জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,

কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—1976

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—1976

চিত্র-সূচী

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিবিধ

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,

কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1976

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1976

চিত্র-সূচী

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার

নিয়মাবলী

1. পরিষদের বার্ষিক সভ্য-চাঁদা 19·00 টাকা ও পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক সভ্য ও গ্রাহক চাঁদা যথাক্রমে 9·50 টাকা ও 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সভ্যগণকে প্রতিমাসে পত্রিকা প্রেরিত হয়ে থাকে।
2. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক ও সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পরে জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
3. কোন সদস্যের চাঁদা 31শে মার্চের (1976) মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা না পড়লে তিনি পরিষদের পরবর্তী বছরের (19 6-'77) জন্য পরিষদের কোন কর্মাধ্যক্ষ পদে বা কার্যকরী সমিতির সদস্য পদে নির্বাচিত হতে বা নির্বাচন করতে পারবেন না।
4. টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 ফোন-55-0660 ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।
6. প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে।
7. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
8. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
9. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
10. চিঠি-পত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ জানুয়ারী, 1976 প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

কর্মবহুল জীবনের আরও একটি বৎসর অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ ঊনত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সুদীর্ঘ আঠাশ বৎসরের অবিরাম প্রয়াসের ফলে বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চার সার্থকতা সম্বন্ধে এখন আর কেহ সন্দিহান নহেন। বর্তমানে আমাদের সম্মুখে একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে—'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র মানোন্নয়নের সমস্যা। কেমন করিয়া এই পত্রিকাটিকে সর্বদিক দিয়া আরও উন্নত করা যায়—ইহাই প্রশ্ন।

এমন এক দিন ছিল যখন কল্পপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা বাংলাভাষায় নিজ নিজ গবেষণার বিষয় প্রকাশে উৎসাহ বোধ করিতেন না। আজ আর সেই দিন নাই, বিজ্ঞানের বহু শাখায় নানা দুরূহ ও জটিল গবেষণার বিষয়ও বাংলাভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বিগত কয়েক বৎসরের বিষয়সূচী লক্ষ্য করিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে। কতকগুলি প্রবন্ধ এতই উচ্চমানের যে, সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। অবশ্য কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরের লেখাগুলি ইহার ব্যতিক্রম। বিষয়ের অতি সরলীকরণের পক্ষপাতী না হইয়াও এই কথা বলা চলে যে, সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিলে তাহা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ অনুকূল হইবে। কিন্তু এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নামমাত্র তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিবার জন্য ভাষার কারিগরি ও কল্পনার চটকদারি যতই জনপ্রিয় হউক না কেন, তাহা প্রকৃত বিজ্ঞান-সাহিত্য পদবাচ্য নহে। আনন্দের কথা আমাদের লেখকগণ ক্রমশঃই এই বিষয়ে অধিকতর সচেতনতার পরিচয় দিতেছেন।

ভাল কাগজে, ভাল ছাপা এবং ভাল ছবি অবশ্যই পত্রিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। ইহা বহিরঙ্গ মাত্র, কিন্তু বহিরঙ্গেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। পরন্তু পত্রিকার মানোন্নয়নের সহিত ইহার সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া আমরা সেই বিষয়েও উন্নতিসাধনে সচেষ্ট আছি। তবে আর্থিক সামর্থ্য আমাদের অতি সীমিত। তজ্জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' গ্রাহক-অনুগ্রাহক এবং সর্বসাধারণের নিকট হইতে উদার আনুকূল্য আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

কোয়াসারের এক যুগ

দীপক বসু*

ভূমিকা

কোয়াসার এক রহস্যময় জ্যোতিষ্ক। দেখতে নক্ষত্রের মত অর্থাৎ বিন্দুবৎ অথচ অন্যান্য গুণাবলী নক্ষত্রের মত নয়। আবিষ্কৃত হয় 1963 সালে। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ বারো বছর। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীদের খাতায় জমা হয়েছে অনেক তথ্য। তার উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত হয়েছে অনেক তত্ত্ব। কিন্তু কোয়াসার কি, অর্থাৎ কোন্ ধরণের জ্যোতিষ্ক? গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা ইত্যাদি আমাদের বহু পরিচিত জ্যোতিষ্কদের মধ্যে এরা কোন্ পর্যায়ে পড়ে? নাকি কোয়াসার সম্পূর্ণ কোন নূতন ধরণের জ্যোতিষ্ক? এক যুগ ধরে সঙ্কলিত তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে আজ আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কি? সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আবিষ্কার

1960 সালের পর থেকে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞার যথেষ্ট উন্নতি হওয়াতে বেতার-জ্যোতিষ্কদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। (বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে—কোন কোন অঞ্চল থেকে খুব শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ আসছে। এদেরই নাম বেতার-জ্যোতিষ্ক। মনে রাখা দরকার—এদের সঙ্গে দৃশ্য নক্ষত্রের কোন সম্পর্ক নেই)। ফলে আলোক-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের বুকে সেই অঞ্চলে কোন দৃশ্য বস্তু আছে কিনা, তার সন্ধান করা বেশ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এইরূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারা কয়েকটি বেতার-জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে আবছা নক্ষত্রের মত বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্‌দের হোঁচট খেতে হয়। পরিচিত কোন মৌলিক পদার্থের সাহায্যেই এদের বর্ণালী রেখা ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে কি এই সব জ্যোতিষ্কে নূতন ধরনের কোন মৌলিক পদার্থ আছে? বিজ্ঞানীরা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেন না। একাধিক ক্ষেত্রে এই ধরণের রহস্যময় বর্ণালী-রেখার আবির্ভাব হবার পর মার্কিন জ্যোতির্বিদ্ মার্টিন স্মিথ অসীম সাহস সঞ্চয় করে এক অত্যাশ্চার্য দাবী করেন—বর্ণালী-রেখার লোহিতাপসরণের সাহায্যে তিনি উপরি-উক্ত রহস্যময় বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

ধরা যাক, গবেষণাগারে কোন মৌলিক পদার্থের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল—তার একটি রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো λ_1। এখন জ্যোতিষ্ক থেকে আগত আলোকের বর্ণালীতে সেই পদার্থের সেই রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ_1 না হয়ে λ_2 হতে পারে (এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হবে)। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে λ_2 সর্বদাই λ_1 অপেক্ষা বৃহত্তর অর্থাৎ রেখাটি বর্ণালীর লাল অংশের দিকে সরে গেছে। তাই এই ঘটনার নাম লোহিতাপসরণ। গাণিতিক ভাবে

$$\text{লোহিতাপসরণ } (z) = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1}$$

z-এর যে মানের সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্কের বর্ণালীর সবগুলি রেখাকে আমাদের পরিচিত পদার্থের বর্ণালী-রেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যাবে, সেই জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে লোহিতাপসরণের পরিমাণও হবে তাই।

---

* Instituto Astronomico & Geofisico Universidade, Sau Paulo, Brasil.

দূরের নীহারিকা থেকে আগত আলোকের লোহিতাপসরণের কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। কিন্তু সেখানে z-এর মান 0·1-এরও কম অর্থাৎ রেখাটি বর্ণালী ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে সামান্যই অপসারিত হয়। মুস্কিল হলো—স্মিথ যে পরিমাণ অপসারণের কথা বললেন—তাতে z-এর মান দাঁড়ালো 0·1-এর থেকে অনেক বেশী। তাই হঠাৎ মেনে নেওয়া একটু অসুবিধাজনক। কিন্তু এই ধারণা পর পর কয়েকটি রহস্যময় জ্যোতিষ্কের জন্যে প্রয়োগ করে সবগুলি বর্ণালীকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো—যদিও z-এর মান ক্রমশঃই বাড়তে থাকলো। আবিষ্কর্তা স্মিথই নূতন জ্যোতিষ্কের নাম দিলেন কোয়াসার। এই হলো সংক্ষেপে কোয়াসারের আবিষ্কারের ইতিহাস। বর্তমানে প্রায় তিন শত কোয়াসারের সন্ধান পাওয়া গেছে। z-এর সর্বনিম্ন মান 0·036, সর্বোচ্চমান 3·53।

প্রধান গুণাবলী

কোয়াসারের প্রধান গুণাবলী হলো: (ক) আপাতদৃষ্টিতে নক্ষত্রের মত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রে নয়) বেতার-তরঙ্গ বিকিরণকারী। (খ) বেশীর ভাগ কোয়াসারের (সকলের নয়) আলোক ও বেতার-তরঙ্গে বিকিরিত শক্তি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, (গ) কোয়াসার নক্ষত্রের তুলনায় অনেক বেশী অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করে থাকে। (ঘ) বর্ণালীতে অতি প্রশস্ত বিকিরণ রেখা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রে নয়) শোষণ রেখা পরিলক্ষিত হয়, (ঙ) বর্ণালী রেখার অত্যধিক লোহিতাপসরণ।

যে সব বর্ণালীতে শোষণ রেখার আবির্ভাব হয়, তাদের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। z-এর যে মানের সাহায্যে বিকিরণ রেখাগুলির সন্ধান পাওয়া গেল—z (বিকিরণ) শোষণ রেখাটি তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে শোষণ রেখার জন্যে z-এর অন্য মান নির্ধারণ করতে হয়—z (শোষণ)।

শুধু তাই নয়, যখন বর্ণালীতে অনেক শোষণ রেখা দেখা যায়, সবগুলি রেখা z (শো)-এর একটি মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে z (শো)-এর একাধিক মানের প্রয়োজন হয়। বিকিরণ রেখার ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও পর্যন্ত একটি বর্ণালীতে বিকিরণ রেখার ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও পর্যন্ত একটি বর্ণালীতে দৃশ্য সব রেখাই z (বি)-এর একটি মানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে একটি কোয়াসারের একটি z (বি) ও একাধিক z (শো) থাকতে পারে।

বেতার-পর্যবেক্ষণ

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন অংশে সর্বদাই নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান করা হচ্ছে। সন্দেহজনক প্রকৃতি লক্ষ্য করলে আলোক-জ্যোতির্বিদ্‌গণ সেই অঞ্চলের বর্ণালী গ্রহণ করে নূতন নূতন কোয়াসার আবিষ্কার করেন। এরপর বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র কোয়াসারের আকৃতি ও গঠন নির্ণয় করে থাকে। সাধারণভাবে কোয়াসার খুবই ক্ষুদ্র। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এক সেকেণ্ডের কম কোণ উৎপন্ন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুগ্ম অবস্থায় বিদ্যমান বা গঠন বেশ জটিল। বিভিন্ন বেতার-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিকিরিত শক্তি পর্যবেক্ষণ করে কোয়াসারের বেতার বর্ণালী নির্ধারিত হয়েছে। শক্তির উৎস সম্বন্ধে জানতে হলে এই বর্ণালী বিশেষ প্রয়োজন।

পরিবর্তনশীল বিকিরণ

উপরে বলা হয়েছে—আলোক ও বেতার উভয় ক্ষেত্রেই কোয়াসার থেকে আগত শক্তি পরিবর্তনশীল। অবশ্য সব কোয়াসারের জন্যে নয়। এই পরিবর্তনের সময়কাল কয়েক দিন

থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে। পরিমাণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হওয়া সম্ভব। কোন পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হয় নি। কোয়াসারের অন্ত কোন গুণাবলীর সঙ্গে এই পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক এখনও স্থাপিত হয় নি—যদিও বেতার-বর্ণালীর সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কের কথা কেউ কেউ দাবী করেছেন। তবে এর জন্যে আরও পর্যবেক্ষণ দরকার।

লোহিতাপসরণ

কোয়াসারের সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ 'গুণ' হলো—বর্ণালী-রেখার অত্যধিক লোহিতাপসরণ। আগেই বলা হয়েছে নীহারিকার ক্ষেত্রে লোহিতাপসরণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত ছিল। ডপ্‌লার প্রক্রিয়ার কথা অনেকেরই জানা আছে তরঙ্গ-বিকিরণকারী উৎস ও গ্রাহকের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি থাকলে আগত তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। যদি উৎস গ্রাহকের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তবে কম্পন-সংখ্যা কমে আসে (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়)। আর যদি উৎস ক্রমশঃ নিকটতর হয়, তবে কম্পন-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমে আসে)। এই কারণেই রেল ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে যখন ট্রেন হুইস্‌ল্ দিতে দিতে কাছে আসতে থাকে, তখন হুইসলের শব্দ ক্রমশঃ বেশী কর্কশ (কম্পন-সংখ্যা বৃদ্ধি) শোনায়। যে মুহূর্তে ইঞ্জিন শ্রোতাকে পার হয়ে বিপরীত দিকে চলে গেল, শব্দের কর্কশতাও কমতে থাকলো (কম্পন-সংখ্যা হ্রাস)। লোহিতাপসরণ হচ্ছে বর্ণালী-রেখার লালের দিকে অপসরণ অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি (কম্পন-সংখ্যার হ্রাস)। ডপ্‌লার প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় যে, জ্যোতিষ্কটি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই 1929 খৃঃ মার্কিন জ্যোতির্বিদ্‌দ্বয় হাব্‌ল্ ও হুমাসন ঘোষণা করলেন—দূরের নীহারিকাপুঞ্জ ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। তাঁরা দেখান যে, নীহারিকা যত দূরে, তার লোহিতাপসরণ তত বেশী (হাব্‌ল্ সূত্র); অর্থাৎ লোহিতাপসরণ দূরত্বের একটি পরিমাপ। স্বভাবতঃই কোয়াসারের লোহিতাপসরণের জন্যেও বিজ্ঞানীরা এই প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তাতে অনেক নূতন সমস্যার উদ্ভব হলো।

কোয়াসারের ক্ষেত্রেও যদি লোহিতাপসরণ দূরত্বের পরিমাপক হয়, তবে লোহিতাপসরণের সঙ্গে কোয়াসারের উজ্জ্বলতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। এখানে 'উজ্জ্বলতা' বলতে কোয়াসার থেকে আগত শক্তির কথা বলা হচ্ছে। স্বভাবতঃই জ্যোতিষ্ক যত দূরে (লোহিতাপসরণ তত বেশী) তার থেকে আগত শক্তিও সাধারণ ভাবে তত কম হবে। আলোক ও বেতার উভয় ক্ষেত্রে গৃহীত শক্তির সঙ্গে লোহিতাপসরণের তুলনা করা হয়েছে—কোন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় নি। তবে কি কোয়াসারের লোহিতাপসরণ দূরত্বের পরিমাপক নয়?

আগেই বলা হয়েছে—বর্তমানে আমরা প্রায় তিন শত কোয়াসারের সন্ধান পেয়েছি। এদের লোহিতাপসরণ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, z-এর (বিকিরণ এবং অথবা শোষণ) কতকগুলি মানে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক কোয়াসার আছে। উদাহরণ স্বরূপ $z=0.06$—z-এর এই মানে (বা এর খুব কাছাকাছি) আট/দশটি কোয়াসার রয়েছে। অপর পক্ষে z-এর অন্যান্য মানে একটি / দুটি মাত্র কোয়াসার পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, দুরূহ অঙ্ক কষে কেউ কেউ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, z-এর যে সব মানে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক কোয়াসার পরিলক্ষিত হয়েছে, সেই সব মান প্রকৃতপক্ষে পর্যায়ক্রমিক। যেমন, $z=0.06$, $z=0.12$, $z=0.18$ ইত্যাদি। এটা যদি সত্য হয়, তবে এর তাৎপর্য খুবই গুরুত্ব-

পূর্ণ। কারণ জ্যোতিষ্ক যত দূরে আছে, সেখান থেকে আলোক আসতে তত বেশী সময় লাগবে। উদাহরণস্বরূপ z=2.0 বিশিষ্ট কোয়াসারের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের প্রায় শতকরা আশি ভাগ এবং এই জ্যোতিষ্ক রয়েছে 1000 কোটি আলোক-বর্ষ দূরে (এক আলোক বছর=9.5×10^{17} সেঃ মিঃ অর্থাৎ এক বছরে আলোক যতটা পথ যেতে পারে)। আজ আমরা এই কোয়াসার থেকে যে আলোক পাচ্ছি, তা সেখান থেকে রওনা হয়েছিল 1000 কোটি বছর আগে। তাহলে বস্তুতঃ তত বছর আগের ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি; অর্থাৎ কোয়াসারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের সুদূর অতীতকে পর্যবেক্ষণ করছি।

এখন আমরা জানি—কোন কোন মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব পরিবর্তনশীল। তা হলে বলতে হয়, z-এর যে সব মানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী কোয়াসার পাওয়া গেছে, সেই সব 'সময়ে' কোন অজ্ঞাত কারণে কোয়াসার সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়েছে। কেন? আর যদি সেই সব 'সময়' পর্যায়ক্রমিক হয়, তা হলে তো আরও চমকপ্রদ! এইভাবে কোয়াসারের লোহিতাপসরণ বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব নিয়ে জোর বাগবিতণ্ডা ও গবেষণা চলেছে।

কোয়াসার কি আকাশের এককোণে পুঞ্জীভূত?

একটি প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে পারে—আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোয়াসারের সংখ্যা কি সমান, না কোন বিশেষ অংশে বেশীর ভাগ কোয়াসারগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে? এর উত্তরে বলতে হয়—এটা নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পর্যবেক্ষণের সুবিধা কেমন আছে, তার উপর। কারণ পৃথিবীর সব অংশ থেকে আকাশের সকল স্থানে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র (আলোক ও বেতার) রয়েছে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ এখনও অনেকটা অজানা অর্থাৎ এক কথায়, পর্যবেক্ষণ এখনও অসম্পূর্ণ। যাই হোক, তবু মোটামুটিভাবে বলা যায়—কোয়াসার কোন অঞ্চলে পুঞ্জীভূত হয়ে নেই। সবদিকে প্রায় সমভাবেই বর্তমান।

নীহারিকার সঙ্গে যুক্ত?

সমস্যা জটিলতর করে কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, তাঁরা একটি নীহারিকা (z-এর মান খুব কম) ও একটি কোয়াসার (z-এর মান খুব বেশী) আকাশের বুকে খুব কাছাকাছি দেখতে পেয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দাবী করা হয়েছে যে, এরূপ দুটি জ্যোতিষ্ক পরস্পরের সঙ্গে আঙ্গিকভাবে যুক্ত। লোহিতাপসরণের তফাতের জন্যে এদের পরস্পরের থেকে অনেক দূরে থাকবার কথা। তাহলে আঙ্গিক যুক্ততার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে কি কোয়াসারের লোহিতাপসরণ দূরত্বের নির্দেশক নয়? বাগবিতণ্ডার শেষ নেই।

কোয়াসারের লোহিতাপসরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা বোধ হয় কোয়াসারের লোহিতাপসরণ। লোহিতাপসরণের জন্যে পদার্থবিদ্দের দুটি ব্যাখ্যা জানা আছে—মাধ্যাকর্ষণ ও ডপ্লার প্রক্রিয়া। কোন শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে ν কম্পন-সংখ্যাযুক্ত আলোক (অর্থাৎ ফোটন) নির্গত হলে মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে যাবার সময়ে তাকে কিছুটা শক্তি (E) হারাতে হয়। আমরা জানি—

$$E=h\nu$$

এখানে h একটি ধ্রুবক। শক্তি হারাবার জন্যে

E-এর মান কমে গেল বলে ν-ও কমে যাবে—ফলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে: অর্থাৎ লালের দিকে অপসারিত হবে। এইভাবে মাধ্যাকর্ষণ-জনিত লোহিতাপসরণ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কোয়াসারের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য বলে অনেকে মনে করেন। যদিও এই মতবাদ এখনও বাতিল করে দেওয়া হয় নি, কিন্তু এর সাহায্যে বর্ণালী-রেখার অন্যান্য গুণাবলী (যেমন প্রশস্ততা) ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

তাছাড়া লোহিতাপসরণ যদি মাধ্যাকর্ষণ-জনিত হয়, তবে সম্ভবতঃ কোয়াসারগুলি আমাদের কাছাকাছিই অবস্থান করছে। সে ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত লোহিতাপসরণ ব্যাখ্যা করতে হলে যে পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ দরকার, সে ধরণের বস্তু কাছাকাছি থাকলে আমাদের ছায়াপথের উপর নানারূপ প্রভাব বিস্তার করবে। সে রকম কোন প্রভাব এখনও লক্ষিত হয় নি।

ডপ্‌লার প্রক্রিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে এর সঙ্গে বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের পরিচয়। তাই এটাই বিজ্ঞানীমহলে সবচেয়ে 'জনপ্রিয়'। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী হাব্‌ল্‌-সূত্র অনুসারে লোহিতাপসরণ দূরত্বের পরিমাপক হতে পারে। কিন্তু লোহিতাপসরণ সত্যই দূরত্বের পরিমাপক কিনা, সে বিষয়ে নানা সন্দেহের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

অপর পক্ষে, আমাদের ছায়াপথ বা কাছাকাছি অন্য কোন নীহারিকাতে বিস্ফোরণের ফলে কোয়াসারের সৃষ্টি হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাহলে পরিলক্ষিত লোহিতাপসরণ হচ্ছে বিস্ফোরণজনিত গতিবেগের পরিমাপক। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কিছু কিছু বস্তু যেমন আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে (লোহিতাপসরণ), তেমনি কিছু বস্তুর নিশ্চয়ই আমাদের দিকে আসবার কথা (নীলাপসরণ ?)। কিন্তু আজ পর্যন্ত নীলাপসরণযুক্ত কোন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাছাড়া পরিলক্ষিত লোহিতাপসরণের জন্যে যে গতিবেগ দরকার, সাধারণ বিস্ফোরণ প্রক্রিয়ায় সে গতিবেগ অর্জন করা সম্ভব নয়।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, যদি কোয়াসারের ক্ষেত্রে লোহিতাপসরণ দূরত্বের পরিমাপক না হয়, তবে এই জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব নির্ধারণের অন্য কোন উপায় এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

অস্বাভাবিক শক্তি বিকিরণ

উপরে বলা হয়েছে—কোয়াসারগুলি হাব্‌ল্‌ সূত্র মেনে চলে এবং তাদের লোহিতাপসরণ দূরত্ব নির্দেশক—এই মতবাদই সর্বাধিক প্রচলিত। তাহলে এদের দূরত্ব পরিচিত অন্যান্য সকল প্রকার জ্যোতিষ্ক থেকে অনেক বেশী। কিন্তু একথাও সত্য—সেখান থেকে বিকিরণ এসে পৃথিবীতে পৌঁচচ্ছে। তাহলে বিকিরিত শক্তি নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেশী। মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে—10^{6} বছরে এদের বিকিরিত শক্তির পরিমাণ 10^{61} আর্গ। অথচ এরা আকৃতিতে খুবই ছোট। সমস্যা হলো এত ক্ষুদ্র বস্তু থেকে এত অধিক পরিমাণ শক্তি কি ভাবে বিকিরিত হচ্ছে? পদার্থবিদ্‌দের পরিচিত কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই এই বিকিরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদই দেওয়া হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

মনে করা যাক O কোন নীহারিকার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্রের খুব ঘন সন্নিবেশ। নক্ষত্রেরা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছে। ঘনত্ব যদি খুব বেশী হয়, তবে এই ধাক্কাধাক্কি এত জোর হতে পারে যে, এক সময়ে নক্ষত্রেরা অত্যধিক গতিবেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে। কোন কোন মতবাদ অনুযায়ী এইভাবে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজিই হচ্ছে কোয়াসার। এর

জন্যে দরকার প্রতি ঘন পারসেকে 10^{11} টি নক্ষত্র (এক পারসেক $= 3.1 \times 10^{18}$ সেঃ মিঃ)।

অন্য মতবাদ অনুযায়ী কোয়াসার সৃষ্টি হয়ে থাকে বহু সংখ্যক নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে। একটি নক্ষত্র বিস্ফোরিত হলে বিকিরিত শক্তির পরিমাণ প্রায় 10^{52} আর্গ। যদি 10^{6} বছরের মধ্যে 10^{9} গুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়। তবে প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া সম্ভব। এর জন্যে দরকার প্রতি ঘন পারসেকে 10^{7}টি নক্ষত্র। ধরে নেওয়া হয়—একটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণ শৃঙ্খল প্রক্রিয়াতে অন্য নক্ষত্রের বিস্ফোরণকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমরা জানি যে, কোন ভারী বস্তু যদি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে, তবে তার থেকে মাধ্যাকর্ষণজনিত শক্তি নির্গত হয়। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে দেখানো যায় যে, বস্তুর ভর যদি 10^{8} গুলি সূর্যের ভরের থেকে বেশী হয়, তবে সে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না এবং তার সংকোচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেই বস্তুর মাধ্যাকর্ষণজনিত শক্তি বিকিরণও অবশ্যম্ভাবী হবে। কোয়াসার এই জাতীয় বস্তু বলে কেউ কেউ মনে করেন।

পদার্থ এবং বিপরীত-পদার্থকে মিলিয়ে দিলে তারা অন্তর্হিত হয় এবং ফলস্বরূপ প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়—পদার্থবিদ্যার এই ধারণা প্রচলিত। কোয়াসারের অভ্যন্তরে এই প্রক্রিয়া ঘটছে বলে কারও কারও বিশ্বাস। কিন্তু এই দুই প্রকার বস্তুর সৃষ্টি, নির্দিষ্ট আকার ও পরিমাণে গঠন পরস্পরের থেকে আলাদাভাবে থাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ে একত্রীকরণ—এসব কি ভাবে ঘটছে, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

সৌরবিস্ফোরণের সঙ্গে জ্যোতির্বিদদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এর ফলে প্রায় 10^{32} আর্গ পরিমিত শক্তি বিকিরিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বর্ধিত করলে 10^{61} আর্গ শক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু 10^{29} গুণ পরিবর্ধন খুব সহজ কথা নয়।

উপরিউক্ত সমস্ত মতবাদই দেওয়া হয়েছে লোহিতাপসরণ দূরত্বজনক—এই ধারণার উপর ভিত্তি করে। গাণিতিক দিক থেকে সকল মতবাদই খুব জটিল। সকলই মনে হয় তাঁদের ধারণাকে যেন ভাসা ভাসা রেখেছেন। কেউই শক্তি বিকিরণের বিশদ ব্যাখ্যা বা গভীরে প্রবেশ করেন নি। প্রয়োজনমত বদলে পর্যবেক্ষনলব্ধ তথ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা চলেছে সব সময়ে।

উপসংহার

বিগত এক যুগ ধরে কোয়াসার সম্বন্ধে সঙ্কলিত তথ্য ও তত্ত্ব উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। ভূমিকাতে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এর থেকে এখন তবে উত্তর দিতে পারি কি? না। যে রহস্যময় জ্যোতিষ্ক হিসাবে কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছিল, দীর্ঘ বারো বছর পরেও তারা সেই রহস্যময়ই থেকে গেছে। আজ পর্যন্ত এমন কোন মতবাদ প্রকাশিত হয় নি, যা কোয়াসারের সব রকম গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, কোয়াসারের রহস্য নিহিত রয়েছে লোহিতাপসরণের রহস্যের মধ্যে। তাই লোহিতাপসরণের ব্যাখ্যার দিকেই বেশীর ভাগ চেষ্টা কেন্দ্রীভূত। লোহিতাপসরণ সংক্রান্ত কোন কোন গবেষণা সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত। কেউ কেউ মনে করেন—কোয়াসারের সংখ্যা (যদিও প্রায় তিন শত) এখনও সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে যথেষ্ট নয়, অর্থাৎ আরও পর্যবেক্ষণ দরকার। আশার কথা—জ্যোতির্বিদেরা হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে নেই। পর্যবেক্ষণ ও অঙ্ক কষা পুরোদমে চলেছে। দেখা যাক, রহস্যময় কোয়াসার আর কত দিন নিজেকে রহস্যাবৃত করে রাখতে পারে।

মাছের বসন্ত রোগ

শ্রীনেপালচন্দ্র নন্দী*

মানুষ তার নিজের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকলেও সাধারণতঃ আশেপাশের প্রাণীর রোগ সম্বন্ধে তেমন একটা নজর দেয় না। খুব কম ব্যক্তিরই জানা আছে যে, আমাদের বসন্ত রোগের ন্যায় মাছের গায়ে ও ফুলকায় এক প্রকার গুটিকা দেখা যায়। এর সংক্রমণে বহু মাছ মারা যায়। মাছের শৈশব অবস্থায় এই রোগ মহামারী সৃষ্টি করে। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, মানুষের বসন্ত রোগ ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত হয়, কিন্তু মাছের বসন্ত রোগ ঘটায় এক প্রকার পরজীবী প্রোটোজোয়া। এরা এককোষী আদ্যপ্রাণী। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম মিক্সোস্পোরিডা (Myxosporida)।

বসন্ত রোগ সুপ্রাচীন—1100 খৃঃ-পূর্বেও তার নজীর আছে। মাছের বসন্ত রোগ কোথায় কবে থেকে সুরু হয়েছে, তার কোন লিখিত ইতিহাস নেই। জার্মান বিজ্ঞানী বুৎসলি পচাঁনব্বই বছর পূর্বে মাছের বসন্ত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের প্রথম আবিষ্কার করেন। সেই থেকে বিদেশে মাছের বসন্ত রোগ সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। ভারতীয় গবেষকেরাও পিছিয়ে নেই। এদেশে প্রথম গবেষণা সুরু করেন 1918 খ্রীষ্টাব্দে যুগ্মভাবে বিজ্ঞানী সাউথওয়েল ও প্রসাদ। বাঙালী গবেষকদের মধ্যে আছেন স্বর্গীয় ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়, স্বর্গীয় ডক্টর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বসু, ডক্টর মুকুন্দ মুরারী চক্রবর্তী, শ্রীশৈবাল রায়চৌধুরী ও ডক্টর অনিলকৃষ্ণ মণ্ডল। ডক্টর চক্রবর্তী বাজারের সাধারণ রুই, কাৎলা, ইলিশ প্রভৃতি মাছের পরজীবী মিক্সোস্পোরিডাদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ডক্টর অমলেশ চৌধুরী ও বর্তমান লেখক সুন্দরবন সাগরদ্বীপ অঞ্চলের ডাকুড় (স্থানীয় নাম) মাছের (Boleopthalmus boddaerti) দেহ থেকে কয়েকটি নতুন ধরণের মিক্সোস্পোরিডা আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ডক্টর ললিথাকুমারী ও ডক্টর কাল্‌রী অনেকগুলি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেন। এক কথায় ভারতে মাছের বসন্ত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের নিয়ে সব রকম গবেষণা সুরু হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মাছের বিভিন্ন প্রকার বসন্ত রোগ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

জীবন-বৃত্তান্ত

পরজীবী মাত্রেই পোষকের প্রয়োজন। কতকগুলি পরজীবীর জীবন আবার দুটি পোষকের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। ম্যালেরিয়ার রোগ-জীবাণু প্লাজমডিয়াম এই জাতীয় পরজীবী। এদের জীবনের কিছু সময় অ্যানোফিলিস মশকীর দেহে ও বাকী সময় মানুষের দেহে অতিবাহিত হয়। মাছের বসন্ত রোগ সৃষ্টিকারী মিক্সোস্পোরিডাদের ক্ষেত্রে একটিমাত্র পোষকের উপস্থিতি দেখা যায়। এরা বিশেষতঃ মাছের পরজীবী হলেও অল্প-বিস্তর উভচর ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর দেহে এবং পক্ষী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীর দেহে পাওয়া যায়। পক্ষী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীতে আজ পর্যন্ত কোন মিক্সোস্পোরিডার হদিস পাওয়া যায় নি। মিক্সোস্পোরিডাদের জীবন-চক্রে মুখ্যতঃ

*সুষমাদেবী চৌধুরাণী সমুদ্র-জীব গবেষণাগার, বামনখালি, সাগরদ্বীপ, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ।

দুটি দশা দেখা যায়, যথা—ট্রোফোজয়েট (Trophozoite) ও স্পোর (Spore) দশা। প্রসঙ্গতঃ ট্রোফোজয়েটের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, অ্যামিবার ন্যায় দেহের সীমারেখা অনিয়মিত। স্পোরের আকৃতি নির্দিষ্ট প্রকারের হয়ে থাকে। স্পোর-ভাল্‌ভবিশিষ্ট স্পোর আবরণ এর মধ্যস্থ স্পোরোপ্লাজম (Sporoplasm) ও পোলার ক্যাপসুল (Polar capsule) সমন্বয়ে গঠিত। পোলার ক্যাপসুলের মধ্যে পোলার সূত্র (Polar filament) থাকে। প্রজাতিভেদে স্পোরের আকৃতি, ভাল্‌ভ সংখ্যা ও পোলার ক্যাপসুল ইত্যাদি বিভিন্ন হয়।

স্পোর দশায় পরজীবীটি একটি নির্দিষ্ট পোষক মাছের পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করে। পোষকের পৌষ্টিক নালীর পাচক রসে স্পোরের আবরণ দ্রবীভূত হয়। স্পোরের মধ্যস্থিত স্পোরোপ্লাজম ক্ষুদে অ্যামিবার চেহারায় বেরিয়ে আসে। পরে অন্ত্রঝিল্লী ভেদ করে বিশেষ বিশেষ দেহযন্ত্রের (যেমন পিত্তস্থলি মূত্রস্থলি দেহ-পেশী, ফুলকা ও ত্বক ইত্যাদি) দিকে এগোতে থাকে। অভীষ্ট যন্ত্রে পৌঁছে ক্ষুদে অ্যামিবা বড় ও ট্রোফোজয়েট দশায় পরিণত হয়। পরিণত ট্রোফোজয়েটের নিউক্লিয়াস পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হয়ে স্পোরন্ট (Sporont) সৃষ্টি করে। জনিতৃ স্পোরন্ট থেকে অপত্য স্পোরের জন্ম হয়। এই সময় আক্রান্ত মাছের পোষক-কলায় বহু পরিবর্তন ঘটে এবং জীবাণুর চারদিকে একটি আবরণের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকেই গুটিকা বা সিস্ট (Cyst) বলে। মাছের গায়ে ও ফুলকায় সংক্রমণ হলে সিস্টগুলিকে খালি চোখে দেখা যায়। পরিপুষ্ট সিস্ট যথাসময়ে ফেটে গিয়ে সিস্ট-মধ্যস্থিত স্পোরগুলিকে জলে মুক্ত করে। দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের সংক্রমণে স্পোর দেহের মধ্যেই মাছের মৃত্যু পর্যন্ত থেকে যায়। মাছের মৃত্যু ও তার পচন হলে স্পোরগুলি জলে মুক্ত হয় ও খাদ্য গ্রহণের সময় স্পোরযুক্ত জল নতুন পোষকের পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করে।

সংক্রমণের যন্ত্রস্থান ও রোগ লক্ষণ

প্রায় সমস্ত যন্ত্রে বা দেহকলায় মিক্সো-স্পোরিডা পাওয়া গেলেও একটি প্রজাতিকে কেবলমাত্র এক বা ভিন্ন মাছের একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রেই ফুল্‌কা, পিত্তস্থলি এবং লোনা জলের মাছে পিত্তস্থলি ও মূত্রস্থলি সংক্রামিত হয়। একটি মাছের একই যন্ত্রে (পিত্তস্থলি বা মূত্রস্থলিতে) এক বা বিভিন্ন মিক্সোস্পোরিডা প্রজাতির সংক্রমণ হতে পারে। তবে একটি প্রজাতি অধিক সংখ্যায় থাকলে সেই যন্ত্রে অন্য প্রজাতি সাধারণতঃ কম থাকে অর্থাৎ সেখানে অসম প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

কেবলমাত্র রোগ-সংক্রমণ ফুল্‌কা, ত্বক ও পাখ্‌নায় হলে সে সব জায়গায় সিস্ট বা গুটিকাকারে রোগের লক্ষণ খালি চোখে ধরা পড়ে। দেহমধ্যস্থ পৌষ্টিক নালী, ঝিল্লী, পর্দা, যকৃৎ, পেশীকলা ও অন্যান্য যন্ত্রে সংক্রমণ হলে সেই সব যন্ত্রের রোগ-জনিত বহু পরিবর্তন ঘটে। মাছের পিত্তস্থলি ও মূত্রস্থলিতে প্রভূত সংক্রমণ হলে পিত্ত ও মূত্রের স্বাভাবিক রং থাকে না ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটে।

মিক্সোস্পোরিডাজনিত রোগ ও মহামারী

মিক্সোস্পোরিডার সংক্রমণে যে রোগ হয়, তাকে এক কথায় মিক্সোস্পোরিডোসিস (Myxo-sporidosis) বলে। মাছের মিক্সোস্পোরি-ডোসিসকে সাধারণ বাংলায় 'মাছের বসন্ত রোগ' বলা যেতে পারে। মাছের বসন্ত রোগ বিভিন্ন দেশে রোগের লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন নামে পরিচিত। নিম্নে কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(ক) কার্প পক্স (Carp pox) বা পোনা

মাছের বসন্ত—রোগ জীবাণুর নাম মিক্সোবোলাস সাইপ্রিনি (Myxobolus cyprini)। এই রোগের সংক্রমণে আমাদের দেশের রুই, কাৎলা ও মৃগেল প্রভৃতি মাছের দৈহিক ওজন হ্রাস পায়। অধিক সংক্রমণে মাছকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখা যায়। সংক্রমণ একটি মাছ থেকেই সমস্ত মাছে ছড়াতে সক্ষম বলে এক সময় মড়ক ও মহামারী সৃষ্টি হয়।

(খ) মোচড় রোগ (Twist disease) বা ঘূর্ণী রোগ (Whirling disease)—রোগ-জীবাণুর নাম মিক্সোসোমা সেরিব্রালিস (Myxosoma cerebralis)। এই রোগ আমেরিকার স্যামন ও ট্রাউট মাছের তরুণাস্থি ও তার পরিবেষ্টিত কলাকে বিনষ্ট করে। যার ফলে কঙ্কাল ও দেহ দুমড়ে বিকৃত চেহারা ধারণ করে। বাচ্চা মাছে এই রোগ মহামারীর আকার পরিগ্রহ করে।

(গ) বিস্ফোটক রোগ (Boil disease)—রোগ-জীবাণুর নাম মিক্সোবোলাস ফাইফেরি (Myxobolus pfeifferi)। ইউরোপের বারবেল (Barbel) জাতীয় মিঠে জলের মাছে এই রোগ হয়।

(ঘ) পোকাঘটিত হ্যালিবাট (Wormy halibut)—রোগ-জীবাণুর নাম ইউনিক্যাপসুলা মাসকুলারিস (Unicapsula muscularis)। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের বিভিন্ন মাছের পেশীতে এই রোগ দেখা যায়।

(ঙ) ট্যাপিওকা রোগ (Tapioca disease)—রোগ-জীবাণুর নাম হেনেগুয়া সালমিনিকোলা (Henneguya salminicola)। এই রোগের সংক্রমণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্যামন মাছের পেশীতে সাদা অস্বচ্ছ ছোট ছোট সিস্ট দেখা যায়।

(চ) দুধি বারাকোটা (Milky barracouta) বা প্যাপ স্নোয়েক (Pap snoek)—রোগ-জীবাণুর নাম কুডোয়া থিরসাইটস (Kudoa thyrsites)। অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বারাকোটা মাছের পেশীতন্তুতে এই রোগের ফলে পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। শতকরা পাঁচভাগ পর্যন্ত মাছকে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে।

রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক

মাছের বসন্ত রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক এখনও গবেষণাধীন। বিশেষ ফলপ্রসূ কোন পন্থা বা প্রতিষেধকের জন্যে আমাদের আরও তৎপর হতে হবে। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য মাছকে সবল রাখে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মাছের বসন্ত হলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

(ক) সংক্রামিত মাছকে রোগমুক্তকরণ—বড় বড় মাছ রোগাক্রান্ত হলে জলাশয় থেকে ঝুড়িতে করে তুলে এনে সদ্য মিথিলিন ব্লু গোলা জলে (কুড়ি লিটার জল : একগ্রাম মিথিলিন ব্লু) আধ বা এক মিনিট নিমজ্জিত অবস্থায় মৃদু ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। মৃদু ঝাঁকানিতে গায়ের সিস্ট বেশ কিছু ভেঙ্গে যাবে। এর অব্যবহিত পরেই আবার আধ মিনিট পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গোলা জলে (দশ লিটার জল : এক গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) আগের মতই ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। এরপর চিকিৎসিত মাছগুলি অন্য জীবাণু-মুক্ত জলাশয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে।

(খ) আবাদী জলাশয়কে রোগমুক্তকরণ—জলাশয়ে ওয়াটার-ডিসপারসিবল গ্যামাক্সিন (দু-কিলোলিটার জল : এক গ্রাম ওয়াটার ডিস্পার-সিবল গ্যামাক্সিন) ছড়াতে হবে। তবে ওয়াটার ডিস্পারসিবল গ্যামাক্সিন শুধুমাত্র রোগ দেখা দিলেই প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়া জলাশয়ে আধকাদি করা ধারালো কাণাযুক্ত বাঁশ বিক্ষিপ্ত ভাবে পুঁতে রাখা দরকার, যাতে মাছ ঐ বাঁশে গা ঘষে সিস্টগুলিকে ভাঙতে বা খসিয়ে ফেলতে

পারে। এই উপায়ে মাছ অন্যান্য বহিঃপরজীবীর আক্রমণ থেকেও রক্ষা পেতে পারে।

মাছ আমাদের অতিপ্রিয় খাদ্যসামগ্রী। রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী বছরে পশ্চিম বঙ্গে মাছের চাহিদার মোট পরিমাণ আট লক্ষ টন। গত বছরে (1974-'75) উৎপাদন খাদ্যের বিভিন্ন আবাদী জলাশয়, ভেড়ী, নদী ইত্যাদি থেকে মাত্র দু-লক্ষ কুড়ি হাজার টন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে মাছের বসন্ত ও অন্যান্য রোগ বিষয়ে বিশেষ নজর দেবার আশু প্রয়োজন আছে। এতে সমস্ত চাহিদার আংশিক পূরণ হতে পারে।

হাতী

মণীন্দ্রনাথ দাস

হাতী বৃহত্তম স্থলচর জন্তু, আফ্রিকা দেশের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতীর ওজন ছয় টন এবং উচ্চতা এগারো ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় সাত কোটি বছরব্যাপী ক্রমবিকাশের ফলে শূকরসদৃশ টেপিরজাতীয় পশু মিরিথেরিয়াম বিবর্তনের ফলে বর্তমান হাতীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রায় দশ লক্ষ বছর পূর্বে হাতীর পূর্বপুরুষ অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বৃটিশ মিউজিয়ামে কেন্ট প্রদেশ থেকে সংগৃহীত যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যামথ নামক অতিকায় রোমশ হাতীর নিদর্শন আছে, সেটি উচ্চতায় প্রায় চৌদ্দ ফুট। ভারতে শিবালিক পর্বতমালা থেকে প্রাচীন যুগের হাতীর যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তার নাম ষ্টেগডন গণেশ, এই হাতীটির দাঁত প্রায় নয় ফুট লম্বা। উত্তর আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন যুগের হাতীর দাঁত প্রায় 16 ফুট দীর্ঘ ছিল। হাতীর আর এক পূর্বপুরুষ ম্যাষ্টোডনের কঙ্কাল ঈজিপ্ট ও ফ্রান্সে পাওয়া গেছে। এদের উপর-নীচে দু-জোড়া দাঁত হতো।

প্রায় পনেরো হাজার বছর আগে প্রাচীন কালের মানুষ হাতীকে বশীভূত করে। দশ হাজার বছর পূর্বেকার প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা হাতীর ছবি উত্তর স্পেনের গুহাপ্রাচীরে দেখা যায়। ভারত, মধ্যপ্রাচ্য মিশর দেশে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে হাতী শিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল।

চার হাজার বছর আগেকার মোহেঞ্জোদারোর শিলায় এবং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মৌর্যমুদ্রায় প্রতীকরূপে হাতীর চিহ্ন দেখা যায়। গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার (খৃঃ পূঃ 356-323) ভারতে এসে সিন্ধু নদের তীরে পুরু রাজাকে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই সময়ে পুরুরাজ যে হস্তিবাহিনী নিয়োগ করেছিলেন, তাতে 200 হাতী ছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (খৃঃ পূঃ 323-299) 9000 যুদ্ধের হাতী ছিল। খৃষ্টপূর্ব 218 অব্দে সুপ্রসিদ্ধ কার্থেজ বীর হ্যানিবল সুশিক্ষিত হস্তীবাহিনী নিয়ে আল্পস পর্বত অতিক্রম করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজার হাতীর পিঠে চড়ে টেম্‌স্ নদী পার হন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে মধ্যযুগে মোগল সম্রাট বাবর পাণিপথের যুদ্ধে 1526 খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করেন। যদিও এই পাঠান নরপতির চারগুণ বেশী সৈন্য ও প্রায় এক হাজার হাতী ছিল।

প্রাচীন বাংলায় ঋষি পালকাপ্য হস্তী-চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন, তৎপ্রণীত হস্ত্যায়ুর্বেদ এ সম্পর্কে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, এই হাতী পুঁথির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হস্তী-প্রচার বলে একটি অধ্যায় আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এই চার মহাদেশেই অতিকায় হস্তী ছিল। বর্তমান কালে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, মালয় ও সুমাত্রা দ্বীপ হাতীর বাসভূমি। ভারতীয় হাতী ও আফ্রিকার হাতীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। আফ্রিকা দেশীয় হাতীর আকার বৃহৎ, ললাট উত্তল, কর্ণ বিস্তৃত (4´×5´), শুঁড়ের অগ্রভাগ দুটি আঙ্গুলের মত আর সম্মুখের পদে চারটি ক্ষুরযুক্ত আঙ্গুল ও পশ্চাৎপদে তিনটি ক্ষুর হয়। আর ভারতীয় হাতীর শরীর অপেক্ষাকৃত ছোট, কপাল অবতল, শুঁড়ের অগ্রভাগ এক আঙ্গুলের মত, সামনের পায়ে পাঁচটি ক্ষুর ও পিছনের পায়ে চারটি ক্ষুর থাকে আর তুলনায় ছোট কান হয়। শ্যামদেশের শ্বেতহস্তীকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। আফ্রিকার কঙ্গো দেশে এক-জাতের ছোট বামন হাতী পাওয়া যায়, এরা উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ থেকে সাত ফুট পর্যন্ত হয় আর ওজনে প্রায় 2500 পাউণ্ড। মদ্দা হাতী মাদী হাতীর চেয়ে একটু বড় হয়।

ভারতীয় হাতী আট থেকে এগারো ফুট পর্যন্ত উঁচু ও ওজনে 4000 কিলোগ্রাম হয় আর আফ্রিকার হাতী উচ্চতায় দশ থেকে তের ফুট পর্যন্ত এবং প্রায় ওজনে 6000 কিলোগ্রাম হয়। হাতীর দৈর্ঘ্য মাথা থেকে পিছন পর্যন্ত 16 থেকে 20 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। শিকারীদের হিসাবে সচরাচর হাতীর পায়ের ছাপের পরিধির দ্বিগুণ হচ্ছে হাতীর কাঁধের উচ্চতা। ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত হাতীর মেরুদণ্ডে 65টি কশেরুকা অস্থিখণ্ড থাকে। ভারতে কেবল পুরুষ হাতীরই ছেদনদন্ত উন্নত এবং বাঁকা হয়ে মুখ থেকে বেশ কিছুটা বেরিয়ে থাকে। চলতি ভাষায় একেই গজদন্ত বলে। ভারতীয় হাতীর দাঁত সাধারণতঃ পাঁচ থেকে নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়—এরূপ একজোড়া হস্তীদন্তের ওজন 70 পাউণ্ড থেকে 150 পাউণ্ড এমন কি, 234 পাউণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আফ্রিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয় হস্তীরই ছেদনদন্তদ্বয় (গজদন্ত) মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকে এবং সচরাচর লম্বায় ছয় ফুট এবং ওজনে 80 থেকে 120 পাউণ্ড অথবা 240 পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। বৃটিশ মিউজিয়ামে একজোড়া বিরাট হস্তীদন্ত সংরক্ষিত আছে, উভয়ের ওজন 293 পাউণ্ড, তার মধ্যে একটির দৈর্ঘ্য সাড়ে এগারো ফুট। হাতীর এই গজদন্ত সারা জীবন বাড়ে। এছাড়া হাতীর উভয় কষে উপর নীচে মিলিয়ে মোট চারটি বড় চর্বণদন্ত আছে। এক একটি লম্বায় এক ফুট এবং ওজনে প্রায় নয় পাউণ্ড। এই দুই জোড়া দাঁত হাতীর সমস্ত জীবনকালে পাঁচ বার পড়ে ও পাঁচ বার নতুন করে গজায়। হাতীর মস্তিষ্ক প্রায় দশ পাউণ্ড ভারী হয়। এই মস্তিষ্ক হাতীর শরীরের অনুপাতে 0·1% আর মানুষের মস্তিষ্ক দেহের তুলনায় 2% হয়। হাতীর হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় 57 পাউণ্ড এবং হৃৎস্পন্দন মিনিটে 22 থেকে 35 বার। হাতীর ক্ষুদ্রান্ত্র 70 ফুট আর বৃহদন্ত্র 80 ফুট দীর্ঘ। হস্তীদেহের তাপমাত্রা 97·2° ফারেনহাইট হয়। হাতীর গায়ের রং ধোঁয়াটে কালো, চামড়া প্রায় এক ইঞ্চি পুরু। হস্তীপুচ্ছ এক গজ লম্বা হয়, শেষের দিকে কেশগুচ্ছ থাকে। এদের চোখের পাতায় চুল প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ।

পোষা হাতী সারা দিনে 300 থেকে 500 পাউণ্ড তৃণশস্য ও প্রায় 30 থেকে 60 গ্যালন জল উদরস্থ করে। বন্য অবস্থায় হাতীর প্রধান খাদ্য গাছের কচি শাখা, পল্লব, ফল-মূল, ঘাস

ও কম। হাতী নিজের ওজনের 25 ভাগের 1 ভাগ খাদ্য আহার করে।

হাতীর নাকই লম্বা হয়ে শুঁড়ে পরিণত হয়েছে। হস্তীশুণ্ড চার-পাঁচ ফুট থেকে সাত ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। হাতীর শুঁড়ই তার হাতের কাজ করে। শুঁড়ের সাহায্যেই হাতী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, গন্ধ গ্রহণ করে, জল শোষণ করে. ভূমি থেকে খাদ্যবস্তু মুখে উঠিয়ে নেয় এবং শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করে। শুঁড়ের আগায় যে আঙ্গুলের মত অংশ থাকে, তার দ্বারা হাতী মাটি থেকে ক্ষুদ্র জিনিষও অনায়াসে তুলতে পারে। হস্তীশুণ্ডের মাংসপেশী এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ যে, হাতী এই অঙ্গটি যে দিকে ইচ্ছা ঘোরাতে সক্ষম, হাতীর নাসারন্ধ্র শুঁড়ের অগ্রভাগে অবস্থিত।

হাতী সাধারণতঃ 60 থেকে 100 বছর পর্যন্ত বাঁচে। কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সে হাতী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়। বন্য অবস্থায় স্ত্রী-হস্তী বছরে তিন মাসের মধ্যে ছয়-সাত বার উত্তেজিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এই সময় এরা পুরুষ হস্তীর সঙ্গে মিলিত হয় গ্রীষ্মকালে প্রায় দুই সপ্তাহের জন্যে পুরুষ হাতীর চোখ ও কানের মধ্যবর্তী গ্রন্থি থেকে উত্তেজক পদার্থের ক্ষরণ হতে থাকে, এই সময় এরা বিশেষ মত্ত ও ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। হস্তিনী প্রায় 22 মাস গর্ভধারণ করে। স্ত্রী-হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে দুটি দুগ্ধ-গ্রন্থি থাকে। বাদামী লোমে ঢাকা বাচ্চা হাতীর ওজন 200 থেকে 250 পাউণ্ড এবং উচ্চতা প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত হয়। হস্তীশিশু দেড় বছর বয়স পর্যন্ত মুখ দিয়ে মাতৃস্তন্য পান করে। সুপ্রসিদ্ধ জীব-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের হিসাব মতে একজোড়া হাতীর 30 থেকে 90 বছর বয়সের মধ্যে তিন জোড়া বাচ্চা হতে দেখা যায়।

সমস্ত দিনের মধ্যে হাতী দাঁড়িয়ে এবং বসে তিন-চার ঘন্টা ঘুমিয়ে নেয়। হাতীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ; কিন্তু ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর। হাতীর সাধারণভাবে চলবার গতি ঘন্টায় ছয় থেকে আট মাইলের বেশী নয়, কিন্তু আক্রমণোদ্যত হলে এরাই আবার ঘন্টায় 20—25 মাইল বেগে ছুটতে পারে। যদিও তাদের এই গতিবেগ 100 থেকে 200 গজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হাতী মোটেই লাফাতে পারে না। এদের পদক্ষেপের বিস্তার সচরাচর ছয় ফুটের মধ্যেই থাকে। বাড়ী বা তাঁবুর চতুষ্পার্শ্বে যদি সাত ফুট চাওড়া ও সামান্য গভীর গর্ত করে ঘিরে দেওয়া হয়, তাহলে হস্তীর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যায়। সব হাতীই খুব ভাল সাঁতার দিতে পারে, এরা জলের মধ্যে সমস্ত শরীরটা নিমজ্জিত করে কেবল শুঁড়টি জলের উপর তুলে রাখে শ্বাস নেবার জন্যে। কখনও একাদিক্রমে ছয় ঘন্টাকাল ভূমি স্পর্শ না করে হাতী নদী পার হয়েছে এরকম ঘটনাও শোনা গেছে। হাতী সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। এক একটি দলে দশ বা কুড়ি থেকে ত্রিশ চল্লিশটি পর্যন্ত হাতী থাকে। মা-হাতী আহত বা রোগগ্রস্ত শাবককে শুঁড় দিয়ে তুলে ধরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বড় হাতী এক এক সময় আহত সঙ্গীকে মাঝখানে রেখে দু-পাশ থেকে ভর দিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়।

সাধারণতঃ বুনো হাতী তিনভাবে ধরা হয়ে থাকে। বাচ্চা হাতীর গলায় ফাঁস পরিয়ে ধরে কিছু দিন বেড়ার মধ্যে পোষ না মানা পর্যন্ত অন্যান্য হাতীর সঙ্গে বন্দী করে রাখা হয়। হাতীর যাওয়া-আসার পথে বারো ফুট চওড়া ও বারো ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে তার উপর ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কোন হাতী অতর্কিতে এর মধ্যে পড়ে গেলে কৌশলে তার গলায় দড়ি বেঁধে অন্য প্রান্ত আর একটি পালিত মাদী হাতীর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর ঐ গর্তের মধ্যে ছোট ছোট কাঠের গুঁড়ি ফেলা হতে থাকে যতক্ষণ না তলা উঁচু হওয়ার ফলে ঐ হাতীর পক্ষে সহজে

বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়। তৃতীয় উপায় হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে কাঠ দিয়ে ঘিরে নিম্ন, মধ্য এবং গোলপ্রান্তে বেশ বড় খেদা তৈরী করে একদল পোষা হাতীর সাহায্যে বন্য হাতীর দলকে তাড়িয়ে এনে ঐ বেড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। ভারতীয় বনবিভাগের এক জন অভিজ্ঞ অফিসার ষ্ট্রাসি এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আসামের জঙ্গলে খেদা করে 1000 বন্য হস্তী ধরে ছিলেন। কখনও কখনও পোষা মাদী হাতীর সাহায্যেও বুনো মদ্দা হাতীকে ভুলিয়ে এনে বন্দী করা হয়। হাতীর প্রিয় খাদ্য আখ কিংবা কলার মধ্যে আফিং দিয়েও এক এক সময় নেশাগ্রস্ত করে হাতী ধরা হয়েছে।

জন হাণ্টার একজন সুপ্রসিদ্ধ হস্তী-শিকারী ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় 1400 হস্তী শিকার করেন। হাতী শিকারীরা প্রথমতঃ হাতীর কান লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। তারপরের লক্ষ্যস্থল হলো হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগলে হাতী এক-শ' গজের মধ্যেই পড়ে যায়। কেউ কেউ আবার হাতীর কপাল লক্ষ্য করেও বন্দুক চালান, গুলি কপাল ভেদ করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতীর মৃত্যু ঘটে। জন হাণ্টারের একজোড়া হাতীর দাঁত ছিল, যার প্রত্যেকটির ওজন 153 পাউণ্ড করে। সে সময় অর্থাৎ এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজোড়া ভাল গজদন্তের মূল্য ছিল প্রায় 150 পাউণ্ড। সাধারণতঃ আফ্রিকার মদ্দা হাতীর এক একটি দাঁতের ওজন প্রায় 120 পাউণ্ড হয়ে থাকে। 1955 সালে আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা অঞ্চলে যে হাতী শিকার করা হয়, সেটির ওজন ছিল 12 টন ও উচ্চতা 13 ফুট 2 ইঞ্চি। এই বিরাট হস্তীর দেহ বর্তমানে আমেরিকায় ওয়াশিংটন নগরে স্মিথসোনিয়ান প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে। 1950 সালে হাওয়ার্ড হিল নামে একজন আমেরিকান তীরধনুক দিয়েই পূর্ব আফ্রিকায় 5 টন ওজনের হাতী শিকার করেন। তাঁর তীরের দৈর্ঘ্য ছিল 41 ইঞ্চি আর ধনুকের টান ছিল 120 পাউণ্ড আন্দাজ। আসামের আদিবাসীরা তীরের ফলায় অ্যাকোনাইট ও জয়পালমিশ্রিত বিষ মাখিয়ে হাতী শিকার করতো।

মানুষ ছাড়া হাতীর অন্যান্য শত্রু হলো বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ, সংক্রামক জীবাণু, সিংহ, ব্যাঘ্র ও হায়না। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হস্তীশাবক বড় হবার আগেই রোগ, দুর্ঘটনা ও হিংস্র পশুর কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। বর্তমানে আফ্রিকার জঙ্গলে মাত্র 350,000 হাতী আছে। ভারতে ও দূরপ্রাচ্যে হাতীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। এই অতিকায় চতুষ্পদ পশুটি যাতে খাদ্যাভাবে পৃথিবী থেকে একেবারে অবলুপ্ত না হয়, সেদিকে আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এর জন্যে চাই পর্যাপ্ত পরিমাণ বনভূমি।

ভারতবর্ষে 1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত যুদ্ধে হাতী ব্যবহৃত হয়েছিল। এমনকি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে সমরোপকরণ ও সাজসরঞ্জাম বহন করবার জন্যে হাতী নিয়োগ করা হতো। বর্মায় শিক্ষিত হাতীকে ভারী সেগুন কাঠের গুঁড়ি বহনে নিয়োজিত করা হয়।

অনেক শিকারী হাতীর পিঠে হাওদায় বসে বাঘ শিকার করতে ভালবাসেন। বড় বড় শোভাযাত্রায় জাঁকজমক সহকারে সুসজ্জিত সারিবদ্ধ হস্তীদলের ধীরমন্থর রাজকীয় গতি সকলেরই মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেক করে।

এশিয়াবাসী হাতী সহজেই মানুষের পোষ মানে। কিন্তু আফ্রিকার মদ্দা হাতীকে বশীভূত করা ও শিক্ষা দেওয়া বিশেষ কঠিন কাজ। 1890 সাল থেকে কঙ্গোদেশে বেলজিয়াম ও ফরাসীরা ভারী কাজে অল্পস্বল্প হাতী ব্যবহার আরম্ভ করেছে। হাতী সহজেই মানুষের বশীভূত হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিলে নানারকম ক্রীড়া-কৌতুকও দেখাতে পারে।

ট্যাকিয়ন প্রসঙ্গে নতুন চিন্তা

সমরেন্দ্রনাথ দাস

ও

সন্তোষ কুমার ঘোড়ই*

জানা ধারণা

গতিবিদ্যা তথা তড়িচ্চুম্বকীয়বিদ্যার সূত্রগুলির মধ্যে অসঙ্গতির মীমাংসার ফল হলো—আপেক্ষিকতাবাদ।

গতিবিদ্যার ধারণায় t সময়ে যদি কোন বস্তু x স্থানাঙ্কে দেখা যায়, তবে দর্শকের সাপেক্ষে u বেগে ধাবমান কোন ব্যক্তি ঐ বস্তুটিকে $x'=x-ut$ জায়গায় দেখতে পাবে। কিন্তু সময় উভয়ের কাছে একই থাকবে অর্থাৎ $t'=t$; অতএব স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের নিয়ম হলো $x \rightarrow x'=x-ut$; $t \rightarrow t'=t$.

এই নিয়মকে বলা যায় গ্যালিলিওর স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের নিয়ম। স্বাভাবিক ভাবেই বেগের পরিবর্তনের নিয়ম দাঁড়াবে $v'=v-u$। এখন তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বানুযায়ী শূন্যে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (c), যার মান আলোর বেগের সমান। কিন্তু যদি কোন দর্শক আলো বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎসের সাপেক্ষে u বেগে ছুটে চলে, তাহলে গ্যালিলীয় নিয়মে দৃষ্ট বেগ $c'=c-u$। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, আলোর বেগ দর্শকের বেগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মাইকেলসন্ ও মর্লির পরীক্ষা এর বিপরীত রায় দেয়। অর্থাৎ পরীক্ষায় পাওয়া যায় $c'=c$, $c' \neq c-u$.

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গ্যালিলীয় সূত্র সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। তাই প্রাচীন গতিবিদ্যার সূত্রের সংশোধন প্রয়োজন। এজন্যে এগিয়ে এলেন পঁয়েকার ও অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। তাঁরা বললেন—আলোর গতি যদি সর্বদা একই থাকে; তবে সময় অক্ষের পরিবর্তন ঘটবে। এরূপ পরিবর্তনের সূত্রকে লরেঞ্জের সূত্র বলে। সূত্রটি হলো

$$x'=\frac{x-ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \qquad t'=\frac{t-ux/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

এই সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বস্তুর জাড্য ধর্ম বস্তুটির চিরন্তন ধর্ম নয়—তা বস্তুটির গতির উপর নির্ভর করে।

এ ছাড়া, যুগান্তকারী সূত্র, শক্তি (E)= ভর (m) × [আলোর গতি (c)]², দেখায় যে, বাস্তব জগতে আলোর বেগের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকার গুরুত্ব বোঝাতে গেলে আর একটি সূত্র স্বাভাবিক কারণে এসে পড়ে। তা হলো-

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

যেখানে $m_0 \rightarrow$ বস্তুর স্থিতি ভর

$m \rightarrow v$ বেগে ধাবমান বস্তুর ভর

$c \rightarrow$ আলোর বেগ।

এই সূত্র থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কোন পার্থিব কণা বা বস্তু আলোর চেয়ে বেশী বেগে ছুটতে পারে না। তাই আলোর বেগ কেবল মাত্র একটি ধ্রুবক নয়, তা বেগের উচ্চতম

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

সীমাও বটে. যাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। তাই আলোর বেগের বেশী বেগে-চলা বস্তুর কথা কল্পনাই করা চলে না। অন্য দিকে তা যদি করা যায়, তাহলে আইনষ্টাইনের কয়েকটি সিদ্ধান্তের মূলে আঘাত হানবে, কিন্তু সত্যই কি আলোর বেগের চেয়ে বেশী বেগে-চলা কোন বস্তুকণা কল্পনা করা যায় না? এগিয়ে চলাই হলো বিজ্ঞানের ধর্ম। ভারতীয় নবীন বিজ্ঞানী ডক্টর ই. সি. জি. সুদর্শন সেই পথের দিশারী। তিনি আলোর বেগের চেয়ে বেশী বেগে-চলা কণা ট্যাকিয়নের অস্তিত্বের কথা নির্ভর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। এই বিষয়ে বিজ্ঞানী মহলকে নতুন করে ভাববার কথা ঘোষণা করলেন। ডক্টর সুদর্শনের মতে ট্যাকিয়নের ধর্মগুলি হলো—

i) ট্যাকিয়ন কখনও আলোর গতির বেড়া অতিক্রম করে না। এর জন্মই হয় আলোর গতির বেশী গতি নিয়ে এবং সব সময়ই ট্যকিয়নের বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশী—কখনই কম বা সমান হতে পারে না।

ii) v বেগে চলা কোন বস্তুর বিপরীত দিকে যদি আমরা u বেগে চলি, তাহলে আমরা বস্তুটির বেগ দেখব,

$$v' = \frac{v+u}{1+\frac{vu}{c^2}}$$

যখন v আলোর বেগের কম, সমান বা হয়, তখন v′ আলোর বেগের কম, সমান বা বেশী হবে; অর্থাৎ সব দর্শকই ট্যাকিয়নকে ট্যাকিয়ন কণা হিসেবেই দেখবে।

iii) আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র থেকে আমরা পাই

$$E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

এখন ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে, v → ট্যাকিয়নের বেগ c-এর চেয়ে বেশী। সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণের হরটি কাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে। যদি শক্তিকে বাস্তব হতে হয়, তাহলে স্থিতিভরকে কাল্পনিক হতে হবে। অর্থাৎ ট্যাকিয়ন কণা কখনই স্থির অবস্থায় থাকতে পারে না। আরও দেখানো যায় যে, এক্ষেত্রে ট্যাকিয়নের ভরবেগ ও বাস্তব রাশি দেবে।

iv) ট্যাকিয়ন কণার আর একটি বিশেষ ধর্ম হলো যে কোন গতিশীল দর্শকের কাছে ট্যাকিয়ন বিকিরণ প্রতিভাত হলে, তা অন্য গতিশীল দর্শকের কাছে শোষণ হিসেবে পরিলক্ষিত হতে পারে; অর্থাৎ আমাদের কাছে ট্যাকিয়নের বিকিরণ ও শোষণ পরস্পর পরিবর্তনশীল। স্থান ও কালের পরিবর্তনের সূত্র এবং শক্তি ও ভরবেগের পরিবর্তনের সমীকরণ থেকে এটা বোঝানো যায়।

v) আমরা বাস্তব কণার ক্ষেত্রে জানি যে, বস্তু যত শক্তি হারাবে, তার বেগ তত কমতে থাকবে। কিন্তু ট্যাকিয়ন কণার ধর্ম হলো যে, এরা যত শক্তি হারাবে, এদের বেগ ততই বাড়বে। অন্য দিকে শক্তি লাভ করলে তার বেগের হ্রাস ঘটবে। অতএব যতই ট্যাকিয়নের শক্তিমাত্রা বাড়বে ততই তা আলোর বেগের কাছাকাছি আসবে অথচ আলোর বেগে পৌঁছবে না।

vi) ট্যাকিয়নের অন্য একটি ধর্ম রয়েছে—তা হলো এই কণাগুলি তড়িৎ-নিরপেক্ষ।

অধ্যাপক সুদর্শন ট্যাকিয়নের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আমরা সে সবের মধ্যে আর যাচ্ছি না।

নতুন চিন্তা

আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক সুদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও অন্য ভাবে ট্যাকিয়ন কণার অস্তিত্ব অনুধাবন করা যায়, অথচ তা আপেক্ষিকত

বাদের বিরুদ্ধে যায় না। বরং এই ক্ষেত্রে দেখানো যেতে পারে যে, ট্যাকিয়নের বাস্তব স্থিতিভর, ধনাত্মক শক্তি এবং ট্যাকিয়নের তড়িৎ-চরিত্র থাকতে পারে।

বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আমরা জানি—"শূন্যে আলোর বেগ উৎস বা দর্শকের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করে না। সব দর্শকের কাছে এই আলোর বেগ একই।"

এখন এই দ্বিতীয় সূত্রের কোনরূপ বিকৃতি না ঘটিয়ে যদি এর মধ্যে একটু সার্বজনীনতা ঢোকানো যায়, তাহলে আমরা সহজেই কয়েকটি সুন্দর সিদ্ধান্তে আসতে পারি। অথচ সে জন্যে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটে না। আমরা যদি দ্বিতীয় সূত্রকে অন্য ভাবে লিখি, অর্থাৎ—

"কেবল মাত্র আলোর বেগ নয়, যে কোন বেগ যা আলোর বেগের অখণ্ড গুণিতক (Integral multiple) তা উৎস বা দর্শকের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করে না।"

তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, লরেন্সের স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের সূত্রটি দাঁড়ায়-

$$x' = \frac{x-ut}{\sqrt{1-u^2/n^2c^2}} \qquad t' = \frac{t-\frac{ux}{n^2c^2}}{\sqrt{1-u^2/n^2c^2}}$$

এখানে n একটি অখণ্ড রাশি, যার মান হতে পারে 1, 2, 3··· প্রভৃতি, এবং আইনষ্টাইনের বহুল প্রচলিত সূত্র দুটি দাঁড়ায়—

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-u^2/n^2c^2}} \text{ এবং } E = mn^2c^2\text{—এ}$$

সমস্ত সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ট্যাকিয়নের বাস্তব স্থিতিভর থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বেগ-যোগ (Addition law of velocities) সূত্রকে লেখা যাবে

$$= \frac{u+v}{1+\frac{uv}{n^2c^2}}$$

এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, সব দর্শকই ট্যাকিয়ন কণাকে ট্যাকিয়ন হিসেবেই দেখবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক $v=3/_2\,c=$ ট্যাকিয়নের বেগ, $u=\frac{1}{2}c=$ দর্শকের বেগ এবং $n=2$,

$$v = \frac{\frac{1}{2}c+\frac{3}{2}c}{1+\frac{3/4c}{4c^2}} = \frac{2c}{1+\frac{3}{16}} = \frac{32}{19}c > c$$

অর্থাৎ ট্যাকিয়ন কণা দর্শক ট্যাকিয়ন হিসাবে দেখবে।

বেগ-ধর্ম নিয়ে বস্তুকণার শ্রেণিবিভাগ

বস্তুজগৎকে গতিবেগের বিশেষত্বে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যাবে :—

(i) যে বস্তুগুলি স্থির আছে, তাদের চিহ্নিত করা যায় m_0, যেখানে m_0 বস্তুর স্থিতিভর।

(ii) যখন বস্তুর বেগ আলোর বেগের কম, অর্থাৎ $o<v<c$ সে ক্ষেত্রে

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \text{ এবং শক্তি } E = mc^2.$$

এই কণাগুলি সচরাচর দৃষ্ট কণা। এগুলিকে কখনও আলোর বেগ পাইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে পাওয়া যায়।

iii) আলোর বেগে-চলা কণা—ফোটন। $v=c$, এদের ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করা যায় না। এদের কোন স্থিতিভর নেই। জানা বিকিরণের ক্ষেত্রগুলিই হলো এই কণার আঁতুড় ঘর।

iv) আলোর গতির বেশী বেগে-চলা কণা—ট্যাকিয়ন। এক্ষেত্রে কয়েকটি সীমা নির্ধারণ করে ট্যাকিয়নের শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

a) যদি কণার গতি c এবং 2c-এর মধ্যে হয়, অর্থাৎ c < v < 2c, সেক্ষেত্রে আমরা

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/4c^2}}$$

এবং শক্তি $E=4mc^2$.

এই সমীকরণ থেকে দেখতে পাই যে c এবং 2c-এর মধ্যে থাকা ট্যাকিয়নের বাস্তব স্থিতিভর (m_0) থাকবে এবং এদের শক্তিও ধনাত্মক। সর্বোপরি এই ধারণা আপেক্ষিকতাবাদের বিরোধী নয়। এই সব ট্যাকিয়ন কণার ক্ষেত্রে বিশেষ চরিত্র আরোপ করা যেতে পারে যে, এই কণাগুলি সৃষ্টি হবার সময়েই আলোর বেশী বেগে চলতে থাকে, কিন্তু কখনই 2c বেগে পৌঁছতে পারে না।

b) 2c বেগে-চলা কণা, যা কেবল 2c বেগেই চলবে। এর বেগকে কমানোও যাবে না বা বাড়ানোও যাবে না। এদের স্থিতিভর নেই। কিন্তু আলোককণা ফোটনের মত ভর-বেগ রয়েছে এবং এটা হলো এক নতুন ধরণের বিকিরণ, যা আমরা এখনও জানি না।

$-3c, \quad m = \frac{h\nu}{9c^2}$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/9c^2}} \qquad E=9mc^2$$

$2c, \quad m = \frac{h\nu}{4c^2}$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/4c^2}} \qquad E=4mc^2$$

$-c, \quad m = \frac{h\nu}{}$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad mc^2$$

o, m_0

[নতুন চিন্তায় বেগ ও শক্তির সাপেক্ষে বস্তুকণার শ্রেণিবিভাগ]

এভাবে আমরা 2c এবং 3c-এর মধ্যে এক রকম ট্যাকিয়ন কণা; এবং 3c বেগে-চলা অন্য রকম বিকিরণ ইত্যাদি পেতে পারি। এভাবে চললে ধর্মানুসারে ট্যাকিয়নকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে যে, আলোর বেশী বেগে-চলা অসংখ্য কণা থাকতে পারে, যাদের বাস্তব স্থিতিভর আছে। এ সমস্ত কণার বস্তু-তরঙ্গও (Matter waves) বিদ্যমান। দ্য ব্রগলির সূত্রানুসারে বস্তু-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $\lambda = \frac{h}{mv}$, এক্ষেত্রে $v>c$ এবং $h=$প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক।

ট্যাকিয়ন কণাগুলি আধানযুক্ত হতে পারে। এজন্যে কোন বিধিনিষেধ নেই। অতএব আধানযুক্ত ট্যাকিয়নগুলি ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হলে বিভিন্ন ধরণের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করবে।

এখানে আর একটা জিনিষ চোখে পড়বার মত। জানা বা সাধারণ কণাগুলির সঙ্গে ট্যাকিয়ন কণার সাদৃশ্য দেখা যায়—এই অর্থে যে, ট্যাকিয়ন কণার ক্ষেত্রে (m/m_0) [যখন $c < u < 2c$] এবং (m/m_0) সাধারণ কণার ক্ষেত্রে অর্থাৎ $(\frac{1}{2}c < u' < c)$ সমান হয়, যদি $u=2u'$ হয়; অর্থাৎ কেবল মাত্র এই সব ক্ষেত্রে বেগের সঙ্গে ভরের পরিবর্তনের ধারা উভয় ক্ষেত্রে একই হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—

সাধারণ কণার বেগ $u'=\frac{2}{3}c<c$.

তাহলে $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-4/9}} = \frac{3m_0}{\sqrt{5}} \rightarrow \frac{m}{m_0} = \frac{3}{\sqrt{5}}$

ট্যাকিয়ন কণার ক্ষেত্রে $u=2u'=2\times\frac{2}{3}c=\frac{4}{3}c>c$ কিন্তু $<2c$;

তখন $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-u^2/4c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{(\ /3c)^2}{4c^2}}}$

$$= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{4}{9}}} = \frac{3\ m_0}{\sqrt{5}},$$

অর্থাৎ $m/m_0 = \frac{3}{\sqrt{5}}$

নিবন্ধের সিদ্ধান্ত

নতুন আলোকে ট্যাকিয়নকে দেখানো সম্ভব হলো। তাছাড়া বেগের সঙ্গে ভরের পরিবর্তন-গুলির ধারা অর্থাৎ (m/m_0) সেই সব কণার ক্ষেত্রে একই যার বেগ $nc < u < (n+1)c$ যখন $u=(n+1)u'$ অর্থাৎ $\frac{\quad}{n+1} c < u' < c.$

এভাবে ট্যাকিয়ন কণার অস্তিত্ব অনুধাবন করতে গেলে দেখা যায় যে, এই ধারণা আপেক্ষিকতাবাদের বিরোধী তো নয়ই বরং আলোর বেগের চেয়ে বেশী বেগে-চলা কণার অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও যথেষ্ট তথ্যপ্রদান করে। সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় সূত্রের একটু পরিমার্জনে আমরা কোনরূপ বিকৃতি লক্ষ্য করছি না বরং এর ব্যবহার সুদূরপ্রসারী।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

বর্তমান আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাঠক-পাঠিকার কাছে বিশ্ববিখ্যাত একজন মহীয়সী মহিলার জীবন-আলেখ্য তুলে ধরছি। যে বছরে আমাদের দেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন, সেই 1820 খৃষ্টাব্দের 12ই মে বিদেশ ভ্রমণরত ইংরেজ দম্পতীর দ্বিতীয়া কন্যারূপে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন এই মহীয়সী মহিলা—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। সুখী পিতামাতা জন্মস্থানের নামানুসারেই এই ফুটফুটে মেয়েটির নাম রাখেন ফ্লোরেন্স। কতকটা বংশগত সূত্রেই তিনি অল্পবয়স থেকেই প্রখর বুদ্ধিমতী ও বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন, কারণ মাতামহ ছিলেন একাধারে দর্শনশাস্ত্র, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পণ্ডিত এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট সভ্যও। অভিজাত বংশীয় তাঁর পিতাও ছিলেন বহুভাষাবিদ্ এবং অঙ্ক, বিজ্ঞান ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েও প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী। পিতার কাছ থেকেই বুদ্ধিমতী কন্যা অল্পবয়সেই শুধু ঐ সকল বিষয়েই নয়, ফরাসী, জার্মান, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়ও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন শান্ত এবং গম্ভীর, যা তাঁর মা পছন্দ করতেন না মোটেই।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে ফ্লোরেন্স তাঁর শিক্ষাসমাপ্তির উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপে ঘুরে বেড়ান এবং বিভিন্ন দেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কলাকৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হন। তখনই তাঁর ধারণা হয় যে, ভগবান তাঁকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁরই ঈপ্সিত মানব সেবাধর্মের উৎকর্ষের জন্যেই তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং সে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই তিনি দেশে ফিরে এসেই উত্তর ইংল্যাণ্ডের লে হার্স্ট (Ley Hurst) ও দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের এম্‌রে পার্কে (Embley Park) তিনি

মানবসেবা ও শিক্ষাপ্রচারের কাজ গ্রহণ করেন।

1847 থেকে 1852 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আবার ইউরোপে এবং আলেকজেন্ড্রিয়ায়ও যান এবং সবখানেই হাসপাতাল ও মানব সেবাধর্মের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে সেবাব্রতী নার্সের কাজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তে পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজন কেউ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেন নি এবং তিনি সর্বপ্রথমে রুগ্ণা ভদ্র-মহিলাদের জন্যে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানের তত্ত্বা-বধায়িকা (Superintendent) নিযুক্ত হন। তারপর তিনি বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ কিংস কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়িকা পদে নিযুক্ত হতে যাচ্ছিলেন. ঠিক এমনি সময়ে (1854) সামরিক বিভাগ থেকে সুদূর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে তাঁর ডাক এল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মপন্থী আটত্রিশ জন নার্সের একটি দল গঠন করে স্কুটারীতে পৌঁছুলেন। সেখানকার সামরিক হাসপাতালে তখন সুব্যবস্থা বলে কিছুই ছিল না এবং আহত রোগীদের অবস্থা ছিল জীবন্ত নরক সদৃশ। নার্সদের আট-দশজনকে একটি কক্ষে গাদাগাদি করে থাকতে হতো; সেখানে না ছিল আলো-বাতাস, না ছিল শৌচাগার কিংবা পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থা। বেসিন ছিল না, সাবান ছিল না এবং রোগীদের ব্যবহারের জন্যে হাসপাতালের নিজস্ব কোন পোষাকেরও বন্দোবস্ত ছিল না। সর্বত্র অপরিচ্ছন্নতা, মশামাছি, উকুন প্রভৃতি ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ এবং দুর্গন্ধের অবাধ দৌরাত্ম্য। এহেন দারুণ অপরিচ্ছন্নতা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্বে পৌঁছে ফ্লোরেন্স কিছু দিনের মধ্যেই যেন যাদুদণ্ডের স্পর্শে যেভাবে সব কিছু বদলে দিলেন, তা শুধু বিস্ময়করই নয়—অচিন্তনীয়ও বটে!

হাসপাতালে কোন উপযুক্ত তৈজসপত্র, এমনকি, খাওয়ার সাহায্যার্থে ব্যবহৃত ডিশ, কাঁটা ও চামচে পর্যন্ত ছিল না এবং চার ঘণ্টা লাগতো রোগীদের খাবার তৈরী করতে ও পরিবেশনে। তিনি অগৌণে তার প্রতিকারার্থে পাঁচ-পাঁচটি পথ্য তৈরীর জন্যে রান্নাঘর করে দিয়ে যাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা রোগীদের কাছে পৌছয়, তার বন্দোবস্ত করলেন এবং তাদের ব্যবহৃত নোংরা ও ময়লা কাপড়চোপড়কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধুয়ে ও কেচে পরিষ্কার করা হয়, তার জন্যে একটি ধোবিখানাও স্থাপন করলেন।

রাত্রিতে অতি গুরুতরভাবে আহতদেরও পর্যন্ত কোন প্রকার নারসিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না। রোগীরা প্রায় অন্ধকারের মধ্যে (অর্থাৎ মোম বাতির দ্বারা স্বল্পালোকিত ওয়ার্ডে) নিতান্ত অসহায়ের মত নিরুপায়ভাবে কাতরাতে থাকতো এবং মৃত্যুর হারও অত্যন্ত বেশী (প্রায় 42%) ছিল। এই সব কিছুরই পরিবর্তন সাধন করলেন অগৌণে ঐ সেবাব্রতী মহীয়সী নারী। বাতাসের দাপটে মোমবাতির শিখা যাতে নিবতে না পারে, সে রকম স্বচ্ছ আবরণযুক্ত একটি বাতি হাতে নিয়ে রোজ গভীর রাত্রিতে কোন এক সময়ে একবার, কোন কোন রাত্রিতে প্রয়োজন হলে বারবার তিনি ওয়ার্ডে আস্তে আস্তে টহল দিয়ে পালাক্রমে প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়ে তার জন্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা করে দিতেন এবং প্রত্যেককে মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিয়ে তার মানসিক বলকে বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করতেন। রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঐভাবে তাকে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে স্বপনচারিণীর মত চলাফেরা করতে দেখে রোগীদের মনে হতো বুঝি বা কোন স্বর্গের দেবীই তাদের রোগ নিরাময়ের জন্যে ওয়ার্ডে আবির্ভূতা হয়েছেন এবং যতক্ষণ তাঁর হাতে উঁচু করে ধরা বাতিটির স্তিমিত আলোক দেখা যেতো, ততক্ষণ তারা রোগ-যাতনাকে একেবারেই ভুলে যেতো এবং বলাবলি করতো—"আর কোন ভয়

নেই, কারণ এই তো বর্তিকাহস্তে মহিলা এসে গেছেন। সেই থেকে ঐ বিশেষ নামেই তিনি সকলের কাছে সমধিক পরিচিত ছিলেন।"

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বৃটিশ সেনাপতি স্ট্যাডফোর্ড ডি রেডক্লিফের প্রস্তাবে ঐ যুদ্ধে কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী কার—এই সম্বন্ধে গোপন ভোট নেওয়া হলে দেখা গেল প্রত্যেকটি ভোটের কাগজে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নামটাই জ্বলজ্বল করছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরবার পর কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ তাঁকে সম্মানিত করেছিল তাঁর বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি নার্সিং-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে তাঁর হাতে একটি বেশ বড় রকমের অর্থ-ভাণ্ডার তুলে দিয়ে এবং তারই ফলে 1860 খৃষ্টাব্দে সেন্ট টমাস হাসপাতালে নার্সিং-শিক্ষণের জন্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলো নাইটিঙ্গেল স্কুল অব নার্সিং। (1) নার্সেরা তাঁদের জন্যে বিশেষ করে স্থাপিত এই স্কুলে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করবেন, (2) এই শিক্ষণে তত্ত্বাবধায়িকা হবেন একজন বিশেষজ্ঞ নার্স; (3) সংশ্লিষ্ট নার্সেরা এমন একটি আবাসে থাকবেন, যেখানে নৈতিক চরিত্র ও শৃঙ্খলাবোধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে, (4) শিক্ষিকা নার্সের পদে কতকটা সাধারণ শিক্ষাও আবশ্যক, কারণ অপরকে শিক্ষা দিতে হলে, 'কেন'? এবং 'কিসের জন্য' তা তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। সেহেতু তাত্ত্বিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষাও একসঙ্গেই চলতে থাকবে এবং (5) এরূপ শিক্ষালয়টির আর্থিক দিক থেকেও স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতে হবে। ঐ সময়ে তাঁর লেখা দু-খানি পুস্তক 'Notes on Hospitals' এবং 'Notes on Nursing' পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী ধরে নার্সিং সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক বলে গণ্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সারা জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা মানবসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড 1907 অব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান "Order of Merit"-এর দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেন। এর পূর্বে আর কোন মহিলা এরূপ বিরল সম্মানের অধিকারিণী হন নি। অতঃপর 1909 খৃষ্টাব্দে তাঁকে "Freedom of the city of London" দেওয়া হয়, কিন্তু এ হেন উচ্চ সম্মান তিনি বেশী দিন ভোগ করে যেতে পারেন নি, কারণ 1910 সালের 13ই অগাষ্ট তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর সর্বাপেক্ষা অভিজাতদের সমাধিস্থল ওয়েষ্টমিনিস্টার অ্যাবেতে তাঁকে কবরস্থ করবার প্রস্তাব এনেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হ্যামপ্‌শায়ারের অন্তর্গত ওয়েষ্ট ওয়েলোতে তাঁর পারিবারিক সমাধিস্থলেই তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হয়।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পূর্ববর্তীকালে নার্সিং পেশারতাদের মধ্যে নৈতিকতার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না। তাঁদের পেশার ও চরিত্রের নৈতিক ভিত্ত গড়ে তোলবার জন্যে তিনিই প্রথমে তাঁর স্কুলে শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষা সমাপনের পর কতকগুলি শপথ বাক্য উচ্চারণের উপর জোর দেন। আজও পৃথিবীর সর্বত্র নার্সদের পক্ষে "নাইটিঙ্গেল শপথ বাক্য" অবশ্য গ্রহণীয় ও আচরণীয় বলে বিবেচিত হয়। সেগুলি হচ্ছে—"ভগবানের নামে এই সমাবর্তন সমাবেশে (Convocation) উপস্থিত সকলের সম্মুখে শপথ করছি যে, আমি পবিত্র জীবনযাপন এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার পেশাগত সকল কর্তব্য পালন করবো।"

"আমি যা কিছু অস্বাস্থ্যকর ও অনিষ্টকর তা থেকে দূরে থাকবো এবং নিজে এমন কোন ক্ষতিকর ওষুধ যেমন গ্রহণ করবো না আবার তেমনি জেনেশুনে কাকেও ঐরূপ কোন ওষুধ খেতেও দেবো না।"

"আমি আমার পেশার আদর্শকে সর্বদা রক্ষা করতে ও উঁচুতে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো

আমার কর্তব্যব্যপদেশে কোন রোগী যে সকল ব্যক্তিগত কথা আমাকে বলবে কিংবা তাদের পরিবারের যে সকল বিষয় আমার গোচরে আসবে, তাদের গোপনীয়তা আমি সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করবো।"

"আমি সর্বদাই চিকিৎসকদের অনুগত থাকবো। এবং আমার তত্ত্বাবধানে যে সকল রোগী থাকবে, তাদের মঙ্গলার্থে আমি আত্মনিয়োগ করবো।"

উল্লিখিত শপথবাক্যগুলি বহু দিনকার আগের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপোক্রেটস-নির্দেশিত, প্রত্যেক চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয় শপথ বাক্যেরই অনুরূপ এবং এগুলিকে ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক নার্স সংস্থার মহা-পরিষদ (Grand council of International councel of Nurses) রচিত নার্সদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় নৈতিক বিধানগুলি (Ethics) নীচে দেওয়া গেল :—

(1) রোগীর জীবন বাঁচাবার চেষ্টা, রোগ যন্ত্রণার উপশম এবং লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা, এই তিনটিই নার্স বা মহতী সেবাব্রতিনীদের মুখ্য দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(2) সদাসর্বদা নার্সিং-এর উচ্চ আদর্শ মেনে নার্সদের ব্যক্তিগত চরিত্র রক্ষা কর্তব্য।

(3) তাদের পক্ষে শুধু ব্যক্তিগত পেশা চালনাই নয়, ঐ সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও কুশলতাকেও উঁচু স্তরে রাখবার প্রয়াস সর্বদাই করে যেতে হবে।

(4) রোগী যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, তার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্মান রাখতে হবে।

(5) নার্সদের কাছে বলা রোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কথার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

(6) নার্সকে একই সঙ্গে তার গুরুদায়িত্ব সীমিত পেশাগত কর্তব্যের কথা মনে রেখে চলতে হবে। শুধু সঙ্কট মুহূর্তেই নয়, নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতামত ওষুধ দেওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার হলেও অনতিবিলম্বে তা চিকিৎসকের কর্ণগোচর করতে হবে।

(7) জ্ঞান-বুদ্ধিমত এবং আনুগত্যের সঙ্গে নার্স চিকিৎসকের নির্দেশ পালনে বাধ্য এবং সকল অবস্থায়ই তার নীতিবিরুদ্ধ কিছু করতে অস্বীকার করা উচিত।

(8) নার্সকে সর্বদাই চিকিৎসক ও অপর সকল সহকর্মীদের বিশ্বস্ত হতে হবে এবং যখনই অপর কোন সংশ্লিষ্ট কর্মীর অনৈতিক কিংবা কাজে গাফিলতির কিছু নজরে আসবে, তখনই তা উপরওলার নজরে আনতে হবে।

(9) নার্স বৃত্তিমূলক কাজের জন্যে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবে এবং ঐরূপ কার্যরত অবস্থায় চুক্তিমত কিংবা নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে।

(10) তারা কখনো কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কিংবা নিজের নাম জাহির করবার জন্যে বিজ্ঞপ্তিতে অংশগ্রহণ করবে না।

(11) নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে তো বটেই, অন্য লোকদের সঙ্গেও যথাযথ সদ্ভাব রেখে চলবে।

(12) হাসপাতালের বাইরেও ব্যক্তিগত জীবন এমন হবে যে, মহতী পেশার সম্মান অক্ষুন্ন থাকে।

(13) নার্স জেনেশুনে কোন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কখনই বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

(14) জনসাধারণের স্থানীয় প্রয়োজন, রাজ্য বা আন্তর্জাতিক স্তরেও অন্যান্য স্বাস্থ্য রক্ষা বিভাগ জনকল্যাণমূলক যে সকল কাজে অগ্রণী হবেন, নার্সদেরও যথাসম্ভব ঐ সকল কাজে যোগ দিয়ে কতকটা দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিত।

এভাবে মানব-কল্যাণে জীবন উৎসর্গীকৃতা সেবাব্রতিনীরা আজ পৃথিবীর সর্বত্র যে সমাজের একটি উঁচু শ্রদ্ধার আসনে আসীনা, তার মূলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনব্যাপী সাধনা ও কর্মনিষ্ঠা। তিনি সত্যই ছিলেন মানব ও আর্তের সেবাধর্মের পথনির্দেশকারিণী প্রদীপ হস্তে মহীয়সী মহিলা।

গভীর জলে মাছের চাষ

চট্টোপাধ্যায়

হামবুর্গের কাছাকাছি উত্তর সাগরে নজর করা ছিল ছোট্ট একটি মাছ-ধরা জাহাজ। অদূরে ছুটি বয়াও পরস্পর ষাট ফুট ব্যবধানে নজরাবদ্ধ ছিল। প্রতিটি বয়ার নীচে জলের তলায় একখানা ধাতুনির্মিত ফলক ঝুলানো ছিল। সেগুলি তারের সাহায্যে ঐ জাহাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিদ্যুৎবাহের তড়িদ্বাররূপে কাজ করবার উপযুক্ত।

জাহাজের ডেকের উপর দূরেক্ষণ (টেলিভিশন) যন্ত্রের পর্দার মত একটি পর্দার সামনে দু-জনে বসে আছেন। সময় সময় এক একটি ক্ষুদ্র ছায়া পর্দার উপর আনাগোনা করে, এ থেকে বুঝা যায় যে, জলের তলে তড়িদ্বারের মধবর্তী স্থানে এক একটি মাছ সাঁতার কাটে। একো সাউণ্ডার (Echo-sounder) নামক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অংশবিশেষ ঐ পর্দা। আধুনিক মাছ-ধরা জাহাজের অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মধ্যে এই যন্ত্রটি অন্যতম। হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল—এক ঝাঁক ছায়া এসে পর্দার উপর ভিড় করলো—সারিবদ্ধ মাছ। পর্যবেক্ষকদের একজন একটি সুইচ্ টিপলেন। একটি গুরুগম্ভীর গুঞ্জন শুনে বুঝা গেল—জলের তলায় তড়িদ্বারের মুখোমুখি বিদ্যুদ্‌-বাহের ঝাঁপাঝাঁপি সুরু হয়েছে। মুহূর্তের জন্যে মাছের দল পাগলের ন্যায় অস্থির হয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো। পরক্ষণেই সবগুলি কেবলমাত্র পজিটিভ তাড়দ্বার অভিমুখে ধাবিত হলো, তার পিছনে একটি জাল পাতা ছিল। বাঁশীর সুরে সম্মোহিত ইঁদুরের গড্ডলিকা প্রবাহের মত শত সহস্র মাছ শীঘ্রই জালে এসে ধরা পড়লো। এটাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছ-ধরবার প্রথম চেষ্টা এবং এর উদ্ভাবক একজন জার্মান বিজ্ঞানী। এর ফলাফল প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রতিফলিত হলে গভীর জলে মাছ ধরা এবং মাছের চাষ ব্যবসায় বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

এই সমীক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এইরূপ—পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িদ্বারের মধ্যবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহের মুখে গতিপথে মাছ আসলে তা পজিটিভদ্বারের অভিমুখী হয় এবং বিদ্যুদ্‌বাহের গাঢ়তা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকলে তার নিম্নাঙ্গের পেশী সঙ্কুচিত এবং অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে। তখন তা সেই দিকে তাড়িত হয়ে জালে বন্দী হয়। গাঢ়তা বাড়ালে সাময়িকভাবে চেতনা হারায় এবং আরও বাড়ালে প্রাণও হারাতে পারে। এভাবে জালে ধৃত ছোট-বড় মাছের আকারও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। মজার কথা এই যে, মাছ যতই বড় হবে, ততই সহজে অর্থাৎ কম বিদ্যুৎ খরচে ধরা পড়বে। কাজেই হরেক রকম মাছের মধ্যে শুধু কেবল বড়গুলিকে জালে চালান করে ছোটগুলিকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব। এ পর্যন্ত এই পদ্ধতি বিশুদ্ধ জলের মধ্যেই বেশী প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ লোনা জলে বেশী বিদ্যুৎ খায়। পুকুর এবং নদীতে মাছ ধরবার এই পদ্ধতি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এটি বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ—প্রথমতঃ ভাবা যাক, কোন সংরক্ষিত জলাশয়ে আমরা বিশেষ শ্রেণীর মাছ রেখে বাকীগুলিকে বিদায় করতে চাই। বিদ্যুদ্‌বাহের দ্বারা আগে সব মাছ জালে ধরে শুধু বাঞ্ছিতগুলি পুনরায় জলাশয়ে ছেড়ে দিলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। বাকীগুলি অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারবো। দ্বিতীয়তঃ এই

পন্থায় রোহিতাদিজাতীয় বড় মাছকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডিম ছাড়বার জন্তে নদীর তলা থেকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করা যায়। যেমন যেমন তারা স্রোতের উপর উঠতে থাকবে, তেমনি বিদ্যুদ্‌বাহ তাদেরকে দূরে নিরাপদ স্থানে, বাধের অবরুদ্ধ জলাধার এবং ডিম ছাড়বার ও ডিম ফুটাবার নির্দিষ্ট স্থানে পরিচালিত করবে; সদ্যোজাত চারা পোনাগুলি যাতে রাক্ষুসে মাছের উদরে না পড়ে, সেজন্তে সেগুলিকেও একই পন্থায় অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ অন্তত্র বিতাড়িত করবে।

বলাই বাহুল্য যে, এই প্রক্রিয়া মহাসাগরের বুকে ব্যাপক অথচ লাভজনকভাবে মৎস্তশিকারের কাজে প্রয়োগ করতে পারলে সেই মহাসিদ্ধি হবে বিস্ময়কর এবং সুদূরপ্রসারী। কড্, হেরিং, ম্যাকরল প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্তকুলকে দলবদ্ধভাবে খামারে প্রতিপালিত গবাদিপশুপালের মত খাদ্য-সমৃদ্ধ সুরক্ষিত জলাধারে বৈদ্যুতিক বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ রেখে প্রয়োজনমত যথাপরিমাণে মৎস্ত-বিপণন কেন্দ্রে সেই পণ্যের নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখা—সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য।

স্থলভাগে মানুষের খাদ্যোৎপাদন তিনটি ধাপে অগ্রসর হয়েছে—শিকার, প্রতিপালন ও চাষ। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের গুহাবাসী মানুষ পশুশিকার করে জীবনধারণ করতো। পরে মানুষ হলো যাযাবর রাখালজাতীয়, দলবদ্ধ. নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ, পশুপালন বা রাখালি তার জীবিকা। শেষ ধাপে মানুষ হলো কৃষিজীবী গবাদিপশু লালন-পালন এবং কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতো।

পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ বিস্তৃত জল এবং সেখানে স্বভাবতঃই স্থলভাগ অপেক্ষা বহু গুণ বেশী সম্ভাব্য খাদ্যের সংস্থান রয়েছে। তথাপি খাদ্যোৎপাদন ব্যাপারে আমরা এখানে আদিম মানুষের শিকারের যুগেই পড়ে আছি। কিন্তু বিশুদ্ধ জলে মাছের চাষ এমন কিছু নূতন ব্যাপার নয়। চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উর্বরতা-সম্পন্ন মাছের পুকুরগুলিতে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ টন পোনা মাছের চাষ হয়। এথেকে প্রতি বছর একর প্রতি প্রায় দু-শ' কে. জি. খাদ্যের সংস্থান হয়। এরূপ পোনা মাছের পুকুর ইউরোপেও সচরাচর দেখা যায়।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় হাজার হাজার পুকুর মজুত এবং তৈরী করা হয়েছে। মৎস্ত-চাষীরা এগুলির ইজারা নেয় ও নানাবিধ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে সমৃদ্ধ করে। ফলে, পুকুরে জলজ শাকসব্জীর বাড়-বাড়ন্ত সাধিত হয়। এই সব খেয়ে 'ব্রীম' জাতীয় মাছের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হয়। আবার কড্, স্যামন প্রভৃতি বড় মাছগুলি ঐ ছোট মাছ খেয়ে পরিপুষ্ট হয় এবং বিস্তৃতিলাভ করে। কতিপয় চাষীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—সমপরিমাণ চাষের জমি এবং পুকুরের মধ্যে তাঁরা পুকুর থেকেই বেশীর ভাগ খাদ্যসম্পদ ও আয় অর্জন করতে পারেন। যত সব মাছ ধরা হয়, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র বিশুদ্ধ জলের বাসিন্দা। তথাপি বিশুদ্ধ জলে অবস্থিত মাছের মোট সংখ্যা সমুদ্রগর্ভস্থিত মোট সংখ্যার নগণ্য ভগ্নাংশমাত্র। একজন ইংরেজ নৌ-সেনাধ্যক্ষ রিপোর্ট করেছেন—তিনি এমন বিশাল একটি হেরিংমাছের ঝাঁক দেখেছিলেন যার আয়তন আট বর্গ মাইল এবং এত ঘন সুবিন্যস্ত যেন একটা কঠিন স্তূপ বা গাদা। পৃথিবীতে হেরিংয়ের বার্ষিক মোট সংগ্রহ সংখ্যা পাঁচ-শ' হাজার লক্ষের অধিক। তৎসত্ত্বেও সমুদ্রগর্ভে হেরিংয়ের বংশবৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান। ম্যাকরল্ আর এক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্ত। এদেরও বংশবিস্তার বিপুল। এই উভয় জাতিই জলের সমতল রেখার অদূরে বাস করে বলে এদের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা জন্মেছে। অন্যান্ত যারা আরও গভীরে বাস করে, তাদের সম্বন্ধে আমরা

কিছু অনুমানও করতে পারতাম না যতদিন পর্যন্ত না বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তাদের গতি-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। অত্যাধুনিক মৎস্য-শিকারী জাহাজ এই যন্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত। যতক্ষণ না জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁর যন্ত্রের পর্দায় মাছের ঝাঁকের ছায়াছবি দেখতে পান, ততক্ষণ তিনি জাল বিস্তার করবেন না। কোনরূপ অনুমানের অপেক্ষায় না থেকে এই যন্ত্র নিরপেক্ষভাবে মাছ-ধরা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞানীরা ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে দূরে এই যন্ত্রের গুঞ্জন শুনে পর্দায় কতগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট চলন্ত পদার্থের একটি স্তর দেখতে পেলেন। তা প্রায় তিন-শ' বর্গ মাইল স্থান জুড়ে ছিল। পরে আরও অনুরূপ স্তর পর্দায় ধরা পড়লো—পার্ল হারবার থেকে সুমেরু পর্যন্ত বিশাল জলরাশির মধ্যে। অধুনা আরও এইরূপ স্তর পৃথিবীর অধিকাংশ গভীর মহাসাগরের গর্ভে আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই অস্থির পদার্থগুলি কি—এখনো কেউ তা জানে না। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন—এগুলি মাছ। কেউ কেউ বলেন—এ জিনিষ ইটালীতে এবং অন্যত্র একটি জনপ্রিয় খাদ্য। তা যাই হোক, বাস্তবিক এই বিশাল স্তর যদি ভক্ষ্য পদার্থ হয় এবং সংগ্রহ করা যায়, তাহলে এর দ্বারাই সমগ্র জগতের মানুষের খাদ্যচাহিদা বহুলাংশে মিটানো যাবে।

সমুদ্র সম্বন্ধে আমরা যত বেশী জানতে পারবো, ততই এর অগাধ জলে আবাখাদ্য প্রাণ-প্রাচুর্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবো। সামুদ্রিক মৎস্যের ষোল হাজার পরিচিত প্রজাপতির মধ্যে প্রায় দু-শ' মাত্র মানুষের ব্যবহারে লাগে। কেবল সাতটি প্রজাতির অধিকতর বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে, যথা—কড, হেরিং, ম্যাকরল, স্যামন (রোহিতাদিজাতীয়)। হ্যালিবাট এবং রেড ফিস প্রভৃতি। রেড ফিস্ গোলাপী রঙের মাছ, ওজন চার-শ' গ্র্যামের বেশী নয়। জালে ধরা পড়লে ইদানীং কালের আগে পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু পরে প্রকাশ্যে লোকেদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো। এখন এই পণ্য প্রায় এক লক্ষ টন প্রতি বছর বিক্রয় করা হয়।

মানুষের ব্যবহারের জন্যে বার্ষিক প্রায় 250 লক্ষ টন মাছ ধরা হয়। তথাপি পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী লোকেই যথেষ্ট খাবার পায় না। যদি প্রতিটি মানুষকে ভরপেট খাওয়াতে হয়, তবে আরও খাদ্যের জন্যে আমাদিগকে সাহসে ভর করে ডুব দিতে হবে সমুদ্রের অগাধ জলে। পৃথিবীর অর্ধেক বুভুক্ষু মানুষ শরীর পুষ্টিকর উচ্চ প্রোটিনসম্পন্ন খাদ্যের অভাবে পীড়িত, মৎস্য এদের অন্যতম। পরলোকগত কার্ল কম্পটনের জিজ্ঞাসা—"যে বৈজ্ঞানিক দক্ষতার সঙ্গে আমরা জমি চাষ করি, তেমনি অধিক ভোজ্য মৎস্য উৎপাদনের জন্যে সমুদ্রে চাষ করবার উপায়-উপকরণ আবিষ্কৃত হবে না কেন?

কি ভাবে পর্যাপ্ত সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এফ. এ. ও. (ফুড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচারাল অরগ্যানাইজেশন) প্রথম শুভ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বেই সুরু করেছে। এই সংস্থা এখন সকল মহাসাগরের মৎস্য-সম্পদের মানচিত্র অঙ্কনে নিরত। বর্তমানের সমস্ত মৎস্য প্রতিষ্ঠান—চালু এবং অকেজো, যেগুলি অনুকূল পূর্বলক্ষণপূর্ণ ইত্যাদি তথ্য এই মানচিত্রটি সমৃদ্ধ করবে। জীবিকার মান নিম্ন—এমন উন্নয়নশীল দেশগুলির সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ মৎস্যাঞ্চল আছে। এদেরকে এসব সংস্থান থেকে লাভজনকভাবে খাদ্যোৎপাদন করতে এফ. এ. ও সাহায্য করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি ভারত জাপানের তুলনায় মাত্র অর্ধেক দক্ষতার সঙ্গে মহাসাগরে মৎস্য-শিকারজাত পণ্যোৎপাদন

করতে পারতো, তবে তার মামুলী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হ্রাস পেত।

জনগণকে এ সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেবার প্রকৃষ্ট উপায়—শুধু হিতোপদেশ দান নয়—অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা মাছ ধরা শেখাতে হবে এবং মাছ ধরবার উন্নততর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম যোগাড় করবার জন্যে সাহায্য করতে হবে।

ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব ও সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণ

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

ভূতত্ত্বের সুপরিচিত 'ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা—একথা আমাদের জানা আছে। সাগর-বিজ্ঞানে এই তত্ত্বের প্রয়োগ এর তাৎপর্যকে আরও সুদূরপ্রসারী করে তুলেছে। এই তত্ত্বের সাহায্যে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানীরা শুধু সুদূর ভূতাত্ত্বিক অতীতের ধারণা করতেই প্রয়াস পান নি, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে মহাদেশগুলির ভূতাত্ত্বিক সংস্থানেরও একটা কল্প-ছবি খাড়া করেছেন। অতীতের ছবির সঙ্গে তুলনা করে সমুদ্রগর্ভে অনাবিষ্কৃত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও নানা উপযোগী ধাতব আকরিকের সম্ভাব্য সঞ্চয়ের স্থান নির্দেশ করবার এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী ও সাগর-বিজ্ঞানীরা সম্পদ-সমস্যা ও শক্তি-সমস্যার সমাধানের এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন।

তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ

ভাসমান মহাদেশ তত্ত্বে বলা হয়, গত বিশ কোটি বছর ধরে বর্তমান মহাদেশগুলি একটি অখণ্ড মহাদেশ থেকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভাসতে ভাসতে বর্তমান অবস্থানে এসেছে এবং এখনও চলেছে এই ভেসে বেড়াবার খেলা। আবার ঐ অখণ্ড মহাদেশ গড়ে উঠবার আগে সেটি নানা বিচ্ছিন্ন মহাদেশখণ্ডরূপে ছড়িয়ে ছিল, অবশ্যই তার ভৌগোলিক চেহারা ছিল ভিন্ন। এই ক্রমাগত ভাঙা আর জোড়া লাগবার কারণ হিসাবে খাড়া করা হয়েছে ভূত্বকের 'পাত সংগঠনের' (Plate tectonic) ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী ভূত্বক অবিচ্ছিন্ন নয়। 48 থেকে 160 কি. মি. পর্যন্ত পুরু 20টি পাত দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলটি মোড়া রয়েছে। মহাদেশগুলি ভূত্বকের এই পাতগুলির উপর সওয়ার হয়েই সতত চলমান। কারণ পাতগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের তলাকার গলিত প্রস্তরসমূহের উপর। একটি পাত যখন ভাসতে ভাসতে মাঝ সমুদ্রে অন্য একটি পাতকে ধাক্কা মারে, তখন একটি পাত সরে গিয়ে খাতের সৃষ্টি হয়। এই সব খাত বা ফাটল ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে সমুদ্রতলেরও বিস্তার ঘটছে।

সাগর-বিজ্ঞানে এই ধারণার প্রয়োগে সমুদ্রে সম্পদ-উৎসের আবিষ্কারের চেষ্টা করা হচ্ছে যে যুক্তিতে—তা হলো এই যে, একদা অখণ্ড যে দুটি ভূমিখণ্ডকে বর্তমানে কোন সাগর বিচ্ছিন্ন করেছে, তার কোন একটি খণ্ডে কোন প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল বা খনিজ সম্পদ থাকলে সেই সাগরের অপর দিকের ভূমিখণ্ডেও (যা একদা প্রথম ভূমিখণ্ডের সঙ্গে অব্যবহিত ছিল) সেই সম্পদের সঞ্চয় থাকবার সম্ভাবনা আছে। উদাহরণস্বরূপ কুমেরুদেশের কথা বলা যায়, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাল সঞ্চয় থাকা

খুবই সম্ভব। এই রকম চিন্তার সাহায্যে ভূ-পদার্থবিদ্ ডক্টর ডি. এইচ. টার্লিং বহু আবিষ্কৃত সম্পদ-উৎসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও একাধিক অনাবিষ্কৃত উৎসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে মিলে গেছে।

সাম্প্রতিককালের চাঞ্চল্যকর ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের অন্যতম হচ্ছে—মধ্যমহাসাগরীয় গিরিশিরা অঞ্চলে নূতন সমুদ্রতলের সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি ও মহাসাগরের বিস্তার। এই নূতন ভূত্বকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পাতগুলির সংঘর্ষজাত ফাটল দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের আকরিক ও জৈব পদার্থের মিশ্রণ, গলিত প্রস্তর প্রভৃতির উদ্গিরণ ও সমুদ্র-গর্ভে আকরিক অবক্ষেপ সৃষ্টি করে। গিরি-শিরার কাছে প্রাপ্ত এসব মিশ্রণ থেকে ধাতু-সংবলিত শিলাপিণ্ডগুলিকে উদ্ধার করা হয়। সাইপ্রাসের ট্রোডোস ম্যাসিফের সমৃদ্ধ তাম্রসঞ্চয় একদা সমুদ্রতলের অংশ ছিল; ক্রম প্রসারমান লোহিত সাগরে বর্তমানে খনিজ পদার্থে পূর্ণ উষ্ণ সমুদ্রগহ্বরের (Brine pool) সন্ধান পাওয়া গেছে।

সম্পদ-উৎসের ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বাস্তব নিশানা

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ভূ-পদার্থবিদ্‌রা যদি এরকম অঞ্চল খুঁজে বের করতে পারেন, যা একদা সমুদ্রের তলদেশ ছিল ও যেখানে পূর্বোক্ত রকম পাত সংগঠন ক্রিয়ায় নানা আকরিক সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল, অথচ বর্তমানে যা সমুদ্রগর্ভের মত দুরধিগম্য নয়, তবে সম্পদ আহরণ প্রচেষ্টা আরও বেশী ফলপ্রসূ হবে। ডক্টর টার্লিং বস্তুতঃ পৃথিবীর বহু স্থানের আকর-ভাণ্ডারের উৎস সম্পর্কে ভূ-পদার্থ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছেন, যেমন—অ্যান্ডিজ পর্বত ও কলোরাডো মালভূমি অঞ্চলের তাম্র সঞ্চয়, কাটাঙ্গান-জাম্বিয়ান তাম্রবলয়, মিসি-সিপি উপত্যকার দস্তা ও সীসার যৌগসমূহ ও ইউরোপের সাইলেশিয়ান আকরিকগুলি। এই সব সম্পদ উৎসের ব্যাখ্যার সাফল্য থেকে সঙ্গতভাবেই এই আশা করা যায় যে, অনাবিষ্কৃত আকর-উৎসের অস্তিত্ব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেও ভূপদার্থবিদ্যা সক্ষম। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল সম্পদের ক্ষেত্রে সমস্যটা একটু জটিল। কারণ এসবের ভাণ্ডার সৃষ্টির জন্যে দায়ী অতীত-কালের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহবস্তু ও তৎকালীন আবহাওয়া। তাছাড়া ঐ সব অবক্ষেপের আর একটি উপাদান হাইড্রোকার্বনসমূহ ঐ সব উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের মৃত্যুর পর ভূত্বক বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেজন্যেই এক কোটি বছরের মত প্রাচীন সম্পদ-উৎসগুলি বদ্বীপ অঞ্চলেই পাওয়া যায়, যা নদীবাহিত হয়ে মোহনায় পৌঁচেছে। এই নদীগুলির গতিপথ নির্ধারণে আবার পর্বত-মালাসমূহের উদ্ভবের যথেষ্ট ভূমিকা আছে, যা ভাসমান দুটি মহাদেশের সংঘর্ষে গজিয়ে ওঠে। ডক্টর টার্লিং-এর মতে, বিশ কোটি বছরেরও বেশী প্রাচীন সম্পদ-ভাণ্ডারগুলি খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হলেও অপেক্ষাকৃত নবীন অ্যান্ডিজ অঞ্চলের তৈল ক্ষেত্রগুলির অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। নদীর মোহনায় কেন তেল বা গ্যাসের সঞ্চয় থাকা সম্ভব, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। এখন ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব অনুযায়ী বহু কোটি বছর আগে বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশ একসঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তখন অ্যামাজন নদী বইতো পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অর্থাৎ বর্তমানের অ্যান্ডিজ পর্বত অঞ্চলে (দঃ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে) ছিল প্রাক্তন অ্যামাজন নদীর মোহানা। পরে অবশ্য আজ থেকে প্রায় তের কোটি বছর আগে অ্যামাজন নদী পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলে সরে আসলো, পশ্চিম উপকূলে উঁচু হয়ে দাঁড়ালো অ্যান্ডিজ পর্বতমালা। অ্যান্ডিজ অঞ্চলে

সুসমৃদ্ধ তৈল ক্ষেত্রের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা এইভাবে পাওয়া গেল।

যে সব গ্যাস ও তৈল ক্ষেত্রের অস্তিত্ব আমাদের জানা আছে, তার নব্বই শতাংশেরও বেশী 'বাষ্পায়নজাত অবক্ষেপের' (Evaporite deposit) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'বাষ্পায়নজাত অবক্ষেপ' বলতে সেই সমস্ত শিলাকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলি উপরের সমুদ্রজল বাষ্প হয়ে যাবার পর বা অগভীর সমুদ্র অঞ্চল থেকে জল সরে যাবার পর পড়ে থাকে। কিন্তু এই সব অবক্ষেপ পড়বার আগে জৈব উপাদানসমূহের চলাচল ছাড়াও হাইড্রোকার্বনগুলিরও ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের শেষ স্তরে শিলারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরে চলে যাওয়া সম্ভব। হাইড্রোকার্বনের এই শিলা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কাজকে আরও ত্বরান্বিত করে সমুদ্রগর্ভের তাপ, যা তেল বা গ্যাসকে ঠেলে উপরের দিকে তুলতে চায়। খুব বেশী তাপ সমস্ত হাইড্রোকার্বনকে শিলা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু গিরিশিরা-গুলির প্রসারণের মৃদু তাপে ঠিক বাঞ্ছিত ফল-টুকু সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত এলাকায় মহাদেশ খণ্ডগুলি সমুদ্রের উপর ভাসতে ভাসতে এসে ঐ গিরিশিরাগুলিকে আবৃত করে, সেখানে ঐ একদা সমুদ্রতলের তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারগুলি পাওয়া যায়। এই তত্ত্বের অনুকূলেই ক্যালিফোর্নিয়া ও লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলের তৈল ক্ষেত্র ও সাইবেরিয়া অঞ্চলের গ্যাস-সঞ্চয় আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি সত্যই মহাসাগরের শিলীভূত গিরিশিরা অঞ্চলে অবস্থিত।

এই সব ভূপদার্থতাত্ত্বিক বিবেচনা থেকেই ডক্টর টার্লিং যে সব জায়গায় সম্ভাব্য তেল ও গ্যাসের উৎসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলি হলো দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা, ল্যাব্রাডর সাগর, উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, সুয়েজ অঞ্চলের কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। ইতিপূর্বেই আলাস্কার তেলের এবং উত্তর সাগরে তৈল ও গ্যাসের আবিষ্কার তাঁর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসব কারণে মনে করা হচ্ছে যে, গভীর সমুদ্র অঞ্চল নয়, অপেক্ষাকৃত সহজগম্য সমুদ্র অঞ্চলেই অনাবিষ্কৃত সম্পদরাজির ভাণ্ডার আছে, যেমন উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলের সমুদ্র ভাগ। যদি খননে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়, তবে ভূপদার্থবিদ্‌রা পৃথিবীর নিষ্কাশনযোগ্য সম্পদ-ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ খোঁজ আনতে পারবেন আশা করা যায়। ষাটের দশকে লোহিত সাগরে আবিষ্কৃত হয় এক সারি নোনা জলের ডোবা (Brine pool)। লোহিত সাগরের মাঝবরাবর বিস্তৃত এই সারির লবণ-পল্বলগুলিতে রয়েছে উষ্ণ জল এবং সেগুলি অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় ধাতব লবণের অবক্ষেপে সমৃদ্ধ। সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য তথ্য হলো এই যে, লোহিত সাগরের ঐ সব পল্বলের জলে মিশ্রিত কঠিন পদার্থগুলির গাঢ়তা সাধারণ সাগরজলে যা দেখা যায়, তার প্রায় শতগুণ এবং ঐ সব পল্বলে যে সব ভারী ধাতুর তলানি সঞ্চিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে সোনা, রূপা, তামা, দস্তা এবং সীসা। 1966 সাল পর্যন্ত তিনটি মাত্র ওরকম পল্বলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 1972 সালে এক জার্মান দল কর্তৃক তেরোটি নূতন পল্বল এবং এখন যেসব পল্বল সক্রিয় নয়, সম্ভবতঃ তাদের অবক্ষেপে পরিকীর্ণ কয়েকটি অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। এর পরে বিভিন্ন পল্বলে গবেষণা চালিয়ে তাদের সাধারণ ও বিশেষ ধর্মের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, সাগর-পল্বলে ঐ সব ভারী ভারী ধাতব পদার্থ কোথা থেকে এলো? এই বিষয়ে দুটি ধারণা আছে। প্রথম ধারণা হচ্ছে, ভূতাত্ত্বিক অতীতের কোন সাম্প্রতিক অংশে লোহিত সাগর শুকিয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার তা জলমগ্ন হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাগরের

গভীরতর গর্তগুলির জল অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে বাষ্পীভূত হয়ে থাকবে এবং তার ফলে পড়ে থাকা লবণের তলানি এখনকার সমুদ্রজলে ক্রমশঃ দ্রবীভূত হচ্ছে। দ্বিতীয় ধারণাটি হলো, ধাতু ও অন্যান্য পদার্থের ঐ সব অবক্ষেপ ভূত্বকের পাত সংগঠনের পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত—যে প্রক্রিয়া লোহিত সাগরকে ক্রমশঃ একটি মহাসাগরে পরিণত করছে। এই সব আঞ্চলিক ক্রিয়া থেকেই পল্বলগুলির উচ্চ উষ্ণতা ও সক্রিয়তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। পল্বলগুলির ভিতরে সব সময়ই পরিচলন প্রবাহের ক্রিয়া চলছে। ভূত্বকের তলায় সংঘটিত নানা ক্রিয়ার তাপে পল্বলের নীচের স্তরের জল উষ্ণ হয়ে শীতল স্তর স্তরগুলির মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে থাকে ও উপরের সমুদ্রজলের সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হয়ে স্থানীয় সমুদ্রগর্ভে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে একটি পল্বলের জল গিয়ে আর একটি পল্বলেও পড়তে পারে ও বিভিন্ন পল্বলের মধ্যে যোগাযোগ সাধিত হতে পারে। স্বভাবতঃ ভারী ধাতুর লোনা জল উত্তপ্ত না হলে কখনই উপরে উঠতে পারে না। একাধিক পল্বলের জলের উষ্ণতা ও ধাতুদ্রব্যের গাঢ়তার মিল দেখে তার মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেই সব পল্বলের ভৌগোলিক অবস্থান পূর্বোক্ত রকম উপ্‌চেপড়া উষ্ণ লোনা জলের সাহায্যে যোগাযোগের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়। সুতরাং ঐ পল্বলগুলি নিশ্চয়ই সমুদ্রতলের নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে যুক্ত—এরকম ভাববার কারণ আছে। এসব সাক্ষ্য সাগর পল্বল ও ভূত্বকের গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগাযোগেরই ইঙ্গিত দেয়।

সাগর-পল্বলে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

লোহিত সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যঙ্ক (Basin) ও ধাতব লবণসমৃদ্ধ এলাকায় অনুসন্ধানী জাহাজে করে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে যে, লোহিত সাগরের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতি ভিন্ন। বৃটেনের জাতীয় সাগর-বিজ্ঞান সংস্থার একটি দল কর্তৃক পরিচালিত 'ডিস্‌কভারি ডিপের' উপর এক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ঐ অঞ্চলের জলের 200 কি. মি. গভীরতা বৃদ্ধিতে লবণাক্ততা 4 শতাংশ থেকে 25 শতাংশ বৃদ্ধি পায় ও উষ্ণতা 22° থেকে বেড়ে হয় 44° সেঃ। 'অ্যাটলান্টিস II ডিপে' দেখা গেছে 1972 সালে লবণজলের উষ্ণতা 60·1° সে., যেখানে 1965 সালে ছিল 55·9° সে.। সেখানকার পরিচলন প্রবাহ মাপা হয়েছে। এই পল্বলগুলি লোহিত সাগরের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। উত্তরাঞ্চলের 'ওশেনোগ্রাফার ডিপে' বৃটেন ও সৌদি আরবের যৌথ প্রচেষ্টায় পরিচালিত গবেষণায় জানা গেছে এই পল্বলের জলে প্রাপ্ত লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর পরিমাণ সাধারণ সাগরজলের ঐ পরিমাণে চেয়ে বেশী, কিন্তু 'অ্যাটলান্টিস-II' প্রভৃতি সক্রিয় পল্বলের চেয়ে কম। আরও জানা গেছে যে, এই পল্বলের তলানিগুলি বেশ ভালো রকম জৈব পদার্থ এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের অতি কড়া গন্ধও তাতে পাওয়া গেছে। এসব তথ্য এই আভাসই দেয় যে, উত্তরাঞ্চলের এই 'ওশেনোগ্রাফার ডিপ' সাগর শুকিয়ে গিয়ে পরে আবার জলমগ্ন হবারই ফল। এখানের লবণ অবক্ষেপ ভূমধ্যসাগরে প্রাপ্ত কিছু বাষ্পায়নজাত অবক্ষেপের অনুরূপ, যা থেকে মনে হয় ভূমধ্যসাগর বেশ কয়েকবার পর্যায়ক্রমে শুকিয়েছে ও জলমগ্ন হয়েছে লোহিত সাগরের এই দু-জায়গায় পল্বলের অস্তিত্ব থেকে এই ধারণাই জন্মায় যে, দক্ষিণাঞ্চলের পল্বলগুলির জন্ম-ইতিহাস বাষ্পায়নযোগ্য অবক্ষেপের সঙ্গে জড়িত নয়, সেগুলি ভূত্বকের গঠন-প্রক্রিয়ার (Tectonic process) সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। ভূত্বকের এই গঠন-ক্রিয়া সুদূর অতীতে কোথায় কোথায়

ওরকম সম্পদ-ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে, ভূতাত্ত্বিকেরা তা শীঘ্রই নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন—এই আশা বোধ করি খুব অসঙ্গত হবে না।

অন্তঃসাগরীয় খনিজ সন্ধানের উপকরণ

সমুদ্রগর্ভে নিহিত তৈল ও অন্যান্য মূল্যবান অবক্ষেপের হদিশ পাবার জন্যে সমুদ্রগর্ভ ও সেখানকার শিলা ইত্যাদি উপাদান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত একটি যান্ত্রিক প্রকরণের কথা সবশেষে আমরা আলোচনা করবো। এটি মূলতঃ একটি 'গাইগার-কক্ষ' (Geiger-Counter) ছাড়া কিছুই নয়। এর সাহায্যে সমুদ্রগর্ভের তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ ও তেজমিতিক মানচিত্র (Radiometric map) রচনা করা সম্ভব। একাজে বৃটেনের উপকূল অঞ্চলে এই যন্ত্র ব্যবহৃতও হয়েছে।

সমুদ্রগর্ভে ছড়িয়ে থাকা নানা ধরণের শিলায় তেজস্ক্রিয় ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে। আলোচ্য যন্ত্রে একটি গামা রশ্মি নির্দেশক (Detector) যন্ত্র সমুদ্রগর্ভের উপর দিয়ে টেনে নেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্দেশক যন্ত্রটিতে ইস্পাতের সিলিণ্ডারে থাকে সোডিয়াম আয়োডাইডের কেলাস। এটা কোন জাহাজের পিছনে বেঁধে সহজেই সাগরগর্ভের উপর দিয়ে একে গড়িয়ে নেওয়া যায়। সমুদ্রগর্ভের উঁচু-নীচু অংশে ও অন্যান্য পাথর ইত্যাদিতে আটকে গিয়ে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্যে ইস্পাত সিলিণ্ডারটিকে রবারের একটি নলাকৃতি থলির ভিতর ঢোকানো হয় ও যন্ত্রের বহির্ভাগ এর ফলে মসৃণ হয়; আকৃতগত সাদৃশ্য থেকে বিজ্ঞানীরা এক রকম সর্পাকৃতি মাছের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাম দিয়েছেন ঈল।

এই যন্ত্র তখন সমুদ্রগর্ভে গড়িয়ে নেওয়া হয়, তেজস্ক্রিয় শিলাসমূহ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি এসে সর্পাকৃতি থলির শেষভাগে অবস্থিত ইস্পাত সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে ও তার ফলে সোডিয়াম আয়োডাইডের কেলাস আলোকস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং ঈলে-র অভ্যন্তরস্থ একটি 'নির্দেশকের সাহায্যে একে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করা হয়, তারপর বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে তা চলে যায় সংলগ্ন জাহাজে। সেখানে ঐ বিদ্যুৎ স্পন্দনকে যন্ত্রগণকে প্রবিষ্ট করানো হয় ও যন্ত্রগণক সবরকম মানের স্পন্দনের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে। স্পন্দনের এই মান উক্ত স্থানের সমুদ্রগর্ভের ও সেখানকার শিলাসমূহের তেজস্ক্রিয়তার মান ও ধর্ম সূচিত করে। পূর্বে ব্যয় ও আয়াসসাধ্য খনন ও উত্তোলন ছাড়া সমুদ্রগর্ভের উপাদান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্ধার সম্ভব ছিল না। বর্তমানে উদ্ভাবিত এই তেজমিতিক পদ্ধতি অগভীর সমুদ্রের গঠন ইত্যাদি জানবার ক্ষেত্রে ভাল কাজ দেবে। অন্যান্য প্রচলিত ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহারেই এই পদ্ধতিকে সবচেয়ে ভাল কাজে লাগানো যাবে।

গবেষণা-সংবাদ

আইনষ্টাইন তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ব্যাপৃত ছিলেন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র-তত্ত্ব ও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র-তত্ত্বের মহাসম্মিলন ঘটাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। আইষ্টাইনের মৃত্যুর পর প্রায় কুড়ি বছর কেটে গেছে। আইন্‌ষ্টাইন প্রদর্শিত পথে এখনও গবেষণা-প্রচেষ্টা চলছে ও তার হোতা কিন্তু প্রধানতঃ গণিতবিদেরা। তাত্ত্বিক পদার্থবিদেরা মনে করেন না যে, ঐ লাইনে সাফল্যের সম্ভাবনা আদৌ উজ্জ্বল। এর মূল কারণ দুটি। প্রথমতঃ মোটামুটি প্রায় সব পদার্থ-বিজ্ঞানীই মনে করেন উভয় ধরণের বলক্ষেত্রের বিবরণ কণাত্মকরণের (Quantization) মধ্য দিয়েই পেতে হবে। অথচ আপেক্ষিকতা-বাদসমন্বিত বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র-তত্ত্বতে (Electromagnetic field theory) কণাত্মকরণ (Field quantization) করা গেলেও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র-তত্ত্বকে (Gravitational field theory) কণাত্মকরণ সম্ভব হয় নি। প্রধান কারণ হলো মহাকর্ষীয় তত্ত্ব রীম্যানীয় ধরণের দেশ-কালের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার আইনষ্টাইন প্রদত্ত রীম্যানীয় জ্যামিতির উপর ভিত্তি-করা মহাকর্ষীয় তত্ত্বটিই এখনও অবধি সবচেয়ে সফল ও সুষ্ঠু।

দ্বিতীয় বড় কারণ হলো আইষ্টাইনের জীবিতাবস্থায় বিজ্ঞানীদের কাছে যে বিষয়টি যথেষ্ট পরিস্ফুট ছিল না, এখন সেই বিষয়টি পরিষ্কার—অর্থাৎ মূল ধরণের মিথস্ক্রিয়া (Interaction) এবং তাদের নিয়ামক বল ক্ষেত্রের সংখ্যা দুই নয়, অন্ততঃ চারটি। এগুলি যথাক্রমে—সবল (Strong), বিদ্যুচ্চুম্বকীয় (Electromagnetic), দুর্বল (weak) এবং মহাকর্ষীয় (Gravitation)। সুতরাং একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব গঠিত হতে হবে এই চারটি ক্ষেত্রকে এক সঙ্গে নিয়ে।

পরমাণু কেন্দ্রকের অন্তঃস্থলে প্রোটন-নিউট্রনের আকর্ষণ বল সবল (strong) দুটি বিদ্যুৎ আধানযুক্ত কণার মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ থাকে, সাধারণ ভাবে বা কুলম্ব বল বলা হয়, তা বিদ্যুচ্চুম্বকীয়, কিন্তু বিটা-ক্ষয়ের সময় নিউট্রন কণা ভেঙ্গে গিয়ে যখন প্রোটন, ইলেকট্রন আর নয়ট্রিনো কণা উৎপন্ন হয়, তখন যে বল ক্রিয়া করে, তা দুর্বল। আর মহাকর্ষীয় বলের কারণ আমরা তো জানিই—ভর বা ওজন।

আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, উপরিউক্ত চারটি বল ক্ষেত্রের মধ্যে—দুর্বল ও বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বলের প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু বাকী দুটির চরিত্র ও প্রকৃতি অনেক ভিন্ন। যে ধরণের কণাগুলি সবল মিথস্ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে, তাদের বলা হয় হাড্রন। হাড্রন গঠন ও সবল বলক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্তেই কুয়ার্ক আর পার্টন মডেলের প্রস্তাব (দ্রঃ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মৌলকণা, লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী: আর. পি. ফাইনম্যান: সায়েন্স, 183 পৃ 601—610, 15 ফেব্রুয়ারী, 1974 এবং অন্যত্র)।

সুতরাং একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্বের প্রথম ধাপ হবে তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল বল ক্ষেত্র দুটির জন্তে একটি মাত্র তত্ত্ব প্রদান করা। প্রায় দেড় যুগ ধরে এই বিষয়ে চেষ্টা চলে এসেছে। সম্প্রতি দুটি তাত্ত্বিক মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি যথেষ্ট জটিল এবং ফাইনম্যান, তোমোনাগা প্রমুখ নির্দেশিত আপেক্ষিকতাসমন্বিত বিদ্যুৎ গতিবাদের পন্থার অনুসরণে। অবদান ভাইন-বার্গ, আবদুস সালাম ও জি টি হুফটের। অন্যটি অম্বানিক ক্ষেত্র-তত্ত্বের—ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত।

তত্ত্বগুলির গভীর প্রবেশের প্রয়োজন নেই। তবে প্রথম তত্ত্বটিতে ইয়াং-মিলস ধরণের ক্ষেত্রের ধর্মগুলিকে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যম হলো ফোটন। সবল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যম হলো পাই-মেসন। দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা নেই। তাছাড়া দুর্বল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী কণাগুলির মধ্যে লেপটনরা থাকবেই। লেপটনদের মধ্যে ভরযুক্ত কোন আধানহীন কণিকা নেই। জি টি হুফটের তত্ত্বটিতে কিছু বাস্তব ও প্রেত (Ghost) কণার উপস্থিতি দেখা যায়। ঘোস্ট বা প্রেত কণাদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যে বাস্তব কণার অস্তিত্বের ভবিষ্যদ্বাণী থাকছে, তাদের মধ্যে ফোটন, স্কেলার ধরণের আধানহীন কণার সঙ্গে হয় আধানযুক্ত ভারী লেপটন কণা থাকবে, নতুবা কোন আধানহীন ভারী ভেক্টর মেসন থাকবে। মনে রাখা যেতে পারে পায়ন বা পাই-মেসনেরা হলো স্কেলার কণা। নবোদ্ভাবিত ভেক্টর মেসন কণাদের সাধারণ : w কণা বলা হয় এবং মনে করা হচ্ছে w কণারাই দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর দু-একটি উচ্চ শক্তি গবেষণাগার থেকে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছে—যাতে মনে করা হচ্ছে, সম্ভবতঃ w কণাদের অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

দ্বিতীয় ধরণের তত্ত্বটির মূল ভিত্তি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। এই তত্ত্বে মনে করা হয়েছে কোন কণাই গঠনহীন বা বিন্দুবৎ নয় এবং শক্তি বা বিদ্যুৎ আধান মানের একটি নিম্নতম মাত্রা আছে, তেমনই দেশ-কালেরও একটি নিম্নতম মাত্রা আছে—যাকে বলা যেতে পারে স্পেস-কোয়ান্টা। অধিক এই দেশ-কাল 'তন্মাত্র' বা কোয়ান্টার অভ্যন্তর সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা থাকবেই এবং কোন মিথস্ক্রিয়ার এলাকা ঐ মাত্রার চেয়ে বেশী মানের হতে হবে। অধিকন্তু আধান, ভর বা অনুরূপ গুণাবলী ঐ দেশ-কাল তন্মাত্রের বিধিক গভীর ধর্ম থেকেই পাওয়া যাবে। এই সব ধারণার সঙ্গে যদি মেনে নেওয়া যায় যে, ফোটন কণাগুলি শুধু বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের বদলে নিউট্রিনোদের সঙ্গে দুর্বল ধরণের মিথস্ক্রিয়াতেও অংশ গ্রহণ করে—তাহলে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার মূল ছবি একই বিশ্বনিয়মের দুই বিভিন্ন রূপ হয়ে প্রতিভাত হয়।

দুটি তত্ত্বেরই কিছু গুণাবলী আছে। আবার যথেষ্ট পরস্পর বিরোধিতা আছে। দুটি তত্ত্বেই লেপটনদের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ভরের স্তরভেদের ব্যাখ্যা আছে। রিনর্মালাইজেশন (Renor malisation) বলে একটি শব্দ ক্ষেত্র-তত্ত্বে সর্বদাই শোনা যায়। আধুনিক তত্ত্বগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-আধান বা ভরের মান অসীম হয়ে যায়। এই সব অসীম মানকে অপনোদন করে যথাযথ মান আনবার ব্যবস্থা রিনর্মালাইজেশনে নামে আখ্যাত। দুটি তত্ত্বই রিনর্মালাইজেশন বা পুনঃপ্রশমনযোগ্য।

তবে এই ধরণের তত্ত্বগুলির সত্যতা নির্ধারণের উপায় উচ্চ শক্তির বিক্ষেপ পরীক্ষা। বিক্ষেপণের বিস্তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই দুই তত্ত্বে বিভিন্ন। কাজেই ভবিষ্যৎ বলে দেবে—w কণা বা ভারী লেপটন সত্যই আছে কিনা কিংবা বিভিন্ন ধরণের বিক্ষেপণ ক্রিয়ার বিস্তার কোন্ তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। তাছাড়া আরও নতুন তত্ত্ব অবতারণার পথ তো উন্মুক্তই আছে।

সুধীরকুমার সেন

ওয়ালটেয়ারে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 63তম অধিবেশন—1976

মূল ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ডক্টর এম এস. স্বামীনাথন
মূল সভাপতি

ডক্টর স্বামীনাথন 1925 সালের 7 অগাষ্ট তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেরল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. এবং 1947 সালে কোয়েম্বাটুর কৃষি কলেজ থেকে বি. এস সি. (এ) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি নূতন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ থেকে 1949 সালে জেনেটিক্স এবং প্লান্ট ব্রিডিং বিষয় অ্যাসোসিয়েট IARI ডিপ্লোমা পান। 1952 সালে তিনি যুক্তরাজ্যে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী পান। 1949-'50 তিনি নেদারল্যাণ্ডের ওয়েজনিনজেন-এর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্সে UNESCO ফেলো ছিলেন। 1953 সালে তিনি উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্সের সহযোগী গবেষক ছিলেন। 1954 সালে তিনি কটকের কেন্দ্রীয় তণ্ডুল গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান করেন। পরে তিনি নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দিরে সাইটোজেনেটিসিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন। পরে (1961-66) তিনি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান হন। 1972 সাল থেকে তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির ডিরেক্টর জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও সেচমন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক মণীন্দ্রচন্দ্র চাকী
সভাপতি—গণিত শাখা

অধ্যাপক মণীন্দ্রচন্দ্র চাকী বগুড়ায় (অধুনা বাংলা দেশ) জন্মগ্রহণ করেন। 1936 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. এবং 1956 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। 1945 সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান করেন এবং এছাড়া তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে লেকচারার হিসাবেও কাজ করেন। 1952 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বক্ষণের লেকচারার রূপে যোগদান করেন। 1950 সালের অগাষ্ট মাসে তিনি রীডার নিযুক্ত হন। 1972 সালের অগাষ্ট মাসে তিনি উচ্চতর গণিতের 'স্যর আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী অধ্যাপক' (পূর্বে এর নাম ছিল হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক) নিযুক্ত হন এবং এখনও এই পদেই আছেন। 1974 সালের অগাষ্ট মাসে তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। ডিফারেনসিয়াল জিওমেট্রি অব রীমানিয়াম স্পেস সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর উল্লেখযোগ্য দান আছে। তিনি অনেক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক ছাত্র গবেষণারত। দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে তিনি নানাভাবে জড়িত আছেন।

অধ্যাপক আর. পি. সিং
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক সিং উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মাষ্টার ডিগ্রী অর্জন করেন (1945)। তিনি স্বর্গতঃ অধ্যাপক কে সে. কৃষ্ণানের (এফ.

আর. এস.) সঙ্গে বেতার-চুম্বক নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। 1947 সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন। 1955 সালে তিনি ওয়াশিংটন ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, সলিড ষ্টেট থিওরী, ফিজিক্স অব কণ্ডেনসড্ ম্যাটার সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। 1957 সালে জুলাই মাসে তিনি পুনরায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং এক বছর সেখানে কাজ করবার পর বোম্বের ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অ্যাঃ প্রোফেসর হিসাবে যোগদান করেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং বিদেশের নানা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে এবং সম্মেলনে বক্তৃতাদি প্রদান করেছেন।

ডক্টর দারোগা সিং

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

ডক্টর সিং 1923 সালে উত্তর প্রদেশের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 1946 সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে মাষ্টার ডিগ্রী অর্জন করেন। কৃষি-পরিসংখ্যান সম্পর্কে শিক্ষণ লাভের জন্যে তিনি 1947 সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (I. C. A.R.) কৃষি-পরিসংখ্যান শিক্ষণের জন্য যোগদান করেন। 1962 সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গাণিতিক পরিসংখ্যানে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। Sampling Techniques হচ্ছে তাঁর কাজের বিশেষ পরিধি। তিনি ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ডিরেক্টর। দেশ-বিদেশের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তিনি 100টির বেশী গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

অধ্যাপক আর. পি সিং

সভাপতি—রসায়নবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক আর. পি. সিং 1921 সালের 16ই জুন রাজস্থানের কোটায় জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। 1944 সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন এবং 1960 সালে তিনি রীডার নিযুক্ত হন। তাঁর গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে—জটিল যৌগের গঠন এবং দ্রবণ সংক্রান্ত রসায়ন। তিনি 170 টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোঅর্ডিনেশন কেমিষ্ট্রিতে এক গবেষক গোষ্ঠি তৈরী করেছেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের গবেষণা এবং শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার জন্য 1954 সালে তিনি কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সংগঠনের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হন। 1971-72 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার তিনি রেকর্ডার ছিলেন।

অধ্যাপক এফ আমেদ

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

অধ্যাপক ফকরুদ্দিন আমেদ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং টাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (হোবার্ট অষ্ট্রেলিয়া) শিক্ষালাভ করেন। 1941 সালে তিনি ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে যোগদান করেন এবং পরে পরে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 1961 সালে তিনি আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। সিংগ্রাউলি

কয়লাখনি এবং বিদ্যায়ন কেন্দ্রিন অঞ্চলের কিয়দংশ (যা এখন পাকিস্থান) তিনি জরীপ করেন। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভূ গর্ভস্থ জল সংক্রান্ত বিভাগেও তিনি কয়েক বছর কাজ করেন। তিনি 60টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন এবং একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব এবং গণ্ডোয়ানার ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ শ্রীমতী সুশীলাস্বরূপ মিত্র

সভানেত্রী—চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা শাখা

ডাঃ সুশীলাস্বরূপ মিত্র 1925 সালের 7ই নভেম্বর মুলতানে (অধুনা পাকিস্থান) জন্মগ্রহণ করেন। 1948 সালে লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. বি. এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। 1949 সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের অধীনে তাঁর গবেষণা-জীবনের সূত্রপাত হয়। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে হিমাটোলজি ইউনিটে কাজ করে তিনি 1961 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন 1961 সালে বৃত্তিলাভ করে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Seattle, U.S A) গবেষণায় রত হন। তিনি 100-টিরও বেশী গবেষণা-নিবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত আছেন।

ডক্টর এস. ওয়াই. পদ্মনাভন

সভাপতি – কৃষিবিদ্যা শাখা

ডক্টর পদ্মনাভন কটকস্থিত সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। তিনি ভারতের একজন খ্যাতনামা উদ্ভিদ নিদানতত্ত্ববিদ্। তিনি ধানগাছের অনেক নিদানতাত্ত্বিক অনুশীলন যুক্ত করেন। ধানগাছের নিদানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্যে তিনি 1968 69 এবং 1970-'71-এর জন্যে রফি আহমদ কিদোয়াই পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ধানগাছের ধসা রোগ সম্বন্ধে সারা ভারতের 52টি কেন্দ্রে সমন্বিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ সংগঠিত করেন। ধসা রোগ সম্বন্ধে তিনি আন্তর্জাতিক সমন্বিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজও সংগঠিত করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল বায়োলজিক্যাল প্রোগ্রাম অ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ কমিটি অব দি ম্যান অ্যাণ্ড বায়োস্ফিয়ার-এর সদস্য। এছাড়া তিনি আরও অনেক দেশী-বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত আছেন।

ডাঃ শ্রীপতি বসু

সভাপতি—শারীরবৃত্ত শাখা

ডাঃ শ্রীপতি বসু 1920 সালের 20 এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ী ঢাকার মালখানগরে (অধুনা বাংলা দেশ) 1944 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শারীরবৃত্তে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ক্লিনিক্যাল হিমাটোলজি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকায় তিনি গবেষণার জন্যে ক্যালকাটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন। এখানে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া এবং হর্মোন সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। পরে তিনি বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টোর্স (এম. এফ. ক্লি) প্রাঃ লিঃ-এ নিযুক্ত আছেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব কেমিষ্ট (ইণ্ডিয়া)-এর ফেলো।

অধ্যাপক কে এস. থিণ্ড

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক কে. এস. থিণ্ড 1917 সালে

সৈয়দপুরে (কপূর্থলা, পাঞ্জাব) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। 1945-48 সালে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্যে ভারত সরকারের বৈদেশিক বৃত্তি লাভ করেন। 1948 সালে তিনি উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ নিদানতত্ত্বে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1967 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের (চণ্ডীগড়) সিনিয়র প্রোফেসর (মাইকোলোজি এবং প্লান্ট প্যাথোলজি) হন। ছত্রাক সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি রত আছেন। দেশ-বিদেশের নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে আমন্ত্রিত হন।

অধ্যাপক ইউ. এস. শ্রীবাস্তব
সভাপতি—প্রাণিবিদ্যা, পতঙ্গবিদ্যা ও মৎস্যবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক শ্রীবাস্তব উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। 1943 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি ডিগ্রী অর্জন করে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে গবেষণায় রত হন। 1947 সালে ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঐ বছরেই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি মজঃফরপুরে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। 1957-58 সালে তিনি কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারচেঞ্জ স্কলার বৃত্তি লাভ করে লণ্ডনের ইম্পিরীয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির প্রাণী ও পতঙ্গবিদ্যা বিভাগে গবেষণা করেন এবং যুক্ত-রাষ্ট্রে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবেও কাজ করেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—কীট-পতঙ্গের ডেভেলপমেণ্টাল মর্ফোলজি, শারীর-বৃত্ত এবং এণ্ডোক্রাইনোলজী। তিনি প্রায় 60-টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত আছেন।

ডক্টর অজিত কে ডাণ্ডা
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

ডক্টর ডাণ্ডা 1936 সালে ঢাকায় (অধুনা বাংলা দেশ) জন্মগ্রহণ করেন। 1959 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1960 সালে তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কালচারাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে যোগদান করেন। 1962 সালে তিনি নতুন দিল্লীর রেজিষ্ট্রার জেনারেল অব ইণ্ডিয়ার অফিসে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসাবে যোগদান করেন। 1966 সালে তিনি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজিতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং তাঁর নিবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল "Planned Development and Leadership in an Indian Village"। 1969 সালে তিনি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় সুপারিন্-টেনডিং অ্যানথ্রোপলজিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন। 1974 সালে তিনি ঐ সমীক্ষায় ডেপুটি ডিরেক্টর হন এবং ঐ পদে এখনও যুক্ত আছেন। "স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় জনসংখ্যার দুর্বলতর অংশের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন" প্রকল্পের তিনি অন্যতম সমন্বয়সাধক। তিনি 56টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি তিনটি পুস্তকের রচয়িতা।

অধ্যাপক টি. ই. শ্যানমুগাম
সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

অধ্যাপক টি. ই. শ্যানমুগাম 1921 সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 1944 সালে তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 1946-'47

এবং 1948-49 সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে রিসার্চ স্কলার এবং রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করেন। তিনি এম. লিট. এবং পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। অপরাধ ও দুষ্কর্মের মনস্তাত্ত্বিক আভাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণা খুব উল্লেখযোগ্য। 1950 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মনস্তত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র প্রোফেসর হিসাবে যোগদান করেন, পরে ঐ বিভাগের রীডার (1956) এবং অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন (1965)। তিনি 56টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি সাতটি পুস্তকের রচয়িতা। তিনি নানা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডক্টর ডি. সি. তপাদার

সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ধাতুবিদ্যা শাখা

ডক্টর তপাদার 1914 সালের 11ই এপ্রিল বরিশালে (অধুনা বাংলা দেশ) জন্মগ্রহণ করেন। 1937 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত রসায়নবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1951 সালে তিনি ডি ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। 1938 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান পেপার পালপ কোং-তে (হাজিনগর, নৈহাটি) রিসার্চ কেমিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন। তিনি প্রায় 30 বছর ঐ কোম্পানীতে নানা পদে আসীন থেকে কাজ করেন। 1968 সালে তিনি সাহারানপুরের ইনষ্টিটিউট অব পেপার টেকনোলজির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 1974 সালে জুন মাসে সেখান থেকে অবসর নিয়ে 1974 সালে জুলাই মাসে তিনি টিটাগড় পেপার মিল কোম্পানীতে যোগদান করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান পাল্প অ্যাণ্ড পেপার টেকনিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের অন্যতম। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য। তিনি প্রায় 50টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

মর্তের প্রাণীতে দিব্য জ্যোতি

গণেশচন্দ্র বিশ্বাস*

দেবদেবীর চিত্র বা মূর্তি লক্ষ্য করলে প্রায়ই দেখা যায় প্রতিকৃতির মস্তকের চতুর্দিকে একটি জ্যোতির্বলয় (Halo) দেওয়া রয়েছে। শাস্ত্রে দেবদেবীর অবয়বের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা শুধু শাস্ত্রকারদের কল্পনা কিংবা তার মধ্যে কোন সত্য রয়েছে কিনা—তা বলা দুষ্কর। তবে সময় সময় ভূপৃষ্ঠের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে এই মর্তের মানুষের মস্তকের চতুর্দিকে যে মণ্ডলাকারে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, তেমন নৈসর্গিক দৃশ্য চর্মচক্ষুতেই দেখতে পাওয়া যায়।

আকাশে তড়িৎগ্রস্ত মেঘ সঞ্চিত হলে, নীচের দিকে অবস্থিত জাহাজের মাস্তুল, মিনার, বৃক্ষ এবং অন্যান্য বস্তুর শীর্ষদেশে, বিশেষভাবে বস্তুর তীক্ষ্ণ প্রান্তে সূর্যাস্তের পর প্রায়ই দেখা যায় এক ধরণের উজ্জ্বল আলো। জাহাজের উচ্চস্থান সমূহে অবস্থিত বিভিন্ন দণ্ডের প্রান্তেও এই আলোক দেখা যায়। জাহাজের উপর এই আলোক এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে দেখা গেছে। পর্বত

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কাঁথি পি. কে. কলেজ, মেদিনীপুর।

বা পর্বত-উপত্যকার উপর দিয়ে তড়িৎগ্রস্ত মেঘ বয়ে যেতে থাকলে পর্বত-চূড়ায় এই আলোর অস্তিত্ব আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই আলোক অগ্নিশিখা, মেরুপ্রভা কিংবা আলেয়ার আলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ঘাস বা গাছের ছোট ছোট পল্লব পোড়াবার সময় যেমন চট্‌পট্‌ শব্দ হতে থাকে, এই আলো প্রকাশিত হলেও তেমনি শব্দ হতে থাকে। বের্ণ-নভিস (স্কটল্যাণ্ড) মানমন্দিরের লিপিবদ্ধ বিবরণ থেকে জানা যায়, 1884-87—এই চার বছরে এই আলোক প্রকাশের ঘটনা ঘটেছে 11 বার। ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চলে এই আলোক 'সন্ত এলমোর অনল' (St. Elmo's Fire) নামে খ্যাত। সন্ত এলমো (Erasmus) ছিলেন তৃতীয় শতাব্দীর একজন সিরীয় প্রধান ধর্মযাজক। ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকদের কাছে তিনি ছিলেন শুভার্থী অভিভাবক স্বরূপ। পালতোলা জাহাজের নাবিকেরা তাদের সংস্কার অনুযায়ী মাস্তুল প্রভৃতিতে এই জ্যোতির আবির্ভাবকে একটা শুভ লক্ষণ বলে মনে করতেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল এই জ্যোতি প্রকাশ পেলে ঝড়ের অবসান হয়—আমাদের যেমন 'রামধনু' শ্রীরামচন্দ্রের নামের সঙ্গে যুক্ত এবং বাদ্‌লা আবহাওয়ায় এর আবির্ভাব যেমন বৃষ্টির অবসান নির্দেশ করে বলে অনেকের বিশ্বাস, কতকটা সেই রকম। কথিত আছে ক্রিষ্টোফার কলাম্বাস, তাঁর আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযানে জাহাজে প্রবল ঝড় উঠলে, মাস্তুল-চূড়ায় এই পবিত্র জ্যোতি দেখিয়ে তাঁর লোকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, এই আলো তাদের ক্লেশের অবসান নির্দেশ করছে। এই আলো সন্ত এলিমাস, সন্ত ক্ল্যারা, সন্ত নিকলাস এবং হেলেনার অনল নামেও পরিচিত। ভারতবর্ষে যেমন অনেকে সপ্তর্ষি মণ্ডলের নক্ষত্র সমবায়কে মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই সাতটি ঋষি বলে মনে করে ইংরেজ নাবিকরাও তেমনি সন্ত এলমোর আলোকে গণ্য করে সন্তের পবিত্র দেহরূপে।

হিমবাহী মেঘ আল্পস্ পর্বতের উপর দিয়ে চলাকালে পর্বতচূড়ায় এই আলোক যখন অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, সেই সময়ে এই পর্বতে ভ্রমণকারীদের মুখে নানারূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়—তাঁরা নাকি দেখেছেন, তাঁদের মাথা এবং আঙুলের ডগা থেকে কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘ উজ্জ্বল শিখা চট্‌পট্‌ শব্দ করতে করতে উপরের দিকে উঠে

কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়ে প্রকাশ পেতে পারে সন্ত এলমোর অনল

যাচ্ছে। এই শিখা মানুষের মস্তকের চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে। কোন পর্বতারোহীর মস্তকের চতুর্দিকে এই ধরণের জ্যোতির্বলয়

দেখতে পেলে সেই জ্যোতিঃকে হয়তো আমরা বলবো 'স্বর্গীয় জ্যোতি', আর বিচিত্র পোশাকে লোকটিকে তখন আমাদের জুপিটার বা ইন্দ্র কিংবা অপর কোন দেবতা বলে ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নয়। বিশেষ পোশাকে পর্বতারোহিণীর ক্ষেত্রে জ্যোতির্বলয়ধারিণীকে আমরা স্বর্গের কোন দেবী বলেও মনে করতে পারি।

তড়িৎগ্রস্ত মেঘের প্রভাবে পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত কোন পুরুষের শিরের তীক্ষ্ণ প্রান্ত ঘিরে, ঘোড়ার কেশরের ধারে ধারে এবং কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়ে প্রকাশ পেতে পারে সন্ত এলমোর অনল। সিনাই পর্বতে মোজেস্ 'The bush burned with fire, and the bush was not consumed' (Exodus III. 2)—এই রকম একটা দৃশ্য দেখতে পান; ঝোপের সেই দাহিকা শক্তিহীন অনল সম্ভবতঃ সন্ত এলমোর অনলের ধরণের কোন আলোক থেকে উদ্ভূত।

ব্যাখ্যা

এই ধরণের নৈসর্গিক দৃশ্যের একটা সরল ব্যাখ্যা এই ভাবে দেওয়া যায়—একটি বিদ্যুৎবাহী মেঘের প্রধান ঋণাত্মক তড়িৎ অবস্থিত থাকে মেঘ-অবয়বের ভূমি অঞ্চলে। এই রকম একটি মেঘ আকাশে সঞ্চিত হলে, তড়িতাবেশের ফলে নীচের দিকে অবস্থিত কোন বস্তুর শীর্ষদেশে উৎপন্ন হয় ধনাত্মক তড়িৎ, আর তার পাদদেশে প্রকাশ পায় ঋণাত্মক তড়িৎ। বস্তু ভূসংযুক্ত হলে পাদদেশের ঋণাত্মক তড়িৎ পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় বস্তুটির ঊর্ধ্বপ্রান্তের চতুর্দিকের বায়ুতে সৃষ্টি হয় একটি প্রবল তড়িৎ-ক্ষেত্র। এই তড়িৎ-ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি মুক্ত ইলেকট্রন (নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে বায়ুতে সর্বদাই কিছু না কিছু মুক্ত ইলেকট্রন থাকতে পারে) ধাবিত হয় বস্তুটির শীর্ষ অভিমুখে এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি লাভ করতে থাকে। এই শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন পথিমধ্যে অপর কোন অণুর সান্নিধ্যে এসে পড়লে সংঘর্ষের দ্বারা নতুন ইলেকট্রন এবং ধনায়ন সৃষ্টি করে। পর পর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে তৈরী হয়
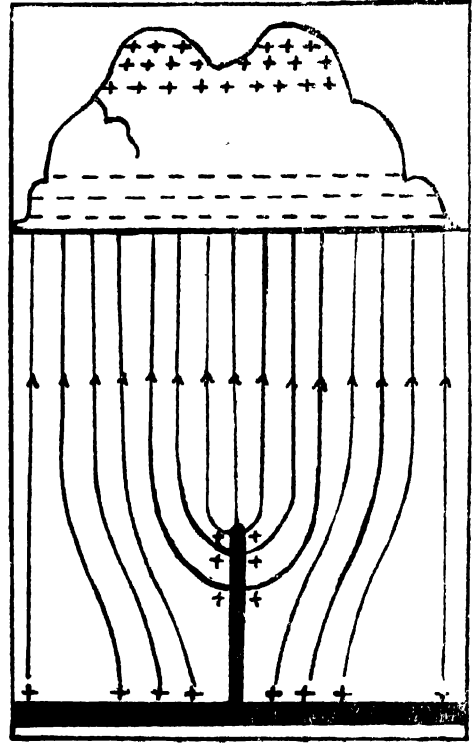
ভূসংযুক্ত পরিবাহীতে বিদ্যুৎ-মেঘের আবেশ এবং তড়িৎ-বলরেখার বিন্যাস।

বিপুল পরিমাণে ইলেকট্রন এবং ধনায়ন। ইলেকট্রনসমূহ ক্রমাগত ধাবিত হতে থাকে বস্তুটির ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত শীর্ষের দিকে, আর মেঘের দিকে চলতে থাকে একটি ধনায়ন-প্রবাহ। ঠিক এই অবস্থায় বস্তুটির শীর্ষদেশ কিংবা কোন মুক্ত প্রান্তের চতুর্দিকে ক্ষেত্রপ্রাবল্য অত্যন্ত তীব্র হলে বস্তুটির মুক্ত প্রান্তসমূহে প্রকাশ পায় সন্ত এলমোর আলোক।

এই আলোকের আবির্ভাব এবং তীব্রতা নির্ভর

করে প্রধানতঃ বিদ্যুৎ-ঝটিকার প্রধান ঋণাত্মক তড়িতের পরিমাণ এবং বজ্রশীর্ষ ও মেঘভূমির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর।

সন্ত এলমোর অনল সৃষ্টিকারী পরিবেশ

মেঘভূমির বিভব এবং পরিবাহীর উচ্চতার উপর নির্ভর করে পরিবাহী প্রান্তের আশপাশের ক্ষেত্রপ্রাবল্য। পরিবাহী স্থাপনের পূর্বে কোন উচ্চতায় যে ক্ষেত্রপ্রাবল্য থাকে, পরিবাহী স্থাপনের পরে পরিবাহী প্রান্তে বহু সংখ্যক তড়িৎ-বলরেখা কেন্দ্রীভূত হয় বলে সেই অঞ্চলের ক্ষেত্রপ্রাবল্য বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। যদি প্রতি সেমি. 100 ভোল্ট বিভব-নতিসম্পন্ন কোন তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি ভূসংযুক্ত পরিবাহী গোলককে মাত্র 3 মিটার (প্রায় 10 ফুট) উচ্চতায় স্থাপন করা যায়, তবে তার আশেপাশে বিভব নতি সৃষ্টি হয় প্রতি সেমি-এ 30,000 ভোল্ট, যার ফলে সুরু হতে পারে গোলকের গা থেকে কূর্চস্ফুরণ (Brush discharge) অর্থাৎ ব্রাসসদৃশ তড়িৎক্ষরণ। মেঘভূমির নিম্নাঞ্চলে কোথাও বিভব নতি যদি প্রতি সেমি-এ মাত্র 10 ভোল্ট থাকে, তাহলেও সেখানে কোন ভূসংযুক্ত পরিবাহী স্থাপন করলে পরিবাহী প্রান্তের চতুর্দিকের ক্ষেত্রপ্রাবল্য প্রতি সেমি-এ 3000 ভোল্টের বেশী হতে পারে এবং প্রকাশ পেতে পারে সন্ত এলমোর অনল। বিদ্যুৎ-মেঘের উপস্থিতিতে বায়ুতে বিভব-নতির মান প্রতি সেমি.-এ 10 ভোল্ট থেকে 100 ভোল্ট থাকলে প্রকাশ পায় সন্ত এলমোর আলোক।

বিদ্যুৎ-মেঘে তড়িৎ-আধান পৃথক হবার প্রক্রিয়া আরম্ভ হলে মেঘভূমি ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিভব-নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার, কোন পরিণত বিদ্যুৎ-ঝটিকার কাজ, যেমন বৃষ্টি, শিলা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বর্ষণের ঘটনা, আধ ঘন্টা কি ঐ রকম সময়ব্যাপী চলবার পর মেঘের বাইরে নিম্নাঞ্চলের বিভব-নতি হ্রাস পেতে থাকে। কাজেই একবার বিদ্যুৎ-ঝটিকা পরিণত হবার পূর্বে এবং আর একবার তার কার্যাবলীর শেষের দিকে বায়ুতে সমমানের বিভব-নতি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘের উপস্থিতিতে বায়ুতে একই মানের বিভব-নতি কয়েক ঘন্টা যাবৎ বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব নয়। অপর দিকে সমস্ত বিদ্যুৎ ঝটিকা থেকেই ভূপৃষ্ঠে বজ্রপাত ঘটে না, যেমন ঘটে না সব মেঘ থেকেই বৃষ্টিপাত। মেঘভূমি সুউচ্চে থাকলে, বিদ্যুৎ-চমক কেবল মেঘলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অল্প তৎপরতার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় এই ধরণের বিদ্যুৎ-ঝটিকার জীবন। এই সব অবস্থায় এবং বিদ্যুৎ-ঝটিকার কার্যাবলীর পরিসমাপ্তির দিকে প্রকাশিত সন্ত এলমোর আলোক দর্শন থেকেই সম্ভবতঃ জাহাজের নাবিকদের মনে ধারণা সৃষ্টি হতো যে, এই আলোক নির্দেশ করে ঝড়বৃষ্টির দিক থেকে তাদের বিপদের অবসান হয়েছে।

আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘের আবির্ভাবে শুধু বায়ুতে বিভব-নতি প্রতি সেমি.-এ 30,000 ভোল্ট দাঁড়ালে আর সন্ত এলমোর আলোক প্রকাশ পায় না, তখন পরিবাহী অগ্রে সরাসরি বজ্রপাত হয় এবং বিদ্যুৎ-ঝটিকার অন্যান্য বিধ্বংসী কার্যাবলী চলতে থাকে তীব্রভাবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

ছবিটা দেখে এলোমেলোভাবে জড়িয়ে থাকা ফিতাকৃমির মত কোন জিনিষের কথাই মনে হয়। আসলে এটি হচ্ছে ফসফোরের (Phosphor) অতি সূক্ষ্ম একটু অংশের বহু গুণ বর্ধিতাকারে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে তোলা ফটোগ্রাফ। ল্যাঙ্কেষ্টারের (পেনসিলভ্যানিয়া) গবেষকেরা ছবিটি তুলেছেন। টেলিভিসনে ছবির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্যে ফসফোরের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

মিথেন গ্যাস

ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 200 মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। অনেক রকম গ্যাসের মিশ্রণে এই বায়ুমণ্ডল গঠিত। বায়ুর প্রধান উপাদান—অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। বায়ুর এই দুটি প্রধান উপাদান ছাড়াও আরো কতকগুলি গ্যাস বায়ুতে রয়েছে, যেমন—হাইড্রোজেন, আর্গন, নিয়ন, জেনন ইত্যাদি। মিথেন নামক গ্যাসও বাতাসে আছে, কিন্তু পরিমাণে খুবই কম।

মিথেন স্বাদ, বর্ণ, গন্ধহীন গ্যাস। এই গ্যাস সাধারণতঃ পুরনো, নোংরা, বদ্ধ জলাভূমিতে পাওয়া যায়। জলাভূমির কর্দমের মাটির ফাঁকে ফাঁকে এই গ্যাস জমে থাকে। কেউ যদি কর্দমের আস্তরণ নাড়াচাড়া করে বা অন্য কোন রকমে ঐ কর্দমস্তরগুলির মধ্য থেকে মিথেন গ্যাস বুদ্বুদের আকারে বেরিয়ে আসে। যে কোন বদ্ধ জলাশয়ের কাছে দাঁড়ালে প্রায়ই দেখা যায়, জল থেকে মাঝে মাঝে বুদ্বুদ উঠে আসছে। ঐ বুদ্বুদগুলি মিথেন গ্যাস ছাড়া কিছু নয়। জলাভূমি থেকে উদ্ভূত ঐ গ্যাসকে মার্শ গ্যাসও (Marsh Gass) বলা হয়।

গ্রামাঞ্চলে অনেক বদ্ধ জলাশয়ে গাছের পাতা বা অন্য কোন জৈব পদার্থ পচে যায়। ঐ পচা পাতা বা পচা জৈব পদার্থ থেকেই মিথেন গ্যাসের উদ্ভব হয়। এই মিথেন গ্যাসই আলেয়ার আলোর সৃষ্টির মূল। গ্রামের লোকেরা মনে করে যে, আলেয়ার আলো হচ্ছে ভৌতিক আলো। তাদের বিশ্বাস ঐ ভৌতিক আলোর কাছে গেলে তারা কোন ভৌতিক ব্যাপারের সম্মুখীন হতে পারে অথবা বেঘোরে ভূতের হাতে প্রাণ হারাতে পারে। সুতরাং কোন লোকই সেখানে যেতে চায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলেয়া জিনিষটা ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপার কিছুই নয়। জলাভূমিতে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পাতা বা কাদায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। কোন রকমে ঐ গ্যাস যদি পাতা বা কাদা থেকে মুক্ত হয়ে বাতাসের সংস্পর্শে আসে, তাহলে মিথেন গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে একটা দাহ্য পদার্থের সৃষ্টি করে। মিথেনের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ফসফিন গ্যাস মিশ্রিত থাকায় তা কখনও কখনও বায়ুর সংস্পর্শে আপনা-আপনি জ্বলে ওঠে। ঐ গ্যাসের মিশ্রণের জ্বলনের ফলে একটা নীলাভ আলোর সৃষ্টি হয়। এই আলোই আলেয়ার আলো। ঐ জ্বলন্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে পাশাপাশি উৎপন্ন অন্য মিথেন গ্যাসের মিশ্রণেও আগুন ধরে যায়। এইভাবে নীলাভ আলোটা স্থানান্তরিত হয়। ফলে মনে হয় আলোটা যেন জলাভূমির উপর ছুটে বেড়াচ্ছে।

অনেক কয়লা খনিতে কয়লার স্তরে ফাঁকে ফাঁকে মিথেন গ্যাস জমে থাকে। খনি-শ্রমিকদের কাছে মৃত্যুর পরোয়ানাবাহী এই গ্যাসকে বলা হতো Fire damp।

আগে খনি-শ্রমিকরা ঢাকনাবিহীন বাতি নিয়ে খনির ভিতরে নামতো। কয়লা কাটবার পর মিথেন গ্যাস কয়লার স্তর থেকে বেরিয়ে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশতো। ঐ গ্যাসের মিশ্রণ শ্রমিকদের বাতির শিখার সংস্পর্শে আসতো। ফলে ঐ গ্যাসের মিশ্রণে আগুন ধরে যেত। কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে একটা বিস্ফোরণ ঘটতো। ঐ বিস্ফোরণের ফলে কয়লার বড় বড় স্তর ভেঙ্গে শ্রমিকদের উপর পড়বার ফলে তারা প্রাণ হারাতো। অনেক সময় এই কয়লার স্তরের হাত থেকে রেহাই পেলেও অনেক শ্রমিক মিথেন গ্যাস প্রজ্বলিত হবার ফলে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে মারা পড়তো। কিন্তু কিছুকাল পরে ডেভি নামক একজন বিজ্ঞানী তার-জালি ঘেরা এমন বাতি তৈরী করেন যে, মিথেন গ্যাসের মিশ্রণ ঐ বাতির শিখার সংস্পর্শে জ্বলতো; কিন্তু তার-জালি খুব দ্রুত বাতির তাপকে চার পাশে ছড়িয়ে দেওয়ায় জালির বাইরের বায়ু ও মিথেনের মিশ্রণ জ্বলে ওঠবার সুযোগ পেত না। এই নিরাপদ বাতি আবিষ্কারের ফলে খনিতে আগের মত অত বেশী দুর্ঘটনা আর ঘটতো না। বর্তমানে অবশ্য বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে খনিকে আলোকিত করবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আগের তুলনায় কয়লা খনিতে দুর্ঘটনার মাত্রা আরও কমে গেছে।

কোন কোন তৈলকূপ অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের স্তরের উপরে প্রচুর পরিমাণে একটি জ্বালানী গ্যাস সঞ্চিত থাকে। এই 'প্রাকৃতিক গ্যাসে' শতকরা নব্বই ভাগ বা তারও বেশী মিথেন থাকে।

মিথেন গ্যাস প্রধানতঃ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বল্প বায়ুতে জ্বালালে মিথেন থেকে যে ভুসা বা কার্বন ব্ল্যাক পাওয়া যায়, তা জুতার পালিশ, ছাপার কালি, কার্বন কাগজ, টায়ার প্রভৃতি তৈরী করতে কাজে লাগে। হাইড্রোজেন, মিথাইল অ্যালকোহল, ফর্মালডিহাইড প্রভৃতি উৎপাদনেও মিথেনের ব্যবহার আছে।

কাঞ্চনপ্রকাশ দত্ত

প্রচলিত। উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী এই কৃত্রিম রেয়ন আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রধানতঃ (1) ভিস্‌কস রেয়ন, (2) অ্যাসিটেট রেয়ন এবং (3) কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন—এই তিন ভাগে রেয়নকে ভাগ করা হয়ে থাকে, যদিও এদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের তেমন কিছু পার্থক্য নেই। সাধারণতঃ ভিস্‌কস রেয়নকেই আমরা পোষাক-পরিচ্ছদে তৈরীতে ব্যবহার করে থাকি।

প্রকৃতি থেকে রেয়নের প্রধান উপাদান অণু সেলুলোজ সংগ্রহের জন্যে মূলতঃ কাঠ অথবা সুতা মিলের অব্যবহার্য তুলাকে কাজে লাগানো হয়। এদের টুক্‌রা অবস্থায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্রবণে সিক্ত করা হয়; পরে অতিরিক্ত বাষ্পের চাপে 12/14 ঘণ্টা পর্যন্ত সিদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সেলুলোজ অবিকৃত থাকে, কিন্তু কাঠের অন্যান্য উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। তখন পর্যাপ্ত পরিমাণ জলে পরিশ্রুত করা হলে কাঠের মণ্ড জলের উপর ভেসে উঠে। এই মণ্ডকে সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইট দিয়ে ধোয়া হয় এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন আকারে সংগ্রহ করা হয়। কাঠের এই মণ্ডে শতকরা প্রায় 95 ভাগ সেলুলোজ থাকে। বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঠের মণ্ডকে কৃত্রিম রেশন বা রেয়নে রূপান্তরিত করা হয়।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

বিজ্ঞানাচার্য ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 82তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

1লা জানুয়ারী 1976 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরলোকগত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসুর 82তম জন্মবার্ষিকী 'সত্যেন্দ্র ভবনে' উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কিশোর কল্যাণ পরিষদের সভ্য-সভ্যাগণ সভায় বিজ্ঞানাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ডক্টর মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুগলকান্তি রায়, শ্রীঅমূল্যধন দেব, ডক্টর ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রমুখ সুধিবৃন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর অনাদিনাথ দাঁ।

জীবনের সূত্রপাত 200 কোটি বছর আগে

প্রস্তর-পূর্ব যুগের রুশ বিশেষজ্ঞ বরিস তিমোফিবের মতে—পৃথিবীতে জীবনের সূচনা হয়েছিল 200 কোটি বছর আগে। সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবর, ইউক্রেন অঞ্চলে পাথরের ভিতর 6 কিলোমিটার গভীরে গর্ত করে তিনি

সরলতম একক কোষের সন্ধান পেয়েছেন। অত গভীর থেকে তুলে আনা নমুনায় তিনি এই কোষের অবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। প্রাচীন জৈব জিনিষের যা কিছু অবশেষের সন্ধান এখনো আমার জানি—তার চেয়ে ওই কোষের বয়স তিনগুণ বেশী।

দুরারোগ্য ক্যান্সারের অন্তিম দশা

শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে গত কয়েক বছর ধরেই দুরারোগ্য রোগ থেকে বাঁচবার আশা হ্রাস পেয়েছে। এই সব দুরারোগ্য রোগের ভিতর ক্যান্সার অন্যতম। এক ক্যান্সার রোগেই প্রতি বছর 50 লক্ষ লোক মরে। রোগ ধরা পড়ে আরও ষাট লক্ষের। তবে, আশার কথা, ক্যান্সার চিকিৎসার সুফল লাভের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এখন প্রতি দশ জনের ভিতর তিন-চারজন এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। স্তনের ক্যান্সারের সুফল আরও বেশী; পাঁচজনের ভিতর চারজনই এই রোগ থেকে নিরাময় হতে পারে। এছাড়া ত্বক, ওষ্ঠাধর, জরায়ু ইত্যাদি ক্যান্সার থেকেও এখন তেমন বেশী ভয়ের কারণ নেই। আশা করা যাচ্ছে ব্যাপক গবেষণার ফল হিসাবে ক্যান্সারের আতঙ্ক আর বেশী দিন মানুষকে মানসিক যন্ত্রণা দেবে না। এই তথ্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বুলেটিন স্থান পেয়েছে। এই মাসিক বুলেটিন গত 2রা নভেম্বর '75 জেনিভায় প্রকাশিত হয়েছে।

জলদাপাড়ায় গণ্ডারের সংখ্যা 32

পি টি আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—জলদাপাড়া বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে গণ্ডারের সংখ্যা এখন 32। কোচবিহার বন বিভাগীয় বন অফিসার একথা জানান। সংরক্ষণ কেন্দ্রে গণ্ডারের চোরা শিকার বন্ধ করবার জন্যে দিনরাত বনবাহিনী এবং জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা পাহাড়া দিচ্ছেন। 78 কিলো-মিটারেরও বেশী এলাকা জুড়ে এই সংরক্ষণ কেন্দ্র।

বন অফিসার দাবী করেন, গত 3 বছরে গণ্ডারের চোরা শিকার হয় নি। যদিও এর আগে অহরহ গণ্ডার চোরা শিকারে নিহত হতো। পশ্চিম বঙ্গ সরকার বন্য প্রাণী রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প বলে তিনি জানান।

আজব জানোয়ার

এ এক পি কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—পূর্ব বোর্নিওর জঙ্গলের মধ্যে এক অদ্ভুত জানোয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ-রকম জানোয়ারের বর্ণনা কোন প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী-তেও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। বলা হচ্ছে, জানোয়ারটি প্রাগৈতিহাসিক, কিন্তু জ্যান্ত। এর উচ্চতা প্রায় এক মিটার, এর আঙুলগুলি অনেকটা মোমবাতির মত, পাগুলি ছাগলের মত এবং দেহটা বাঘের মত।

এতেই শেষ নয়, এর আবার পাখাও রয়েছে—ঠিক যেন 'উপকথায় পড়া ঘোড়ার ডানার মত'। খবরটি দিয়েছেন 'অন্তরা' নামক জাকার্তার সরকারী সংবাদ সংস্থা।

জাকার্তার চিড়িয়াখানার অধিকর্তাকে এই ধরনের জন্তু সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললে তিনি বলেন, বোর্নিও দ্বীপে এ-রকম প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা তো অসম্ভব নয়, কেননা এই দ্বীপের অনেক জায়গা চিরকালই সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিল।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

A NAME TO REMEMBER

MNP

HAVING VAST EXPERIENCE IN MANUFACTURING QUALITY WIRE WOUND RESISTORS & ALLIED PRODUCTS COVERING A WIDE RANGE OF SIZES & TYPES.

Continuous period of supply to many major Electrical & Electronic projects throughout the country.

MADE STRICTLY ACCORDING TO ISI AND INTERNATIONAL SPECIFICATION SUITABLE FOR ELECTRICAL & ELECTRONIC APPLICATION.
HIGH RELIABILITY & PROMPT SERVICE.

Write for Details to :

M.N. PATRANAVIS & CO.,

19, Chandni Chawk St, Calcutta-13.

P. Box No. 8956

Phone : 24-5873 Gram : PATNAVENC

AAM/MNP/O
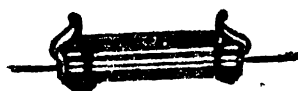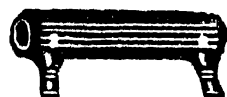
TYPE—VP
SOLDERING LUG
TYPE TERMINATION

FERRULE TERMINATION

TYPE—V.T
RESISTOR SOLDERABLE
LUG TYPE TERMINATION
WITH TAPS

RADIAL LEAD

TYPE—T
TOROIDAL POWER
RHEOSTAT

PIONEER SCIENTIFIC INSTRUMENT CORPORATION

15/2A, Biswakosh Lane, Calcutta-700003

Phone : 55-0139

MANUFACTURERS OF
'PISCO' BRAND
LABORATORY GLASS
APPARATUS

Specialists in :

* SINTERED GLASS-WARES
* BALL JOINTS
* FLANGE JOINTS
* STANDARD JOINTS

etc. etc.

A RESPECTABLE HOUSE FOR YOUR REQUIREMENTS IN

All sorts of
LAMP BLOWN GLASS APPARATUS

for Schools, Colleges & Research Institutions

ASSOCIATED SCIENTIFIC CORPORATION

232 B, UPPER CIRCULAR ROAD
CALCUTTA—4

Phone :
Factory : 55-1588 **Gram—ASCINCORP**
Residence : 55-2001

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

Benzytol SOAP
THE MILD SOAP WITH A PROVEN ANTISEPTIC
Benzytol®
SOAP
FOR THE PROTECTION YOU KNOW YOU SHOULD HAVE DAILY

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার

নিয়মাবলী

1. পরিষদের বার্ষিক সভ্য-চাঁদা 19·00 টাকা ও পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক সভ্য ও গ্রাহক চাঁদা যথাক্রমে 9·50 টাকা ও 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সভ্যগণকে প্রতিমাসে পত্রিকা প্রেরিত হয়ে থাকে।
2. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক ও সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পরে জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
3. টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
4. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।
5. প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন: প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে।
6. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
7. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
8. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
9. চিঠি-পত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (ফোন: 55-0660) কলিকাতা-6। ইতি

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]
[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

অমূল্যধন দেব
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ — ফেব্রুয়ারী, 1976 — দ্বিতীয় সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জলের গতি-প্রকৃতি

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়*

খরা, বন্যা পশ্চিম বঙ্গের এক চিরন্তন সমস্যা। এই দুই সমস্যাকে সমভাবে মোকাবিলা করবার জন্যে সম্প্রতি ভূগর্ভস্থ জল-বিজ্ঞান সংক্রান্ত চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে।

বৃষ্টির জল কিছু বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে, কিছু গাছপালা টেনে নিচ্ছে, কিছু নদীনালায় পড়ছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় বদ্বীপান্তর্গত পাললিক সমভূমি এলাকায় প্রায় 30 ভাগ জল ভূগর্ভে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃতিদত্ত ভূগর্ভস্থ জলাধারে মাত্র কয়েক ফুট নীচে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত আছে। এই সঞ্চিত প্রকৃতির দান সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই আমরা খরার সময় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চীৎকার করছি।

জল সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই ভূগর্ভস্থ মাটির স্তর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার, যেখানে জল সঞ্চিত হবে। তারপর জানতে হবে এই জলের গতিবিধি, নদীর জলের সঙ্গে এই জলের কি সম্বন্ধ, বাৎসরিক বৃষ্টির সঙ্গে কতখানিরই বা কি সম্বন্ধ, বাৎসরিক বৃষ্টির কতটা ভূগর্ভস্থ জলে রূপান্তরিত হয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলির সম্যক জ্ঞানের উপর নির্ভর করবে আমরা কতখানি জল ঐ এলাকা থেকে নির্ভয়ে নিতে পারি, কিভাবে কোন্ স্তর থেকে নিতে পারি, কোন্ পাম্পের সাহায্যে নিতে পারি ইত্যাদি—প্রশ্নের সদুত্তর।

নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকার মাটি সাধারণতঃ বেলে দোঁয়াশজাতীয়। এই বেলেমাটি অন্ততঃ 450 ফুট পর্যন্ত বিনা অবরোধে বজায় রয়েছে। তাই

*অন্তর্জলীয় উপবিভাগ, 10 এইচ. সি. সরকার রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই এলাকায় বেলেমাটির মধ্য দিয়ে জল অনায়াসে চুঁইয়ে যাচ্ছে এবং অনেক গভীরে জলপ্রবাহগত ধারাবাহিকতা (Hydraulic continuity) বজায় রয়েছে। এক গ্লাস ভর্তি জলে যদি একটা পিচকারী ঢুকিয়ে জল টানা হয়, জল একইভাবে নামবে, পিচকারীটা গ্লাসের উপরিভাবে রাখা হোক বা পিচকারীর মুখ গ্লাসের একেবারে নীচে নামিয়ে দেওয়া হোক, কিছু যায় আসে না—শুধু জলের ঊর্ধ্বসীমারেখা নেমে যাবে। সেই কারণে এই এলাকায় ভূগর্ভের জল খুব বেশী করে টানলেও বিরাট দুর্ঘটনা কিছু হবে না। তবে কি হবে? জলের সীমারেখা 16 ফুট থেকে 28 ফুট নেমে যাবে। কিন্তু অগভীর নলকূপ এবং খাবার জলের নলকূপ দিয়ে জল বের হবে না।. এরও উপায় আছে। পাম্প গর্ত করে নীচে নামিয়ে দিলেই চলবে। $1\frac{1}{2}$" টিউবওয়েলে সিলিণ্ডার বসাতে হবে। প্রয়োজনে অগভীর নলকূপে টার্বাইন পাম্প লাগাতে হবে। আর 28 ফুট ঊর্ধ্বসীমা দু-এক মাসের জন্যে। বর্ষার পর আবার ঊর্ধ্বসীমা 16 ফুট উঠে আসবে। বেশী জল টানবার একটা ভাল দিকও আছে। শুধু 1972 সাল নয়—1971 সালে মাঝে মাঝে আসে—এসেছিল 1956 সালে, 1959 সালে বন্যা। চারদিকে থৈ থৈ জল, জলটা যাবে কোথায়? ধীরে ধীরে বের হয়ে যেতে বহু সময় লাগবে। ইতিমধ্যে সব পচে শেষ, কলেরা মহামারী দেখা দিবে। কিন্তু যদি প্রচুর টিউবওয়েল বসিয়ে অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত খুব করে মাটির নীচের জল টানা হয়, তবে জলের ঊর্ধ্বসীমা 16 ফুট থেকে 32 ফুটেও নেমে যেতে পারে এবং প্রকৃতিদত্ত একটা বিরাট জলাধার তৈরী হবে। বন্যার জল এই জলাধারে স্থান নেবে। কয়েক দিন পরেই দেখা যাবে আর বন্যার জল নেই। তাই এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, ভূগর্ভস্থ জল সেচ ব্যবস্থা বন্যা, খরা—এই সব সমস্যাকে সমভাবে মোকাবিলা করতে পারে।

ভূত্বকে যদি এঁটেল জাতীয় মাটির আবরণ থাকে, তবে উপরিভাগের বৃষ্টির জল চুইয়ে যেতে পারে না। যেখানে এই জাতীয় মাটির অবরোধ শেষ হয়, সেখান দিয়ে কিছু পরিমাণ জল প্রবেশ করে। এই রকম এলাকায় বাৎসরিক সঞ্চয়ের পরিমাণ কম। কলকাতা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কলকাতার ভূত্বক থেকে 100 ফুটেরও গভীর পর্যন্ত এঁটেলজাতীয় মাটি। এই জাতীয় মাটির মধ্যে জল থাকতে পারে, কিন্তু পারস্পরিক আণবিক আকর্ষণে (Intermolecular attraction) মাটি জলের সূক্ষ্মকণা আঁকড়ে রাখে, জলে বিচরণ করে না। তাই কলকাতায় যে বৃষ্টিপাত হয়, তার জল ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় না। গাছের যেমন, বাষ্পীভবনে কিছু পরিমাণ উবে যায় এবং বেশীর ভাগ জল নদীনালায় গিয়ে পড়ে। তবে কি কলকাতায় ভূগর্ভে জল নেই? আছে এবং এই জল যোগাচ্ছে নদীয়া জেলা।

ভূগর্ভে জল সব সময় নড়াচড়া করে, কিন্তু অতীব ধীর গতিতে। নদীর জল প্রবাহিত হয়, তার স্বাভাবিক গতি প্রতি সেকেণ্ডে 3 ফুট। ভূগর্ভের জল চুইয়ে যায়। এর গতিবেগ অবিরত পরিবর্তনশীল, স্বাভাবিক গতি বছরে $\frac{1}{2}$ থেকে $\frac{1}{8}$ মাইল। জলের গতি নির্ভর করে মাটির স্তরের উপর, যার মধ্য দিয়ে জল যাচ্ছে এবং ঢালুভাবের মাত্রা বা পরিমাণের উপর। যদি মোটা বালি বা কাঁকরের স্তর হয়, জল দ্রুত চোয়াবে, যদি সরু বালির স্তর হয়—গতি ধীর হবে।

কলকাতায় যে এঁটেলজাতীয় মাটির কথা বলা হয়েছে—ভূতত্ত্ববিদদের মতে এর সুরু হয়েছে হরিণঘাটা, কল্যাণী এলাকা ছাড়িয়ে মোটামুটিভাবে নৈহাটি এলাকা থেকে। যত দক্ষিণে যাচ্ছে, তত এই এঁটেল মাটির স্তর গভীর হচ্ছে, কলকাতায় 100 ফুটের উপর এবং সুন্দরবন এলাকায় গিয়ে আরও গভীরে। গাঙ্গেয় অববাহিকার জেলাসমূহের ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। আরও

সঠিকভাবে বলতে গেলে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ভূগর্ভের জল মোটামুটি এই ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। নদীয়ার মাটির নীচের জল এবং শুধু নদীয়া কেন, মুর্শিদাবাদ এবং আরও উত্তরের ভূগর্ভের জল ধীর গতিতে দক্ষিণের দিকে এগোচ্ছে এবং নৈহাটির কাছে গিয়ে উপরে এঁটেলজাতীয় মাটি পেয়ে সোজা নীচের দিকে ঢুকে পড়ছে এবং কলকাতায় 150 ফুট, 400 ফুট বা আরও নীচে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে। 150 ফুট, 400 ফুট বা 600 ফুট গভীর নলকূপ খনন করে কলকাতায় এই জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। তাই কলকাতার ভূগর্ভস্থ জল কলকাতার নয়, কলকাতাকে নদীয়া দিচ্ছে এই জল যুগ যুগ ধরে।

নলকূপ বসাবার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দরকার। একটি টিউবওয়েল যে এলাকার থেকে জল টানছে, সেই এলাকায় আর একটি টিউবওয়েল বসালে কালক্রমে দুটি টিউবওয়েল থেকেই জল বের হবে না বা অল্প জল বের হবে। সম্পূর্ণ টাকা জলে যাবে। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। হুগলীর ডানলপ রবার ফ্যাক্টরী, বিরাট কারখানা, প্রচুর লোক কাজ করে। 20 বছর আগেও ঘণ্টায় অন্ততঃ 1,62,000 গ্যালন জলের প্রয়োজন ছিল। 1955 পর্যন্ত ৮টি বড় ব্যাসের নলকূপের সাহায্যে এই জলের প্রয়োজন মিটান হতো। 1956-58-এ আরও দুটি বড় নলকূপ খনন করা গেল। কিন্তু উল্টো বিপত্তি সুরু হলো। নূতন দুটি নলকূপ দিয়ে ভাল জল বের হচ্ছে না, এমন কি পুরনো নলকূপগুলির জলের প্রবাহ কমে গেছে। ঘণ্টায় অন্ততঃ 28000 গ্যালন জল বের হওয়া উচিত, সেখানে 21000 গ্যালনের মত জল বের হচ্ছে। ব্যাপারটা কি? মাটির নীচের জল কি শুকিয়ে যাচ্ছে? নাকি ফিল্টারের মুখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? না, আসল কারণ একটি টিউবওয়েল মাটির নীচে যে এলাকার থেকে জল নিচ্ছে, সেই এলাকায় আর একটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। একটির থেকে আর একটি টিউবওয়েলের দূরত্ব রাখা হয়েছিল মোটামুটি 300 ফুট। বিশেষজ্ঞেরা এসে বিচার-বিবেচনার পর জানালেন যে, দুটি টিউবওয়েলের মধ্যে কম করে ব্যবধান থাকা উচিত ছিল 2000 ফুট। যাই হোক, 3টি টিউবওয়েল 8 ঘণ্টা করে চালাবার ব্যবস্থা হলো যাতে 2টি চালু টিউবওয়েলের মধ্যে অন্ততঃ 1000 ফুট ব্যবধান থাকে। সমস্যা কিছুটা মিটলো।

একটু দেখেশুনে এগোতে পারলে পশ্চিম বঙ্গের অন্ততঃ 50 ভাগ এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল টানবার বিশেষ সমস্যা নেই। সমস্যা নেই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরের দক্ষিণ ভাগে, মালদহের বিস্তৃত অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে (ভাগীরথীর পূর্বে), নদীয়ায়, বর্ধমান (কালনা, কাটোয়া, সদর আর দুর্গাপুর মহকুমার কিছু অংশ) আর হুগলীর পূর্বাঞ্চলে, হাওড়া আর চব্বিশ পরগণার উত্তরাঞ্চলে, মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ার পূর্বাঞ্চলে। সেই একই কারণ। মাটির স্তরে কোন দীর্ঘ অবরোধ নেই। বেলেমাটির স্তর বহুদূর পর্যন্ত বর্তমান, যার মধ্য দিয়ে জল চুইয়ে যেতে পারে। একেই বলা হয় প্রমুক্ত জলময় স্তর (Unconfined aquifer), কিন্তু এছাড়াও পশ্চিম বঙ্গে আরও বহু জায়গা রয়েছে। এসব জায়গায় কিন্তু শুধু দুই স্থানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের দিকে নজর দিলেই জলতোলন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান হবে না। সতর্ক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। সমস্যা বিভিন্ন রকম। কোথাও ভূগর্ভে শক্ত পাথরের বাধা। এই বাধা রয়েছে দার্জিলিংয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে, জলপাইগুড়ির উত্তরাঞ্চলে, পুরুলিয়ায়, বীরভূমে, বাঁকুড়ায় মেদিনীপুরে (ঝাড়গ্রাম মহকুমায়) আর বর্ধমানে (দুর্গাপুর আসানসোল মহকুমায়)। কোথাও নোনা জলের বাধা। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় যেমন মেদিনীপুরে কাঁথির মত উপকূলে, দক্ষিণ

চব্বিশ পরগণা এবং হাওড়ার দক্ষিণ ভাগে এই সমস্যা বিশেষভাবে দেখা দিতে পারে। সাধারণ অবস্থায় ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় যদি অতিরিক্ত মাত্রায় ভূগর্ভের জল উত্তোলন করা হয়, তবে উল্টো ঘটনা ঘটবে। ভূগর্ভের জলস্তর নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের নোনা জল ধীর গতিতে ভূগর্ভে প্রবেশ করবে। জলধারণক্ষম মাটির স্তর নোনা জলে কলুষিত হবে। এই স্তরের জল আমাদের কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারবে না।

তৃতীয় সমস্যা এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা—আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ জলস্তরের অবস্থিতি। জানা গেছে কলকাতায় এঁটেলজাতীয় মাটির স্তরের পর রয়েছে সূক্ষ্ম ও মোটা বালির স্তর, কাঁকর ও নুড়িপাথরের স্তর। এরূপ বিভিন্ন জলধারণক্ষম স্তর চলে গেছে স্থানবিশেষে 500 ফুট, 700 ফুট, এমন কি 1000 ফুট পর্যন্ত। তারপর আবার এঁটেলজাতীয় মাটির দীর্ঘ অবরোধ। একেই বলা হয় অবরুদ্ধ জলময় স্তর (Confined aquifer)। এখানে একটা বড় ব্যাসের পাইপের মধ্যে জল অবরুদ্ধ। স্বভাবতঃই এই অবরুদ্ধ অবস্থায় জলের মধ্যে এক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা বায়ুমণ্ডলের চাপের (Atmospheric pressure) থেকে বেশী এবং যখন নলকূপের সাহায্যে এই ধরণের জলস্তর থেকে জল নেওয়া হয়, তখন প্রথমেই জলস্তর নেমে যাওয়ার প্রশ্ন আসছে না। প্রথমে এই জলের চাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে, তারপর একটা সময় আসবে যখন নদীয়া মুর্শিদাবাদের মত এখানেও জলস্তর কমতে থাকবে। এই ধরণের অবরুদ্ধ জল কলকাতায় রয়েছে, রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, বাঁকুড়ার অংশবিশেষে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং সদর মহকুমা এলাকায়। বর্ধমানের দুর্গাপুর মহকুমায়, মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলে, বীরভূম আর মালদহের অংশবিশেষে। এই ধরণের অবরুদ্ধ জলস্তর যদি সখানে নেমে যায়, তবে একটা দারুণ ভয়ের ব্যাপার রয়েছে। 100, 200 বা 500 ফুট নীচে অবরুদ্ধ বালির স্তর বা নুড়িপাথরের স্তর থেকে সখানে জলকণা বেরিয়ে যাচ্ছে, অবরুদ্ধ জলের চাপ কমে এবার জলের সমতা নেমে যাচ্ছে। একটা বিরাট শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে উপরে রয়েছে দারুণ চাপ। ভূপৃষ্ঠে বাড়ীঘর, গাছপালার চাপ, ভূগর্ভে এঁটেলজাতীয় মাটির চাপ, শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্যে এবার শহর বসে গেলেই হলো। এই নিদারুণ দুর্ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে। হঠাৎ দেখা গেল ক্যালিফোর্নিয়া সিটি একদিন বসে যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যাপক এলাকায় সেচের ব্যবস্থা, খাবার জলের ব্যবস্থা ছিল ভূগর্ভস্থ জলের দ্বারা। বছরের পর বছর অবরুদ্ধ জলস্তর থেকে এই জল টানা হচ্ছিল—কবে একদিন সবার অগোচরে নিরাপদ সীমারেখা পেরিয়ে গেছে। মাটি বসতে সুরু করেছে। সুরু হলো বিশেষজ্ঞদের, বিজ্ঞানীদের গবেষণা। তাঁরা শহরকে রক্ষা করবার এক উপায় বের করলেন। জলস্তর থেকে এতদিন যে জল নেওয়া হয়েছে, তা ফেরত দেওয়া সুরু হলো। ভূপৃষ্ঠের জল শোধন করে ভূগর্ভের জলবাহী স্তরে প্রবেশ করানো হলো। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার নিমজ্জন বন্ধ করা হলো। এই ধরণের আবদ্ধ জলস্তর থেকে জল নিতে হলে জলপ্রবাহের নিরাপদ ভারসাম্য (Waterbalance) বজায় রাখবার জন্যে সতর্ক পরিকল্পনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন।

অবরুদ্ধ জলের মধ্যে প্রবল চাপ থাকায় স্থান বিশেষে এই জল পাম্পের সাহায্য ছাড়াই ফল্গুধারার মত ঠেলে বেরিয়ে আসে; শুধু ভূগর্ভে নলকূপ খনন করলেই হয়। একেই বলা হয় আর্টিজিয়ান ওয়েল। আমাদের পশ্চিম বঙ্গেও রয়েছে—মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বেলদা, খড়্-

বেতা এলাকায়, বাঁকুড়ার সোনামুখী, কোতলপুর, বিষ্ণুপুর, তালডাংরা এলাকায়।

সংলগ্ন এলাকায় ভূপৃষ্ঠের জলের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার-বিবেচনার পর ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ব্যাপক পরিকল্পনা করা উচিত। পার্শ্ববর্তী নদী কখনও ভূগর্ভের জল টেনে নেয় আবার এই নদীই অন্য কোন সময় বা অন্য কোন স্থানে ভূগর্ভে জল দেয়। একেই বলে নদীর এফ্লুয়েন্ট বা ইনফ্লুয়েন্ট চরিত্র। কৃষ্ণনগর শহরের পাশে জলাঙ্গী নদী বছরের অন্ততঃ 8 মাস ভূগর্ভের জল টেনে নিচ্ছে। তাই প্রাক-বর্ষাকালীন মাসগুলিতে কৃষ্ণনগর এলাকায় ভূগর্ভের স্থিরজলের ঊর্ধ্বসীমা স্থানবিশেষে 30 ফুটেরও নীচে নেমে যায়। এই ধরণের এলাকায় অগভীর নলকূপ বা সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ভাল কাজ করে না। আবার উত্তর প্রদেশে গঙ্গানদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বছরের অধিকাংশ সময় নদীর জল ভূগর্ভে যায়। তাই এই সব এলাকায় গভীর এবং অগভীর নলকূপ খুব ভাল কাজ করে।

উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে, পশ্চিম বঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের সমস্যা সর্বত্র সমান নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে এব এলাকা অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই জন্যে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় এবং গতিবিধির উপর ব্যাপকহারে সুব্যবস্থিত অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হওয়া প্রয়োজন। একটি হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার গভীর, অগভীর নলকূপের মাধ্যমে জলোত্তোলন বাবদ 30 কোটি টাকার উপর খরচ করেছেন, কিন্তু যে জল উত্তোলন করা হচ্ছে, তাকে জানবার জন্যে 30 লক্ষ টাকাও কি খরচ করা হয়েছে? আশার কথা—বর্তমান সরকার জল অনুসন্ধানের এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। 'ওয়াটার রাইট' প্রতিষ্ঠিত করে কিছু আইনকানুনও হয়তো প্রয়োগ করা হবে এবং মালিকের জমির পরিমাণ অনুযায়ী জলোত্তোলনের অধিকার দেওয়া হবে।

ভূমিকম্প

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে নানা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। মানুষ, চিরকালই এই সব প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এদের অনেকগুলিকে মানুষ জয় করতে পারলেও যেগুলিকে আজও মানুষ বশে আনতে পারে নি, তার মধ্যে অন্যতম হলো ভূমিকম্প। পৃথিবীর আদি পর্বে প্রায়ই ভূমিকম্প হতো। বর্তমানে ভূমিকম্প অনেক কম হলেও সংখ্যায় নগণ্য নয়। এখনও প্রতি বছর ছোট-বড় মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে এক লক্ষ মত ভূমিকম্প হয়। এদের মধ্যে হাজার দশেক ছাড়া অধিকাংশই এত ক্ষীণ যে, আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না।

খুব বড় ধরণের ভূমিকম্প বেশী হয় না বটে, কিন্তু হলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হয় খুব বেশী।

*পদার্থ-বিজ্ঞান, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী।

জাপানে একটি ভূমিকম্পে 38 হাজার লোক মারা যায়। ভারতে 1967 খৃষ্টাব্দে কয়নানগরে যে ভূমিকম্প হয়, তাতে দু-শ'র মত লোক মারা যায় এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে। এই সব ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঠিক ঠিক ভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাওয়া এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবার ক্ষমতা মানুষকে অর্জন করতে হবে। এ দুটি ক্ষমতা মানুষ আজও করায়ত্ত করতে পারে নি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছেন।

ভূমিকম্প পরিমাপ

ভূমিকম্পের পরিমাণকে সাধারণতঃ রিকৃটার স্কেলে (Richter Scale) প্রকাশ করা হয়। সি. এফ. রিকৃটার নামক ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্নোলজির একজন বিজ্ঞানী 1935 খৃষ্টাব্দে এই স্কেলের উদ্ভাবন করেন। তাঁর স্কেলে ভূমিকম্পের মান M হলে log E=a+b M হয়। এখানে E হলো ভূমিকম্পের ফলে নির্গত শক্তির মান (আর্গ), a ও b ধ্রুবক, যাদের মান যথাক্রমে 5·8 এবং 2·4। অতএব এই সম্পর্কের সাহায্যে কোন স্থানে ভূমিকম্পের ফলে নির্গত শক্তির পরিমাপ করে ভূমিকম্পের মান জানা যাবে।

রিকটার স্কেলে ভূমিকম্পের মান 2-এর কম হলে সাধারণতঃ তা অনুভূত হয় না। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যে ভূমিকম্প হয়েছে, তার মান 8·9। 8 মানের ভূমিকম্পের ফলে নির্গত শক্তির পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার 10^4টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে নির্গত শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। ভূমিকম্পের মান 3·5—4·2 হলে—তাকে মৃদু ভূমিকম্প বলা হয়। ভারী লরি চললে যে ধরণের মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, এই ভূমিকম্পগুলি সে ধরণের। ভূমিকম্পের মান 4·3-4·8 হলে—মানুষ সুপ্ত অবস্থায় অথবা হাঁটতে হাঁটতে তা অনুভব করতে পারে। এগুলিকে মাঝারি ধরণের ভূমিকম্প বলা হয়। এ সময় গাছপালা, ঘরবাড়ী, ঝুলন্ত বস্তুসমূহ আন্দোলিত হয়। ভূমি-কম্পের মান 5·5-6·1 হলে—সেগুলিকে খুব তীব্র ভূমিকম্প বলা হয়। এর ফলে দেয়ালে ফাটল ধরে এবং দেয়াল থেকে প্লাষ্টার (Plaster) খসে পড়ে। ভূমিকম্পের মান 6·2-6·9 হলে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। এ সময় ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিছু ভেঙে পড়ে। 7·0-7·3 মানের ভূমি-কম্পকে বিধ্বংসী (Disastrous) ভূমিকম্প বলা হয়। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়, ঘরবাড়ী অনেক ভেঙে পড়ে, রেল লাইন বেঁকে যায়। ভূমিকম্পের মান 7·4-.·1 হলে—তা প্রচণ্ড ক্ষতিকারক হয়। এ ধরণের ভূমিকম্পের পর খুব কম ঘরবাড়ীই টিকে থাকে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বন্যা হয়। ভূমিকম্পের মান ·1-এর বেশী হলে—তার রূপ কি হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এক কথায় তা বিপর্যয়কর (Catastrophic)।

ভূমিকম্পের কারণ

ভূমিকম্প কেন হয়, তা নিয়ে মানুষ চির-কালই চিন্তা করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে তারা মনগড়া কারণ নির্ধারণ করে। ফলে এ বিষয়ে নানা উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী বাসুকী নামে এক সাপের মাথার উপর পৃথিবী অবস্থান করে এবং বাসুকি মাথা নাড়লে ভূমিকম্প হয়। মঙ্গোলীয়ানদের উপকথা অনুযায়ী পৃথিবী ব্যাঙের উপর ভর করে আছে এবং ব্যাঙ হাত অথবা মাথা নাড়ালে ভূমিকম্প হয়। এই সব উপ-কথাগুলি মানব মনের কল্পনা হলেও ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত দেয়। বর্তমানে ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের প্রধান যে

কারণগুলি নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পৃথিবীর ত্বক (Crust) গঠনকারী শিলাস্তরের আপেক্ষিক সরণ। মূলতঃ এই সরণের ফলেই বিধ্বংসী ভূমিকম্পগুলি ঘটে। এই ধরণের ভূমিকম্পকে বলে টেক্‌টনিক (Tectonic) ভূমিকম্প। পৃথিবীর ভূত্বক গঠনকারী শিলাস্তরগুলি কখনও কখনও উচ্চ চাপের প্রভাবাধীন হয়, কিন্তু শিলাস্তরে সর্বত্র চাপ সমান হয় না। এই চাপের ফলে শিলাস্তরগুলিতে বিকৃতির সৃষ্টি হয়। ঐ চাপ যখন শিলাস্তরের স্থিতিস্থাপক সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন শিলাস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং প্রভাব হ্রাসের প্রচেষ্টায় খণ্ডিত শিলাস্তরগুলি উপরে-নীচে বা পাশে চ্যুত হয়। এইভাবে শিলাস্তরে ফাটল সৃষ্টি হয়ে খণ্ডিত শিলাস্তরগুলির সরণ ঘটাকে চ্যুতি বা ফল্‌ট্ (fault) বলা হয়। ফাটল বরাবর ঘর্ষণের ফলে খণ্ডিত শিলাস্তরগুলির আপেক্ষিক সরণ বাধা পায়। কিন্তু খণ্ডিত শিলাস্তরগুলির উপর নতুন করে চাপ পড়তে পারে এবং চাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যখন খণ্ডিত শিলাস্তরগুলি ফাটলে ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করে হঠাৎ এমনভাবে সরে যাবে যাতে তারা চাপমুক্ত হতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নতুন চ্যুতি সৃষ্টি অথবা পুরাতন চ্যুতির বৃদ্ধি—এই দুই ক্ষেত্রেই শিলাস্তরে দীর্ঘ দিন ধরে সঞ্চিত স্থিতিস্থাপক শক্তি হঠাৎ মুক্ত হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ মুক্ত এই শক্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। এটাই হলো টেক্‌টনিক ভূমিকম্পের কারণ। পৃথিবীর অধিকাংশ বিধ্বংসী ভূমিকম্পগুলি (যথা আসামে 1897 এবং 1950 খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প, কাংগ্রার 1905 খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্প, বিহারে 1934 খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প প্রভৃতি) টেক্‌টনিক। 1906 ক্যালিফোর্নিয়ার বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কারণ ছিল স্যান অ্যানড্রাস চ্যুতিতে (San Andreas Fault) নতুন অনুভূমিক সরণ।

পৃথিবীর ভূত্বক অবিচ্ছিন্ন (Continuous) নয়—তা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলির বিভেদতলে (Boundary) তাদের মধ্যে আপেক্ষিক সরণ হতে পারে এবং তা হলেই ভূমিকম্প হয়। মূলতঃ দু-ভাবে এই সরণ ঘটে (1) বিভেদতল বরাবর পার্শ্বসরণ অর্থাৎ বিভেদতলে একটি খণ্ড অন্য খণ্ডের পাশ বরাবর সরে যেতে পারে; এবং (2) একটি খণ্ড অপর খণ্ডের উপর উঠে পড়ে। প্রথমটিকে বলা হয় স্ট্রাইক-স্লিপ (Strike slip) চ্যুতি এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় থার্স্‌ট্ টাইপ (Thirst type) চ্যুতি।

চ্যুতিগুলি সবক্ষেত্রে পৃথিবীর উপরিভাগে কোন চিহ্ন রাখে না। অনেক চ্যুতিই পৃথিবীর অনেক গভীরে অবস্থিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়, তাকে ফোকাস (Focus) বলে। ফোকাস থেকে কল্পিত উল্লম্ব রেখা পৃথিবীর উপরিতলে যে স্থানে ছেদ করে, তাকে বলে এপিসেন্টার (Epicentre)। অবশ্য ফোকাস বা এপিসেন্টার কখনও‌ই একটি বিন্দু হতে পারে না, কারণ ভূমিকম্প একটি বিন্দুতে নয়, সৃষ্টি হয় একটি অঞ্চলে। সুতরাং ফোকাস ও এপিসেন্টার বললে কিছুটা অঞ্চল বুঝতে হবে। ফোকাস পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 30 মাইল বা তার কম গভীরে অবস্থিত হলে ভূমিকম্পকে স্বল্প ফোকাসের (Shallow focus) ভূমিকম্প বলে। ফোকাস বেশী গভীরে (যথা কয়েক শ' মাইল) অবস্থিত হলে ভূমিকম্পকে গভীর ফোকাসের (Deep focus) ভূমিকম্প বলে।

নতুন চ্যুতি সৃষ্টি বা পুরাতন চ্যুতির বৃদ্ধির ফলে যে স্থিতিস্থাপক শক্তি নির্গত হয়, তা ফোকাস থেকে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই শক্তি তরঙ্গাকারে অগ্রসর হয়। তরঙ্গগুলি প্রধানতঃ দু-ধরণের—প্রাথমিক তরঙ্গ (Primary waves) বা P-তরঙ্গ এবং গৌণ তরঙ্গ (Secondary waves) বা S-তরঙ্গ। P-তরঙ্গগুলি অনুদৈর্ঘ্য

তরঙ্গ এবং S-তরঙ্গগুলি তীর্যক তরঙ্গ। প্রাথমিক তরঙ্গগুলির গতিবেগ (v_p) গৌণ তরঙ্গগুলি গতিবেগ (v_s) অপেক্ষা 1.7 গুণ বেশী। P-তরঙ্গ কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে কিন্তু S-তরঙ্গ কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। S-তরঙ্গের গতিবেগ মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর ভূত্বকে P-তরঙ্গের গতিবেগ 6-7 কিলোমিটার/সেকেণ্ড, কিন্তু ম্যান্টাল (Mantle) তলে (ভূত্বকের ঠিক নীচে থেকে কেন্দ্রের দিকে 2900 কিলোমিটার পর্যন্ত অংশকে ম্যান্টল বলে) পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এই বেগ হঠাৎ বেড়ে 8 কিলোমিটার/সেকেণ্ডে হয়ে যায়। এরপর পৃথিবীর কোরে (Core) পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এই বেগের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। কোরে বেগ আবার বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে S-তরঙ্গ পৃথিবীর 2,900 কিলোমিটার গভীরতা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

ভূমিকম্পের আর একটি কারণ হলো আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত। অগ্ন্যুৎপাতের সময় পৃথিবীর উপরিতল কাঁপতে থাকে। কিন্তু এই সব কম্পন সাধারণতঃ খুব বেশী তীব্র হয় না। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে তা ধ্বংসাত্মক রূপ নিলেও তার প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। এমনকি অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূমিকম্প একেবারেই হয় না। বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে, যেগুলির অগ্ন্যুৎপাত খুব ধীরভাবে হয়—এগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠে কম্পনের সৃষ্টি করে না। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে খুব বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়েছে—এমন সংখ্যা খুব বেশী নয়। বড় ধরণের ভূমিকম্পের অধিকাংশই টেক্টনিক।

উল্কাপাত, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, শিল্পাঞ্চলে ভারী ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ভারী গাড়ী চলাচল প্রভৃতির ফলেও ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেগুলি সাধারণতঃ খুবই ক্ষীণ হয় এবং অনেক সময় তা এতই ক্ষীণ হয় যে, তা অনুভূত হয় না। স্পষ্টতঃই এগুলি কোন ক্ষতি করতে পারে না।

সাম্প্রতিক কালে ডেনভারে (Denver) অবস্থিত একটি পর্বতের নীচে কূপ খনন করে সেখানে তরল প্রবিষ্ট করালে কয়েকটি ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 1962 সালে মার্চ মাসে প্রথম তরল প্রবেশ করানো সুরু হয় এবং তার পর থেকেই সেখানে ভূমিকম্প হতে থাকে। হিলি ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ দেখান যে, এই ভূমি-কম্পগুলির এপিসেন্টার প্রায় সরল 8 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি অঞ্চল, যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে কূপটি। ফোকাসের গভীরতা 4-6 কিলো-মিটার—3.8 কিলোমিটার গভীর কূপের ঠিক তলদেশে। 1966 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তরল প্রবেশ বন্ধ করলে ভূমিকম্প সংঘটিত হবার হার আশানুরূপভাবে অনেক হ্রাস পায়। কিন্তু 1966 সালে শেষভাগে অপ্রত্যাশিতভাবে ভূমি-কম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 1967 সালে প্রায় সারা বছরই এরকম চলতে থাকে। 1968 সালে ভূমিকম্পের সংখ্যা আবার হ্রাস পেতে থাকে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে হিলি ও তাঁর সহ-কর্মীবৃন্দ সিদ্ধান্ত করেন যে, তরল অনুপ্রবেশের ফলে চ্যুতিবরাবর ঘর্ষণ বলের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কোন বড় জলাধারে জল ভর্তি করলেও ভূমিকম্প হতে দেখা গেছে। কারদার এরকম কয়েকটি ভূমিকম্প নথিভুক্ত করেন। 1935 সালে একটি লেক তৈরী হবার পরবর্তী 10 বছরে প্রায় 600টি স্থানীয় ভূমিকম্প পরিলক্ষিত হয়। এগুলি অধি-কাংশ অবশ্য খুব কম মানের ছিল। কেবলমাত্র একটির মান ছিল 5 এবং দুটির মান ছিল 41 কারদারের মতে লেকে জলভর্তি করবার ফলে ঐ অঞ্চলে যে চ্যুতি ছিল, তা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিককালে রোথে (Rothe) বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা চালান। কয়েকটি ক্ষেত্রে জলাধারে জল ভর্তি করবার ফলে ভূমিকম্প হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 1967 সালে ডিসেম্বর মাসের কয়নানগর ভূমিকম্প। এটির মান ছিল প্রায় 6·5 এবং এর এপিসেন্টার ছিল কয়না ড্যামের 10 কিলো-মিটারের মধ্যে। 1962-63 সালে এই ড্যামটি তৈরী করা হয়। 1963 সাল থেকেই ছোটখাটো ভূমিকম্প ঐ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

জাম্বিয়ায় 1958 সালে কারিবা লেক তৈরী হবার পর অনেকগুলি ভূমিকম্প হতে দেখা যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্পটির মান 5·8। Gough সিদ্ধান্ত করেন যে, জলাধারে জল ভর্তি করবার ফলে ঐ স্থানের চ্যুতি সক্রিয় হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্যকর ভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাবার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলেও এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছেন। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার ফলে এমন আশার সঞ্চার হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবেন।

সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পূর্বে কোকাস অঞ্চলে বিকৃতি (Deformation) ঘটে এবং এই বিকৃতির ফলে ঐ অঞ্চলের ভৌত ধর্মাবলীর কিছু পরিবর্তন হয়। রাশিয়া ও জাপানের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গত কয়েক বছরে যে, বিস্তারিত গবেষণা করেছেন তাতে জানা যায় যে, অনেক ভূমিকম্পের পূর্বে এই পরিবর্তন ঘটে। ভূমিকম্পের আগে সমুদ্র ও জমির উচ্চতার (Level) পরিবর্তন ঘটে, পৃথিবীর বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়, র‍্যাডন নির্গত হয় এবং ছোট ছোট স্থানীয় ভূমিকম্প হতে দেখা যায়।

1969 সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী নারসেসভ ও সেমেনভ মধ্য এশিয়ার গর্ম (Garm) অঞ্চলে পরীক্ষা চালাতে চালাতে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা লক্ষ্য করেন। সাধারণতঃ ভূত্বকে P ও S-তরঙ্গের বেগের অনুপাত $v_p/v_s = 1{\cdot}7$; কিন্তু নারসেসভ ও সেমেনভ দেখেন যে, মাঝারি ধরণের (Moderate) ভূমিকম্পের (মান 4-5) কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস আগে এই অনুপাত হঠাৎ হ্রাস পায়। অনুপাতের মান পুনরায় ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং এর কিছু পরেই ভূমিকম্প হয়। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, বেগের অনুপাতের এই অস্বাভাবিক অবস্থার স্থায়িত্ব ভূমিকম্পের মান বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার প্রায় তিন বছর অবহেলিত ছিল। এর পর 1971 সালে নিউ ইয়র্কের Blue Mountain Lake-এ যে ভূমিকম্প হয়, তা পর্যালোচনা করে আগরওয়াল রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের অনুরূপ ফলাফল লক্ষ্য করেন। এই ভূমিকম্পের (মান 2·5-3·3) কয়েক দিন আগে v_p/v_s হ্রাস পায় এবং ভূমিকম্প ঘটবার প্রায় একদিন আগে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। তাছাড়া বেগের অনুপাতের এই অস্বাভাবিক অবস্থা ভূমিকম্পের মান বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। 1971 সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় 6·4 মানের San Fernando ভূমিকম্প হবার প্রায় 3½ বছর আগে থেকে বেগের অনুপাতের অনুরূপ অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন হুইটকম্ব এবং গ্যারমানি। সাম্প্রতিককালে Ohatake নামে একজন জাপানী বিজ্ঞানী জাপানে দুটি মোটা-মুটি বড় ধরণের ভূমিকম্পের আগে বেগের অনুপাতের অনুরূপ অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন।

এই সব ঘটনা থেকে বলা যায় যে, ভূমিকম্পের

আগে ভৌত ধর্মের এই পরিবর্তনকে কয়েকটি বড় ধরণের এবং ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্তে পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং ভৌত ধর্মাবলীর পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরীক্ষাগারের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে বেগের অনুপাত পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, চ্যুতির আগে শিলার আয়তনের প্রসারণ ঘটে। এই ঘটনাকে বলা হয় ডিলাট্যান্সি (Dilatancy)। আয়তনের প্রসারণ ঘটে শিলার উপর চাপের ফলে সৃষ্ট ফাটল ও তার অগ্রগতির জন্তে। পরীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, শিলার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হলে P ও S উভয় তরঙ্গের বেগের হ্রাস হয়। P-তরঙ্গের বেগ হ্রাস S-তরঙ্গের বেগ হ্রাস অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য যদি ফাটল জলের দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে তবে P-তরঙ্গের বেগের হ্রাস উল্লেখযোগ্য হয় না; অপর দিকে S-তরঙ্গের বেগের ক্ষেত্রে এই সম্পৃক্ততার কোন ভূমিকা নেই।

ডিলাট্যান্সি বা শিলার আয়তনের প্রসারণের ফলে চ্যুতি অঞ্চলে ছিদ্র চাপ (Pore pressure) হ্রাস পায়। ছিদ্র চাপ হলো ফাটল বা ছিদ্রের দেয়ালে জলের চাপ। ছিদ্র চাপ হ্রাস পাবার ফলে উচ্চ চাপের অঞ্চল থেকে জল নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। যদি শিলার প্রসারণের হার নতুন সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্যে জল প্রবাহের হার অপেক্ষা বেশী হয়, তবে নতুন ছিদ্রগুলি জলপূর্ণ হবে না এবং সেগুলি অসম্পৃক্ত অবস্থায় থাকবে। এই অসম্পৃক্ততা P-তরঙ্গের বেগ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করে, কিন্তু S-তরঙ্গের উপর এর প্রভাব অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। সুতরাং বেগের অনুপাত v_p/v_s হ্রাস পায়। ছিদ্র চাপ কমতে কমতে এমন অবস্থা হয়, যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে জল প্রবাহের হার শিলার আয়তনের বৃদ্ধির হার-অপেক্ষা বেশী হয়। এ অবস্থায় ছিদ্রগুলি ক্রমশঃ সম্পৃক্ত হতে থাকে। সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চাপও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে P-তরঙ্গের বেগ তথা বেগের অনুপাত v_p/v_s বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মানে উপনীত হয়। এর পর ছিদ্র চাপ একটি নির্দিষ্ট মানে (Critical value) পৌঁছুলে তা ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে. ডিলাট্যান্সির ফলে ছিদ্র চাপ হ্রাস পাওয়ায় ভূমিকম্প বিলম্বিত হচ্ছে এবং ছিদ্র চাপ পুনরায় নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে তা ভূমিকম্প সৃষ্টি করছে। এই দুই ঘটনার মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয়, তা চ্যুতি অঞ্চলে জল-প্রবাহের হারের উপর নির্ভরশীল। জল-প্রবাহের হার আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিলাঅঞ্চলের আকারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং v_p/v_s অনুপাতের অস্বাভাবিকতার স্থায়িত্বের পরিমাণ এবং ভূমিকম্পের পরিমাণের মধ্যে স্পষ্টতঃই একটি সম্পর্ক বিদ্যমান।

ডিলাট্যান্সির ফলে শুধু যে P-তরঙ্গের বেগের পরিবর্তন হয় তাই নয়, ফোকাস অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রোধ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। শিলার তুলনায় জলের পরিবাহিতা বেশী। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, ডিলাট্যান্সির সুরু থেকে ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত উৎস অঞ্চলের বৈদ্যুতিক রোধ হ্রাস পেতে থাকবে। বাস্তবিকই গর্ম অঞ্চলে কয়েকটি ভূমিকম্পের আগে বৈদ্যুতিক রোধের উল্লেখযোগ্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

শিলার আয়তন বৃদ্ধির ফলে স্থলভাগের উন্নতি বা সমুদ্রতলের অবনতি হয়। এর পরিমাণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এপিসেন্টার অঞ্চলে এই উন্নতির পরিমাণ সর্বোচ্চ এবং তা ঘটে ডিলাট্যান্সি যখন প্রাথমিক বিস্তার করে, সেই সময়। যখন ডিলা-

ট্যান্সির প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে জল-প্রবাহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই উন্নতি কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়। জাপানে 1964 সালে Niigata ভূমিকম্প (মান 7·5) হবার আগে 1958 সালে থেকে সুরু করে স্থলভাগ দ্রুত প্রায় 5 সেন্টিমিটার উন্নীত হয়।

1966 সালে রাশিয়ার তাসখন্দে যে ভূমিকম্প হয়, তার আগে ভূমিকম্প অঞ্চলে অবস্থিত একটি গভীর কূপের জল পরীক্ষা করে জলে র‍্যাডনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পেতে স্বাভাবিক পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ হতে দেখা গিয়েছিল। ভূমিকম্প না হওয়া পর্যন্ত জলে র‍্যাডনের এই উচ্চ পরিমাণ বজায় ছিল। এটিও ডিলাট্যান্সির ফল। (শিলা, খনিজ পদার্থ প্রভৃতিতে যে সামান্য ইউরেনিয়াম থাকে, তা বিয়োজিত হয়ে র‍্যাডন সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট র‍্যাডনের কিছু অংশ শিলা, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে আসে। এই র‍্যাডনই কূপের জলে পাওয়া যায়।)

একটি বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট থেকে মাঝারি আকারের ভূমিকম্প অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম হয়। 8 মানের একটি ভূমিকম্প হবার আগে প্রায় 20 বছর স্থানটি মোটামুটি শান্ত থাকে। ঘটনাটি ডিলাট্যান্সির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ডিলাট্যান্সির ফলে ছিদ্র চাপ হ্রাসের জন্যে ভূমিকম্প অঞ্চল কঠিনতর হয়। ফলে সেখানে কম্পন হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়ে। Blue Mountain Lake-এর ভূমিকম্পের (মান 3) পূর্বেও খুব ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেতে দেখা যায়।

ভূমিকম্পের পূর্বে যে সব অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তার স্থায়িত্ব ভূমিকম্পের মান বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ফলে অস্বাভাবিকতার স্থায়িত্ব নির্ধারণ করলে পরবর্তী ভূমিকম্পের সম্ভাব্য মানের পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ডিলাট্যান্ট অঞ্চলের (Dilatant zone) (অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে এমন শিলা অঞ্চলের) আকার নিরূপণ করলেও আগামী ভূমিকম্পের মানের পূর্বাভাস পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ভূমিকম্পের সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত ডিলাট্যান্ট অঞ্চলের আকার এবং আগামী ভূমিকম্পের মানের মধ্যে কোন স্থির সম্পর্ক পাওয়া যায় নি।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের জন্যে যে সব ঘটনা কাজে লাগানো যেতে পারে, তার মধ্যে বেগের অনুপাত (v_p/v_s) পরিবর্তনটিই ভূমিকম্পের সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী আশার সঞ্চার করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে v_p/v_s অনুপাত স্বাভাবিক মানে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিকম্প হয় না, হয় কিছু পরে। এই বিলম্বের সঙ্গে ভূমিকম্পের মানের সম্পর্ক আছে বলে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন। কিন্তু কোন সম্পর্ক এখনও নির্ণীত হয় নি।

1973 খৃষ্টাব্দের 3রা অগাষ্ট Blue Mountain Lake-এ যে 2·6 মানের ভূমিকম্প হয়, তার পূর্বাভাস v_p/v_s অনুপাত পদ্ধতির সাহায্যে দু-দিন আগে 1লা অগাষ্ট করা হয়। ঐ পূর্বাভাসে ভূমিকম্পের মান 2·5-3 হবে বলে বলা হয়েছিল। 30শে জুলাই, '73 তারিখে v_p/v_s অনুপাত হ্রাস পায় এবং তা পরবর্তী 2/3 দিন স্থায়ী হয়। v_p/v_s অনুপাত স্বাভাবিক হবার প্রায় একদিন পর উক্ত ভূমিকম্পটি ঘটে।

ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণ এখনও অনেক দূরের কথা। তবে বড় ধরণের ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক ভূমিকম্পের সৃষ্টি করবার একটা সম্ভাবনা দেখা গেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, বড় জলাধার তৈরী, পৃথিবীর ভূত্বকের শিলায় জল

অনুপ্রবেশ, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা ভূমিকম্প সৃষ্টি করা হয়। জলাধার তৈরী এবং জল অনুপ্রবেশের ফলে যে ভূমিকম্প হয়, তা কখনও কখনও ধ্বংসাত্মক হলেও পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে ভূমিকম্প হয় তার প্রাবল্য বেশী নয়। এ থেকে আশা করা যায় যে, উপযুক্তভাবে তরল অনুপ্রবেশ বা পারমাণবিক বিস্ফোরণ দ্বারা কম মানের ভূমিকম্প সৃষ্টি করে টেক্টনিক চাপসঞ্জাত শক্তিকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিতভাবে মুক্ত করে বিরাট ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে।

এই বিষয় নিয়ে র‍্যানগেলির তৈলক্ষেত্রে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ঐ অঞ্চলে চারটি শূন্য তৈলকূপে প্রতি দিন 120,000 গ্যালন জল অনুপ্রবেশ করানো হয়। এর ফলে ওখানে অবস্থিত 16টি ভূকম্প নির্দেশক যন্ত্রে (Seismograph) সপ্তাহে 60টি পর্যন্ত ভূমিকম্প ধরা পড়ে। এর মধ্যে অধিকাংশই স্বল্প মানের, তবে কয়েকটির মান 3·5-এর মত হতে দেখা যায়। 1970 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে র‍্যালে ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ ঐ কূপগুলি থেকে জল বের করে নিতে থাকেন। এর পর 1971 খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, এমনকি—কয়েক সপ্তাহে একটিও ভূমিকম্প হয় নি। র‍্যালে ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ পর্যায়ক্রমে জল অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন করবার পরিকল্পনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জল অনুপ্রবেশ করলে ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিষ্কাশনের ফলে ভূমিকম্পের সংখ্যা হ্রাস হয় কিনা পরীক্ষা করা। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল উৎসাহজনক বলে র‍্যালে মন্তব্য করেন। যদি র‍্যালের পরীক্ষা সফল হয়, তাহলে আশা করা যেতে পারে যে, বিপজ্জনক চ্যুতি অঞ্চলে 12-15 মাইল ব্যবধানে কূপ খনন করে তরল অনুপ্রবেশ করিয়ে চ্যুতি অঞ্চলের বিকৃতি ক্রমে ক্রমে কমিয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের সম্ভাবনা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

কীট বনাম মানুষ

নীলাঞ্জন অধিকারী

বর্তমান দুনিয়ায় সম্ভবতঃ কীট-পতঙ্গই মানুষের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। ছোট ছোট পোকামাকড়ের বহুমুখী আক্রমণকে ঠেকাতে 'দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব' মানুষকেও হিমসিম খেতে হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation) সাম্প্রতিক হিসাব মত মানুষের মৃত্যু, পঙ্গুত্ব ও অসুস্থতার জন্যে অন্ততঃ অর্ধেক ক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গই পরোক্ষভাবে দায়ী। কারণ মানুষের পক্ষে মারাত্মক জীবাণু ও ভাইরাসের বহনকর্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই। আবার শুধু এই-ই নয়—প্রত্যেক বছর মানুষ যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে, তার অন্ততঃ পনেরো শতাংশ পোকামাকড়ের আক্রমণে বিনষ্ট হয়। এরা শুধু চাষের ক্ষেতই আক্রমণ করে না, উৎপন্ন দ্রব্যগুলি যে সব গুদামে জমা করা হয়, জীবনধারণের অন্যান্য সুবিধাগুলি পেলে সেখানেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। কয়েক জাতের পোকামাকড় আবার শস্যের দানার ভিতরে ঢুকে ভিতরের সমস্ত শাঁস খেয়ে শুধু ফাঁপা খোলাটা ফেলে রাখে। দেখা গেছে, যদি পোকামাকড়ের আক্রমণের হাত থেকে এই খাদ্যদ্রব্য বাঁচানো যায়, তবে বাঁচানো খাদ্যের

পরিমাণ অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে এই কাজ করতে যে খরচ পড়বে, তার তুলনায় বাঁচানো খাদ্যের মূল্য অনেক বেশীই হবে। আবার শুধু এই দু-ক্ষেত্রেই কীট-পতঙ্গ মানুষের শত্রুতা করে না, কাষ্ঠনির্মিত বিভিন্ন জিনিস নষ্ট করতেও এরা সমান পারদর্শী।

'কীটনাশক' বলতে কীটপতঙ্গ বিনাশ বা নিয়ন্ত্রণ করে এমন যে কোন জিনিসকে বোঝায়। কিন্তু কীটনাশক আছে বহু রকমের এবং এগুলির প্রত্যেকের কাজের ধারাও এক নয়। তাই কাজের পদ্ধতি অনুসারে এগুলির কয়েকটা বিভাগ করলে বুঝতে সুবিধা হবে।

বাড়ীতে বা গুদামে পোকামাকড় মারতে সিলিকন বা অ্যালুমিনিয়াম যৌগের মত কয়েক ধরণের খনিজ পদার্থের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। এগুলি যান্ত্রিক উপায়ে কাজ করে। কীট-পতঙ্গের দেহের চারধারে মোমের মত একরকম আবরণ থাকে। এই আবরণ জলনিরোধক এবং পোকামাকড়ের দেহের ভিতরের তরল পদার্থের ক্ষয় রোধ করে। ঐ গুঁড়া পদার্থের তীক্ষ্ণপ্রান্ত এই আবরণে ছিদ্রের সৃষ্টি করে, ফলে পোকামাকড়ের দেহের তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায় এবং ফলে তারা মারা পড়ে।

কিন্তু অধিকাংশ কীটনাশকই রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাজ করে। এগুলি পোকামাকড়ের বাঁচবার পথে বিভিন্ন উপায়ে বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রথমে তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটায়। এই ধরণের কীটনাশকেরও আবার শ্রেণিবিভাগ আছে।

রাসায়নিক কীটনাশকগুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একধরণের কীটনাশকের নাম stomach poison বা পাকস্থলী বিষ। এই শ্রেণীর কীট-নাশকগুলি তখনই কাজ করে, যখন সেগুলি কোন উপায়ে পোকামাকড়ের পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং কীট-পতঙ্গের খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করলে তবেই তারা কার্যকরী হয়।

পঙ্গপাল এবং ঐ ধরণের উদ্ভিদভোজী অন্যান্য পোকামাকড়কে গাছপালায় পাকস্থলী বিষ দিয়ে বিনাশ করা যায়, এই ধরণের কীটনাশকগুলি কীটের অন্ত্রের আবরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কীটের দেহের ভিতরে শোষিত হয়ে ক্ষতিসাধন করে। পিঁপড়ে বা আরশোলা মারতে বিষাক্ত খাদ্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন আকর্ষণীয় খাবারে কীটনাশক মিশিয়ে উপযুক্ত স্থানে ফেলে রাখলে পিঁপড়ে ও আরশোলা ঐ বিষাক্ত খাবার খেয়ে মারা পড়ে। কিন্তু কয়েক ধরণের পোকামাকড় আছে, যারা গাছপালার পাতা বা অন্যান্য খাদ্য খায় না, শোষক নলের সাহায্যে খাদ্যের রস শোষণ করে। এদের আগের উপায়ে মারা যায় না, কারণ এরা বিষাক্ত খাদ্য চিবিয়ে খায় না।

নতুন একধরণের কীটনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে, এদের নাম systemic insecticides। এই ধরণের কীটনাশকগুলিকে (যেমন systox) গাছপালা শোষণ করে নেয় এবং গাছের দেহরসের সঙ্গে এরা মিশে যায়। এতে গাছের নিজের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু শোষক পোকামাকড়গুলি (যেমন—aphids) ঐ বিষাক্ত রস শোষণ করার ফলে মারা পড়ে। পাকস্থলী বিষও খাদ্যশস্যের উপর সাধারণতঃ গুঁড়া বা তরল-স্প্রে হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। বয়ন-শিল্পের উল বা ঐ ধরণের পদার্থগুলিকে মথ আক্রমণমুক্ত করতে পাকস্থলী বিষ ব্যবহার করা হয়।

আরেক ধরণের রাসায়নিক কীটনাশক হলো স্পর্শ বিষ। এগুলি কীট-পতঙ্গের দেহের সংস্পর্শে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দেয়, তাদের দেহের ভিতরে ঢোকবার অপেক্ষা রাখে না। এগুলির কার্যকারিতার বেগ বিষের প্রকৃতি এবং কীটদেহের নরম আবরণ ভেদ করবার ক্ষমতার

উপর নির্ভর করে। স্পর্শ বিষ আবার পাকস্থলী বিষ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি উদ্বায়ী এবং বাষ্পীভূত হয়ে গ্যাসীয় কীটনাশকের মত কাজ করে। স্পর্শ বিষ কয়েক রকম ভাবে ব্যবহার করা যায়। বাড়ীতে ব্যবহার্য কীটনাশকগুলি সাধারণতঃ কয়েকটা স্পর্শ বিষ বিশিষ্ট যৌগের মিশ্রণ। এইরকম কীটনাশকের কণাগুলি স্প্রে করবার পর কীট-পতঙ্গকে স্পর্শ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আবার সব রকম স্পর্শ কীটনাশকই সমান বেগে কাজ করে না। কোনটা হয়তো দু-রাউণ্ডের মধ্যেই পোকাকে 'নক-ডাউন' করে ফেলে, কিন্তু রেফারী 'দশ' গোণার আগেই পোকাটি উঠে পড়ে, কীটনাশকটি তাকে আটকাতে পারে না। আবার আর এক ধরণের কীটনাশক কয়েক রাউণ্ড ধরে ক্রমাগত 'জ্যাব' ও 'পাঞ্চ'-এ পোকাকে দুর্বল করে এনে শেষ রাউণ্ডের মাথায় চরম আঘাতে তাকে 'নক আউট' করে ফেলে। বাড়ীর কীটনাশকগুলির মধ্যে এই দুটি ধর্মেরই সমন্বয় দেখা যায়, এতে পোকা খুব তাড়াতাড়ি 'নক-আউট' হয় এবং মরতেও দেরী করে না। স্পষ্টতঃই এই ধরণের কীটনাশক একমাত্র কীটের উপস্থিতিতেই প্রয়োগ করা যায়। এক ধরণের স্পর্শ কীটনাশকের গুঁড়া বা তরল-স্প্রে কীট-পতঙ্গের বাসায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেগুলি বেশ কিছুটা সময় ধরে কার্যকর থাকে। এগুলিকে বলা হয় স্থায়ী কীটনাশক। গ্রীষ্মমণ্ডলের বাড়ী-গুলির এই ধরণের কীটনাশক দেয়ালে বসে থাকা মশামাছি মারতে ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের কণাগুলি পতঙ্গের পা, স্নায়ু এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সরঞ্জামগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

কোন কীটনাশক যত বেশী উদ্বায়ী হয়, সেগুলির স্থায়িত্বও তত কম হয়। তবে গ্যাসীয় কীটনাশকের অনেক সুবিধাও আছে। এগুলি আক্রান্ত সামগ্রীর খুব ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করে, যা কঠিন বা তরল কীটনাশক পারে না। তারপর সমস্ত কীট-পতঙ্গের (যেমন শস্যদানার পোকা) বাঁচবার পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের মেরে ফেলে। গুদামজাত পদার্থের ক্ষেত্রে গ্যাসীয় কীটনাশক খুব কার্যকরী। যে স্থানকে কীটমুক্ত করতে হবে, তাকে গ্যাস-প্রুফ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে না যায়। গ্যাসীয় কীটনাশক প্রয়োগ করবার পর ঐ চাদর দিয়ে স্থানটা ঢেকে দেওয়া হয়। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে চাদর সরিয়ে নেওয়া হয়। ঐ নির্দিষ্ট সময় আবার স্থানীয় তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। আশপাশের লোকজন সরিয়ে দিয়ে ঐ চাদর সরিয়ে নেওয়া হয় এবং জায়গাটা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। আস্তে আস্তে সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে যায়। ঐ জায়গায় কোন জীবন্ত পোকামাকড় বা বিষাক্ত গ্যাস অবশিষ্ট থাকে না। এইভাবে কিন্তু কোন জায়গা স্থায়ী-ভাবে পোকামাকড়মুক্ত করা যায় না। বিষাক্ত গ্যাসের কোন অবশেষ থাকে না বলে পরক্ষণেই আবার নতুন কীট-পতঙ্গ এসে জুটতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে গ্যাসীয় কীটনাশকের পর কঠিন বা তরল স্থায়ী কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্যাসীয় কীটনাশকের মধ্যে মিথাইল ব্রোমাইড (CH_3Br), হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) উল্লেখযোগ্য। গ্যাসীয় কীটনাশকগুলি প্রত্যেকেই মারাত্মক বিষাক্ত।

তাই কেবল শিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ লোক ছাড়া আর কারও এদের ব্যবহার করা উচিত নয়। ছোটখাটো জায়গায় কীটনাশক ছড়াতে ছোট ছোট স্প্রেয়িং মেশিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিরাট বিরাট চাষের ক্ষেত ও বাগানে একাজ করতে ট্র্যাক্টর বা হেলিকপ্টার অধিকতর উপযোগী। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে প্লেনের

সাহায্যে বিস্তীর্ণ এলাকার উপর কীটনাশক গুঁড়া বা তরল ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

কীটনাশক যৌগসমূহ

বছর তিরিশেক আগেও মাত্র কয়েকটাই কীটনাশক যৌগ ব্যবহার করা হতো। এগুলি মধ্যে আবার বেশীর ভাগই ছিল ডেরিস (Derris), নিকোটিন (Nicotine) প্রভৃতির মত উদ্ভিদজাত পদার্থ। আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগও পোকামাকড় বিনাশের কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এগুলি প্রত্যেকেই মারাত্মক বিষ এবং মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীর পক্ষেও ক্ষতিকর। একটা আদর্শ-কীটনাশকের যে সব গুণ থাকা উচিত, তা হলো, এটা ছোটখাটো পোকামাকড়ের পক্ষে মারাত্মক হবে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে একেবারেই ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু এরকম কোন কীটঘ্ন আজও আবিষ্কৃত হয় নি। পাইরিথ্রাম (Pyrethrum) নামক ফুল থেকে পাইরিথ্রিন (Pyrethrin) নামে এক রকম কীটনাশক ওষুধ বেরিয়েছিল বেশ কিছু দিন আগেই। এটা খুব তাড়াতাড়ি কীট-পতঙ্গকে 'নক ডাউন' করে, কিন্তু সবসময় মেরে ফেলতে পারে না। তবুও বাড়ীতে ও খাদ্যদ্রব্যের গুদামে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে, কারণ কীট-পতঙ্গদের মারতে যে মাত্রায় ব্যবহার করা হয়, তা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

আদর্শ কীটঘ্ন আবিষ্কারের চেষ্টায় অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার পর 1930 সাল নাগাদ যখন D.D.T. (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) আবিষ্কৃত হলো তখন মনে হলো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। D. D. T. কীট-পতঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক। অন্যান্য কীটনাশকের মত মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রথমে সবাই ভেবেছিল কীটবিনাশের জন্যে যে মাত্রায় D. D. T. প্রয়োগ করা হয়, তা মানুষের পক্ষে একেবারেই ক্ষতিকর নয়। তাই বিভিন্ন দেশে D. D. T.-র ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হলো এবং মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল যে, D. D. T. স্নেহজাতীয় পদার্থে সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং মানুষের শরীরে একবার অল্প পরিমাণে ঢুকলেও স্নেহপদার্থে দ্রবীভূত হয়ে সঞ্চিত হয়, ফলে সহজে বেরোতে চায় না। এদিকে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মানবদেহে অল্প পরিমাণে D. D. T. জমতে জমতে ক্রমে বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেখা গেছে গরু, হাঁস বা মুর্গীর শরীরে D. D. T. ঢুকলে তাদের দুধ ও ডিমেও D. D. T. থাকে। সুতরাং D. D. T. নানা দিক থেকেই মানবস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই D. D. T.-র ব্যাপক ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের পরিমাণের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। D. D. T.-র আবিষ্কারের পর লিনডেন (Lindene-benzene-hexachloride), অ্যালড্রিন (Aldrin), ডায়েলড্রিন (Dieldrin) প্রভৃতি কীটনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি প্রত্যেকেই chlorinated hydrocarbon (অর্থাৎ, যে হাইড্রোকার্বনের কয়েকটি বা সবগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুই ক্লোরিনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে)। এরা কীটনাশক হিসেবে গ্যাসীয় বা চূর্ণ অথবা স্প্রে যে কোনরূপেই খুব কার্যকরী। তবে এগুলি মানবদেহের পক্ষে D.D.T.-র চেয়েও ক্ষতিকর।

D. D. T. বা অন্যান্য কৃত্রিম কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। দেখা গেছে—মশা, মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের মধ্যে কীটঘ্ন প্রতিরোধক একরকম শক্তি গড়ে উঠেছে। আগে অল্পপরিমাণে ওষুধ

প্রয়োগেই যে সব পোকামাকড় মরতে দেরী করতো না, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করলেও তারা দিব্যি হজম করে নিচ্ছে, মরবার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। এই প্রতিরোধশক্তি নিয়ে গবেষণার ফলে দেখা গেছে, ঐ সব কীট-পতঙ্গের দেহে এমন এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হয়েছে, যা কীটের কোন ক্ষতি করবার আগেই কীটনাশককে নষ্ট করে ফেলে। দেখা গেল এই উপসর্গ দূর করবার তিনটি উপায় আছে—

(1) কীটনাশক প্রয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া, (2) কীটের দেহে ঐ অদ্ভুত রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের উপায় বিনষ্ট করা এবং (3) নতুন ধরণের কীটনাশক ব্যবহার করা। প্রথম সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া হলো, কারণ বিষের পরিমাণ বাড়ানো হলে মানুষ নিজেই তো আক্রান্ত হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা, অনেক গবেষণার পর বহু নতুন কীটঘ্ন জন্ম নিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফস্‌ফরাসের জৈব যৌগগুলি, যেমন diazion এবং malathion। এগুলি মানুষের পক্ষেও বিপজ্জনক, তবে malathion অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং গুদামজাত খাদ্যশস্যকে কীটবিমুক্ত করবার জন্যে চূর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর পরেও বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের মধ্যে প্রতিরোধশক্তি ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এবং অনেক কীটনাশকই এর ফলে অকেজো হয়ে পড়ছে। ফলে নতুন নতুন কীটঘ্নের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়ছে।

বাজারে ছাড়া পাবার আগে প্রত্যেক কীটনাশককেই বহু কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। পাশ করবার প্রাথমিক শর্ত হলো অল্প মাত্রাতে ব্যবহারের ফলেই এদের পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে কার্যকর হতে হবে। প্রথমে কোন আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কোন বিশেষ কীটের উপর কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়। এবার দেখা হয় অন্যান্য প্রাণী এবং গাছের উপর তার প্রতিক্রিয়া কি—বিশেষ করে স্থায়ী কীটনাশকের সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ থাকবার পর। এছাড়াও দেখা হয়, কীটনাশক প্রয়োগে খাদ্যদ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় কি না। আবার রসায়নাগারের ছোটখাটো পরীক্ষার পর মানবসমাজে কোন কীটনাশকের ব্যাপক প্রয়োগের ফল পরীক্ষা করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। দেখা হয়—এই কীটনাশকের প্রয়োগ কতখানি কম খরচে করা যায় এবং এর প্রয়োগে মানুষ আদৌ কোন উপকার পাবে কি না।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক যেন কৃষিকাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী পোকামাকড় বিনষ্ট না করে। কীটনাশককে এক্ষেত্রে বেছে বেছে কীট বিনাশ করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব নয়। এখানেই জীববিদ্যার সাহায্যে কীটনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির কাছে কীটনাশকের পরাজয়। জীব-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সৈন্য বা উপকারী পোকামাকড়কে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বিনাশে নিয়োগ করা ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক বেশী উপযোগী, যদিও কীটনাশক প্রয়োগের থেকে এই পদ্ধতিতে কাজ স্বভাবতঃই অনেক মন্থর। এই প্রক্রিয়ায় কীট নিয়ন্ত্রণ করলে কোন অবাঞ্ছনীয় বিষাক্ত অবশিষ্ট থাকবার আশঙ্কা থাকে না। ফলে এই পদ্ধতি মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীর দেহের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভবিষ্যতে এই পথেই কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যাপকতর করবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কীটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক অভিনব সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। গত কয়েক দশকে কীটনাশক-বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে নানা ধরণের নতুন নতুন কীটঘ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব কীটঘ্নের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে কৃষি-খামারের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, সেই সঙ্গে মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব

ও খাদ্যদ্রব্য অনেক বেড়েছে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, কীট-পতঙ্গের দেহে অদ্ভুত প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠবার ফলে কীটনাশক আর আগের মত কার্যকর হচ্ছে না। তাছাড়া বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার মানবদেহের উপরেও নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই কীট নিয়ন্ত্রণের নতুন উপায় উদ্ভাবনের জন্যে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে ও বর্তমানেও চলছে। গত কয়েক বছরে এই সব গবেষণার ফলে কীট-পতঙ্গ বিনাশের কতকগুলি নতুন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এই সব নতুন উপায়ে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষের শরীরে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। এদের মধ্যে একটা পদ্ধতি খুব সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। এই অভিনব পদ্ধতিটি হলো রাসায়নিক গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ।

নতুন পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য হলো এ দিয়ে পোকামাকড়ের নিজস্ব অস্ত্রের সাহায্যেই তাদের কাবু করা হয়। অনেক কীট-পতঙ্গ তাদের খাবার খোঁজা, সঙ্গী বেছে নেওয়া এবং ডিম পাড়বার জন্যে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নেওয়া প্রভৃতি কাজে নানা রকম গন্ধের সাহায্য গ্রহণ করে। তাদের এই আচরণকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবহার্য গন্ধই ব্যবহার করে মানুষ অনিষ্টকর কীট-পতঙ্গকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত গন্ধওয়ালা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে অবাঞ্ছনীয় পোকামাকড়কে একটা যুৎসই কীটনাশক ছড়ানো জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা যায়। একইভাবে স্ত্রী-কীটকে এমন জায়গায় ডিম পাড়তে প্ররোচিত করা যায়, যেখানে সদ্যোজাত লার্ভা খাদ্যের অভাবে মারা পড়বে। এইভাবে কীট-নিয়ন্ত্রণের খরচ অনেক কমিয়ে ফেলা গেছে এবং মানবদেহে এই পদ্ধতির কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

খাদ্যদ্রব্যের আকর্ষণ

দেখা গেছে, পোকামাকড় গাছের পাতা, বীয়ার, রাম, চিনিজাত দ্রব্য, শস্য, মজে-যাওয়া কলা, মাছ—এ সবের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে খাবার খুঁজে নেয়। কৃত্রিম উপায়ে কোথাও খাবারের গন্ধ ছড়িয়ে দিলে তার আকর্ষণে পোকামাকড় সেই জায়গায় এসে জড়ো হয়। তাই এই সব খাবারের গন্ধের সাহায্যে লোভ দেখিয়ে পোকামাকড়কে টেনে এনে কীটনাশকের সাহায্যে মেরে ফেলা যায়। এই কৃত্রিম খাবারের গন্ধ দু-ভাবে কাজ করে—(1) এই গন্ধের সাহায্যে পোকামাকড়কে খাবারের লোভ দেখিয়ে কীটনাশক ছড়ানো জায়গায় টেনে আনা যায়। (2) স্ত্রী-কীটকে ডিম পাড়বার সময় আকর্ষণ করা যায়, কারণ তারা চায় সদ্যোজাত লার্ভা বেড়ে ওঠবার জন্যে উপযুক্ত খাবার পাক। তারা এই গন্ধকে ভাল খাবারের গন্ধ বলে ভুল করে মানুষের ইচ্ছামত এমন জায়গায় ডিম পাড়ে, যেখানে লার্ভা অনাহারে মরে। তবে খাদ্যদ্রব্য থেকে পাওয়া রাসায়নিক গন্ধদ্রব্যগুলি খুব একটা কার্যকর নয়। কারণ এরা খুব কম সময়ের জন্যেই কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করতে পারে। আবার পোকামাকড়কে যে আকর্ষণ করবেই এমন কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাছাড়া এরা যে শুধু ক্ষতিকর কীটকেই আকর্ষণ করবে এমনও কোন কথা নেই। মানুষের উপকারী পোকামাকড়কেও এরা টেনে আনে আর কীটনাশকের সংস্পর্শে এসে তারাও মারা পড়ে। এই ধরণের আকর্ষকগুলির মধ্যে অ্যামোনিয়া, কয়েক ধরণের অ্যামাইন, স্নেহজাত দ্রব্য এবং সালফাইড উল্লেখযোগ্য।

ফেরোমোন

বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ সঙ্গী খোঁজবার সময় এক রকম গন্ধযুক্ত পদার্থ দেহ থেকে নিঃসৃত

করে। এই গন্ধযুক্ত আকর্ষকের নাম ফেরোমোন (Pheromone)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী-কীট পুরুষ কীটকে এবং কোন কোন প্রজাতির পুরুষ কীটও স্ত্রী-কীটকে আকর্ষণ করবার জন্যে এই রাসায়নিক সঙ্কেত ব্যবহার করে। আর সেই সঙ্কেতে সাড়া দিয়ে বহু দূর থেকে সেই প্রজাতির কীট ছুটে আসে। আরশোলার বাসার কাছে একরকম দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এ গন্ধ ফেরোমোনের। এই ফেরোমোন জীব-বিজ্ঞানে সবচেয়ে সক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এমনকি খুব লঘু অবস্থায় ব্যবহৃত ফেরোমোনও কীট-পতঙ্গের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম।

ফেরোমোনের আবিষ্কর্তা ফরাসী প্রকৃতিবিদ্ আঁরি ফাব্র্‌ (Henri Fabre)। একবার তিনি একটি স্ত্রী-মথকে কাপড়ের খাঁচায় ভরে জানালার কাছে ঝুলিয়ে রাখেন। পনেরো ঘন্টার মধ্যে ঐ জাতের ষাটটি পুরুষ মথ খাঁচার চারপাশে জড় হলো। পুরুষ মথগুলি কিসে আকৃষ্ট হলো—দেখতে গিয়ে তিনি কয়েকটি পরীক্ষা করেন। একটি বদ্ধমুখ পাত্রে তিনি যখন স্ত্রী-মথটিকে রাখলেন, দেখা গেল—বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও কোন পুরুষ মথ হাজির হলো না। কারণ পাত্রের ভিতরের কোন গন্ধ বাইরে আসবার উপায় ছিল না। আর একটি খোলা পাত্রে মথটিকে রাখবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ মথকে সেটা আকৃষ্ট করলো। এই পরীক্ষাগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো স্ত্রী-মথটি কোন রকম গন্ধের সাহায্যেই পুরুষ মথগুলিকে আকৃষ্ট করেছিল। যদিও ফাব্র্‌ নিজে এটা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, গন্ধ অতদূর থেকে কীটকে আকর্ষণ করতে পারে।

অনুরূপভাবে কোন কোন প্রজাতির পুরুষ কীটও ফেরোমোনের সাহায্যে স্ত্রী-কীটকে আকর্ষণ করতে পারে। আবার ফেরোমোনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—কোন দুই প্রজাতির কীটের ব্যবহৃত ফেরোমোন এক ধরণের হয় না। প্রত্যেকেই আলাদা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। যেমন দু-জন মানুষের আঙুলের ছাপ কখনও এক হয় না। এই বৈশিষ্ট্যটি আবার ফেরোমোনের সাহায্যে কীট-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা করে দিয়েছে।

ফেরোমোনের অস্তিত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কীট-পতঙ্গের নিজস্ব যোগাযোগ সাধনের মাধ্যমকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হলো। এর মাধ্যমে কীট-নিয়ন্ত্রণও অনেক সহজসাধ্য হয়ে পড়ল। অনেক গবেষণার পর মানুষ কৃত্রিম ফেরোমোনও তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এখন মানুষ যদি কৃত্রিম ফেরোমোন ব্যবহার করে, তাহলে কি হবে? এভাবে অনায়াসেই ক্ষতিকর কীটকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। এখন তো তাদের নিয়ে মানুষ যা খুশী করতে পারে। ফেরোমোনকে দু-ভাবে কীটবিনাশে ব্যবহার করা যেতে পারে: (1) কোন জায়গা থেকে সাধারণ ঘনত্ববিশিষ্ট ফেরোমোন ছড়িয়ে কীটকে সেদিকে আকৃষ্ট করে কীটনাশকের সাহায্যে তাদের বিনাশ করা যায়। (2) খুব বেশী ঘন ফেরোমোন বাতাসে ছেড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যে, সাড়া দেবার সঙ্গে কীটগুলি কম ঘনত্বের প্রাকৃতিক ফেরোমোনের অস্তিত্ব বুঝতে পারে না এবং সাড়াও দিতে পারে না। এক্ষেত্রে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক প্রজাতির কীটের ব্যবহৃত ফেরোমোন স্বতন্ত্র বলে যে কীটকে বিনাশ করতে হবে, সেই প্রজাতির কীটের উপযুক্ত বিশেষ ফেরোমোনটি ব্যবহার করতে হয়।

প্রথম ক্ষেত্রে ধরা যাক কোন বিশেষ প্রজাতির কীট আমাদের খুব ক্ষতিসাধন করছে। এদের মারা দরকার। এখন আমরা যদি ঐ প্রজাতির কীটের ব্যবহার করা বিশেষ ধরণের ফেরোমোনটি কীটদেহ থেকে সংগ্রহ করে বা কৃত্রিমভাবে

তৈরী করে, কোন স্থানে ছড়িয়ে দেই, তবে তা স্বভাবতঃই ঐ শ্রেণীর কীটকে আকৃষ্ট করে সেখানে ঠেলে আনবে। ঐ স্থানে কীট জড়ো হবার পর তাদের উপযুক্ত কীটনাশক দিয়ে বিনাশ করা তো কিছুই অসুবিধাজনক নয়। ফেরোমোনের সুবিধা হলো—মানবদেহের উপর এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। আর উপকারী কীট-পতঙ্গকেও সে আকৃষ্ট করে টেনে আনে না, যদি না আমরা ঐ বিশেষ কীটের ব্যবহার্য ফেরোমোন ব্যবহার করি। আবার উপযুক্ত ফেরোমোনের সাহায্যে যে কীটকে আমরা বিনাশ করতে চাই, সহজেই তাকে টেনে আনা সম্ভব।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পোকামাকড়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাওয়ায় খুব ঘন কৃত্রিম ফেরোমোন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ বিশেষ ফেরোমোন যে বিশেষ প্রজাতির কীটের—তারা ঐ ঘন ফেরোমনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নিজেদের যোগাযোগের জন্যে প্রচলিত লঘু ফেরোমোন তাদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না। ফলে তাদের পক্ষে সঙ্গী নির্বাচন করাও সম্ভব নয়।

সিগারেট-অধীনতা

প্রদীপকুমার রাহা*

কে না জানে যে, ফুসফুসে কর্কট রোগের হার ধূমপানকারীদের মধ্যে অনেক বেশী এবং তা প্রায় সন্দেহাতীতভাবেই বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য কত রোগই আছে, যা ধূমপানকারীদের মধ্যেই সমধিক সূচিত হয়েছে। নিবন্ধের অন্য অংশে তা বর্ণিত হয়েছে। সমাজের প্রতি স্তরের মানুষকে আজ যখন আমরা সিগারেট খেতে দেখি, তখন আমরা ভেবে দেখি না ধূমপানকারী শারীরিক ক্ষতির বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে কেন তিনি এই অভ্যাসের দাস হলেন? আনুষঙ্গিক আরও অনেক প্রশ্নই আছে, তারই কিছু কিছু উত্তর এই নিবন্ধে সন্নিবেশিত হলো।

সমীক্ষায় জানা গেছে যে, এক জন যৌবনোন্মুখ প্রতিদিন যদি একটির বেশী সিগারেট খায়, তবে শতকরা 85 ভাগ ক্ষেত্রেই তার নিয়মিত ধূমপায়ী হয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং মাত্র শতকরা 15 ভাগ পরবর্তী জীবনে চিরতরে সিগারেট বর্জন করতে পারে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সিগারেট-অধীনতা এক ব্যাধির আকারেই আমাদের সমাজ জীবনে বিস্তার লাভ করেছে। এই রচনায় সিগারেট ছাড়া অন্য কোন ধূমপান বিষয়ে আলোচনা করা হয় নি, তাই ধূমপান উল্লেখে সিগারেট সম্বন্ধীয় বলেই ধরতে হবে।

'কেন সিগারেট খান?'—এই প্রশ্ন করলে তিন ধরণের উত্তর পাওয়া যায়। 'খুব সম্ভব অভ্যাসের জন্যে', 'স্নায়ুগুলিকে শান্ত করে' কিংবা 'মনঃসংযোগে সাহায্য করে।' কেউই এমন জোর গলায় বলতে পারবেন না যে, প্রতিটি সিগারেটই তিনি উপভোগ করেন। তবু তিনি ধূমপান করেন, কিন্তু কেন?

সিগারেটপায়ীদের নানানভাবে ভাগ করা যায়, যেমন—গুরু ও লঘু, গভীর বা অগভীর বা নিয়মিত ও অনিয়মিত ধূমপায়ী। আগের এই বিভাগের পাশাপাশি ইদানীংকালে সিগারেট খাওয়ার

*প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা-4।

প্রেরণার উপর ভিত্তি করে আরও একটি ভাগ করা হয়েছে—(1) মানসিক, (2) অনুভব সম্বন্ধীয়, (3) ওষুধ সম্বন্ধীয় (Pharmacological)। মানসিক কারণে সিগারেট খাওয়ার অন্যতম প্রয়োজন সমাজে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাঁরা মনে করেন, এর সঙ্গে শক্ত মানুষের অভিপ্রেত ছায়াও তাঁদের উপর পড়ে। স্বাদ, গন্ধ ছাড়াও লোককে দেখানো, দুটি আঙুলে সিগারেট ধরবার মধ্য দিয়ে স্পর্শসুখের অভ্যাস সিগারেটপায়ীদের একটি অংশের সিগারেটের নেশার কারণ। ওষুধ সম্বন্ধীয় প্রয়োজন সম্ভবতঃ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যার দ্বারা সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে নিকোটিন গিয়ে প্রথম দিকে উত্তেজক ও পরবর্তীকালে শান্তিকর প্রভাব এনে দেয়। এ ছাড়াও নিকোটিনের প্রচ্ছন্ন মানসিক আনন্দ দেবারও ক্ষমতা রয়েছে। এসব সত্ত্বেও ধূমপানকারীদের সঠিক বিভাগ করা কঠিন—কেন না, যাঁরা ধোঁয়া টেনেই ছেড়ে দেন তাঁরা খুব সামান্য নিকোটিনই সিগারেট থেকে আহরণ করেন এবং এই দলভুক্তদের সংখ্যাও খুব সামান্য নয়। এই কারণে ধূমপানকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(1) অনুভব সম্বন্ধীয় ধূমপান—এক্ষেত্রে নিকোটিন অধিগ্রহণ প্রায় হয় না এবং ধূমপায়ীদের প্রথম জীবনেই এরূপ ধূমপান প্রচলিত। বন্ধুবান্ধবদের কাছে ব্যক্তিসত্তার প্রমাণ দেবার বাসনার থেকে ও সামাজিক জমায়েতেই সাধারণতঃ এই ধরণের ধূমপান করা হয়। এই অনুভব সম্বন্ধীয় ধূমপান অনেক দিনের পুরনো হলে তখন আস্তে আস্তে নিকোটিনের প্রয়োজন দেখা দেয় ও আগের শ্রেণিবিভাগে ওষুধ সম্বন্ধীয় দলে তাঁরা পড়ে যান।

(2) চরিতার্থতাহেতু ধূমপান। এই ধরণের ধূমপান নেহাতই আনন্দ পাবার জন্যে এবং খবরের কাগজ পড়বার সময়, গান শোনবার সময়, ইদানীংকালে টেলিভিসন দেখবার সময় একটি সিগারেট ধরালে কিছু লোক খুশী হন। এঁরা চা, কফি বা মদ্যপানের সময় সাধারণতঃ সিগারেট খান। যখন কাজে খুব ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁরা ধূমপান করেন না ও দু-তিন ঘণ্টা বা ততোধিক সময় ধূমপান না করে অনায়াসেই এঁরা কাটাতে পারেন।

(3) প্রশান্তিহেতু ধূমপান—চিন্তাভাবনার থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিকোটিনের প্রয়োজনেই প্রধানতঃ এই ধরণের ধূমপান করা হয়। সিগারেট হাতে ধরে ও আঙুলের মধ্যে ঘোরালে বা দুই ঠোঁটের মধ্যে রাখলেও এক ধরণের অনুভূতি হয়, যা চিন্তাধারণা থেকে খানিকটা রেহাই দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে বলেছেন।

(4) উত্তেজক ধূমপান—ক্লান্তি উপশমের জন্যে নিকোটিনের উত্তেজক প্রভাবের সাহায্য নেওয়াই এই জাতীয় ধূমপানের উদ্দেশ্য। বলা হয় যে, কোন বক্তৃতা দেবার আগে, পরীক্ষার অব্যবহিত আগে, দূরপাল্লার মোটর গাড়ী চালাবার সময় উত্তেজনায় প্রয়োজনে ধূমপান করা বহুল প্রচলিত। এসব সময়ে ঘন ঘন সিগারেট খাওয়ার ঘটনা আমাদের প্রায়ই চোখে পড়ে।

(5) আসক্তিজনিত ধূমপান। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পনেরো বা কুড়ি মিনিট ধূমপান না করলেই অস্বস্তি দেখা দেয়। দিনের কাজকর্মের সঙ্গে এই ধূমপানের কোন সম্বন্ধ থাকে না; এই দলে যাঁরা পড়েন, তাঁরা সকালে ঘুম থেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সিগারেট ধরান, আর রাত্রে ঘুমাবার আগে পর্যন্ত ধূমপানের নিবৃত্তি হয় না। এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে নিকোটিনের অধিক মাত্রা বজায় রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, নিকোটিন একটি মারাত্মক ধরণের বিষ, যার দুই-তিন ফোঁটাই মানুষের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

পৃথিবীব্যাপী সিগারেট খাওয়া রোধ করবার জন্যে অভিযান চলা সত্ত্বেও তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। ডাক্তার সমাজের বন্ধু হিসাবে ও চিকিৎসক হিসাবেও অনেক সংসারে যথেষ্ট প্রভাব রাখেন।

তাই তাঁদেরই রোগীদের উপদেশ দেবার আগে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস প্রথম বর্জন করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। ত্রিশ বছর বয়সের পর সিগারেট পরিত্যাগ করা অল্প অল্প সুরু হয় (মাত্র শতকরা 18 জন) এবং তা চলে প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত। দেখা গেছে, যাঁরা সিগারেট ছাড়তে পেরেছেন, তাঁদের কিন্তু পরবর্তী কালে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এর উপরে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শতকরা 66 ভাগ (যাঁরা ধূমপান ছেড়েছেন) বলেছেন—কোন অসুবিধা নেই এবং ছাড়তেও কোনই কষ্ট হয় নি, শতকরা 20 ভাগ লোক বলেছেন ছাড়তে কষ্ট হয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে সইয়ে নিয়েছি। বাকী শতকরা 14 জন বলেছেন যে, ছাড়তে ভীষণ কষ্ট হয়েছে এবং সম্ভবতঃ ছেড়ে থাকতে পারবো না। আশ্চর্য এই যে, সিগারেট ছেড়েও যাঁরা পরবর্তীকালে আবার সুরু করেছেন, তাঁদের শতকরা 56 ভাগ বলেছেন যে, সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে তাঁদের আদৌ অসুবিধা হয় নি।

সিগারেট বন্ধ করবার ছয় দফা কারণ পাওয়া যায়। (1) শারীরিক অসুস্থতা—উদাহরণ স্বরূপ কাশী, গলায় ক্ষত, নিঃশ্বাসের কষ্ট, অজীর্ণ ইত্যাদি বলা চলে। এ ছাড়া ফুস্‌ফুসে কর্কট রোগের আশঙ্কা তো রয়েছেই।

(2) ব্যয়াধিক্য—ছোটখাটো শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে সিগারেটের জন্যে ব্যয়াধিক্য কিছু লোককে সিগারেট ছাড়তে বাধ্য করে।

(3) সামাজিক চাপ—নিকট আত্মীয় বিশেষ করে স্ত্রীর কাছ থেকে নিত্য অভিযোগের ফলেই এই সিগারেট বর্জন।

(4) ডাক্তার, পিতা বা শিক্ষকের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁদের মতই ধূমপান না করা।

(5) মানসিক ক্ষমতার পরীক্ষা হিসাবে কিছু লোক ধূমপান বর্জন করেন।

(6) ধূমপান এক অত্যন্ত কদর্য, নোংরা অভ্যাস মনে করেও কিছু লোক ছেড়েছেন। (খুব কম লোকই যে শেষের তিনটি কারণে ধূমপান ছেড়ে দেন, তা সহজেই অনুমেয়)।

রচনার শেষে আলোচনা করি, ডাক্তারেরা কি ভাবে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে সাহায্য করতে পারেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ দিতে হবে যে, ধূমপান পরিত্যাগ করবার একমাত্র পথ—হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে তারপর ছাড়বার পদ্ধতি সব ক্ষেত্রেই বিফল হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর জন্যে যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা আহরণ নিজেকেই করতে হবে. যে কোন সদুপদেশ নিরর্থক, একথা চিকিৎসকদের বোঝাতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে যদি ধূমপায়ীদের ধূমপানজনিত শারীরিক অসুস্থতার নামগুলি জানা না থাকে, তবে অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকেরা কিছু ছোটখাটো প্রস্তাব দিতে পারেন, যেমন ধূমপানকারীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা (প্রথম কিছুদিন ঘরের বাইরে না যাওয়া) সব সময় কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত থাকা, মুখে লবঙ্গ বা ঐ জাতীয় ছোট কিছু রাখা যাতে সিগারেট না থাকবার জন্যে ঠোঁটে বা মুখে ফাঁকা ফাঁকা এক অনুভূতি না আসে। এ ছাড়া (1) লবেলিন (Lobelin) বা ভিটামিন 'সি' বড়ি নিরর্থক ভাবেই ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে—এই দেখাবার জন্যে (Placebo) দেবার প্রচলন আছে।

(2) হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান বাড়িয়ে দিয়ে সিগারেটের প্রতি একটা বিরক্তিজনিত অনাসক্তি এনে সিগারেট ছাড়তে সাহায্য করে।

(3) আত্মশাসন পদ্ধতিতে সিগারেট ছাড়বার জন্যে উপদেশ দেওয়া হয় যে, ধূমপানের ইচ্ছা হলেই একটি ছোট অন্ধকার ঘরে একটি শক্ত চেয়ারে, দেয়ালের মুখোমুখী বসলে ভাল হয়, যেন কোনভাবেই ধূমপানের পরিবেশ সৃষ্টি না হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এভাবে সিগারেট খাবার ইচ্ছাটা নষ্ট হয়ে যায়।

সংক্ষেপে এই কথাই তাই বলা যেতে পারে যে, সিগারেট একবার ধরলে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত, তবু শুধুমাত্র নিজের মনের জোরেই এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। সব দিক থেকে বিবেচনা করলে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, নানা ব্যাধির মূলে যে কু-অভ্যাস, তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

সভ্যতার প্রদীপ যাঁরা জ্বালিয়েছিলেন, অতি দূর অতীতের সেই ঋষিকল্প মানবসন্তান তাঁরা, প্রায় আক্ষরিক অর্থেই, আগুনের ব্যবহারকে সংযত করে তেলের প্রদীপ জ্বালাতে শিখেছিলেন। শুধু আশ্রয়স্থলের নিরাপত্তার জন্যে নয়, ঘন অন্ধকারে প্রদীপের সাহায্যে গৃহকর্ম নিষ্পন্ন করবার প্রশ্ন ছিল এবং আরও পরে, দিনান্তে অন্ধকার গৃহকোণে এই প্রদীপের আলোতেই শিল্প-চর্চা কিংবা জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থেকেছে। যা দাহ্য এবং দীর্ঘকাল আলো বিকিরণে সক্ষম, এমন সব পদার্থের সার্থক ব্যবহার যেন দীপশিখাকে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর করেছে, তেমনি তৈলাধারেরও ক্রমবিবর্তনে প্রথমে সঙ্কুচিতমুখ মৃণ্ময় পাত্রের এবং পরে ধাতুনির্মিত পাত্রের প্রচলন হয়েছে।

মোমবাতি তেলের প্রদীপেরই অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্করণ। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের প্রার্থনার অঙ্গ হিসেবে গীর্জার বেদীমূলে মোমবাতি জ্বালাবার রীতি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। আর কিছু দিন আগেও বিলাসবহুল গৃহসজ্জার অভিজাত-অলঙ্করণে মোমবাতির বেশ কদর ছিল। আজও যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপ রাত্রিতে বা বিদ্যুৎ-সঙ্কটে মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো শহর-বন্দরের ঘরে ঘরে প্রায় অপরিহার্য। মোমেরও ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে। চর্বি বা ওই জাতীয় দাহ্য-উপকরণের পরিবর্তে এখন পেট্রোলিয়ামজাত মোমের প্রচলন হয়েছে।

যেখানে বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছয় নি, সেই গ্রামে-গঞ্জে কেরোসিনের লণ্ঠন আজও সভ্যতার আলোটুকু জ্বালিয়ে রেখেছে। মোমবাতির মত কেরোসিনের বাতির ব্যবহারও বিদ্যুৎ-সঙ্কটে, বা অন্যান্য কারণে শহরের বহু গৃহে প্রচলিত রয়েছে।

কোল-গ্যাসের (বা কয়লা-গ্যাসের) ব্যবহার কিছু দিন আগেও কলকাতার শহরের পথঘাট আলোকিত করতো। দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পথের দু-পাশে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠতো। পাশ্চাত্যদেশে শুধু পথ নয়, গৃহাভ্যন্তরেও গ্যাসের বাতির সমাদর ছিল।

কিন্তু সব আলোর সেরা বৈদ্যুতিক আলো। সরবরাহ কেন্দ্র থেকে তারবাহিত হয়ে ঘরে ঘরে পথেঘাটে এমনকি দূরতম গ্রামাঞ্চলেও আলো বিকিরণ করছে। দিনের আলোর বিকল্প অবশ্য কিছুই নেই। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর কল্যাণে ঘন অন্ধকার রাত্রিতেও আলোক-নির্ভর সব কাজই এখন অনায়াসে করা সম্ভব।

তেলের প্রদীপ

প্রদীপ বলতে বোঝায় একটি পাত্র, এতে থাকে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ তেল এবং একটি সলতে। তেল-সিক্ত সলতের দহনে পাওয়া যায় আলো। কৈশিক বলের (Capillary action) ফলে তেল সলতের ভিতর দিয়ে উর্ধ্বে সঞ্চারিত হয়।

ফরাসীদেশে প্রস্তর যুগের মানুষের গুহায় পাথরের প্রদীপের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের খবর সম্ভবতঃ ইউরেশিয়া হয়ে উত্তর আমেরিকার এস্কিমোদের কাছেও পৌঁচেছিল।

* আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-4

কারণ, কলম্বাসের পূর্ববর্তী আমেরিকায় এরা ছাড়া আর কেউ প্রদীপের ব্যবহার জানতো না।

পাথরের তৈলাধারেরও ক্রমোন্নতি ঘটেছিল। পাথরের পরিবর্তে শঙ্খ বা শাঁখ দিয়েও যে সুন্দর প্রদীপ বানানো যায়, এই জ্ঞান যখন হলো, তখন থেকেই অনেক দেশের শঙ্খের প্রদীপ ব্যবহৃত হতে লাগলো। শঙ্খের প্রদীপ শুধু সুন্দরই নয়, অনায়াসলব্ধও বটে।

আদি মানবের পরিপার্শ্বে জল ছিল, মাটি ছিল। জল দিয়ে মাটি মেখে রোদে বাতাসে শুকিয়ে নিলে যেমন শক্ত হয়, তার চেয়ে আরও শক্ত হলো আগুনে পুড়িয়ে। কাদা-মাটির নরম তালকে সে খুশীমত আকৃতি দিল, আগুনে পোড়ালো। সভ্যতার আদিযুগের বাসনকোসন, গহনাগাঁটি, খেলনা সৃষ্টি হলো। এমন করেই মানুষ একদিন মাটির প্রদীপ তৈরী করতে শিখেছিল। বলা বাহুল্য, প্রথম দিকের প্রদীপের গঠন ছিল অনেকটা শঙ্খের প্রদীপের মতই! তারপর তার আকার ক্রমশই বদলেছে। আজও দীপাবলীর রাত্রে বা তুলসীমঞ্চে মাটির প্রদীপ তার ক্ষুদ্র আলোর শিখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মূল কথাই হলো দেখা আর ভাবা। অতীতের মানুষও নিশ্চয়ই ভাবতে পারতো, চোখ মেলে দেখতে পেত। তাই কালে কালে যুগে যুগে মাটির প্রদীপেরও অনেক উন্নতি সাধন সে করতে পেরেছে। সৌন্দর্যবোধের ক্রমবিকাশে নানা শিল্পকর্মে সৌষ্ঠব যুক্ত হয়েছে।

এরপর একদিন তামার আকরিক থেকে তামা ধাতু আবিষ্কৃত হলো। বলা বাহুল্য যে, এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ তামা উৎপন্ন হয় নি, হয়েছিল অশুদ্ধ মিশ্র-ধাতু, যাকে বলা যেতে পারে ব্রোঞ্জ। এ দিয়ে বাসনকোসন, প্রদীপ, ছুরি-ছোরা, বর্শা, তীরের ফলা প্রভৃতি সবই তৈরী করা হয়েছিল। ধাতব পাত্রে আরও উন্নত ধরণের নক্‌শা-কাটা, সূক্ষ্ম কারুকার্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হলো। মিশর, সুমের, গ্রীস, ক্রীট, ব্যাবিলন, চীন, মহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রাচীন দেশে এসবের অনেক সুন্দর সুন্দর নিদর্শন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই রকম প্রদীপই ছিল মানুষের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এই সময় কোন এক চিন্তাশীল মানুষ তেলের বাতিতে সাধারণ গোলাকার সল্‌তের বদলে চ্যাপ্টা সল্‌তে ব্যবহার করলেন। শুধু তাই নয়, ছোট্ট একটি দাঁতওয়ালা চাকার সাহায্যে এই সল্‌তে উস্‌কে দেবারও ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে অনেক বেশী আলো পাওয়া গেল। ক্রমে এর উপরে কাচের চিম্‌নি বসাবার ব্যবস্থা হলো। এইভাবে তৈরী হলো টেবিল ল্যাম্প, যা আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে আজও সমান সমাদৃত।

মোমবাতি

একটি সল্‌তে আর তাকে ঘিরে মোমের আবরণ, আকার বেলনের মত (Cylindrical), এই হলো মোমবাতি। সল্‌তের আগুন ধরিয়ে দিলে মোমের দহনের ফলে সুন্দর স্নিগ্ধ আলো পাওয়া যায়।

আগেকার দিনে, একটি ফাঁপা বেলনাকৃতি পাত্রের মধ্যে একটি সল্‌তে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মধ্যে মৌচাকের মোম গলিত অবস্থায় ঢেলে দেওয়া হতো। ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলে একে বের করে আনা হতো এবং শ্বেত-পাথরের টেবিলের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে একে ঠিক বেলনাকৃতি করে নেওয়া হতো।

তবে ইউরোপে মধ্যযুগে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে মোমবাতি তৈরী করা হতো সাধারণতঃ জান্তব চর্বি দিয়ে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ছাঁচে ঢালাই করে মোমবাতি তৈরী করবার শিল্পের সূচনা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তা তেমন প্রসার লাভ করে নি।

ফরাসী বিজ্ঞানী সেভ্রেউল তেল ও চর্বির রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে অনুশীলন করেন এবং 1820 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম চর্বির জলবিশ্লেষণ (Hydrolysis) সম্পাদন করে তা থেকে স্টিয়ারিক অ্যাসিড পৃথক করতে সক্ষম হন। সাধারণভাবে একেই স্টিয়ারিন বলা হয়। 1840 খৃষ্টাব্দে এই স্টিয়ারিক অ্যাসিড দিয়েই মোমবাতি (Stearine candle) তৈরী করা হলো। এই ধরণের বাতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হলো। মোমবাতি শিল্পও দ্রুত প্রসারলাভ করতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে নানা আকারের শিল্পসুষমামণ্ডিত দীপাধারেরও (Candle-sticks) প্রচলন হতে লাগলো। বড় বড় গীর্জায় এবং রাজা-জমিদারদের বাসগৃহের শোভা বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে তৈরী হলো নানা আকারের সুদৃশ্য সব ঝাড়লণ্ঠন বা ঝাড়বাতি (Chandelier)। উৎসব-অনুষ্ঠানে এই সব বাতিদানে শত শত মোমবাতি জ্বালিয়ে রচিত হতো অপূর্ব মায়াজাল, আলোর বন্যায় দশদিক ভেসে যেত।

পরবর্তী কালে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল আবিষ্কৃত হবার ফলে একদিকে যেমন পাওয়া গেল পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া গেল এক নতুন ধরণের মোম, যাকে বলা হয় পেট্রোলিয়ামজাত মোম (Petroleum-wax—Paraffin wax)। এর ফলে মোমবাতি-শিল্পের আরও উন্নতি হয়েছে। এখন শতকরা 90 ভাগ পেট্রোলিয়ামজাত মোমের সঙ্গে 10 ভাগ স্টিয়ারিন মিশিয়ে মোমবাতি তৈরী করা হয়। আগেকার যে কোন মোমবাতির তুলনায় এই বাতি থেকে অনেক বেশী আলো পাওয়া যায়। আর স্টিয়ারিন থাকায় এ বেশ শক্ত ও মজবুত হয়। বলা বাহুল্য, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও, গ্যাস ও বিদ্যুতের এত প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও মোমবাতির চাহিদা একটুও কমে নি।

কেরোসিনের বাতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুরু হলো পেট্রোলিয়ামের যুগ। বিজ্ঞানীরা নানা দেশে পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেল।

খনিজ পেট্রোলিয়াম নিয়ে আংশিক পাতনপ্রক্রিয়া (Fractional distillation) সম্পাদন করে স্ফুটনাঙ্ক অনুযায়ী পর পর পাওয়া যায়—গ্যাস, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল তেল, পিচ্ছিলকারী তেল, মোম ইত্যাদি। সভ্যজগতে স্বভাবতঃই এসব জিনিসের খুব চাহিদা হলো।

মলিন তেলের শতকরা প্রায় 70 ভাগ কেরোসিনরূপে পাওয়া যায়। আলোক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এই তেল ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেল। তাই সব দেশেই এর ব্যবহার হতে লাগলো।

টেবিল ল্যাম্প এবং পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হ্যারিকেন লণ্ঠনের মধ্যে বায়ু-প্রবাহ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই এগুলি জ্বলবার সময় কোন অসুবিধা হয় না। বাস্তবিক, হ্যারিকেনলণ্ঠনের গঠনপ্রণালী এরকম যে, প্রবল ঝড়-বাতাসের মধ্যেও এ-নিয়ে অনায়াসে চলা-ফেরা করা যায়, সহজে নিভে যাবার ভয় থাকে না। ইংরেজী Hurricane শব্দের অর্থ প্রবল ঝড়। সেজন্যেই এই লণ্ঠনের নামকরণ হয়েছে হ্যারিকেনলণ্ঠন (Hurricane Lantern)।

গ্যাসের বাতি

মাটির নীচে কাঁচা-কয়লা পাওয়া যায়। একটি বদ্ধ-পাত্রে কাঁচা-কয়লা নিয়ে তার অন্তর্ধূমপাতন বা শুষ্ক-আসবন-প্রক্রিয়া (Destructive distillation) সম্পাদন করলে প্রধানতঃ পাওয়া যায় কয়লা-গ্যাস (Coal gas) এবং কোক (Coke),

আর সেই সঙ্গে উপজাত দ্রব্য হিসেবে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়াযুক্ত দ্রবণ, আলকাতরা প্রভৃতি।

কোক গৃহস্থালীর কাজে জ্বালানী হিসেবে এবং ধাতু-শিল্পে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রথম-দিকে কয়লা-গ্যাস নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। তাই এই মূল্যবান গ্যাসের অপচয় হতো।

বৃটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম মার্ডকের জন্ম 1754 খৃষ্টাব্দের 21শে অগাস্ট। 1777 খৃষ্টাব্দে তিনি জেমস ওয়াটের সহকারী নিযুক্ত হন। 1792 খৃষ্টাব্দেই তিনি প্রথম কয়লা-গ্যাসের সদ্ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন। এজন্যে একটি লোহার বকযন্ত্রে (Retort) কাঁচা-কয়লা নিয়ে তার অন্তর্ধূম পাতন-প্রক্রিয়া সম্পাদন করলেন, এবং এথেকে উদ্ভূত গ্যাস কতকগুলি বায়ুরোধী (Air-tight) ব্যাগ বা থলির মধ্যে সংগ্রহ করলেন। এরূপ থলির মুখে একটি রোধনী (Stop-cock)-যুক্ত ধাতব নল জুড়ে দিলেন। এর মুখটি সরু। আঁধার রাতে কারখানা থেকে বাড়ী ফেরার পথে তিনি এরকম একটি ব্যাগ বগলদাবা করে নিতেন, আর রোধনী খুলে নলের সরু মুখে, গ্যাসে আগুন ধরিয়ে দিতেন। এতে সুন্দর আলো পাওয়া যেত, যাতায়াতের পথ সুগম হতো।

কয়লা-গ্যাস উৎপাদনের জন্যে ঐ বছরই তিনি বাড়ীতে ছোটখাটো একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং এই গ্যাস দিয়ে তাঁর ঘরবাড়ী আলোকিত করবার ব্যবস্থা করেন। এর ছয় বছর পরে তাঁরই তত্ত্বাবধানে সোহোতে (বার্মিংহাম) বোল্টন এবং ওয়াটের কারখানাটি গ্যাস দিয়ে আলোকিত করা হয়। এই প্রথম জনসাধারণের জন্যে আলোক-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা-গ্যাস ব্যবহৃত হলো। আর অল্প দিন পরেই পাইপের (বা নলের) ভিতর দিয়ে কয়লা-গ্যাস পরিচালিত করে রাস্তার আলো জ্বালাবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

কিন্তু অনেকেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। কেউ বললেন,—'সর্বনাশ! এই গ্যাসের বিস্ফোরণে শহর উড়ে যাবে, নয়তো এর সংস্পর্শে শহরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠবে।' আবার কেউ বললেন—'বাতি জ্বালাবার জন্যে এতকাল আমরা তিমিমাছের তেল ব্যবহার করেছি। গ্যাস ব্যবহার করলে তিমির তেলের চাহিদা থাকবে না। তখন তিমি-শিকারের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যেহেতু নৌ-সেনারা প্রধানতঃ তিমি-শিকারীদের জাহাজেই শিক্ষালাভ করে থাকেন, সেহেতু আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত নৌ-বাহিনীও এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

কিন্তু এই সব যুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকলো না। 1809 খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বাসগৃহের সম্মুখের রাস্তা গ্যাসের আলোয় আলোকিত করা হয়। এর পর 1813 খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের 'ওয়েস্ট-মিন্‌স্টার ব্রিজ'-ও গ্যাসের দ্বারা আলোকিত করা হলো। দলে দলে লোক এসে অবাক হয়ে তা দেখতে লাগলো। আর আনন্দে চীৎকার করে বলতে লাগলো—'কী অদ্ভুত! কী উজ্জ্বল!'

সে যুগে যে ধরণের বার্নার ব্যবহার করা হতো, তাতে গ্যাসের বাতি যে খুব উজ্জ্বল হতো, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। তবে এতাবৎকাল যে টিম্‌টিমে তেলের বাতি ব্যবহৃত হতো, সে তুলনায় এই গ্যাসের বাতি ছিল অনেক বেশী উজ্জ্বল।

তাপ-উৎপাদনের জন্যে লেবোরেটরীতে যে গ্যাস-দীপ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, সেই দীপ আবিষ্কার করেন হাইডেলবার্গের অধ্যাপক বুন্‌সেন (Bunsen)। তাই এই গ্যাস-দীপের নাম দেওয়া হয়েছে বুন্‌সেন-দীপ (Bunsen burner)।

অধ্যাপক বন্‌সেনের ছাত্র অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ওয়েল্‌সবাক্ (Welsbach) ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

যোগ দিয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং এখানেই 1884 খৃষ্টাব্দে গ্যাস-ম্যাণ্টল্ (Gas-mantle) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। গ্যাস-ম্যাণ্টল্ তৈরী করতে প্রয়োজন থোরিয়াম অক্সাইড ও সিরিয়াম অক্সাইড। সিল্কের জালের সঙ্গে ওই দুটি অক্সাইড মাখিয়ে নিয়ে এই ম্যাণ্টল্ তৈরী করা হয়। জ্বলন্ত গ্যাসের প্রথম সংস্পর্শে সিল্কের জাল পুড়ে যায় বটে, কিন্তু যৌগিক উপাদান দুটি শক্ত হয়ে যাওয়ায় জালের আকার অবিকৃত থাকে। এই জালই গ্যাসের আগুনের সান্নিধ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। স্বভাবতঃই ভাস্বর জালির সাহায্যে আলোক-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা-গ্যাসের চাহিদা খুব বেড়ে গেল। শহরে শহরে ঘরে ঘরে নতুন ধরণের গ্যাসের বাতি ব্যবহৃত হতে লাগলো।

বৈদ্যুতিক বাতি

ডায়নামো আবিষ্কারের পর থেকেই বিদ্যুৎ সহজলভ্য হলো। তখন অনেকেই বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালাবার কথা ভাবতে লাগলেন। এই ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হলো আর্ক-দীপ (Arc-lamp)। প্যারিসে এবং ইংল্যাণ্ডের জন-বহুল শহরে এরূপ দীপ প্রথম ব্যবহার করা হয়। এতে থাকে দুটি কার্বনের দণ্ড। স্ক্রু ঘুরিয়ে এদের মধ্যেকার দূরত্ব ইচ্ছামত বাড়ানো-কমানো যায়। উচ্চ-বিভবসম্পন্ন তড়িতের উৎসের সঙ্গে এদের যোগ করে দিলে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাতে জোরালো আলো পাওয়া যায়। এরূপ আর্ক-দীপ রাস্তাঘাটে, ম্যাজিক লণ্ঠনে, সার্চ-লাইটে এবং লাইট-হাউসে জোরালো আলোক উৎপাদনের জন্যে আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস্ আল্ভা এডিসন ভাবলেন, এমন ছোটখাটো বৈদ্যুতিক বাতি বানাবেন, যা পড়বার ঘরে কিংবা অফিসঘরে অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে, অথচ বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

কোন পরিবাহী তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকলে তারটি উত্তপ্ত হয়। যে পদার্থের রোধ (Resistance) বেশী, সেই পদার্থ দিয়ে কুণ্ডলী বানালে বেশী তাপ উৎপন্ন হয়। আবার তার যত সরু করা যায়, রোধ তত বেশী হয়। আর তাপের মাত্রা বেশী হলে তারটি ভাস্বর হয়ে আলো দিতে থাকে। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই বৈদ্যুতিক বাতি (Electric lamp) আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

এডিসন এবিষয়ে-পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, কি দিয়ে ফিলামেন্ট (Fila-ment) বা সরু তার তৈরী করা যায়। যা দিয়েই তিনি ফিলামেন্ট তৈরী করেন না কেন, তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অবশেষে 1879 খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি কার্বনের ফিলামেন্ট তৈরী করে একটি বায়ুশূন্য বাল্বের মধ্যে রাখলেন। তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার পর ফিলামেন্ট পুড়ে গেল না, আর কাজ-চলাগোছের আলো এথেকে পাওয়া গেল। এডিসন এবং তাঁর সহকর্মীরা ক্রমাগত দু-দিন ধরে এর উপর নজর রাখলেন, কিন্তু বাতির ফিলামেন্ট অটুট রইলো, পুড়ে গেল না। বিজ্ঞানীর নতুন নামকরণ হলো মেন্‌লো পার্কের যাদুকর (The wizard of Menlo Park)।

এদিকে ইংরেজ বিজ্ঞানী যোসেফ উইল্‌সন যোয়ানও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গবেষণা করে অনুরূপ কার্বন-বাতি প্রস্তুত করেন। 1880 খৃষ্টাব্দে একটি এক্‌জিবিশনে (বা প্রদর্শনীতে) সর্বপ্রথম তা দেখানো হলো। তাই পরবর্তীকালে এরূপ বাতির নাম দেওয়া হয় এডিযোয়ান ল্যাম্প (Ediswan lamp)।

এর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে কার্বনের

সরু তারটি ভাস্বর হয়ে আলো দেয়। আর বাল্‌ব্‌টি বায়ুশূন্য থাকায় কার্বন পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। তবে এই বাতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো এই যে, এথেকে পীতাভ (ঠিক সাদা নয়) আলো পাওয়া যায়। আর এর শিখা সর্বদাই কাঁপছে বলে মনে হয়, তাই এই আলো চোখের পক্ষেও অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাছাড়া ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্‌বের কাচের গায়ে কার্বনের সূক্ষ্ম স্তর সঞ্চিত হতে থাকে। ফলে বাতিটি ক্রমশঃ কালো হয়ে যায় এবং আলো ক্রমশঃ কমে আসে।

এরপর 1909 খৃষ্টাব্দ থেকে যে বাতির প্রচলন হয়, তাতে একটি বায়ুশূন্য বাল্‌বে কার্বনের বদলে টাংস্টেনের সরু তার ব্যবহার করা হয়। এতে বেশী আলো পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাল্‌ব্‌টি বায়ুশূন্য থাকায় বেশী উষ্ণতায় এই তার থেকে ধাতুকণা নির্গত হয় বলে তারের ক্ষয় হতে থাকে এবং ধাতুকণাগুলি বাল্‌বের গায়ে সঞ্চিত হয়ে বাল্‌বকে ক্রমশঃ কালো করে দেয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, বাল্‌ব্‌টি সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য না করে তার মধ্যে কিছু-পরিমাণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরে দিলে সুফল পাওয়া যায়। কারণ, তা হলে তার থেকে ধাতুকণা নির্গমন বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। এজন্যে 1913 খৃষ্টাব্দ থেকেই বাল্‌বের মধ্যে খানিকটা গ্যাস ভরে দেওয়ার বিধি প্রচলিত হয়। কিন্তু বাল্‌বের মধ্যে গ্যাস থাকলে আর একটি অসুবিধা দেখা দেয়। ভাস্বর তারের তাপ আভ্যন্তরীণ গ্যাসে পরিবাহিত ও পরিচালিত হয় বলে তার উষ্ণতা হ্রাস পায়। ফলে তার ঔজ্জ্বল্যও অনেকখানি কমে যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে 1934 সাল থেকেই বাল্‌বের মধ্যে সোজা তার ব্যবহার না করে কুণ্ডলিত তার (Coiled coil) ব্যবহার করবার বিধি প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে পরি-চালিত তাপের পরিমাণ কম হয়, তাই এরূপ বাতি থেকে অনেক বেশী আলো পাওয়া যায়।

উপসংহার

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার আর কোন সমস্যা নয়। শুধু গৃহকর্মে নয় বা পথঘাট আলোকিত করবার জন্যে নয়, কলে-কারখানায়, স্কুলে-কলেজে, অফিসে বা ক্রীড়াঙ্গনে এই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে দিবালোকের মতই সব কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যুৎ যদি বর্তমান সভ্যতার প্রাণ-শক্তি, বিদ্যুতের আলো অবশ্যই এই সভ্যতার প্রাণ-প্রদীপ।

আকাশে চন্দ্র-সূর্য ছিল বলেই আদিমানব আলোর উপকারিতা বুঝতে পেরেছিল। নিশাচর প্রাণীর মত অন্ধকারে লুকিয়ে না থেকে অন্ধকার অপসারণের কঠিন সাধনায় আজ সে সফল। আলোর এই বিবর্তনে কৃত্রিম আলোর প্রতিটি উৎসই বিশ্বস্ত বন্ধুর মত মানুষকে সাহায্য করেছে। মাটির প্রদীপ আজও তার কল্যাণব্রত নিয়ে দরিদ্রের ঘরে আলো বিতরণ করছে, আজও মোমের বাতির শীতল-স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য গীর্জায় পবিত্র-পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, আজও শহরের বাইরে গ্রামে-গঞ্জে হ্যারিকেন-লণ্ঠন তার অতীত মর্যাদা নিয়ে অক্ষুন্ন রয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতি অবশ্যই অন্ধকার অপসারণে সর্বাধিক সফল। কিন্তু কে জানে—আলোর ক্রমবিবর্তনে উজ্জ্বলতর কোন্ বাতি ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে অপেক্ষা করে আছে!

গ্রহান্তরে নিত্য আনাগোনা

শৈলেশ সেনগুপ্ত

মহাবিশ্বের বুকে একমাত্র পৃথিবীতেই কি প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে? পৃথিবীর কল্লোলিত জীবনপ্রবাহ কি রবিনসন ক্রুশোর মতই নিঃসঙ্গ? শুধু আজ নয়, আবহমানকাল ধরে মানুষ এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছে। যুগে যুগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে কল্পনার রথ চেপে।

এমন একসময় ছিল, যখন রহস্যবাদী জ্যোতিষচর্চা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির বিধানানুযায়ী পৃথিবীই ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং সকলেই তা এক রকম মেনে নিয়েছিল। কিন্তু একটা অলীক চিন্তাধারার অন্ধকূপে মানুষের প্রজ্ঞা ও মননশীলতা চিরকালের মত বন্দী থাকতে পারে না। প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকে সুরু করে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটলো। সেসব কাহিনী যেমন আশ্চর্যজনক তেমনি চিত্তাকর্ষক।

মনে করতে হয় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রীক দার্শনিক থালেসের কথা। সর্বপ্রথম তিনিই ধরতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবী এবং চাঁদ মোটেই থালার মত চ্যাপ্টা নয়, গোলাকার। সে যুগে এমন চিন্তাধারা ছিল খুবই বিস্ময়কর। বলা হয়ে থাকে—তিনিই জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তাঁর সমসাময়িক আর একজন গ্রীক দার্শনিক আনাকসিমেণ্ডার সূর্যকে নিয়েও অনেক গবেষণা করে গেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর আয়তনে সমান। কিন্তু কয়েক দশক বাদেই গ্রীক পণ্ডিত হেরাক্লিটাস এই হিসেবটি সংশোধন করে বললেন, সূর্যের ব্যাস বারো ইঞ্চি। আজ এসব কথা এখন যতই হাস্যকর মনে হোক না কেন, সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন যুগে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা যে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে পেরেছিলেন, তাকে কোনমতেই ছোট করে দেখা চলে না। শুধু তাই নয়, গ্রহান্তরে জীবজগতের কথাও তাঁরা কল্পনা করে গেছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে খ্যাতনামা গ্রীক পণ্ডিত প্লুটারক চন্দ্রলোকের কথা নিয়ে বই লিখেছিলেন। সভ্যতার ইতিহাসে এটিই বোধ হয় গ্রহান্তর জীবন নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ। চাঁদকে তিনি একটি দ্বিতীয় পৃথিবী বলে বর্ণনা করে গেছেন। সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর গিরিখাত। সে যুগে এমন ধারণাও ছিল যে, চাঁদে মানুষ আছে। কিন্তু প্লুটারকের বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। তাঁর মতে, সেখানে দৈত্যদানবেরা বাস করে। কেবলমাত্র মৃত্যুর পরই নাকি মানুষের আত্মা চাঁদে চলে যায় এবং সেখান থেকে দানবের আত্মা নাকি পৃথিবীতে আসে। তাঁর গ্রন্থের [De Facie in Orbe Lunae] শেষভাগে রয়েছে মানব এবং দানবাত্মার সংলাপ।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত আর একখানি গ্রন্থও কিছু কম আকর্ষণীয় নয়। এটিও লিখেছেন আর একজন গ্রীক চিন্তাবিদ লুসিয়ান। গ্রন্থের নাম 'খাঁটি ইতিহাস' [True History] হলেও লেখক কোনরকম ভুল ধারণার অবকাশ রাখেন নি। তিনি যে আগাগোড়াই মনগড়া গল্প লিখেছেন, সেকথা সুরুতেই বলে দিয়েছেন। কিন্তু একালের 'সায়েন্স ফিকশন' অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক

কল্পকাহিনীগুলিও কি তাই নয়? বরং লুসিয়ান অনেক বেশী প্রশংসার যোগ্য। তরল অক্সিজেন, রকেট, ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটর প্রভৃতির সাহায্য ছাড়াই তাঁর নায়কেরা মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছে। মহাসমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়া একদল অসমসাহসী দুর্ধর্ষ মানুষের কথা দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। পিলারস অব হারকিউলিস অর্থাৎ জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে যাবার সময় তারা এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড়ের কবলে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশছোঁয়া এক জলস্তম্ভ এসে এদের আজগুবি গল্প। তা হলেও শুক্রগ্রহে উপনিবেশ গড়বার মত কল্পনা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেই দেখা দিয়েছে, এটা খুব আশ্চর্যজনক নয় কি?

মহাভারতের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানান মত। কেউ বলেন তিন হাজার বছর, কেউ বলেন পনেরো হাজার বছর আগেকার ঘটনা। মহাকাশে পাড়ি জমাবার ব্যাপারটা কিন্তু তখনো ছিল। নারদমুনির ঢেঁকি হলো এমন একটি পরমাশ্চর্য মহাকাশযান যাতে চেপে তিনি অবলীলাক্রমে বিশ্বের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন।

প্লুটারকের চন্দ্রলোকবাসী

গ্রাস করে। তার মধ্যে পড়ে অসহায় মানুষগুলি বিদ্যুৎবেগে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠতে থাকে। সে ওঠার যেন আর শেষ নেই! অবশেষে চাঁদের মাটিতে তারা পা রাখতে পারল। কিন্তু সেখানেও কি স্বস্তি আছে? এক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর কয়টি মানুষ। সূর্যলোকের রাজার সঙ্গে চন্দ্রলোকের রাজার দারুণ লড়াই বেঁধে গেছে। কে আগে গিয়ে শুক্রগ্রহে উপনিবেশ গড়বে, তা নিয়েই যত অশান্তি। এই বিপদের সময় পৃথিবীর দুর্ধর্ষ আগন্তুকদের কাছে পেয়ে চাঁদের রাজা যেন চাঁদ হাতে পেলেন।

পুরনো দিনের কথা ছেড়ে দিয়ে এবারে মধ্যযুগের দিকে একবার তাকানো যাক। লুসিয়ান না হয় মনগড়া কথা লিখে গেছেন, কিন্তু কেপ্‌লার? নিউটনের মত তিনিও তো ছিলেন গণিত-সাম্রাজ্যের দিকপাল। গ্রহগুলি যে বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তা নিয়ে মোটামুট যুক্তিপূর্ণ মতবাদ সর্বপ্রথম তিনিই খাড়া করেছিলেন। তবে পরিবেশের প্রভাব বুঝি কেউই এড়াতে পারে না। নিউটনের মত তিনিও ছিলেন মধ্যযুগীয় রহস্যবাদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

কেপ্‌লারের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস

সোমনিয়াম (Somnium) প্রকাশিত হয় 1634 সালে। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আর উদ্ভট ধ্যানধারণা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কাহিনীটি গ্রহান্তর অভিযানের। ডুরাকোটাস নামে আইসল্যাণ্ডের একজন তরুণ তার যাদুকরী জননীর সহায়তায় চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হলো। সে এক পরমাশ্চর্য দেশ। মাটির উপর ছড়িয়ে রয়েছে ওককলের মত দেখতে এক ধরণের পদার্থ। সারাদিন ধরে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পুড়তে থাকে, সন্ধ্যার কেটে গিয়ে ঐ পদার্থগুলির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে চন্দ্রলোকের নবজাত অধিবাসীরা। দেখতে অনেকটা সরীসৃপের মত। প্রায় পুরো দেহটাই

বুনো হাঁসের পিঠে চেপে

ঘন লোমে ঢাকা। সূর্যের আলো একেবারেই পছন্দ করে না। দিনের বেলা পাহাড়-পর্বতের খাঁজে খাঁজে ছায়ায় লুকিয়ে থাকে। কাউকে যদি দিনের আলোয় জোর করে এনে রাখা হয়, তবে তার নরম লোমগুলি খুব শক্ত আর ভঙ্গুর হয়ে যায়। অবশ্য রাত্রে তা ঝরে গিয়ে আবার নতুন করে গজায়। এই হলো কেপলার-কল্পিত গ্রহান্তরের জীব! তবুও এর তাৎপর্য কম নয়। তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বসেও ভিন্ন জগতে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করে গেছেন কেপ্‌লার।

শুধু বিজ্ঞানীরা কেন, এ ব্যাপারে ধর্মগুরুরাও কিছু কম যান না। এই প্রসঙ্গে কল্প কাহিনীকার হিয়ারফোর্ডের বিশপ গডউইন লিখলেন 'চাঁদের বুকে মানুষ' (The man in the moon) এই সুখপাঠ্য উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 1638 সালে, তাঁর মৃত্যুর পরে। কাহিনীর নায়ক ডোমিনগো গনজালেস বুনো হাঁসের পিঠে চেপে চাঁদে গেছে। সেখানে বহু রকমের অবাক করা কাণ্ডকারখানার সামনে পড়েছে। গ্রহান্তরজীবনের কথা মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্মগুরুদের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল! অথচ এমন চিন্তাধারা ছিল বাইবেলবিরোধী।

অষ্টাদশ শতক থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুরু হলো। পৃথিবী যে বিশ্বের কেন্দ্র নয়—ক্ষুদ্র একটি গ্রহ মাত্র, এই সত্য বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন গ্যালিলিও। তারপর অনেকের ধারণা হলো যে, সবগুলিতে না হলেও সৌরজগতের অন্ততঃ দু-একটা গ্রহে নিশ্চয়ই উচ্চস্তরের প্রাণী আছে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে এগিয়ে এলেন স্বনামধন্য উইলিয়াম হারশেল। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং দূরবীন নির্মাতা। নক্ষত্রলোকের বহু রহস্যই তিনি ভেদ করে গেছেন।

হারশেলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, চাঁদে জীবজগৎ আছে। এমন কি সূর্যেও উন্নত ধরণের প্রাণী বাস করে! তাঁর মতবাদ অনুযায়ী, উত্তপ্ত সৌরপৃষ্ঠের ঠিক নীচেই রয়েছে চমৎকার এক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, যেখানে বুদ্ধিমান সৌরজীবেরা হেসেখেলে বেড়ায়। গ্রহান্তর জীবনের সুনিশ্চয়তা হারশেলের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে এসব কথা নিয়ে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করতেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন ওঠে নি। সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজ অতুলনীয় খ্যাতির অধিকারী হারশেলের সঙ্গে একমত হতেই ভালবাসতো। পাছে তাঁর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে, এই আশঙ্কায় কেউ কোন মন্তব্য করতেও ভরসা পেতেন না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিশিষ্ট জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রিথিসেন তো চাঁদের বুকে আস্ত একটা শহরই আবিষ্কার করে ফেললেন। সে এমন এক শহর, যার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে গিয়ে, কালোমাটির মহাকায় প্রাচীর তৈরী করা হয়েছে চারিদিকে।

গ্রহান্তর জীবন নিয়ে জালিয়াতির নজীরও পাওয়া যাবে। 1835 সালে 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকায় একটি খবর পড়ে পাঠকেরা দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপে বসে জন হারশেল (উইলিয়াম হারশেলের পুত্র) নাকি চাঁদের বুকে বহু জন্তুজানোয়ার আবিষ্কার করেছেন। মস্ত শিং-ওয়ালা ভেড়া, ধূসর পেলিক্যান পাখী, বাঁদরমুখো মানুষ আরও কত কি! এক ধরণের অতিকায় উভচর প্রাণী নাকি চন্দ্রলোকের নুড়িপাথরে ঢাকা প্রান্তর তোলপাড় করে উদ্দাবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে! অনেক দিন বাদে ধরা পড়লো যে, খবরটা ভুয়া।

তারপর চাঁদ এক সময় বাতিল হয়ে গেল। সেখানকার জলবায়ুশূন্য পরিমণ্ডল যে আদপেই প্রাণসৃষ্টির উপযুক্ত নয়, একথা বেরসিক বিজ্ঞানীরা বেশ জোর দিয়েই বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তা জেনে কি তৃপ্ত হওয়া যায়? কল্পনাপ্রবাহ এবারে ভিন্ন খাতে ছুটল। লক্ষ্যস্থল মঙ্গলগ্রহ। ইটালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী শিয়াপারেল্লি মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে বরফ এবং সোজা কতগুলি খাল আবিষ্কার করে ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

যশস্বী ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েলস রচনা করলেন 'বিশ্বলোকের মহাযুদ্ধ' (War of the worlds)। মহাবুদ্ধিমান মঙ্গলীয়েরা সরাসরি এসে পৃথিবীকে আক্রমণ করে বসেছে। ওয়েলস তাদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন—'এখন আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি। অবিশ্বাস্য গড়নের অপার্থিব জীব। বর্তুলাকার দেহের পরিধি মস্ত জালার মত, কম করেও চার ফুট। তবে দেহ না বলে ওটাকে বোধ হয় মাথা বলাই যুক্তিযুক্ত। মুখ রয়েছে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। নাক বলে কিছু নেই। মঙ্গলীয়দের কোন রকম গন্ধের অনুভূতি আছে বলে মনে হয় না। মস্ত এক জোড়া ভয়ঙ্কর গোল চোখের ঠিক নীচেই রয়েছে অত্যন্ত পুরু দু-খানা মাংসল ঠোঁট। চাবুকের মত লম্বা আর লিকলিকে কতগুলি শুঁড় ঠোঁটের উপরে নীচে বৃত্তাকারে সাজানো।'

মঙ্গলীয় বুদ্ধিমান প্রাণীর কি চমৎকার চেহারা! বইখানি কিন্তু অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে মঙ্গলগ্রহ-সভ্যতা নিয়ে একটার পর একটা কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু
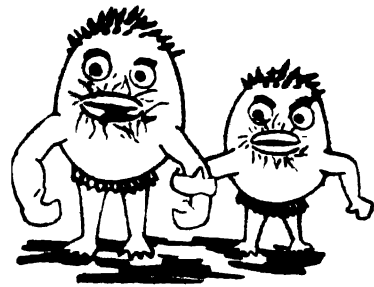
ওয়েলস-বর্ণিত মঙ্গলগ্রহবাসী

অলোকসামান্য ওয়েলসীয় প্রতিভার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে নি।

শুধু মঙ্গলগ্রহ নিয়ে লেখা বলেই নয়, 'বিশ্বলোকের মহাযুদ্ধে' আরও একটি নূতনত্ব আছে। এবার আর মানুষকে ছুটতে হয় নি, ভিন্ন জগতের প্রাণীরা সশরীরে এসে পৃথিবীর বুকে হাজির হয়েছে। সর্বাধুনিক যুগে এই ওয়েলসীয় কল্পনাটি যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত রূপও নিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে গ্রহান্তর-রহস্য এক অভাবনীয় পথে মোড় নিল। আর কোন কথা-শিল্পীর কল্পনা নয়—একেবারে বাস্তব ঘটনা।

উড়ন্ত চাকী এক মস্ত প্রহেলিকা। অনেক মানমন্দিরে শক্তিশালী দূরবীনের দৃষ্টিতে তা ধরা

পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-বিজ্ঞান সংস্থা 'নাসা' ঐ হতবুদ্ধিকর পদার্থের নাম দিয়েছে 'অজ্ঞাত উড়ন্ত পদার্থ' (Unidentified flying object)। কেমন সে পদার্থ? সত্যই ভিন্ন জগতের কোন মহাকাশযান নাকি?

প্রথম খবরটা আসে 1947 সালে। জনৈক মার্কিন ব্যবসায়ী তার নিজস্ব এরোপ্লেনে চড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় এক ঝাঁক উড়ন্ত চাকীর সারি দেখতে পান। সেই থেকে ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকে এই ধরণের খবর। ক্রমে ক্রমে দিল প্রচণ্ড উত্তেজনা। উড়ন্ত চাকীরা যে অজানা কোন গ্রহান্তর-সভ্যতার মহাকাশযান, তাতে অনেকেরই সন্দেহ রইলো না। গুজব উঠলো গ্রহান্তরের জীবেরা নাকি পৃথিবীর যেখানে-সেখানে নামতে সুরু করছে—ছড়িয়ে দিচ্ছে মাধুর্য আর জ্ঞানের প্রবাহ।

টারম্যান বেথারাম নামে এক ভদ্রলোক তো একটা উড়ন্ত চাকীর মধ্যে গিয়েই বেশ কিছু সময় কাটিয়ে এলেন। সে এক মহাচমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। আউরা রানেস নাম্নী এক পরমাসুন্দরী সেই যানের চালিকা—নিবাস ক্লারিয়ন গ্রহ। কিন্তু কোথায় সে গ্রহ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলেও, বেথারাম কিন্তু শপথ করে বলেছেন যে, ব্যাপারটার মধ্যে কল্পনার লেশমাত্র নেই।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত মাউন্টপালোমার মানমন্দিরের পাশেই থাকেন জর্জ অ্যাডামস্কি। তিনি ঘোষণা করলেন শুক্রগ্রহ থেকে আসা নরনারীর কথা। পালোমার মানমন্দিরের কাছে তারা নাকি সদলবলে এসে নেমেছিল। অ্যাডামস্কি ঐ শুক্রবাসীদের সঙ্গেই তাদের উড়ন্ত চাকীতে গিয়ে উঠেছিলেন। তারপর চললো সুদীর্ঘ ভ্রমণের পালা। সৌরজগতের প্রায় সর্বত্রই তিনি ঘুরেছেন। শুক্র, মঙ্গল ও শনিগ্রহের মানুষদের সঙ্গে ছুটিয়ে মেলামেশা করেছেন। এমনকি সেই বিস্ময়কর উড়ন্ত চাকীর ফটোগ্রাফ পর্যন্ত তুলে আনতে ছাড়েন নি। কিন্তু সে প্রমাণ এত অস্পষ্ট যে, দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। মনে হয় যেন একটা বৈদ্যুতিক আলোর শেড।

ইংল্যাণ্ডের সেডরিক অ্যালিংহাম 1954 সালে লিখলেন 'মঙ্গলগ্রহের ফ্লাইং সসার' নামে একখানা বই। একজন মঙ্গলীয় মানুষের সঙ্গে মোলাকাতের বিবরণ। উড়ন্ত চাকীটি এসে নেমেছিল স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে। বইতে সেই মঙ্গলগ্রহবাসীর একখানা ছবিও ছেপে দেয়া

উড়ন্ত চাকীর চালিকা

হয়েছে। চেহারাটা হুবহু একজন মধ্যবয়সী মানুষের মত। পরণে ট্রাউজার, কোমরে বেল্ট বাঁধা।

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এসব কাহিনী লাগামছাড়া উদ্ভট কল্পনা-মাত্র। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় 'অজ্ঞাত উড়ন্ত পদার্থ' কি জিনিস? সেগুলি তো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়েছে। সন্দেহবাদীদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিভিন্ন দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয় অনেক কিছুই জানেন—যা কিনা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। গ্রহান্তরের জীবেরা নাকি ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। (সন্দেহটা যে অমূলক, তা কিন্তু খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ যে দ্রুতহারে মানবিকতা ও প্রজ্ঞার অবলুপ্তি ঘটতে সুরু করেছে, তার পিছনে ভিন্ন জগতের সুগভীর চক্রান্ত থাকাটা মোটেই বিচিত্র নয়)।

কল্পনার কথা থাক। গ্রহান্তর-সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই নিয়ে তাঁরা এখন অনেক কথাই বলতে পারেন। যে সব খবর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে, তা এমনই বিস্ময়কর এবং কৌতূহলজনক, যা কল্পকাহিনীকেও হার মানায়।

সঞ্চয়ন

গাছগাছড়া থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন

ক্ষুধা আর অপুষ্টির হাত থেকে মানবজাতির মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্যে বিশ্বের গবেষকগণের সাধনার অন্ত নেই। এই ব্যাপারে এক নবতম পদক্ষেপ হচ্ছে, আঁশ, খোসা, শ্বেতসার, কার্বোহাইড্রেটসমেত মূল শস্যের পরিবর্তে ঐ শস্য থেকে শুধু মাত্র প্রোটিনের অংশটুকু বেছে আলাদা করে নিয়ে তা মানুষের পুষ্টিকর আহার্য-রূপে পরিবেশন করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার অর্থানুকূল্যে নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল গবেষক গাছগাছায় প্রোটিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন। এই বিজ্ঞানীদের নেতা ডক্টর লোয়েল স্যাটারলি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ডক্টর জেমস কেনড্রিকের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের পুষ্টিবিধানের জন্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে জৈব প্রোটিনের সমপর্যায়ে আনবার জন্যে তাঁরা গবেষণা করে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে খাবার উপযুক্ত শুকনো বীনের উদাহরণ উল্লেখ করে ডক্টর স্যাটারলি বলেছেন যে, ভারতে প্রোটিনের প্রয়োজন খুব বেশী বলে ঐ ধরণের এক-শ' পাউণ্ড বীন ভারতে রপ্তানী না করে তার পরিবর্তে সমপরিমাণ শুধুমাত্র প্রোটিন যদি দশ পাউণ্ড ওজনের প্যাকেটে করে পাঠানো যায়, তা হলে কাজটা কতই না সুষ্ঠু হয়। কাজেই বিশল্যকরণীর জন্যে গন্ধমাদন পাঠিয়ে কি কিছু লাভ আছে? উন্নতিশীল অনেক দেশেই কার্বোহাইড্রেট লাভের উৎস রয়েছে। কাজেই প্রোটিনের সঙ্গে অবান্তর বোঝা বাড়িয়ে অন্যত্র সে সব পাঠিয়ে তো লাভ নেই।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সংগ্রহের এই পরিকল্পনা খুবই সহজ, কিন্তু একে রূপায়ণের পথে বাধাবিঘ্ন কিন্তু কম নয়। নানাভাবে গাছগাছড়া থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন করে নিলেই কাজ শেষ হয়ে গেল না—কোন্ গাছের প্রোটিনে দেহগঠনের

উপযোগী কোন্ রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, বা কোন্ শস্যের প্রোটিনে কোন্ উপাদান কতটা আছে না আছে, তাও সমীক্ষাসাপেক্ষ।

এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় ডক্টর স্ল্যাটারাল বলেছেন যে, দেহতন্ত্রর উন্নতিবিধানের জন্যে প্রত্যেক মানুষের বিশেষ করে আট রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন। অধিকাংশ জৈব প্রোটিনে এই অ্যামিনো অ্যাসিডের সুসমঞ্জস মাত্রা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। সম্ভবতঃ ডিমের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড সবচেয়ে সুসমঞ্জস মাত্রায় রয়েছে। দুধ, অ্যাসিড মাংস প্রভৃতিতেও প্রচুর পরিমাণ অ্যামিনো রয়েছে; কিন্তু উদ্ভিজ্জ প্রোটিন জৈব প্রোটিনের মত খাদ্যগুণসম্পন্ন নয়। দেহের পুষ্টির জন্যে যে অ্যামিনো অ্যাসিড একান্ত অপরিহার্য, উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম। আর তাছাড়া প্রতিটি গাছগাছড়ার অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রাও সমান নয়।

প্রত্যেক খাদ্যশস্যে প্রোটিনের মাত্রা খুবই কম থাকে। উদাহরণস্বরূপ ভুট্টায় প্রোটিনের পরিমাণ সাত অথবা আট শতাংশ মাত্র। কাজেই দেহের প্রোটিনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অনেক বেশী করে ভুট্টা গ্রহণ করতে হবে। ভুট্টার সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট, আঁশ প্রভৃতি অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিসও উদরস্থ করতে হয়। এরা দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি জোগায়। দেহের উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন পাবার জন্যে খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর ক্যালোরি মানুষ গ্রহণ করে থাকে।

কাজেই নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা গাছগাছড়া থেকে শুধুমাত্র প্রোটিনটি পৃথক করে নিয়ে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অগ্রসর হতে গিয়ে তাঁরা মানব দেহের উপযোগী অনেক নতুন নতুন প্রোটিনের সন্ধান পেয়েছেন। সেই সব নতুন প্রোটিন এতকাল কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কাজ করতে গিয়ে এই গবেষকদল অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীনও হয়েছেন। এই সমস্যা প্রোটিন পৃথকীকরণ প্রক্রিয়নের রাসায়নিক পন্থার দিক দিয়ে বেশী নয়, তাঁদের উদ্ভাবিত দ্রব্যটি মানুষের দেহে ও মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেই সমস্যাটি বেশী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, খাদ্যশস্যের মধ্যে সয়াবিনে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশী বলে সর্বজনস্বীকৃতি-লাভ করেছে। কিন্তু আল্‌ফালফা নামে এক রকমের ঘাস আছে, যা এখন শুধু মাত্র পশুর খাদ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতি হেক্টার জমির আলফালফা থেকে সয়াবিনের তিনগুণ বেশী প্রোটিন পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, বস্তুটি থেকে যে প্রোটিন নিষ্কাশন করা হয়, তা ঘাসের মত বিস্বাদ। গবেষকেরা এই পশুখাদ্য থেকে এক ধরণের ধূসর সাদা রঙের নির্যাস নিষ্কাশনের উপায় বের করেছেন।

সয়াবিন থেকে প্রোটিন উৎপাদনের চেয়ে আলফালফা থেকে প্রোটিন উৎপাদনের সম্ভাবনা তিনগুণ বেশী রয়েছে। আবহাওয়ার প্রতি-কূলতায় যে সব দেশে সয়াবিন ভাল ফলে না, সে সব দেশে প্রচুর আলফালফা উৎপাদনের দিকে নজর দিতে পারে। কাজেই বিশ্বের ক্ষুধা নিবারণের ব্যাপারে ঐসব দেশ সয়াবিনের চেয়ে আলফালফার উপর বেশী নির্ভর করতে পারে। তবে এই পদার্থটি থেকে প্রোটিন নিষ্কাশনের অনেক সমস্যা আছে। এই উদ্দেশ্যসাধনে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন। এই ব্যাপারে প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক প্রসার হলে বিশ্বের প্রোটিনের অভাব দূর হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বের কোন দেশ প্রোটিনসমৃদ্ধ প্রচুর আলফালফা উৎপাদন করে তা থেকে অত্যা-বশ্যকীয় প্রোটিন নিষ্কাশনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা, প্রোটিন হলেই তো আর হলো না, তার স্বাদটিও

যে মানুষের রসনার গ্রহণোপযোগী হওয়া চাই। আমেরিকার পুষ্টি-বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

খাদ্যের এই সমস্যাটা কেবল মাত্র গরীব দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। স্যাটারলি-কেনড্রিক গোষ্ঠী আলফা-লফা প্রোটিন-সার দিয়ে কেকজাতীয় খাবার প্রস্তুত করে গবেষণাগারের কর্মীদের মধ্যে পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। এমন কি গবেষণাগারের একনিষ্ঠ কর্মীরা এই কেকজাতীয় খাবারকে শরীরের পক্ষে খুব উপকারী জানা সত্ত্বেও তাঁরা ওগুলিকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁদের মনে হয়েছে তাঁরা যেন স্রেফ ঘাস চিবোচ্ছেন।

এই প্রোটিন-সার পাঁউরুটি, হাতে-গড়া রুটি প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে খাদ্যোপযোগী করে তোলবার জন্যে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে অনেক সুফল পাওয়া গেছে। খাদ্যের এই প্রাণবস্তুটি রুটি এবং অন্যান্য খাবারে সঙ্গে পরিমাণও প্রয়োজনমত মিশিয়ে ব্যবহার করতে অনেকেই শিখেছে। তা ছাড়া ঐ প্রোটিন-সারের উৎপাদনও বেড়েছে।

পাতার প্রোটিন-সার মিশিয়ে মাংসের পরিমাণ যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি খাদ্যগুণের দিক থেকে মাংসকে অধিকতর পুষ্টিকরও করে তোলা যায়। তবে এই প্রোটিন জলখাবারের রুটি বা দানাশস্যের দ্বারা প্রস্তুত খাবার প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে ভাল কাজ পাওয়া যায় না। তবে পাতার প্রোটিন-সারে যে অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, সেটি খুবই আকর্ষণীয়। ডক্টর স্যাটারলি ও তাঁর সহকর্মীরা এই প্রোটিন-সার তাঁদের মিশ্রণে অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহারে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন-সার মানুষের খাদ্যগুণ বৃদ্ধির ব্যাপারে খুবই উপকারী বলে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ঘাস বা শাকসব্জি প্রভৃতি থেকে সস্তায় কি ভাবে প্রোটিন-সার নিষ্কাশন করা যায়, সেটাই ভাবনার বিষয়। সস্তায় প্রোটিন-সার প্রাপ্তির সুত্রানুসন্ধান একটা চিত্তাকর্ষক গবেষণার ব্যাপার। মানুষের খাদ্য প্রক্রিয়নের পথে খাদ্যের অনেক অংশ অপ্রয়োজনীয় বলে আবর্জনার গাদায় ফেলে দেওয়া হয়। এই সব পরিত্যক্ত অংশ পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন গম থেকে আটা, ময়দা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে গিয়ে ভুষি প্রভৃতি বাদ যায়। সেগুলি পশুখাদ্যরূপে কাজে লাগে।

চোলাই কাজের পরও নানাবিধ উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়। শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনেই হোক অথবা মানুষের ব্যবহারের জন্যেই হোক—সুরাসার প্রস্তুত করতে গিয়ে কতগুলি উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়। ডক্টর কেনড্রিক বলেছেন যে, চোলাইয়ের এই সব পরিত্যক্ত পদার্থ প্রোটিনসমৃদ্ধ।

সুরাসার প্রস্তুত করতে যে দানাশস্য' বা ভুট্টা অথবা গম প্রভৃতির শস্যাদির প্রয়োজন হয়, সেগুলির মধ্যে যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে, সুরাসারের উপজাতর মধ্যে সেই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনই শুধু থাকে না, সেই সঙ্গে থাকে ঈষ্ট-প্রোটিনও। সুরাসার গাঁজাবার সময় এই জাতীয় প্রোটিন উদ্ভূত হয়ে থাকে। প্রোটিনকে শক্তিশালী করাতেই ঈষ্টের প্রয়োজন শেষ হয় না, চোলাইয়ের প্রক্রিয়নের ফলে উপজাত দ্রব্যে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধিও এর দ্বারা হয়ে থাকে।

প্রোটিন-সার সংগ্রহ করবার এই যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তা কি গবাদিপশুর অনাহারেরই ইঙ্গিত দেয়? এই ভাবনা অনেকের মাথায় এসেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা জোরের সঙ্গে এর জবাবে বলেছেন, না—তা কখনই নয়। এই দুশ্চিন্তা অমূলক। কেননা, গাছগাছড়া থেকে প্রোটিন পৃথকীকরণের এই ব্যবস্থার প্রবর্তন গবাদিপশুর কথা চিন্তা করেই করা হয়েছে। প্রোটিন নিষ্কাশনের এই প্রক্রিয়নে ঘাস প্রভৃতি পদার্থের চার ভাগের তিন ভাগই গবাদিপশুর ভোগে লাগে।

আর বাকী একভাগ উৎকৃষ্ট প্রোটিন-সার হিসাবে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছগাছড়া থেকে ভাল ভাল প্রোটিন তুলে নেবার পর তন্তু, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি ছিব্‌ড়াজাতীয় যে সব পদার্থ পড়ে থাকে, তাতেও কিছু কিছু কিছু প্রোটিন পাওয়া যায়। তবে সেগুলি নিম্নমানের, কিন্তু গবাদিপশুর পক্ষে তা খুবই উপকারী। রোমন্থনকারী প্রাণীরা মানুষের ফেলে দেওয়া এই সব আঁশ, খোসা প্রভৃতি খেয়ে শক্ত সবল হয়ে বেড়ে ওঠে। অথচ মানুষের কাছে এর কোন প্রয়োজন নেই।

বিশ্বের যে সব দেশ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, বিজ্ঞানীদের প্রোটিন-সার সংগ্রহের এই গবেষণা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের পেট ভরাতে পারবে না। তবে বিশ্বের খাদ্য-সমস্যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নিরসন হবার নয়। অপর পক্ষে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা জটিলতর হবারই সম্ভাবনা বেশী। ডক্টর কেনড্রিক বলেছেন যে, নেব্রাস্কার এই গবেষকদল মানুষকে ক্ষুধার হাত থেকে রেহাই দিতে না পারলেও মানুষের অনাহারে মৃত্যুকে অনেক দূর পিছিয়ে দিতে পারবে।

1975 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুইডিস রয়েল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স 1975 সালে যাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন, বিজ্ঞানীরা মনে করেন এঁদের প্রত্যেকের সব যুগান্তকর আবিষ্কারই আগামী কয়েক দশকে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। এই সব আবিষ্কার আগামী দিনে আরও অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করবে।

রসায়ন-বিজ্ঞান

রসায়ন-বিজ্ঞানে 1975 সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে—যৌথভাবে দু-জন বিজ্ঞানীকে। তাঁদের একজন হচ্ছেন জন ওয়ার্কপ কর্নফোর্থ (জে. ডাব্লিউ. কর্নফোর্থ)। তিনি ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অপরজন হচ্ছেন সুইজারল্যাণ্ডের অধ্যাপক ভ্লাদিমির প্রেলগ (ভি. প্রেলগ)। অধ্যাপক কর্নফোর্থ এবং অধ্যাপক প্রেলগ উভয়েই জৈব রসায়নের মূল তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। জৈব যৌগের অণুর ত্রৈমাত্রিক গঠন অনুসন্ধান তাঁদের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু। এই দুই রসায়ন-বিজ্ঞানীর মূল কাজের বিবরণ বইগুলিতে অনেকাংশে আছে।

অধ্যাপক কর্নফোর্থ 1917 সালের 7ই সেপ্টেম্বর সিডনিতে (অস্ট্রেলিয়ায়) জন্মগ্রহণ করেন। 1937 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি বি. এস-সি. ডিগ্রী পেয়েছিলেন। অধ্যাপক কর্নফোর্থ পরে অক্সফোর্ডে যান এবং 1941 সালে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1953 সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 1962 সালে তিনি মিলস্টেড লেবোরেটরী অব কেমিষ্ট্রি এবং এনজাইমোলজি অব শেল রিসার্চ লিমিটেডের ডিরেক্টর ছিলেন এবং পরে 1965 সালে ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ডক্টর কর্নফোর্থ ষ্টেরিওকেমিষ্ট্রির উপরে যে কাজ করেছেন, তার তুলনা মিলে না। ডক্টর কর্নফোর্থ একটু একগুঁয়ে, তিনি বধির। জৈব

যৌগের কার্বন অণুর উপর এনজাইমের বিক্রিয়ার অনুসন্ধানই অধ্যাপক কর্নফোর্থের প্রধান কাজ। অণুর ত্রৈমাত্রিক গঠন-বৈচিত্র্যের গুপ্ত রহস্যও অধ্যাপক কর্নফোর্থের বিভিন্ন গবেষণা-নিবন্ধ থেকে জানা যায়। স্কুয়ালেন একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগ। স্কুয়ালেনের গঠন-পদ্ধতি এবং স্কুয়ালেন থেকে বিভিন্ন ষ্টেরয়েড যা যা গড়ে উঠেছে, তা কি ভাবে সম্ভব, তা বুঝবার জন্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নিয়ে কোন্ অংশের সঙ্গে এনজাইম বিক্রিয়া করেছে, তা বুঝে নিয়ে অধ্যাপক কর্নফোর্থ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। অন্য সব মৌলিক কাজের মধ্যে কোগেন্ট্রিনের জৈব সংশ্লেষণ এবং বায়োসিন্থেটিক কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক কর্নফোর্থের কাজের আর একটা দিক হচ্ছে নন-অ্যারোম্যাটিক ষ্টেরয়েড সিন্থেসিস। বহু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রমোন্নতি অধ্যাপক কর্নফোর্থকে করতে হয়েছিল। 1946 সাল থেকে 1953 সাল পর্যন্ত কর্নফোর্থ পরলোকগত অধ্যাপক রবার্ট রবিনসনের সঙ্গে যৌথভাবে অনেক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর পর অধ্যাপক কর্নফোর্থ পেনিসিলিন এবং হেটেরোসাইক্লিক যৌগ নিয়েও গবেষণা করেছিলেন। সব কিছুর মধ্যে এনজাইম কেমিষ্ট্রি আর ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কেমিষ্ট্রি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক ভি. প্রেলগ যুগোশ্লাভিয়ায় 1906 সালের 23শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখাপড়া প্রেগেই হয়। 1929 সালে তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1950 সালে তিনি অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন এবং 1957 সালে বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। 1962 সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

প্রেলগ রুলই ডক্টর প্রেলগের প্রধান পরিচয়। তাঁর গবেষণা অণুর ত্রৈমাত্রিক গঠন-বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। নানারকম অ্যান্টি-বায়োটিক্স এবং তাদের ষ্টিরিওকেমিষ্ট্রি ডক্টর প্রেলগের কাজের অন্য ধারা। ডক্টর প্রেলগও এনজাইম কেমিষ্ট্রি আর ন্যাচারাল প্রোডাক্টের উপর গবেষণা করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান

1975 সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন। ডক্টর অ্যাগে বোর (53), বেঞ্জামিন মোটেলসন (49), ডক্টর জেমস রেইনওয়াটার (57)।

ডক্টর অ্যাগে বোরের জন্ম কোপেনহাগেনে 1922 সালের 22শে জুন। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ডক্টর বোর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক নীলস বোরের পুত্র। পিতা নীলস বোর 1922 সালে পারমাণবিক গঠন এবং বিভিন্ন বিক্রিয়া বিষয়ের গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কথিত আছে, পিতা নীলস বোর 1943 সালে নিউক্লিয়ার বোমা-প্রকল্পে ডেনমার্কে 21 বছরের পুত্রকে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে 1946 সালে পিতা পুত্র উভয়ে কেপেনহাগেনে ফিরে আসেন। 1962 সালে ডক্টর অ্যাগে বোরের বাবা মারা যান। সে সময় থেকে ডক্টর অ্যাগে বোর ডক্টর নীলস বোর ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর। ডক্টর বোর 1956 সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

জেমস রেইনওয়াটার 1917 সালের 9ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। 1937 সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে বি. এস-সি. পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি (1941) আর. পি-এইচ. ডি. (1946) ডিগ্রী পান। 1952 সালে তিনি অধ্যাপকপদে উন্নীত হন।

জেমস রেইনওয়াটার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদে নিজেই বিস্মিত। তিনি বলেছিলেন তাঁর

বা কাজ, তার অধিকাংশই 1949 সালে কিংবা তার আগে। সুতরাং এর থেকে কিছু আসতে পারে, তা তাঁর মনে হয় নি। জেমস রেইনওয়াটার প্রতিদিন সাইকেল চড়েন এবং এভাবেই অফিস যাতায়াতে অভ্যস্ত। ডক্টর রেইনওয়াটার অণুর কেন্দ্রতত্ত্ব বিশদভাবে সংশোধন করেছেন। অন্য সব কাজের মধ্যে আছে এক্স-রে, নিউট্রন ক্রস-সেকশন, নিউট্রন টাইমফ্লাইট রেজোনেন্স স্পেকট্রোস্কপি। পাইওন, মিউওন নিয়ে জেমস রেইনওয়াটার অনেক কাজ করেছেন।

ডক্টর বেঞ্জামিন মোটেলসন (49) এককালে আমেরিকার অধিবাসী ছিলেন। 1973 সাল থেকে তিনি ডেনমার্কের নাগরিক। জন্ম চিকাগো শহরে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী পান। কোপেনহাগেনে তিনি নীলস-বোরের লেবোরেটরীতে ফেলোশিপের কাজে বৃত ছিলেন। থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের উপর গবেষণাই তাঁর প্রধান কাজ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 1975 সালে তিনজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—(1) ডক্টর ডেভিড বাল্টিমোর (37), (2) ডক্টর হাওয়ার্ড টেমিন (40), (3) ডক্টর রেনাতো ডুলবেক্কো (61)।

ডক্টর বাল্টিমোরের জন্ম নিউইয়র্কে। তিনি রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী (1964) পান। এর পূর্বে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট থেকে এম. এস-সি. ডিগ্রী পান। তিনি 1972 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ডক্টর ডুলবেক্কোর অধীনে কাজ করেন।

ডক্টর ডুলবেক্কো ইটালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর টেমিন 1950 সালে ডক্টর ডুলবেক্কোর গবেষণাগারে ছাত্র ছিলেন। ডক্টর বাল্টিমোরও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্ক ইনষ্টিটিউট অ্যাটলাণ্টোনাতে গবেষকদলের মুখপাত্র ছিলেন। ডক্টর টেমিন টিউমার ভাইরাস নিয়েই ডক্টর ডুলবেক্কার অধীনে গবেষণা চালান ডক্টর টেমিন এবং ডক্টর বাল্টিমোর উভয়েই জন্মগত অধিকারের দিক থেকে আমেরিকার নাগরিক। ক্যান্সার গবেষণা কাজের জন্যে এই তিন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন। নোবেল কমিটি মনে করেন ডি. এন. এ. কিংবা আর. এন. এ. ভাইরাসই মানুষের ক্যান্সার রোগ যে ঘটাতে পারে, তা এই তিন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা পরিষ্কার করে তুলেছে। এই কমিটি আরও মনে করেন অনতিবিলম্বে এঁদের গবেষণা ক্যান্সার রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিপাক-ক্রিয়া ও এক্স-রে

শরীরের বিপাক-ক্রিয়া একরকমের গোলমাল হয়, যেটা প্রায়ই অলক্ষিত থেকে যায়। এক্স-রে পরীক্ষায় এখন তা ধরা যাচ্ছে। এই বিপাক-বিকারকে বলা হয় হেমোক্রোম্যাটোসিস। দেহ-যন্ত্রের অনেক জায়গায় লৌহের অতিরিক্ত প্রাবল্য ঘটে এই রকম বিকার ঘটলে, বিশেষ করে যকৃতে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পাযেলা জেনসেন এমন জনা ছয়েক এই ধরণের রোগীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের যকৃতের রোগের লক্ষণ ধরা পড়েছে। অন্য অনেক রোগী প্রথম প্রথম নানা-রকম উপসর্গের কথা বলে—নিউমোনিয়া বা অন্য কোন সংক্রমণজনিত অসুস্থতা, রক্ত সংবহনের গোলযোগ বা বহুমূত্র। এঁদের মধ্যে শতকরা 50 ভাগের ক্ষেত্রে আবার আরথ্রাইটিস এবং সন্ধি-স্থলের বেদনা দেখা দেয়, বিশেষ করে হাতে। এক চিকিৎসক সমাবেশে ডক্টর জেনসেন বলেন যে, বিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগই যদি এই সবের কারণ হয়ে থাকে, এক্স-রে পরীক্ষায় তা ধরা যায়।

এক্স-রে করে এমন এক ধরণের বাতজাতীয় অবস্থাও নির্ণয় করা যায়, যার সূত্র রয়েছে এই লৌহ বিপাকক্রিয়ার গোলযোগের মধ্যেই।

অসত্য ভাষণের পরীক্ষা

মিথ্যা কথা বললে সেটা চট্ করে ধরে ফেলবার একটা উপায় এখন আমেরিকার পুলিশ আর নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে। এখনও পর্যন্ত সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের যে ব্যবস্থা প্রচলিত, 'সাইকোলজিক্যাল ষ্ট্রেস ইভ্যালুয়েটর' অর্থাৎ মানসিক আলোড়ন পরিমাপক যন্ত্রটি তার চেয়ে অনেক বেশী সুষ্ঠু এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক-ভাবে উপযোগী। মন বিচলিত হলে কণ্ঠস্বরে এমন সব কম্পন ঘটে, যেটা কানে শুনে বোঝা যায় না, অথচ এই যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। যে কোনও পেশীই যখন সক্রিয় হয়, তখন খুব সূক্ষ্ম-ভাবে স্পন্দিত হয়—আমাদের স্বরনালীর পেশীও। কথা বলবার সময়ে কেউ যদি মানসিক দিক দিয়ে সহজ, স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তখন তার স্বরতন্ত্রীর কম্পনগুলি অবদমিত হয়ে যায়। বক্তার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা টেপ্‌টা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বাজিয়ে শোনা হয় আসল গতির সিকি-ভাগ গতিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্র্যাফের উপর কাঁটার সাহায্যে নির্দেশ পাওয়া যায়, ঠিক কোন্ কথাটা বলবার সময়ে বক্তার মনের উপর চাপ পড়েছিল। কাঁটার ডগা থেকে যে তরঙ্গায়িত রেখা আঁকা হয়ে যায় গ্র্যাফের উপর, সেগুলি যদি এলোমেলোভাবে উঁচু-নীচু হতে থাকে, বুঝতে হবে বক্তার কোন মানসিক চাঞ্চল্য ঘটে নি। যখন বক্তার মনে চাঞ্চল্য বা দুর্ভাবনা থাকে, মিথ্যা বলবার সময়ে যা হওয়া স্বাভাবিক, তখন স্বরতন্ত্রীর মৃদু কম্পন শুরু হয়ে যায়। কাজেই, তরঙ্গায়িত রেখাগুলি হয় অনেকখানি নিয়মিত এবং সংযত।

বৃহস্পতি গ্রহে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সন্ধান

বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতি গ্রহের আবহমণ্ডলে এক ধরণের বর্ণহীন গ্যাস আবিষ্কার করেছেন। সেই গ্যাসের নাম অ্যাসিটিলিন। এই আবিষ্কার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এথেকে বৃহস্পতি গ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যেতে পারে। এই অতিকায় গ্রহটি থেকে বিজ্ঞানীরা আর যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা

থেকে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়েছে যে, বৃহস্পতি গ্রহে ঝঞ্ঝা ও বজ্রপাতের সময় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। জনৈক বিশেষজ্ঞ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীতে যে ধরণের বজ্রপাত ঘটে, তার সমান আকৃতিবিশিষ্ট এবং শক্তিসম্পন্ন দশহাজার গুণ বেশী বজ্রপাত ঘটলে বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে। বৃহস্পতি গ্রহের এক বর্গ-কিলোমিটার এলাকা থেকে যথোপযুক্ত পরিমাণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস পেতে হলে বছরে 53 হাজার বজ্রপাতের প্রয়োজন। অথবা প্রতি 10 মিনিটে প্রতিবর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে প্রায় একটি বজ্র-পাতেই সমহারে ঐ গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে।

সয়াবিন ও প্রোটিন

সয়াবিনের আর এক নাম প্রোটিন, এ কথা বললে কিছুই বাড়িয়ে বলা হয় না। কেননা এক কল্পনাতীত প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হচ্ছে সয়াবিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খাদ্য হিসেবে মানুষ সয়াবিনকে এখনও তেমনভাবে গ্রহণ করে নি। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দুনিয়ায় তো এর তেমন প্রচলন নেই বললেই চলে। ইলিনয়ের অন্তর্গত পিওরিয়ায় অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের গবেষণা-গারের রসায়ন-বিজ্ঞানী আর্থার এন্ডরিজ সয়াবিন-জাত প্রোটিনকে স্বাদে ও গন্ধে উন্নততর করে তোলা সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন। অন্ততঃ পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়নে সয়াবিনজাত প্রোটিনকে স্বাদে ও গন্ধে উন্নততর করে তোলা সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন। অন্ততঃ পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়নে সয়াবিনজাত প্রোটিনকে এমন স্নিগ্ধ ও উপাদেয় করে তোলা হচ্ছে, যার ফলে খাদ্যের পরিপূরকরূপে একে অনায়াসেই গ্রহণ করা যায়। শতকরা 40 থেকে 60 ভাগ অ্যালকোহল দ্রবণে সয়াবিন ভিজিয়ে নিয়ে এই সব সুফল পাওয়া যেতে পারে। যে অ্যালকোহল বিনের ভিতরে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, কারখানায় প্রক্রিয়নের পূর্বে সেগুলিকে বাষ্পীভবনের দ্বারা শুকিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে।

স্বাক্ষর সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া

কারও স্বাক্ষরকে কি সনাক্তকরণের অমোঘ পন্থা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে? সনাক্ত-করণের এই পথটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলবার জন্যে একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম স্বয়ংক্রিয় হস্তাক্ষর যাচাই। ব্যক্তিবিশেষের স্বাক্ষরের ধরণটি কেমন এই পদ্ধতিতে সেই দিকে নজর না দিয়ে নিজের নাম স্বাক্ষর করবার সময় কাগজের উপর কে কতটা চাপ দেয়, তা নির্ণয় করাই এই নতুন প্রক্রিয়ার মূল কথা। এক বিশেষ ধরণের বল-পয়েন্ট কলমের সাহায্যে এই চাপের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। তার পর ভবিষ্যতে তুলনামূলকভাবে বিচারের জন্যে ঐ চাপের মাত্রা রেকর্ড করে কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। নিরাপত্তা দপ্তরের প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী কর্তৃক এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ অথবা তার কণ্ঠস্বর যাতে তৎক্ষণাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করা যায়, বিমানবাহিনী এরূপ পদ্ধতির উদ্ভাবনেও সচেষ্ট রয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
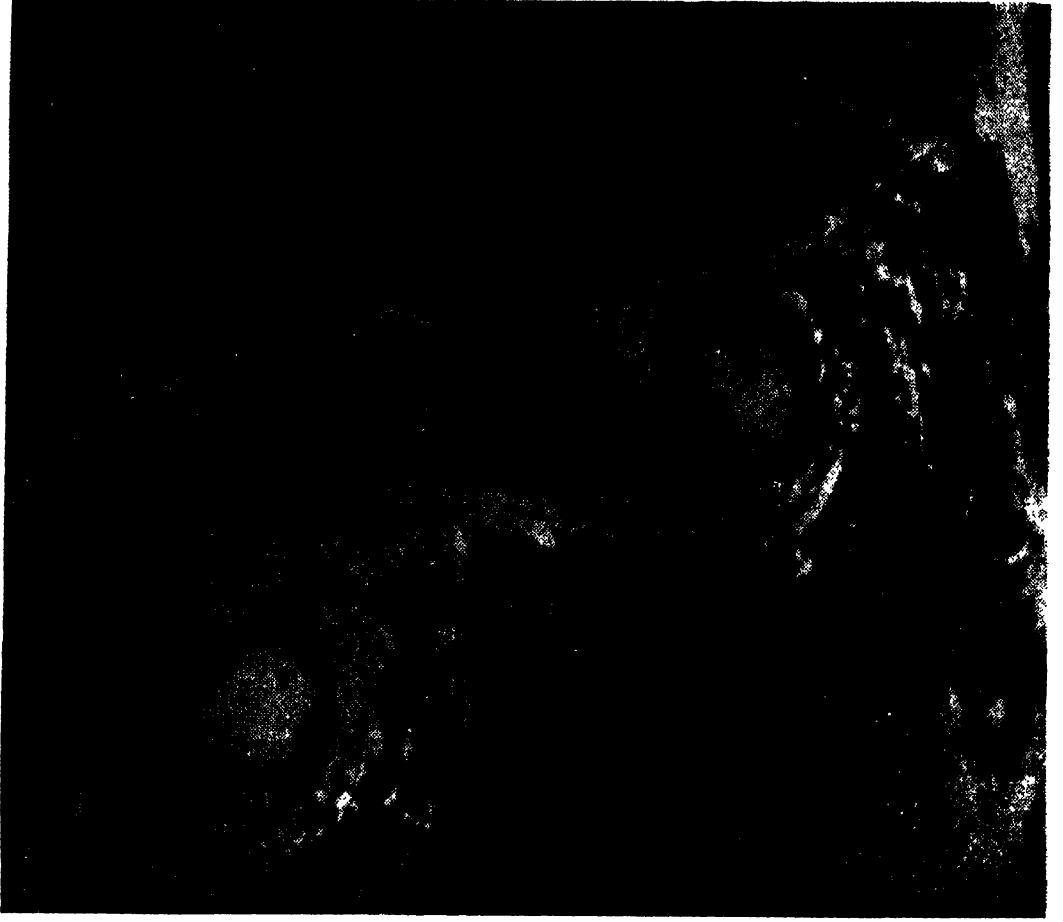
1974 সালের অগাষ্ট মাসে NOAA-3 নামক কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে গৃহীত ফটোগ্রাফের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই এবং মেক্সিকোর মধ্যে সামুদ্রিক ঝড় উৎপত্তির প্রাথমিক দৃশ্য। এই প্রাথমিক ছবি এবং সংগৃহীত অন্যান্য বিবরণ থেকে বিশেষজ্ঞেরা উক্ত অঞ্চলের যাবতীয় ঝড়ের পূর্বাভাস সংগ্রহ করেছিলেন।

দৌড়নো-পাখী

পাখী হলো প্রকৃতি জগতের এক বিচিত্র সৃষ্টি। উড়ন্ত পাখাদের বলা হয়, 'প্রকৃতির স্বাভাবিক বিমান'। মনুষ্য সৃষ্ট বিমানের চেয়েও যন্ত্রপাতি তার নিখুঁত। কিন্তু যে সমস্ত পাখী মোটেই উড়তে পারে না, তাদের দৈহিক গঠন, বাসস্থান এবং স্বভাব অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

বিশ্বের বর্তমান পক্ষিকুলকে দুটি বৃহৎ বিভাগে ভাগ করা হয়—

ক) উড়ন্ত পাখী

খ) দৌড়নো-পাখী

সাধারণ দৃষ্টিতে যদিও এই দুই বিভাগের প্রাণীরাই পাখী, কিন্তু এদের মধ্যে তফাৎ অনেক। উড়ন্ত পাখীদের দৈহিক গঠন এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যা কেবল বিমানের সঙ্গেই তুলনা চলে। অপরপক্ষে দৌড়নো-পাখীদের দৈহিক গঠনের রূপান্তর দ্রুত-গতিসম্পন্ন প্রাণীদের সঙ্গেই বেশী মিলে।

যদিও সরীসৃপ থেকে পাখীদের উৎপত্তি। কিন্তু দু-বিভাগের পাখীদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন উড়ন্ত পাখী থেকেই দৌড়নো-পাখীদের উৎপত্তি। দীর্ঘকাল স্থলচর হিসাবে জীবনযাপনের জন্যে ডানা ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ অব্যবহারের ফলে লুপ্ত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। সুতরাং উড়ন্ত পাখীদের পরে এদের উৎপত্তি।

আবার অন্য একদল বিজ্ঞানী মনে করেন উড়ন্ত পাখী ও দৌড়নো-পাখীদের বংশধর দুই ভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ। সুতরাং বর্তমান দু-বিভাগের পাখীই নিজ নিজ পরিণতি লাভ করেছে এবং তাদের উৎপত্তিও সমসাময়িক।

বর্তমান প্রবন্ধে দৌড়নো-পাখী আলোচ্য বিষয়।

বহু প্রাচীনকাল থেকে উটপাখী মানুষের পরিচিত। এদের পালক দিয়ে তৈরী হয় বিচিত্র পোষাক। অতীতে আফ্রিকার মানুষেরা ঐ পোষাক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতো এবং এখনও করে থাকে। এদের মাংস অবশ্য সুখাদ্য নয়।

বর্তমানে আফ্রিকা ও আরবের মরুভূমি অঞ্চলে এবং মেসোপটেমিয়ায় এরা বাস করে। এদের জীবাশ্ম (Fossil) ভারতের সিবালিক পর্বতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এককালে এরা এশিয়াতেও ছিল। সাধারণতঃ শুষ্ক ভূমিতে এরা বাস করে।

বিশ্বের বৃহত্তম পাখী হলো উটপাখী। ঘাড় তুললে মাটি থেকে আট নয় ফুট পর্যন্ত দেহটি উঁচু। ওজন কয়েক মণ। দেহ কাল পালকে ঢাকা। অকেজো ডানা ও লেজ সাদা। গলা ও পায়ে জজ্বা মাংসের মত লাল্‌চে। ঐ স্থানগুলিতে হলুদ রঙের সরু

উটপাখী

সরু চুলের মত অল্প কিছু পালক থাকে। স্ত্রী ও বাচ্চা পুরুষেরা ছাই রঙের। দ্রুত দৌড়বার জন্যে পা দুটি অত্যন্ত মজবুত, আঙুল দুটি করে, নখ ছোট এবং ভোঁতা। বালি অথবা শক্ত বস্তুর উপর দিয়ে দ্রুত দৌড়বার উপযোগী আঙুলের তলায় পুরু প্যাড্ আছে। মাথা শরীরের তুলনয়ে ছোট ; চক্ষু চওড়া ; মুখের হাঁ বড় ; ঘাড় অত্যন্ত লম্বা। নানা প্রজাতির উটপাখী আছে।

মরুভূমিই এদের প্রিয় বাসস্থান। ঘোড়া ছাড়া সব জন্তুর চেয়ে এরা দ্রুত দৌড়য়। প্রতি পদক্ষেপে 25 ফুট ব্যবধান থাকে। দৌড়বার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ডানা মেলে ধরে। কিন্তু গতিপথ বৃত্তাকার। তাই অশ্বারোহী শিকারীরা সহজেই এদের গতিপথ নির্ণয় করে ধরে ফেলে। এরা মরুভূমির অন্যতম দ্রুতগামী জন্তু এবং জিরাফ, কৃষ্ণসার মৃগ প্রভৃতির সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঝোপের মধ্যে দেহটি লুকিয়ে কেবলমাত্র মাথাটুকু তুলে শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখে।

সাধারণভাবে এরা শান্ত, কিন্তু রেগে গেলে সিংহের মত গর্জন করে। এদের খাদ্য উদ্ভিদ, কিন্তু কখনও কখনও স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এরা দীর্ঘদিন জল না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

সাধারণতঃ এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। একটি দলে একটি মাত্র পুরুষ এবং পাঁচ-ছয়টি স্ত্রী-পাখী থাকে। কখনও কখনও স্ত্রী-পাখীর সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশটিও হতে পারে।

ডিম পাড়বার পূর্বে স্ত্রী-উটপাখীর অধিকার নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ হয়, মারামারির সময় এরা পা এবং চঞ্চু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পায়ের ধাক্কা বিপদজনক। কখনও কখনও বিচিত্র ভাবভঙ্গীর সাহার্যেও স্ত্রী-উটপাখীর মনোরঞ্জন করে।

ডিম পাড়ার আগে পুরুষ পাখী বালির মধ্যে গর্ত করে একটি বাসা তৈরী করে। পুরুষের অধীনস্থ সমস্ত স্ত্রী-পাখীই একটি গর্তে ডিম পাড়ে। গর্তের মধ্যে তিরিশ-চল্লিশটি পর্যন্ত ডিম দেখা গেছে এবং মূলতঃ পুরুষ পাখীই ডিমে তা দেয়। বাসার আশেপাশে কিছু ডিম ছড়ানো থাকে। বাচ্চারা ঐগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বাচ্চা ফুটতে ছয়-সাত সপ্তাহ সময় লাগে। অতিরিক্ত সূর্যতাপ থাকলে ডিমে তা দেবার প্রয়োজন হয় না। ডিম অত্যন্ত বড়। উপজাতিরা উটপাখীর ডিমের খোল পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

রিয়া

রিয়া সাধারণতঃ আমেরিকান উটপাখী নামে পরিচিত। উটপাখীর সঙ্গে দেহের গঠন এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেক মিল আছে; তবে আকারে ছোট। এদের পালক দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা নানা রকম শৌখিন বস্তু তৈরী করে।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার পোম্পাই অঞ্চলে এরা বাস করে।

রিয়া

উটপাখার চেয়ে আকারে এরা কয়েক ফুট ছোট। বিভিন্ন প্রজাতির রিয়ার গায়ের রং বিভিন্ন রকমের। ডানা একটু বড়। মাথা, ঘাড় এবং উরুতে পালক আছে। দ্রুত দৌড়বার জন্যে পা দুটি শক্তভাবে তৈরী। পায়ে আঙুলের সংখ্যা তিন; নখ ধারালো।

সাধারণতঃ গাছবিহীন শুষ্ক মরুভূমিতে এরা বাস করে। দৃষ্টিশক্তি প্রখর। দৌড়বার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ডানা মেলে থাকে। উটপাখীর মতই এরা বৃত্তাকারে

দৌড়য় এবং হরিণদলের সঙ্গে ঘুরতে ভালবাসে। ঘাস, মূল, পতঙ্গ, শামুক, কিন্নর, গিরগিটি প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

এদের মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য বেশী। একটি দলে একটি পুরুষ এবং পাঁচ থেকে তিরিশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। একই গর্তে স্ত্রী-পাখীরা ডিম পাড়ে। পুরুষ পাখী 20 থেকে 30টি ডিম একসঙ্গে তা দেয়। আশেপাশে ছড়ানো ডিমগুলি বাচ্চারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পাঁচ-ছয় সপ্তাহ বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

ক্যাসোয়ারী

ক্যাসোয়ারী পাখী আকারে উটপাখী এবং এমুর পরে। এদের চুলের মত লম্বা পালক দিয়ে তৈরী হয় নানাবিধ পোষাকী বস্ত্র এবং কম্বল ও মাদুর। এদের মাংসও সুস্বাদু। এদের বাসস্থান অষ্ট্রেলিয়া এবং নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে। স্থানীয় বাসিন্দারা এদের পোষ মানিয়ে মুরগীর মত পালন করে। শিকারীরা অরণ্যে কুকুর নিয়ে এদের শিকার করে।
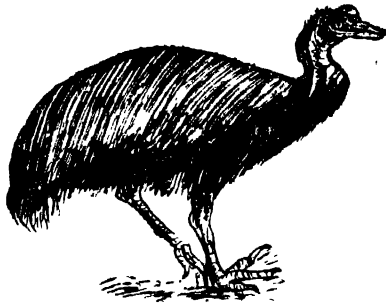
ক্যাসোয়ারী

এদের ডানা দুটি লুপ্ত প্রায় এবং অকেজো। দেহের আবৃত পালকগুলি যথেষ্ট লম্বা এবং চুলের মত। লেজে বিশেষ পালক নেই। গায়ের রং পালকের জন্য কালো। ঘাড় এবং মাথা প্রায় পালকশূন্য। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—মাথার উপর অস্থিকলা-নির্মিত একটি বড় ঝুঁটি। পা দুটি লম্বা, তিনটি করে ধারালো নখযুক্ত আঙুল। এই পাখীর বেশ কয়েকটি প্রজাতি জীবিত।

ক্যাসোয়ারী জাতির সমস্ত পাখী বনাঞ্চলে থাকে। এরা সূর্যের আলো পছন্দ করে না। খাদ্যান্বেষণের জন্যে সকাল-সন্ধ্যায় ঝোপঝাড়যুক্ত খোলা মাঠে বের হয়। গাছের ফল ও পোকামাকড় এদের খাদ্য। এরা অত্যন্ত দ্রুতগামী। নিমেষে চোখের আড়ালে চলে যায়। ঘুমাবার সময় বুক পেতে ঘুমায়। অবসর সময়ে নাচে, খেলা করে, বয়স্ক পুরুষেরা রেগে গেলে পা ছোঁড়ে এবং পালক কুঞ্চিত করে।

বর্ষাকালে বড় বড় নদীতে এরা সাঁতার কাটে, সমুদ্রেও স্নান করে। এদের জোড়ালো

কণ্ঠস্বর একমাইল দূর থেকেও শোনা যায়। বাচ্চাদের ডাকবার সময় স্বর নীচু, উত্তেজনায় ঘুৎ-ঘুং শব্দ করে। স্ত্রীরা শান্ত, কখনও কখনও বাঁশীর মত শব্দ করে।

ডিম পাড়বার সময় এরা জোড় বাঁধে। ঝোপের নীচে পাতা ও ঘাস দিয়ে বাসা করে। স্ত্রীরা পাঁচ-ছয়টি ডিম পাড়ে, পুরুষ তা দেয়। সাত সপ্তাহ পরে বাচ্চা হয়। বাচ্চারা একটু বড় হলে গোটা পরিবারকে দল বেঁধে ঘুরতে দেখা যায়।

এমু

এমু আকারে উটপাখী থেকে ছোট; কিন্তু ক্যাসোয়ারী থেকে বড়। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের মাংস খুব পছন্দ করে এবং চামড়ার নীচের চর্বিস্তর সংগ্রহ করে তেল উৎপাদন করে। এরা সহজেই পোষ মানে। এদের বাসস্থান পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া।

উটপাখীর চেয়ে এদের পা দুটি ছোট হলেও উচ্চতায় পাঁচ ফুট। ডানা লুপ্তপ্রায়। সাদা ও কালো পালকে দেহ আবৃত। গলায় একটি বড় থলি আছে, চঞ্চু চওড়া। মাথায় ও ঘাড়ের পালক ছোট ছোট। ঝুঁটি নেই, গলায় লতি নেই। দৃঢ়ভাবে গঠিত পায়ে তিনটি করে নখযুক্ত আঙ্গুল। এদের দুটি প্রজাতি আছে।

এমু

এদের স্বভাব মোটামুটি ক্যাসোয়ারীর মত। তবে খোলা বালুকাময় প্রান্তরে বিচরণ করে; যদিও জঙ্গলেও এদের দেখা যায়। সূর্যালোক পছন্দ করে না, দ্রুত দৌড়ায়। দৃষ্টিশক্তি প্রখর। ফল ও শিকড় প্রধান খাদ্য। এরা নিয়মিত জলপান করে, ভাল সাঁতার জানে। সাধারণতঃ হ্রস্ব শব্দ উচ্চারণ করে।

গর্তের মধ্যে স্ত্রী-পাখী ছয় সাতটি ডিম পাড়ে, পুরুষরাই তা দেয়। কখনও কখনও স্ত্রীরাও তা দেয়, আট সপ্তাহ পরে বাচ্চা হয়।

কিউই

দৌড়নো-পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো কিউ। অবশ্য টিনামাস পাখীকেও যদি দৌড়নো-পাখী বলে গণ্য করা হয়, তাহলে সেটিই হবে সবচেয়ে ছোট

দৌড়নো পাখী। তবে টিনামাসের এই দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মতবিরোধ আছে। কিউইয়ের ডিম ও মাংসস্থানীয় বাসিন্দারা খুবই পছন্দ করে। পালক নিয়েও নানা পোষাকী জিনিষ তৈরী হয়।

এদের বাসস্থান নিউজিল্যাণ্ড ও আশ-পাশের দ্বীপাঞ্চল।

এদের দেহের আকার ছোট—ক্রমশঃ সরু, লম্বা, নীচের দিকে বাঁকানো চঞ্চু, যার প্রায় অগ্রভাগে নাসারন্ধ্র অবস্থিত। মাথা, চোখ, ঘাড় এবং পা তুলনামূলকভাবে ছোট। পায়ে তিনটি করে আঙ্গুল ও একটি বুড়ো আঙ্গুল; ধারালো নখ। পা অনেক পিছনে অবস্থিত। ডানা ও লেজ লুপ্তপ্রায়। মাথা ও দেহ সরু চুলের মত পালকে আবৃত। এদের কয়েকটি প্রজাতি আছে।
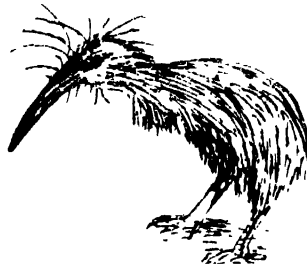
কিউই

পাহাড়ী বনাঞ্চলে এরা বাস করে এবং ঢালু পাহাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে থাকে। এরা নিশাচর পাখী, দিনের বেলায় গর্তের মধ্যে গোল হয়ে ঘুমায়। রাতে চলবার সময় দু-পায়ে ভর করে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়; আবার ঘাড় নামিয়েও চলে। সরু চঞ্চু দিয়ে পোকামাকড় এবং কেঁচো ধরে খায়। হাঁটবার সময় প্রতি পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য প্রায় এক গজ। এরা অত্যন্ত স্পর্শ ও গন্ধসচেতন এবং সন্ধ্যার সময় বাঁশীর মত শব্দ করে।

ডিম পাড়বার স্ত্রী-পাখী নখের সাহায্যে মাটিতে গর্ত করে এবং একজোড়া ডিম পাড়ে। পুরুষ ডিমে তা দেয় এবং বাচ্চা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সাম্প্রতিককালে দুটি দৌড়নো-পাখী পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া, যা উটপখীর চেয়ে আকারে বড় ছিল এবং ম্যাডাগাস্কারের হস্তী-পাখী। হস্তী-পাখীর দেহ হাতীর মতই বড় ছিল। ঐ পাখীর ডিমের খোলা আজও কারো কারো কাছে রয়ে গেছে, যা পানীয় জলের আধার হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং তাতে প্রায় দু-গ্যালন জল ধরে।

হরিমোহন কুণ্ডু*

*প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

করে দেখ

সাইফন (Siphon) পদ্ধতির নাম তোমরা অনেকেই জান। এটা একটা U-আকারের বাঁকানো নল, যার এক বাহু ছোট, অন্য বাহু বড়। এই নলটাকে কোন তরল পদার্থে (যেমন—জল) ভর্তি করে ছোট বাহুটা উপরে অবস্থিত কোন পাত্রের তরল পদার্থে ডোবালে ঐ পাত্রের জল নলের মধ্য দিয়ে নীচের পাত্রে পড়বে চিত্র—(ক)।

চিত্র (ক)　　　　চিত্র (খ)
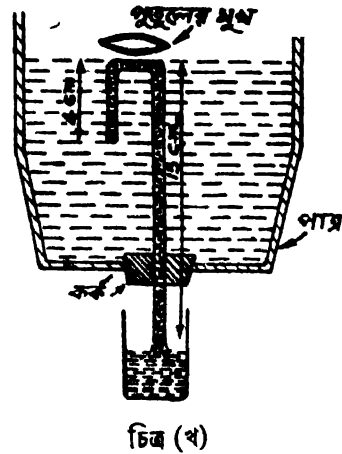
সাইফন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নানা ধরণের ব্যবহারিক যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এর সাহায্যে একটা খেলনাও বানানো যায়।

যা যা লাগবে :—

(1) U-আকারের বাঁকানো কাচ-নল। বড় বাহু=15 সেঃ মিঃ
ছোট বাহু=4 সেঃ মিঃ

(2) ছিদ্রযুক্ত কর্ক।

(3) বড় গামলা—1টি।

(4) 1টা বড় প্লাষ্টিকের পুতুল।

পদ্ধতি :—

U-নলের বড় বাহুটা কর্কের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। গামলার তলায় কর্কের মাপে 1টা ছিদ্র করে U-নলযুক্ত কর্কটা তার মধ্যে বেশ শক্ত করে এঁটে দিতে হবে। নলের বাঁকা অংশটা গামলার উপর তল থেকে যেন $1\frac{1}{2}''$-র মত নীচে থাকে চিত্র—(খ)।

এবার গামলার মধ্যে জল ঢালতে থাক। দেখা যাবে, জল যেই কাচ-নলের বাঁকা অংশের কাছে পৌঁছবে, অমনি জলতল 4 সেঃ মিঃ নীচে নেমে যাবে। কারণ জলতল বাঁকা অংশের কাছে পৌঁছনোর অর্থ সাইফন-নল জলপূর্ণ হওয়া। সাইফন জলপূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপরের জল নলের মধ্য দিয়ে নীচে পড়ে যাবে।

পুতুলটাকে যদি নলের উপর এমনভাবে বসানো যায়, যাতে তার মুখটা ঠিক কাচ-নলের বাঁকা অংশের কাছে থাকে, তাহলে জলতল যেই পুতুলের মুখের কাছে উঠবে, তৎক্ষণাৎ নেমে যাবে। গল্পে আছে পাপীরা নাকি তৃষ্ণার সময় জল পান করতে পারে না এই পুতুলটিকেও সেই রকম কোন পাপী বলে চালানো যায়।

পুর্ণেন্দু সরকার

বিবিধ

ফুল-কথা

ইউ. এন. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বিজ্ঞানীরা উপযুক্ত হর্মোন ব্যবহার করে কিছু উদ্ভিদে লিঙ্গ রূপান্তর ঘটিয়েছেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহন রামের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী কলা ফুলের গাছের লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটাবার ব্যাপারে সক্ষম হয়েছেন। কিছু হর্মোন ছিটিয়ে ওই গাছের স্ত্রী-ফুলগুলিকে করা হয়েছে পুরুষ ফুল এবং পুরুষ ফুলকে করা হয়েছে স্ত্রী-ফুল। এই উপায়েই যে সব স্ত্রী-ফুলের ফল হয় তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে গাছের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।

আর একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা যে রাসায়নিকপদার্থগুলি কিছু গাছে বিশেষ বর্ণ ও গন্ধ দান করে, তাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। পোকামাকড়েরা ওই বর্ণ ও গন্ধের জন্যই ফুলে ছুটে আসে।

লাঙ্গুলহীন বানর

পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—মেঘালয়ে গারো পাহাড়ে এক ধরণের লাঙ্গুলহীন বানরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বানরেরা তিন থেকে চারজন করে এক এক দলে থাকে এবং প্রত্যেক দলে স্ত্রী-বানর থাকে একটি করে। এই ধরণের লাঙ্গুলহীন বানর সচরাচর দেখা যায় না। উত্তর-পূর্ব ভারতে অরণ্য অঞ্চলে সম্প্রতি বন্যপ্রাণী নিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। দুর্লভ প্রাণী সংরক্ষণ এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক যথাক্রমে 19·00 এবং 9·50 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্ম বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।
2. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
4. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আপনার ত্বক সম্পর্কে আপনি যা জানেন না, বোরোলীন তা জানে....
বোরোলীনে অ্যান্টিসেপটিক সুরক্ষিত ক্রীম
বোরোলীন
ব্যবহারে শুষ্কতা,
রুক্ষতার অবসান;
ত্বক সুরক্ষিত।
বোরোলীন হাউস,
কলিকাতা-৩

মডার্ণ ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
৬০-এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট • কলি-৬ • ফোন-৫৫-২৫৪৭
৫৫-৬৫৬৫

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনত্রিংশত্তম বর্ষ — এপ্রিল, 1976 — চতুর্থ সংখ্যা

ভ্যাকুয়াম-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

শহর কলকাতায় গত 15ই ফেব্রুয়ারী থেকে 24শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভ্যাকুয়াম-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে একটি কোর্সের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে যে 40 জন শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় অর্ধেক ছিলেন কলকাতা ও কলকাতার শহরতলীগুলি থেকে, বাকী অর্ধেক এসেছিলেন বোম্বাই, পুণা, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, জামসেদপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে। বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত কথা হলো—শিক্ষার্থীদের অনেকে যেমন এসেছিলেন গবেষণাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে, তেমনি আবার অনেকে এসেছিলেন বেশ কয়েকটি শিল্প-সংস্থান থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, একদিকে যেমন বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণায় ভ্যাকুয়াম বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নানান শিল্পের কাজেও এই বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ আছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, 'ভ্যাকুয়াম' বলতে কি বোঝায়? আমরা জানি, পৃথিবীতে বায়ু আমাদের নিত্যসঙ্গী, ভূপৃষ্ঠের সর্বত্রই সবসময় বায়ু বিরাজমান। যখন আমরা সাধারণভাবে কোন পাত্রকে খালি বলি, তখন সেটা আসলে খালি নয়, সেখানে বায়ু আছে। কোন আবদ্ধ পাত্র থেকে বায়ু বের করে নিতে পারলে তবেই যথার্থ খালি বা ভ্যাকুয়াম অবস্থার সৃষ্টি হয়। খালি বা শূন্য বোঝাবার জন্যে একটি গ্রীক শব্দ থেকে 'ভ্যাকুয়াম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

ভ্যাকুয়াম বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। কোন আবদ্ধ পাত্র থেকে যদি বায়ু বের করে দিয়ে

পাত্রের ভিতর বায়ুর চাপ ক্রমাগত কমানো হয়, তাহলে প্রথমে সৃষ্টি হয় অল্প ভ্যাকুয়ামের (চাপ: 760 মি. মি. থেকে 1 মি. মি.), তারপর মাঝারি ভ্যাকুয়ামের চাপ: 1 মি. মি. থেকে 10^{-3} মি. মি.), তারপর উচ্চ ভ্যাকুয়ামের (চাপ: 10^{-3} মি. মি. থেকে 10^{-6} মি. মি.) এবং পরিশেষে অত্যুচ্চ ভ্যাকুয়ামের (চাপ: 10^{-6} মি মি-এর চেয়ে কম)। এমন ভ্যাকুয়াম অবস্থা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তুলনায় 10 কোটি ভাগেরও আবার 10 কোটি ভাগের মত সামান্য।

আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে ভ্যাকুয়াম অবস্থার সৃষ্টি করা হয় পাম্পের সাহায্যে। মেকানিক্যাল পাম্প, ডিফিউসন পাম্প, গেটার-আয়ন পাম্প প্রভৃতি নানারকম পাম্প আছে। যে মাত্রার ভ্যাকুয়াম প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী এক বা একাধিক পাম্প ব্যবহার করতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশেও এখন নানারকম পাম্প তৈরী হচ্ছে এবং তাদের উৎকর্ষ ক্রমশঃ বাড়ছে।

ভ্যাকুয়াম অবস্থা সৃষ্টি করবার সময় এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, যে-পাত্র বায়ুশূন্য করা হচ্ছে, তার ভিতরের স্থানটি বায়ু-সমুদ্রের মধ্যে শূন্যতার একটি দ্বীপের মত—পাত্রের বাইরের বায়ু সামান্যতম ছিদ্র পেলেও সেই পথে ভিতরে ঢুকে ঐ স্থান অধিকার করে নেবে। এজন্যে সেই পাত্রকে বায়ুনিরুদ্ধ রাখতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

আমাদের সুপরিচিত বৈদ্যুতিক বাল্ব, প্রতিপ্রভ বাতি, থার্মো ফ্লাস্ক ইত্যাদি থেকে সুরু করে রেডিওয় ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ভাল্বে, টেলিভিশনের পিক্চার টিউবে, এক্স-রশ্মি উৎপাদনে ব্যবহৃত কূলীজ নল প্রভৃতির গঠনে ভ্যাকুয়াম-বিজ্ঞানের প্রয়োগ আছে। যে সব পাত্রে তরল নাইট্রোজেন বা ঐ ধরণের কোন অতি শীতল পদার্থ রাখা হয়, সেগুলিতে থার্মোফ্লাস্কের মত অনুরূপ ব্যবস্থায় তাপের অনুপ্রবেশ কমিয়ে দেওয়ার জন্যে সেগুলির গঠনেও ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়।

কোন বস্তুর উপর সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতুর সূক্ষ্ম আবরণ দিতে হলে বায়ুশূন্য পরিবেশে ঐ সব ধাতুকে বাষ্পীভূত করে এবং বস্তুটির উপর সেই বাষ্পকে জমতে দিয়ে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। প্লাস্টিকের বালা, মূর্তি ইত্যাদির উপর ধাতুর পাতলা প্রলেপের মত সাধারণ কাজেও এই প্রক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার আছে।

অধিক উষ্ণতায় নানারকম ধাতব প্রক্রিয়ার জন্যে বায়ুর উপস্থিতি ক্ষতিকারক। এজন্যে বায়ু-শূন্য চুল্লী ব্যবহার করা হয়। এতে একটি অতিরিক্ত সুবিধা হলো এই যে, অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় ধাতুকে গলিয়ে ফেলা যায়। বায়ুর চাপ কম হলে গলনাঙ্কের মত স্ফুটনাঙ্কও কমে যায় বলে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় পাতনক্রিয়ায় বায়ুশূন্য পরিবেশ ব্যবহার করা হয়।

বায়ুশূন্য পরিবেশে বরফকে গরম করলে তা সোজাসুজি বাষ্পে পরিণত হয়। রক্তের প্লাজমা, বসন্তের প্রতিষেধক প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যে শীতল অবস্থায় শুষ্কীকরণে এই ঘটনাটিকে কাজে লাগানো হয়। পরে ব্যবহারের সময় উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশিয়ে দিলেই আবার মূল পদার্থটি ফিরে পাওয়া যায়। ফল, মাংস, কফি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে এই প্রক্রিয়াটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহু ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন আছে। সাম্প্রতিক কালে নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা ও মহাকাশবিষয়ক গবেষণায় এই প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষ কাজে লাগছে। মহাকাশের অধিকাংশ স্থানেই প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থা। তাই ভূপৃষ্ঠে যথাসম্ভব অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে মহাকাশযান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।

আমাদের দেশে ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পূর্ণ স্বনির্ভর না হলেও এই বিষয়ে বেশ কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। এই ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী, দু-রকম উদ্যোগই আছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, গত 10 বছরে বোম্বাইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের উচ্চ ভ্যাকুয়াম সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি তৈরী করেছেন। সম্প্রতি তাঁরা ইনডো-বর্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর সঙ্গে এমন একটি চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, যাতে ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ঐ কোম্পানী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে চাহিদা অনুযায়ী নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারেন।

এই প্রবন্ধের গোড়াতেই ভ্যাকুয়াম-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাবিষয়ক যে কোর্সের কথা বলা হয়েছে, তার উদ্যোক্তা ছিলেন ইণ্ডিয়ান ভ্যাকুয়াম সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ফিজিক্স অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখা; এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন ইণ্ডিয়ান ক্রায়োজেনিক্স কাউন্সিল। এই ধরণের কয়েকটি কোর্স ভারতে আগে হলেও পূর্বাঞ্চলে এটিই সর্বপ্রথম। এই রকম কোর্সের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা (এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের সহকর্মীরা) যেমন একদিকে ভ্যাকুয়াম-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, অন্যদিকে তেমনি গবেষণা ও শিল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে ওঠে, কারণ কেবল শিক্ষার্থীরাই নন, শিক্ষকেরাও আসেন গবেষণাগার ও শিল্প-সংস্থা থেকে। আমরা আশা করি, আলোচ্য কোর্সটির মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি কোর্সের আয়োজন করা হবে অদূর ভবিষ্যতে, যাতে শিক্ষার আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে গবেষণা ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে ওঠে—বর্তমান যুগে যে কোন দেশের উন্নতি নির্ভর করে এই যোগসূত্রের সার্থকতার উপর।

জয়ন্ত বসু

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

হর্ষনারায়ণ বসু*

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কোন আলোচনার সুরুতেই আমার যে কথাটা মনে হয়, সেটা হলো তাঁর মত বিরাট ব্যক্তির সমগ্র চরিত্রায়ন বা চিন্তাধারার সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ করা একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সকলেই জানেন অপরের সমস্যায় মাস্টার মশাইয়ের (আচার্য বসু) সহৃদয় আগ্রহের কথা—কত লোকের বোঝা স্বেচ্ছায় তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিতেন। অথচ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তিনি নিজের প্রসঙ্গ প্রায় তুলতেই চাইতেন না। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বা বন্ধুমহল ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানবার উপায় ছিল না। বাইরের কারো মনেই হতো না যে এই অকৃপণ, সহৃদয় ও 'অবারিত দ্বারের' ওধারে কোন সমস্যা থাকা সম্ভব। ফলে আমরা সকলেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের খণ্ডচরিত্রমাত্র নিয়ে নিজেদের বুদ্ধিসাধ্য একটা চরিত্রায়নের চেষ্টা করি।

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন ভারতীয়দের ভাবধারা বুঝতে গেলে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তাঁদের যখন ছাত্রাবস্থা, তখন বাংলা

*আই. আই. টি. খড়্গপুর

তখন সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে এবং এর ঢেউ সমস্ত সচেতন যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে 'বড় একটা কিছু' করবার সাধনায়। সে যুগে দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে একটা অহেতুক অতি বিশ্বাস বাসা বেঁধেছিল ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে। এই হীনমন্যতার সুযোগে বিদেশীয়দের মনেও একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, ভারতীয়েরা নিম্নস্তর মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী, যাদের পক্ষে ইউরোপীয়দের মত মানসিক বা শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করা বা বিদ্যা-বুদ্ধিতে পারদর্শী হবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। বহু এদেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও এই জাতীয় কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সে যুগে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করবার সময় স্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যে সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাতে ভারতীয়দের মানসিক সামর্থ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর অশ্রদ্ধাই প্রকট ছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন তাঁর অপূর্ব সুন্দর পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করে দেখাবার আমন্ত্রণে, তখন তাঁকে বহু অবিশ্বাসীদের অশ্রদ্ধা ও অবিবেচনার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই জাতীয় অনেক ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাছাড়া ব্যবহারিক জীবনেও দেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিভেদকারী অসমব্যবহারের কথাও তাঁদের অজানা ছিল না। ফলে তদানীন্তন প্রতিভাশালী ছাত্রশ্রেণী, বিশেষতঃ যাঁরা ছিলেন সমাজ-সচেতন ও স্বদেশকামী, তাঁরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন সর্বতো ভাবে ইউরোপীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়ে ওঠবার সাধনায়। সত্যেন্দ্রনাথের আচরণ ও কর্মধারার মধ্যেও এর প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানাচার্যের কাজের রীতিনীতি দেখে আমার অন্ততঃ মনে হতো যে, ইউরোপীয় মনীষীরা যে সকল সমস্যার সমাধানে বিফলমনোরথ হয়েছেন, সেগুলির সমাধান করাতেই যেন তিনি বেশী আনন্দ পেতেন। ঐসব সমস্যার আসল সমাধান হয়ে যাওয়ার পর ঐ ব্যাপারে তাঁর আর কোন লক্ষণীয় উৎসাহ থাকতো না।

ভারতীয়দের যন্ত্রকুশলতার অভাব—বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে—একটা প্রবাদ-বাক্যের মত দাঁড়িয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করবার কাজে অক্ষমতার জন্যে আধুনিক গবেষণায় আমাদের যথোচিত অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে না—একথা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। দেশীয় কারিগরের সাহায্যে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ করা একটা অপরিহার্য চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের যে অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি, তার মূলেও ছিল তাঁর গভীর স্বদেশপ্রীতি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রেরণা। তাছাড়াও অবশ্য ছিল তাঁর ছাত্র ও স্নেহভাজনদের গবেষণার কাজে সহায়তা করবার তাগিদ।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ যখন প্যারিসে ছিলেন, গবেষণার উদ্দেশ্যে, তখন তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল অধ্যাপক লাঁজেভাঁর (Langovin) সঙ্গে। শুনেছি অধ্যাপক লাঁজেভাঁ ছিলেন পদার্থ-তরঙ্গবাদের আবিষ্কর্তা লুই ডি ব্রগলির (Louis De Broglie) গুরুস্থানীয় এবং প্রায় ঐ সময়ই ডি ব্রগলি পদার্থ-তরঙ্গবাদ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, যদিও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ইউরোপে থাকা-কালেই কোয়াণ্টাম-বলবিদ্যার গোড়াপত্তন হয়, তথাপি তিনি যেন ঐ ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখান নি ঐ যুগে। তখন তিনি প্রিন্স ডি ব্রগলির বাড়ীতে এক্স-রে যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করবার ব্যাপারে নিমগ্ন। কোয়াণ্টাম-বলবিদ্যায় তাঁর এই আপাত অনাগ্রহের কারণ

ব্যাখ্যা হিসাবে মনে হয় যেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাবার মত ব্যক্তি বা অবস্থা তখন ওখানে ছিল না। তাছাড়া দেশে ফিরে গবেষণাগারে উন্নততর বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নির্মাণ করবার সঙ্কল্প হয়তো তাঁর মনে অনেক দিন থেকেই ছিল। পরের কয়েক বছরে তাঁর কর্মধারার পর্যালোচনা করলে এই ধারণারই সমর্থন পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা ভাবতে গেলে প্রধানতঃ আর একজনের নাম স্বতঃই আমাদের মনে আসে, তিনি হলেন তাঁর সহপাঠী কর্মযোগী আচার্য মেঘনাদ সাহা। আমাদের দেশের বর্তমান যুগের এই দুই বিস্ময়কর প্রতিভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের আদি-যুগে একসঙ্গে পড়াশুনা ও আলোচনা করবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তার ফলে তাঁদের প্রতিভা স্ফুরণের পথ সুগম হয়েছিল। দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণাগারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয় বহুলাংশে তাঁদের সমবেত চেষ্টায়। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠীর অনুরোধে দূরদর্শী উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, বিশেষ করে আধুনিকতম বিষয়বস্তু পড়াবার উদ্দেশ্যে, তখন যতীন্দ্রনাথ রাজবন্দী হলেন, শৈলেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার এড়াতে দেশত্যাগ করলেন এবং অধ্যাপক রামনের বছর দুয়েক দেরী হলো তাঁর পদে যোগ দিতে। তার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী তরুণদের চেষ্টাতেই বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান পড়াবার বন্দোবস্ত হলো। সেকালের দুরূহ বিষয়গুলি পড়াবার দায়িত্বও এঁদের উপর ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে কোন বইপত্রও তখন সুলভ ছিল না। অতি অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার মান যে বেশ উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তার কৃতিত্ব সবটাই এই সহপাঠীদ্বয় ও তাঁদের সহকর্মীদের প্রাপ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা ভারতের বিজ্ঞান জগতের দুটি অবিস্মরণীয় নাম। দু-জনেই ছিলেন বিরাট মেধা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁদের প্রকৃতি, কর্মপদ্ধতি মানসিকতা ও প্রতিভার ধরণে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার পক্ষে, বিশেষ করে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এঁদের দু-জনের গুণাবলী ছিল পরস্পরের পরিপূরক। যতদিন এঁদের দু-জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলোচনা ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানের অনায়াস সুযোগ ছিল, ততদিন দু-জনেই উচ্চাঙ্গ গবেষণার ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক নানাবিধ কারণে পরিণত বয়সে তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান অনায়াসলভ্য ছিল না। আমি মনে করি, বৈজ্ঞানিক জগতের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এর ফলে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান দিয়ে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করা যায় না। নানারকম বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার কথা প্রায় একটি কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে এবং তা সর্বজন-বিদিত। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, চিন্তাশীল অধ্যাপকেরা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে কিন্তু এই দলে ফেলা যায় না। দেশের ও দশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে আমরা তাঁর গভীর আগ্রহ ও প্রখর দূরদৃষ্টি লক্ষ্য করেছি। সাম্প্রতিককালে প্রায়ই শোনা যায়, সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যে প্রাসঙ্গিক গবেষণার যৌক্তিকতার কথা। অথচ বহু দিন আগেই, দেশের স্বাধীনতা লাভের গোড়া থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের তাগিদ দিতেন দেশের ও দশের প্রকৃত উপকারে লাগে—এই জাতীয় সমস্যায় গবেষণা করবার জন্যে। দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাসঙ্গিক সমস্যায় তাঁর আগ্রহের ফলেই হয়তো তিনি

তেজস্ক্রিয়-রসায়ন, জারমেনিয়াম নিষ্কাশন, হিলিয়াম আহরণ প্রভৃতি সমস্যায় একথানি আগ্রহী হয়েছিলেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসাধনার কথা অনেকেই জানেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়ন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। দেশে অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা ভুলে গিয়েও—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার জন্যে যে অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস তিনি করে গেছেন—শুধু সে জন্যেই ভবিষ্যৎ দেশবাসীরা তাঁকে স্মরণ করবে। দেশের বিদগ্ধমহলের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষায় ইংরেজী ছাড়া আমাদের অন্য কোন গতি নেই এবং ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব নয় অথবা শ্রেয়ও নয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির চেষ্টায় অসাধ্যসাধন হয়েছে। বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা শুধু সম্ভবই নয়, তা একান্তই কাম্য—সার্বজনীন কল্যাণের জন্যে এই ধারণা পণ্ডিতমহলেও স্বীকৃত হয়েছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি—এই বিরাট প্রতিভাধরের একটা সুযোগ্য কীর্তি বলে আমাদের ধারণা। আজকের এই দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী দিবসের স্মৃতিবাসরে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই অক্ষয় কীর্তি উত্তরোত্তর গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টায়—এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার আজকের বক্তব্য শেষ করি।

[আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকী সভায় প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

বেতার-বিস্ফোরণ ও তার পরিণতি

নারায়ণচন্দ্র রাণা

পৃথিবীর বুকে বিধ্বংসী ভূমিকম্প কিংবা যুদ্ধের তাণ্ডবলীলার ঘটনা বিরল নয়। তার জন্যে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সব তুচ্ছ পার্থিব বিপর্যয়মূলক ঘটনার তুলনায় কোটি কোটি গুণ মহাপ্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানে প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এদের খবর আমরা রাখি না। তাছাড়া সূর্যের বুকেও প্রায়ই বড় বড় ঝড় হয়, তাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৃথিবীর চেয়েও ভারী এমন এক একটি গ্যাসপিণ্ড সূর্যের দেহ থেকে লাফিয়ে উঠে ঘণ্টায় প্রায় লক্ষ মাইল বেগে। পৃথিবীতে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রেডিওগুলি কিছু সময়ের জন্যে এলোমেলোভাবে বাজতে থাকে; কিন্তু খালি চোখে সূর্যের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এই সব ঝড়ের খবর যারা বয়ে নিয়ে আসে, তারা আলোকের বেগে চলমান এক ধরণের তরঙ্গ। এদের নাম তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। বেতার-তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি, সাতরঙা দৃশ্য আলো, অতিবেগুনী রশ্মি রঞ্জেন রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি এই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের গুণভেদে এক একটি বিশেষ নাম। মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে পৌঁছুতে গেলে এই সব তরঙ্গ বা রশ্মি সমূহের অবশ্যই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে হবে। বেতার-তরঙ্গের কিছু অংশ এবং দৃশ্য আলো ছাড়া বাদ বাকী সমস্ত রশ্মি বায়ুমণ্ডলের আয়নমণ্ডলের দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। কিন্তু মহাকাশের 'বিভিন্ন

জ্যোতিষ্ক বিভিন্ন ধরণের তরঙ্গ বিকিরণ করে। ফলে রাতের আকাশে আমরা খালি চোখে যে সব নক্ষত্র দেখি, তারা সকলেই সাত রঙা দৃশ্য আলোর তরঙ্গ ছড়ায়। বেতার-তরঙ্গের অনুভূতির জন্যে আমাদের যদি অপর কোন চোখ থাকতো, তবে নিশ্চয়ই লুব্ধক নক্ষত্র কিংবা ধ্রুবতারাকে আর দেখতে পেতাম না। এক নতুন ধরণের নক্ষত্রের সমাবেশ দেখতে পেতাম, যাদের বিজ্ঞানীরা বলেন, বেতার-নক্ষত্র, বেতার-গ্যালাক্সী ইত্যাদি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বেতার-নক্ষত্র কিংবা রঞ্জেন নক্ষত্রের মধ্যে কোন ঝড় কিংবা বিস্ফোরণ ঘটলে আমরা কেউ বুঝতে পারবো না। কেবলমাত্র বিভিন্ন বেতার মানমন্দিরের (Radio Observatory) শক্তিশালী বেতার-দূরবীনের সংগ্রাহকের (Antenna) মুখ উৎসের দিকে ধরলে তার বিভিন্ন মিটারের কাঁটার নড়ন-চড়ন থেকে সেখানে কি ব্যাপার ঘটছে, বোঝা যাবে। কিন্তু রঞ্জেন-নক্ষত্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বসে তাও জানা সম্ভব নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে পৃথিবী পরিক্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পাঠানো দূরবীন দিয়ে তাদের তত্ত্ব নেন। উহুরু (Uhuru), এরোবী (Aerobee) প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহ বিজ্ঞানীদের আজ পর্যন্ত বহু রঞ্জেন-নক্ষত্রের সন্ধান দিয়েছে এবং তাদের অবস্থা সম্বন্ধে নানা তথ্য সরবরাহ করেছে।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি যে কোন দিন উত্তর-পূর্ব আকাশে সন্ধ্যার সময় হংসমণ্ডলকে (Cygnus) দেখা যায়। এই মণ্ডলের অন্তর্গত কয়েকটি রঞ্জেন-নক্ষত্র যেমন Cyg x 1, Cyg x-2, Cyg x-3 প্রভৃতি রয়েছে। এদের মধ্যে Cyg x-3 নক্ষত্রটির মধ্যে একটি প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে গেছে 1972 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। Cyg x-1 নক্ষত্রটিও অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল 1971 সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। এরা বিস্ফোরণের আগে সাধারণ রঞ্জেন-নক্ষত্র হিসেবে বিশেষরূপে পরিচিত থাকলেও তাদের ক্ষীণ-বেতার-তরঙ্গ বিকিরণের কথাও জানা ছিল। যাই হোক, Cyg x-3-এর বিস্ফোরণের সংবাদ হয়তো সকলের অলক্ষ্যে পৃথিবী ছাড়িয়ে বহু দূরের মহাকাশে পুনরায় মিলিয়ে যেতো, কারণ তখন বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পার্সিয়ুস মণ্ডলের মায়াবতী (Algol) নক্ষত্রের উপর অধিক নজর দিচ্ছিলেন। 1972 সালের 2রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় ক্যানাডার অ্যালগনকুইন পার্ক মানমন্দির জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রেগরী (P.C.Gregory) 150′ বেতার-দূরবীন নিয়ে মায়াবতী নক্ষত্রের উদয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ইত্যবসরে Cyg x-3 কি করছে দেখতে তাঁর ইচ্ছা হলো। তাঁর দূরবীন 1,050 কোটি হার্ৎস্—এই বেতার-কম্পাঙ্কে বাঁধা ছিল, অর্থাৎ উপরিউক্ত কম্পাঙ্কের যে কোন বেতার তরঙ্গ ঐ দূরবীনে পড়লে তার পরিমাপ সম্ভব হয়। Cyg x-3 তখন প্রচণ্ড শক্তিশালী বেতার-নক্ষত্রের মত বেতার-তরঙ্গ পাঠাচ্ছে এবং তা তার সাধারণ অবস্থার চেয়ে অন্ততঃ কয়েক-শ' গুণ জোরালো। গ্রেগরী তাঁর যন্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভার্জিনীয়ার গ্রীনব্যাঙ্ক মান-মন্দিরে (NRAO) টেলিফোনযোগে খবর দিলেন। সেখানে এল্‌মিং (R. M. Hjellming) এবং বালিক (B.Balick) 269·5 কোটি এবং 808·5 কোটি হার্ৎস্—এই দুই বেতার-কম্পাঙ্কে Cygx-3-এর চরিত্র লিপিবদ্ধ করতে সুরু করলেন। এই বিস্ফোরণের সংবাদ তৎক্ষণাৎ ক্যালিফোর্ণিয়া, ম্যাসাচুসেট্‌স্, মিচিগান, প্যারিস, জড্রেল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ডজনখানেক বড় বড় মানমন্দিরে এবং পৃথিবী পরিক্রমারত 'উহুরু' প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহদেরও Cyg x-3-কে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক সপ্তাহব্যাপী পর্যবেক্ষণের ফলাফল বেরুলো 'নেচার' পত্রিকার 20শে অক্টোবরের বিশেষ সংখ্যায়। তাতে এই বিস্ফোরণসংক্রান্ত মোট পেপার ছিল 21টি।

বিস্ফোরণের আগে Cyg x-3-কে শেষ দেখা হয়েছে 31শে অগাষ্ট সকাল 8-টা (G. M. T.) পর্যন্ত। বিস্ফোরণের চূড়ান্ত পর্যায় 2রা সেপ্টেম্বর রাত্রি 11টা 45 মিনিট। তারপর বেতার-তরঙ্গের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং 12ই সেপ্টেম্বর পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তারপর আবার 18ই সেপ্টেম্বর আর একবার পূর্বের মত বেতার-বিস্ফোরণ ঘটে। এইভাবে অক্টোবরের 6 তারিখ পর্যন্ত মোট চার-বার পুনরাবৃত্তি হয়। এই সমস্ত বেতার-বিস্ফোরণের প্রত্যেকটিতে রঞ্জেন রশ্মির পরিমাণ প্রায় বাড়ে নি বললেই চলে (সর্বাধিক স্বাভাবিক অপেক্ষা দু-গুণ)। সুতরাং সুপারনোভা যেমন দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে নক্ষত্রের অমিয় বিস্ফোরণ, তেমনি cyg x-3-এর বিস্ফোরণ সুপারনোভারই যেন বেতার-সমতুল্য।

বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ফোরণের আগে এটি একটি পরস্পর পরিক্রমারত যুগল নক্ষত্র (Binary star) হিসেবে পরিচিত ছিল। কারণ তার ঔজ্জ্বল্য 4·8 ঘণ্টা অন্তর পর্যায়বৃত্তভাবে পরিবর্তিত হতো। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বলতে পারেন, কি রকম ভরের দুটি নক্ষত্র কি রকম দূরত্ব থেকে একে অন্যের চারদিকে ঘুরতে থাকলে 4·8 ঘণ্টা অন্তর তার পর্যায়কাল হতে পারে। পরিক্রমণের সময় পৃথিবীর দিক থেকে একে অপরকে বিভিন্নভাবে আড়ালে করে চলে বলে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটতে থাকে। এই অবস্থায় cyg x-3 যথেষ্ট রঞ্জেন-রশ্মি বিকিরণ করতো। আমরা জানি, কোন জিনিষকে ক্রমশঃ গরম করতে থাকলে প্রথমে ক্ষীণ লাল আলো, পরে ক্রমশঃ হলুদ, নীল প্রভৃতি আলো দিতে থাকে। আরও গরম করতে থাকলে অতিবেগুনী রশ্মি—এমন কি, রঞ্জেন রশ্মিও বের হতে পারে। তবে এজন্য তার উষ্ণতা কয়েক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হওয়া চাই। এত অধিক উষ্ণতায় বস্তু কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না, অর্থাৎ তার পরবর্তী চতুর্থ অবস্থা (প্লাজ্‌মা) প্রাপ্ত হয়। কঠিন অবস্থায় অণুগুলি সংঘবদ্ধভাবে থাকে, তরলে সেই আন্তরাণবিক তীব্র আকর্ষণ বলে শিথিল হয়, গ্যাসীয় অবস্থায় অণুগুলি (তাপীয় শক্তির প্রভাবে) ছন্নছাড়া হয়ে দৌড়ুতে থাকে, আর প্লাজ্‌মা অবস্থায় কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলিও ছাড়া পায়। প্রচণ্ড গরমে তখন সবাই এমন জোরে কাঁপতে থাকে, দৌড়ুতে থাকে এবং ঘুরতে থাকে যে, পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীন আর ইলেকট্রনদের ধরে রাখতে পারে না। ঐ সমস্ত কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রন ইত্যাদি তড়িৎযুক্ত কণাগুলির মধ্যে পরস্পর ধাক্কাধাক্কির ফলে রঞ্জেন রশ্মির উদ্ভব হয় এবং তা বিকিরণের আকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বিকিরণের যেটুকু পৃথিবীর দিকে বেরিয়ে আসে, তারা আন্তঃদেশীয় (Inter-stellar) গ্যাস-কণার (প্রধানতঃ হাইড্রোজেনের) রাজ্য ভেদ করে বহু বছর পরে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। এই বিশ্বের সর্বত্রই হাইড্রোজেনের প্রাচুর্য। হাইড্রোজেন গ্যাস একটি বিশিষ্ট কম্পাঙ্কের (21-সে. মি. তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত) বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শোষণও করতে পারে। cyg x-3-এর ক্ষেত্রে ঐ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ আন্তঃদেশীয় হাইড্রো-জেনের দ্বারা কতটা শোষিত হয়েছে, তা পরিমাপ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। হিসাব অনুযায়ী, জ্যোতিষ্কটি পৃথিবী থেকে কম করেও 30 হাজার আলোক-বর্ষ দূরে রয়েছে (এক আলোক-বর্ষ—সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বেগে আলো এক বছরে যতদূর যায়—588 হাজার কোটি মাইল)। সুতরাং 1972 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবী থেকে যে বিস্ফোরণটি লক্ষ্য করা হলো, প্রকৃতপক্ষে cyg x-3-তে সেটি ঘটেছে প্রায় 30 হাজার বছর আগে অর্থাৎ ঐসব বেতার-তরঙ্গগুলি সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক

কালে পৃথিবী থেকে জ্যোতিষ্কটির মোট দূরত্বপথের প্রায় পাঁচ-ষষ্ঠাংশ অতিক্রম করে ফেলেছে। যাই হোক, এখন দেখা যাক, সেখান থেকে বেতার-তরঙ্গ কেন আসে?

কোন তড়িদাহিত কণা যখন মুক্তভাবে চলবার পথে হঠাৎ ত্বরান্বিত কিংবা মন্দীভূত হয়, তখন গতিপরিবর্তনের (তথা গতীয় শক্তির পরিবর্তন) প্রমাণস্বরূপ তার দেহ থেকে তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি তরঙ্গাকারে নির্গত হয়। আবার কোন চৌম্বক-ক্ষেত্র ভেদ করতে গিয়েও গতিশীল তড়িদাহিত কণাগুলি ত্বরান্বিত হতে পারে। সাধারণতঃ প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোর তুল্য বেগে চলমান ইলেকট্রন বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। প্রাপ্ত তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঐ যুগল নক্ষত্রের মধ্যে একটির আকার খুব ছোট এবং সেটি খুব সম্ভব সূর্যের সমান ভরবিশিষ্ট একটি নিউট্রন তারকা। এর চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে একটি অশান্ত অতি উষ্ণ প্লাজ্মা বলয়। জুড়ি নক্ষত্রটি আকারে এবং ভরে যথেষ্ট বড়। যাই হোক, বিস্ফোরণের সময় ঐ অশান্ত প্লাজ্মা বলয়ের কিছুটা অংশ 'রোশ সীমা' (যার মধ্যে বস্তু মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) অতিক্রম করে এবং সেকেণ্ডে প্রায় 20 হাজার মাইল বেগে চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের (প্রাবল্য প্রায় 0.1 গাউস) মধ্যে নিক্ষিপ্ত মহাজাগতিক ইলেকট্রনগুলি (সংখ্যায় প্রায় 10^{40}) ত্বরান্বিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই বিস্ফোরণের স্থিতিকাল ছিল প্রায় একদিন। কিন্তু পৃথিবী থেকে চার-পাঁচদিনব্যাপী বিস্ফোরণ লক্ষ্য করবার কারণ হলো তার অস্বাভাবিক বিশাল আকৃতি। একপ্রান্তের বিস্ফোরণের সংবাদ অপর প্রান্তে পৌঁছতেই সময় লাগে একদিনের চেয়েও বেশী। বারবার বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে cygx-3 ক্রমশঃ স্থায়ী অবস্থার দিকে এগিয়ে এলেও অনেকের মতে এটি মহাজাগতিক রশ্মির একটি অন্যতম স্থায়ী উৎস।

cygx-1 ও বিস্ফোরণের আগে একটি রঞ্জেন নক্ষত্র ছিল। কিন্তু বিস্ফোরণের পরে এটি একটি স্থায়ী বেতার-নক্ষত্রের উৎসে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া নিউট্রন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হবার পর অনেকেরই অনুসন্ধানী দৃষ্টি পড়েছে কালো গহ্বরের (Black hole) উপর। সৌভাগ্যবশতঃ cygx-1 নক্ষত্রটির কেন্দ্রভাগে এই কালো গহ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে থর্ন (K. S. Thorne) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত। তাই প্রকৃতিতে কিরকম অবস্থায় একটি কালো গহ্বর থাকে, সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য এখানে দেওয়া যেতে পারে।

cyg x-1-এর কেন্দ্রে যে কালো গহ্বর রয়েছে তার প্রবল আকর্ষণে প্রায় 4 কোটি মাইল দূরের একটি অতি বৃহৎ জুড়ি নক্ষত্রের দেহ থেকে গ্যাসীয় পদার্থগুলি প্রচণ্ডবেগে গহ্বরটির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু গহ্বরটির নিজের কক্ষাবর্তনের জন্যে এই গ্যাসের স্রোত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গহ্বরটির চারদিকে বৃত্তাকার পথে প্রচণ্ডবেগে ঘুরতে থাকে। ফলে এই ঘন গ্যাস-পিণ্ড একটি চাকৃতির আকার ধারণ করে, যার বেধ (Thickness) স্থানে স্থানে 60-70 হাজার মাইল পর্যন্ত এবং ব্যাসও প্রায় 25 লক্ষ মাইল। গহ্বরের আকর্ষণে চাকৃতিটি আরও সঙ্কুচিত হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাপীয় শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে চাকৃতিটির অন্তর্ভাগের উষ্ণতা এত বৃদ্ধি পায় যে, সেখান থেকে রঞ্জেন রশ্মি বিকিরিত হতে থাকে। এই বহির্মুখী বিকিরণজনিত চাপ মাধ্যাকর্ষণজনিত সঙ্কোচনকে বাধা দেয়। সেজন্যে গহ্বরের কাছাকাছি কয়েক লক্ষ মাইল জুড়ে গ্যাসকণাগুলি কেঁপে উঠে। সেই সঙ্গে একটি বলয়াকৃতিবিশিষ্ট এবং তিন লক্ষ মাইল উঁচু একটি গ্যাসের পাঁচিল তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু এই গ্যাসীয় পাঁচিল আরও ভিতরের দিকে

মাধ্যাকর্ষণের প্রবল প্রভাবে ক্রমশঃ পাত্‌লা হয়ে দু-সাতহাজার মাইল ব্যাসযুক্ত একটি অতি পাত্‌লা চাকৃতিতে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে ভিতরকার 30-40 মাইলব্যাপী অঞ্চলে গ্যাসীয় চাকৃতির বেধ এক মাইলের চেয়েও যথেষ্ট কম। গহ্বরের তীব্র আকর্ষণে ঐ অঞ্চলের গ্যাস আর আবর্তন করতে পারে না, বরং প্যাঁচানো পথে (ঘূর্ণনের জন্যে) চিরতরে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঐ অঞ্চলটির উষ্ণতা অন্ততঃ কয়েক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং তাই তা রঞ্জেন রশ্মি বিকিরণের একটি প্রধান উৎস। এরই কেন্দ্রে রয়েছে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান কালো গহ্বরটি। এর ভর প্রায় সূর্যের ভরের আটগুণ। তত্ত্বগতভাবে কালো গহ্বরের মধ্যে থেকে কোন বস্তুকণা এমনকি আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং cyg x-1-এর কেন্দ্রস্থল মহাকাশের বুকে অসীম অন্ধকারময় একটি শাশ্বত গুহা। বিশ্লেষণের বিবরণের মধ্যে থেকেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন তাঁদের বহু আকাঙ্খিত কালো গহ্বর।

নক্ষত্রলোকে গ্রহজগৎ

শৈলেশ সেনগুপ্ত

বিজ্ঞান যেখানে রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে, সেখানে কাল্পনিকতারও অবসান ঘটে। মানুষ সশরীরে চন্দ্রলোকে গিয়ে উপস্থিত হবার পর থেকে চাঁদ নিয়ে কেউ আর কল্পকাহিনী লেখে না। এমনকি সৌরজগতের গ্রহগুলি নিয়ে কাহিনী রচনাও দারুণভাবে কমে গেছে। তবুও কল্পনাশক্তির জয়গান করতে হবে। এই শক্তি না থাকলে মানুষ কোনদিন মানুষ হতে পারতো না। প্রথমে যা ছিল কল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলি তারই বাস্তব রূপায়ণ। গ্রহান্তর-জীবন কিম্বা নক্ষত্রসভ্যতা নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনা আজও প্রায় কল্পনার স্তরে থাকলেও কিছুমাত্র অসঙ্গতি নেই।

পৃথিবীর বাইরে কোথায় আছে প্রাণ? কোথায় বয়ে চলেছে মানুষের মত বা তার চেয়ে উন্নত সভ্যতার ধারা? জবাব খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ দুটি রহস্য সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন। এক, কিভাবে জীবন সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠে। দুই, কিভাবে জন্ম হয়েছিল সৌরজগতের। কারণ এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বজীবন-রহস্যের চাবিকাঠি।

যদি কোন সহজ সরল নিয়মে সৌরজগতের জন্ম হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য নক্ষত্রলোকেও একই ব্যাপার ঘটছে, গোটা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে পৃথিবীর মত কোটি কোটি গ্রহের চক্রাবর্তন। আর প্রাণের পরিবেশ? সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহটির বুকে একটুখানি জীবনস্রোত বইয়ে দিয়েই কি বিশ্বপ্রকৃতি নিঃস্ব হয়ে গেছে? একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না এবং যায় না বলেই বিষয়টি নিয়ে অসংখ্য মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই রহস্য সমাধানে জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন জৈব রসায়ন বিশেষজ্ঞেরা। তাঁরা শুনিয়েছেন অনেক নতুন কথা। সে কথা আলোচনা করবার আগে সৌরজগতের আদিপর্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি বলেন, দেখা যাক।

প্রথম তত্ত্বটি দিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ইমান্যুয়েল কাণ্ট—1755 সালে। তাঁর মতে সৌর-

জগতের উদ্ভব হয়েছিল এক বিস্তীর্ণ গ্যাসীয় মেঘের মধ্যে থেকে। 1796 সালে লা প্লাস উপস্থিত করলেন তাঁর সুবিখ্যাত নীহারিকা প্রস্তাব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একদা ছিল এক বিশাল ঘূর্ণীত নীহারিকা (Spiral nebulae)। ক্রমে তার বিভিন্ন অংশে অভিকর্ষ কেন্দ্রের সৃষ্টি হওয়াতে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ জমাট বাঁধতে সুরু করে। সৃষ্টি হতে থাকে পর পর কতগুলি জ্যোতির্ময় বলয়। পরে সেগুলি হয়ে যায় এক একটি গ্রহ। নীহারিকার বেশীর ভাগ পদার্থ পেয়েছিল বলে সূর্য হয় অভিকর্ষকেন্দ্র। সংক্ষেপে লা প্লাসের তত্ত্ব হলো এই। শতবর্ষ পরে 1895 সালে রাসেল গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তত্ত্বটির অসারতা প্রমাণ করেন। পরে আরও অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ায় বিখ্যাত নীহারিকাবাদ পরিত্যক্ত হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সবচেয়ে বিখ্যাত তত্ত্বটির সূত্রপাত করলেন চেম্বারলেন এবং মোলটন। তাঁরা বললেন—এক মহাকায় নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় মহাজোয়ারে ফুলে ওঠা সৌরদেহের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে যায়। তবে বরাত ভাল, আগন্তুক নক্ষত্র এমন প্রচণ্ড বেগে দূরে চলে যায়, যার ফলে ঐ বেরিয়ে যাওয়া অংশটি তার গায়ে গিয়ে আর আছড়ে পড়বার সময় পায় নি। পরে একদিন তা থেকে সৌর গ্রহমণ্ডলী জন্মলাভ করে। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী জিনস্‌য়ের হাতে পড়ে এই প্রকল্পটি দারুণ মর্যাদালাভ করেছিল। তিনি বললেন, আগন্তুক নক্ষত্র এবং সূর্য—এই দুই মহাশক্তিশালী অভিকর্ষকেন্দ্রের টানাপোড়েনে বেরিয়ে যাওয়া অংশটি লম্বা হয়ে যায় এবং পটলের মত আকার নিয়ে দু-প্রান্ত সুঁচালো হয়ে পড়ে। তাই মাঝ-খানে জন্ম নিয়েছে গ্রহরাজ বৃহস্পতি আর দুই প্রান্তের গ্রহগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে গেছে। মোটামুটিভাবে এই হলো জিনস্‌য়ের 'জোয়ার তত্ত্ব'। কিন্তু একটি তারার গা ঘেঁসে আর একটি তারার ছুটে যাওয়া অথবা দুটির মধ্যে ধাক্কা লাগা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমনকি যেখানে কোটি কোটি নক্ষত্রের গাদাগাদি, গ্যালাক্সির সেই গভীরতম অংশেও এমন ঘটনা ঘটবে না। কারণ ছায়াপথ বিশ্বেও রয়েছে এক মহাশক্তিশালী অভিকর্ষ কেন্দ্র, যা প্রত্যেকটি নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। জিনস্‌ নিজেও অবশ্য তাঁর জোয়ারতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এটা বিশ্বের এক বিরলতম ঘটনা, হয়তো 500 কোটি বছরের মধ্যে মাত্র একবারই এমন ঘটতে পারে। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন,—না, কোনদিনই তা হতে পারে না। তাছাড়া যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নেয়া যায় যে, অমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল, তবু ঐ ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া সৌর-পদার্থ জমাট বাঁধতে পারতো না। জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে তা ছড়িয়ে পড়বে এবং মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। অনেক জটিল হিসেবনিকেশের পর একদা বিখ্যাত জোয়ার তত্ত্বটিও আজ পরিত্যক্ত হয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্য একসময় যুগ্মনক্ষত্র ছিল। কতগুলি বিশেষ কারণে জুড়ি নক্ষত্রটির দেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেটি সুপারনোভায় পরিণত হয়। ফলে দুটি তারার দেহ থেকেই বিপুল পরিমাণ গ্যাসীয় বস্তু চিরকালের মত শূন্যলোকে উধাও হয়ে যায়। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সেই জুড়ি নক্ষত্রের বাদবাকী অংশগুলি সূর্যের টানে আটকা পড়ে এবং তা থেকেই পর্যায়ক্রমে গ্রহগুলির জন্ম হয়। এই তত্ত্বটিকে অবশ্য কোনমতেই অসম্ভব বলা চলে না। তবে পরবর্তীকালে হয়েল নিজেই তাঁর মতবাদকে বাতিল করে দিয়েছেন।

সর্বাধুনিক প্রকল্প রচনা করেছেন জার্মেনীর ওয়েজাকার এবং রাশিয়ার শিমিড। তাঁদের তত্ত্বকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় বলে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। ওয়েজা-

কারের মতে সূর্যকে ঘিরে থালার মত চ্যাপ্টা এক নীহারিকা বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করতো। সেই ঘূর্ণিত গ্যাস-সমুদ্রের মাঝে মাঝে অভিকর্ষের নিয়মে জমাট বাঁধার পর্ব সুরু হয়ে যায় এবং তা থেকেই গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়। শিমিডের মতবাদও প্রায় একই। তবে গ্রহের উৎপত্তিকে তিনি কিছুটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নীহারিকা-বাদের সঙ্গে এই তত্ত্বর আপাত মিল দেখা গেলেও দুটির মধ্যে পার্থক্য কিন্তু মৌলিক। লা প্লাসের নীহারিকা ছিল দ্যুতিময়, আর এই প্রকল্পটির নীহারিকা হলো নিরুত্তাপ মহাজাগতিক গ্যাসের এক অন্ধকার মহাসমুদ্র। আদিম সূর্যের দেহে উত্তাপের নামগন্ধও ছিল না।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা কুইপারের তত্ত্বটিও অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, আদিপর্বে সৌরজগৎ দুটি সত্তায় বিভক্ত ছিল, যাকে যুগ্মতারার প্রাথমিক পর্যায় বলা চলে। ক্রমে একটির বস্তুপুঞ্জ জমাট বেঁধে সূর্যে রূপান্তরিত হয় এবং অপরটিতে কোন নির্দিষ্ট অভিকর্ষ কেন্দ্র গড়ে না ওঠায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমেই তা থেকেই জন্ম নিয়েছে সৌর-গ্রহ-মণ্ডলী। কুইপারের মতামত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য এই কারণে যে, তাঁর অনেক তত্ত্বই নির্ভুল বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

সুইডেনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আলফ্‌ভেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিষয়টিকে বিচার করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, চৌম্বক ঔদক গতিসূত্রের (Magneto-Hydrodynamics) বিধানেই গ্রহ-জগতের উদ্ভব। যে গ্যাস-সমুদ্র সূর্যকে ঘিরে পাক খেত, তা একদিন জমে গিয়ে তরল হতে সুরু করে। তখন সৌর-চৌম্বকশক্তির প্রভাবে তা থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়।

সৌরজগৎ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছিল, তা আজও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। এখন প্রশ্ন হলো, নক্ষত্রলোকে গ্রহজগৎ থাকা কি কোন সাধারণ ঘটনা, না প্রকৃতির খেয়াল? জোয়ারতত্ত্বের মানে হচ্ছে, প্রকৃতির উদ্ভট খেয়ালে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। জিন্‌স্‌ জোরের সঙ্গে বলে গেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও গ্রহজগৎ এবং প্রাণের অস্তিত্ব নেই। হয়েলের সুপারনোভা তত্ত্বটির মানেও তাই। অপরদিকে ওয়েজ্‌সাকার, শিমিড, কুইপার, আলফ্‌ভেনের প্রকল্পগুলির মধ্যে যে কোন একটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু অনায়াসে বলা যায় যে, মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি 'সৌর জগৎ'।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রকল্পে বলা হয়েছে যে, ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে একই সময় সমস্ত নক্ষত্রের জন্ম হয় নি। আদিতে সবই ছিল প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাসের অন্ধকার সমুদ্র। তার মধ্য থেকে ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তারাগুলি আগে জন্মলাভ করে। বাকী হাইড্রোজেন গিয়ে জমা হয় সর্পিল বাহুগুলিতে। পর্যায়টি এখনো চলছে। সেখানে হাজার হাজার ঘন আলোক-বর্ষ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কৃষ্ণ নীহারিকা (Dark nebulae), যা কিনা নিষ্ক্রিয় হাইড্রোজেন গ্যাসের নিরন্ধ্র অন্ধকার রাজ্য,—নবজাতক নক্ষত্রের সূতিকাগার।

এটা লক্ষ্য করেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্ররাজিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রবীণদের নাম দেওয়া হয়েছে পপুলেশন টু (Population II stars) এবং নবীনদের পপুলেশন ওয়ান তারা (Population I stars)। ছায়াপথবিশ্বের প্রতিবেশী ম্যাগিলানিক ক্লাউড, ট্রায়াংগুলাম, অ্যান্ড্রোমিডা প্রভৃতি গ্যালাক্সিতেও রয়েছে এই দুই শ্রেণীর নক্ষত্র। কেন্দ্রীয় অংশের সমস্ত তারাই পপুলেশন টু শ্রেণীর। ওরা বেশীর ভাগই যৌবনের সেই প্রচণ্ড উষ্ণতা খুইয়ে

লাল কিম্বা সাদা বামন তারা এবং রক্তবর্ণ দানব নক্ষত্রে পরিণত হয়ে গেছে। অন্য দিকে পপুলেশন ওয়ান শ্রেণীর তারারা যৌবনের দৃপ্ত তেজ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিবর্তনের পথ ধরে। এদের মধ্যে রয়েছে অতি উত্তপ্ত নীল দানবের দল এবং ছোট মাঝারি, নানা আকারের নক্ষত্র। আমাদের সূর্যও এই শ্রেণীভুক্ত। সে রয়েছে ছায়াপথ কেন্দ্র থেকে প্রায় 30,000 আলোক-বর্ষ দূরে কালপুরুষ-মণ্ডলীয় সর্পিল বাহুটির (Spiral arms) উপর।

শত শত কোটি বছর আগে, বহুবিস্তীর্ণ এক কৃষ্ণ নীহারিকার গর্ভ থেকেই বুঝি সৌরজগৎ এবং প্রতিবেশী তারারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাই এযুগের বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বিশ্বের বুকে গ্রহজগতের আবির্ভাব আদপেই কোন বিরল ঘটনা নয়। বরং গ্রহহীন নক্ষত্রের সংখ্যাই হয়তো নগণ্য। তাঁরা আরও একটি আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা বলেছেন। পপুলেশন টু অর্থাৎ প্রাচীন তারাদের কোন গ্রহে যদি সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে থাকে, তাহলে সে সভ্যতা নিশ্চয়ই মানব-সভ্যতাকে পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এমন কি শতকোটি বছরের অগ্রজ সভ্যতা থাকাও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়! অপর দিকে সূর্যের সম-বয়সী কোন নক্ষত্রলোকে সভ্যজগৎ থাকলে তা বোধ হয় মানবসভ্যতার সমস্তরেই রয়েছে।

সূর্য আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে 13 লক্ষ গুণ বড়। একটা আর্ক ল্যাম্পকে যদি সূর্য বলে মনে করা যায়, তাহলে ঐ ল্যাম্পের গায়ে লেগে থাকা ক্ষুদ্রতম ধূলিকণাটিও পৃথিবীর চেয়ে বড় হয়ে যাবে। এতেই বোঝা যায়, আমাদের নিকটতম নক্ষত্র 4·2 আলোক-বর্ষ দূরের প্রক্সিমা সেন্টরিতে বসে মহাশক্তিশালী দূরবীন দিয়েও সৌরজগতের কোন গ্রহকে দেখা সম্ভব নয়। নক্ষত্রলোকের দৃষ্টিতে মহাদ্যুতিময় সৌরতেজসমুদ্রে নিমজ্জিত গ্রহজগৎ কিছুতেই দৃশ্যমান হবে না।

তবুও এই পৃথিবীতে বসেই মহাসুদূরের কয়েকটি গ্রহের ঠিকানা মিলেছে। প্রথম খবর এনেছেন সুইডেনের কে. এ. স্ট্রাণ্ড—1944 সালে। 11 আলোক-বর্ষ দূরে, সৌরজগতের অন্যতম প্রতিবেশী 61 সিগনাই বি নক্ষত্রের অতিকর্ষ অঞ্চলে রয়েছে সেই মহাগ্রহ—ওজনে বৃহস্পতির 15 গুণ! পরে আরও কিছু বড় বড় গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন ওফিউচি 70 নক্ষত্রের একটি গ্রহ, বৃহস্পতির চেয়ে 12 গুণ ভারী। ওগুলি সত্য সত্য গ্রহ, না নিভে যাওয়া নক্ষত্র—তা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্যাট্রিক মুরের মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বড় হলেও ওগুলি গ্রহই। কারণ নক্ষত্র-আয়তনের বিচারে ওদের আয়তন খুবই তুচ্ছ।

নিঃসন্দেহে এটি এক বিরাট আবিষ্কার। নক্ষত্রলোকে একবার যখন বড় বড় গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্রের মত ছোট গ্রহও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু প্রাণ? গ্রহান্তর সভ্যতা? জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক পরি-সংখ্যানে প্রকাশ, এই ছায়াপথবিশ্বে প্রতি দেড় হাজার ঘন আলোক-বর্ষ এলাকার মধ্যে অন্ততঃ একটি করে সভ্যতা আছে। আপাততঃ এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ সে সব সভ্যতার সঙ্গে আজও মানুষের যোগাযোগ ঘটে নি, অথবা হয়তো একদিন ঘটেছিল (ডানিকেনের তত্ত্ব), যার কথা আজ আর কারোর মনে নেই!

ভূস্তরের জল-বিজ্ঞান—নদীয়া জেলার সমীক্ষা

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়*

ভূমিকা

পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চম দশকের শেষ ভাগ থেকে নলকূপের সাহায্যে জল-সেচব্যবস্থার বিস্তৃত কর্মসূচী চলছে। উন্নত প্রথায় চাষের পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেচের চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ জলের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা বাড়াবার যুগপৎ প্রচেষ্টা সুরু হয়। অল্প খরচে দ্রুত ফললাভ করায় নলকূপের মাধ্যমে জল-সেচ ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্যে গত দুই দশকে পশ্চিম বঙ্গে 2242টি গভীর এবং 75,008টি অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এরূপে গত দশকে পশ্চিম বঙ্গে নলকূপ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বর্তমান সরকার, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্রসেচ কর্পোরেশন, সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন কর্পোরেশন আরও বর্ধিতহারে নলকূপ খননের কর্মসূচী নিয়েছেন। এই হাজার হাজার নলকূপের মাধ্যমে যে জল নেওয়া হচ্ছে, সেই ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় বা গতিবিধি সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে না। কম খরচে বেশী জল উত্তোলনের জন্যেও কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে না। নির্বিচারে এরূপ জলোত্তোলনের অনিষ্টকর ফল ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন অংশে দেখা যাচ্ছে। তামিলনাড়ুর কোন কোন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের ঊর্ধ্বসীমা দ্রুত নেমে যাচ্ছে, ফলে নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভবই হচ্ছে না। পশ্চিম বঙ্গে এরূপ চরম অবস্থা রোধ করবার জন্যে নলকূপ কেন্দ্রীভূত এলাকায় পরিকল্পিত অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গে ভূস্তরের জল-বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনুসন্ধান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন একটি জেলায় বা থানায় ভূগর্ভে কতটা জল আছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কত নীচে আছে, জলোত্তোলনের হার কত হওয়া উচিত, একনাগাড়ে কতক্ষণ উত্তোলন সম্ভব, দুই নলকূপের মধ্যে ব্যবধান কতখানি থাকা উচিত, জলোত্তোলনে ন্যূনতম খরচ কত হওয়া উচিত ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর বোধ হয় কোন জেলা বা কোন অঞ্চল থেকেই পাওয়া যাবে না। নদীয়া পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নলকূপ কেন্দ্রীভূত জেলা, তাই বেশ কিছু দিন যাবৎ এই এলাকায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভূগর্ভস্থ জল সম্বন্ধে অনুসন্ধানমূলক পরীক্ষা চলানো হচ্ছে। নদীয়া জেলায় চাষীরা প্রযুক্তিবিদ্‌ বা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ছাড়াই ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের জন্যে হাজারে হাজারে অগভীর নলকূপ খনন করছেন। এখানে নদীয়া জেলায় ভূস্তরের জলসংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করা হচ্ছে।

---

*অন্তর্জলীয় উপবিভাগ, 10, এইচ, সি, সরকার রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

নদীয়া জেলার থানাওয়ারী গভীর এবং অগভীর নলকূপের সংখ্যা নিরূপণ :-

('000 একরে)

থানার নাম	থানার ভৌগোলিক আয়তন	চাষযোগ্য জমির আয়তন	গভীর নলকূপের সংখ্যা	অগভীর নলকূপের সংখ্যা
করিমপুর	111·19	79·43	46	705
কালিগঞ্জ	79·07	50·71	34	958
তেহট্ট	104·78	85·32	41	876
নাকাশীপাড়া	81·90	57·30	21	1153
চাপড়া	76·60	52·40	26	679
নবদ্বীপ	26·10	23·47	9	207
কৃষ্ণনগর	101·31	71·11	56	473
হাঁসখালি	60·77	44·05	57	672
কৃষ্ণগঞ্জ	37·26	24·50	11	295
শান্তিপুর	48·40	38·57	51	624
রাণাঘাট	109·12	67·87	75	1177
চাকদহ	59·05	54·50	52	1144
হরিণঘাটা	41·25	30·40	31	1239
			510	10,202

এই 510টি গভীর নলকূপ এবং 10,202টি অগভীর নলকূপের মাধ্যমে জেলার চাষযোগ্য জমির মাত্র 16 ভাগ ভূগর্ভস্থ জল-সেচ এলাকায় আনা গেছে। এই নলকূপ এবং নদী জলোত্তোলন প্রকল্প ছাড়া জেলায় অন্য কোন রকম সেচের ব্যবস্থা নেই, নদীতে বর্ষব্যাপী উপযুক্ত জলপ্রবাহের অভাবে এবং বালুকাময় জমির ফলে নদীর উপর বাঁধ দিয়ে বা খাল কেটে এবং পুকুরের সাহায্যে কোনরকম সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার সম্ভাবনা নেই। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সতর্ক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই জেলায় আরও প্রচুর গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করা প্রয়োজন।

নদীয়া জেলায় ভূস্তরের জল-বিজ্ঞানগত অবস্থা

গভীর এবং অগভীর নলকূপের লগ্ চার্ট এবং মৃত্তিকাস্তরের নমুনা বিশ্লেষণ করে বলা চলে যে, এই জেলায় ভূগর্ভের জল সাধারণভাবে ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে স্থিত ও পর্যাপ্তভাবে সঞ্চিত। মৃত্তিকাস্তরের নমুনায় পাওয়া গেছে অনেক স্তর পর্যায়; যেমন—বালি, পাতলা ও মোটা মেশানো, পলি, কাদা, নুড়ি ও কাঁকড় মেশানো বালি। জেলার বেশীর ভাগ এলাকায় মাটির উপরের স্তরে রয়েছে বালি মেশানো দোআঁশ বা পলিমেশানো দোআঁশ মাটি। মাত্র কয়েক জায়গায় রয়েছে এঁটেল মাটির প্রলেপ, এই অঞ্চলে ভূগর্ভের জল সাধারণত থাকে প্রমুক্ত জলধরস্তরে (Unconfined aquifer).

এ পর্যন্ত সংগৃহীত গভীর এবং অগভীর নলকূপ এবং পাতকুয়ার স্থির জলের সমতা সংক্রান্ত নথিপত্র ঘেঁটে বলা চলে যে, এই জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কালীগঞ্জ, তেহট্ট থানায় জলের

উর্ধ্বসীমা সবচেয়ে কাছে রয়েছে। এই উর্ধ্বসীমা-রেখা সাধারণতঃ 6 ফুট থেকে 11 ফুটের মধ্যে। উর্ধ্বসীমারেখা সবচেয়ে গভীরে রয়েছে কৃষ্ণনগর থানার উত্তর-পূর্ব এবং চাপড়া থানার দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই অঞ্চলে উর্ধ্বসীমারেখা 28 ফুট পর্যন্ত নেমে যায়। কৃষ্ণনগর থানার দক্ষিণে উর্ধ্বসীমা-রেখা আবার উপরে উঠতে সুরু করেছে এবং হাঁসখালী, শান্তিপুর, রাণাঘাট থানার স্থির জলের সমতা 12 ফুট থেকে 21 ফুটে রয়েছে। জেলার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে জলের গভীরতা বেশী, তাই জলের উর্ধ্বসীমারেখা শান্তিপুর থানা থেকে হাঁসখালি থানার কাছে। দক্ষিণাঞ্চলে চাকদহ এবং হরিণঘাটা থানার স্থির জলের সমতা 13 ফুট থেকে 23 ফুটের মধ্যে রয়েছে। চাপড়া এবং নাকাশীপাড়ায় রয়েছে 12 ফুট থেকে 22 ফুটের মধ্যে। করিমপুরে মোটামুটি 20 ফুটের মধ্যে এই গভীরতা। স্থির জলের এই সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম হয়েছে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে। এই নদীগুলি বছরে অন্ততঃ 8 মাস পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূগর্ভের জল টেনে নিচ্ছে। তাই এই সব নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানবিশেষে জলের উর্ধ্বসীমা 30 ফুটেরও নীচে নেমে যায়।

জেলা ব-দ্বীপান্তর্গত সমভূমিতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের 48 ফুট থেকে 24 ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত। 48 ফুট উত্তরে করিমপুর তেহট্ট এলাকায় এবং 24 ফুট চাকদহ এলাকায়, জেলার ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, জেলায় ভূগর্ভের জল মোটামুটি এই ঢাল অনুযায়ী অত্যন্ত ধীর গতিতে নড়াচড়া করছে। এখানকার জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতীয় মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগর শাখার দ্বারা। বৃষ্টিপাতের গড়পড়তা হিসাব বছরে 52″, যার বেশীর ভাগ পড়ে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। সাধারণতঃ অক্টোবর মাসের গোড়ায় এখান থেকে বর্ষা বিদায় নেয়, বৃষ্টিপাত ও বন্যাজনিত প্রচুর জল এবং আমন ধানের সেচের জলে উদ্বৃত্ত অংশ সম্পৃক্তমণ্ডলে (Zone of saturation) যুক্ত হওয়ায় নভেম্বরের শেষ নাগাদ জলের উর্ধ্বসীমা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়। এই কারণে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জলের স্তর নেমে যায় বাষ্পীভবন, গাছের স্বেদন (Evapo-transpiration) এবং গভীর-অগভীর নলকূপের যান্ত্রিক জল সরবরাহের চাপে। সম্পৃক্তমণ্ডলে ভূগর্ভের জল সাধারণতঃ সুষম পর্যায়ে থাকে, অর্থাৎ বাষ্পীভবন, স্বেদন বা নিষ্কাশনের ফলে যে পরিমাণ জল বেরিয়ে যায়, তা আবার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জলের স্তর তাই থাকে অবিচলিত। তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালজনিত বিকল্প পর্যায়ক্রমের জন্যে ঋতুগত জলের পরিমাণের পার্থক্য ঘটে। তাছাড়া, জলসেচ ব্যবস্থায় যদি অতিরিক্ত জল ব্যবহার হয়, তবে জলের স্তর উপরে উঠে যাবে আবার পাম্পের সাহায্যে অতিরিক্ত জল আহরণের জন্যে জল নেমে যাবে নীচের দিকে।

এই জেলায় বেলেমাটির স্তরের এবং জল প্রবাহের ধারাবাহিকতা (Hydraulic continuity) অন্ততঃ 478 ফুট গভীর পর্যন্ত বিনা বাধায় বজায় রয়েছে। তাই এই জেলায় মোট বৃষ্টিপাতের অন্ততঃ 30 ভাগ জল মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত অনায়াসে চুঁইয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে এঁটেলজাতীয় মাটির বাধা কোথাও কোথাও রয়েছে। কিন্তু তার বিস্তৃতি সামান্যই, সেই কারণে এই জেলা ভূগর্ভের জলরাশি পর্যাপ্ততার দিক থেকে বিশেষভাবে সম্পদশালী।

ভূগর্ভের জলসম্পদ আহরণ

ভূগর্ভের জল আহরণের জন্যে নদীয়া জেলায় প্রচলিত ব্যবস্থা—(1) গভীর নলকূপের (বাইরের ব্যাস $8\frac{5}{8}''$ এবং গড়পড়তা 380′–0″ গভীর) সাহায্যে গড়পড়তা ঘন্টায় 40,000 গ্যালন জলাকর্ষণ

এবং (2) অগভীর নলকূপের (বেশীর ভাগ 82′—0″ গভীর, 10′—0″ নারকেল দড়ির ফিল্টার 4টি ও 3″ ব্যাসবিশিষ্ট 20′ বা 21′ দীর্ঘ 2টি পাইপ) সাহায্যে ঘন্টায় গড়পড়তা 5000 গ্যালনের জলাকর্ষণ।

নদীয়া জেলায় মাটির গভীরে জলপ্রবাহগত ধারাবাহিকতা আছে বলে একই জলস্তর থেকে 510টি গভীর নলকূপ, 10,202টি অগভীর নলকূপ এবং নানা পরিবারের খাবার জলের নলকূপের মাধ্যমে অনবরত জল তোলা হচ্ছে। এখানকার মাটির স্তরের, ভূস্তর-জলের ও মৃত্তিকা গঠনের বৈশিষ্ট্য বিচার-বিশ্লেষণ করে বেশীর ভাগ এলাকায় 3″×4″ ব্যাসবিশিষ্ট টেলিস্কোপিক অগভীর নলকূপ এবং অল্প কয়েক জায়গায় গভীর নলকূপ বসানো যেতে পারে।

3″ ব্যাসবিশিষ্ট নলকূপ বসাবার প্রচলিত রীতি বন্ধ করে তার বদলে সামান্য বেশী খরচে 3″×4″ নলকূপ বসানো দরকার, তার থেকে পাওয়া যাবে ঘন্টায় 7000 গ্যালনের মত জল।

নিম্নাকর্ষণ

প্রাক্-বর্ষাকালীন মাসগুলিতে জলের উর্ধ্বসীমা সবচেয়ে নীচে নেমে যায়। সেই জন্যে এই কয়মাসে সব জায়গা থেকে জলাকর্ষণের প্রয়াস এক দারুণ বিপত্তির সম্মুখীন হয়। এই সময়েই বিশেষ করে অগভীর এবং গভীর নলকূপ দিয়ে সবচেয়ে বেশী জল তোলবার প্রচেষ্টা চলে, তার ফলে মাটির নীচে জলধরস্তরে স্বাভাবিক জলের সঞ্চয় কমে যায়। সুতরাং গ্রীষ্মকালে ঘণ্টায় 7000 গ্যালন জল তুলতে 4′-0″ এবং ঘন্টায় 40000 গ্যালন জল তুলতে 20′—0″ পর্যন্তও নিম্নাকর্ষণের প্রয়োজন হতে পারে।

নলকূপের মধ্যবর্তী ব্যবধান

একটি নলকূপের প্রভাবাধীন এলাকা থেকে পার্শ্ববর্তী নলকূপটিকে মুক্ত রাখতে হলে, নলকূপের স্থান নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যাতে নলকূপ দুটির নিম্নাকর্ষণ প্রভাবাধীন এলাকায় একে অপরের বাধাস্বরূপ না হয়ে দাঁড়ায়। জলবিজ্ঞানিগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে নলকূপ থেকে জলের প্রবাহ, ভূগর্ভে জলের সঞ্চয় এবং স্তর থেকে জল নির্গমনের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। তত্ত্বগতভাবে এই দূরত্ব যাই হোক না কেন, এটি ঠিক যে, কিছু দূর যাবার পর নিম্নাভিমুখী সীমানার উপরিভাগ ক্রমাগত সমতল জলরেখার দিকে এগোতে থাকে, কিন্তু কখনও জলরেখার সঙ্গে মেলে না। তাই কিছু দূর যাবার পর নিম্নাকর্ষণ প্রভাব থাকে নগণ্য। সুতরাং কৃষি-সেচবিভাগ বর্তমানে যে এক মাইল দূরত্বে নলকূপ বসাবার নীতি অনুসরণ করছে, তা অত্যন্ত বেশী বলে মনে হয়। বিশেষতঃ এই ধরণের প্রমুক্ত জলধরস্তর ও জলপ্রবাহগত ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে। সেই জন্যে এই জেলায় গভীর নলকূপের দূরত্ব 2000 ফুট হলেও একে অপরের প্রভাবমুক্ত থাকবে। গভীর নলকূপের মধ্যবর্তী ব্যবধান 2000 ফুট নির্দিষ্ট করবার পিছনে যুক্তি এই যে, প্রতি 1000 ফুট হলো প্রভাবিত মণ্ডলের (Cycle of influence) অন্তর্গত। এই সম্পর্কে Bennison-এর সুপারিশ মানা হয়েছে। ঘন্টায় 7000 গ্যালন জলাকর্ষণের জন্যে অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যাপারে মধ্যবর্তী ব্যবধান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে 1600 ফুট।

নলকূপের ছাঁকনি

কিছু কিছু নলকূপ বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনীয়ার নলকূপে নারকেল দড়ির ফিল্টার ব্যবহারের বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে এগুলি অত্যন্ত নীচুমানের ও সাময়িক, কিন্তু নদীয়া জেলার মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্য ও জলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এখানে 120′—0″ গভীরতাসম্পন্ন অগভীর

নলকূপে নারকেল দড়ির ফিল্টার নিরাপদেই ব্যবহার করা চলে। তার চেয়ে অগভীর স্তরে পিতলের ফিল্টার ব্যবহার করা আবশ্যিক; কেননা অতটা গভীরে নলকূপ যথার্থ পরিষ্কার করবার জন্যে cone plug-এর বদলে plug cutter অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। আর অত গভীরে নারকেল দড়ির ফিল্টার বসাবারও অসুবিধা রয়েছে। পক্ষান্তরে এই জেলার জলের bi-carbonate পিতলের ফিল্টারের পক্ষে ক্ষতিকারক, যার ফলে এগুলি 5 বছরের বেশী টেঁকে না। পিতলের ফিল্টারের চেয়ে দড়ির ফিল্টারের জলপ্রেরণক্ষমতা অনেক বেশী। পিতল একটি মূল্যবান ধাতু, যা বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহারযোগ্য। অতএব মাটির নীচে বেশী পরিমাণে পিতল রাখা অর্থহীন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 4″ ব্যাসবিশিষ্ট একটি পিতলের ফিল্টারের দাম (6 ফুট) 225 টাকা, সেখানে 10 ফুট একটি দড়ির ফিল্টারের দাম মাত্র 90 টাকা। কিন্তু ফিল্টার নলকূপের প্রাণস্বরূপ। সুতরাং দড়ির ফিল্টার নির্বাচনে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন।

গভীর নলকূপে ছিদ্রযুক্ত পাইপ ব্যবহার করতে হবে। ছিদ্রের আকার হবে মোটামুটি $3'' \times \frac{3}{32}''$ পাইপের চারপাশে স্ক্রীভেলের মোড়ক থাকবে। মূল পাইপটির ভিতর গাত্রের মোট আয়তনের 12 ভাগ থেকে 15 ভাগের মধ্যে থাকবে উন্মুক্ত অংশের পরিমাণ। ছেনির দ্বারা ছিদ্র করা চলবে না। মেসিনের সাহায্যে ছিদ্র করতে হবে।

নলকূপের গভীরতা

জেলায় ভূগর্ভস্থ জল যেহেতু মাটির নীচে প্রচুর জলময় স্তরে স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং মৃত্তিকাস্তরের ও জলপ্রবাহের ধারাবাহিকতা এখানে বেশ ভাল, তাই এই জলার বেশীর ভাগ এলাকায় 100 ফুটের মধ্যে অগভীর নলকূপ বসানো যেতে পারে। জেলায় প্রায় 60 ভাগ এলাকায় নলকূপের গভীরতা 82 ফুট রাখা চলে, কিন্তু কৃষ্ণনগর, তেহট্ট, রাণাঘাট, হাঁসখালি থানার কয়েকটি অঞ্চলে এবং চাকদহ, হরিণঘাটা থানার বিস্তৃত অঞ্চলে ঘণ্টায় 7000 গ্যালন জল পাবার জন্যেও নলকূপের গভীরতা 120 ফুট এমনকি 180 ফুট পর্যন্ত করতে হতে পারে। চাকদহ, হরিণঘাটা এলাকায় তাই গভীর নলকূপ খনন করা উচিত। 40,000 গ্যালন জল পাবার জন্যে গভীর নলকূপের গভীরতা সাধারণতঃ 350 ফুটের মধ্যে রাখলেই চলবে। তবে জেলার অন্ততঃ 15 ভাগ এলাকায় বিশেষতঃ জেলার দক্ষিণাংশে এই জল পাবার জন্যে নলকূপের গভীরতা 475 ফুট পর্যন্ত করতে হতে পারে।

স্থান ও পাম্প নির্বাচন

সেন্ট্রিফুগাল পাম্পের ক্ষেত্রে নিম্নাকর্ষণের পর জলের যে উর্ধ্বসীমা আসবে, তা যেন 20 ফুটের নীচে না হয়। সেই জন্যে 4 ফুট নিম্নাকর্ষণ করলে প্রাক্-বর্ষাকালীন সময়ে জলের উর্ধ্বসীমা 16 ফুটের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই সব এলাকায় যেখানে সেন্ট্রিফুগাল পাম্প বিশেষ কার্যকর হবে। এই সব এলাকায় অগভীর নলকূপ বসাতে হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। নদীয়া জেলার বেশীর ভাগ এলাকাই এই জাতীয় সীমাবদ্ধতায় বিশিষ্ট। গভীরতম জলের উর্ধ্বসীমা এলাকায় ভূগর্ভের জলাকর্ষণের জন্যে গভীর নলকূপ খনন করতে হবে। তাতে ব্যবহার করতে হবে বিস্তরবিশিষ্ট টারবাইন পাম্প বা সাব্‌মারসিবিল পাম্প।

যেখানে জলের উর্ধ্বসীমা গভীর অথচ অগভীর নলকূপ ব্যবহার প্রয়োজন, সেখানে বিকল্প তিনটি সমাধান সূত্র আছে।

ক) Ejecto jet pump ব্যবহার।

খ) 6″ ব্যাসবিশিষ্ট submerssible pump অথবা $3\frac{1}{2}''$ ব্যাস বিশিষ্ট খাড়া turbine pump

ব্যবহার। ইলেক্ট্রো পাম্প নিরুপদ্রবতাসম্পন্ন (3" ব্যাসে ঘন্টায় সাধারণতঃ 1800 গ্যালন জল ওঠে এবং 4" ব্যাসে ঘন্টায় সাধারণতঃ 3000 গ্যালন জল ওঠে) ও দামী। সাবমারসিবিল ও টারবাইন পাম্পের দাম আরও বেশী এবং এগুলিতে বাইরের আধার (বহিরাবরণ) দরকার হয়।

গ) তৃতীয় সমাধান হলো sump well তৈরী করা, যার মধ্যে অন্ততঃ 6 ফুট পর্যন্ত পাম্প নাবিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইচ্ছামতী নদী সমূহের আধ মাইলের অন্তর্গত জমি এলাকা বাদ দিলে ভাল; কেননা এই নদীগুলি বছরের প্রায় 8 মাস জল টেনে নেওয়া (Effluent) জাতের। এই এলাকার জমি সহজেই নদী জলোত্তোলনের সাহায্যে সেচ সেবিত করা যেতে পারে।

প্রকল্প অঞ্চলের ভূগর্ভ-জলসম্পদের ভারসাম্য

ভূগর্ভের জলসম্পদ আহরণের জন্যে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণগত বিশ্লেষণ (Quantitative analysis) করা প্রয়োজন।

পরিগ্রহণ সমূহ- (ক) বেসিন-ভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ সুনির্দিষ্ট সমীক্ষার অভাবে জেলার শাশ্বত ভূগর্ভস্থ জলসম্পদকে বিপর্যস্ত না করবার সংরক্ষণশীল পরিগ্রহণ (Conservative assumption) করা হয়েছে।

খ) পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ ঘটে নি বলে পার্শ্ববর্তী জেলা (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলা) থেকে অন্তঃপ্রবাহকে (Lateral inflow) ধরে নেওয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী জেলার (অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা, কলকাতা) বহিঃপ্রবাহের সমান সমান।

গ) প্রাপ্তব্য পুনর্নিবেক (Recharge) এলাকার পরিমাপ বিচারকালে, জেলার 10 শতাংশ জমি বাদ রাখা হয়েছে পাকা রাস্তা, ফ্যাক্টরী, বাস্তজমি ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

ঘ) 25 বছরের বেশী সময়ের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিবেচিত হয়েছে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় নির্ণয়ের জন্যে।

ঙ) নলকূপ ইত্যাদি থেকে সরাসরি চোঁয়ানো পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত (Return flow) হলো ও মোট বৃষ্টিপাতের পুনর্নিবেক 30 শতাংশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ভূগর্ভে স্থির জলের সমতার ঋতুগত পার্থক্য দেখে এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থেকে বাষ্পীভবন, গাছের স্বেদন এবং ভূপৃষ্ঠে জলস্রোত ইত্যাদির মাধ্যমে জল চোঁয়ানের পরিমাণ বাদ দিয়ে বিভিন্ন হিসাবনিকাশ করে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে।

চ) গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে বছরে 400 একর ফুট জলোত্তোলন এবং অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে 50 একর ফুট জলোত্তোলনের পরিমাণ বিবেচিত হয়েছে।

ছ) বছরের প্রায় ৮ মাস কাল ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী নদীসমূহ ভূগর্ভ থেকে জল টেনে নেয় বলে ভূপৃষ্ঠের জলস্রোত থেকে সর্বসময়ের পরিমাণ 'শূন্য' ধরে নেওয়া হয়েছে।

ক	খ	গ	ঘ
জেলার মোট আয়তন (একর হিসাবে)	একর হিসাবে পুনর্নিবেক ভোগ্যনীট এলাকা (পাকা রাস্তা, বাস্তভিটা, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি বাবদ 10% বাদ দিয়ে)	ইঞ্চি হিসাবে 25 বছরের গড়পড়তা বৃষ্টিপাত।	বৃষ্টিপাতজনিত বার্ষিক পুনর্নিবেকের পরিমাণ একর ফুট হিসাবে (30% পুনর্নিবেক ধরে নিয়ে)
1515 বর্গমাঃ × 640 =9,69,600 একর	8,72,640	52	10,90,800

ঙ	চ	ছ	জ
নলকূপ ইত্যাদি থেকে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত বার্ষিক পুনর্নিবেকের পরিমাণ একর ফুট হিসাবে (30% পুনর্নিবেক ধরে)	একর ফুট হিসাবে মোট বার্ষিক পুনর্নিবেকের পরিমাণ (ঘ+ঙ)	বর্তমান নলকূপের সংখ্যা গভীর — অগভীর	একর ফুট হিসাবে মোট বার্ষিক জল উত্তোলনের পরিমাণ।
22,77,15	13,18,515	5,0—10, 02	75,90.50

ঝ	ঞ
একর ফুট হিসাবে ভূগর্ভস্থ জলের সম্ভাব্য পরিমাণ। (চ — জ)	প্রস্তাবিত নলকূপের শ্রেণী ও সংখ্যা। গভীর — অগভীর
5 ,90,6	250—9,90

সুপারিশ ও উপসংহার

নদীয়া জেলার বার্ষিক পুনর্নিবেকের পরিমাণ বিবেচনা করে, এই জেলায় আরও 250টি গভীর নলকূপ এবং 9100টি অগভীর নলকূপ খননের সুপারিশ অনায়াসেই করা চলে। প্রস্তাবিত নলকূপ ও নদীর জলোত্তোলন পরিকল্প থেকে পুনর্নিবেকের পরিমাণ বিবেচনা করলে এবং যে সব এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের উর্ধসীমা অন্ততঃ 13 ফুটের মধ্যে থাকে, সেই সব এলাকায় ভূগর্ভের শাশ্বত জলসম্পদ থেকে কিছু জল আহরণের ব্যবস্থা ঘটালে আরও কিছু গভীর এবং অগভীর নলকূপ খনন করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রখ্যাত জল-বিজ্ঞানী Thies-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে নদীয়ায় যে পরীক্ষা নীরিক্ষা চালানো হয়েছে, তাতে জলময় স্তরের storage coefficient পাওয়া গেছে O2, যা জেলায় ভূগর্ভে জলের পর্যাপ্ততা বিশেষভাবে প্রমাণ করে। এছাড়া এই জেলায় 478 ফুট গভীর পর্যন্ত বেলে মাটির স্তর এবং জল প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও একথা সত্য যে, ভূগর্ভের গভীরতর পর্যায়ে মোটা বালি নুড়ি ও কাঁকরের স্তর থাকায় জলের সঞ্চয় অনেক বেশী থাকে; কারণ ভূগর্ভ জলের অন্তঃপ্রবাহ নির্ভর করে স্তরের ছিদ্রতা এবং ঢালুভাবের মাত্রা বা পরিমাণের উপর। 500 ফুটেরও গভীর নলকূপের পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, জেলায় জলময় স্তরের coefficient of transmissibility গড়ে 6,03, 603 গ্যালন প্রতি দিনে এবং প্রতি ফুট জলময়-স্তরের বিস্তারে, উপরিউক্ত সূত্রগুলি বিবেচনা করে আরও শতকরা 50 ভাগ গভীর নলকূপ এবং শতকরা 25 ভাগ অগভীর নলকূপ খনন করলে সম্ভাব্য নলকূপের সংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

গভীর নলকূপ 375টি—নলকূপ খননে reverse circulation rotary drilling ring ব্যবহৃত হবে। বাইরের ব্যাস $8\frac{5}{8}''$, গড়পড়তা গভীরতা 380′—0″, পাম্প নামাবার জন্যে বহিরাবরণের ব্যাস 14″ বা $12\frac{3}{4}''$, ছাকনি হিসাবে $8\frac{5}{8}''$ ছিদ্রযুক্ত পাইপ—সাধারণতঃ 100′—0″ দীর্ঘ, পাইপের চারপাশে গ্রীভেলের মোড়ক, গ্রীভেলের আকার $\frac{1}{4}''$ থেকে $\frac{3}{16}''$, সাবমারসিবিল বা টারবাইন পাম্প

ব্যবহৃত হবে। জলাকর্ষণ গড়ে ঘণ্টায় 400000 গ্যালন। প্রভাবিত মণ্ডল চারদিকে 1000 ফুট পর্যন্ত। প্রতিটি নলকূপের সম্ভাব্য ব্যয় 1,35,000 টাকা।

অগভীর নলকূপ—11,433—ওয়াটার জেট পদ্ধতিতে নলকূপ খনন করতে হবে, 3″ × 4″ ব্যাস-বিশিষ্ট টেলিস্কোপিক, অর্থাৎ 3″ গ্যাল্ভ্যানাইজড্ পাইপ আর 4″ ফিল্টার 10′–0″ নারকেল দড়ির ফিল্টার 4টি বা পিতলের 6′–0″ ফিল্টার 6টি, ফিল্টারের চারপাশে মোটা বালির মোড়ক, গভীরতা 120 ফুটের বেশী হলে পিতলের ফিল্টার ব্যবহৃত হবে, তবে বেশীর ভাগ এলাকায় গভীরতা 82 ফুট বা 100 ফুটের মধ্যে। সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহৃত হবে, জলাকর্ষণ গড়ে ঘণ্টায় 7000 গ্যালন। প্রভাবিত মণ্ডল চারিদিকে 300 ফুটের মধ্যে। প্রতিটি নলকূপের সম্ভাব্য ব্যয় 6500 টাকা।

চালু এবং প্রস্তাবিত 885টি গভীর এবং 22,589টি অগভীর নলকূপের দ্বারা জেলার চাষযোগ্য জমির 30 ভাগ জল-সেচএলাকায় আনা যাবে। নদীর দুই ধারে আধ মাইল পর্যন্ত প্রায় 10 ভাগ এলাকায় নদী-জলোত্তোলন প্রকল্পের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু এখনও 60 ভাগ চাষযোগ্য জমি পড়ে থাকছে। নিরাপদ সীমা-রেখা বজায় রেখে আরও নলকূপ খনন করা কি সম্ভব নয়? এর সদুত্তরের জন্য দুটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। এক—কোন সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি না করে জেলার ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ থেকে কত বেশী জল আহরণ করা সম্ভব। উপরের হিসাব-নিকাশের সময় শুধু পুনর্নিষেক থেকে সঞ্চিত জল আহরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, জলসম্পদ বিশেষ বিপর্যস্ত হয় নি। দুই—পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, মালদহ থেকে অন্তঃপ্রবাহের সাহায্য জেলার বহিঃপ্রবাহ থেকে কত বেশী পাচ্ছে। প্রস্তাবিত 375টি গভীর এবং 11,438টি অগভীর নলকূপ খননে কমপক্ষে তিন বছর সময় লাগবে। এই তিন বছরের মধ্যে নবগঠিত 'রাজ্য জল-পর্ষদ' নিশ্চয়ই উপরিউক্ত প্রশ্ন দুটির সদুত্তর বের করবে এবং আরও প্রচুর নলকূপ খননের ব্যবস্থা হবে। মধুমতীর শাশত ফল্গুধারা নদীয়া-বাসীর জীবন মধুময় করে তুলবে। ঘাটতি জেলা বাড়তি জেলা হবে, অন্যেরও মুখের অন্ন যোগাবে।

বিপদের মুখে বায়ুমণ্ডলের ওজোন

দীপক বসু*

ওজোন এক প্রকার গ্যাস। রং নীলাভ এবং বিশেষ এক ধরণের গন্ধযুক্ত। রাসায়নিকের কাছে এই গন্ধ বিশেষ পরিচিত। অক্সিজেনের অণুতে (O_2) ছুটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। ছুটির বদলে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু এক সঙ্গে মিলে গঠিত হয় ওজোন অণু (O_3)। বায়ুমণ্ডলে এর অবস্থিতি ভূপৃষ্ঠের জীবজগতকে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির কবল থেকে রক্ষা করে। তাই আমাদের কাছে ওজোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুমণ্ডলে এর হ্রাসপ্রাপ্তি আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের বায়ুমণ্ডলকে প্রধানতঃ ছুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—নিম্নবায়ুমণ্ডল ও উচ্চবায়ুমণ্ডল। নিম্নবায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি পঞ্চাশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত। এখানকার নানারূপ ঘটনাবলীর সঙ্গে আমরা পরিচিত—প্রধানতঃ আবহাওয়া (ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ, তুষারপাত ইত্যাদি)। উচ্চ বায়ুমণ্ডলের বায়ুকণিকা সূর্যরশ্মির প্রভাবে আয়নিত হয়ে যায় (কোন পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, তাকে বলে আয়ন)। তাই এর আর এক নাম আয়নমণ্ডল। দূর পাল্লার বেতার যোগাযোগের জন্যে আয়নমণ্ডল অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ নানা প্রকার গ্যাসের অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত—যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ওজোন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। এই সব গ্যাসের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে প্রধানতঃ সূর্যরশ্মির প্রভাবে।

1378 খৃষ্টাব্দে সূর্যরশ্মির বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, 2900 Å ($1 Å = 10^{-8}$ সেঃ মিঃ)-এর কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (তরঙ্গের পাশাপাশি ছুটি উচ্চতম অংশের মধ্যে দূরত্ব) রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে সক্ষম নয়। তখনই বায়ুমণ্ডলের ওজোনের অস্তিত্ব সন্দেহ করা হয়। ফলে বায়ুমণ্ডলের ওজোনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রায় শতবর্ষ পূর্তির পথে।

ওজোন আমাদের নিম্নবায়ুমণ্ডলের অধিবাসী। ভূপৃষ্ঠের উপর মোটামুটি কুড়ি থেকে চল্লিশ কিঃ. মিঃ. অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। এই অঞ্চলকে ওজোনমণ্ডল বলা হয়।

সূর্যের অতিবেগুনীরশ্মি অক্সিজেন অণুকে ভেঙে অক্সিজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত করে ($O_2 \rightarrow O + O$)। অক্সিজেন পরমাণু তখন অন্য অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে ওজোন অণু ($O + O_2 \rightarrow O_3$) (এই প্রক্রিয়া অবশ্য প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় কোন অণুর উপস্থিতির মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়ে থাকে, যদিও এই তৃতীয় বস্তু মূল প্রক্রিয়ার কোন অংশ গ্রহণ করে না)। একদিকে যেমন এইভাবে ওজোন সৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওজোন আবার ধ্বংসও হয়ে যাচ্ছে। ওজোন অণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছুটি অক্সিজেন অণুর সৃষ্টি করতে পারে ($O - O_3 \rightarrow 2O_2$)। এছাড়া 2900 Å-এর কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সূর্যরশ্মি ওজোন অণুকে ভেঙে দিতে সক্ষম ($O_3 \rightarrow O + O_2$)। এই প্রক্রিয়ার ফলেই বায়ুমণ্ডলে ওজনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই ওজোন

*Instituto Astronomicoe Geofisico Universidade do Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil.

সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে দেয় না। এইভাবে নিম্নবায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মির প্রভাবে চলেছে ওজোনের ভাঙাগড়ার খেলা। এরই মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা বজায় রেখে ওজোনমণ্ডল নিজেকে রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু সূর্যরশ্মির প্রভাবের পরিবর্তনের জন্যে ওজোনের পরিমাণ বিভিন্ন অক্ষরেখায় বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ও সৌরচক্রের বিভিন্ন অংশে (সৌরকলঙ্কে হ্রাস-বৃদ্ধিকে সৌরচক্র বলে) বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

এই সাম্যাবস্থা ভূপৃষ্ঠে মানবজাতি ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দায়ী। তার প্রধান কারণ ওজোন সূর্যের শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকে রেখেছে। যদি ওজোনের পরিমাণ কিছুটা কমে যায়, তবে অধিকতর পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়বে এবং জীবজগতের উপর তার প্রভাব ভয়াবহ হতে পারে। সে কথা পরে আলোচনা করা হচ্ছে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন—অতিবেগুনী রশ্মি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, অল্প পরিমাণে ভাল ঠিকই, কিন্তু বেশী হলে বিপজ্জনক। ওজোন গ্যাস নিজেও তাই। অনেকেরই হয়তো জানা আছে—সমুদ্রের বাতাসে ওজোন আছে এবং তা স্বাস্থ্যপ্রদ, কিন্তু খুবই স্বল্পমাত্রায়। সীমা অতিক্রম করলে ওজোন ক্ষতিকর।

এখন দেখা যাক কি ভাবে বায়ুমণ্ডলে ওজোনের পরিমাণ বিপজ্জনক ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে পারে। তিনটি প্রক্রিয়ার কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন—বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, উচ্চাকাশে বিচরণকারী জেটবিমান এবং ঘরে ঘরে ব্যবহৃত (বিশেষভাবে পাশ্চাত্যদেশে) ক্লোরোকার্বন।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস (NO) নির্গত হয়ে থাকে। শব্দের থেকে দ্রুতগামী জেটবিমান থেকে নির্গত গ্যাসের মধ্যেও থাকে প্রচুর নাইট্রিক অক্সাইড। নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে ওজোনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ওজোন তার তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে একটি হারিয়ে অক্সিজেন অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে ($NO+O_3 \rightarrow O_2+NO_2$)। পারমাণবিক বিস্ফোরণ (পরীক্ষামূলক) প্রধানতঃ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ঘটে থাকে বলে এর প্রভাবে ওজোনের হ্রাসপ্রাপ্তি প্রধানতঃ উত্তর গোলার্ধের বায়ুমণ্ডলেই পরিলক্ষিত হবে। অপরদিকে, একটি হিসাবে বলা হয়েছে যে, মোটামুটি পাঁচ-শ' জেটবিমান যদি ওজোনমণ্ডলের কাছাকাছি বিচরণ করে, তবে পাঁচ-শ' বছরে ওজোনের পরিমাণ শতকরা বারো ভাগ হ্রাস পাবে।

ক্লোরোকার্বন এক ধরণের রাসায়নিক বস্তু—কার্বন, ক্লোরিন ও ফ্লোরিন পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এর ব্যবহার অনেক—যেমন এরোসল (যে কোন প্রকার 'স্প্রে' হিসাবে ব্যবহৃত, যেমন—দুর্গন্ধনাশক, কীটনাশক ইত্যাদি), রেফ্রিজারেশন, প্লাষ্টিক প্রস্তুত, দ্রাবক, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি। ভূপৃষ্ঠে ক্লোরোকার্বন, খুবই নিরীহ ও নির্লিপ্ত—কারো সঙ্গে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয় না। কিন্তু ক্লোরোকার্বনের অণু ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং ওজোনমণ্ডলের কাছাকাছি এসে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ভেঙে গিয়ে ক্লোরিন পরমাণু নির্গত হয়। ক্লোরিন ওজোনের স ঙ্গ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে অক্সিজেন অণুর সৃষ্টি করে ($Cl+O_3 \rightarrow Cl\,O+O_2$)। এখানে মনে রাখতে হবে, ক্লোরোকার্বন অণুর ঊর্ধ্বগতি ঘটে থাকে খুব ধীরে ধীরে। যদি অনতিবিলম্বে ঘোষণা করা হয় যে, পৃথিবীর কোথাও আর ক্লোরোকার্বন ব্যবহার করা হবে না, তবুও যা বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়ে রয়েছে, তার প্রভাব প্রায় শত বছর ধরে চলবে এবং আগামী পনেরো বছর ওজোনের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ হ্রাস পাবে

উপরে যে তিনটি প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো, তার যে কোনটি বা তিনটি যৌথভাবে ওজোন থেকে একটি অক্সিজেন পরমাণু বিচ্ছিন্ন

করে তাকে অক্সিজেন অণুতে পরিবর্তিত করছে। অক্সিজেন অণুর পক্ষে অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকানো সম্ভব নয়। ফলে ভূপৃষ্ঠের সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কুফল হলো মানবদেহে চর্মের ক্যান্সার। এছাড়া শস্যের উপরও প্রভাব দেখা যেতে পারে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে ক্যান্সার রোগ। সম্প্রতি সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠের উপর অক্ষরেখার সঙ্গে (এর সঙ্গে ওজোনের পরিমাণের সম্পর্ক আছে, একথা আগেই বলা হয়েছে) এক ধরণের চর্মের ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাবের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এতে বিজ্ঞানীরা আরও বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এর প্রতিকার কি? প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও তৎপর করে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াসমূহ ভূপৃষ্ঠে জীবজগতের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কতখানি দায়ী। এর জন্যে দরকার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সহযোগিতা; যথা—বায়ুমণ্ডল-বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্, পদার্থবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। পারমাণবিক বিস্ফোরণ (বায়ুমণ্ডলে, পরীক্ষামূলক) ও এক ধরণের বিমান যা প্রধানতঃ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রীবাহী বিমান ও ক্লোরোকার্বনের সঙ্গে শিল্প ও বণিক সম্প্রদায় যুক্ত। তাঁদের সহযোগিতা এর জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। সম্প্রতি নানা ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার (এমনকি বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যেও) পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও কি তা সম্ভব হবে না?

সঞ্চয়ন

সয়াবীনের ময়দার রুটি যথেষ্ট পুষ্টিকর

গমের ময়দার সঙ্গে সয়াবীনের ময়দা মিশিয়ে গমের ময়দাকে পুষ্টিসমৃদ্ধ করবার গবেষণা সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। সাধারণতঃ যে ময়দা দিয়ে রুটি তৈরী হয়ে থাকে, তাতে প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। কাজেই এই রুটির পুষ্টিগুণ যথেষ্ট নয়। রুটির খাদ্যগুণ কোন রকম নষ্ট না করে তার সঙ্গে উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ সয়াবীনের ময়দা এবং অন্যান্য আরও অনেক প্রোটিনসমৃদ্ধ উপাদান মিশিয়ে রুটির ময়দাকে গাঁজানো বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে। সয়াবীনের ময়দায় প্রোটিনের অংশ শতকরা 12 ভাগ অথবা তার চেয়েও বেশী থাকে। এই সয়াবীনের ময়দার সঙ্গে গমের ময়দা মিশিয়ে যে রুটি প্রস্তুত হয়, তা সাধারণ ময়দায় তৈরী রুটির চেয়ে অনেক বেশী পুষ্টিকর হয়।

আগে সাদা রুটির সঙ্গে তৈলবীজের প্রোটিন মেশানো হতো। এর ফলে রুটির পরিমাণই শুধু সঙ্কুচিত হতো না, রুটির মূল উপাদান ময়দাকে নষ্ট করে ফেলতো আর ঐ ময়দায় তৈরী রুটিও কেউ নিতে চাইতো না। ক্যানজাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সি. সি. শেন এবং ডক্টর জে. হুভার সাধারণ ময়দার সঙ্গে সোডিয়াম ষ্টিয়ারইল 2-ল্যাকটিলেট (সংক্ষেপে এস. এস. এল) মিশিয়ে তাকে প্রোটিনসমৃদ্ধ করবার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। এই জাতীয় প্রোটিন

গমের প্রোটিন থেকে আলাদা। এই ধরণের প্রোটিনসমৃদ্ধ ময়দার যে রুটি তৈরী হয়, তার মান খুব উঁচু পর্যায়ের। বারো শতাংশ সয়াবীনের ময়দা মিশিয়ে যে রুটি প্রস্তুত হয়, তার সঙ্গে এস. এস. এল ব্যবহার করলে তা সাধারণ ময়দায় তৈরী রুটির সঙ্গে আকারে-প্রকারে আলাদা করা বাস্তুতঃ কঠিন। কারণ এই দুই ধরণের ময়দায় তৈরী রুটি আকৃতি রং, স্বাদ, ওজন এবং অন্যান্য সবদিক থেকেই হুবহু এক। এই রুটি তৈরীর খরচও অপেক্ষাকৃত কম।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউ.-এস. এ. আই. ডি) এই গবেষণা-কার্যের খরচ বহন করছে। এই গবেষণার ফলে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের অগণিত মানুষ উপকৃত হচ্ছে। কেন না, সেই সব দেশের জনসাধারণ এর কল্যাণে অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য পাবার সুযোগ পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি সহায়ক খাদ্য কর্মসূচী অনুসারে বিশ্বের নানাদেশে পুষ্টিসমৃদ্ধ রুটি তৈরী করবার জন্যে যেসব ময়দা পাঠানো হয়, তা এই গবেষণার দ্বারা আরও অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ করা হচ্ছে।

সাধারণ ময়দাকে পুষ্টিসমৃদ্ধ করবার জন্যে সয়াবীনের ময়দা মেশাবার কারণ হচ্ছে এই জাতীয় ময়দার উৎপাদন খুব বেশী। এই ধরণের ময়দা গুণের দিক থেকেও সর্বদা সমান। তা ছাড়া দামও খুব কম।

রুটি তৈরীর সাধারণ ময়দা নিয়াসিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ এবং বি-তে সমৃদ্ধ থাকে। ভিটামিন-বি-এর মধ্যে থিয়ামিন এবং রিবোফ্ল্যাভিন প্রভৃতি উপাদানই বেশী থাকে। শান্তিসহায়ক খাদ্য কর্মসূচী অনুসারে যে সমস্ত ময়দা সরবরাহ করা হয়, তাতে প্রোটিনের ভাগ থাকে 11 শতাংশ। আর এই কর্মসূচী অনুসারে প্রেরিত অতিরিক্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ ময়দায় প্রোটিনের ভাগ থাকে 16 শতাংশ।

21 রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রণে প্রোটিন তৈরী হয়। এর মধ্যে আটটি মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাপারে একান্ত অপরিহার্য। এই আট ধরণের অ্যাসিডের অন্যতম হচ্ছে লাইসিন। ময়দার মধ্যে এই উপাদানটি খুব কম থাকে। সেই অনুসারে মানুষ দেহের প্রয়োজনের অনুপাতে এই অ্যাসিডের যোগান কম পায়। এদিকে সয়াবীনের ময়দায় কিন্তু লাইসিনের পরিমাণ খুব বেশী থাকে। কাজেই এই ময়দা সাধারণ ময়দার সঙ্গে মেশানো হলে সাধারণ ময়দার প্রোটিনের মাত্রাতো অনেক বেড়ে যায়ই, তাছাড়া মানুষের দেহের বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডেও এই মিশ্রিত ময়দা সমৃদ্ধ হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, সাধারণ ময়দা খেয়ে ইঁদুরের দেহ যে হারে বাড়ে, সয়াবীনের ময়দা মেশানো পুষ্টিসমৃদ্ধ ময়দায় ইঁদুরের বৃদ্ধি তার সাতগুণ বেশী হয়।

শান্তিসহায়ক খাদ্যনীতি কর্মসূচী কর্তৃক সয়াবীনের ময়দা মেশানো প্রোটিনসমৃদ্ধ রুটি তৈরীর ময়দা বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করবার আগে এই খাদ্যসামগ্রীটি সামান্য কিছু পরিমাণে ভারত আর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল। শিশুদের খাদ্য হিসেবে এর উপযোগিতা পরীক্ষা করাই সামান্য পরিমাণে ঐ ময়দা পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল।

এই দুই দেশে বেকারি শিল্পের নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্যে ওয়েষ্টার্ন হুইট অ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধিগণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি সহায়ক খাদ্য কর্মসূচীর অফিসারবৃন্দ আর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে একযোগে অনেক কিছু কাজ করেছেন। ওয়েষ্টার্ন হুইট অ্যাসোসিয়েটস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গম উৎপাদনের একটি সংস্থা। এই সব পদ্ধতি ভারতের আধুনিক বেকারির জটিল যন্ত্রপাতির পক্ষেই শুধু নয়, সুদূর পাড়াগাঁয়ের অতিসাধারণ বেকারিগুলিতেও যাতে প্রয়োগ

করা যায়, সেই দিক থেকে পরীক্ষাকার্য চলছে। জল দিয়ে ময়দা গোলবার সময় জলের আনুপাতিক পরিমাণ, জল মেশাবার সময়, রুটি সেঁকবার তাপমাত্রা এবং অন্যান্য আরও অনেক খুঁটিনাটি যথাসময়ে যথোপযুক্তভাবে মানিয়ে চলবার ফলে ভারতের বেকারিগুলিতে রুটি, বিস্কুট এবং এই ধরণের অন্যান্য যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী তৈরীর ব্যাপারে স্থানীয় প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ-পুষ্টিসমৃদ্ধ রুটি নিউট্রিবান সাধারণ ময়দা, বনস্পতি তেল এবং চর্বিবিহীন শুকনো গুঁড়া দুধ সহযোগে প্রস্তুত হতো। স্কুলের বাচ্চাদের জলখাবার হিসেবে এটির খুব প্রচলন ছিল। 12 শতাংশ সয়াবীনের ময়দা নিউট্রিবান তৈরীর জন্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঐ দেশের সমগ্র স্কুলের খাবারের জন্যে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীনের পুষ্টিসমৃদ্ধ ময়দার জন্যে অনুরোধ আসে। এর দ্বারা ঐ দেশের 20 লক্ষ অপুষ্ট শিশু উপকৃত হয়। সয়াবীনের ময়দা অতিমাত্রায় পুষ্টিসমৃদ্ধ। কাজেই এই ময়দা দিয়ে নিউট্রিবান তৈরী করা হয়েছে বলে ঐ রুটিতে বনস্পতি তেল এবং গুঁড়া দুধ দেওয়া হয় নি। এর ফলে ছাত্রদের জলযোগের ব্যাপারে খরচ অনেক কমে যায়। ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, চিলি, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, হণ্ডুরাস, পেরু, নিকারাগুয়া, গুয়াটেমালা প্রভৃতি দেশের নানা বন্টন ক্ষেত্রে জাহাজ বোঝাই করে সয়াবীনের ময়দা সরবরাহ করা হচ্ছে। শান্তিসহায়ক খাদ্যনীতি কর্মসূচী অনুযায়ী প্রেরিত সাধারণ ময়দার স্থান যে একদিন ব্যাপকভাবে সয়াবীনের ময়দাই অধিকার করবে, তা আশা করা যায়।

যে সব ক্ষেত্রে খাদ্যে অধিকতর প্রোটিনের প্রয়োজন, সম্ভবতঃ সেই সব ক্ষেত্রেই খামার থেকে, শতকরা 12 ভাগ পুষ্টিসমৃদ্ধ ময়দা ব্যবহৃত হবে স্কুল ও কূপ নির্মাণ, খামার থেকে বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরী প্রভৃতি যে সকল কর্মসূচীতে খাদ্যকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে খাদ্যদান প্রকল্পে ঐ জাতীয় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করা হয়। খরচ কম অথচ উচ্চ-প্রোটিনে সমৃদ্ধ এমন সব খাবার একের পর এক উদ্ভাবিত হচ্ছে।

এই ধরণের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সর্বপ্রথম বেরিয়েছে সি. এস. এম। এতে রয়েছে 68 শতাংশ ভুট্টা, শতকরা 25 ভাগ সয়াবীনের ময়দা আর 5 ভাগ সরতোলা গুঁড়া দুধ। এই খাবার নানা রকমের ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। এরপর দেখা দিল ডাবলিউ. এস. বি. নামে গম আর সয়াবীনের সমন্বয়ে গঠিত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার। এই উভয় ধরণের খাবারই শিশু, খুব ছোট ছেলেমেয়ে, গর্ভবতী নারী অথবা যাঁরা বাচ্চাকে স্তন দান করেন, এমন মায়েদের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী।

মঙ্গলগ্রহ ও ভাইকিং

মঙ্গলগ্রহের প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধানে দ্বিতীয় ভাইকিং মহাকাশে যাত্রা করেছে 9ই সেপ্টেম্বর (1975) তারিখে। ভাইকিং মহাকাশযানে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় গোলযোগের ফলে 1লা সেপ্টেম্বর যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এই রহস্যময় লোহিতগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

প্রথম ভাইকিংটির যাত্রাও নির্দিষ্ট দিনে সম্ভব হয় নি। নির্দিষ্ট দিনের 10 দিন পরে গত 20শে আগষ্ট (1975) প্রথম ভাইকিং উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

মহাকাশযানে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার এর যাত্রা বিলম্বিত হয়েছিল।

দুটি ভাইকিংযানের প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি অরবিটার ও একটি ল্যাণ্ডার। যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করতে থাকলে প্রথম ভাইকিং 1976 সালের 4ঠা জুলাই মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করবে। দ্বিতীয় ভাইকিং অবতরণ করবে 1976 সালের 9ই সেপ্টেম্বর।

এই দুটি ভাইকিং যানে কোন মহাকাশচারী থাকছেন না। যানদুটি অতি জটিল ও সর্বাধুনিক যন্ত্রসমন্বিত। এই ধরণের মহাকাশযান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর আগে আর কখনও নির্মাণ করে নি।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার (নাসা) মহাকাশ-বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রশাসক ডক্টর নোয়েল হাইনার্স বলেছেন, যে অ্যাপোলো মহাকাশযান চাঁদে অবতরণ করেছিল। বহু দিক থেকেই ভাইকিং তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। ভাইকিং মহাকাশযানে তিনটি পূর্ণাঙ্গ জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেবোরেটরী রয়েছে। প্রত্যেকটিতে মঙ্গলের মৃত্তিকা নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালানো হবে। প্রাণের নিদর্শনের সন্ধানে নানা মেটাবলিক বা বিপাকীয় পরীক্ষা এবং বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরীক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া জীববিদ্যা সংক্রান্ত লেবোরেটরীতে রয়েছে একটি কম্পিউটার, বেতার যন্ত্রপাতি এবং পরিবেশ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদি। আর এ সবই এক ঘন-ফুটেরও কম জায়গার মধ্যে সন্নিবিষ্ট।

দুটি অরবিটের ও দুটি ল্যাণ্ডারের সাহায্যে মোট 13টি পরীক্ষা সম্পাদন করা হবে। জীব-বিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি তারই একটি অংশ। অবশ্য এই পরীক্ষাগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেকটি অরবিটারে রয়েছে দুটি উচ্চশক্তির টেলিভিশন ক্যামেরা। এই ক্যামেরার সাহায্যে মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করবার কাজে সহায়তা হবে। এছাড়া রয়েছে একটি ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমিটার। এগুলির কাজ হবে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব কোথাও আছে কিনা তার সন্ধান নেওয়া এবং মঙ্গলের আবহমণ্ডল ও মঙ্গলপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিমাপ করা।

ভাইকিং-এ সন্নিবিষ্ট ক্যামেরাগুলির সাহায্যে দুটি নির্বাচিত অবতরণ স্থলের ক্লোজ-আপ ছবি নেওয়া হবে। অবতরণস্থলের আলোকচিত্রগুলি বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরই মহাকাশযানটি মঙ্গলের বুকে অবতরণ করবে, তার আগে নয়।

আলোকচিত্র দেখে সিদ্ধান্ত নেবার পর ল্যাণ্ডার ও অরবিটার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণের সময় যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়া মণ্ডলের উপাদান, তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনত্ব পরিমাপ করা হবে। এথেকে বিজ্ঞানীরা শুধু যে মঙ্গলের বর্তমান অবস্থারই পরিচয় লাভ করবেন তা নয়, মঙ্গলের ইতিহাসের কিছু হদিসও পাবেন।

ল্যাণ্ডার মঙ্গলের বুকে অবতরণের পর অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে আণবিক, জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দিক থেকে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করা হবে এবং এর আবহাওয়া, পৃষ্ঠদেশের আভ্যন্তরীণ গঠন ও অন্যান্য ভৌত ও চৌম্বক উপাদানাদি পরীক্ষা করা হবে।

ল্যাণ্ডারে রঙীন ছবি তোলবার উপযোগী টেলিভিশন ক্যামেরাও থাকবে। এর সাহায্যে অবতরণস্থলের ব্যাপক অঞ্চলের রঙীন ছবি প্রচারিত হবে।

ডক্টর হাইনার্স বলেছেন, সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে মানুষ ছাড়া কোন মহাকাশযান অবতরণ করে এরূপ বিস্তারিত পরীক্ষাকার্য এর আগে আর সম্ভব হয় নি।

বিজ্ঞানীরা জানতে চান পৃথিবীর বিকাশ যেভাবে হয়েছে, মঙ্গলগ্রহের বিকাশ কেন সেভাবে হয় নি। পূর্ব ধারণা বাতিল করে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেরিনার-9 মহাকাশযান 1971 সালে

জানিয়েছিল যে, মঙ্গল আকৃতির দিক থেকে ঠিক পৃথিবীর মত। মঙ্গলগ্রহে অতিকায় সব আগ্নেয়গিরি রয়েছে। সৌরজগতে এত বৃহৎ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব আর কোথাও নেই। বড় বড় অনেক উপত্যকা, খাদের মত বড় বড় গহ্বর আছে। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে এমন সব চিহ্ন রয়েছে, যা দেখলে মনে হয় শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত। মঙ্গলে এখন সমুদ্রের অস্তিত্ব নেই বটে, তবে মহীসোপান, অববাহিকা, নিম্নভূমি দেখা যায়।

মঙ্গলে ভূমিকম্প হয় কিনা, তা দেখা হবে। যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে সক্রিয় গলিত অভ্যন্তরভাগ রয়েছে কিনা ভাইকিং তা পরীক্ষা করে দেখবে। মঙ্গলপৃষ্ঠের আবহাওয়া এবং এর পৃষ্ঠদেশ ও আবহাওয়ার রাসায়নিক বিবর্তন সম্পর্কেও ভাইকিং তথ্য প্রেরণ করবে। কিন্তু ভাইকিং প্রাণের সন্ধান দিতে পারবে না।

নাসার একটি গবেষণা কেন্দ্রের জীব-বিজ্ঞানী হেরল্ড ক্লিন বলেছেন, হয়তো মঙ্গলগ্রহে জীবনের স্পন্দন রয়েছে, কিন্তু আমরা হয়তো তার সন্ধান পাব না। মঙ্গলের প্রাণীগুলি হয়তো আমাদের ফাঁদে ধরা দেবে না। খুব অল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী মঙ্গলে জীবনের অস্তিত্ব আছে বলে খুবই আশা পোষণ করেন। যদি এর প্রমাণ মেলে খুবই ভাল। কিন্তু যদি না মেলে, তাহলে বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন দেখা দেবে—কেন নেই? সেই প্রশ্নের সূত্র ধরে চলবে আরও গবেষণা, আরও অনুসন্ধান।

লেসারের উপযোগিতা

গোপালচন্দ্র ভড়*

এক বিশেষ ধরণের আলোর উৎস এই লেসার। এর আবিষ্কার 1960 সালে এক আকস্মিক ঘটনা নয়; কারণ এর গঠনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি কিছু সময় ধরেই প্রকাশিত হয়েছিল সি. এইচ. টাউনস্, এ. এল. স্কালো, এন. ব্লোয়েমবারগেন্, এন. জি. বাসভ্; পি. এম. প্রকভ্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণামূলক প্রবন্ধে। তবে এর আবিষ্কার হয়তো আরও কয়েক বছর আগে হতে পারতো যখন আইনস্টাইন তাঁর উত্তেজিত বিকিরণের (Stimulated emission) তথ্য ঘোষণা করেন এবং এটাই লেসারের মূল কথা। প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবনের জন্যে এই সময়টুকু অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আবিষ্কারের পর এই স্বল্প পরিসর সময়ের ব্যবধানে আজ লেসারের ব্যবহার যে পরিমাণে প্রসারলাভ করেছে, ট্রানজিষ্টর আবিষ্কারের পর মনে হয় আর কোন জিনিষ বিজ্ঞানজগতে এরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এই প্রবন্ধে লেসারের কয়েকটা চমকপ্রদ ব্যবহারের কথা আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। তবে তার আগে সাধারণ আলোর চেয়ে লেসার আলোর কি এমন বিশেষত্ব আছে, যার জন্যে একে এক যুগান্তকারী অবিষ্কার হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে—তা জানা দরকার।

সাধারণ আলো ও লেসার আলো

আলো এক প্রকার শক্তি এবং বিজ্ঞানের ভাষায় বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গাকারে (Electro-magnetic wave) প্রবাহিত হয়। বাতির আলো, লণ্ঠনের আলো বা বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে যে আলোর উৎপত্তি—উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পুকুরের জলে কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

করলে যে ধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—সেরূপ। স্থানীয়ভাবে প্রত্যেকটা প্রস্তরখণ্ড বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটা আলোড়নের নিজ নিজ স্বাধীন সত্তা এবং তাদের মধ্যে দশাগত (Phase) সম্পর্ক থাকায় পরস্পরের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে ক্ষীণ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। যদি প্রতি প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তরঙ্গ একই তালে উৎপন্ন হতো এবং সুসমঞ্জভাবে যোজিত হতো, তবে সামগ্রিক (Resu'tant) তরঙ্গ অতি শক্তিশালী হতে পারতো। এই ধরণের প্রক্রিয়া ঘটানো হয় লেসারে।

লেসারের মধ্যে থাকে এক বিশেষ মাধ্যম এবং এই মাধ্যমের অক্ষের (Axis) সঙ্গে লম্বভাবে দু-প্রান্তে দুটি প্রতিফলক বসানো থাকে (1নং চিত্র)। আর এই মাধ্যমকে উত্তেজিত করবার
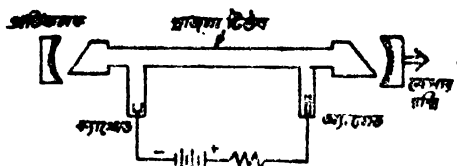
1নং চিত্র—গ্যাস লেসার

ব্যবস্থা থাকে এর মধ্যে। একে বলা হয় pumping। এটি লেসার মাধ্যমের উপর নির্ভর করে, যেমন—বায়বীয় লেসারে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ, কঠিন পদার্থ লেসারে ফ্লাস বাতি ইত্যাদি। মাধ্যমের উত্তেজিত অণু/পরমাণুর ইলেকট্রন শক্তির উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার ফলে উত্তেজক শক্তির কিছুটা আলো হিসাবে বিকিরিত হয়। প্রথমে স্বতঃবিকিরণের (Spontaneous emission) দ্বারা উৎপন্ন কয়েকটা আলোক-তরঙ্গ অক্ষপথ দিয়ে মাধ্যম অতিক্রম করার সময় অন্যান্য উত্তেজিত অণু-পরমাণু থেকে উত্তেজিত বিকিরণ সৃষ্টি করে। এটা হয় ঐ প্রাথমিক তরঙ্গের সঙ্গে সুসমঞ্জ (Coherent)। দর্পণে প্রতিফলিত হবার পর বারংবার মাধ্যমের মধ্যে ঐ ভাবে উৎপন্ন তরঙ্গগুলি একইভাবে যোজিত হয়। এভাবে উৎপন্ন তরঙ্গের তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উৎপন্ন তরঙ্গগুচ্ছ কেবলমাত্র অক্ষ ও সংলগ্ন পথেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলে রশ্মি হয় একমুখী (Directional)। আর যা প্রথমেই বলা হয়েছে কেবলমাত্র বিশেষ একজোড়া শক্তিস্তর থেকেই আলোক তরঙ্গের সৃষ্টি হয় বলে এই আলো হয় এক রঙের (Monochromatic)।

বিভিন্ন প্রকার লেসার

লেসার ক্রিয়া বর্তমানে নানাপ্রকার কঠিন, তরল, বায়বীয় অর্ধ-পরিবাহী পদার্থে পরিলক্ষিত হয়েছে। অতিবেগুনী (Ultraviolet) বর্ণালী থেকে সুদূর অবলোহিত (Far Infra-red) পর্যন্ত এদের ক্রিয়া বিস্তৃত। প্রথম আবিষ্কৃত চুনী (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·6943 মাইক্রন, 1 মাইক্রন $=10^{-4}$ সে. মি.) লেসারের পর অবিরাম He-Ne লেসার (প্রধান এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ·6328 মাইক্রন) বহুল ব্যবহৃত। এর পর দৃশ্য আলোর লেসারের মধ্যে Ar আয়ন লেসার (প্রধান একটা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·48:0 মাইক্রন) ও Dye (রঞ্জন) লেসারের কথা মনে আসে। রঞ্জন আলোর লেসারের এক বিশেষত্ব হলো এই যে, একই রঞ্জক থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লেসার আলো পাওয়া যেতে পারে। আবার বেগুনী থেকে লাল—সকল প্রকার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লেসার আলো দিতে পারে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জন। অর্ধপরিবাহী Ga As লেসারের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·8030 মাইক্রনের মত অর্থাৎ অবলোহিতের কাছে বলে সহজে দেখা যায় না। এই লেসারের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—এর ছোট আকৃতির জন্যে সহজ বহনযোগ্য এবং অপেক্ষাকৃত নিপুণভাবে কার্যক্ষম। এসব ছাড়া আরও অনেক দৃশ্য আলোর লেসার আছে। অবলোহিতের ক্ষেত্রে দুই প্রধান লেসার হলো Nd লেসার ও CO_2 লেসার। Nd অণু

নানাপ্রকার কঠিন পদার্থে লেসার ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 1 মাইক্রনের কাছাকাছি। CO_2 লেসার কাজ করে 10 মাইক্রনের কাছে। He-Ne লেসারের He-এর মত CO_2 লেসারে N_2, He, H_2O মূল লেসার মাধ্যমকে pumping-এ সাহায্য করে।

লেসার আলোর উপরে আলোচিত বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করেই এর বিভিন্ন ব্যবহার উদ্ভব হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে—সুসঙ্গত, একমুখী, একরঙা—এই তিন ধর্মের কোনটিই যথেষ্ট শক্তি ছাড়া সাফল্যলাভ করতে পারে না। সাধারণ আলো থেকে যদিও নীতিগতভাবে প্রথমোক্ত তিনটি ধর্ম পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এতে ঐ আলোর শক্তির পরিমাণ এত কমে যায় যে, কোন কাজে তা ব্যবহার করা যায় না।

লেসারের একমুখীতা ব্যবহার

লেসার আলোর সবচেয়ে সহজ ও প্রত্যক্ষ উপযোগিতা হলো একমুখীতা ব্যবহার। লেসারের একমুখীতা পরিমাপ করা হয় রশ্মিগুচ্ছের প্রসারতার (Divergence) সাহায্যে। যদি লেসারের মধ্যে রশ্মিগুচ্ছের ক্ষুদ্রতম আকার (ব্যাস $2w_0$ হয়, তবে

$$\text{প্রসারতা} = \frac{\lambda}{\pi w_0}$$ λ —লেসার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। $2w_0$-এর পরিমাণ নির্ভর করে প্রতিফলক দুটির মধ্যে দূরত্ব এবং তাদের বক্রতার উপর। এথেকে বোঝা যেতে পারে যে, প্রসারতা এক ডিগ্রীর সামান্য এক ভগ্নাংশ সাধারণভাবে হতে পারে। লেসার রশ্মির এই অল্প প্রসারতার উপর নির্ভর করেই নানারকম ব্যবহারের উদ্ভব হয়েছে। পরীক্ষাগার ও গবেষণাগারে বিভিন্ন যন্ত্র একরৈখিককরণ ছাড়াও বাস্তব জীবনে এর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, যথা—কলকারখানায় বিভিন্ন যন্ত্র একরৈখিককরণে, জমি মাপবার কাজে (Surveying), রাস্তা, সুড়ঙ্গ ও সেতু ইত্যাদি তৈরী করবার কাজে।

ওয়েল্ডিং ও ড্রিলিং শিল্পে

অমার্জিত অবস্থায় (Crude form) লেসারের শক্তির ব্যবহার, লেসার আলো সুসঙ্গত হলে লেন্সের সাহায্যে ফোকাস করে অতি ক্ষুদ্রস্থানে রশ্মিগুচ্ছ একত্রিত করা সম্ভব। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f হলে $2w_1$ আকারের (ব্যাস) রশ্মিগুচ্ছকে
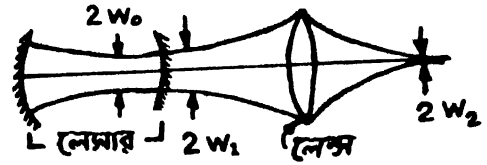
2নং চিত্র—লেসার রশ্মি লেন্সের দ্বারা কেন্দ্রীভূতকরণ

$2w_2$ আকারে পরিণত করা যায় (2নং চিত্র); এই সূত্রানুযায়ী

$$w_2 = \frac{f\lambda}{\pi w_1}$$

কাজেই এথেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রশ্মিগুচ্ছের আকার কত ছোট করা যেতে পারে! এর ফলে অনেক বেশী শক্তির ঘনত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব। এই উচ্চশক্তি ঘনত্বে ধাতু, অধাতু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বস্তুর ওয়েল্ডিং বা ড্রিলিং অতি সহজেই করা যায়।

লেসার রেডার বা Lidar

কোন বস্তুর দূরত্ব, অবস্থান, সামগ্রিক আকার ইত্যাদি নির্ণয় করবার জন্যে রেডার ব্যবহার করা হয়। সাধারণ রেডারে মাইক্রোওয়েভ বেতার-সংকেত ঐ বস্তুর দিকে পাঠানো হয়। ঐ সংকেত বস্তু থেকে কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। পাঠানো ও ফিরে আসবার সময়ের ব্যবধান মেপে বস্তুর অবস্থান ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

বিচ্ছিন্ন লেসারের আলো এই কাজ আরও সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে করতে পারে, কারণ লেসার আলোর একমুখীতা এই কাজে বিশেষ সহায়ক। তবে এক্ষেত্রে লেসার ও ঐ বস্তুর মধ্যে কোন বাধা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। লেসারের শক্তির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে এই লেসার রেডারের ব্যাপৃতি (Range), অর্থাৎ কতদূরের বস্তুকে এভাবে মাপা সম্ভব। এ কাজের জন্যে দৃশ্য আলোর চুণী লেসার সর্বাধিক ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে প্রতিরক্ষা (Defence) সম্পর্কিত কাজে অবলোহিত লেসার যথা Nd ও Ga As লেসার ব্যবহৃত হচ্ছে। সুবহনযোগ্যতার (Portability) কথা চিন্তা করলে এবিষয়ে Ga As লেসারই সর্বাধিক উপযোগী।

বায়ু দূষিতকরণ নির্ণয়

শহরাঞ্চলে বাতাসে নানাপ্রকার ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। এসব গ্যাস সাধারণতঃ মোটরগাড়ী, বিভিন্ন ধরণের কলকারখানা, তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি থেকে নির্গত হয়ে বাতাসে মেশে। এগুলির মধ্যে NO, CO, C_2H_4, SO_2 উল্লেখযোগ্য। লেসারের সাহায্যে এসব গ্যাসের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রত্যেক গ্যাসের তার নিজস্ব বিশিষ্ট শোষণ কম্পাঙ্ক আছে। কাজেই ঐ কম্পাঙ্কের লেসার আলো গ্যাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করালে শোষণ ও শোষণমাত্রা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা সম্ভব। গ্যাসের শোষণ কম্পাঙ্কের লেসার আলো হওয়া দরকার। এছাড়া ঐ কম্পাঙ্কে বাতাসের সাধারণ উপাদান বা অন্য কোন দূষিত পদার্থের শোষণ থাকলে পরিমাপের অসুবিধা সৃষ্টি করে। সেজন্যে একাজে পরিবর্তনশীল কম্পাঙ্কের লেসারের (Tunable laser) দ্বারা শোষিত বর্ণালী অঞ্চলের পরিমাপ করা যায়। শোষণ মাত্রার অনুপাত থেকে পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Stanford University, M. I. T ও Bell Talephone Laboratories একাজে বিশেষ অগ্রণী। এভাবে বায়ুমণ্ডলের লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত দূষিত
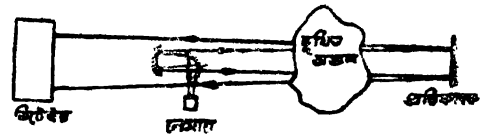
3নং চিত্র—বায়ু দূষিতকরণ নির্ণয়

গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। (3নং চিত্র)।

লেসার ফটোগ্রাফী বা হলোগ্রাফী

সাধারণ ফটোগ্রাফীতে কোন বস্তু বা দৃশ্য থেকে নিক্ষিপ্ত আলো লেন্স মারফৎ ফোকাস করে কোন দ্বিমাত্রিক তলে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করা হয়। 1948 সালে ডেনিস গেবর এক নূতন ধরণের ফটোগ্রাফীর কথা ঘোষণা করেন। এর দুই ধাপ—প্রথমতঃ বস্তুকে কোন সুসঙ্গত আলো দিয়ে আলোকিত করতে হয়। বস্তু থেকে নিক্ষিপ্ত আলোর সঙ্গে আপতিত আলোর এক অংশের (Reference beam) ব্যতিচার (Interference) নিবদ্ধ করা হয় কোন ফটোগ্রাফিক ফিল্মে (4নং চিত্র)। একে বলা হয় হলোগ্রাম (Hologram)। দ্বিতীয়তঃ এটাকে কোন সুসঙ্গত আলো দিয়ে আলোকিত করলে বস্তুটির প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। এভাবে তৈরী প্রতিবিম্বে বস্তুর ত্রি-মাত্রিকতা প্রকাশিত হয় ; অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দেখবার কৌণিক অবস্থান পরিবর্তন করলে বস্তুর গভীরতা ও পাশের অংশ প্রকাশ পায়। কাজেই এধরণের একটা ছবি বহু দ্বিমাত্রিক ছবির সমতুল্য। এছাড়া আরও একটা আকর্ষণীয় ধর্ম হলো এই যে, হলোগ্রামের যে:কান ভগ্নাংশ পূর্ণ প্রতিবিম্ব গঠন করতে সক্ষম, তবে এতে প্রতিবিম্বের তীক্ষ্ণতা

(Resolution) হ্রাস পায়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ হলো হলোগ্রাম তৈরী করবার সময় বস্তুর সকল
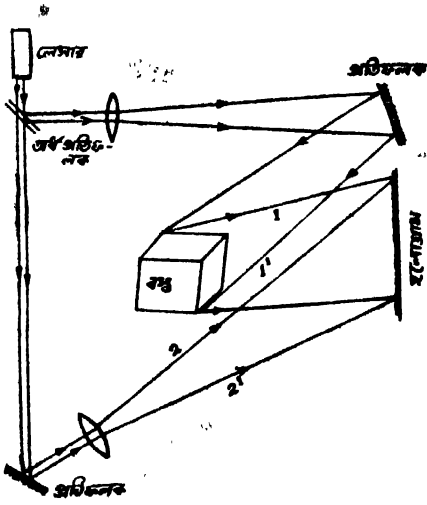
4নং চিত্র—হলোগ্রাফী। 1 1' বায়ু থেকে নিক্ষিপ্ত আলো। 2 2' রেফারেন্স আলো

অংশ থেকে আলো ফিল্মেরও সকল অংশে পড়ে; অর্থাৎ ফিল্মের প্রতিটি বিন্দু বস্তুর সকল বিন্দু থেকে নিক্ষিপ্ত আলো পায়। কিন্তু সাধারণ ফটোগ্রাফীতে প্রতিবিম্বের কোন অংশ বস্তুর অনুরূপ অংশের আলো থেকেই সৃষ্ট হয়। হলোগ্রামের ফিল্মের উপর আবার পর পর একাধিক ব্যতিচার নিবদ্ধ করা সম্ভব। এর ফলে ঐ বস্তুর সামান্যতম পরিবর্তন নির্ণয় করা যেতে পারে, যে পরিবর্তন হয়তো সাধারণভাবে চোখে দেখা ও নির্ণয় করা সম্ভব নয়। হলোগ্রাফীর ব্যবহার আজকাল বহুল প্রসারলাভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে এর সাহায্যে ত্রিমাত্রিক ও রঙীন টেলিভিসন তৈরী করা সম্ভব হবে।

লেসার যোগাযোগ ব্যবস্থা

বর্তমান মানবসভ্যতা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বেতার-তরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভের দ্বারা রেডিও, টেলিভিসন প্রচার ছাড়াও টেলিফোন, ছবি ইত্যাদি আদান-প্রদান করা হয়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এসবের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। নিম্ন কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বেশী পরিমাণে এসব সঙ্কেত আদান-প্রদান করতে পারে বলে মাইক্রোওয়েভের চেয়ে বেশী কম্পাঙ্কের তরঙ্গের কথা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছিলেন। লেসার হচ্ছে এর সমাধান। মাইক্রোওয়েভের চেয়ে লেসার তরঙ্গের সঙ্কেত-বহন ক্ষমতা প্রায় লক্ষগুণ বেশী।

এত বড় সুবিধা থাকলেও লেসারের দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করবার পথে বাধা অনেক। মুক্ত আকাশে বেতার-তরঙ্গের মত লেসার-তরঙ্গ বেশী দূর যেতে পারে না, কারণ বাতাসের নিক্ষিপ্তকরণ, শোষণ ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে এই তরঙ্গ উপযোগী। পৃথিবীতে সঙ্কেত পাঠাবার কাজে একে ব্যবহার করতে গেলে লেসার রশ্মিকে আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে চালিত করা (Guide) প্রয়োজন। এজন্যে সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হলো এক বিশেষ ধরণের কাচ থেকে তৈরী সরু সূতার মত fibre-এর মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মি চালিত করা। এই fibre-এর মধ্যে কোর (Core) থাকে আরএক ধরণের কাচ বা এক প্রকার তরল পদার্থ, যার প্রতিসরনাঙ্ক বাইরের (Cladding) কাচের আবরণের প্রতিসরনাঙ্কের চেয়ে কিছু বেশী (5নং চিত্র)। ক্ল্যাডিং ও
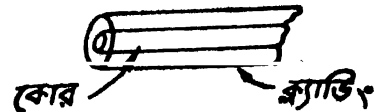
5নং চিত্র—গ্লাস ফাইবার

কোরের পদার্থের আলোক শোষনাঙ্ক খুব কম হওয়া প্রয়োজন। সঙ্কেতসম্বলিত লেসার আলো অক্ষের স্তরে প্রবেশ করালে দুই মাধ্যমের

মধ্যস্তরে পূর্ণ প্রতিফলন হয়ে অক্ষের স্তর দিয়েই যেতে থাকে। খুব অল্প শোষণাঙ্কের fibre-এর মধ্যে দিয়েই এভাবে কয়েক কিলোমিটার যাবার পরও বহির্গত লেসার আলো থেকে সব সংকেত বের করা সম্ভব। পরীক্ষামূলকভাবে একপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়াতে এই ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোর প্রচেষ্টা চলছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহার

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেসারের ব্যবহার বহুল গবেষণাসাপেক্ষ। ইতিমধ্যে কয়েকটা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। শল্যচিকিৎসায় এবং চক্ষু-চিকিৎসায় বর্তমানে এর ব্যবহার আশাপ্রদ। পাশ্চাত্যদেশে কয়েকটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এধরণের যন্ত্রপাতিও তৈরী করছে। লেসার আলোর শক্তিই হলো এই ব্যবহারের মূলকথা। বিচ্ছিন্ন লেসারের রশ্মি গুচ্ছ লেন্সের সাহায্যে ফোকাস করে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এর ফলে ঐ পেশীর অংশ দূরীভূত হয়। একাজে সময় লাগে সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। এই সামান্য সময়ের মধ্যে বেদনা হয় না বলে চেতনা লোপের প্রয়োজন হয় না। চোখের ছানি ও গ্লুকোমা চিকিৎসায় অপকারী পেশীর অংশ দূরীকরণে এর ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া দন্ত চিকিৎসা, চর্মবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেসারের ব্যবহার সম্বন্ধে বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আইসোটোপ পৃথকীকরণ

লেসারের সাহায্যে আইসোটোপ পৃথক করা বর্তমানে বিভিন্ন দেশে প্রাধান্য লাভ করছে। এই ব্যবস্থা অন্যান্য প্রচলিত প্রক্রিয়ার তুলনায় সহজ ও দ্রুত; পরীক্ষাগারে প্রাথমিকভাবে তা প্রমাণিত হয়েছে—যদিও অপেক্ষাকৃত হাল্কা আইসোটোপের ক্ষেত্রে।

মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রকের বিভিন্ন ভর অবস্থাই হলো তার আইসোটোপ। সাধারণ অবস্থার তুলনায় অন্য অবস্থায় এক বা একাধিক নিউট্রন কণিকা কম বা বেশী থাকে। বিভিন্ন ভর অবস্থার জন্যে পরমাণুর শক্তিস্তরের কিছুটা পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ঐ মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আইসোটোপের ক্ষেত্রে। ভরের তফাৎ যত বেশী, শক্তিস্তরের পার্থক্যও হবে তত বেশী। কাজেই এদের দ্বারা শোষিত বা বিকীর্ণ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেরও পার্থক্য থাকে। লেসার আলোর একরংমুখীতাই আইসোটোপ পৃথকীকরণে এর ব্যবহারের অন্যতম প্রধান কারণ। লেসার থেকে উৎপন্ন আলোক-তরঙ্গের বিস্তার (Line width) অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলে কোন পদার্থের আইসোটোপ মিশ্রণে অন্যান্য আইসোটোপে ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট একটা আইসোটোপকেই উত্তেজিত করা সম্ভব। পরে এই আইসোটোপকে অন্যান্য অনুত্তেজিতের মধ্যে থেকে ফটো-কেমিক্যাল বা অন্য কোন বিক্রিয়া দ্বারা পৃথক করা হয়। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সর্ত হলো এই যে, বিভিন্ন আইসোটোপের মধ্যে যথাসম্ভব বেশী শক্তিস্তরের পার্থক্য (এর উপরই নির্ভর করে separation factor) এবং এটা লেসারের তরঙ্গ বিস্তারের চেয়ে বেশী হওয়া চাই। আর প্রয়োজন আইসোটোপের দ্বারা শোষণের উপযোগী আলোর তরঙ্গ লেসার আলোর তরঙ্গের সঙ্গে সমান হওয়া ছাড়াও উপযুক্ত ফটো-কেমিক্যাল বিক্রিয়া। বর্তমানে tunable লেসার (যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অবিরাম পরিবর্তন করা যায়) এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী হলেও উপযুক্ত ফটো-কেমিক্যাল বিক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্যে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। হাইড্রোজেন, ট্রিটিয়াম ও ডয়টেরিয়ামের ক্ষেত্রে অনেক বেশী sepa-

ration factor পাওয়া যায়। 0·42444 মাইক্রন আলো (Transition) ইউরেনিয়াম-238 ও ইউরেনিয়াম-235 আইসোটোপে 1·4 cm-¹ তরঙ্গ-বিস্তার পার্থক্য সৃষ্টি করে। শক্তিউৎপাদনের ক্ষেত্রে লেসারের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। নিউক্লিয় বিভাজন (Fission) ক্রিয়ায় আইসোটোপ পৃথকীকরণই প্রথম ও প্রধান কথা। কাজেই এভাবে পৃথকীকৃত থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম আইসোটোপ নিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজন ঘটালে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া সম্ভব। এছাড়া নিউক্লীয় সংযোজনেও (Fusion) লেসারের ব্যবহার অত্যন্ত আশাপ্রদ। ইতিমধ্যেই আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মেনী প্রভৃতি দেশে শক্তিশালী Nd-Glass লেসারের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে হাল্কা পরমাণুর নিউক্লীয়াসের সংযোজন করা হয়েছে। বিশ্বে ফসিল শক্তি (কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) সীমিত, তাই অফুরন্ত নিউক্লীয় শক্তি আহরণে লেসার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অধিকার করবে।

ভারতের অগ্রগতি

বিশ্বের উন্নত দেশে আজ লেসার বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা সুরু হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণাগারে, জাতীয় ভৌত গবেষণাগার, ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে। এর পর বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশ থেকে লেসার এনে বা পরীক্ষাগারে তৈরী করে গবেষণা প্রসার লাভ করে। সম্প্রতি কলকাতার কেন্দ্রীয় কাচ ও সিরামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে প্রথম কাচের লেসার মাধ্যম তৈরী করতে সক্ষম হওয়ায় লেসার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক দৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা হয়েছে। আমাদের দেশে লেসারের তত্ত্বীয় ও মৌলিক গবেষণার চেয়ে ব্যবহারিক গবেষণারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। পাশ্চাত্যদেশে পরীক্ষালব্ধ ফল নিত্যনিয়ত গবেষণাগার থেকে শিল্পে ব্যবহারিক-ভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিষয়ে চেতনা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রসার না থাকায় ব্যবহারিক গবেষণার চেয়ে তত্ত্বীয় গবেষণাই অধিক সংখ্যায় অনুসৃত হচ্ছে। যদিও অল্প কয়েকটি গবেষণাগার লেসার তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচেষ্টার অভাব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবিষয়ে যোগসূত্রে অভাবের ফলে এবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয় নি। তাই এজন্যে প্রয়োজন এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হবে লেসারের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিকগুলির প্রয়োগ বিভিন্ন পরীক্ষাগারের উপর ন্যস্ত করা। এভাবে মনে হয় আমাদের মত বিকাশশীল দেশে এই শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব।

উপসংহার

এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে লেসারের কয়েকটা ব্যবহারের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া লেসারের আরও অনেক চমকপ্রদ ব্যবহার আছে এবং নিত্যনূতন ব্যবহারেরও উদ্ভাবন হচ্ছে। ট্রানজিষ্টর যদিও ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের চেয়ে এক উন্নত যন্ত্র মাত্র, তথাপি এর আবিষ্কার ইলেকট্রনিক শিল্পে এক যুগান্তর এনেছে। লেসারের বিশিষ্ট ধর্মগুলির বিকল্প কোন যন্ত্র নেই, কাজেই এমন আশা করা অযৌক্তিক নয় যে, লেসার সে সব কাজ করতে সক্ষম হবে, যা পূর্বে অসম্ভব বা অকল্পনীয় ছিল। আলোচিত কয়েকটি ব্যবহার থেকে সে কথাই মনে হয়।

প্রোটিনের অভিব্যক্তি রহস্য

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

জীবদেহের গঠনে প্রোটিনের অবদান সর্বজনবিদিত এবং এবং এরই মাধ্যমে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কুড়ি প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমিক সজ্জায় গড়ে ওঠে প্রোটিনের জটিল শিকলি। একটি, দুটি কখনও বা তার চেয়ে বেশী শিকলি দিয়ে প্রোটিনের এক অতিকায় অণু সৃষ্টি হয়।

ছত্রাক ও মানুষের পার্থক্যের মূলে আছে বিভিন্ন প্রোটিনের সমাবেশ। বিভিন্ন জীবে এমন কতকগুলি সাধারণ প্রোটিনের অস্তিত্ব দেখা যায় যে, যাদের সাহায্যে জীবের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব। মানুষের রক্তকণিকায় যে হিমোগ্নোবিন থাকে, তাকে সাধারণ প্রোটিন হিসাবে গণ্য করা যায়। এর ধর্ম হচ্ছে অক্সিজেন বহন করা এবং ফুস্ফুসের মধ্যে ঢুকে শরীরের বিভিন্ন তন্তুতে তা ছড়িয়ে দেওয়া। হিমোগ্নোবিনের অস্তিত্ব মানুষ, বানর, গরু, ভেড়া, কুকুর, ইঁদুর প্রভৃতি জীবে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জীবে এই প্রোটিনের কার্যকলাপ অভিন্ন। ভাবতে অবাক লাগে কি করে এই ধরণের সাধারণ প্রোটিন কোটি কোটি বছর ধরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে। বিভিন্ন জীবে কোন এক প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম অনুধাবন করলে, তাদের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা যায়। এই কারণে প্রোটিনকে জীবন্ত 'জীবাশ্ম' বলে।

জীবাশ্মের ও জীবের আকৃতিগত প্রকারভেদের সাহায্যে প্রাণীজগতের বিবর্তন-লতিকা (Evolutionary tree) প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যখন জীবাশ্মের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন বিভিন্ন প্রাণীর কোন সাধারণ প্রোটিনের অ্যামিনো সজ্জাক্রমের পার্থক্য থেকে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন কালও (Divergence time) জানতে পারা যায়।

প্রজনন-বিজ্ঞানীরা নিকট-জাতের যৌন-মিলনের (Crossing) সাহায্যে তাদের বংশগত পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন। কিন্তু এই মিলনেরও এক সীমা আছে। দূরসম্পর্কীয় দুই ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিসম্পন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলন ঘটানো সম্ভব নয়। যৌন-মিলন ব্যতিরেকে বর্তমানে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম বিশ্লেষণ করে দূরসম্পর্কীয় প্রজাতির বংশগত পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। আমেরিকার উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক জে. এফ. ক্রো এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, তিমিমাছ ও ইঁদুরের সঙ্গে মিলন ঘটানো সম্ভব না হলেও, তাদের কোন সাধারণ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম তুলনা করে বলা যাবে যে, তাদের মধ্যে কয়টা পার্থক্য আছে এবং কোন্ স্থানে তা ঘটেছে।

জীবের দেহকোষে ডি-এন-এ নামে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে, তাকে বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদান বলে গ্রহণ করা হয়। চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের ক্রমিক সজ্জায় ডি-এন-এ অণুর এক বিরাট শিকলি গড়ে ওঠে। ডি-এন-এ থেকে কিভাবে প্রোটিন সংশ্লেষিত এবং প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ধারিত হয়, সে সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়েছে (ডিসেম্বর 1968, জানুয়ারী 1969, মে 1970, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1970, 1971) । ডি-এন-এ শিকলির যে অংশ বিশেষ একটি প্রোটিন অণু সৃষ্টি করে, সেই অংশকে জিন বলে। বিভিন্ন প্রোটিন বিভিন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জিনের অর্থাৎ ডি-এন-এ'র কোন অংশের রূপান্তর বা পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটলে, প্রোটিনের কোন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে তা ঘটে ব্যক্তিবিশেষে পরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র জনসাধারণে। এই প্রক্রিয়াকে অ্যামিনো অ্যাসিড অথবা জিন প্রতিস্থাপন (Gene substitution) বলে। আবার প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড শিকলির কোন অংশের যুক্তিতে বা বিযুক্তিতে শিকলিটা লম্বায় বড় ও ছোট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রক্রিয়াকে জিনের দ্বিত্বকরণ (Gene duplication) বলে। জিনের দ্বিত্বকরণে ও প্রতিস্থাপনে প্রোটিনের অভিব্যক্তি ঘটে।

উদাহরণ হিসাবে হিমোগ্লোবিন প্রোটিনের অভিব্যক্তি অনুধাবন করা যেতে পারে। যে কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হিমোগ্লোবিন অণু ছুটি আলফা-শিকলি (α-chain) ও ছুট বিটা-শিকলি (β-chain) দিয়ে গঠিত। একটি আলফা ও একটি বিটা শিকলিতে যথাক্রমে 141 ও 146টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। সগু নবজাতকের হিমোগ্লোবিন অণু ছুটি আলফা ও ছুটি গামা-শিকলি (γ-chain) দিয়ে গঠিত। জন্মগ্রহণের আগের থেকে বিটা-শিকলি ধীরে ধীরে গামা-শিকলির স্থান অধিকার করে এবং সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণ ডেল্টা-শিকলির (δ-chain) আবির্ভাব হয় এবং তারা আলফা-শিকলির সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশ পায়। বিটা-শিকলির ন্যায় গামা ও ডেল্টা-শিকলিও 146টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত।

তিমির স্পার্মে (Sperm) যে মায়োগ্লোবিন প্রোটিন থাকে, তার একটি অণুতে 153টি অ্যামিনো অ্যাসিড পরপর সাজানো আছে। মায়োগ্লোবিন ও হিমোগ্লোবিন অণুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে, প্রথমটি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি শিকলি ও দ্বিতীয়টি চারটি শিকলি দিয়ে গঠিত। হিমোগ্লোবিনের আলফা ও বিটা-শিকলির সঙ্গে মায়োগ্লোবিন শিকলির গঠন তুলনা করলে যথাক্রমে 115টি ও 117টি স্থানে (Site) অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য দেখা যায়। জিন দ্বিত্বকরণের ফলে মায়োগ্লোবিন থেকে আলফা ও বিটা জাতীয় (বিটা, গামা ও ডেল্টা) হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

আবার আলফা ও বিটা-শিকলিকে যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, 77টি স্থানে ভিন্ন এবং 64টি স্থান অভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। বিটা ও গামা শিকলির এবং বিটা ও ডেল্টা-শিকলির গঠনে যথাক্রমে 39 ও 10টি অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য দেখা যায়। ছুটি ভিন্ন প্রোটিন শিকলির গঠনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য-সংখ্যা জানা থাকলে তাদের বিচ্ছিন্নকাল সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। পার্থক্য-সংখ্যা কম ও বেশী হলে ছুটি প্রোটিন শিকলির বিচ্ছিন্নকালও যথাক্রমে কম ও বেশী হয়। হিমোগ্লোবিনের বিভিন্ন শিকলিতে অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য-সংখ্যা লক্ষ্য করে সহজে বলা যেতে পারে যে, প্রথমে আলফা ও বিটাজাতীয় শিকলি, পরে গামা শিকলি ও বিটা ডেল্টা শিকলি এবং সর্বশেষে বিটা ও ডেল্টা শিকলি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

জিনের দ্বিত্বকরণের সঙ্গে জিনের পরিব্যক্তি ও প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। বিভিন্ন মানুষে আলফা ও বিটা হিমোগ্লোবিন শিকলিতে প্রায় 150টি নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিব্যক্ত হবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পরিব্যক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি এককভাবে পৃথিবীর

বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ব্যক্তির রক্তকণিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের বিটা শিকলির ষষ্ঠ স্থানে গ্লুটামিক অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তে ভ্যালিন অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হওয়ায় অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের সৃষ্টি হয়—ফলে মানুষ সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন জীবে কোন এক হিমোগ্লোবিন শিকলির অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম তুলনা করলে তাদের অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য-সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্য-সংখ্যা নিকট সম্পর্কীয় জীবে কম এবং দূরসম্পর্কীয় জীবে বেশী দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে গোরিলা, বানর, ঘোড়া, খরগোশ ও মাছের হিমোগ্লোবিন আলফা-শিকলির তুলনা করলে যথাক্রমে 1, 4, 18, 25 ও 71টি অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং বিবর্তনের বিচারে মানুষ ও গোরিলা যত কাছাকাছি, মানুষ ও মাছ তত নয়।

প্রোটিনের অভিব্যক্তির মূল রহস্য জানতে 'পপুলেশন জেনেটিক্সের' (Population genetics) গোড়ার কথা কিছু বলতে হয়। প্রজনন-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমাজে (Population) জিনের মাত্রার (Frequency) পরিবর্তনে অভিব্যক্তির (Evolution) সূচনা হয়। জিনের মাত্রার পরিবর্তন নির্ভর করে তার নির্বাচন (Selection), প্রব্রজন (Migration), পরিব্যক্তি (Mutation) ও এলোমেলো বিক্ষিপ্ততার (Random drift) উপর। যদি জিনের নির্বাচন, প্রব্রজন ও পরিব্যক্তি না ঘটে, তখন বিক্ষিপ্ততার প্রভাবে জিনের মাত্রা পরিবর্তিত হয়।' সমাজে জনসংখ্যার উপর জিনের বিক্ষিপ্ততার প্রভাব নির্ভর করে। জন-সংখ্যা কম ও বেশী হলে এর প্রভাব যথাক্রমে বেশী ও কম লক্ষ্য করা যায়। সমাজে যে জনসমষ্টি আছে, তাদের কোন বিপরীত গুণবিশিষ্ট A ও a দুটি জিনের অনুপাত যে কোন পর্যায়ে (Generation) নির্দিষ্ট। জিন-বিক্ষিপ্ততার (Genetic drift) ফলে সমাজে প্রতি পর্যায়ে জিনের মাত্রা অল্প অল্প করে পরিবর্তিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে আসে, যখন সমাজে শুধুমাত্র একটি জিন (A অথবা a) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অপরটি লোপ পায়। কোন জিন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ জিনের অধিকারী হয়। একটা চরম দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরুন, কোন সমাজে A জিনের মাত্রা a-র তুলনায় বেশী, অর্থাৎ সমাজে বেশী লোক A জিন ও কমলোক a জিন বহন করে। যে অল্প ব্যক্তি a জিন বহন করে, তাদে যদি কোন সন্তান না হয়, তাহলে সমাজে এক পর্যায়ের মধ্যে a জিনের বিলুপ্তি (Loss) ও A জিনের প্রতিষ্ঠা (Fixation) হয়। সাধারণতঃ মনুষ্য সমাজে O, A, B ও AB এই চার প্রকার রক্ত-শ্রেণী দেখা যায়, কিন্তু আমেরিকান ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ আমরা যাদের রেড ইণ্ডিয়ান বলি, তারা সকলেই O রক্তশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তাদের এক রক্তশ্রেণী হবার মূলে জিন বিক্ষিপ্ততাকে প্রধানতঃ দায়ী করা হয়।

জিনের প্রতিস্থাপন কিভাবে সমাজে প্রসার লাভ করে, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথমে কোন ব্যক্তিবিশেষে জিনের পরিব্যক্তি ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে অথবা এলোমেলো বিক্ষিপ্ততার ফলে পরিব্যক্ত জিন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়ে যায় কয়েক পর্যায়ের মধ্যে। শুধু যে ক্ষতিকর জিনের বিলোপ হয়, তা নয়। এমন কি প্রাকৃতিক নির্বাচনে যে জিন কিছুটা সুবিধা করতে পারে, সে জিনেরও বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোন জিন প্রাকৃতিক নির্বাচনে এক শতাংশ সুবিধা করতে পারে, তাহলে সেই জিনের প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দুই শতাংশ এবং বাকী 98 শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র কয়েকটি ভাগ্যবন্ত পরিব্যক্ত জিন ধীরে ধীরে সমাজে প্রসার লাভ

করে এবং পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি পরিব্যক্ত জিনটি নির্বাচন-নিরপেক্ষ (Selectively neutral) অর্থাৎ অক্ষতিকর (Harmless) হয়, তাহলে তার সমাজে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কি এবং কতকালে তা প্রতিষ্ঠিত হবে? জটিল অঙ্কের মধ্যে না গিয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিষটাকে পরিষ্কার করা যাক। ধরুন, যদি এক হাজার ব্যক্তির মধ্যে একজনের একটি জিন অক্ষতিকর জিনে পরিব্যক্ত হয়, তাহলে সেই জিনটি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার সম্ভাবনা দু-হাজারে (জনসংখ্যার দু'গুণ) একাংশ এবং জিনটি প্রতিষ্ঠিত হতে প্রায় চার হাজার (জন সংখ্যা চারগুণ) পর্যায় (Generation) সময় লাগবে।

জাপানে প্রখ্যাত প্রজনন-বিজ্ঞানী ডক্টর মটো কিমুরা দেখিয়েছেন যে, হিমোগ্লোবিনের আলাফা-শিকলিতে অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপনের হার মাছ ও স্তন্যপায়ী জীব, যেমন—ইঁদুর, খরগোস, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি সকলেরই একই রকম এবং শিকলির প্রতি স্থানে (Site) বছরে অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনের হার 10^{-9}। প্রতিস্থাপনের হার বলতে আমরা বুঝি যে, প্রোটিন শিকলির যে কোন এক স্থানে বছরে কয়টা পরিত্যক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনের হার বিভিন্ন জীবে এক রকম লক্ষ্য করে ডক্টর কিমুরা 1969 সালে অঙ্ক কষে দেখান যে, যদি কোন পরিত্যক্ত জিন প্রাকৃতিক নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে তার প্রতিস্থাপনের হার পরিব্যক্তি হারের সমান হবে। কিন্তু জিনের প্রাকৃতিক নির্বাচনে যদি কোন ভূমিকা থাকে, তাহলে প্রতিস্থাপনের হার বিভিন্ন জীবে এক রকম দেখা যাবে না। বিভিন্ন জীবে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপনের হার সমান লক্ষ্য করে ডক্টর কিমুরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রোটিনের অভিব্যক্তির মূল রহস্য নিহিত আছে নির্বাচন-নিরপেক্ষ জিনের পরিব্যক্তিতে ও তাদের বিক্ষিপ্ত প্রসারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতে।

1969 সালে 'Science' পত্রিকায় ডক্টর জ্যাক্ কিং ও ডক্টর টমাস জিউকস্ 'Non Darwinian Evolution' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ডক্টর কিমুরার মতবাদকে সমর্থন করেন। তারা বলেন যে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড গঠনে যে তিনটি নিউক্লিওটাইডের প্রয়োজন হয়, তাদের পরিব্যক্তিতে শতকরা 24টি ক্ষেত্রে অ্যামিনো অ্যাসিডের ধর্মের কোন রূপান্তর হয় না, ফলে প্রোটিনের কার্যকলাপও বিঘ্নিত হয় না। তাঁরা স্তন্যপায়ী জীবের 53টি প্রোটিনের কুড়ি প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুপাত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, চারপ্রকার নিউক্লিওটাইডে এলোমেলো সংযোগে প্রায় একই রকম অনুপাত পাওয়া যায়। যদি নির্বাচনের কোন প্রভাব থাকতো, তাহলে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুপাতের তথ্যে ও তত্ত্বের মধ্যে আশ্চর্যরকম মিল পাওয়া যেত না।

যে সব প্রজনন-বিজ্ঞানী জীবের অভিব্যক্তি বিষয়ে গবেষণা করেন, তারা আজ দু-দলে বিভক্ত। একদল নির্বাচনপন্থী, অপরদল নিরপেক্ষ পন্থী। ডারউইনপন্থীরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন যে, যেসব জিন সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তারা সকলেই পরিবেশের উপযোগী বলে প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করেছে। অপরপক্ষে কিমুরার মতাবলম্বী নিরপেক্ষপন্থীরা বলেন যে, জীবের অভিব্যক্তিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা খুবই সামান্য—নিরপেক্ষ জিনের বিক্ষিপ্ত প্রসারই মুখ্যতঃ দায়ী। জৈব রসায়নবিদ জীব বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ কিমুরাকে সমর্থন করেন, কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা, যাঁরা জীব-জন্তু ও ড্রসোফিলা মাছি নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা জিনের নির্বাচন-নিরপেক্ষতা মানতে চান না। যাঁরা মধ্যপথ অবলম্বন করেন, তাঁরা বলেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও জিনের বিক্ষিপ্ত প্রসার উভয়ই জীবের অভিব্যক্তির কারণ ঘটায়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অদৃশ্য জগৎ দৃশ্যমান

মানুষের শরীরকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট বা তিন বেধবিশিষ্ট করে দেখা এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছতাবিশিষ্ট করে দেখা কি সম্ভব? এমন স্বচ্ছতাবিশিষ্ট যাতে শরীরের ভিতরকার হাড়, পেশী, টিস্থ ও এমনকি রক্তবাহী নালীগুলি পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে ওঠে? জবাবে বলতে হয়, হাঁা। তবে তার জন্যে যেটি করা চাই, তা হচ্ছে শব্দঘটিত হলোগ্রাফি।

জর্জিয়ার বিজ্ঞানীরা আলোক-তরঙ্গের বদলে শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করে তিন-বেধের চিত্র লাভ করতে পেরেছেন। শব্দ-সংবেদনশীল কোন বস্তু যখন নিমজ্জিত হয়, তখন তার উপরিতলে বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিয়ে থাকে। লেসার রশ্মি ফেলে এই বুদ্‌বুদ্‌গুলিকে উদ্ভাসিত করা হয়। প্রতিফলিত লেসার-রশ্মি শূন্যলোকে গড়ে তোলে শব্দ-সংবেদনশীল সেই বস্তুর আলোক মণ্ডিত একটি প্রতিমূর্তি। শূন্যে প্রতীয়মান এই প্রতিমূর্তিকেই বলা হয় হলোগ্রাম।

শব্দ-তরঙ্গ নিরেট বস্তুকে ভেদ করতে পারে। শব্দ-তরঙ্গের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন গবেষকেরা, আকাঙ্খিত বস্তুকে শব্দ-তরঙ্গের গমনপথে স্থাপন করে সেই বস্তুর হলোগ্রাম তৈরী করেছেন। তারপরে এমনি একটি হলোগ্রামের মধ্যে দিয়ে পার করিয়েছেন আলোর একটি সাধারণ উৎস থেকে উদ্গত রশ্মি। আর তখনই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে সেই বস্তুর ভিতরকার পৃথক পৃথক অংশের তিন-বেধবিশিষ্ট একটি প্রতিমূর্তি।

শব্দঘটিত হলোগ্রাফির বহুপ্রকার প্রয়োগ হতে পারে। এই পদ্ধতিতে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পেতে পারেন প্রস্তরের তিন-বেধবিশিষ্ট চিত্র, দেখতে পারেন খনিজ পদার্থ ও তৈলক্ষেত্রের অবস্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আগে থেকেই দেখে নিতে পারেন মাটির ভিতরে কি আছে এবং খনন করতে হবে কিনা। আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে শব্দঘটিত হলোগ্রাফি প্রচুর মঙ্গল সাধন করতে পারে, এক্স-রে যেখানে অপারগ সেখানেও এই হলোগ্রামের সাহায্যে দেখা যেতে পারে।

অতি-পরিবাহীরূপে ধাতব হাইড্রোজেন

হীরকের তৈরী একটি বিশেষ কুঠরির মধ্যে ত্রিশ লক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করলে অসাধারণ প্রকৃতির একটি উপাদান লাভ করা যেতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোজেন থাকে গ্যাসীয় রূপে এবং হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুর সমন্বয়ে একটি অণু গঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে শীতল করে তুললে হাইড্রোজেন প্রথমে হয় তরল এবং তার পরে হিমাঙ্কের 259 ডিগ্রী নীচের তাপমাত্রায় হয়ে ওঠে কঠিন। এই কঠিন অবস্থায় যে কেলাস গঠিত হয়, তা বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়।

কিন্তু তত্ত্বগত হিসাব থেকে জানা যায় কয়েক লক্ষ বায়ুমণ্ডলায় চাপের মধ্যে হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়ে উঠতে পারে। তখন তার কেলাসের জাফ্‌রিতে থাকবে অণু নয়—পরমাণু। অর্থাৎ, হাইড্রোজেন হয়ে উঠবে একটি ধাতু এবং এই অবস্থায় অতি-পরিবাহী।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর উচ্চচাপ পদার্থবিদ্যা ইনষ্টিটিউটে ধাতব হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে তরল হিলিয়ামের মধ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি পাইলট প্ল্যাণ্টের মধ্যে প্রায় ত্রিশলক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করে। তবে

এই ধাতব হাইড্রোজেন অতি পরিবাহী হয়েছিল কিনা, তা বলা শক্ত। এখনো পর্যন্ত এটুকু পরিষ্কার যে, চাপ অপসৃত হলেই হাইড্রোজেন তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এই বিষয়ে আরো পরীক্ষাকার্য চালাবার প্রয়োজন আছে।

ইনষ্টিটিউটে বর্তমানে একটি বহু ধাপবিশিষ্ট কুঠরী তৈরী হচ্ছে। বাইরের দিকের একটি ইস্পাতের আধারে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়। এই আধারের মধ্যে স্থাপন করা হয় উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন ইস্পাতের তৈরী একটি কুঠরি। ফলে গুণনের সূত্র অনুযায়ী এই কুঠরির মধ্যে চাপ হয় আরো অধিক। কুঠররি মধ্যে থাকে অতি কঠিন সঙ্কর ধাতুর তৈরী আরো একটি কুঠরি এবং শেষোক্ত কুঠরির মধ্যে থাকে আরো একটি কুঠরি—কৃত্রিম হীরকে তৈরী। বর্তমানে ইনষ্টিটউটের একটি বিভাগে কৃত্রিম হীরকের কুঠরি তৈরী হচ্ছে।

এই হীরকের কুঠরির মধ্যেই তৈরী হয় ত্রিশ লক্ষাধিক বায়ুমণ্ডলের চাপ। এই চাপের মধ্যেই পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাকার্য চালাবেন এবং নতুন হাইড্রোজেন ধাতু নিয়ে গবেষণা করবেন।

বিচিত্র আঠা

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমন একটি আঠা তৈরী করতে পেরেছেন, যা দিয়ে যে কোন জিনিষ জোড়া লাগানো যেতে পারে—কি কাচ, কি কাঠ কি ধাতু—এমনকি জীবন্ত মানুষের টিস্যু। এই আঠার নাম সিয়াক্রিন। যোক্ষম এই আঠা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষতিকর, সঙ্গে সঙ্গেই জোড়া লাগায় ও বিনা উত্তাপে জমাট বাঁধে।

অসাধারণ এই সিয়াক্রিন ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, ইলেকট্রনিক্সে, মাইনিংয়ে, ঘড়ি নির্মাণে, জহরতে ও আরো বহু ক্ষেত্রে। সমুদ্রের জলের মধ্যে ধাতুর পাত এবং খনির মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রের অংশকে এই আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হচ্ছে। চিকিৎসাবিদ্যায় সিয়াক্রিন ব্যবহৃত হচ্ছে ফুসফুসের টিস্যু, অন্ত্র ও ভাঙা হাড় জোড়া লাগাবার জন্যে; ব্যবহৃত হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের এবং চক্ষুর অপারেশনেও।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা
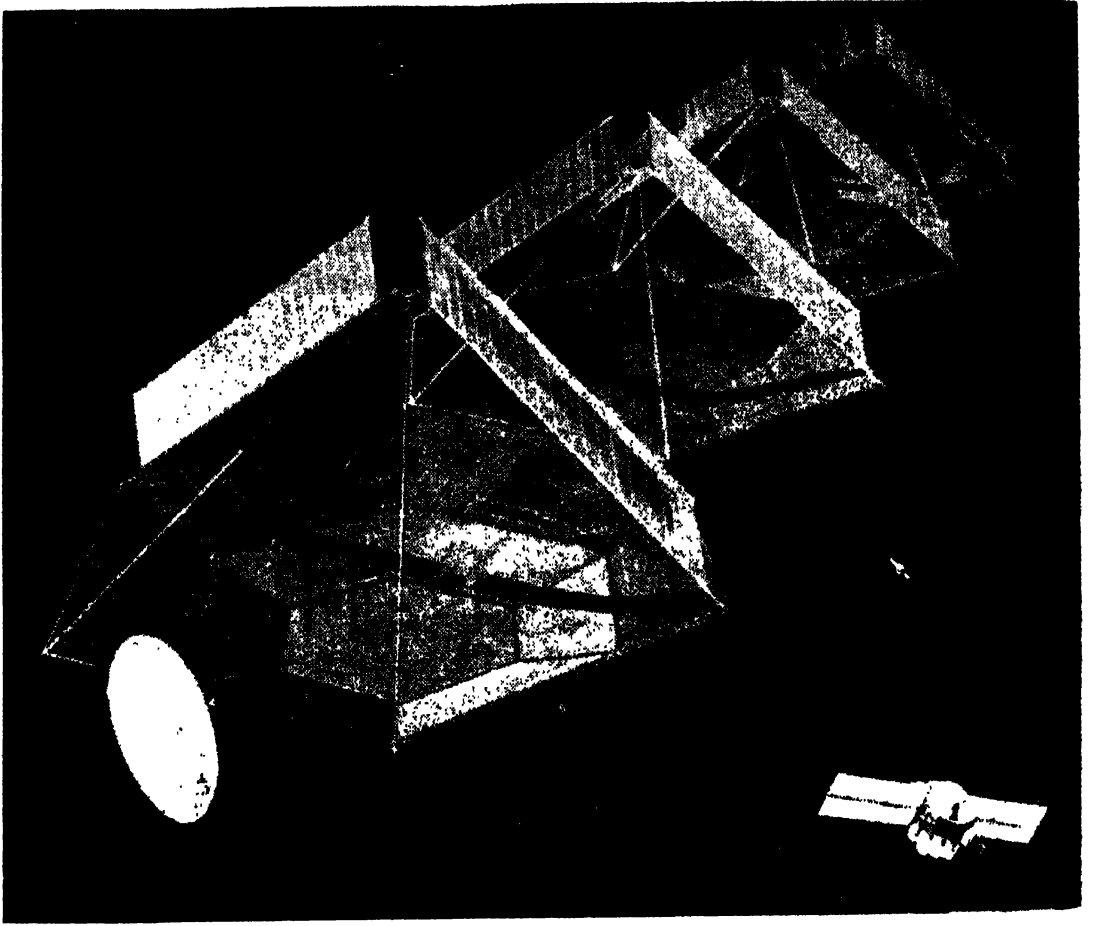
শক্তিসংগ্রাহক উপগ্রহ

চারটি শক্তিসংগ্রাহক অংশের সমবায়ে গঠিত কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি মহাকাশে পনেরো কিলোমিটার প্রসারিত হয়ে বিরাট দর্পণের সাহায্যে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে তাপীয় জেনারেটরে পতিত হয়। বাঁ-দিকের প্রকাণ্ড গোলাকার দর্পণটি জেনারেটরে উৎপাদিত শক্তি মাইক্রোওয়েভরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রেরণ করে। সেখান থেকে এই শক্তি বিদ্যুৎশক্তিরূপে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

ইঞ্জিন অথবা এঞ্জিন শব্দটি ইংরেজী engine অথবা ফরাসী engin হলেও বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে। আর ইঞ্জিনীয়ার তোমাদের আশেপাশেই রয়েছেন। ইঞ্জিনীয়ার শুধু ইঞ্জিন নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন, এই রকম ধারণাও হতে পারে, কিন্তু এটা পুরাপুরি ঠিক নয়। স্থপতি, বাস্তুকার, পূর্তবিদ, যন্ত্রশিল্পী ইত্যাদি নানা পেশার ইঞ্জিনীয়ার আছেন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইঞ্জিনীয়ার হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছো। জেনে রাখ, ইঞ্জিনীয়ার ইংরেজী Ingenuity (কৌশল, উদ্ভাবনশক্তি, প্রতিভা) শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। ল্যাটিন ভাষায় Ingeniatorem, জার্মান ভাষায় Ingeniur, ও ফরাসী ভাষায় engigneor ইঞ্জিনীয়ার বুঝায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নেই, এমন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ইঞ্জিনীয়ার বলা যায়। বিদ্যা বা বুদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-নির্ভর নয়। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির জীবনই তার প্রমাণ। প্রতিভা ও প্রেরণা পরিশ্রমের দ্বারাই লভ্য। টমাস এডিসনের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—'Genius is one percent inspiration and ninetynine percent perspiration'। টমাস এডিসন, হেনরি ফোর্ড, হারগ্রীভস, জেমস ওয়াট, জর্জ ষ্টিফেনসন, মাইকেল ফ্যারাডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল না, কিন্তু প্রযুক্তি বা প্রকৌশল আয়ত্ত করে পৃথিবীর কল্যাণার্থে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

খবরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেখা যায়—Wanted purchase engineer, Wanted sales engineer, তখন মনে হয় বিজ্ঞাপনদাতা 'প্রতিভাসম্পন্ন' প্রার্থী চান, অথবা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীধারী প্রার্থী চান, যাঁর প্রতিভা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও লাভজনক হবে। অনেক দেশে, বিশেষ করে জার্মেনীতে টেক্‌নিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করলে ইঞ্জিনীয়ার বনে যাওয়া যায়, তাঁরা নামের আগে Ing লিখেন, যেমন আমাদের দেশে ডাক্তারেরা নামের আগে Dr. লিখে থাকেন। আমাদের দেশে টেক্‌নিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করলে কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার বলে না, বলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার। ডাক্তারের যেমন রেজিষ্টার্ড নম্বর থাকে বা উকিলদের সনদ থাকে, ইঞ্জিনীয়ারদের বেলায় এখনও এমন কোন রেজিষ্টার্ড নম্বর নেই। এজন্যে ইঞ্জিনীয়ার শব্দটি নামের পূর্বে বা পরে নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করতে বাধা নেই। যা হোক, প্রতিভা, প্রকৌশলই যোগ্যতার নিদর্শন। স্কুল, কলেজের পাঠক্রমের মধ্যে যে শিক্ষার পরিধি ব্যাপ্ত, তার বাইরেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়, প্রমাণ করা সম্ভব হয় 'কৌশলং বলম্'। ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের সীমারেখা আপেক্ষিক। কারিগরের দক্ষতা ও ইঞ্জিনীয়ারের দর্শন ভিন্ন সাফল্য লাভ করা যায় না।

শ্রমের মূল্য বা মর্যাদা সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের পরীক্ষায় বসে রচনা লিখতে হয়, এটা শ্রমের প্রতি অবদমিত অমর্যাদার সূচক ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমাদের দেশে কারখানার 'মিস্ত্রী' সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নন। অথচ মিস্ত্রী শব্দটি এদেশে যখন পর্তুগীজেরা এসেছিল তাদের শব্দভাণ্ডার থেকে এসেছে। পর্তুগীজ mestre শব্দের অপভ্রংশ মিস্ত্রী আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আসল রূপ দিতে পারি নি। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া মিস্ত্রীর প্রতিশব্দ master। মাষ্টার শব্দটি আমরাও ব্যবহার করি এবং সম্মানার্থেই—যেমন হেড মাষ্টার, পোষ্ট মাষ্টার, মাষ্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ও কারখানার হেড মিস্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার কত তফাৎ! যদিও একজন কাগজ-কলমে শিক্ষা দেন আর একজন হাতে-কলমে শিক্ষা দেন। মিস্ত্রীর দক্ষতা যত আছে, সামাজিক মর্যাদা তত নয়, এজন্যেই শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে রচনা লিখতে হয়। আমাদের দেশে কারিগরীবিদ্যার বিকাশ হবে, কারিগরীবিদ্যার প্রতি কিশোরেরা আকৃষ্ট হবে, কিন্তু সেজন্যে দক্ষতা অর্জনের জন্যে যে মাষ্টারের কাছে হাতে কলমে পাঠ নিতে হবে, সেই মিস্ত্রীকে (Mestre বা Master) যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। মিস্ত্রীর মগজে অনেক কিছু থাকে, যা পুঁথিপত্রে মেলে না এবং যার বিস্তার কারিগরীবিদ্যার বিকাশে অপরিহার্য। আমাদের অনেক আবিষ্কার বিকাশের সুযোগ পায় না, গবেষণার আলো দেখতে পায় না, এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মিস্ত্রীর 'Know how' ও ইঞ্জিনীয়ারের 'Know why'-এর সমন্বয় সাধনই সাফল্যের সোপান।

অমূল্যধন দেব

রকেট

পূজার সময় বিভিন্ন বাজীর আলোয় ও শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত থাকে। বিশেষ করে কালীপূজার সময় এবং তার প্রাক্কালে আমরা আকাশে বিভিন্ন আলোর ঝলকানি ও শব্দ শুনতে পাই। বাজিগুলির মধ্যে যেগুলি আকাশে উঠে শব্দ ও আলো বিকিরণ করে, সেগুলি হলো হাউই ও উড়নতুবড়ী। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো রকেট, যেটা কিনা হাউই। উড়নতুবড়ীরই ব্যাপক ক্ষেত্রে উন্নত সংস্করণ। হাউই বাজিতে শলতের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে বা উড়নতুবড়ীতে খোলের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে দিলেই সেটা শব্দ করে তীরবেগে আকাশে উঠে যায়। রকেটের মধ্যেও কোন পদ্ধতিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আকাশে তোলা হয়। বাজিতে যেমন বিভিন্ন মশলা থাকে, রকেটে থাকে তরল জ্বালানী। রকেট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার আগে প্রথমে কতগুলি প্রাথমিক জিনিষ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।

রকেট যে ছুটে চলে, সেটা কি ভাবে ছোটে, সেটা প্রথমে আমাদের জানা দরকার। আমরা জানি যে, যখন বন্দুক ছোঁড়া হয়, তখনই গুলিটা বন্দুক থেকে বেরিয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটাও পিছন দিকে ধাক্কা মারে। 'Destination Moon' নামে একটি ইংরেজী ছায়াছবিতে দেখানো হয়েছে যে, Mike-Mouse শূন্য থেকে মাটির দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে। যতবারই সে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ছে, ততবারই সে বন্দুকের পিছনের দিকের ধাক্কায় আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। একরকম অসংখ্য বন্দুক যদি মাটির দিকে তাক করে একসঙ্গে ছোঁড়া হয়, তবে তার ধাক্কার প্রচণ্ডতা যে কিরকম হবে, তা সহজেই অনুমেয়। রকেটের গতিরও ঠিক এইরকম ভাবেই সৃষ্টি হয়। তবে রকেটের মধ্যে বন্দুক ও গুলি থাকে না। রকেটের মধ্যে প্রচণ্ড রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং এই বিস্ফোরিত বস্তুকণাগুলি প্রচণ্ড বেগে বন্দুকের গুলির মতই বেরিয়ে আসতে থাকে। আর যেদিক দিয়ে এগুলি বেরিয়ে আসে, তার উল্টো দিকে ধাক্কায় সৃষ্টি হয়। এই ধাক্কায় রকেট মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। এখন দেখা যাক এই পিছনের ধাক্কা কোথা থেকে আসে।

যখন আমরা হাঁটি, তখন আমাদের শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা যখন চলি, তখন আমরা পা দিয়ে মাটিতে চাপ দিই পিছন দিক থেকে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে, ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়াও থাকবে এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। তাই আমরা যখন পা দিয়ে মাটির উপর পিছন দিক দিয়ে চাপ দিই, তখন মাটিও অনুরূপভাবে সামনের দিকে সমান ঠেলা দেয়। এই ঠেলার জোরেই শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে—মাটির বেলায় শরীর এগোলো, কিন্তু পায়ের চাপে তো মাটি সরলো না। এই প্রশ্নের সমাধান এই যে, পৃথিবী মানুষের তুলনায় এত বড় যে, মানুষের পায়ের চাপে পৃথিবীকে নড়ানো যায় না। কিন্তু পৃথিবী না হয়ে যদি অন্য কোন ছোটখাটো জিনিষ হতো, তবে সে জিনিষ অবশ্যই মানুষের পায়ের চাপে নড়ে উঠতো।

ধরা যাক, একটা ট্রলি লাইনের উপর দাঁড় করানো আছে। লাইনের সঙ্গে ট্রলির চাকার কোন ঘর্ষণজনিত বাধা নেই—মনে করা যাক। এখন কোন লোক যদি ট্রলি থেকে সামনের দিকে লাফ দিয়ে পড়ে, তবে দেখা যাবে লাফ দিয়ে লোকটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ট্রলিটা পিছনের দিকে ছুটে যাবে।

এবার এই দৃষ্টান্তকে অন্যভাবে দেখা যাক। মনে করা যাক, ট্রলির উপর অনেকগুলি ইট ও একটি মানুষ আছে। এখন ট্রলির উপর মানুষটি যদি একটি ইট সামনের দিকে ছোঁড়ে, তবে দেখা যাবে যে, ঐ ট্রলিটা পিছনের দিকে চলতে সুরু করেছে। এখন যদি সে 2য় ইটটা ছোঁড়ে, তবে ট্রলিটা আগের চেয়ে একটু বেশী জোরে ছুটবে। এইভাবে লোকটা যদি সমানে ইট ছুঁড়তে আরম্ভ করে, তবে ট্রলিটার গতিবেগও বাড়তে থাকবে।

প্রথমবারে ইট ছুঁড়ে যত না গতিবেগ বাড়ানো গিয়েছিল, শেষের দিকে এক একটা ইট ছুঁড়ে তার গতিবেগ অনেক বাড়ানো গিয়েছিল। কারণ ইট যত ছোঁড়া হচ্ছিলো, ট্রলিটা তত হাল্‌কা হচ্ছিলো আর যত ট্রলিটা হাল্কা হচ্ছিল তার গতিবেগও তত বাড়ছিল। প্রথম বার ইট ছোঁড়বার সময় ট্রলির ওজন যত ছিল, শেষবার ইট ছোঁড়বার সময় তার ওজন যদি অর্ধেক হয়, তবে প্রথমবার ইট ছোঁড়বার সময় ট্রলির যা গতিবেগ ছিল, শেষবার ইট ছোঁড়বার সময় ট্রলিটার গতিবেগ হবে দ্বিগুণ।

উপরের উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ট্রলির গতিবেগটা নির্ভর করছে দুটি জিনিষের উপর—(1) ইটগুলি কতটা জোরে ছোঁড়া হয়েছে, (2) ইটের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইট যত জোরে ছোঁড়া হবে, ট্রলির গতিবেগও তত বাড়বে। কিন্তু ইট ছোঁড়বার জোরকে তো আর ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না। তারও একটা সীমা আছে। সুতরাং সেই সীমায় পৌঁছে ট্রলি যতটা বেগে ছুটেছে, তার চেয়ে বেশী জোরে ট্রলিটাকে ছোটানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেটাও সম্ভব ইটের সংখ্যা বাড়িয়ে। যেমন ধরা যাক মানুষসমেত ট্রলিটার ওজন 100 কে. জি এবং ট্রলি থেকে ইট ছোড়া হচ্ছে ঘণ্টায় 10 কি. মি. বেগে। এখন মানুষসহ ট্রলিটাকে যদি ঘণ্টায় 10 কি. মি. বেগে ছোটাতে হয়, তবে মানুষসমেত ট্রলিটার যা ওজন, তাকে 1·72 গুণ করলে যা পাওয়া যাবে, ততগুলি ইট ছুঁড়তে হবে। একই ক্ষেত্রে যদি ট্রলিটাকে (মানুষসহ) ঘণ্টায় 20 কি. মি. বেগে ছোটাতে হয়, তবে মানুষসহ ট্রলির ওজনকে 6·4 দিয়ে গুণ করলে যত হবে, ততগুলি ইট লাগবে। আবার ট্রলির গতিবেগ ইট ছোঁড়বার গতিবেগের তিনগুণ করতে হলে মানুষসহ ট্রলির ওজনকে 19 দিয়ে গুণ করলে যা পাওয়া যাবে, ততগুলি ইট লাগবে।

রকেটের ছোটবার ব্যাপারও একই ধরণের। রকেটের পিছন থেকে যতক্ষণ বন্দুকের গুলি বা ইট ছোঁড়বার মত বস্তুকণা বেরিয়ে আসতে থাকবে, ততক্ষণ রকেট সামনের দিকে ঠেলা খাবে। কিন্তু এই ঠেলা মানে এই নয় যে, বস্তুকণাগুলি বাইরের কোন কিছুকে ঠেলা মারছে, যেমন নৌকার দাঁড় জলকে ঠেলা মারে এবং এই ঠেলার জোরেই নৌকা চলে, তা হলে এই ঠেলা আসে কোথা থেকে ? 1নং চিত্র দেখানো হয়েছে রকেটের মোটরের একটি দৃশ্য। মনে করা যাক, মোটরের মধ্যে প্রচণ্ড রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। স্বভাবতঃই মোটরের মধ্যে ফেঁপে ফুলে ওঠা গ্যাস মোটরের চারদিকে একটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।

এখন মোটরের মধ্যে যদি কোন ছিদ্র না থাকে, তবে মোটরের মধ্যে চাপ সবদিকে সমান হবে এবং মোটরটা স্থির থাকবে। কিন্তু যদি মোটরটার (খ) অংশে যদি কোন ফাঁক থাকে, তবে সেই ফাঁক দিয়ে গ্যাস প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসবে এবং গ্যাস বেরিয়ে আসবার দরুণ সেই অংশটাতে অর্থাৎ (খ) অংশে কোন চাপ থাকবে না। কিন্তু উল্টো দিকে অর্থাৎ (ক) অংশে চাপ আগের মতই থাকবে। সুতরাং ক অংশে চাপ বেশী

থাকায় সেই চাপই রকেটের মোটরটাকে ধাক্কা মারে এবং এই ধাক্কার জোরেই রকেট ছুটে চলে। সুতরাং রকেটের ধাক্কা সৃষ্টি হচ্ছে রকেটের মধ্যেই। রকেট সম্পর্কে যা কিছু বলা হলো, সেগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এই ভাবে বলা যায়।
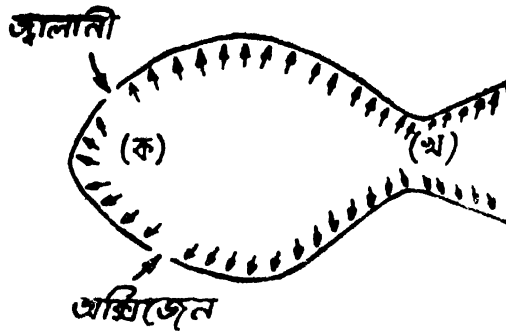
1নং চিত্র

(1) রকেটের গতি বাইরের কোন জিনিষের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ হাওয়া বা মহাশূন্য যেখানেই হোক, সেখানেই রকেট ছুটবে নিজস্ব ধাক্কার জোরে।

(2) রকেট যত ছুটবে, তত তার জ্বালানী পুড়ে নিঃশেষ হবে এবং ততই রকেট হাল্কা হবে। রকেট যত হাল্কা হবে, তার বেগও তত বাড়বে।

(3) রকেটের মোটর থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে, যাকে বলা হয় রকেটের নিঃসরণ, তা যত বেগে বেরিয়ে আসবে রকেটের বেগও শেষ পর্যন্ত তত বেশী হবে।

(4) জ্বালানীর ওজন যদি রকেটের ওজনের 1·72 গুণ হয়, তবে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ বেগের সমান। জ্বালানী যদি রকেটের ওজনের 6·4 গুণ হয়, তবে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ বেগের দ্বিগুণ। জ্বালানী যদি রকেটের ওজনের 19 গুণ হয়, তবে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ বেগের তিন গুণ।

আমরা আগেই বলেছি যে উড়নতুবড়ী বা হাউয়েরই উন্নত সংস্করণ হচ্ছে রকেট। উভয়ের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু রকেটের সঙ্গে হাউই বা উড়নতুবড়ীর পার্থক্য এই যে, হাউই বা উড়নতুবড়ী বিস্ফোরণের জন্যে অক্সিজেন নেওয়া হয় বাতাস থেকেই। কিন্তু রকেটের ক্ষেত্রে অক্সিজেন তার ভিতরের রক্ষিত আধার থেকে নেওয়া হয় আর হাউই বা উড়নতুবড়ীর জ্বালানী কঠিন পদার্থ, যেমন—গন্ধক, সোরা কাঠকয়লার মিশ্রণ। কিন্তু রকেটের জ্বালানী হচ্ছে তরল পদার্থ, যেমন—(1) কেরোসিন ও তরল অক্সিজেন, (2) পেট্রোল ও তরল অক্সিজেন, (3) তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন ইত্যাদি।

2নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, দুটি পৃথক জায়গায় জ্বালানী ও অক্সিজেন থাকে। পাম্পের সাহায্যে জ্বালানী ও অক্সিজেন নিয়ে আসা হয় মোটরে। তারপর

সেখানে ঘটানো হয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তারপর সেই বিস্ফোরিত গ্যাস রকেটের নীচের দিকে সরু ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসবার দরুণ সেখানকার চাপ কমে যায়, কিন্তু
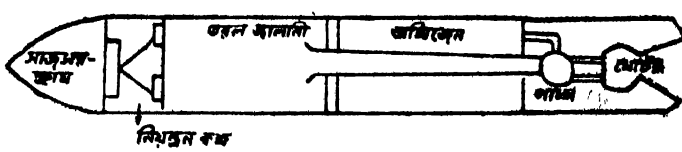
2নং চিত্র

গ্যাসের সামনের চাপ আগের মতই থাকে। তারই ফলে রকেট সামনের দিকে চলতে সুরু করে। রকেটে তরল জ্বালানী ব্যবহার করবার সুবিধা এই যে, তরল জ্বালানীর নিঃসরণ বেগ সবচেয়ে বেশী এবং তরল জ্বালানীর চলাচলকে খুব সহজেই কম-বেশী করা যায়। উল্টোমুখী রকেট (Retro-rocket) চালিয়েও রকেটের সামনের গতিকে কমিয়ে আনা যায়। আর তা ছাড়া রকেটের নীচের দিকে এদিক ও ওদিক ছিদ্র করে (যেগুলি ইচ্ছামত বন্ধ করা যায় বা খোলা যায়). রকেটের গতিপথও পাল্টানো যায়। রকেটে তরল জ্বালানীর পরিবর্তে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করবার কথা চলছে। এর দ্বারা জ্বালানীর প্রচুর সাশ্রয় হবে। অবশ্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে হলে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ পারমাণবিক শক্তি নিঃসৃত হবার সময়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে, যা মানুষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যাতে রকেট প্রায় আলোর বেগে ছুটতে পারে। তা যদি সম্ভব হয়, তবে আগামী যুগ যে কী বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আসছে, তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

শিবপ্রসাদ হোড়

বিবিধ

ইউনেস্কোর উদ্যোগে আর্যভট্টের জন্মোৎসব

সমাচার কর্তৃক নতুন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—ইউনেস্কো (রাষ্ট্রপুঞ্জ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক সংস্থা) চলতি বছরে ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্টের দেড় সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যোজনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল 18ই মার্চ রাজ্যসভায় এই খবর জানান। প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও জানান যে, আর্যভট্টের সব পুঁথি অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্রোঞ্জ যুগের গোলাঘর

সমাচার কর্তৃক নতুন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—কিরঘিজিয়ার ওস অঞ্চলের কাছে দুই হাজার বছরের আগের ব্রোঞ্জ যুগের একটি গোলাঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গোলাঘরে এখনও গম মজুত রয়েছে। আরও খননকার্য চালিয়ে কৃষিকর্মের যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, ওস-কারাসুইওয়াসিস অঞ্চলে আদিবাসীরা চাষবাস করতো। তারা সেখানে আড়াই হাজার বছর আগে বসবাস করতো।

বাঁকুড়ায় কয়লা পাওয়া গেছে

আসানসোল থেকে সমাচার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—বাঁকুড়া জেলার আরাধাগ্রাম, কালিদাসপুরে, বাকুলিয়া অঞ্চলে 19 কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি কয়লার স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে খননকার্য শীঘ্রই সুরু হবে। এখানে প্রায় 18 কোটি টন কয়লা আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই কয়লার স্তর 10 থেকে 100 মিটার গভীরতায় রয়েছে। ইস্টার্ণ কোলকোল ফিল্ডস লিমিটেডের প্রধান প্রযুক্তি-উপদেষ্টা এম. এন. গুঁই-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল সমীক্ষার শেষে বলেছেন—প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এবং ইনফ্রা ষ্ট্রাকচারের সুবিধা পাওয়া গেলে এই জেলা ভারতের কয়লার মানচিত্রে স্থান পাবে।

প্রাচীনতম গোলাপ

নতুন দিল্লী থেকে সমাচার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—হ্যাম্পশায়ারে ঐতিহাসিক রোমান গীর্জার দেয়ালের ভিতর থেকে পাওয়া গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো একটি গোলাপ। গোলাপটির বয়স সাড়ে 800 বছরেরও বেশী। গীর্জার পুব দিকের দেয়ালের একটি ছবি সরাতে গিয়ে কর্মীরা দেখতে পান দেয়ালের একটা জায়গায় অদ্ভুত রকমের প্লাস্টার লাগানো। প্লাস্টার সরাতেই দেখা গেল একটি ফোকর। ফোকরের মধ্যে গোলাপটি—বিশুষ্ক, কিন্তু আকৃতিতে অবিকল। দেড় ইঞ্চি ব্যাসের গোলাপটি বহু পাপড়িবিশিষ্ট। সঙ্গে ছোট একটি ডাল, তাতে পাতাও আছে।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব

নতুন দিল্লী থেকে সমাচার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—পুনার কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের সমুদ্রোপকূলে ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা শাখা যে সমীক্ষা চালিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারবে। ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ক্যাম্বে উপসাগরে দৈনিক

6000 থেকে 7000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এর পাশে কচ্ছ উপসাগরে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় 1000 মেগাওয়াট। হুগলী নদীর মুখে সুন্দরবন এলাকাতেও সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

মাদ্রাজে উপগ্রহ যোগাযোগ কেন্দ্র হচ্ছে

নতুন দিল্লী থেকে সমাচার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—মাদ্রাজে একটি উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমারত ফ্রান্স ও জার্মেনীর একটি উপগ্রহ 'সিম্ফনি'র সাহায্যে এই কেন্দ্র থেকে উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে পরীক্ষ-নিরীক্ষা করা হবে। এই ব্যাপারে আরও সাহায্য করবেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংঠনের আমেদাবাদ ও দিল্লী কেন্দ্র। মাদ্রাজে ডাক ও তার বিভাগ কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। কাজ সুরু হবে আগামী বছর—চলবে 1979 সাল পর্যন্ত।

পঁচিশ বছর পরে চাঁদে মানব-শিশু জন্মাতে পারে

সমাচার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—যাঁরা এই বছর জন্মেছেন এবং 25 বছর পর বিয়ে করবেন, তাঁদের প্রথম সন্তান চাঁদেও হতে পারে। প্রখ্যাত মহাকাশ-বিজ্ঞানী ডক্টর ওয়ানহার ফনব্রাউন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর মতে 2000 খৃষ্টাব্দ নাগাদ চাঁদে প্রথম মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে। তার আগেই চাঁদের মাটিতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠবে। এখন দক্ষিণ মেরুতে যে সব গবেষণাকেন্দ্র আছে, এটিও সেই ধাঁচের হবে। 2025 খৃষ্টাব্দ নাগাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আবহবিদ, পরিবেশ-বিজ্ঞানী, ভূতত্ত্ববিদ, তৈল-অনুসন্ধানকারী প্রমুখ বিশেষজ্ঞের দল চাঁদের দেশে পাড়ি দেবেন।

এই শতাব্দীর শেষে যে শক্তি-সঙ্কট দেখা দেবে, তা মোকাবিলার জন্যে মহাকাশ কি সাহায্য করতে পারে, তা অনুসন্ধান করে দেখতে এই বছরেই নাসা অনুসন্ধানে নামছে। স্কাইল্যাবের স্রষ্টা ডক্টর ক্রাফক্রে এরিক বিশ্বাস করেন—আমাদের চারপাশের মৃত উপগ্রহগুলি থেকে আমরা খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করতে পারি; চাঁদে গড়তে পারি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং পৃথিবীকে আমরা সৌরজগতের বাগান হিসাবে বাঁচিয়ে রাখবো।

তিনি আরও বলেছেন—তারকারাজি কনস্তয়েতে পৃথিবী হচ্ছে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ। অন্য গ্রহগুলি হচ্ছে মালবাহী জাহাজ। এই সব মালবাহী জাহাজ থেকে আমাদের সম্পদ সংগ্রহ করা উচিত।

তিনি বলেন যে, পরমাণু বিস্ফোরণ পৃথিবীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, কিন্তু চাঁদের ব্যাপারে সঙ্গতিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর চাহিদা মেটাবার জন্যে চাঁদ থেকে প্রচুর পরিমাণ জিনিষ-পত্র উৎপাদিত হতে পারে।

নীল আর্মস্ট্রং যিনি প্রথম পৃথিবী থেকে চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, তিনি মনে করেন, 2025 খৃষ্টাব্দ নাগাদ চাঁদের উপর কলোনি গড়ে উঠবে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

লেখক/প্রকাশকের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা বিষয়ক বই দান করিবার জন্য লেখক/প্রকাশকদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে। গ্রন্থাগারের পাঠাগার ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দান হিসাবে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন-55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক যথাক্রমে 19·00 এবং 9·50 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয় ; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য ; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা :—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।

2. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

3. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

4. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ — মে, 1976 — পঞ্চম সংখ্যা

মৌল কণিকাসমূহের ইতিবৃত্ত

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত*

পদার্থের গঠনতত্ত্ব নিয়ে মনে হয়, স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ কৌতূহল প্রকাশ করে এসেছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি কণাদ বহু শতাব্দী পূর্বে পদার্থ-গঠনের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম 'কণা'-র ধারণা প্রবর্তন করেন। আরও পরে খৃষ্টপূর্ব 400 অব্দের কাছাকাছি গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস এই ধারণাকে আরও সুসংবদ্ধ করেন এবং এই কণার নামকরণ করেন অ্যাটম বা পরমাণু। গ্রীক ভাষায় 'অ্যাটমস' (Atomos) বলে একটি কথা আছে। আর ছোট করে ভাঙ্গা যায় না—এমন জিনিসকেই বলা হয় অ্যাটমস। সম্ভবতঃ এই কথাটি থেকেই 'অ্যাটম' কথাটি এসেছে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই 1810 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রসায়নবিদ জন ডালটন রচনা করেন তাঁর প্রখ্যাত 'পারমাণবিক তত্ত্ব'—যেটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সকল পদার্থই অবিভাজ্য পরমাণুর দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি মৌল বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন সদৃশ পরমাণু দিয়ে তৈরী; অর্থাৎ কোন মৌলে যে অসংখ্য পরমাণু বিদ্যমান, তারা সকলেই আকারে, ওজনে ও অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ একরকম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ব্যাকারেল এবং কুরীদম্পতি তেজস্ক্রিয়া এবং ঐ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী আবিষ্কার করেন, তখন দেখা

---

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা-9

গেল যে, পরমাণু আর অবিভাজ্য নয়—পরমাণু গঠিত হয়েছে আরও ক্ষুদ্রাকার কতকগুলি মৌল কণার বিচিত্র সমাবেশে। তেজস্ক্রিয় ঘটনাবলী এবং বর্ণালীর ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান তথ্যাবলীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাদারফোর্ড 1910 খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি প্রথম নিউক্লীয়াসসমন্বিত পরমাণুর মডেল প্রচার করেন। এর কিছু আগে স্যার জে. জে. টমসন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ক্ষুদ্রতম ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণিকা ইলেকট্রন। রাদারফোর্ড প্রচারিত মডেল অনুযায়ী এই ইলেকট্রনগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণা প্রোটনের দ্বারা গঠিত একটি ঘনসন্নিবিষ্ট কেন্দ্রকের চতুর্দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লীয়াসে আছে মাত্র একটি প্রোটন এবং নিউক্লীয়াসের বাইরে আছে একটি ইলেকট্রন এবং এদের দুয়ের তড়িতাধান প্রশমিত হয়ে সমস্ত পরমাণুটি হয়েছে তড়িৎ-নিরপেক্ষ। এর কিছুদিনের মধ্যেই বোর এবং সমারফেল্ড প্রমাণ করলেন যে, ইলেকট্রনগুলি নিউক্লীয়াসের চতুর্দিকে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ কক্ষপথেই পরিভ্রমণ করতে সক্ষম এবং এই পারমাণবিক গঠন অনেকটা সৌরজগতের গঠনের অনুরূপ। বিভিন্ন মৌলের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হলো যে, কোন মৌলের ভরসংখ্যা A এবং পারমাণবিক সংখ্যা Z হলে তার পরমাণুর নিউক্লীয়াসে থাকবে A সংখ্যক প্রোটন এবং (A-Z) সংখ্যক ইলেকট্রন, যাতে করে নিউক্লীয়াসের মোট তড়িতাধান হয় +Z; ঐ নিউক্লীয়াসের চারিদিকে Z সংখ্যক ইলেকট্রন বোর নির্দেশিত বিভিন্ন কক্ষপথে পরিক্রমা করবে। ফলে পরমাণুটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ হবে। সব রকম পরমাণুতেই ইলেকট্রন এবং প্রোটন থাকাতে, মৌল কণিকাদের তালিকায় প্রথম দুটি স্থান অধিকার করলো ইলেকট্রন এবং প্রোটন।

পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে কয়েকজন বিজ্ঞানীর পারমাণবিক নিউক্লীয়াসঘটিত কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে 1932 সালে আর একটি মৌল কণিকার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। এই কণিকাটির নাম নিউট্রন এবং আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইংরেজ বিজ্ঞানী জেমস্ স্যাডুইকের। নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণা এবং এর ভর প্রায় প্রোটনের সমান।

নিউট্রন আবিষ্কারের পর খুব দ্রুত জানা গেল যে, কোন পরমাণুর নিউক্লীয়াসে ইলেকট্রন নেই—আছে প্রোটন ও নিউট্রন। পরমাণুর ভরসংখ্যা A এবং পারমাণবিক সংখ্যা Z হলে, এর নিউক্লীয়াসে থাকবে Z সংখ্যক প্রোটন এবং (A-Z) সংখ্যক নিউট্রন। নিউক্লীয়াসের বাইরে থাকবে Z সংখ্যক ইলেকট্রন। পারমানবিক গঠনের নিউট্রন-প্রোটন তত্ত্ব থেকে শুধু তেজস্ক্রিয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলী নয়, বিভিন্ন মৌলের সমস্থানিকেরও (Isotopes) সুষ্ঠু ব্যাখ্যা মিললো।

পারমাণবিক নিউক্লীয়াস গঠনকারী নিউট্রন ও প্রোটন এবং নিউক্লীয়াসের বহির্মণ্ডল গঠনকারী ইলেকট্রন ছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরও অনেকগুলি কণিকা আবিষ্কার করেছেন—যেগুলিকেও মৌল কণিকা আখ্যা দেওয়া যাবে। নিউক্লীয়াসের ধর্মাবলী নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই কণিকাগুলির।

1929 খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ডিরাক এক সম্পূর্ণ তত্ত্বীয় আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, মহাশূন্যে এমন কতকগুলি মৌল কণিকার অস্তিত্ব আছে, যেগুলি সর্বাংশে ইলেকট্রনেরই মত কিন্তু ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। ডিরাক যখন তাঁর এই তত্ত্বীয় আলোচনা ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন, তখন চতুর্দিক থেকে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কিন্তু সহসা 1932 সালে এই সমালোচনার ঝড় স্তব্ধ হয়ে গেল। ঐ সময় কার্ল এণ্ডারসান মহাজাগতিক রশ্মি পর্যালোচনা

করতে গিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ডিরাক নির্দেশিত নতুন কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। এই কণিকার ভর ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু তড়িতাধান ধনাত্মক। এদের বলা হয় ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন। মৌল কণিকাদের তালিকায় আর একটি কণিকা যুক্ত হলো।

ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন আবিষ্কারের পর স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল হলো যে, ঋণাত্মক প্রোটন বা অ্যান্টি-প্রোটন বলে কোন কণিকা আছে কি না? অর্থাৎ এমন কোন কণিকা আছে কি না—যার ভর হবে প্রোটনের সমান, কিন্তু তড়িৎ হবে ঋণাত্মক? বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের নিরসন হলো 1955 খৃষ্টাব্দে, যখন কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী 6·2 বিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসমন্বিত পারমাণবিক অভিক্ষেপ (Atomic projectile) দিয়ে কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুকে (Target) আঘাত করে অ্যান্টি-প্রোটনের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে নির্গত বিটা কণার (বস্তুতঃ ইলেকট্রন) শক্তি পর্যালোচনা করে বহু আগেই দেখা গিয়েছিল যে, এই শক্তি সম্পর্কে খানিকটা গণ্ডগোল আছে। আলফা কণা নিঃসরণের সময় দেখা যায় যে, আলফা কণাগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তি নিয়ে নির্গত হচ্ছে, কিন্তু বিটা কণাগুলি শূন্য থেকে বেশ উচ্চ শক্তি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সব রকম শক্তি নিয়েই নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ বিটা কণার শক্তি-বর্ণালী ধারাবাহিক (Continuous)। শক্তি সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ হলো যে, বিটা কণার সঙ্গে সম্ভবতঃ আরও একটি কণিকা নির্গত হচ্ছে—যে কণিকাটি বিটা কণার সঙ্গে নানাভাবে শক্তি বণ্টন করে বিটা কণার শক্তি-বর্ণালী ধারাবাহিক করে দিচ্ছে। তত্ত্বীয় হিসাব মত এই কাল্পনিক কণাটির কোন তড়িতাধান থাকবে না এবং এর ভর হবে ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক কম। বিজ্ঞানী পাউলি এই কণিকাটির নাম দিয়েছিলেন নিউট্রিনো। প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ এই কণিকাটিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলবার সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। 1956 খৃষ্টাব্দে নিউক্লীয়ার রিয়্যাক্টর পরীক্ষায় একটি বৃহদাকার কণা-গণকের (Particle counter) সাহায্যে নিউট্রিনোকে বন্দী করা হলো। মৌল কণিকার তালিকা ক্রমশঃ স্ফীত হতে লাগলো।

পজিট্রন এবং নিউট্রিনো—এই দুটি কণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন প্রথমে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তত্ত্বীয় আলোচনার মাধ্যমে এবং পরে তা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, তেমনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল কণিকার অস্তিত্ব আমরা প্রথমে পাই তত্ত্বীয় আলোচনায়। 1935 খৃষ্টাব্দে জাপানী পদার্থবিদ হিদেকি য়ুকাওয়া পারমাণবিক নিউক্লীয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের ভিতর যে প্রচণ্ড বন্ধন-শক্তি কাজ করছে, তার উৎস সম্বন্ধে একটি তত্ত্বীয় আলোচনা প্রকাশ করেন। ঐ আলোচনায় তিনি দেখান যে, বন্ধন-শক্তির জন্যে দায়ী একটি নতুন কণিকা, যার ভর হবে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি। গ্রীক ভাষায় 'মেসস্' (Mesos) বলে একটি কথা আছে, যার অর্থ হচ্ছে 'মাঝামাঝি'। তাই এই নতুন কণিকাটির নামকরণ হলো মেসন। এই আলোচনা প্রকাশের বছর দুই পরেই মহাজাগতিক রশ্মি পর্যালোচনা করতে গিয়ে কার্ল এণ্ডারসন এই কণিকাটির সাক্ষাৎ পান। এণ্ডারসনের পরিমাপ অনুযায়ী দেখা গেল যে, এর ভর ইলেকট্রন ভরের দু-শ' গুণ—যে-কথাটা য়ুকাওয়ার আলোচনাতেই বলা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিউক্লীয়াসের অধিবাসী প্রোটন ও নিউট্রনের সঙ্গে এই কণিকা বিক্রিয়া করতে খুবই অনিচ্ছুক। তাই থেকে সন্দেহ হলো যে, বন্ধন-শক্তির উৎস হিসাবে য়ুকাওয়া যে

এই কণার কথা বলেছিলেন, সেটা হয়তো ঠিক নয়। এর বছর দশেক পরে বিজ্ঞানী পাওয়েল দেখলেন যে, দু-রকমের মেসন আছে—একদলকে পাই-মেসন বা পায়ন এবং অন্য দলকে বলা হয় মিউমেসন বা মিউয়ন। একটি পাই-মেসন 10^{-8} সেকেণ্ড সময়ের ভিতরই আপনা থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একটি মিউ-মেসন এবং একটি নিউট্রিনোর জন্ম দেয়।

এর পর একে একে আরও অনেক মৌল কণিকা আবিষ্কৃত হতে লাগল—বিশেষ করে মহাজাগতিক রশ্মি এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণাত্বরক-কের (Particle accelerator) পরীক্ষায়। এদের মধ্যে আছে কে-মেসন—যাদের ভর ইলেকট্রন ও নিউক্লীয়ন (অর্থাৎ প্রোটন-নিউট্রন) ভরের মাঝামাঝি, ল্যামডা, সিগমা, চি এবং ওমেগা কণা, যাদের ভর নিউক্লীয়ন ভরের চেয়ে বেশী। মৌল কণিকার তালিকায় যদি আলোককণা অর্থাৎ ফোটনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে মোট কণিকার সংখ্যা দাঁড়াবে 37; ভর বিচার করে এদের লেপটন্স, মেসন্স, নিউক্লীয়ন্স, হাইপেরন্স ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এদের মধ্যে একমাত্র প্রোটন (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক), ইলেকট্রন (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক), নিউট্রিনো এবং ফোটন এরাই সহজাতভাবে স্থায়ী; অন্যগুলি খুবই ক্ষণস্থায়ী। ভর এবং স্থায়িত্বকালসহ এদের একটি তালিকা পরিশেষে দেওয়া হলো।

গত কয়েক বছরে বিজ্ঞানীরা আরও অনেকগুলি নতুন ভারী মৌল কণিকার সন্ধান পেয়েছেন, যাদের স্থায়িত্বকাল খুব কম—প্রায় 10^{-23} সেকেণ্ডের কাছাকাছি। মৌল কণিকাদের তালিকায় এদের স্থান দিলে কণিকাগুলির সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দু-শ'র কাছাকাছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এরা সকলেই কি বাস্তবিক মৌল কণিকা? অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, মৌল কণিকার সত্তার এত বৈচিত্র্য এবং বিপুল নয়—এরা সহজতর কোন কিছুর বিভিন্ন অবস্থা অথবা বিভিন্ন শক্তিস্তর।

মৌল কণিকাগুলির সংখ্যা, ভর, তড়িতাধান ইত্যাদি তথ্যগুলি বর্তমানে যে এলোমেলো অবস্থায় আছে, তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে হাইড্রোজেন পরমাণুসংক্রান্ত বোর মডেল ঘোষিত হবার পূর্বে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার এলোমেলো অবস্থা। 1869 খৃষ্টাব্দে রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিভ যেমন মৌল পদার্থগুলিকে পারমাণবিক ভার অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে যুগান্তকারী একটি পর্যায়-সারণীতে (Periodic table) সাজিয়েছিলেন, বর্তমানে বিজ্ঞানীরা তেমনি মৌল কণিকাগুলিকেও তাদের ভর, তড়িতাধান, ঘূর্ণন (Spin) এবং অন্যান্য ধর্মাবলী অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করছেন, তার মধ্যে গেল-ম্যান প্রস্তাবিত পদ্ধতি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতিতে SU_3 প্রতি-সাম্যকে কাজে লাগিয়ে মৌল কণাদের ক্রমবর্ধমান তালিকাকে সুসংবদ্ধ করবার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। SU_3 প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়েছে ত্রিমাত্রিক দেশে ঐকিক আবর্ত প্রতিসাম্য (Unitary rotational symmetry) বোঝাতে। বছর দুয়েক আগে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী মৌল কণিকাদের সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের মতে বিভিন্ন মৌল কণিকাগুলি হচ্ছে একটি একক কণিকার বিভিন্ন উদ্দীপিত অবস্থা। এই একক কণিকাটিকে তাঁরা কল্পনা করেছেন একটি নির্দিষ্ট আয়তনে সীমিত আন্দোলিত তরল (Pulsating fluid) রূপে। যদি এই তত্ত্ব বিশ্বের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নেন, তাহলে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় এটি হবে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

মৌল কণিকাদের তালিকা

	কণা	প্রতীক	ভর (Mev)*	স্থায়িত্বকাল (সেকেণ্ড)
	ফোটন	γ	0	স্থায়ী
লেপ্টন্স	নিউট্রিনো	ν_e	$<2\times10^{-4}$	"
		ν_μ	<2	"
	ইলেকট্রন	$e^\pm$	0·511	"
	মিউয়ন	$\mu^\pm$	105·7	$2·21\times10^{-6}$
মেসন্স	পায়ন	π^0	135	2×10^{-16}
		$\pi^\pm$	139 6	$2 55\times10^{-8}$
	কেয়ন	$K^\pm$	493·9	$1·22\times10^{-8}$
		K^0	497·8	$0·9\times10^{-10}$
		$K^0{}_2^1$	497·8	$5·62\times10^{-8}$
নিউক্লীয়ন	প্রোটন	$p^\pm$	938·2	স্থায়ী
	নিউট্রন	n	939·5	$1·01\times10^3$
হাইপেরন্স	ল্যাম্‌ডা	Λ	1115·4	$2·5\times10^{-10}$
	সিগ্‌মা	$\Sigma^\pm$	1189·4	$0·81\times10^{-10}$
		Σ^-	1197·08	$1·6\times10^{-10}$
		Σ^0	1191·5	$<10^{-14}$
	চি	Ξ^-	1320·8	$1·2\times10^{-10}$
		Ξ^0	1314·3	$3·06\times10^{-10}$
	ওমেগা	Ω^-	1675·0	$1·3\times10^{-10}$

*1 Mev = $1·783\times10^{-27}$ gm.

[Seience resource letter-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সহায়তায়]

গ্রহান্তর-জীবন সন্ধানে

শৈলেশ সেনগুপ্ত

বহু খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে কোটি কোটি গ্রহজগৎ। এই ধারণার সপক্ষে কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণও মিলেছে। তবে গ্রহ থাকলেই যে প্রাণসৃষ্টির পরিবেশ থাকবে, এমন কোন কথা নেই। একমাত্র পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের আর কোন গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে কিনা, তাও আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। নক্ষত্রলোকের পরিবেশ তো আরও জটিল। যেমন, কোন তারার আয়তন যদি অতি বিশাল হয় কিম্বা তাপাঙ্কের মাত্রা হয় অত্যধিক, তাহলে সেখানকার কোন গ্রহে জীবন-সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত নক্ষত্রদের বলা হয় 'O' শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক। তাপাঙ্ক 30,000° থেকে 100,000° সেন্টিগ্রেড। এমন ভয়ঙ্কর উত্তাপের জন্যে পরমাণু-বিভাজনক্রিয়া চলে অসম্ভব দ্রুতবেগে। প্রচণ্ড তেজ বিকিরণের ফলে তিন-শ' থেকে চার-শ' আলোকবর্ষ পরিধির মধ্যে সমস্ত মহাজাগতিক পদার্থকণাই আয়নিত (Ionized) হয়ে যায়, অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে কোন বন্ধন থাকে না। তাই 'O' শ্রেণীর নক্ষত্রের কোন গ্রহে জীবনের পরিবেশ থাকতে পারে না। কিন্তু মহাবিশ্বের বুকে কি ঘটতে পারে আর কি যে পারে না, তা নিয়ে কোন মন্তব্য করা চলে না।

পৃথিবীতে জীবদেহ এবং জৈব পদার্থ গঠনে প্রধান ভূমিকা কার্বনের। প্রতিটি জৈব পদার্থের অণুর মধ্যে রয়েছে কার্বন পরমাণু। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আরও একটি বস্তু—হাইড্রোজেন পরমাণু। মুক্ত অবস্থায় না পাওয়া গেলেও এটি জলের সঙ্গে মিশে আছে। কার্বন আর হাইড্রোজেন পরমাণু জোট বেঁধে সৃষ্টি করেছে নানা ধরণের হাইড্রোকার্বন যৌগ এবং জৈব পদার্থ। উদ্ভব হয়েছে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিডের মত জটিল জৈব রাসায়নিক বস্তুর।

তবে কি ধরে নেওয়া যায় যে, কার্বন ছাড়া প্রাণসৃষ্টি হতে পারে না? জৈব রসায়নবিদেরা বলেছেন, নিশ্চয়ই পারে। সিলিকন মৌলিক পদার্থটিও স্বভাবচরিত্রে অনেকটা কার্বনের মত। কার্বন-অক্সিজেন মিলে যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড যৌগ গঠন করে, তেমনি সিলিকন-অক্সিজেন একত্রিত হয়ে তৈরী করে সিলিকন ডাই-অক্সাইড। হাইড্রোকার্বনের মত হাইড্রোসিলিকনও হতে পারে। আমাদের পরিচিত বালি, স্ফটিক প্রভৃতি অনেক পদার্থই সিলিকন যৌগ।

উপযুক্ত পরিবেশে সিলিকনভিত্তিক জৈব পদার্থ সহজেই গড়ে উঠতে পারে। এমনকি এই পৃথিবীতেই একদিন তা ছিল। আদিম সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো ডায়াটম নামে এককোষী প্রাণীদের ছিল সিলিকন কাঠামো। নানা ডিজাইনের জ্যামিতিক ঘন পদার্থের মত দেখতে সেই সব কাঠামোর জীবাশ্ম (Fossil) জীব-বিজ্ঞানীদের কাছে এক পরম বিস্ময়। সিলিকন যৌগ পদার্থের কাঠিন্য অনেক বেশী, অন্ততঃ 2500° ডিগ্রি উত্তাপ না হলে গলে না। কাজেই সিলিকনভিত্তিক জীবজগতের ক্রমবিকাশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। যেখানে মাত্র 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপেই পৃথিবীর জীবজগৎ ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, সেখানে 1000° সেন্টিগ্রেডের ভয়াবহ উষ্ণতার মধ্যেও সিলিকন-প্রাণীরা স্বচ্ছন্দে হেসেখেলে বেড়াবে।

অকল্পনীয় হিমেল পরিবেশেও জেগে উঠতে পারে প্রাণপ্রবাহ। যেখানে জল জমে গিয়ে ধাতব পদার্থের চেয়েও কঠিন হয়ে গেছে, সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে তরল অবস্থায়, সেখানে তরল অ্যামোনিয়া গ্যাসের মত বিষাক্ত বস্তুও জলের ভূমিকা নিয়ে প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে। কার্বন পরমাণু হয়তো তার সঙ্গে মিলেমিশেই সৃষ্টি করবে জৈব পদার্থ। এটা মোটেই কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। জৈবরসায়নবিদদের ধারণা, অতি উত্তপ্ত পরিবেশের চেয়ে ঐ ধরণের হিমেল জগতেই নাকি অনেক সহজভাবে প্রাণের বিকাশ ঘটবে।

কোথাও হয়তো পৃথিবীর মতই পরিবেশ আছে অথচ অক্সিজেন নেই। সেখানে মিথেন, ক্লোরিন কিম্বা হাইড্রোজেন-সালফাইডের মত বিষাক্ত গ্যাসও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। একদিন এই পৃথিবীতেই নাকি এমন অবস্থা ছিল। স্বনামধন্য জীব-বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেনের মতে আদিম পৃথিবীর কোথাও মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব ছিল না। আবহমণ্ডলের প্রায় পুরোটাই ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং সেই পরিবেশেই সুরু হয়েছিল আদিম প্রাণের জয়যাত্রা।

শনিগ্রহের মহাকায় উপগ্রহ টাইটান আয়তনে বুধগ্রহের চেয়েও বড়। সেখানে রয়েছে মিথেন গ্যাসের আবহমণ্ডল। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা সেখানে প্রাণী আছে।

এমনকি আবহমণ্ডল না থাকাটাও প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে কোন বড় বাধা নয়। এই পৃথিবীতেই এমন কিছু ভাইরাসজাতীয় জীবাণু আছে, যা বাতাস ছাড়াই বেঁচে থাকে। এই ধরণের আণুবীক্ষণিক প্রাণকণা হয়তো সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে। কিছু উল্কাপিণ্ডের মধ্যে সাইটোসিন, অ্যাডেনিন প্রভৃতি জৈব বস্তুর সন্ধান পেয়ে বিজ্ঞানীরা তো দারুণ অবাক হয়ে গেছেন। ঐসব উল্কাপিণ্ড কি মহাজাগতিক প্রাণের বার্তাবহ?

খ্যাতনামা সুইডিশ বিজ্ঞানী সোয়াস্তে আরহেনিয়াস মনে করেন, মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে আবহমানকাল ধরে বয়ে চলেছে আণুবীক্ষণিক জীবনকণার স্রোত। শুধু তাই নয়—বস্তুসত্ত্বা, জ্যোতিসত্ত্বা এবং চেতন—সত্ত্বাই ব্রহ্মাণ্ডের মৌল উপাদান। ওরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এবং অবিনশ্বর। পৃথিবী অথবা অন্য যে কোন জগতে জীবন-কল্লোলের সূত্রপাত করেছে ঐ মহাজাগতিক প্রাণকনা। আরহেনিয়াসের এই বিস্ময়কর মতবাদ সম্পর্কে আজই কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। সুদূর নক্ষত্রলোকে পাড়ি জমাবার মত ক্ষমতা অর্জন করলে তবেই বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে যাচাই করতে পারবেন।

কেবল জৈব বস্তুই নয়, কিছু কিছু উল্কাপ্রস্তরের মধ্যে পাওয়া গেছে জীবাণুর শিলীভূত দেহ (Microfossils)। এই প্রহেলিকার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারে নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনও ছিলেন 'মহাজাগতিক প্রাণকণা মতবাদে' (Lithopanspermia) বিশ্বাসী।

চেহারায়, স্বাভাবচরিত্রে গ্রহান্তরের জীবেরা কি পৃথিবীর প্রাণীদের মত? হুবহু পৃথিবীর পরিবেশ ছাড়া কি মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব ঘটতে পারে না? এই সব কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জৈবরসায়নবিদেরা।

ধরা যাক, এই ছায়াপথবিশ্বের কোথাও না কোথাও এমন একটি গ্রহ আছে, যার আবহমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম, কিন্তু মঙ্গলগ্রহের চেয়ে বেশী। মাধ্যাকর্ষণশক্তি পৃথিবীর অর্ধেক এবং গড়-উষ্ণতার পরিমাণ সামান্য। বিশেষজ্ঞদের মতে এমন পরিস্থিতিতেও প্রাণের বিকাশ ঘটতে কোন অসুবিধা নেই। এমন কি সেখানেও মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব ঘটা বিচিত্র নয়। তবে পরিবেশ আলাদা বলে পার্থক্যও অনেক দেখা দেবে। বাতাস খুব

পাতলা আর মধ্যাকর্ষণশক্তি কম হওয়াতে মানুষের মত প্রাণীর চেহারা হবে দারুণ লম্বা ও ছিপছিপে, ওজনও হবে অনেক কম। সে গ্রহে বহু কিম্ভূত-কিমাকার জীবেরও দেখা মিলতে পারে। দেখা পাওয়া যেতে পারে তিনটি মাথা আর বারোখানা পাওয়ালা বুদ্ধিমান প্রাণীরও। বিশ্বপ্রাণের পরমাশ্চর্য মহামিছিলে মানবদেহই আদর্শের একমাত্র মানদণ্ড হবে—তার কি মানে আছে? হয়তো এমনও দেখা যাবে যে, ঐ বহুপদবিশিষ্ট তিনমাথাওয়ালা প্রাণী-দেহ এবং মানবদেহ একই জৈব পদার্থে গঠিত!

পৃথিবীর প্রাণীজগতের দিকে তাকালে কি দেখতে পাওয়া যায়? এখানেও কি বিদঘুটে প্রাণীর কিছু কমতি আছে? আট বাহুওয়ালা অক্টো-পাস, ডিম্বপ্রসবকারী স্তন্যপায়ী জীব প্ল্যাটিপাস, 170 টন ওজনের মহাকায় তিমি,—এরা যদি পৃথিবীতে না থাকতো, তাহলে অন্য কোন জগতে এই ধরণের প্রাণীর কথা কেউ বিশ্বাস করতো কি? নানা বিরুদ্ধ পরিবেশে জীবনস্রোত বয়ে চলবার নজীরও এই পৃথিবীতেই আছে। 70°-75° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্কের তপ্ত মরুভূমি এবং মাইনাস −50°, −60° ডিগ্রির হিমশীতল মেরুপ্রদেশেও সমানে বয়ে চলেছে প্রাণের প্রবাহ। মানুষ তো প্রায় সব রকম আবহাওয়ার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। ভরশূন্য অবস্থায় দিনের পর দিন মহাকাশে কাটিয়ে এসেও তার কোন ক্ষতি হয় নি। মহাসমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে, যেখানে দিনের বেলাও সূর্যের আলো ঢোকে না, সেখানেও চলেছে প্রাণের বিচিত্র লীলা। অথচ সেই বারো হাজার ফুট (সমুদ্রের গড়-গভীরতা) জলের নীচে চাপা পড়ে গেলে কোন ডুবোজাহাজ আর উপরে উঠতে পারে না। অমন ভারী চাপ এবং নিরন্ধ্র অন্ধকারের রাজ্যে প্রাণদায়িনী মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই জীবনের ধারা বজায় রেখে চলেছে নানান জাতের সামুদ্রিক প্রাণীরা।

পৃথিবীতেই যখন এই অবস্থা, তখন মহা-ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় প্রাণ আছে আর কোথায় যে নেই, তা নিয়ে মন্তব্য করা নিরর্থক। সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলির মধ্যেও কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। কিবা আয়তন, কিবা পরিবেশ,—সব দিক দিয়েই প্রত্যেকে এক একটি আলাদা জগৎ। কাজেই অনন্ত কোটি নক্ষত্রলোক যে সীমাহীন বৈচিত্র্যে ভরা থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? প্রত্যেকটি নক্ষত্রজগতেই রয়েছে নিজস্ব মৌলিক পরিবেশ, যার ফলে প্রত্যেকের ইতিহাসও হবে মৌলিক। একথা মনে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে গ্রহান্তর প্রাণের উৎস সন্ধানে।

এযুগে বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীর দৃঢ় বিশ্বাস, গোটা মহাবিশ্বই জীবনকল্লোলে কল্লোলিত। এ পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে গ্রহান্তর-জীবনেও সভ্যতার ইতিবাচক সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীমহলে জেগেছে দারুণ উদ্দীপনা। শুরু হয়ে গেছে উন্নত নক্ষত্রসভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার প্রচেষ্টা। অবশ্য উদ্যোক্তরা কেউই জানেন না, কোথায় রয়েছে সেই স্বপ্নের রাজ্য! যদি বা থেকে থাকে, তবুও মানুষের আহ্বানে সাড়া দেবে কি?

দৌত্যের ভার দেয়া হয়েছে বেতার-তরঙ্গের উপর। 21·1 সেন্টিমিটার মাপের সেই দুর্বার বেতার-তরঙ্গ; মহাবিশ্বের কোনরকম আবহ-মণ্ডলই যে তরঙ্গের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। মহাসুদূর থেকে প্রতিমুহূর্তে ভেসে আসছে ঐ প্রাকৃতিক বেতার-তরঙ্গধারা। একথা সর্বপ্রথম জানা গিয়েছিল 1931 সালে। পরবর্তী-কালে এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান (Radio-Astronomy)। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

নক্ষত্রলোকের উন্নত সভ্যতাও (যদি থাকে) নিশ্চই এই মহাজাগতিক বেতার-তরঙ্গের কথা জানে। একথা মনে রেখে, গ্রহান্তরের মননশীল

জীবদের কাছ থেকে 21·1 সে. মি. বেতার-তরঙ্গের বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্কেত পাবার আশায় রেডিও-অ্যাস্ট্রোনমাররা কান পেতে আছেন। সাড়ে বাইশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে এই ধরণের কিছু রহস্যময় বেতার-সঙ্কেত, যা বিজ্ঞানীমহলে প্রচণ্ড কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

এই সব রহস্য বুঝি রহস্যই থেকে যাবে। আলো আর বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ প্রায় একই। আজ পৃথিবী থেকে যদি কোন বেতার-সঙ্কেত পাঠানো হয় এবং অ্যানড্রোমিডা বিশ্বের প্রজ্ঞাবান জীবেরা তার জবাব দেয়, তা হলে তা পেতে সময় লাগবে 22·5 লক্ষ+22·5 লক্ষ=45 লক্ষ বছর! কি বিপুল সময়কাল! এভাবে যোগাযোগ করা কি মানুষের কাজ?

এসব কথা চিন্তা করেই মার্কিন বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক প্রতিবেশী নক্ষত্রজগতের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করবার চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বেছে নিয়েছেন সাড়ে দশ আলোকবর্ষ দূরের দুটি তারা টাউ সেটি এবং এপসিলন এরিডানিকে। সেখানকার কল্পিত গ্রহসভ্যতার কাছে বেতার-সঙ্কেত পাঠানো হয়েছে 1960 সালে। জবাব আসবে 1981 সাল নাগাদ। অবশ্য জবাব দেবার মত কেউ থাকলে তবেই। নিশানা জানা না থাকলে অনেক সময় অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়তে হয়। তবুও ড্রেকের প্রচেষ্টায় নূতনত্বের চমক আছে।

মহাবিজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন যে, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে তিনি কিছু উপলখণ্ড কুড়িয়ে বেড়িয়েছেন মাত্র। তারপর তিন-শ' বছর কেটে গেছে। এই সময়কালের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল কুইপার প্রায় নিউটনের ভাষাতেই এই অগ্রগতিকে অতি নগণ্য বলে বর্ণনা করে গেছেন। তিনি বলেছে—চিররহস্য ঘেরা মহাব্রহ্মাণ্ডের খুব কম খবরই জানা গেছে এবং উত্তরকালের বিজ্ঞানীদের বিচারে এই জানার অনেক কিছুই হয়তো ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই আসে সাফল্য। ভুলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সঠিক পথের সন্ধান। মানুষের প্রজ্ঞা একদিন নিশ্চয়ই জ্ঞানসমুদ্রের গভীরে গিয়ে পৌঁছবে। দেবতা গ্রহান্তরের মানুষ, না না মানুষ হবে গ্রহান্তরের দেবতা—সে প্রশ্নেরও একদিন মীমাংসা হয়ে যাবে।

লোক-ঔষধ ও লোকজীবন

রেবতীমোহন সরকার*

মানবদেহে বিভিন্ন ধরণের রোগের উৎপত্তি এবং তাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়া সবদেশে এবং সবকালে মানবসমাজে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার নিত্য-নতুন উদ্ভাবনীশক্তির মাধ্যমে জীবনের এই চরমতম বিপর্যয়কে ঠেকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছে। কখনও সে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছে, আবার কখনও বা ব্যাধিরূপ অক্টোপাসের নিষ্পেষণে তার প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু তবুও মানুষকে ভগ্নোদ্যম করা যায় নি। জীবনের এই ব্যাধিজাত ঘটনা-দুর্ঘটনার রূপ ও প্রকৃতিকে মানুষ অতি নিকট থেকে নিরীক্ষণ করেছে; তারপর তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে নানা পন্থা প্রয়োগে সেই ব্যাধি-সমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। আজকের পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগে এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক নানা ওষুধের কার্যগুণে বহু জটিল রোগের উপশম হচ্ছে আর মানুষও কিছুটা অনিশ্চিত জীবনযাত্রার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। কিন্তু এককালে মানুষ রোগ উপশমে নানারূপ লোক-ওষুধের (Folk medicine) উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে এসেছে এবং আজও গ্রামীন মানুষের জীবন লোক-ওষুধকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, এই লোক-ওষুধের পরিবেশ ও জনজীবনের পারস্পরিক জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে সেই লোক-ওষুধের বিভিন্ন ধারা রূপায়িত হয়েছে। পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে অনভিজ্ঞ মানুষ তার জীবনের নানা সমস্যায় আধিভৌতিক শক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগসাধনে ব্রতী হয়েছিল। একমাত্র এই কারণেই জীবনে চলবার পথে মানুষের মধ্যে অতি প্রাকৃত শক্তি-গুলিকে বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করে তাদেরই প্রভাবে নানা সমস্যা সমাধানের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দেশ-বিদেশের উপজাতি-জীবনচর্যা পর্যালোচনা করলে আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। বহু উপজাতিগোষ্ঠীর ধারণায় মানুষের ব্যাধির দুটি মুখ্য কারণ রয়েছে—হয় কোন বাইরের বস্তু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে অথবা আত্মাটি কোথাও হারিয়ে গেছে কিংবা কেউ চুরি করে নিয়েছে। এহেন অবস্থায় ওঝার ঝাড়ফুঁক ও যাদুবিদ্যাসংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই দুষ্কৃতকারী বস্তুটিকে দেহ থেকে বের করা হয় অথবা হারিয়ে-যাওয়া বা চুরি-হওয়া আত্মা-টিকে ফিরিয়ে আনা হয়। ওঝা আনুষ্ঠানিক-ভাবে অহিতকারী শক্তিগুলির সঙ্গে নানাভাবে যুদ্ধ করে, কখনও সে তার নিজের আত্মাকেও পাঠায় রোগীর হারিয়ে-যাওয়া আত্মাকে পথ দেখিয়ে আনতে। ওঝার উপর বিশ্বাসই মানুষের নানা অসুখ সারিয়ে দেয়—ওঝাও বিশ্বাস করে সেই অতিপ্রাকৃত শক্তির অলৌকিক ক্ষমতাবলী। যার সাহায্যে নিমেষেই রোগরূপী দৈত্যের বিনাশ ঘটে; মানুষ আবার প্রাণচঞ্চল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি আমাদেরই ঘরের আশেপাশে, বিশেষ করে গ্রামবাংলার পথেপ্রান্তরে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে বহু লোক-দেবতার সন্ধান পাব—গ্রামীণ মানুষ যাদের শ্রদ্ধাভরে পূজা নিবেদন করছেন

---

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা-9

আর জীবনের চলবার পথকে লাবণীল করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ধর্মরাজ, চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে আর এদের দরবারে মানুষ বারে বারে আর্জি জানাচ্ছে রোগ উপশমের উদ্দেশ্যে। লোকদেবতার পূজায় মানুষের হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায়। নানাজাতি ও শ্রেণীর মানুষ রীতিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে লোকদেবতার পূজাউৎসবে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। অধিকাংশ লোকদেবতার স্থানে নানা রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। কোন কোন লোক-দেবতা মানুষের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হয়েছে যে, যুগে যুগে মানুষ এদের দরবারে অবলীলাক্রমে হাজির হচ্ছে; কখনও বা বহু দূর-দেশ থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি সারাবার উদ্দেশ্যে বহু মানুষের ভীড় জমে এই সকল লোকদেবতার থানে।

বিভিন্ন লোকদেবতা বিভিন্ন ওষুধ বিশারদ বলে ধারণা করা হয়। কেউ হাঁপানি, অর্শ আর বাত বিশেষজ্ঞ, কেউ জটিল স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, কোন লোকদেবতা, চক্ষুরোগ আর হৃদ্‌রোগ সারিয়ে দেয়, আবার কোথাও বা ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো হয় অথবা হাড়সংক্রান্ত যে কোন রোগেরই ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। লোকদেবতার দেয়াশীই এসকল রোগ-চিকিৎসার প্রধান হোতা। ব্রাহ্মণ থেকে সুরু করে ডোম, বাউড়ী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষ এই সব লোকদেবতার দেয়াশীর কাজ করে থাকেন। এই সব ওষুধের মধ্যে যেমন ঝাড়-ফুঁক, জলপড়া বা অন্যান্য ধরণের তুকতাক রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এঁরা নানা ধরণের গাছগাছড়া ও মূল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। রোগের পূর্ণ বিবরণ শুনে অথবা রোগীকে পরীক্ষা করে এঁরা সেই সব ওষুধ প্রয়োগ করেন। ওষুধ পাওয়াকালীন রোগীর নানা রকমের বিধিনিষেধ পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। এমনিভাবে পুরুষানুক্রমে এই দেয়াশীরা নিজ দায়িত্ব পালন তো করছেনই, তাছাড়াও এঁদের মনের মধ্যে রয়েছে লোকসেবার এক মহৎ অনুপ্রেরণা। তাই বহু মানুষ বিশেষভাবে গ্রামীণ মানুষের দল সর্বাগ্রেই এই সকল লোকদেবতার দেয়াশীদের কাছেই ছুটে আসে তাদের রোগ উপশমের জন্যে। এখানে মানত, পূজা, ঝাড়-ফুঁক, মাদুলি গ্রহণ প্রভৃতি যেমন রয়েছে তেমনিই দেখা যায় চিকিৎসা-বিদ্যার বাস্তব রূপ। তা না হলে বীরভূমের এক অখ্যাত ও নগণ্য গ্রামের ধর্মঠাকুরের থানে হাড়-ভাঙা রোগীদের এত ভীড় কেন? কিসের জন্যেই বা দেয়াশীর ঘরের পাশের স্থানটুকুতে কেটে ফেলে দেওয়া হাসপাতালের প্লাস্টারের স্তূপাকার? তাই লোক-ওষুধকে কেবলমাত্র ঝাড়-ফুঁকসর্বস্ব বলে অভিহিত করা যাবে না। লোক-ওষুধ প্রয়োগ-কারী অধিকাংশ দেয়াশীর রোগ ও তার প্রকৃতি নিরূপণে বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। তবে এঁদের বিশ্লেষণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশজ প্রথা ও রীতি অনুযায়ী বিকশিত হয়েছে এবং পুরুষানুক্রমে এই দক্ষতা একে অপরের কাছ থেকে লাভ করে আসছে। বীরভূমেরই আর এক গ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর থানে দূষিত ও ভয়াবহ কার্বঙ্কলের উপশমে দেয়াশী অবলীলাক্রমে তাঁর ব্যবস্থাপত্র দিয়ে চলেছেন আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ওষুধ ও ব্যবস্থাপত্রের গুণে ধীরে ধীরে রোগী আরোগ্যলাভ করছেন। এখানে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এসে থাকেন। মুসলমান ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের রোগীরাও দেবীর দেয়াশীর কাছে ওষুধ নিয়ে দেবীকে প্রণাম করে পূজা দিয়ে যাচ্ছেন। এই লোকচিকিৎসা অল্পদিনের ব্যাপার নয়—কোন অনাদিকাল থেকে এই সকল লোকদেবতা গ্রামীণ রোগহারক হিসেবে প্রধান ভূমিকায় ব্রতী। কেবল রোগের চিকিৎসাই নয় রোগের আক্রমণ যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্যেও রয়েছে নানা বিধিব্যবস্থা।

লোকদেবতা এবং লোক-ওষুধকে কেন্দ্র করে

গ্রামীণ জনসমাজে যুগান্তব্যাপী বিশ্বাস-সংস্কারের যে ঢেউ প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তা কেবলমাত্র কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস অথবা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের ছলচাতুরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করলে সত্যের অপলাপ হবে। গ্রামীণ মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন, মানসিক মানোন্নয়ন এবং রোগ-মুক্তি ও রোগপ্রতিরোধ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী-সমন্বিত সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং একই উদ্দেশ্যের পশ্চাৎপটে সামগ্রিক কর্মস্পৃহা জাগ্রত করতে এই সব লোকদেবতার অবদান কম নয়। সমাজ-সংস্কৃতি এবং বর্তমানের পরিবর্তিত পটভূমিকার পশ্চাৎপটে গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন লোকদেবতাকেন্দ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন এবং দেয়াসীদের বিভিন্ন ভূমিকার সুসবদ্ধ আলোচনা ও মূল্যায়ন লোকজীবন-চর্চার এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের মত প্রায় প্রতিটি দেশেই লোক-ওষুধের প্রচার ছিল যা এখনও রয়েছে। পৃথিবীর বহু সভ্য দেশ আজকের পরিবর্তিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এগুলির মূল্যায়নে সচেষ্ট। লোকচিকিৎসকদের সুপরিব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে এদের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টাকে যদি আজকের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও গবেষণার কাজে লাগানো যায়, তাহলে ক্ষতি তো নয়ই বরং তাতে আজকের বিকাশপ্রাপ্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের লাভই হবে। কোন কিছুকে সাধারণভাবে অবজ্ঞা করা বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়, বরং অবজ্ঞাত বস্তুকে যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে বাচাই করাই বিজ্ঞানের ধর্ম। তাই লোকচিকিৎসাকে এবং তথাকথিত লোকচিকিৎসকদের নানা পদ্ধতি ও মাধ্যমকে প্রকৃতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করবার মধ্যে প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর মনোভাব লুকিয়ে রয়েছে। আজকের সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার মত বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যায় অগ্রণী দেশগুলিতে ব্যাপক হারে লোকচিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্র-গবেষণার ভিত্তিতে সংগ্রহ এবং তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই সূত্রে প্রখ্যাত লোক-চিকিৎসার অনুসন্ধানী ডাঃ আলেকজাণ্ডার দগলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সোভিয়েট রাশিয়ার অপাংক্তেয় লোকচিকিৎসার বিভিন্ন তথাকথিত 'অবৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিগুলির মূল্যায়ন হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। সোনিক থেরাপি (Sonic therapy) বা ধ্বনি চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি যে গবেষণা করেছেন, তার ফলাফলের সঙ্গে লোকচিকিৎসদের বিভিন্ন মৌলিক আওয়াজ-জনিত চিরন্তনী চিকিৎসা পদ্ধতির আত্মিক সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়। ভিন্ন রকম ধ্বনি প্রয়োগে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানাভাবে সাড়া দেয় এবং বিভিন্ন রকম স্নায়বিক রোগ দূরীকরণে এই ধ্বনি চিকিৎসা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। সাইবেরিয়ার ওঝা বা যাদু-করেরা বহুকাল ধরে ধ্বনিপ্রসূত পদ্ধতির মাধ্যমে যে চিকিৎসা লোকচিকিৎসকেরা চালিয়ে আসছিল, তা এই পরীক্ষার মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে। এখানে ওঝারা তাদের খঞ্জনি বাজিয়ে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করে রোগীর চিকিৎসা করে। এই বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধ্বনিই যে রোগীর শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে—একথা আজ আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সম্মোহনবিদ্যাকে যথেষ্ট গুরুত্বদান করা হয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ বিদ্যা রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার লোকচিকিৎসকেরা কোন্ অনাদিকাল থেকে তাদের রোগীদের সুস্থ করে তোলবার কাজে ব্যবহার করে আসছে, তার ইয়ত্তা নেই। রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার আজকের দৃষ্টিভঙ্গীতে লোক-চিকিৎসা পদ্ধতির পুনর্মূল্যায়নের জোয়ার চলেছে। এই বিশেষ গবেষণার পরিকল্পনা রূপায়ণে কৃতী

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাই হলেন প্রধান উদ্যোক্তা। কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের জটাজাল উন্মোচন করে প্রকৃত কার্যকারণের ধারা অনুসন্ধান করতে পারলেই এই গবেষণা সার্থকতায় পর্যবসিত হবে। একথা ভুললে চলবে না যে, এই অনুসন্ধানও আজকের চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম প্রধান কাজ। আনুপূর্বিক বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত কোন পার্থিব ঘটনাকে অবৈজ্ঞানিক এবং উদ্ভট আখ্যা দান করা প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পথ নয়। এমনও হতে পারে—তথাকথিত লোক-চিকিৎসকেরা তাদের বহুকালব্যাপী প্রচেষ্টা এবং আত্ম-নিয়োগের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্যের কোন বিশেষ একদিকের সন্ধান পেয়েছিল। তাদের সেই সমবেত প্রয়াস এবং যুগান্তব্যাপী প্রচেষ্টালব্ধ অভিজ্ঞতার প্রকৃত মূল্যায়নের দাবী রাখে। আজকের বিজ্ঞানই দ্বিধাহীন চিত্তে সেই মূল্যায়নে অগ্রণী হবে।

ভারতীয় লোকচিকিৎসা এবং লোকচিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মূল্যায়নের কোন প্রচেষ্টাই হয় নি অথচ ভারতে লোকচিকিৎসা বহু প্রাচীন, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং জনজীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে পরিগণিত। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই লোকচিকিৎসাকে আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসার প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হয়। লোকচিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি-প্রকরণের বিরূপ সমালোচনা করা হয়। কখনও বা এগুলির কর্মপদ্ধতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয়। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব এবং অনুসন্ধিৎসার কথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ও বহু দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় গুণীজনেরা করেছেন। দেশীয় মতে এদের প্রচার ও প্রসার এবং ঐতিহ্য ও রীতিনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন ঘটে চলেছে যুগ ও কালের বিচিত্র গতিতে। সেই যুগান্তব্যাপী জ্ঞানসমৃদ্ধ চিন্তা-ধারার প্রকাশ লোকচিকিৎসার কেন্দ্রভূমিকে প্রভাবিত করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং উদ্ভট চিন্তাধারার পশ্চাৎপটে প্রকৃত তথ্য এবং তত্ত্বের যথাযথ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন হলে বহু মূল্যবান বিষয় উদ্ঘাটিত হবে—এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনীষী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

দীপককুমার দাঁ

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনায় সারস্বত পথিক ও লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার মহান পুরোধা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বদেশপ্রেম এবং যুক্তিনিষ্ঠ মননশীলতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। 'যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না'—এই সচেতন আক্ষেপবোধ রাখালদাসকে বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ও এর যথার্থ বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়, পুরাবস্তুর আবিষ্কারে, মুদ্রা ও লিপির পাঠোদ্ধারে, বাংলা-ইংরেজী প্রবন্ধ রচনায়—তাঁর দক্ষতা ও প্রতিভা এক বিরল উদাহরণ। রসিক, আড্ডাপ্রিয়, বন্ধুবৎসল রাখালদাস নিজে যে ঐতিহ্যের ও বিপুল কর্মকৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, আমরা তার কতটা যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি, তার মূল্যায়ন আশা করি অনাবশ্যক নয়।

ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ও পালিভাষায় প্রধান অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন। এ সময়ই তিনি তৎকালীন জার্মান পণ্ডিত ও লিপিতত্ত্ববিদ ডক্টর থিয়োডর ব্লকের সঙ্গে পরিচিত হন। মাত্র 20 বছর বয়সে, 1312 খৃষ্টাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'বৌদ্ধ বারাণসী' শিরোনামায় তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বি. এ. পাশ করবার আগেই তিনি মুদ্রা ও লিপিতত্ত্বে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এজন্যে 1908 খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের তালিকা প্রণয়নের জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। মাত্র 3 মাসে তিনি একাজ শেষ করেন। 1910 খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী অধ্যক্ষপদে যোগ দেন। ইংরেজ সরকার তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 1917 সালে পশ্চিম বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন। 1924 সালে তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বক্ষণের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। 1926 সালে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। (অবশ্য 'ভারতকোষ' গ্রন্থের 5ম খণ্ডে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদচ্যুত করা হয়েছিল।) 1928 সালে ডক্টর কাশীপ্রসাদ জয়সবালের চেষ্টায় তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়।…… .. বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই।………যে বাঙ্গালী

---

* 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (1ম খণ্ড) গ্রন্থে 'গ্রন্থকারের জীবনী' অংশে রাখালদাসের পুত্র শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের অবসর গ্রহণ নিকটবর্তী হচ্ছিল। তাঁর অবর্তমানে হিন্দু-সভ্যতার আবিষ্কর্তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ পদ প্রদান প্রায় অনিবার্য ছিল। সেই কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এই বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা প্রয়োজন।

তাহাকেই লিখিতে হইবে।' রাখালদাসের বহু সযত্নপ্রসূত চেষ্টার ফল হলো—'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়। 1ম খণ্ড : হিন্দুযুগ (1311 বঙ্গাব্দ); 2য় খণ্ড : মুসলমান যুগ, ভারতীয় (1324 বঙ্গাব্দ)। এই বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী বহুদিনের লজ্জা ও কলঙ্কের গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তথ্য ও পাদটীকায় বিশ্লেষণে যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যই একজন স্বভাবজাত ঐতিহাসিকের। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, 'এই বই হইতে যে সকল কথা জানিয়া শিখিলাম, এজন্ত তোমাকে গুরু বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে গেলে যদি তোমার অকল্যাণ বোধ কর, তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম। বাঙ্গালার ইতিহাস তোমার পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও তোমার নিকট ঋণী হইল, কেননা এখন হইতে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে হইলে বিদেশী পণ্ডিতদেরও এই বাঙ্গালীর বই আশ্রয় করিতে হইবে।' এমন মূল্যবান বইটি, যা কিনা যে কোন বাঙ্গালীমাত্রেই রক্ষাকবচ হিসেবে সংগ্রহে রাখতে পারে, তার প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল বন্ধু নরেন্দ্রনাথ বসুর অর্থ সাহায্যে।

1917 সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হওয়ায় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে মোহেন্-জো-দড়ো* এলাকার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। 1917-18 থেকে 22 সাল পর্যন্ত পাঁচটি শীতঋতুতে রাখালদাস দক্ষিণ-পাঞ্জাব, বিকানীর, বাহাওয়ালপুর, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আলেকজাণ্ডারের ইতিহাস লেখক কর্তৃক বর্ণিত গ্রীক ও ভারতীয় ভাষাযুক্ত দ্বাদশটি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক স্থাপিত শিলাস্তম্ভের সন্ধান আবিষ্কার। 1917-র শেষভাগে তিনি মোহেন্-জো-দড়ো এলাকার এক জঙ্গলের মধ্যে চকমকি পাথরের একটি ছুরি দেখে স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হন। পরে 1922 সালে তিনি মোহেন্-জো-দড়ো নগরের খননকার্য আরম্ভ করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন পান। এই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন, '1921 সালে লাড়কানা জিলার পশ্চিমাংশে গৈচিত্তেরো নামক স্থান পরিদর্শনকালে দেখতে পাওয়া গেল যে, একটি বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি বড় বড় মাটির জালা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে একটি জালার ভিতরে হাত দিতেই আমার একটি আঙ্গুল কাটিয়া গেল। সকলেই বলিল যে উহার ভিতর সাপ আছে এবং তোমাকে সাপে কামড়াইয়াছে। তারপর জালার ভিতরে সাপের বদলে পাওয়া গেল পাথরের ছুরি অন্তান্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগে ধাতু।' এই ধাতুর নিদর্শন যে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে, তা রাখালদাসই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। মোহেন্-জো-দড়ো খননকার্যের বেশ কয়েক বছর পূর্বে হরপ্পায় বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, শীলমোহর আবিষ্কার করেছিলেন কানিংহাম, দয়ারাম সাহানী প্রমুখ। এঁরা এগুলিকে বৌদ্ধ যুগের বলে অনুমান করেছিলেন। এই বিষয়ের যথার্থ বিশেষজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো' গ্রন্থে (2য় সংস্করণ, 1961) লিখেছেন, 'অতঃপর 1922 খৃষ্টাব্দে তিনি মোহেন্-জো-দড়ো নগরের খননকার্য আরম্ভ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শনপ্রাপ্ত হন। তাহার পূর্বে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু উপরে বৌদ্ধস্তূপ এবং আধুনিক যুগের ইটের মত ইট দেখিয়া এই নগরের প্রাগৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হন নাই।

* সিন্ধি ভাষায় 'মোহেন্-জো-দড়ো' শব্দের অর্থ 'মৃতের স্তূপ' (Mound of the dead).

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধস্তূপ ও চৈত্যবিহার উদ্ধার করা।……খননের ফলে অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত কয়েকটি নরম পাথরের শীল-মোহর তাঁহার হস্তগত হয়। এইগুলি স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ কর্তৃক বহু বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নগরের প্রাপ্ত শীলমোহ-রের মত। 1921 খৃষ্টাব্দেই রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহনীও হরপ্পায় খননকার্য আরম্ভ করিয়া আবার তাম্রপ্রস্তর যুগের শীলমোহর ও বহু পুরাতন জিনিসপত্র প্রাপ্ত হন। এইগুলি রাখালবাবু কর্তৃক প্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। কাজেই মোহেন-জো-দড়োন সঙ্গে হরপ্পার সভ্য-তার বিষয়ে সামঞ্জস্য সহজেই প্রমাণিত হইয়া যায়। …তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে ঠিক করেন যে, যদিও বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের ইট এবং নীচের প্রাসাদের ইট একই মাপের, এবং স্তূপ ও বিহার হইতে উক্ত প্রাসাদ মাত্র 1/2 ফুট নীচে অবস্থিত, তথাপি ইহা অন্ততঃ 2/3 হাজার বৎসর পূর্ববর্তী কালের হইবে। এরূপ স্বল্প প্রমাণের বলে এত বড় বিস্ময়কর কথা উচ্চারণ করা অসীম অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্তী কালে খননের এবং গবেষণার ফলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের অনুমান স্থানে স্থানে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।'

রাখালদাসের প্রধান সম্বল ছিল তাঁর অনন্ত স্বদেশপ্রেম। 'প্রাচীন মুদ্রা'—বাংলা ভাষায় লেখা মুদ্রাতত্ত্বের প্রথম বই। মুদ্রা ও লিপিতত্ত্বের অভি-জ্ঞতায় তিনি সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় (লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা যাদুঘর ও বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) গৃহীত মুদ্রার তিনি তালিকা প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব পৃথিবীর প্রথম সারির ঐতিহাসিকের সমতুল্য। 'দি অরিজিন অভ বেঙ্গলী স্ক্রীপ্ট' (1919), পালস্ অব বেঙ্গল (1913), হিস্ট্রী অব ওড়িশা (2য় খণ্ড) (1930-31), গুপ্ত রাজগণের যুগ, ত্রিপুরী জাতি ও তাদের প্রস্তর শিল্প, ভূমারার শিবমন্দির প্রভৃতি গ্রন্থাদি এবং বহু গবেষণা প্রবন্ধ প্রাজ্ঞ রাখালদাসের স্বল্পস্থায়ী জীবনকে আমাদের কাছে আরও রহস্যময় করে তোলে। 'করুণা', ধর্মপাল, শশাঙ্ক, ময়ূখ, পাষাণের কথা প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'পাষাণের কথা' উপন্যাসে তিনি এক পাষাণখণ্ডের মুখ দিয়ে প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'শশাঙ্ক' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 'পাষাণের কথা মনীষিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হয় নাই।' করুণা, ধর্মপাল, শশাঙ্ক—এই তিনটি উপন্যাসে তিনি ভারতীয়দের পরাধীনতার কারণগুলি জীবন্ত করে তুলেছেন। একদিকে যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা, অপরদিকে সরস জনপ্রিয় সাধারণবোধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন—সব্যসাচী রাখালদাসের দ্বৈত মেজা-জের ভাবধারাকে সুস্পষ্ট করে।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে 'civilization' শব্দটির পরিভাষা 'সভ্যতা' অপেক্ষা 'উৎকর্ষ'-র প্রতি তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 'civilization শব্দটা আধুনিক বাঙ্গালায় 'সভ্যতা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সভ্যতা' বলিলে ইংরাজী শব্দটির শক্তির সমস্তটা প্রকাশিত হয় না। 'সভ্যতা' বোধ হয় নূতন পাথরের যুগেও ছিল। কারণ, তাহারাও কাপড় বুনিতে জানিত, ভাল ভাল মাটির বাসন তৈয়ারী করিত এবং সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত, 'উৎকর্ষ' শব্দে তৎকালীন মানব-সমাজের আপেক্ষিক উন্নতির পরিচয় বুঝিতে পারা যায়। নূতন পাথর এবং তাম্র বা ব্রোঞ্জের যুগে প্রভেদ আপেক্ষিক, সুতরাং উৎকর্ষ শব্দই ব্যবহার করা উচিত।'

'তাম্রের যুগের ভারতবর্ষ', 'বুদ্ধগয়া', 'পাল-রাজাদের কাহিনী, 'শকাধিকার ও কণিষ্ক', 'গণেশ

ও মধুমর্দন', 'চন্দ্রকেতুগড়'—প্রভৃতি তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধাবলীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলা গদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। নমুনা হিসাবে 'চন্দ্রকেতুগড়' (1330, বার্ষিক বসুমতী) প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি করছি। 'বাংলাদেশের দক্ষিণধার জলময় ও বনময় ছিল এবং অতি অল্পকাল পূর্বে মানবের বাসভূমি হইয়াছিল। ইহাই ভূতত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্ত। ভূতত্ত্ববিদ লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন, শতাব্দ বা সহস্রাব্দ তাঁহার নজরে আসে না, ভূতত্ত্ববিদ যে স্থানে মেদিনীর ইতিহাস শেষ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক সেই স্থান হইতেই মানবজাতির ইতিহাস আরম্ভ করিয়া থাকেন সুতরাং ভূতত্ত্ববিদের মতে যে কাল অত্যন্ত আধুনিক, ইতিহাসের তাহাই প্রাচীনতম যুগ।' এমন ঝরঝরে তথ্যসমৃদ্ধ গদ্য রচনা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে খুবই কম আছে।

ডাবলিউ. আর. গুলাযের পরিকল্পনাই রাখালদাসের 'বাঙালার ইতিহাস' রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহের কঠিন অধ্যবসায়ের মধ্যেও তাঁর আমোদপ্রিয়তা ও বন্ধু-সংসর্গ অবিচ্ছিন্ন ছিল। নীরস বিষয়কে বৈঠকী আড্ডায় তিনি খুব জমিয়ে তুলতে পারতেন। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'লম্বা-চওড়া পুরুষোচিত দেহ, সুশ্রী মুখ, সাজপোষাকে সৌখিনতার অভাব ছিল না এবং তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে ও কথাবার্তা শুনে বেশ বোঝা যেত জীবনকে তিনি উপভোগ করে নিয়েছেন যথাসাধ্য।'

রাখালদাসের জন্ম 1292 সালের 1লা বৈশাখ (1886 সালের 12ই এপ্রিল) মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। 24 পরগণার বনগ্রাম মহকুমার ভুযরিয়া গ্রামে তাঁদের বসতবাটী। পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ওকালতি পাশ করে মুর্শিদাবাদে আইনব্যবসা করেন। বাগ্মী ও তেজস্বী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। রাখালদাস ছিলেন মাতা কালীমতীদেবীর অষ্টম গর্ভের সন্তান (এর আগের সকলেই মারা যান)। এন্ট্রান্স পাশ করবার পর তিনি কাঞ্চনমালা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই পুত্র—অসীমচন্দ্র ও অদ্রীশচন্দ্র। মাত্র 45 বৎসর বয়সে 1930 সালের মে মাসে তিনি পরলোকগমন করেন।

শব্দোত্তর তরঙ্গ

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

1912 সালের এপ্রিল মাসে উত্তর আমেরিকার উপকূলের নিকট বিশাল বৃটিশ জাহাজ টাইটানিক (Titanic) হিমশৈলের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং যার ফলে সমস্ত যাত্রী ও চালকসহ জাহাজটির সলিলসমাধি ঘটেছিল, সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে বেদনাহত করে তুলেছিল। সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ ভাবতে সুরু করেছিলেন জাহাজটিতে যদি এমন ব্যবস্থা থাকতো যাতে ক্যাপ্টেন ভাসমান বরফস্তূপ সম্পর্কে আগেই সতর্কতার সংকেত পেতেন, তাহলে ঐ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু কি সেই ব্যবস্থা? নোবেল পুরস্কারবিজয়ী বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী সার ওয়েন উইলিয়াম রিচার্ডসন (1879-1959) এই ব্যাপারে শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন; যদিও তিনি নিজে বাস্তব কোন পদ্ধতির কথা সে সময় ভাবতে পারেন নি। কুয়াশা-ঢাকা বিশাল সমুদ্রে ভাসমান বরফস্তূপের অস্তিত্ব সাবধান করে দিতে পারে একমাত্র শব্দোত্তর তরঙ্গ, আর শব্দোত্তর তরঙ্গের এই বিশেষ ক্ষমতার বিষয় আবিষ্কার হলো বেশ কয়েক বছর পরে।

1914-18 সালের ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী, সমগ্র ভূপৃষ্ঠ জুড়ে শুধু ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মানুষ শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে। আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত জাহাজগুলি নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে মৃত্যুর আর ধ্বংসের পরোয়ানা নিয়ে। এমন সময় জার্মেনীর দুরন্ত ডুবোজাহাজগুলি সমুদ্রের ভিতরে ভেল্কি দেখাতে সুরু করলো। ফরাসী নৌবাহিনীর জাহাজগুলি এই সব ডুবোজাহাজের আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বিশাল সমুদ্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থেকে এরা শত্রু জাহাজগুলিকে এমন প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল করতে লাগলো যে, ফরাসী সরকার ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। দেশের বৈজ্ঞানিকদের এই সব ডুবোজাহাজের হাত থেকে নৌবাহিনীর জাহাজগুলিকে রক্ষার জন্যে একটা উপায় উদ্ভাবন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

1916 খৃষ্টাব্দে দেশের সম্মানে ও মর্যাদা রক্ষার্থে দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় সত্যকার ফলপ্রদ উপায়ের সন্ধান যিনি দিলেন, তিনি হলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী পল্ ল্যাঞ্জেভিন (1872-1946)। ল্যাঞ্জেভিন রিচার্ডসনের চিন্তাধারা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতিটি খুবই সহজ ও সরল। জাহাজ থেকে সমুদ্রের অভ্যন্তরে শব্দোত্তর তরঙ্গ (Supersonic waves) পূর্ব-নির্ধারিত দিকে পাঠানো হবে। পথে যদি কোন বাধা অর্থাৎ সমুদ্রজলের ঘনত্বের অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট কোন বস্তু না থাকে, তবে উক্ত তরঙ্গ অসীম সমুদ্রের সীমাহীনতায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু অনুরূপ বাধা থাকলে উক্ত তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসবে এবং প্রমাণ করবে যে, পথ বিপন্মুক্ত নয়। প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র মিলিতভাবে কাজ করায় এই পদ্ধতিতে বাধার সঠিক অবস্থিতি অর্থাৎ জাহাজ থেকে তার দূরত্ব নিরূপণ করা সম্ভব। ধরা যাক, শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠাবার চার সেকেণ্ড পরে প্রতিফলিত তরঙ্গ গৃহীত হলো। এখন জলের মধ্যে শব্দের গতিবেগ জানা গেছে সেকেণ্ডে

মোটামুটি 4900 ফুট। যেহেতু তরঙ্গটি বাধা পর্যন্ত পথ এই চার সেকেণ্ডে দু-বার অতিক্রম করছে, অতএব সহজেই বলা যায় বাধার অবস্থিতি জাহাজ (যেখানে প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র রয়েছে) থেকে 4900×4 ফুটের অর্ধেক দূরে অবস্থিত।

এই সময় পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন জাগবে, তা হলো—শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্য কেন এই পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে? সাধারণ শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ কি একইভাবে কার্যকর হবে না?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আরো প্রাথমিক প্রশ্ন থেকে সুরু করা যাক। শব্দোত্তর তরঙ্গের সঙ্গে সাধারণ শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দের পার্থক্য কি?

সভ্যতার অতি শৈশবকাল থেকে মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে কুকুরের তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তি লক্ষ্য করে আসছে। সামান্যতম শব্দ, যা মানুষের কানে ধরা পড়ে না, তাও কুকুরকে অতি সহজে বিচলিত করে। প্রাচীনযুগে শিকারীরা এক বিশেষ ধরণের বাঁশী ব্যবহার করতো, যার অত্যুচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য না হয়েও কুকুরকে আকৃষ্ট করতো এবং এই বাঁশীর সাহায্যে গভীর অরণ্যে কুকুরকে সঙ্কেত পাঠাতো শিকারী। এথেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে, তা হলো কতকগুলি শব্দ আছে, যা মানুষের কানে ধরা পড়ে না, কিন্তু কুকুর শুনতে পায়। কুকুরের এই বিশেষ ক্ষমতা শিকারীর কাজে লাগলেও শ্রুতি-সীমার বাইরের শব্দকে যে কখনো আরো অনেক বৃহত্তর কাজে লাগানো যেতে পারে—এই চিন্তাও কিন্তু সে যুগের কোন মানুষ করে নি। শব্দোত্তর তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়।

কম্পনই শব্দ সৃষ্টির মূল—এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সব বস্তুর সব রকমের কম্পনজনিত শব্দই কি আমরা শুনতে পাই? নিশ্চয়ই পাই না, তা না হলে কুকুর যে শব্দ শুনতে পায়, আমরা পাই না কেন? আর আমাদের হৃৎপিণ্ডতো প্রতিনিয়ত কম্পিত হচ্ছে, কিন্তু তার কম্পনজনিত শব্দও আমরা শুনতে পাই না কেন? কাজেই একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যে সীমার মাঝখানের কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দগুলি আমাদের শ্রুতিগ্রাহ্য হয়। মোটামুটিভাবে জানা গেছে সেকেণ্ডে 20 থেকে 20000 পর্যন্ত কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ আমরা শুনতে পাই। বয়স ও ব্যক্তিগত শ্রবণ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এই সীমার কিছু ব্যতিক্রমও হতে পারে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে উক্ত সীমার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে। সেকেণ্ডে 20000-এর অধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দই (যা আমরা শুনতে পাই না) শব্দোত্তর তরঙ্গরূপে পরিচিত এবং আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

গত শতাব্দীর শেষভাগে লেবোরেটরীতে প্রথম শব্দোত্তর-তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় কয়েক মিলিমিটার দীর্ঘ সুর-শলাকার (Tuning fork) সাহায্যে, সেকেণ্ডে 90.000 পর্যন্ত কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ এতে সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির জন্যে গ্যাল্টনের বাঁশীও (Galton's whistle) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি সে সময়ে সম্ভব হলেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক নিয়ে কোন প্রচেষ্টা সে সময় হয় নি।

এবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। কল্পনা করা যাক অন্ধকার রাতে একটা অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত ঘরের কথা। ঘরটির মধ্যে একজন সুদক্ষ শিল্পী নিপুণ হস্তে গীটারে একটা খুব সুন্দর সুর বাজাচ্ছেন। ঘরটির একটিমাত্র জানালা খোলা এবং স্বাভাবিকভাবেই জানালার আয়তাকার আকৃতির জন্যে জানালার নীচে কিছু দূরে ভূমিতে একটি আয়তাকার আলোকোজ্জ্বল স্থান সৃষ্টি হবে। এই আলোকোজ্জ্বল স্থানে বসে কেউ অনায়াসে বই পড়বার কাজও করতে পারবে, কিন্তু আয়ত ক্ষেত্রটার বাইরে একেবারে অন্ধকার। সেই লোকই কিন্তু ঐ আলোকোজ্জ্বল স্থানে বসে

গীটারের সুর-লহরী যে তীব্রতায় শুনবে, আয়ত-ক্ষেত্রের বাইরে অন্ধকারস্থানে সে তীব্রতা মোটেই হ্রাস পাবে না. এমনকি ঘরটির দেয়ালের প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়েও একইভাবে শুনতে পাবে। এর থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আলোক ও শব্দ-তরঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আলোক সুনির্দিষ্ট পথে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হয় আর শব্দ শান্ত পুকুরে ঢিল ফেলে সৃষ্টি-হওয়া বৃত্তাকার ঢেউয়ের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোক ও শব্দ-তরঙ্গের এরূপ ভিন্ন আচরণের কারণ কি? কোনো তরঙ্গ আলোকের মত নির্দিষ্ট পথে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হবে, না শব্দের মত ছড়িয়ে পড়বে, তা নির্ভর করে তরঙ্গ-সৃষ্টির উৎসের বা নির্গমন-মুখের বিস্তৃতি ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। যদি উৎসের বিস্তৃতি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান হয়, তাহলে তরঙ্গ শব্দের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, উল্লিখিত ঘটনায় গীটার থেকে সৃষ্ট শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ফুট এবং জানালার বিস্তৃতিও তাই হওয়ায় শব্দ-তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যদি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উৎস বা নির্গমন-মুখের বিস্তৃতির তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র হয়, তাহলে তরঙ্গ নির্দিষ্ট রশ্মির আকারে প্রবাহিত হবে, আলোকের ক্ষেত্রে যা হয়েছে। আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক-মিলিমিটারের দশহাজার ভাগের একভাগ; অর্থাৎ জানালার বিস্তৃতির তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কাজেই আলোক নির্দিষ্ট রশ্মির আকারে প্রবাহিত হয়েছে, বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। এখানে জানালাটি আলোক ও শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টির উৎসরূপে কাজ করছে,-যদিও প্রকৃত উৎস ঘরের অভ্যন্তরে রয়েছে। এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে সাধারণ শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ প্রয়োগের অসুবিধা, এই শব্দ নির্দিষ্ট পথে না গিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে জাহাজের উপরিস্থিত যে কোন বস্তু থেকেই প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসবে এবং যে উদ্দেশ্যে শব্দ প্রেরণ, তা সিদ্ধ হবে না। এখন তাহলে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে নির্দিষ্ট পথে শব্দকে প্রেরণ করা। এর জন্যে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে উল্লেখ্যভাবে হ্রাস করা কিংবা উৎসের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করা। উৎসের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করা অসুবিধাজনক, কারণ শব্দসৃষ্টির একটি বিশালাকার যন্ত্র জাহাজে স্থাপন করা কষ্টসাধ্য। কাজেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ্রাস করাই একমাত্র সম্ভাব্য উপায়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করতে গেলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করতে হবে—কম্পাঙ্ক × তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। একই মাধ্যমে গতিবেগ সব সময় অপরিবর্তিত থাকছে, অতএব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ্রাসের উপায় কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি। কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করে শব্দ আর সাধারণ শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ থাকছে না। ল্যাঞ্জেভিন এজন্যেই শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন। সমস্যার কিন্তু পুরাপুরি সমাধান এখানে হলো না। কারণ সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়ে ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করবে যে তরঙ্গ, তা খুব শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিশালী শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির জন্যে গবেষণা সুরু করলেন।

এর পরের ইতিহাস সাফল্যের ইতিহাস। বিজ্ঞানীদের একনিষ্ঠ সাধনায় শক্তিশালী শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হতে লাগলো। বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী জেম্স প্রেসকট জুল (1818-1889) কর্তৃক 1847 সালে আবিষ্কৃত একটি তথ্যের (চুম্বকত্ব প্রাপ্তির পর চুম্বক দণ্ডের দৈর্ঘ্যের অতি-সূক্ষ্ম পরিবর্তন) উপর ভিত্তি করে 1927 সালে জে, এইচ, ভিন্সেন্ট কর্তৃক উদ্ভাবিত চৌম্বক সঙ্কোচন দোলক (Magnetostriction oscillator) এবং 1880 সালে জে. কুরী ও পি কুরী ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক আবিষ্কৃত পিজো-ইলেকট্রিক ক্রিয়ায় (কয়েকটি অসমঞ্জস আকারের স্ফটিকের দুই বিপরীত তলে চাপ প্রয়োগে অপর দুই বিপরীত তলে বিপরীত-ধর্মী তড়িতাধান সৃষ্টি এবং চাপহ্রাসে উভয় তলে ঠিক বিপরীত তড়িতা-

ধান সৃষ্টি) উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত পিজো-ইলেকট্রিক জেনারেটর (Piezo-electric generator) শক্তিশালী শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির ছুটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

ভাবলে অবাক হতে হয়, প্রকৃতপক্ষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রয়োজনে যার গবেষণার সূত্রপাত, সেই শব্দোত্তর তরঙ্গ আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে ও বিভিন্ন প্রাণরক্ষাকারী পদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

যে পদ্ধতিতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে ডুবোজাহাজের অবস্থিতি নিরূপণ করা হয়েছিল, সেই পদ্ধতিতে সমুদ্রের যে কোন স্থানের গভীরতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

শব্দোত্তর তরঙ্গ বিজ্ঞানের জগতে ভোজবাজি দেখিয়ে চলেছে। জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবদ্ধ বিশাল লৌহতোরণ যদি মালিকের মোটর গাড়ী আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গিয়ে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দেয়, তাহলে ভোজবাজি ছাড়া আর কি মনে হবে? আরব্যোপন্যাসের সেই 'চিচিং-ফাঁক' মন্ত্রোচ্চারণে খুলে যাওয়া দস্যু-দলের গুপ্ত প্রকোষ্ঠের মত শব্দোত্তর তরঙ্গ এমন বিস্ময়কর ঘটনাও সম্ভব করেছে। মোটর গাড়ীতে স্থাপিত শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির যন্ত্র থেকে উত্থিত তরঙ্গ লৌহতোরণের গ্রাহক-যন্ত্রে গৃহীত হয় এবং বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্মুক্ত হয়। বলা বাহুল্য মালিকের গাড়ী থেকে যে বিশেষ কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রেরিত হয়, তাই লৌহতোরণকে উন্মুক্ত করতে পারবে, অন্য কোন তরঙ্গ নয়।

কয়েক বছর আগে আমেরিকার এক সাময়িকীতে একটি জুয়েলারির দোকানে ফাঁদ পেতে চোর ধরবার ঘটনার কথা বেরিয়েছিল। প্রথমে ঐ দোকানে যখন চুরি হয়, তখন দোকানটির প্রতিটি দরজা ও জানালা বৈদ্যুতিক 'তস্কর সতর্কতা ধ্বনি' (Burglar alarm) ব্যবস্থা সম্বলিত ছিল। চোরেরা কিন্তু দরজা, জানালা স্পর্শ না করে ঘরের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢোকে এবং যথাকর্তব্য সুসম্পন্ন করে চম্পট দেয়। পরের বার মালিক উন্নত পর্যায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। পাহারা দেবার গুরুদায়িত্ব তড়িৎ শক্তির হাত থেকে নিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঘরটির মধ্যে বসানো হলো শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র, যার থেকে প্রতিনিয়ত তরঙ্গ উত্থিত হয়ে ঘরের প্রতিটি বস্তু থেকে বার বার প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসতে লাগলো। এর ফলে ঘরটির অভ্যন্তর ভাগে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের নির্দিষ্ট মাত্রার তরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রবহমান রইলো। ব্যবস্থা এমনই সুচারু যে, সামান্যতম গোলযোগে তীব্র শব্দের উৎপত্তি হয়। চোরেরাও এবার অত্যন্ত সতর্ক হয়ে দরজা, জানালা এমন কি দেয়াল পর্যন্ত না স্পর্শ করে সোজা ছাদ ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করলো। বলা বাহুল্য, সব কয়জনই অতি-বিশ্বস্ত প্রহরী শব্দোত্তর তরঙ্গের সময়োচিত সতর্কতায় অকুস্থলেই হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। দশ হাজার ঘনফুট পর্যন্ত আয়তনের বিরাট ঘর শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রহরায় রাখা যায়। অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিভিন্ন কলকারখানার কোন অংশে হঠাৎ অগ্নিসংযোগের সংকেতধ্বনি যথাযথ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়বার বিভীষিকা সৃষ্টি করবার আগেই তাকে নিভানোর জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

আমেরিকার খ্যাতনামা পদার্থ-বিজ্ঞানী রবার্ট উইলিয়ামস উড (1868-1955) এবং অ্যালফ্রেড লী লুমিস বিভিন্ন প্রাণীদেহের উপর শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ দিন গবেষণা করেছেন। দেখা গেছে ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতির মত ছোট ছোট প্রাণী শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাণ হারায়। শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে বিভিন্ন

রোগজীবাণু ধ্বংস করা চিকিৎসা-জগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া প্রভৃতির জীবাণু রোগীর দেহ থেকে সংগ্রহ করে একটি পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ রেখে যদি শক্তিশালী শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে জীবাণুগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। শব্দোত্তর তরঙ্গের এই বিস্ময়কর জীবাণু-হনন ক্ষমতার জন্যে দুধ, জল প্রভৃতি জীবাণুমুক্ত করবার কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। হুপিংকাশির জীবাণুদের থেকে এণ্ডোটক্সিন নামক বিষ শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে নিষ্কাশিত করা হয়। এই বিষ ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণ রাখলে এর বিষক্রিয়া হারায় এবং তখন এটি অন্য প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট করালে হুপিংকাশি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তোলে।

রশ্মিকের অভ্যন্তরে গঠিত অতিক্ষুদ্র ছিদ্রাদির অস্তিত্ব (যা এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে ধরা পড়া দুঃসাধ্য) নিরূপণে, জলে ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ে, জলে অদ্রাব্য কোন বস্তুকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রাণদায়ী ওষুধ প্রস্তুতিতে, পৃথিবীর আকৃতি নির্ধারণে, পশমের পরিচ্ছদাদি পরিষ্কারে, বাতাস বিশুদ্ধকরণের কাজে, বিভিন্ন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণে, ধাতব পদার্থের অভ্যন্তরে শূন্যতার অস্তিত্ব নির্ণয়ে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিস্ময়করভাবে শব্দোত্তর তরঙ্গের বিভিন্ন ধর্মকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো হচ্ছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু মানব কল্যাণমূলক কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে চলেছে। এই সম্বন্ধে শেষ কথা আজো বলা হয় নি।

নিমগাছ

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে রোগ নিরাময়কারী হিসাবে নিমের নাম খুবই পরিচিত। অনেকেই নিমের ব্যবহার প্রত্যহই করে থাকেন। এথেকেই নিমের দাঁতের মাজন তৈরী হয়। অনেকেই নিমের ডাল দিয়েই দাঁত মাজেন। নিমের সাবান তৈরী হয়। চর্মরোগে এবং বিভিন্ন কার্বাঙ্কলজাতীয় পীড়ায় নিম অব্যর্থ। এর বাকল, পাতা, ফল ফুল সবই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রয়োজন।

নিমগাছ ভারতের সর্বত্রই আছে। এর বোটানিক্যাল নাম অ্যাজাডিরাকটা ইণ্ডিকা (Azadirachta indica)। বাংলায় বলা হয় নিম; সংস্কৃতে নিম্ব, গুজরাটিতে লিম্ড়ো (Limdo) আর ইংরেজীতে মারগোসা ট্রি (Margosa tree)। নিমগাছ খুবই লম্বা, কোথাও কোথাও এর উচ্চতা 40 থেকে 50 ফুট পর্যন্তও হয়। এর পাতার রং গাঢ় সবুজ। এই পাতা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়ে থাকে। এটি বসন্ত রোগের প্রতিষেধকও বটে, এর স্বাদ তেতো। নিমের পাতা সিদ্ধ করে অনেকেই সেই জল জীবাণুনাশক হিসাবে ক্ষতস্থানে ব্যবহার করেন। এক্সিমা নিবারণে সিদ্ধ নিম পাতার ব্যবহার আমাদের দেশে চালু আছে। কারো কারো মতে—নিম গাছের পাতা বিছিয়ে রাখলে দেখা যায় পশমী বা রেশম কাপড়ের অনিষ্টকর পোকা আর ক্ষতি ঘটাতে পারে না।

*রসায়ন বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

নিমের বাকল থেকে কিছু কিছু অ্যালকালয়েড (Alkaloid), যেমন মার্গোসিন (Margosine), নিম্বিডিন (Nimbidin), নিম্বিন (Nimbin) ইত্যাদি পাওয়া গেছে। নিমে নিমবোষ্টিরল (Nimbosterol) আছে। বাকল থেকে শোষিত এই রস দিয়েই দাঁতের মাজন তৈরী হয়। এই রস ফোড়া কিংবা কার্বাঙ্কলকে নিরাময় করে।

নিমের সবুজ পাতার মধ্যে বিটা-সিটোষ্টিরল (Beta-sitosterol) এবং অন্য একটি হলুদ বর্ণের যৌগ কোয়েরসিটিনও (Quercetin) আছে। এটা জীবাণুনাশক, সুতরাং ক্ষতস্থানে পাতার ব্যবহারে অনেক সময়ই ভাল ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন নিমের বীজ থেকে মার্গোসা অয়েল (Margosa oil) নিষ্কাশন করা হয়। এটি স্বাদে তেতো। এর মধ্যে আছে অলেয়িক অ্যাসিড (Oleic acid) (49-62%), ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড, (Stearic acid) (14-23%) আর পামিটিক অ্যাসিড (Palmitic acid) (12°-15%°)। তা-ছাড়া এতে আছে কিছু পরিমাণ ট্যানিন (Tannin) (6%)। সুতরাং এই তেল দিয়েই নিমের সাবান তৈরী হচ্ছে। নিমবলি চূর্ণ আর মধু বমি বন্ধ করে। অর্শের রক্তপাত বন্ধ করতেও নিমের ব্যবহার হয়।

এই নিমগাছ থেকেই নিমবায়ল (Nimbiol) বলে একটি পলিফিনলিক ডাইটারপিন (Polyphenolic diterpene) সম্প্রতি পাওয়া গেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও এই নতুন ডাইটারপিনটির কোন উপকারিতা আছে কিনা, তা বিজ্ঞানীরা এখন পরীক্ষা করে দেখছেন। কারো কারো মতে— নিম থেকে প্রাপ্ত মার্গোসা তেলের আরও একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে—এই তেল যে সব রোগীর রক্তে চিনির পরিমাণ অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায়, তা দমন করতে সাহায্য করে। কিসের কারণে তা ঘটছে, তা কিন্তু কেউ এখনও জানেন না। গবেষণায় নিমের মধ্যে সালফারের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। চিনি-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এই সালফার যৌগের জন্যেই ঘটছে কিনা, তা এখনও গবেষণাসাপেক্ষ

আকাশের ছোট বস্তুগুলির কথা

সিতাংশুবিমল করঞ্জাই
ও
সূর্যকুমার বর্মণ*

সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে। তাছাড়া গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা এসব ছোট ছোট বস্তুগুলি সূর্যের চারিদিকে নিজের কক্ষপথে ঘুরছে। এদের উপাদান বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল নিয়মেই আন্তঃসৌরজগৎ প্লাজমায় গঠিত—তা সে পারমাণবিক বা আণবিক অবস্থায় থাক্ বা আয়ন এবং ইলেকট্রন অবস্থায় থাক। এদের আচরণ তাদের ভরের উপর নির্ভর করে। ভরের উপর নির্ভর করে তাদের উপর কখনো (a) সৌর আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে, কখনো বা (b) সৌর-বিকিরণ, কখনো বা (c) তড়িচ্চুম্বকীয় টান প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের ভর সংখ্যামানে পঞ্চাশতম পদ পর্যন্ত নিয়ে মনে হয় এই সব ছোট বস্তু থেকে কোন ভরে কি আচরণ পাওয়া যায়, তার পূর্ণ ছবি

*গণিত বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (পঃ বঃ)

পাওয়া যাবে (Astrophys, Space Sci, 8,338, 1970) :

(a) যখন m > 10^{-10}g অর্থাৎ বস্তুগুলির ভর 10^{-10}g থেকে বেশী থাকে, তখন এদের উপর সূর্যের টানটা প্রবল হয়ে ওঠে (গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু এবং অধিকাংশ উল্কাও এই শ্রেণীভুক্ত)।

তখন সূর্যের টান হচ্ছে :

$$f = K M_{\odot} m/r^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

যেখানে

$M_{\odot}$ = সূর্যের ভর

r = $M_{\odot}$ এবং m-এর মধ্যেকার দূরত্ব

k – মহাকর্ষীয় ধ্রুবক

এই টানে বস্তুগুলি কেপ্‌লারের উপবৃত্তীয় পথে ঘোরে। ঘোরবার পথে তারা বিভিন্নভাবে বিচলিত হতে পারে :

(1) ভরমুক্ত বিচলন

এই বিচলন (Mass-independent perturbations) গ্রহগুলির টানের ফলেই সৃষ্টি হয়। তাদের উপর সূর্যের কার্যকরী টানের তুলনায় গ্রহগুলির কার্যকরী টান উপেক্ষণীয় না হলে এই বিচলন সৃষ্টি হয়। বস্তুর নিস্পন্দ বিন্দুগুলির পূর্বগমন (Secular precession of the nodes) এবং অক্ষের অনুসূর (Perihelion of the orbits)—এদের মধ্যে গ্রহগুলির টানের ফল নিহিত আছে। ছোট বস্তুগুলি নিজের কক্ষপথে ঘুরছে। তাদের কক্ষতল রবিমার্গের (Ecliptic) সঙ্গে দুটি বিন্দুতে মিলিত হয়। বিন্দু দুটি নিস্পন্দবিন্দু। আকাশের তারকাগুলির সাপেক্ষে সূর্যের বার্ষিক পথ রবিমার্গ। নিস্পন্দবিন্দুগুলি স্থির থাকে না—প্রতি বছর রবিমার্গে সূর্যের গতির বিপরীত দিকে একটু একটু করে সরে পড়ে। একেই বস্তুর নিস্পন্দবিন্দুগুলির পূর্বগমন বলে। এর ফলে সূর্য কিছু আগেই তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। আর, গ্রহ-উপগ্রহ তাদের কক্ষপথে একটা বিন্দুতে সূর্যের সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে, এই বিন্দুকেই অনুসূর বলে। যেমন অ্যাডোনিসের অনুসূর বিন্দু হচ্ছে বুধের কক্ষের বাইরে 50 লক্ষ মাইল এবং সেই বিন্দু পৃথিবীর কক্ষ থেকে দশ লক্ষ মাইলের কিছু দূর দিয়ে চলে যায়।

(2) ভরযুক্ত বিচলন

এই বিচলন (Mass-dependent perturbation) আলোকচাপ (Light pressure) এবং পয়ন্টিংরবার্টসন ফলের (Poynting-Robertson effect) দরুণ সৃষ্টি হয়। আলোকরশ্মি কোন বস্তুর উপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপর চাপও দেয়। একে আলোকচাপ বলে।

কোন বস্তুর 6 প্রস্থচ্ছেদের উপর আলোক বিকিরিত হয় আর যদি বিকিরণের শক্তি-ঘনত্ব ω হয়, তবে বস্তুর উপর যতখানি কম কাজ করবে, তার পরিমাণ—

$$f_l = \frac{6\omega}{c} \text{ (c = আলোকের গতিবেগ)} \quad \cdots(2)$$

রবার্টসন দেখিয়েছেন যদি কোন কালবস্তু গতিবেগে v_r এবং v_e চলে, তবে বস্তুর উপর বিকিরণ চাপ দুই অংশে বিভক্ত করে দেখা যায়

$$_r = f_l \left(i - \frac{v_r}{e} \right) \quad \cdot(3)$$

এবং

$$f_\theta = -f_l \left(\frac{v_e}{c} \right) \quad \cdot(4)$$

স্পর্শকদিকের অংশটি (4)-কে পয়ন্টিং-রবার্টসন ফল বলে। তাহলে এই ফলটি হচ্ছে সূর্যের বিকিরণ ক্ষেত্রে বস্তুর গতির জন্যে।

বস্তুগুলি যতই ছোট হবে, ততই এই ফলগুলি (টানের তুলনায়) বড় হতে থাকবে। m > 10^5g হলে এই ফল আর কার্যকরী হয় না।

(3) আর একরকম ভরযুক্ত বিচলন ভিস্কো-

সিটি-এর দরুণ সৃষ্টি হয়, তার মানে অন্যান্য বস্তুগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এই বিচলন সৃষ্টি হয়।

(b) $m<10^{-10}$ g—এই ক্ষেত্রে বিকিরণচাপ (Radiation pressure) প্রবল হয়ে ওঠে, সৌর আকর্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তখন ছোট বস্তুগুলির গতিবিদ্যা জটিল হয়ে ওঠে এবং বস্তুর ভর ও তাদের রাসায়নিক গঠনের উপর নির্ভর করে—খুবই সঙ্কটপূর্ণ পথে। আন্তঃসৌরজগতে তাদের জীবনকাল 10^7 সেকেণ্ড থেকেও কম। তারপর তারা জোডিয়াক্যাল আলোক (Zodiacal light) এবং জেগেন্‌স্‌চিন (Gegenschein)-এ জীবনদান করে। জোডিয়াক্যাল আলোক হচ্ছে ক্ষীণ কুয়াসাচ্ছন্ন আলোকের বেল্টবিশেষ, যেটা রবিমার্গের দিকে সূর্য থেকে উত্থিত হয়ে মোচাকৃতি আলোকের মত বিস্তৃত। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সারা বছরই সকাল-সন্ধ্যায় দেখা যায় এবং আকাশ পরিষ্কার থাকলে রবিমার্গের চারদিকে অপ্রশস্ত জোডিয়াক্যাল বেল্টের মত দেখায়। সূর্য বিপরীত দিকে রবিমার্গের উভয়দিকে এই বেল্টটি 10^0 ব্যাস পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়। একেই জেগেন্‌স্‌চিন (বা প্রতিরূপ আলোক) বলে যেটা 1855 সালে প্রথম ধরা পড়ে।

(c) $m<10^{-15}$ g—এই ক্ষেত্রে তড়িচ্চুম্বকীয় বল প্রবল হয়ে ওঠে। তড়িৎক্ষেত্র E, চৌম্বকক্ষেত্র B উপস্থিতিতে ভর m এবং আধান e-সম্পন্ন কোন বস্তু v বেগে চলে, তখন তার উপর যতখানি তড়িচ্চুম্বকীয় বল কাজ করে তা

$$f=e\left(E+\frac{1}{c}v\times B\right) \quad ......(5)$$

(c—আলোকের গতিবেগ)

ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এবং আয়নের ক্ষেত্রেও, তড়িচ্চুম্বকীয় বল যেকোন বল থেকে বেশী হয়ে ওঠে। প্লাজ্‌মার বেলায় ইলেকট্রনের f আয়নের f-এর প্রায় একেবারে বিপরীতমুখী এবং সংখ্যামানে সমান। তার ফলে প্লাজ্‌মায় f-এর মান (5) থেকে ছোট হয়। সুতরাং প্লাজ্‌মার উপর যান্ত্রিক বল, তড়িৎচ্চুম্বকীয় বলের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া আকাশে বস্তুগুলি সাধারণতঃ তড়িৎ-আহিত থাকে। সেখানে দুটি প্রতিযোগী জিনিস কাজ করে। অবস্থা বিশেষে একটা অপরটার তুলনায় প্রবল হয়ে ওঠে। একটি ফটো-তাড়িৎ ফল (Photo-electric effect) এবং অপরটি উভয়ধর্মী-দুইমেরু ব্যাপন (Ambipolar diffusion)। ফটো-তাড়িৎ ফল ধনাত্মক আধান প্রদান করবার প্রবণতা দেখায়। যখন একটা বদ্ধ-পদ্ধতি (Bound system) আহিত কণা ধারণ করে থাকে এবং বেশ উচ্চশক্তিসম্পন্ন কোয়ান্টা দিয়ে আলোড়িত করা হয়, তখন পদ্ধতিটি ভেঙ্গে যাওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকে। এই পদ্ধতিটিকে পরমাণু ক্ষেত্রে ফটো-তাড়িৎ ফল বলে। আর অপরটি অর্থাৎ প্লাজ্‌মা স্থানে উভয়ধর্মী-দুই মেরু ব্যাপন ঋণাত্মক আধান প্রদান করবার প্রবণতা দেখায়। উভয়ধর্মী-দুই মেরু বলতে বোঝায় যে, দুই মেরুতে উভয় ধর্মই প্রকাশ পায় অর্থাৎ তড়িচ্চুম্বকীয় ধর্ম প্রকাশ পায়। এই দুই মেরুগুলির ব্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঋণাত্মক আধান-প্রদান করবার প্রবণতা দেখা দেয়। তার ফলে উপরিউক্ত প্রতিযোগিতায় আমরা যে বস্তুগুলি নিয়ে আলোচনা করছি, তাতে কয়েক পদযুক্ত ভোল্টের আধান পাওয়া যাবে। এখন দানাগুলি যদি কম-ঘনত্বসম্পন্ন প্লাজ্‌মার মধ্যে থাকে এবং সূর্যের আলো খুব কম পায়, তখন ধনাত্মক আধান, আর দানাগুলি যদি বেশ ঘনত্বসম্পন্ন প্লাজ্‌মার মধ্যে থাকে আর সূর্যের অল্প আলো পায়, তখন ঋণাত্মক আধান উৎপন্ন হয়। ধরা যাক ব্যাসার্ধ R এবং ঘনত্ব $\odot$ সম্পন্ন একটা গোলক দানার ভোল্টেজ Vesu (−300V), তাহলে আর

$$\text{আধান } q=RV, \quad ......(6)$$

$$\text{এবং ভর } m=\tfrac{4}{3}\pi\odot R^3 \quad ......(7)$$

m_e ভরসম্পন্ন বস্তুর টান fg-এর অধীন

অতএব,

$$f_g = k\,(m\,M_e/r_e^2) \qquad \ldots\ldots(8)$$

যখন r_e = বস্তুদুটির মধ্যেকার দূরত্ব
k = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

বস্তুটি যদি চৌম্বক ক্ষেত্র B-এ v বেগে চলে, তবে তড়িচ্চুম্বকীয় বল f_m :

$$f_m = q\frac{v}{c}B \qquad \ldots\ldots(9)$$

(c = আলোকের গতিবেগ)।

তাহলে তাদের অনুপাত ∝

$$\propto = \frac{f_m}{f_g} = \frac{3}{4\pi}\,\frac{VB}{\odot}\,\frac{v}{c}\,\frac{r_e^2}{M_e}\,\frac{1}{R^2} \qquad (10)$$

এখন ধরা যাক

$V = \frac{1}{300}$ esu (=IV), $\odot = 3gcm^{-3}$,

$\frac{v}{c} = 10^{-4}$ এবং $\frac{kM_e}{r_e^2} = 1$ cm sec^{-2}

[পৃথিবীর কক্ষের নিকটে সূর্যের টানের জন্যে যে পদের সংখ্যামান হতে পারে]

তখন আমরা পাই

$$\propto = 2{\cdot}5 \times 10^{-8}\,\frac{B}{R^2} \qquad \ldots\ldots(11)$$

$m < 10^{-10}g$ স্তরের ছোট বস্তুগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে সেই অবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী অবস্থা বা পরিবর্তনশীল অবস্থা বলা যায়। তখন প্লাজ্মা ঘনীভবন এবং উপলেপ পদ্ধতিতে আরও বড় বস্তুতে পরিণত হয়। তাহলে তত্ত্বগুলি নীতিগতভাবে ছোট বস্তুগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেগুলি সৌরজগৎ বিবর্তনের ইতিহাস নির্ণয়ে অনেকখানি সাহায্য করবে। তবে কথা হচ্ছে নীতিগুলি বাস্তবে কত দূর সত্য—বলা কঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামান্যই দেওয়া যায় আবার কিছুটা কাল্পনিকও। তাছাড়া এই স্তরের বস্তুগুলির জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী হলে এসব থেকে খুব সামান্যই খবর পাওয়া যাবে।

এখন কথা হচ্ছে ছোট বস্তুগুলির জন্ম হলো কি করে? দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি টুক্‌রাপদ্ধতি (Fragmentation) এবং অপরটি ঘনীভবন ও উপলেপ পদ্ধতি (Condensation and Accretion) :

(1) টুক্‌রা পদ্ধতি—আকাশে এক বা একাধিক বস্তুর সংঘর্ষে টুকরা টুকরা হয়ে এই ছোট বস্তুগুলির জন্ম হয়েছে। সবাই স্বীকার করবেন আকাশে উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন বস্তুগুলির মধ্যে সংঘর্ষ লাগে এবং তারফলে বস্তুগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যেতে পারে। সম্ভবতঃ গ্রহাণুগুলি এক বা একাধিক বস্তুর টুক্‌রা অবস্থা। বস্তুগুলি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে ফেটে পড়েছে অথবা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে গেছে। উল্কাগুলিও সম্ভবতঃ একই পদ্ধতিতে ধূমকেতু এবং সম্ভবতঃ গ্রহাণুপুঞ্জ থেকেও উৎপত্তি হয়েছে।

(2) ঘনীভবন ও উপলেপ পদ্ধতি—মহাকাশে এখনও গ্যাস বা প্লাজ্মা থাকতে পারে অন্ততঃ বিশ্বসৃষ্টির সময় ছিল। এই সব গ্যাস বা প্লাজ্মা ঘনীভূত হয়েও ছোট বস্তুগুলির উৎপত্তি হতে পারে। তারপর উপলেপ পদ্ধতিতে বস্তুগুলি আকারে বড় হয়েছে। এটি অতিক্ষুদ্র গ্রহ প্রকল্পের মূল জিনিস। এখনও বর্তমান পূর্বের দানাগুলি গভীরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে এই পদ্ধতিটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

উপরের দুই-পদ্ধতিতেই যদি ছোট বস্তুগুলির জন্ম হয়ে থাকে, তবে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে কতখানি কোন পদ্ধতিতে হলো? তার উত্তর পেতে হলে (1) তাদের কক্ষপথের বণ্টন ও (2) আয়তন বর্ণালী—এই দুটি বিষয় পাঠের মাধ্যমে এগোতে হবে।

এই তত্ত্বগুলি নীতিগতভাবে ছোট বস্তুতে প্রয়োগ করে তাদের রহস্য বের করা যেতে পারে। তবে বাস্তবে কত দূর সম্ভব হবে, বিশ্বতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কতদূর সাহায্য করবে—সেকথা বলা কঠিন। তবে তার জন্যে গবেষণার কাজ বিন্দুমাত্র শিথিল হবে না।
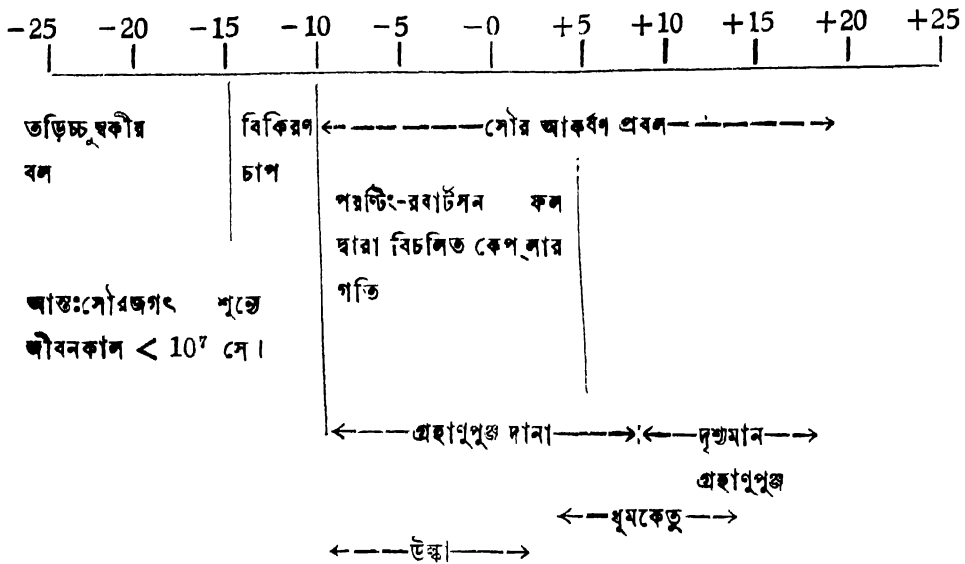
বিভিন্ন ভরসম্পন্ন আন্তঃ-সৌরজগৎ বস্তুগুলির উপর কার্যকরী বল
(চিত্রটি বর্তমান সৌরবিকিরণ ক্ষেত্রসাপেক্ষে)।

সঞ্চয়ন

পোড়া ঘায়ের নিরাময়

অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং তাদের যন্ত্রণা লাঘব করে দ্রুত সুস্থ করে তোলবার জন্য চিকিৎসকেরা নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে চলেছেন। এই রকম একজন চিকিৎসক হলেন ডাঃ ব্রুস জাওয়াকি! ইনি ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্ণিয়ার অধ্যাপক। কিন্তু ডাঃ জাওয়াকি এখনও একটা বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছেন—অগ্নিদগ্ধ রোগীর নিরাময়ের ব্যাপারে প্রাথমিক চিকিৎসাই হলো প্রথম ও প্রধান ব্যবস্থা।

তারপর চিকিৎসককে সেই সব গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, অগ্নিদগ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে যেগুলি দেখা দেবেই, যেমন—তার পুষ্টির সমস্যা এবং অন্য রোগ-জীবাণু সংক্রমণ সম্ভাবনা প্রতিরোধ। অন্য সমস্ত রকম চিকিৎসাগত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অগ্নিদগ্ধ হলে বিপাক-ক্রিয়া বা মেটাবলিজ্‌মের হার খুব বেড়ে যায়।

দেহের পুষ্টির ব্যাপারটা বজায় রাখা বিশেষ একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় এই কারণে যে, খুব বেশীরকম পুড়ে গেলে রোগীর ক্ষুধা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। এমনও হয় যে, রবারের নলের সাহায্যে তরল অবস্থায় প্রোটিন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে জোর করে খাওয়াতে হয়।

চিকিৎসকেরা যখন নিশ্চিন্ত হন যে, রোগী প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে উঠেছে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিবিধান হওয়ায় তার বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, তখনই কেবল

তাঁরা রোগীর ক্ষতের আসল চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

অধ্যাপক জাওয়াকি বলেছেন, এরপর সবচেয়ে বড় সমস্যার ব্যাপার হয় মৃত কোষগুলি অপসারণ করে সেখানে সক্রিয় কোষ বসিয়ে দেওয়া। এই জীবন্ত কোষ বা টিস্যুগুলি সংক্রমণের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে। পুড়ে যাওয়ার পর সংক্রমণের যে সম্ভাবনা থাকে, তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এক চমৎকার সম্ভাবনাময় পদ্ধতি এটি।

শল্যবিদরা যেমন এই পদ্ধতিকে ক্রটিহীন করে তোলবার জন্য চেষ্টা করেছেন, তেমনি সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে অন্যান্য পদ্ধতিও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। রোগীকে প্লাস্টিকের তৈরী তাঁবুর মত ঘেরা জায়গায় রাখা হচ্ছে, বাইরের বাতাস অপসারিত করে জীবাণুমুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে বায়ুবাহিত জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটে। এই সঙ্গে রোগীর দেহে অ্যান্টিসেপটিক ক্রীমের প্রলেপও লাগানো যেতে পারে, যাতে প্রত্যক্ষ স্পর্শ থেকে বাঁচানো যায়।

অপসারিত মৃত কোষকণার জায়গায় বসাবার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর দেহেরই অন্য জায়গা থেকে চামড়ার টুকরো কেটে নেওয়া হয়। ডাঃ জাওয়াকি এমন অনেক অগ্নিদগ্ধ রোগীর চিকিৎসা করেছেন, যাদের দেহের এমন কোন জায়গা প্রায় অবশিষ্ট ছিল না, যেখান থেকে কোন-না-কোন সময়ে চামড়া নিয়ে দেহের অন্য জায়গায় বসাতে হয় নি।

যন্ত্রণা সম্পর্কে ডাঃ জাওয়াকি একটা নতুন কথা শুনিয়েছেন। আমাদের ধারণা বেশী পুড়লে যন্ত্রণাও বেশী হয়। কিন্তু তিনি বলছেন, তা ঠিক নয়। খুব বেশী বা খুব গভীরভাবে পুড়ে গেলে যন্ত্রণা বরং কমই হয়, কারণ স্নায়ুর প্রান্তভাগগুলি পর্যন্ত পুড়ে যায় বলে বেদনার অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। যাদের ক্ষত অল্প হয়, ক্ষতের গভীরতা যাদের কম, যন্ত্রণা বেশী তাদেরই সইতে হয়। ডাঃ জাওয়াকির মতে যন্ত্রণার বেশীর ভাগ কারণ হলো আতঙ্ক, উদ্বেগ, ভয়।

খুব তাড়াতাড়ি মৃত কোষকণার জায়গায় রোগীর নিজের গায়ের ভাল চামড়া লাগিয়ে সংক্রমণ ঠেকাবার কাজে নবতর সাফল্যের সূচনা করবার আশা রাখেন ডাঃ জাওয়াকি। ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্ণিয়ায় যে গবেষণা চলছে, তার বেশীর ভাগটাই এই সম্পর্কে।

ডাঃ জাওয়াকি বলেন, ক্ষতস্থানে অনেকখানি অংশ কেমন করে ঢাকা দেওয়া যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই চামড়ার টুকরাগুলিকে আকারে বাড়াবার ব্যবস্থার উপরই এখন জোর দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদ্ধতি বেশ ব্যাপকভাবেই অনুসরণ করা হচ্ছে। চামড়ার ফালি নিয়ে প্রথমে সেটা একটা যন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয়, তারপর চামড়ার গায়ে খোঁচা মেরে অনেক ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। ফলে টেনে সেটাকে আকারে বাড়ানো যায় এবং ক্ষতস্থানে অনেক বেশী জায়গা ঢাকা দেওয়া যায়। যেমন, মেয়েদের মোজা দেখতে যতখানি, টানলে তার চেয়ে অনেক বড় হয় এবং তখন পায়ের অনেকখানি বেশী জায়গা তা দিয়ে ঢাকতে পারা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করা গেছে অনেক বেশী। সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে ক্ষতস্থান ঢাকবার সমস্যাটা এখন আর কোন বাধাই নয়।

চামড়ার ফালিকে টেনে বাড়ানো ছাড়াও আরও অনেক চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে অন্য আরও অনেক উপায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে কয়েকটি খুবই অদ্ভুত এবং অভিনব। একটা হলো মানুষের চামড়ার কাল্‌চার করা, অর্থাৎ, দেহের বাইরে চামড়াকে গজানো। আগেও মানুষের চামড়ার কাল্‌চার করা হয়েছে, তবে পোড়া ঘায়ের উপর সেগুলি স্থায়ীভাবে

বসানো যায় নি, কারণ সেগুলি কিছুদিন বাদেই নষ্ট হয়ে যায়। তবে সম্প্রতি ডাঃ জাওয়াকি জানিয়েছেন যে, এর একটা সুরাহা সম্ভবতঃ হতে চলেছে।

তিনি বলেছেন, ওহায়োতে একদল গবেষক মানুষের চামড়া কাল্‌চারের এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বলে দেখা যাচ্ছে, যাতে মানুষের চামড়া কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে না, এমন ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, পরে দেহের ক্ষতস্থানে লাগালে তা টিকেও থাকছে। এটা করা হচ্ছে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে। অগ্নিদগ্ধ রোগী হাসপাতালে এলেই তার দেহ থেকে সামান্ত টুক্‌রা টুকরা চামড়া নিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে রোগীকে যখন চাঙ্গা করে তোলা হচ্ছে, তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা চলছে, সংক্রমণ প্রতিরোধ করা হচ্ছে, ওদিকে তখন গৃহপালিত শূকরের জীবাণুমুক্ত চামড়ার ফালির গায়ে রোগীর দেহের সেই একটুকরা চামড়ার কোষ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, আকারে প্রসারিত হচ্ছে। দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে রোগীর দেহের ক্ষতস্থান যখন নতুন চামড়ার কোষকলা গ্রহণের জন্ত তৈরী, ততদিনে সেই টুকরাগুলি মাপে এমন বেড়ে গেছে যে, তার আসল মাপের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী জায়গা এখন ঢাকা যায় সেগুলি দিয়ে।

ডাঃ জাওয়াকি অবশ্য জানিয়েছেন যে, শূকরের চামড়ার উপর মানুষের চামড়া লাগিয়ে কাল্‌চারের এই পদ্ধতিটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। মানুষের দেহে প্রয়োগ করতে এখনও কিছু সময় লাগবে। সংক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত করাই এখন তাঁর প্রধান চিন্তা। তাঁর মতে বাইরে থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনাই অগ্নিদগ্ধ রোগীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ।

জাওয়াকির ভাষায়, 'আমরা মনে করি, পুড়ে গেলে মানুষের যে মৃত্যু হয়, তার প্রধান কারণ সংক্রমণ। মৃত কোষকলার দ্রুত অপসারণ করতে পারলে সংক্রমণ প্রতিরোধের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। আমরা প্রকৃতই বিশ্বাস করি, প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে বেশী কার্যকর, এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল উপায় হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোড়া জায়গাগুলিকে পরিষ্কার করে ফেলা। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি, কি করে আরও তাড়াতাড়ি আরও বেশী জায়গায় পোড়া চামড়া কেটে ফেলে পরিষ্কার করে ফেলা যায়।'

অগ্নিদগ্ধ রোগীর ক্ষেত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ফুসফুসে সংক্রমণ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আগুন নয়, আগুনের সঙ্গে যে ধোঁয়া থাকে, সেটাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

ডাঃ জাওয়াকি বলেছেন—'বিভিন্ন ধরণের ধোঁয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশের ফলে মানুষের যে অসুস্থতা ঘটে, তার প্রতিকার ও চিকিৎসাই আমাদের গবেষণার আর একটা লক্ষ্য।'

বৃহস্পতিগ্রহ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ

পায়োনীয়ার-11 মহাকাশযান বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি এসেছিল পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণের কুড়ি মাস পরে। এই মহাকাশযানটি চালক বা আরোহীবিহীন। বৃহস্পতির মহাকর্ষের প্রভাবে এটি আবার ফিরে আসবে সৌরজগতের বিরাট প্রসারের মধ্যে ছুটে যাবে শনি গ্রহের দিকে। 5ই মহাকাশযানটির শনিগ্রহে পৌঁছবার কথা 1979 সালের 5ই সেপ্টেম্বর।

এর বছরখানেক আগে অনুরূপ আর একটি মহাকাশযান—পায়োনীয়ার-10 বৃহস্পতিগ্রহের গা ঘেঁষে যাবার সময়ে সৌরজগতের বৃহত্তম এই গ্রহটির কাছ থেকে তোলা রঙীন আলোক চিত্র এবং প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠিয়েছিল।

বৃহস্পতি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের অনেক কারণ আছে। প্রথমত, বৃহস্পতিগ্রহের বিপুল আকর্ষণ ও প্রবল তাপমাত্রার জন্য মনে হয় যে, আমাদের এই সৌরজগতের প্রথম সৃষ্টির সময় সেখানে যে ধরণের মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণ ছিল, বৃহস্পতির পর্যাপ্ত উপাদানের মধ্যে আমরা তারই সাদৃশ্যের সন্ধান পাব।

বৃহস্পতি সম্পর্কে আমরা জানতাম এটি হচ্ছে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ, এর আহ্নিক গতি অন্য যে কোন গ্রহের চেয়ে দ্রুত—এক একটা দিনের স্থায়িত্ব দশ ঘণ্টারও কম। এটাও আমাদের জানা ছিল যে, সূর্য থেকে যে তাপ বা শক্তি সে পায়, বিকিরণ করে তার চেয়ে বেশী। বৃহস্পতির চাঁদ বা উপগ্রহের সংখ্যা 12। বিজ্ঞানীরা অনুমান করতেন, বৃহস্পতি-গ্রহের অধিকাংশই, হয়তো বা সবটাই তরল হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী। পায়োনীয়ার-10 যে সব তথ্য পাঠিয়েছে, তা থেকে বিজ্ঞানীদের এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকটা তথ্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃহস্পতির উপরে কোন কঠিন আস্তরণ নেই, আর এর কেন্দ্রস্থলে যদি কিছু থাকে, তা হলে সেটা খুব স্বল্প পরিসর এবং ঘন। আগে ধারণা ছিল যে, বৃহস্পতির আবহাওয়ায় হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া আর হিলিয়াম আছে, সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে পায়োনীয়ার-10-এর প্রেরিত তথ্যাবলী থেকে।

বৃহস্পতিকে ঘিরে প্রশস্ত বলয়াকৃতি বর্ণাঢ্য যে মেঘসম্বলিত আবহবলয় রয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকেই তা দেখে আসছেন, কিন্তু তা রহস্যই রয়ে গেছে। বৃহস্পতির উপরকার এই ঘন মেঘের আবরণের উপর নিশ্চয়ই প্রচণ্ড টান পড়ে। কারণ, এই গ্রহের আহ্নিক গতির বেগ অত্যন্ত বেশী। অথচ আশ্চর্যের কথা, সেখানকার আবহাওয়া বেশ স্থিতিশীল। পায়োনীয়ার-10 কিন্তু এই রহস্য ভেদ করতে পারে নি। এই মহাকাশযান থেকে বৃহস্পতির যেসব আলোকচিত্র তোলা হয়েছে, তার একটিতে সেই বর্তুলাকার জায়গাটি পরিষ্কার দেখা যায়—পৃথিবীর চেয়ে আকারে বড়। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির ডক্টর অ্যানড্রু ইংগারসল মনে করেন, এটা আবহাওয়ার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃহস্পতিতে প্রচণ্ড উত্তাপ। এর আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা হবে সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রার চারগুণেরও বেশী। এই প্রচণ্ড তাপমাত্রার কারণটাও একটা রহস্য। বৃহস্পতির উপরে বা ভিতরে কোথাও থার্মোনিউক্লিয়ার ক্রিয়া ঘটছে না, তাই এই প্রচণ্ড তাপমাত্রার একমাত্র সম্ভাব্য কারণ হতে পারে—নিজস্ব আদি উত্তাপেরই অবশেষ। 450 কোটি বছর আগে সৌরজগৎ সৃষ্টির সময়ে বৃহস্পতি যে উত্তাপ পেয়েছিল, এতদিন বিকিরণের পর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটাই বৃহস্পতিদেহের এই উত্তাপের কারণ। আভ্যন্তরীণ এই তাপমাত্রার তুলনায় তার বাইরের তাপমাত্রা অবশ্য অনেক কম। সেই উত্তপ্ত অভ্যন্তরের কয়েক হাজার কিলোমিটার উপরে মেঘের মাথায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও নীচে।

পায়োনীয়ার-10 উৎক্ষেপণের অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা জানতেন, পৃথিবীর মত বৃহস্পতিরও নিজস্ব একটি চৌম্বক ক্ষেত্র আছে। বিজ্ঞানীরা একথাও জানতেন যে, বৃহস্পতি থেকে শক্তি-কণা বিকিরিত হয়।

পায়োনীয়ার-10-এর তুলনায় আরও বেশী তথ্য পাওয়া যাবে পায়োনীয়ার-17-এর কাছ

থেকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বৃহস্পতির প্রচণ্ড বিকিরণেও পায়োনীয়ার-11 মহাকাশযানের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি হবে না।

পায়োনীয়ার-11-এর পরেও বৃহস্পতির রহস্য সন্ধানে আরও মনুষ্যবিহীন মহাকাশযাত্রার পরিকল্পনা আমেরিকার আছে। 1977 সালে কোন সময়ে মেরিনার শ্রেণীর মহাকাশ পাঠানো হবে বৃহস্পতি অভিমুখে। বৃহস্পতির কাছে পরিক্রমারত একটা মেরিনার অনুসন্ধানী উপগ্রহ স্থাপন করবার পরিকল্পনা করছেন জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা।

উপগ্রহ দূর-সংযোজন প্রসঙ্গে

মৃণালকান্তি সাহা*

'India enters Spce Age'—আর্যভট্ট উৎক্ষেপণের পর একাধিক সংবাদপত্রের শিরোনাম। এই সংবাদে আমরা চমকিত হয়েছিলাম, তার চেয়েও অধিক উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং ভারতবাসী হিসেবে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলাম। ভারত বিজ্ঞান-জগতে আজ আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ভাবতে রোমাঞ্চ বোধ হয় নিত্য নূতন চমকপ্রদ খবরে,—প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি বয়ে আনে বিজ্ঞান জগতে ভারতের বহু আনন্দদায়ক খবর। এই তো কিছুদিন আগের কথা। দেখলাম, ATS-6 (Application Technology Satellite-6) সরে এল ভারতের আকাশে। তারপর এর সাহায্যে প্রথম পর্যায়েই চমকপ্রদ কর্মসূচী উপভোগ করছেন ভারতের বেশ কিছু গ্রামবাসী। কর্মসূচীর মধ্যে আছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ প্রভৃতি। অর্থাৎ কথাগুলির নির্গলিতার্থ হলো, গ্রামের যে মেয়েটি এতদিন হয়তো ছিল শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, ATS-6 তার চোখের সামনে থেকে নিরক্ষরতার কালো পর্দাটিকে সরিয়ে দেবার জন্যে অভিনব প্রয়াস সুরু করে দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে এসব কল্যাণকর কার্যসূচী নূতন দিনের বার্তাবহ।

এবার অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার, বহু আগেই মহাকাশযুগে ভারতের প্রবেশাধিকার সম্ভব হয়েছে। আর্যভট্ট উৎক্ষেপণ একটি পূর্ণতার আভাস। পরলোকগত ডক্টর বিক্রম সরাভাইয়ের নেতৃত্বে বেশ কয়েক বছর আগেই মহাকাশ-বিজ্ঞানে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয় ও উপগ্রহ দূর-সংযোজন (Tele-communication) ব্যবস্থায় ভারত অংশগ্রহণ করে। তদানীন্তন ভারতীয় মহাকাশ-বিজ্ঞানের পুরোধা হিসেবে তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিস ও ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জির যৌথ প্রচেষ্টায় পুণার অদূরে আরভিতে গড়ে ওঠে ভারতের প্রথম উপগ্রহ ভূ কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এর রূপকারের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর গিরি 'বিক্রম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র' নামকরণ করে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এটি এখন ভারতের গর্ব এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্দের মুন্সিয়ানার দ্যোতক। এরই মাধ্যমে ভারত বর্তমানে পৃথিবীর অত্যাধুনিক সংযোজন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছে। সুখের বিষয় দেরাদুনে ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র নির্মাণের দায়িত্বভার সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হয়েছে

*ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিস, আন্তর্জাতিক বেতার প্রেরক কেন্দ্র, হালিশহর, 24 পরগণা।

আমাদের ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিসের উপর এবং এটি সমাপ্তপ্রায়। সম্প্রতি যোগাযোগ মন্ত্রকের সেক্রেটারী শ্রী এস. ডি. শেনয় ঘোষণা করেছেন যে, দেরাদুনের ভূ-কেন্দ্র চালু হবে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, দ্বিতীয় ভূ-কেন্দ্রটি পুরাপুরি মাত্রায় উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থার মানচিত্রে ভারতের স্থান আরো স্পষ্টতর হবে এবং সাধারণ জনসাধারণ থেকে সুরু করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা দপ্তর প্রভৃতি আরো বেশী উপকৃত হবে। যা হোক এখানে আমরা উপগ্রহ দূর-সংযোজনের প্রাসঙ্গিক দিকগুলি নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করবো।

মাইক্রোওয়েভের সুবিধা

প্রচলিত দূর পাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাধারণতঃ উচ্চ-কম্পাঙ্কের (3-30 Mc/s) বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। ট্র্যান্সমিটার (Transmitter) বা প্রেরক-যন্ত্র থেকে উপযোগী এরিয়াল বা অ্যান্টেনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোণে নত করে উচ্চ-কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ তাক করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তারপর তা আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে (Receiver) ধরা পড়ে। এই পদ্ধতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা নানা কারণে ব্যাহত হতে পারে এবং হয়। কারণ দিনরাত্রির তারতম্যে এবং ঋতুভেদে আয়নমণ্ডলের গতি-প্রকৃতি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতারও অনেক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া সূর্যকলঙ্ক (Sunspot), সৌরপ্রভা (Solar flare), চৌম্বক ঝড় (Magnetic storm) আয়নমণ্ডলের ঝড় (Ionospheric storm) প্রভৃতির দ্বারাও আয়নমণ্ডল ভীষণভাবে প্রভাবিত, অর্থাৎ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আয়নমণ্ডলের উপস্থিতি যেমন বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল রাখে, তেমনি এর ব্যবহার-বৈচিত্র্যের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্তও হতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, শীতের রাতে অনেক সময় অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আমরা অতিমাত্রায় প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক হয়ে অসহায় বোধ করি।

উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় আমরা উচ্চ-কম্পাঙ্কের তরঙ্গের পরিবর্তে 'মাইক্রোওয়েভ' বা অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকি। আমরা জানি, সাধারণতঃ কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 1000 মেগাসাইকেলের বেশী হলে তাকে মাইক্রোওয়েভ বা অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ বলা হয়; তখন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ·3 সে. মি.-এর কম হয় ($c = \nu\gamma$)। যা হোক, মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে পূর্ববর্নিত অসুবিধাগুলি উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। এছাড়া মাইক্রোওয়েভের ব্যবহারে কয়েকটি বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে, যা ছিল পূর্বে নিতান্তই অভাবিত। সে সম্পর্কে নীচে সামান্য আলোকপাত করছি।

(ক) সাধারণতঃ ছায়াপথের কিছু বিশেষ অংশের জন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত গোলমালের (Noise) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 1-10 GHZ কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করলে এই প্রকার গোলমাল বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাছাড়া মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের শোষণও ততটা অনুভূত হয় না। শুধুমাত্র অক্সিজেন অণু ও জলীয় বাষ্পের জন্যে মাইক্রোওয়েভের শক্তির খানিকটা হ্রাস ঘটে।

(খ) ভূ-কেন্দ্র থেকে উপগ্রহের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া মাইক্রোওয়েভ বা উপগ্রহ থেকে ভূ-কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মাইক্রোওয়েভ আয়নমণ্ডলের দ্বারা খুব সামান্যই শোষিত বা প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ আয়নমণ্ডল মাইক্রোওয়েভের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক নয়। তাছাড়া, ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ও (Van Allen Radiation Belt) মাইক্রোওয়েভের চলাচল ব্যাহত করতে পারে না।

(গ) ক্ষুদ্র তরঙ্গে পটি-বর্ণালি (Band

spectrum) অসংখ্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে কোন রকম বিস্তৃত পটির (Broad band) কাজ করবার ক্ষেত্র ক্রমশঃই সীমিত হয়ে আসছে। বস্তুতঃ, I. F. R. B (International Frequency Registration Board)-এর পক্ষে আজকাল এরূপ অনুমোদন দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া যে কোন রকমের প্রেরণ-কার্যে অনুমোদিত পটি থেকে কোন কারণে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে তক্ষুণি অন্য কোন নিকটবর্তী কম্পাঙ্কের রিসেপশন (Reception) বা গ্রহণের কাজ ব্যাহত হয়, অনতিবিলম্বে অভিযোগ আসে এবং আইনলঙ্ঘনকারী সংস্থাকে কৈফিয়ত দিতে হয়। তবে মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত এরকম সম্ভাবনা তেমন অনুভূত হয় নি। তাই এই ব্যবস্থায় অনেক বেশী ব্রড-ব্যাণ্ড কমিউনিকেশন বা বিস্তৃত পটি সংযোজন কাজ সম্ভব।

(ঘ) উপগ্রহ সংযোজন ব্যবস্থায় মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে অ্যানটেনা গেন (Antenna gain) অনেক বেশী হয়। ডিশ অ্যানটেনার (Dish antenna) ক্ষেত্রে গেন (Gain) ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সূত্রবদ্ধ রূপ :

$$G-\frac{4\pi D}{}$$

এখানে G—গেন (Gain)
D—ডিশ অ্যানটেনার ব্যাস,
λ—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণে দেখা যাচ্ছে অ্যানটেনা গেন ডিশের ব্যাসের সঙ্গে সরল সমানুপাতী ও কম্পাঙ্কের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতী। অতএব এটি স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে অনেক বেশী গেন পাওয়া যায়। আবার কম্পাঙ্ককে সীমিত রেখে গেন বৃদ্ধি করতে হলে ডিশের ব্যাস বিরাট পরিমাপের হবে। সহজবোধ্য কারণে এটি অনেকটা অসম্ভব। তাছাড়া, অস্বাভাবিক আকারের ডিশ অ্যানটেনাকে প্রয়োজনবোধে সহজভাবে ঘোরানো (Steer) অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্পুটনিক থেকে ইনটেলসাট

আজ ইনটেলসাট (Intelsat) সিরিজের উপগ্রহগুলি আমাদের দূরপাল্লার সংযোজন-ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। কিন্তু আজকের এই ইনটেলসাট অনেক বিবর্তনের ফল। এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় স্পুটনিককে (Sputnik)—পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। স্পুটনিকের উৎক্ষেপণ মানবেতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির এক চরম সোপান। বাস্তবিক পক্ষে স্পুটনিকের সাফল্য বিশ্বের দূরপাল্লার যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। আবার একাদিক্রমে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এই সকল কৃত্রিম উপগ্রহের উদ্দেশ্য বিবিধ এবং প্রত্যেক উপগ্রহ তার নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করে চলে তবে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটগুলিকে মোটামুটি দু-ভাবে বিশেষায়িত করা যায়—অ্যাকটিভ স্যাটেলাইট (Active Satellite) ও প্যাসিভ স্যাটেলাইট (Passive Satellite)। অ্যাকটিভ স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে ভূ-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সিগ্ন্যালের (Signal) শক্তি স্যাটেলাইটের মধ্যে ইলেকট্রনিক উপায়ে পরিবর্ধন করা হয় এবং তারপর তা গ্রাহক ভূ-কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। প্যাসিভ স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবস্থাটা ভিন্নরূপ। এক্ষেত্রে প্রেরক ভূ-কেন্দ্র থেকে নির্গত সিগ্ন্যালের কিছুটা অংশে উপগ্রহ থেকে ভূ-কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে পুনঃসঞ্চারণ করা হয়। তবে দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় কার্যকারিতার নিরিখে অ্যাকটিভ স্যাটেলাইটের উপযোগিতা অনেক বেশী।

অ্যাকটিভ স্যাটেলাইটের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য স্কোর (Score), কুরিয়ার (Courier),

টেলস্টার (Telstar), রিলে (Relay), আরলি বার্ড (Early bird) বা ইনটেলসাট-I (Intelsat-I), মলনিয়া (Molniya), ব্লু বার্ড (Blue bird) বা ইনটেলসাট-II, ইনটেলসাট-III, ইনটেলসাট-IV, ইত্যাদি। আবার ইকো-I (Echo-I), ইকো-II প্যাসিভ স্যাটেলাইটের গোষ্ঠীভুক্ত। এদের উৎক্ষেপণকাল ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে চমৎকার একটি ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটির কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবুও পুনরায় উল্লেখ করছি কার্যক্রমের বিভিন্নতা অথচ ধারাবাহিকতা ও তাদের সফল রূপায়ণের মধ্যেই নিহিত আছে আজকের সাফল্যমণ্ডিত উপগ্রহ দূর-সংযোজন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্কোর ('58), কুরিয়ার ('60), টেলস্টার ('62), রিলে ('62) অসমলয় উপগ্রহ এবং এদের কক্ষপথের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। এদের মধ্যে টেলস্টার প্রথম বিস্তৃত-পটি সংযোজন উপগ্রহ। এটার সাহায্যেই প্রথম অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে টেলিভিসন কার্যসূচী সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে। রিলে একটি পরীক্ষামূলক সংযোজন উপগ্রহ। মহাকাশের ভিন্নতর পরিবেশে মূল্যবান যন্ত্রপাতির উপযোগিতা যাচাই করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সিনকম, ইনটেলসাট (I/II/III/IV) প্রভৃতি সমলয় উপগ্রহ এবং এদের কক্ষপথের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বেশী। 1965 সালের 6ই এপ্রিল অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপরে কক্ষপথে স্থাপিত আর্লি বার্ড বা ইনটেলসাট-1-এর সাফল্যমণ্ডিত উৎক্ষেপণ দূর-সংযোজন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আশার আলো সঞ্চার করে। প্রত্যেকটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর তার সাফল্য-অসাফল্যের নিখুঁত পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। এরই ফলে আজকের দূর-সংযোজন ব্যবস্থা অতিমাত্রায় আধুনিক ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সামগ্রিক উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় আজকের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা 99·9999% নিখুঁতত্ব উপহার দিতে পেরেছেন, সন্দেহ নেই।

কক্ষপথ সময়কাল সম্পর্ক

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি নির্বাচিত গতিপথে আবর্তন করে, যার নাম অর্বিট (Orbit) বা কক্ষপথ। কক্ষপথ ও পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা এই দুয়ের সঠিক ও সূক্ষ্ম নিরূপণ একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ এদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে কার্যক্রমের সঠিক ও সফল রূপায়ণ। আবার কক্ষপথের সঙ্গে আবর্তনকাল নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেপলারের সূত্র :

$$T \propto H^{3/2},$$

এখানে T=উপগ্রহে আবর্তনকাল

H=পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কক্ষপথের উচ্চতা।

অর্থাৎ কক্ষপথের উচ্চতা কম হলে আবর্তনকালও কম হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য উপগ্রহটি দুটি ভূ-কেন্দ্রের কাছে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য দৃষ্টিগোচর হবে। বিপরীতপক্ষে, কক্ষপথের উচ্চতা বেশী হলে আবর্তনকাল ও দুট ভূ-কেন্দ্রের কাছে দৃষ্ট সমীকরণ বেড়ে যাবে। নিখুঁত গণনা ও পরীক্ষার পর দেখা গেছে, মোটামুটিভাবে (T 36,540 কিলোমিটার উচ্চ কক্ষপথে পরিক্রমণরত উপগ্রহের আবর্তনকাল 24 ঘণ্টা অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্তনের সমান। এইরূপ কক্ষপথে স্থাপিত উপগ্রহগুলিকে পৃথিবীর সাপেক্ষে নিশ্চল মনে হয়। তাই এদের বিকল্প অভিধা—'জিওস্টেশনারী স্যাটেলাইট (Geostationary Satellite) বা ভূ-স্থির উপগ্রহ।

সমলয় ও অসমলয় উপগ্রহ

পর্যবেক্ষক মহল বলেন, ঠিক এই মুহূর্তে মহাকাশে আড়াই হাজারেরও বেশী কৃত্রিম উপগ্রহ

বিভিন্ন কক্ষপথ পরিক্রমা করে চলেছে। এদের বিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে গোয়েন্দাগিরি, মহাকাশ গবেষণা, আবহওয়ার পূর্বাভাস, শিক্ষা-প্রসার, দূরপাল্লার যোগাযোগ প্রভৃতি। যাহোক, কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে আবর্তনকালের ভিত্তিতে খুব সহজেই দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সিনক্রোনাস স্যাটেলাইট (Synchronous Satellite) বা সমলয় উপগ্রহ এবং অ্যাসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট (Asynchronous Satellite) বা অসমলয় উপগ্রহ।

সমলয় বা ভূস্থির উপগ্রহ—পরিভাষা থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যায়। সমলয় কারণ এদের ও পৃথিবীর আবর্তনকাল সমান। আবার পৃথিবীর সাপেক্ষে এদের আপেক্ষিক গতিবেগ শূন্য—ভূস্থির। যদিও এরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 35,540 কিলোমিটার উপরে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণরত, তবুও পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে এদের নিশ্চল মনে হয়। এবার একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে উপগ্রহের যে অংশ দৃষ্টিগোচর হবে, ঠিক এক মাস পরেও সেই অংশই দৃষ্টিগোচর হবে, এর কোন হেরফের হবে না। যে সকল উপগ্রহ অন্য উচ্চতার কক্ষপথে পরিক্রমা করে তাদের আবর্তনকাল ভিন্ন। সেক্ষেত্রে পৃথিবী ও উপগ্রহের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ বর্তমান থাকে। এইরূপ অবস্থায় দুটি ভূ-কেন্দ্রের পক্ষে একটি উপগ্রহ সবসময়ের জন্যে দৃষ্টিগোচর হবে না। তাই তাদের পরিচয়—অ্যাসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট বা অসমলয় উপগ্রহ।

এক্ষেত্রে বলা বিশেষ প্রয়োজন, উপগ্রহ দূর-সংযোজনের ক্ষেত্রে সমলয় সর্ত পালিত হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। সমলয় উপগ্রহ ব্যবহারের ফলে অনেকগুলি বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়, যা অন্য ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

দূর-সংযোজনের ক্ষেত্রে আমাদের মূল লক্ষ্য হোক সারাদিন সংযোজন ব্যবস্থাকে সজীব রাখা এবং এই ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে হলে উপগ্রহকে যোগাযোগকামী দুটি ভূ-কেন্দ্রের কাছে সবসময় গোচরীভূত থাকা দরকার। কক্ষপথের অবস্থান, আবর্তনকাল, ভূ-কেন্দ্রগুলির দূরত্ব প্রভৃতির
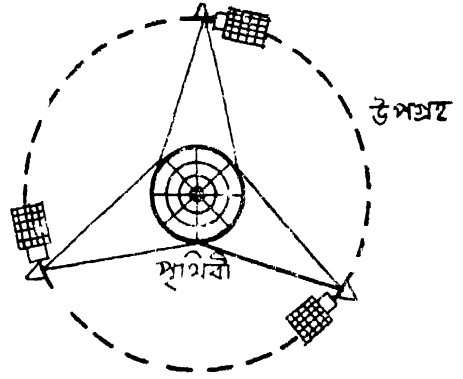
1নং চিত্র। সমলয় কক্ষপথে তিনটি উপগ্রহ

সূক্ষ্ম গণনায় দেখা গেছে যে, সমলয় উপগ্রহগুলির ক্ষেত্রে মাত্র তিনটি উপগ্রহ সারা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সবসময়ের জন্যে সচল রাখতে সক্ষম।

ভূ-কেন্দ্র অ্যানটেনা

সংযোজনের যে কোন শাখার সঙ্গে অ্যানটেনা কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কার্যক্ষেত্রের বিভিন্নতা ও প্রয়োজনের রকমফেরে অ্যানটেনারও, আকার ও প্রকৃতির রকমফের হয়ে থাকে। যেমন—পোর্টেবল ট্রানজিস্টরের ছোট, শীর্ণকায় ও হাল্কা অ্যানটেনার সঙ্গে ভূ-কেন্দ্রের দৈত্যাকার কয়েক শ' টন ওজনের ডিশ অ্যানটেনার আমূল তফাৎ। যাহোক, এখানে সব রকম অ্যানটেনার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। তাই, উপগ্রহ দূর-সংযোজনের ক্ষেত্রে ভূ-কেন্দ্রে প্রচলিত ডিশ অ্যানটেনাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে।

উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের মূল অ্যানটেনা—এবার

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বলি—ভূ-কেন্দ্রের ফিগার অব মেরিট (Figure of merit) ডিশ অ্যানটেনা। আসলে কথাটির মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। কারণ, ডিশ অ্যানটেনা ভূ-কেন্দ্রের প্রেরণ ও গ্রহণ—উভয় কাজই সমাধা করে থাকে অর্থাৎ, ডিশ অ্যানটেনা যেমন ভূ-কেন্দ্রের প্রেরক ব্যবস্থা থেকে সিগন্যালগুলিকে উপগ্রহের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে
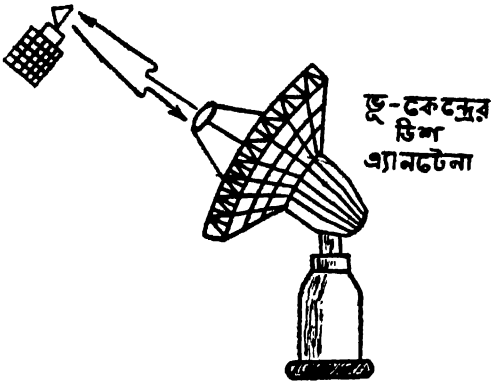
2নং চিত্র। উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থা

দেয়, তেমনি আবার উপগ্রহ থেকে প্রেরিত সিগন্যালগুলিকে গ্রহণ করে ভূ-কেন্দ্রের গ্রাহক ব্যবস্থার দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই দ্বৈত ব্যবস্থা প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী ও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে।

সাধারণভাবে যে কোন ভূ-কেন্দ্রের গুণাবলীর মূল মাপকাঠিটি প্রধানতঃ অ্যানটেনার একটি বিশেষ ধর্ম—দিগদর্শিতার বৈশিষ্ট্যের (Directional characteristics) উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ অ্যানটেনার এই বৈশিষ্ট্যের মাত্রা যদি খুব উচ্চমানের হয়, তবে খুব ক্ষীণ সিগন্যালও অনেক সময় কার্যকরী থাকে। আবার, এই নিরিখে বিচার করলে অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক (Parabolic reflector) টাইপের ডিশ অ্যানটেনা ব্যবহার করাই শ্রেয় এবং এটিই বহুলপ্রচলিত। এক্ষেত্রে অ্যানটেনা গেন বেশী হয় এবং মূল সংযোজন ব্যবস্থার সক্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণতঃ এই প্রকার ডিশ অ্যানটেনাগুলিকে প্রয়োজনবোধে খুব সহজেই ঘোরাবার (Steer) ব্যবস্থা থাকে। এই ঘূর্ণনক্ষম অ্যানটেনার প্রয়োজনীয়তা খুব সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর সাপেক্ষে সংযোজন উপগ্রহগুলি সচল বা নিশ্চল হতে পারে। আবার সমলয় কক্ষপথে থাকলেও নানা কারণে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। কিন্তু সচল সংযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যে অ্যানটেনাকে সর্বদা উপগ্রহের অভিমুখী হতে হবে। তাছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দিনে অ্যানটেনাকে সুরক্ষিত রাখতে উর্ধ্বমুখী করে রাখা প্রয়োজন। তাই অ্যানটেনাকে দৃশ্য উপগোলকে সম্পূর্ণভাবে ঘোরাবার জন্যে প্রতিফলন ব্যবস্থাকে অনুভূমিক (Horizontal) ও দিগংশ (Azimuth)—এই দুটি অক্ষের উপর স্থাপন করা হয়। এই ঘোরাবার কাজ সূক্ষ্ম সারভো-ব্যবস্থার (Servo mechanism) মাধ্যমে নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

এবার বাহুল্যবোধ হলেও আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। আয়নমণ্ডলের মাধ্যমে উচ্চ কম্পাঙ্কের দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় প্রেরণ বা গ্রহণ কাজের জন্যে অসংখ্য অ্যানটেনার প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে, দিবারাত্রির তারতম্যে, ঋতুভেদে ও নানারকম প্রাকৃতিক কারণে আয়নমণ্ডলের ধর্মের পরিবর্তন ঘটে এবং উচ্চতারও প্রচণ্ড হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাই দুটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সংযোজনের প্রয়োজনে প্রেরণ ও গ্রহণ—উভয়বিধ কাজের জন্যে বেশ কিছু করে কম্পাঙ্ক ও তদনুযায়ী অ্যানটেনারও প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু উপগ্রহ দূর-সংযোজনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না; কারণ দৈত্যাকার ডিশ অ্যানটেনাই সব অ্যানটেনার কাজ করতে সক্ষম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কার্যকারিতার নিরিখে

আমাদের আরভি ভূ-কেন্দ্রের ডিশ অ্যানটেনা অতীব উচ্চমানের। গর্বের বিষয়, এটি গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রয়াসে অর্থাৎ এটি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উন্নত মেধা ও কর্মপ্রয়াসের এক অনন্ত উদাহরণ।

টি. টি. সি. (T. T. C)

সংক্ষেপিত বয়ান টি. টি. সি এবং এভাবেই কথাটি কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ণ পরিচয়- ট্র্যাকিং (Tracking), টেলিমেট্রি (Telemetry) ও কমাণ্ড (Command)। মনে রাখা দরকার, টি. টি. সি হলো উপগ্রহের মূল কার্যধারার প্রাণ, অর্থাৎ সবকিছু সঞ্জীবিত রাখবার পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। টি. টি. সি সাধারণতঃ ভূ-কেন্দ্র থেকে করা হয়ে থাকে।

মূল যান (Launch vehicle) থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর উপগ্রহের গতিপথকে নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করবার জন্যে ট্র্যাকিংয়ের প্রয়োজন। এর তথ্যাবলীর মধ্যে মূলতঃ থাকে যানের গতিবেগ, দূরত্ব ও কৌণিক অবস্থান।

টেলিমেট্রি বা দূরমিতি বলতে সাধারণতঃ দু-রকম তথ্যের পরিমাপ বোঝায়। এক—যানের অবস্থাসংক্রান্ত পরিমাপ, দুই—পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ প্রথমোক্ত পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত হলো তাপমাত্রা, চাপ, শক্তি সরবরাহ, সাবসিস্টেম-গুলির (Subsystems) রুটিনমাফিক পাঠ ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক কার্যসূচী উপগ্রহভেদে রকমফের হয়ে থাকে। যেমন, গবেষণামূলক উপগ্রহের ক্ষেত্রে সোলার প্লাজ্মার রহস্যোদ্ধার, মহাজাগতিক রশ্মির পর্যবেক্ষণ, আয়োনোস্ফিয়ারের ব্যবহার-বৈচিত্র্য, চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

কমাণ্ড বা নির্দেশন—কক্ষপথে স্থাপন করবার পর যানকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করবার জন্যে অবিরত নির্দেশ দেওয়া দরকার। নিয়মমাফিক কার্য সম্পাদনের জন্যেও কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া, অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের উপস্থিতিতে কার্যক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের প্রয়োজনেও কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন হয়। এই নির্দেশ সাধারণতঃ পাল্স্ কোডের (Pulse code) সাহায্যে উপগ্রহে প্রেরিত হয়ে থাকে এবং উপগ্রহগুলি ভূ-কেন্দ্র থেকে কমাণ্ড পাবার পর সেই ব্যবহার করে।

কমিউনিকেশন বা সংযোজন উপগ্রহের ক্ষেত্রেও টি. টি. সি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এবার উপগ্রহের ক্ষেত্রে টি. টি. সি-র জন্যে কমিউনিকেশন ছাড়াও বিকন (Beacon) সিগ্ন্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এর কম্পাঙ্ক আলাদা। মহাকাশে পরিক্রমারত অসংখ্য উপগ্রহের টি. টি. সি. বিভিন্ন ভূ-কেন্দ্র থেকে করা হচ্ছে। যেমন—ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্টের টি. টি সি হচ্ছে মূলতঃ মস্কোর বিয়ার্স লেক ও ভারতের শ্রীহরিকোটা থেকে। তেমনি ইনটেলসাট সিরিজের উপগ্রহগুলির টি. টি. সি চারটি নির্দিষ্ট ভূ-কেন্দ্র অ্যানডোভার (মেল্যাণ্ড ইউ. এস. এ), পাউমালু (হাওয়াই, ইউ. এস. এ), ফুসিনো (ইটালী) ও কারনারভন (অষ্ট্রেলিয়া) থেকে হচ্ছে।

সংযোজনে কম্পিউটার

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রায় সব শাখাতেই কম্পিউটার এক বিরাট হাতিয়ার। সুষ্ঠু ও নিয়মানুগ পদ্ধতিতে ও অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে যে কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করবার জন্যে কম্পিউটার অন্যতম সহায়ক। দ্রুত পরিবর্তনশীল কারিগরীজগতে টেলি-কমিউনিকেশন বা দূর-সংযোজন শাখাতেও আধুনিকতার ছাপ প্রকট। যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে এই শাখাতেও কম্পিউটার প্রবেশ করেছে। উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন কম্পিউটার ডাটা

(Computer data) আদান-প্রদান ত্বরান্বিত হচ্ছে, তেমনি কম্পিউটার এই শাখার জটিল কার্যক্রমকে অনেক বেশী উৎকর্ষের সঙ্গে সম্পাদনে সহায়তা করছে। শুধুমাত্র সিগ্ন্যাল সংরক্ষণ বা সুইচিং সার্কিটের নিয়ন্ত্রণই নয়, সামগ্রিকভাবে এই শাখার প্রতিটি বিভাগেই কম্পিউটারের প্রবেশাধিকার। এর ব্যবহারের ফলে সিগ্ন্যাল আদান-প্রদানের অস্বাভাবিক দ্রুততা বাড়বে, যা প্রচলিত ব্যবস্থায় কখনো ভাবা যায় না। তাছাড়া স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিল তৈরী, যন্ত্রপাতি রুটিন পরীক্ষা, ত্রুটি নিরূপণ ও তার সংশোধন ব্যবস্থা অনেক বেশী সুষ্ঠুভাবে ও স্বল্প সময়ে করা সম্ভব। এছাড়াও কম্পিউটার ব্যবহারে আন্তর্জাতিক সার্কিটে টেলিফোন, টেলেক্স্ প্রভৃতির সহায়ক হিসাবে কোন অপারেটারের প্রয়োজন হবে না। কম্পিউটার সংযোগসাধন হবার সঙ্গে সঙ্গে দু-প্রান্তের মানুষ তাদের মধ্যে সার্থক সংযোগ গড়ে তুলতে পারবেন। আরেকটি কথা বলা যেতে পারে—উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় কম্পিউটার অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক দিগন্ত খুলে দেবে। এমনি করে সময় সংক্ষেপের ফলে দূরত্বের ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে হতে পৃথিবী আমাদের কাছে অনেক বেশী ছোট অনুভূত হবে। আশীর দশকের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে—প্রত্যয় নিয়ে বলা যায়।

উপসংহার

আজকের উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থা অনেক বিবর্তনের ফল। এই বিবর্তনের গোড়ার চিত্রে ছিল রানার, অশ্বারোহী, পায়রা প্রভৃতি। তারপর ক্রমবিকাশের সূচক বহ্ন্যুৎসব, বাদ্যবাজনা, রং-বেরঙের বাহারী পতাকা নাড়ানো প্রভৃতি। তবে আধুনিক সংযোজন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে হার্জের (Hertz) সেই যুগান্তকারী পরীক্ষার মধ্যে। তাঁর পরীক্ষার সার্বিক মূল্যায়ন করতেই যেন পাদপ্রদীপের সামনে এগিয়ে এলেন গ্রাহাম বেল ও স্যামুয়েল মোর্স! এখান থেকেই ক্রমোন্নতির সোপান, সর্বশেষ চিত্র—উপগ্রহ দূর-সংযোজন ব্যবস্থা।

[বর্তমান লেখক লেখার ব্যাপারে উৎসাহদানের জন্যে নিজ সংস্থা ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিসের কলকাতা কেন্দ্রের Shri A. S. Khadilker, Director (CB) এবং Shri G A. Patil, E/C (TRS)-এর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।]

বিজ্ঞান-সংবাদ

অভিনব পন্থায় দুধ সংরক্ষণ

দুধ সংরক্ষণ ও দূরস্থানে প্রেরণের জন্যে এখন আর রেফ্রিজারেটরের সাহায্যে হিমায়িতকরণের প্রয়োজন হবে না।

দুধ সংরক্ষণ ও জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে সাধারণতঃ পাস্তুর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে গরুর বাঁট থেকে দুধ দোহনের পরই যত শীঘ্র সম্ভব সেই দুধ উচ্চ তাপে স্বল্পকালের জন্যে উত্তপ্ত করা হয়। দুধে যেটুকু জীবাণু থাকবার সম্ভাবনা থাকে, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে। কিন্তু এতেও অনেক সময় কিছু জীবাণু জীবিত থাকতে পারে। একমাত্র ষ্টেরিলাইজেশন বা নির্বীজন পদ্ধতিতেই সেই জীবাণু ধ্বংস করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে দুধকে আরও উচ্চ তাপ দিয়ে উত্তপ্ত করা হয়।

স্টেরিলাইজ করা দুধ নিরাপদ হতে পারে, কিন্তু এর স্বাদ দুধের মত নয়। তাই পাস্তুরাইজ করা দুধকে আবার হিমায়িত করা হয়, যাতে জীবিত ব্যাক্টিরিয়ার জন্যে ঐ দুধ টক্ হয়ে না যায়। কিন্তু হিমায়ণ পদ্ধতিটি খরচসাপেক্ষ। এজন্যে অনেক বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যয় হয় এবং এই পদ্ধতিতে দুধকে প্রসেসিং কারখানায় এবং সেখান থেকে রক্ষণাগারের মধ্যে এবং গৃহস্থের রান্নাঘরে পর্যন্ত ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে জটিল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হয়।

নতুন পদ্ধতিতে আর দুধ হিমায়িতকরণের প্রয়োজন হবে না। এই প্রক্রিয়ায় একটি এনজাইমের সাহায্যে দুধে তাজা স্বাদ বজায় রাখা হয়। এই এনজাইমটি একটি রাসায়নিক পদার্থ। এর আগে অবশ্য ঐ দুধকে অতি উচ্চ তাপে ষ্টেরিলাইজ করা হয়। উত্তর ক্যারোলিনা ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হ্যারল্ড সোয়াইসগুড ইউ. এস. ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে এই নতুন প্রক্রিয়াটি উদ্ভাবন করেছেন।

এনজাইমটির নাম সালফাইড্রিল অক্সিডেস মাত্র আট বছর আগে কাঁচা দুধের মধ্যে এই এনজাইমট আবিষ্কৃত হয়। ডক্টর সোয়াইসগুড ও তাঁর সহকর্মীরা এই এনজাইমটি পৃথক করেছেন এবং এর সাহায্যে ষ্টেরিলাইজ করা দুধের স্বাভাবিক সুগন্ধ ফিরিয়ে আনবার একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় দুধের মধ্যে বাইরের কোন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয় না। দুধটি একই থাকে, কেবল এর স্বাদ আরও ভাল হয়।

ডক্টর সোয়াইসগুড অনুমান করেন, পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে হিমায়ণের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাজা দুধ দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেছেন যে, পাত্রের মুখ না খোলা পর্যন্ত এই দুধ রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয় না, কারণ যে সমস্ত জীবাণু দুধকে নষ্ট করে, তা আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও আবহাওয়া-বেলুন

ভারতে বর্ষা ঋতুর প্রভাব কি রূপ হবে? মেরুতুষার গ্রীণল্যাণ্ডের উপকূল থেকে কোন্ দিকে সরে আসছে? এই ধরণের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলেছে।

নিমবাস-6 এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত রয়েছে। নিমবাস-6 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থার নবতম কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি অতি আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিসমন্বিত আবহ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা-উপগ্রহ। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি

পৃথিবী থেকে সহস্রাধিক কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থান করে উত্তর দক্ষিণ মেরু কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ভূপৃষ্ঠের অনেক কাছে পৃথিবীকে ঘিরে বিরাজ করছে প্রায় এক হাজারটি বেলুন। এই বেলুনগুলি নানা যন্ত্রপাতি সমন্বিত এবং এরা নিমবাস-6 কৃত্রিম উপগ্রহটির মারফৎ অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, ক্যানাডা, ফ্রান্স, নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত গবেষণা-কর্মীদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। এই পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্যে রূপায়িত হলে দক্ষিণ মেরু, ভারত মহাসাগর, আফ্রিকা, সামোয়া এবং উত্তর মেরু প্রভৃতি দূরদেশ থেকেও মেরু প্রদেশ ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের আবহাওয়া এবং মহাসাগর ও তুষারের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিজ্ঞানীদের হাতে এসে পৌঁছুবে।

পরীক্ষার একটি অংশ হলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বলয়ের আবহাওয়া পর্যালোচনা করা। এজন্যে সামোয়া, ঘানা এবং দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকের অ্যাসেনসান দ্বীপ থেকে চার শতাধিক বেলুন ছাড়া হয়েছে। এই বেলুনগুলি ভূপৃষ্ঠ থেকে 14 কিলোমিটার উর্ধ্বে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং নিমবাস-6 তার পরিক্রমার পথে যখনই এদের সম্মুখীন হচ্ছে, এরা তখনই ঐ কৃত্রিম উপগ্রহটির নিকট তথ্য প্রদান করছে।

জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী ভারত মহাসাগরের সেকেলেস দ্বীপ থেকে 50টি বেলুন ছেড়েছেন। এগুলি বেশী উঁচুতে তোলা হয় নি। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 750 মিটার উর্ধ্বে এই যন্ত্রপাতিসমন্বিত বেলুনগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে এবং বাতাস ও সমুদ্রের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং ভারতে বর্ষা ঋতুর উপর এই ক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে।

নিমবাস-6 পৃথিবীর চতুর্দিকে ভাসমান বেলুনসমূহ থেকে তথ্য গ্রহণ করে তা প্রেরণ করে। আলাস্কার তৈলসমৃদ্ধ প্রধো উপসাগরের ঠিক উত্তরে বোফোর্ট সাগরের তুষারখণ্ড কোন্ দিকে সরে যাচ্ছে, তা নির্ণয়ের কাজেও নিমবাসকে ব্যবহার করা হবে।

জাল সই ধরবার বলপয়েণ্ট পেন

কম্পিউটারসমন্বিত এক ধরণের বলপয়েণ্ট পেন আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে জাল সই ধরা পড়বে। এই পেন রাসায়নিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ইঞ্জিনীয়ারেরা এই পেন পরীক্ষা করে দেখছেন। এটি দেখতে সাধারণ বলপয়েণ্ট পেনের মতই, তবে একটি কম্পিউটার যন্ত্রের সঙ্গে এটি তার-যোগে সংযুক্ত। এই ব্যবস্থায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আবার সই করতে বলা হবে। স্বাক্ষর-কারীর হস্তাক্ষরের গতিভঙ্গী এবং অক্ষরের বাইরের আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে জাল স্বাক্ষর ধরা সম্ভব হবে। লেবোরেটরী পরীক্ষায় এই কলম জাল স্বাক্ষর ও আসল স্বাক্ষরের মধ্যে পার্থক্য সহজেই নির্ণয় করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি একটি মূল সত্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই সত্যটি হলো এই যে, কেউই নিজের সই দু-বার হুবহু একই প্রকার করতে পারে না। এই প্রক্রিয়ায় সেই পার্থক্যটুকুও ধরা পড়ে, তা যত সূক্ষ্মই হোক না কেন। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার সই করলে দুটি সইয়ের মধ্যে দুটি ভুল বা বৈষম্য থাকবে। কিন্তু জাল স্বাক্ষরকারীর সইয়ের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি বা চারটি ভুল বা বৈষম্য থাকবেই। বলপয়েণ্ট পেনটি স্বাক্ষরকারীর দুটি সইয়ের মধ্যে কয়টি ভুল বা বৈষম্য আছে, তা সহজেই নির্দিষ্ট করে দেবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর

দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

কৃত্রিম চামড়া

ছবিতে রুটির মত যে জিনিষটি দেখা যাচ্ছে, আসলে সেটি রুটি নয়—সম্প্রতি উদ্ভাবিত এক প্রকার কৃত্রিম চামড়ার ফটোগ্রাফ। কোলাজান নামক এক প্রকার প্রোটিনসম্পৃক্ত কার্বোহাইড্রেট থেকে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কৃত্রিম চামড়া উদ্ভাবকদের অন্যতম মাসাচুসেট্‌স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক আইওয়ানিস ইয়ানাস কৃত্রিম চামড়া প্রদর্শন করছেন। গুরুতরভাবে দগ্ধ বা অন্য কোন কারণে দেহে নতুন চামড়া সংযোজনের প্রয়োজন হলে এই কৃত্রিম চামড়া সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে, শরীর থেকে নতুন চামড়া কেটে লাগাবার প্রয়োজন হবে না।

রেডিও-তরঙ্গের কথা

রেডিও সেটের সুইচ খুললে, অমনি আরম্ভ হয়ে গেল গান, বক্তৃতা বা নাটক। কি আশ্চর্য! বহু দূরে রেডিও ষ্টেশনে বসে কোন ব্যক্তি কথা বলছে, শূন্যের মধ্যে পাড়ি দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার কথা রেডিও সেটের ভিতর দিয়ে তোমার কানে পৌঁছে যাচ্ছে। তোমরা ভাবছো এতে আর আশ্চর্য কি। আমি জোর গলায় ডাক দিলে খেলার মাঠের ওপারে আমার বন্ধুর কানে পৌঁছে যায়। সেইভাবে রেডিও ষ্টেশনের কথা আমার কানে পৌঁছবে না কেন? না মোটেই তা পৌঁছবে না। তুমি গলায় যত জোর দাওনা কেন, বায়ুতে তার যে তরঙ্গ উঠবে, তার শক্তি এত দ্রুত হ্রাস পাবে যে, কয়েক শ' গজের বেশী তোমার কথা পৌঁছবে না। তোমার কথাকে আরও অনেক বেশী দূরে পৌঁছে দিতে হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্য নিতে হবে। তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বলবে, হ্যাঁ মনে পড়ছে, এতো আমাদের জানা। মাইক্রোফোন আর লাউড স্পীকার তো দিন-রাত শব্দ-তরঙ্গকে বর্ধিত করে অনেক দূরে পৌঁছে দিচ্ছে। এইভাবে কি আরও অনেক বেশী দূরে পাঠানো যায় না? না, এভাবেও পাঠানো যায় না। তবে মাইক্রোফোনের পদ্ধতিটাকে আংশিকভাবে কাজে লাগানো হয় বই কি।

এখন মাইক্রোফোনের পদ্ধতিটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মাইক্রোফোনের চোঙের সামনে কথা বললে তা পরিবর্তী বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই তরঙ্গ অ্যাম্প্লিফায়ার নামক যন্ত্রে বর্ধিত হয়ে লাউডস্পীকারে পুনরায় শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যার শক্তি মূল শব্দ থেকে অনেক বেশী। অ্যাম্প্লিফায়ার কিন্তু মূল শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্ককে পরিবর্তন করতে পারে না, কেবল তার বিস্তারকে বাড়িয়ে দেয়, ফলে তার শক্তিটাও বেড়ে যায়।
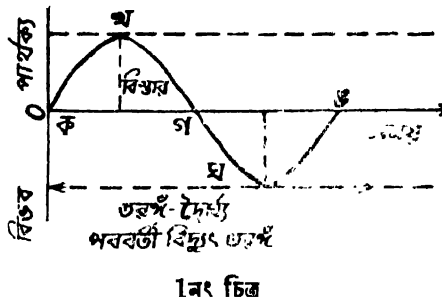
1নং চিত্র

এখন দেখা যাক, কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ-বিস্তার কথাগুলির অর্থ কি। জলে ঢিল পড়লে যে তরঙ্গ উঠে, তার সঙ্গে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাদৃশ্য আছে। 1নং চিত্রে একটি তরঙ্গ-রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে।

মধ্যবর্তী সরলরেখাটি হলো সময়রেখা। একে শূন্যরেখা ধরে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বিভব-পার্থক্যের উত্থান-পতন দেখানো হয়েছে। ক-বিন্দুতে কোন এক মুহূর্তে এর মাত্রা শূন্য (0), আবার বাড়তে বাড়তে খ-বিন্দুতে তা হয়েছে ধনাত্মক চরম, পুনরায় হ্রাস পেয়ে গ-বিন্দুতে হয়েছে শূন্য; এরপর ঘ-বিন্দুতে ঋণাত্মক চরম ও ঙ বিন্দুতে পুনরায় শূন্য হয়েছে। ক-থেকে বাঁকা পথ ধরে ঙ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। এর প্রতীক λ (ল্যামডা)। এর একক হলো মিটার (মিঃ)। খ বা ঘ বিন্দু থেকে শূন্যরেখা পর্যন্ত দূরত্বকে বলে তরঙ্গের বিস্তার। বিস্তার বাড়ে কমে তরঙ্গের শক্তি অনুপাতে। একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো তরঙ্গের একবার কম্পনের দৈর্ঘ্য। এক সেকেণ্ডে তরঙ্গটি যতবার কম্পিত হয়; অর্থাৎ যতগুলি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করে, তাকে বলে কম্পাঙ্ক। এর প্রতীক f, এবং একক হার্জ / সেকেণ্ড (হাঃ/সেঃ)* পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোর মত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতিবেগও হলো সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার। এর থেকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায়।

$$f\,(\text{হা/সে}) = \frac{3\times10^8}{\lambda\,(\text{মিঃ})}\ ;\ \text{অথবা}\ \lambda\,(\text{মিঃ}) = \frac{3\times10^8}{f\,(\text{হা/সে})},$$

$$\text{অথবা}\ f\lambda = 3\times10^8\ \text{মিঃ।}$$

দুটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক—

447·8 মিঃ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কম্পাঙ্ক কত ?

$$f = \frac{3\times10^8}{447{\cdot}8} = 670\ \text{কি. হা. / সে. (প্রায়)}$$

আবার, 1000 কি. হা. / সে. কম্পাঙ্কের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো—

$$\lambda = \frac{3\times10^8}{1000\times1000} = 300\ \text{মিঃ}$$

এর থেকে তোমাদের অতি পরিচিত রেডিও ষ্টেশন যথাক্রমে কলকাতা ক ও খ-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের হিসাব পাচ্ছ।

কিন্তু এগুলি হলো উচ্চমাত্রার কম্পাঙ্ক। আমরা যে কথাবার্তা বলি, গান করি, অথবা বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনি সৃষ্টি করি, তাদের কম্পাঙ্ক এদের চেয়ে অনেক কম। আমাদের শ্রবণ যন্ত্রের গ্রহণ ক্ষমতার একটা উচ্চতম ও একটা নিম্নতম সীমা আছে। এই সীমা হলো 20 থেকে 20,000 হা./সে., অর্থাৎ কোন শব্দের কম্পাঙ্ক 20-এর নীচে হলে তা যেমন আমাদের কান ধরতে পারে না, তেমনই 20,000-এর উপরে হলেও তা আমাদের কানে গ্রাহ্য হয় না। মানুষের কথার কম্পাঙ্ক সাধারণতঃ 80 থেকে 12000 এবং বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির কম্পাঙ্ক 30 থেকে 5000-এর মধ্যে থাকে।

* পূর্বে একে সাইক্‌ল্ / সেকেণ্ড (সা / সে) বলা হতো। বর্তমানে বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী হার্জের নামের সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়েছে।

যা হোক, রেডিও ষ্টেশনে মাইক্রোফোনের মধ্যে যে শব্দ-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তার কম্পাঙ্ক 50-5000-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই সীমারেখার মধ্যের কম্পাঙ্ককে নিম্নকম্পাঙ্ক বা শ্রুতি-কম্পাঙ্ক বলা হয়। আবার 10,000-এর উপর কম্পাঙ্ককে উচ্চকম্পাঙ্ক বা রেডিও-কম্পাঙ্ক নাম দেওয়া হয়েছে। রেডিও-ষ্টেশনের উচ্চ এরিয়ালের মধ্যে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করলে তা একই কম্পাঙ্কের তরঙ্গের আকারে শূন্যের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ রেডিও সেটের এরিয়ালের মধ্যে ধরা পড়ে। এখন শ্রুতিযোগ্য তরঙ্গকে এইভাবে সোজাসুজি দূরদূরান্তে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে কাজটা অনেক সহজ হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা সম্ভব হয় না। কারণ শ্রুতিযোগ্য তরঙ্গের শক্তি অতি সহজে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে শোষিত হওয়ার ফলে অত্যল্প দূরত্বের মধ্যেই তা অতি স্তিমিত হয়ে যায়। এজন্যে শ্রুতিযোগ্য তরঙ্গকে বহন করে নিয়ে যেতে কোন শক্তিশালী বাহকের প্রয়োজন হয়। তবে আধুনিক রেডিও-বিজ্ঞানীরা বার্তা তরঙ্গের বাহকরূপে নিয়োগ করেন কোন উচ্চ কম্পাঙ্কের রেডিও-তরঙ্গকে।

উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের বহু দূরে ছড়িয়ে পড়বার ক্ষমতা আছে। এরূপ কোন উপযুক্ত রেডিও-তরঙ্গকে শ্রুতি-তরঙ্গের বাহক করে উচ্চ এরিয়াল থেকে শূন্যের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। একপ তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে। প্রেরণের পদ্ধতিটি অতি জটিল, তবে সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যায়—

রেডিও ষ্টেশন বসে কোন ব্যক্তি যে কথা বললেন, তা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে নিম্নকম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে। অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে তার বিস্তার ও শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্রান্সমিটার যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় একটি নির্বাচিত উচ্চকম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। পূর্বোক্ত নিম্নকম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে এই উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিশিয়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় মডুলেশন। এবার এই উচ্চকম্পাঙ্কযুক্ত মডুলেশন-করা বিদ্যুৎ-প্রবাহকে উচ্চ প্রেরক এরিয়ালের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়। সেখান থেকে তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে 3×10^8 মিঃ গতিবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 2নং চিত্রে দেখানো হয়েছে বাহক ও শ্রুতি-তরঙ্গের রেখা চিত্র এবং 3নং চিত্র দেখানো হয়েছে মডুলেটেড তরঙ্গের রেখাচিত্র।

এটা তো গেল প্রেরণের ব্যাপার। এবার এই তরঙ্গকে গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত রেডিও সেটের গ্রাহক এরিয়ালে এই তরঙ্গ ধরা পড়ে। কিন্তু বহু দূর ভ্রমণের ফলে নানাভাবে শোষিত হয়ে এর শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রেডিও সেটের মধ্যে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় এই তরঙ্গের বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।

এই তরঙ্গ কিন্তু উচ্চকম্পাঙ্কযুক্ত বলে শ্রুতির অযোগ্য। এর মধ্যে যে শ্রুতি যোগ্য তরঙ্গ মিশ্রিত হয়ে আছে, তাকে পৃথক করতে হবে। নানারূপ জটিল ইলেক-
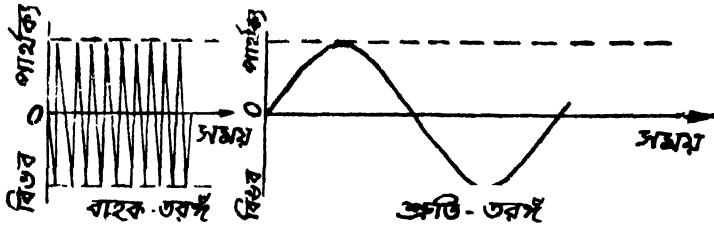
2নং চিত্র

ট্রনিক ব্যবস্থায় উচ্চকম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গ থেকে নিম্নকম্পাঙ্কের শ্রুতি-তরঙ্গকে পৃথক করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ডিমডুলেশন বা ডিটেকশন। 4নং চিত্রে
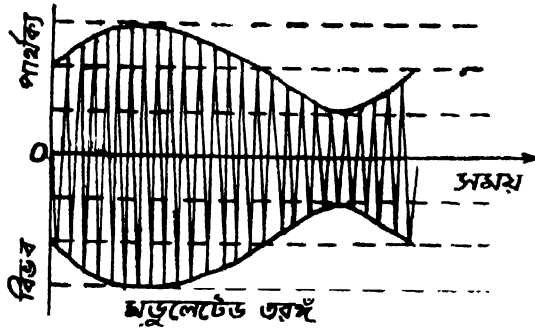
3নং চিত্র

দেখানো হয়েছে ডিমডুলেটেড তরঙ্গের রেখাচিত্র এবং অবশেষে বেরিয়ে আসা শ্রুতি-তরঙ্গের রেখাচিত্র।
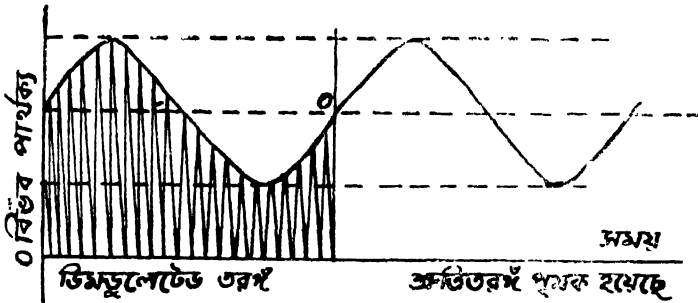
4নং চিত্র

ডিটেকশনের ফলে যে শ্রুতি-তরঙ্গ ফিরে পাওয়া গেল, তার কম্পাঙ্ক প্রেরিত মূল তরঙ্গের অনুরূপ। তবে এর মধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতিতে কিছু পরিমাণ বিকৃতি এসে

পড়ে। নানা ব্যবস্থায় এই বিকৃতি যত দূর সম্ভব দূর করে এবং এর শক্তি পুনরায় বাড়িয়ে দিয়ে লাউডস্পীকারের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়। লাউডস্পীকারে এখন মূল শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি আপাতসহজ মনে হলেও এর মধ্যে বহু জটিলতা ও সমস্যা আছে। এই সকল সমস্যার সমাধান একদিনে হয় নি। বহু কাল ধরে বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রেডিও-বিজ্ঞান আজ একটি পরিপূর্ণ যন্ত্র-বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং কেবল রেডিও ব্রডকাষ্ট নয়—বার্তা প্রেরণের নানা উন্নত পদ্ধতিও এর ফলে সৃষ্ট হয়েছে।

সরোজাক্ষ নন্দ

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1: তাপ-ইঞ্জিন সম্বন্ধে সহজ কথায় জানতে চাই।

সুবলচন্দ্র নন্দী, কাঁচড়াপাড়া।

প্রশ্ন 2: 'লুপিং দ্যা লুপ' বললে কি বুঝায়?

অলকরঞ্জন সাহা, দমদম।

উত্তর 1: ইঞ্জিন এমন কতকগুলি অংশ বা উপকরণের সমষ্টি, যার সমন্বয় বিধান শক্তির প্রয়োগে সহায়ক হয়। প্রকৌশল তত্ত্ব অনুধাবন করেই এই সমন্বয় সম্পন্ন করা হয় এবং নীতিগত উদ্দেশ্য—কম শক্তি প্রয়োগে অধিক উৎকর্ষ সাধন লভ্য হয়।

সূর্য সমস্ত শক্তির উৎস। শক্তির বিনাশ নাই, কিন্তু শক্তির রূপান্তর হয়। তাপ এক প্রকার শক্তি এবং তাপ-ইঞ্জিনে তাপ-শক্তির রূপান্তর হয়, যেমন জলশক্তির বায়ুশক্তির অথবা বিদ্যুৎ-শক্তির রূপান্তর হয় বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনে। তাপ-ইঞ্জিনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, রেলওয়ে ইঞ্জিনে কয়লার দহন থেকে যে তাপ-শক্তি পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করে বয়লারের জল বাষ্পীভূত করা হয়, সেই বাষ্প ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের ভিতর পিষ্টন চালনা করে রেলের চাকা ঘোরায় এবং তার ফলে গাড়ী চলে। এইভাবে কয়লার দহনজনিত তাপ গাড়ী চালনার কাজে প্রয়োগ করা হয়। কত তাপে কত কাজ পাওয়া যায়, তাও সহজেই গাণিতিক নিয়মে নির্ণয় করা যায়। তাপ-গতি তত্ত্বের প্রথম সূত্র অনুযায়ী:

কাজ=ব্যবহৃত তাপ—আভ্যন্তরীণ শক্তির বিবর্তন। Joule এই সূত্রের প্রবর্তক এবং একে Joule সূত্রও বলা হয়। শক্তির নিত্যতার প্রমাণও এই সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এটি প্রমাণিত হয়েছে:

427 কিলোগ্র্যাম-মিটার কাজ = 1000 ক্যালরি তাপ। তাপ-গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রের দ্বারা কাজ ও তাপের সম্বন্ধ অথবা তাপ পরিমাণগতভাবে নির্ণয় করা হয় এবং দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তাপের উৎকর্ষ পরিমাপ করা হয়। প্রথম সূত্রের একটি দৃষ্টান্ত: একজন লোক দশ কে. জি মাল বহন করে একশ'-মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে, $10 \times 100 = 1000$ কিঃ মিটার কাজ করা হয়। এর জন্যে তাপ প্রয়োগ করতে হবে (যদি তাপ থেকে কাজের শক্তি আহরণ করতে হয়) $\frac{1000 \times 1000}{427}$ ক্যালরি।

আমাদের শরীরে খাদ্য পরিপাকজনিত বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপ কর্মশক্তি যোগায়। কোন কাজের জন্যে কত তাপ দরকার এবং কায়িক শ্রমের দ্বারা সেই কাজ করতে হলে, কত খাদ্য গ্রহণ করবার পর প্রয়োজনীয় তাপ শরীরে উৎপন্ন হবে, তাও উপরিউক্ত সূত্রের ভিত্তিতে-নির্ণয় করবার পর খাদ্যতালিকা ঠিক করা যায় এবং খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে তার উপার্জন কত হওয়া উচিত, তা ঠিক করা যায়। কর্মীদের বেতন কাঠামো স্থির করবার সময় এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

উত্তর 2: প্রশ্নটি আকাশযান পরিচালনার অন্তর্গত। একজন বাইসাইকেল আরোহী ইচ্ছামত হাতল অগ্র-পশ্চাৎ করে সঞ্চরণপথ অনুবর্তন করতে সক্ষম। মোটর-গাড়ী চালক ষ্টীয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গতিপথ নির্ণয় করতে পারেন। স্থলপথের যান কেবল এক সমতলেই চলনক্ষম। সাবমেরিন জলযান দু-তলে যথা উপর-নীচ, সামনে-পিছনে চলতে পারে। ব্যোমযান তিন তলেই চলতে পারে। ডাইনে-বায়ে, উপরে-নীচে এবং কাত হয়ে অথবা গড়াগড়ি দিয়ে চলতে পারে।
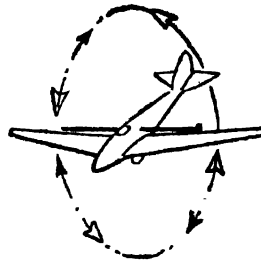
1নং চিত্র

লুপিং বলতে কি বুঝায়, তা 1নং চিত্রে পরিদৃশ্যমান। তির্যক অনুভূমিক অক্ষকে কেন্দ্র করে-দৈর্ঘ্য পথ পরিক্রম করাকে ইংরেজীতে looping the loop বলা হয়। যদি একটি আলপিন (চিত্র দ্রষ্টব্য) ডানার সমান্তরাল এপার-ওপার ফুটিয়ে দেওয়া হয় এবং আকাশ-যানটি ঘুরতে আরম্ভ করে, তবে পরিক্রমা লুপিং সমতলে সম্পন্ন হবে। আকাশযানের অগ্রভাগ উপরে ওঠবার সময় উপরে এবং নীচে নামবার সময় নীচের দিক নির্দেশ করবে। এলিভেটর অনুভূমিক হালের কাজ করে।

দেবকুমার গুপ্ত

বিবিধ

1976 সালে বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার

1976 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য তাঁর "প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান" গ্রন্থের জন্য। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য দশ হাজার টাকা।

পৃথিবীর প্রথম সৌর বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ভারতে হবে

সমাচার কর্তৃক নতুন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—ভারত ও পশ্চিম জার্মেনী যৌথ-ভাবে প্রথম সৌর বিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈরী করবে। এটি তৈরী হবে ভারতে। ভারতের দূরবিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে সৌরশক্তির ব্যবহার দেখাবার জন্যেই এই সৌর বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি তৈরী করা হবে। এই কেন্দ্রে দশ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি মাদ্রাজে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির সীমানার মধ্যে এটি স্থাপিত হবে।

ভারত-পশ্চিম জার্মান বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে এই পরীক্ষামূলক কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে ভারতীয় ও পশ্চিম জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায়। এই নতুন প্রচেষ্টায় ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালসের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ এবং কয়েকটি জাতীয় প্রয়োগশালা যুক্ত থাকবে। ভারতীয় হেভী ইলেকট্রিক্যালস ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রের জন্যে সৌর-সংগ্রাহক ও তাপ বিনিময়ক তৈরীর পরিকল্পনা রচনা করেছে। অন্যান্য যন্ত্র—যেমন শব্দহীন প্রেরক, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি সরবরাহ করবে পশ্চিম জার্মেনী

হিমালয়ের তুষার পরীক্ষায় ভারতীয় উপগ্রহ

সমাচার কর্তৃক নতুন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—১৯৭৮ সালে ভারতের যে দ্বিতীয় উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হবে, সেটি হিমালয়ের তুষার আবরণ পরীক্ষা করবে। এ-পি-এন জানিয়েছে, সোভিয়েট মহাকাশযাত্রী পিয়োত্রী ক্ল্যাক বলেছেন যে, এই পরীক্ষার ফলে ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরা তুষার গলনের সময় হিমালয়ের নদী-গুলিতে জলের পরিমাণ পরিমাপ করতে পারবেন, সেচের জন্যে কি পরিমাণ জল ব্যবহার করা যেতে পারবে, তা নির্ণয় করতে পারবেন এবং বন্যার পূর্বাভাস দিতে পারবেন ও সেই সঙ্গে বন্যার ফলে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে, তা নিবারণ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে আন্তঃমহাকাশ সংস্থার সহ-সভাপতি ডক্টর নিকোলাই নোভিকভ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্টের মত দ্বিতীয় উপগ্রহও সফল হবে।

ডক্টর নোভিকভ বলেছেন, এই দ্বিতীয় উপগ্রহের আকৃতি আর্যভট্টের মতই হবে, তবে এটি আর্যভট্টের চেয়ে কিছু বেশী ভারী হবে।

আর্যভট্টের এক বছর

সমাচার কর্তৃক ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—প্রথম ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্টের মহাকাশ পরিক্রমার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সাফল্য দেশের উন্নয়নে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

গত বছর 19 এপ্রিল রাশিয়ার একটি

মহাকাশ কেন্দ্র থেকে আর্যভট্টকে মহাকাশে পাঠানো হয়। এই উপগ্রহটি তার প্রাথমিক লক্ষ্যগুলি অধিকাংশই পূরণ করেছে।

আর্যভট্টের মহাকাশ পরিক্রমার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আর্যভট্ট সম্পর্কে একটি রঙীন পুস্তিকাও বের করেছেন।

গর্দভ শুমারি

সমাচার কর্তৃক রাজকোট থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—গুজরাটে গাধা গণনা সুরু হয়েছে। বন্য প্রাণী সংক্রান্ত উপদেষ্টা পর্ষদ 15ই এপ্রিল গুজরাট রাজ্যে বিশ্বের দুষ্প্রাপ্য প্রাণী হিসেবে পরিচিত বুনো গাধার গণনার কাজ সুরু করেছেন। বুনো গাধার একমাত্র আবাসভূমি ছিল কচ্ছের রান অঞ্চলে। এখন তারা বীরেন্দ্রনগর, রাজকোট, কচ্ছ, মেশানা এবং বনসকণ্ঠ জেলার 4,840 কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিচরণশীল। বুনো গাধা সাধারণ গাধার চেয়ে আকারে বেশী লম্বা। এদের শক্তিও বেশী এবং এরা ভাল দৌড়তে পারে। 1969 সালের শেষ গণনায় এদের সংখ্যা ছিল 362।

25 লক্ষ বছরের প্রাচীন মাথার খুলি

সমাচার কর্তৃক চণ্ডীগড় থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞেরা পঁচিশ লক্ষ বছরের পুরনো অতিকায় হাতী 'ষ্টেগোডন গণেশা'-র একটি খুলি আবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়া পাওয়া গেছে বড় বড় কচ্ছপের দাঁত এবং-বড় বড় মাছের আঁশ। হিমাচল প্রদেশের সকেতি ফসিল পার্কে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। পার্কটির আয়তন প্রায় দেড়শো বিঘা।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর (উত্তর বিভাগ) এ. পি তেওয়ারি জানান, যে, এর ফলে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো—বড় বড় স্তন্যপায়ী জীবজন্তু বহু লক্ষ বছর আগে শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে বিচরণ করতো।

তেওয়ারি এই প্রসঙ্গে বলেন, এই অঞ্চলটিকে সংরক্ষিত রাখা হবে এবং পর্যটকদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন—এই পার্কটির মত পার্ক এশিয়াতে আর নেই।

তেওয়ারি আরও বলেন, সকেতিতে একটি স্থায়ী ফসিল যাদুঘর গড়ে তোলা হবে।

দশ হাজার বছর আগের নরকঙ্কাল

সমাচার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার সরাই নাহার রাই গ্রামে পুরাতন প্রস্তর যুগের 13টি নরকঙ্কালের সন্ধান মিলেছে। সেই সব কঙ্কালের পাশে পোড়া মাটির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই থেকেই মনে হয়, ওই সময়কার মানুষেরা আগুনের ব্যবহার জানতো। কঙ্কালগুলির কিছু কিছু প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, এগুলি 10 হাজার বছর আগের। সেগুলি পাওয়া গেছে মাথা পশ্চিম দিকে এবং পা পূর্ব দিকে করে চিৎ করে শোয়ানো অবস্থায়। মাইক্রোলিথিক যুগে এইভাবেই সমাধি দেওয়ার নীতি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। উত্তর-প্রদেশ পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর উপরিউক্ত তথ্য দিয়ে বলেন, এই নরকঙ্কালের কিছু কিছু অংশ কলকাতায় নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে এবং বোম্বাইয়ে টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

লেখক/প্রকাশকের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা বিষয়ক বই দান করিবার জন্য লেখক/প্রকাশকদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে। গ্রন্থাগারের পাঠাগার ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দান হিসাবে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন-55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক যথাক্রমে 19·00 এবং 9·50 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।

2. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

3. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

4. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ জুন, 1976 ষষ্ঠ সংখ্যা

হল এফেক্ট

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

সূচনা

1879 খৃষ্টাব্দে ই. টি. হল যে ঘটনাটি আবিষ্কার করেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবিষ্কারকের নামানুসারে ঘটনাটি হল এফেক্ট (Hall Effect) নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে কঠিন পদার্থে বৈদ্যুতিক পরিবহনের তত্ত্ব গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিশেষতঃ অর্ধপরিবাহীর গবেষণায় হল এফেক্ট বিজ্ঞানীদের কাছে একটি মূল্যবান হাতিয়ার রূপে পরিগণিত হয়।

হল চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তাড়িৎ-পরিবাহীর উপর বলের প্রকৃতি নির্ণয়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময় (1870 দশকের শেষ ভাগে) ইলেকট্রনের আবিষ্কার হয় নি। ফলে পদার্থের তড়িৎ-পরিবাহিতার কোন উপযুক্ত তত্ত্ব জানা ছিল না। এই সময় ম্যাক্সওয়েলের 'Electricity & Magnetism' পুস্তকের একটি অনুচ্ছেদের প্রতি হলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই অনুচ্ছেদে ম্যাক্সওয়েল এই মত ব্যক্ত করেন যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তড়িদ্বাহী পরিবাহীর গতির জন্যে যে বল দায়ী, তা বৈদ্যুতিক প্রবাহের উপরে ক্রিয়া করে না—ক্রিয়া করে পরিবাহীটির উপর এবং এর ফলে কোন তীর্যক চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরিবাহীকে স্থির অবস্থায় রাখলে পরিবাহিতে তড়িৎ-প্রবাহের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী।

কোন প্রভাব পড়বে না এবং তড়িৎ-প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকবে। অপর দিকে 1851 খৃষ্টাব্দে কেলভিন বলেন যে, একটি চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তড়িৎ-প্রবাহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) বিদ্যমান থাকবার কথা। কিন্তু কেলভিন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই মতটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি মূলতঃ যথেষ্ট উন্নত এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাবে। হল প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে তড়িৎ-প্রবাহের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। হল প্রথমে পরীক্ষা করে দেখেন কোন তড়িদ্বাহী তারের রোধ চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হয় কি না। কিন্তু কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি, যদিও বর্তমানে সূক্ষ্ম পরিমাপের ফলে দেখা গেছে যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তারের রোধ সামান্য বৃদ্ধি পায়। এর পর তিনি অনুমান করেন যে, চৌম্বক ক্ষেত্র তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ বাঁকানোর চেষ্টা করতে পারে এবং তা হলে পরিবাহীতে একটি তীর্যক বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হবে। পরীক্ষায় তাঁর এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়। দেখা যায় যে, একটি তড়িদ্বাহী পরিবাহীর সমকোণে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে তড়িৎ-প্রবাহ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সমকোণে পরিবাহীতে একটি বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয়। এটাই হল এফেক্ট। হল আরও লক্ষ্য করেন যে, সৃষ্ট তীর্যক তড়িৎ-ক্ষেত্রের মান পরিবাহীতে তড়িৎ-প্রবাহ ঘনত্ব (Current density) এবং তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ ও সৃষ্ট তড়িৎ-ক্ষেত্রের অভিমুখের লম্ব দিকে প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের উপাংশের সঙ্গে সমানুপাতিক। তড়িৎ-প্রবাহ x-অক্ষের অভিমুখে i_x হলে এবং প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের z-অক্ষ বরাবর উপাংশ B_z হলে y-অক্ষ বরাবর যে তাড়ৎ-বিভবের সৃষ্টি হবে, তার পরিমাণ $E_y = R_h i_x B_z$ হবে। এখানে R_h একটি ধ্রুবক, যা 'হল ধ্রুবক' বা 'হল গুণাঙ্ক' বলে পরিচিত।

যদি পরিবাহিটি ab প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রাকার একটি পাত x-অক্ষ বরাবর অবস্থিত হয়, তবে $i_x = I/ab$, যেখানে I তড়িৎ-প্রবাহের মান এবং $E_y = V_h/a$, যেখানে V_h হলো সৃষ্ট তীর্যক বিভব-প্রভেদ (1নং চিত্র)। সুতরাং
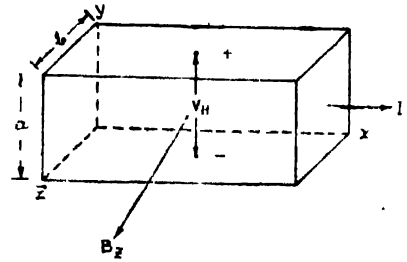
1নং চিত্র

$$R_h = \frac{bV_h}{IB_z} \quad \cdot(1)$$ [a = পরিবাহীর প্রস্থ এবং b – পরিবাহীর বেধ এই সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হল গুণাঙ্ক পরিবাহীর প্রস্থের উপর নির্ভর করে না। সমীকরণটি থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পরিবাহীর বেধ যত কমানো হবে, ততই সৃষ্ট তীর্যক বিভব-প্রভেদ (যাকে এখন থেকে হল বিভব বলা হবে) বৃদ্ধি পাবে। এই জন্যেই হল এফেক্ট পরীক্ষায় পরিক্ষণীয় পদার্থকে পাতলা পাতের (Thin plate) আকারে নেওয়া হয়।

উপরিউক্ত সমীকরণটি নির্ণয়ে একটি সরলীকরণ করা হয়েছে—পরিবাহীর দৈর্ঘ্য অসীম, যাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে তড়িৎ-প্রবাহ ঘনত্ব সমমান বজায় রাখে। স্বভাবতঃই এই সর্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। ফলে কিছু ত্রুটি থেকে যায়। অবশ্য দেখা গেছে যে, যদি পরিবাহীর দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের চার গুণের কম না হয়, তবে ত্রুটির পরিমাণ নগণ্য হয়, কিন্তু যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমান হয় (বর্গাকৃতি পাতের ক্ষেত্রে), তবে সৃষ্ট হল বিভব অনেকটা হ্রাস পায়।

হল এফেক্ট ও ইলেকট্রনীয় পরিবাহিতা

ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হবার পর হল এফেক্টকে ইলেকট্রন প্রবাহের দ্বারা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়। স্থির তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রয়োগে ইলেকট্রনগুলি তড়িৎ-ক্ষেত্রের অভিমুখে একটি নির্দিষ্ট ঝোঁক-বেগ (Uniform drift velocity) অর্জন করে এবং এই ঝোঁক-বেগ প্রযুক্ত তড়িৎ-ক্ষেত্রের সমানুপাতী হয়। এই অবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহের উপর চৌম্বক-ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে (চৌম্বক ক্ষেত্র ও তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ ভিন্ন) ইলেকট্রনগুলির উপর একটি বল ক্রিয়া করে। এই বলের অভিমুখ হবে চৌম্বক ক্ষেত্র ও তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখের সঙ্গে লম্ব দিকে। যদি শূন্য স্থানে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় (যথা ক্যাথোড রশ্মি), তবে এই বলের ক্রিয়ায় ইলেকট্রনগুলি যথারীতি বিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু ইলেকট্রন-প্রবাহ কোন কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে হলে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ বিক্ষেপ হতে পারে না। এক্ষেত্রে কিছু ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হয়ে পরিবাহীর কোন একটি তলে জমা হবে। কোন তলে এইভাবে সঞ্চিত অতিরিক্ত ইলেকট্রন—আরও ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হয়ে এই তলে জমা হওয়াকে বাধা দেবে, কারণ তলে সঞ্চিত অতিরিক্ত ইলেকট্রন একটি বিকর্ষণী তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। ফলে বিকর্ষণী তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাব যতক্ষণ বিক্ষেপী বলের প্রভাব অপেক্ষা কম থাকবে, ততক্ষণ কোন একটি তলে (ফ্লেমিং সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত) ইলেকট্রন সঞ্চিত হতে থাকবে এবং অবশেষে ইলেকট্রনের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সৃষ্ট বিক্ষেপী বল যখন পরিবাহীর তলে সঞ্চিত ইলেকট্রন সৃষ্ট বিকর্ষণী তড়িৎ-ক্ষেত্রের ফলে সৃষ্ট বলের সমান হবে, তখন একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হবে এবং নতুন কোন ইলেকট্রন আর পূর্বোক্ত তলে সঞ্চিত হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পরিবাহীটিতে একটি তীর্যক বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভাবে ইলেকট্রন প্রবাহের দ্বারা হল এফেক্টের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এখন ধরা যাক, চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগের পূর্বে পরিবাহীর অভ্যন্তরে x-অক্ষ বরাবর ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছিল এবং চৌম্বক ক্ষেত্র z-অক্ষ বরাবর প্রয়োগ করা হয়েছে। এই অবস্থায় ইলেকট্রনগুলি y-অক্ষ অভিমুখে বিক্ষিপ্ত হবে। চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্যে সৃষ্ট বিক্ষেপী বলের মান $=B_z e v_x$ (e—ইলেকট্রনের আধান v_x—ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ, B_z—চৌম্বক-ক্ষেত্রের মান)। সাম্যাবস্থায় সৃষ্ট তড়িৎ-ক্ষেত্রের মান E_y হলে, $eE_y = B_z e v_x$ হবে। যদি পরিবাহীর একক আয়তনে n সংখ্যক ইলেকট্রন (তড়িদ্বাহী কণা) থাকে, তবে তড়িৎ-প্রবাহ ঘনত্ব $i_x = nev_x$ $\therefore$ $E_y = \frac{1}{me}$, $i_x B_z$

এবং $R_h = \frac{1}{ne}$ ...... (2) সুতরাং হল গুণাঙ্ক পরিবাহীতে তড়িদ্বাহী কণার ঘনত্বের ব্যাস্তানুপাতী।

উপরিউক্ত তত্ত্বটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একযোজী ধাতুর ক্ষেত্রে সমীকরণ (2)-এর সাহায্যে দেখা যায় যে, তড়িদ্বাহী কণার ঘনত্ব পরিবাহীতে পরমাণু ঘনত্বের কাছাকাছি; অর্থাৎ গড়ে প্রতি পরমাণুর একটিমাত্র ইলেকট্রন তড়িদ্বাহী। কোন কোন পরমাণু মাত্র একটি ইলেকট্রন পরিবহন ক্রিয়ায় অংশ নেয়, তার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা উপরিউক্ত তত্ত্বে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কেন কোন কোন পদার্থের ক্ষেত্রে হল গুণাঙ্ক ধনাত্মক এবং কোন কোন ধাতুর ক্ষেত্রে হল গুণাঙ্ক ঋণাত্মক, তার ব্যাখ্যাও এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সমীকরণ (2) নির্ণয় করবার সময় তড়িদ্বাহী কণাগুলি সমবেগসম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বাস্তবে তা হতে পারে না। বেগ বন্টন (Velocity distribution) হিসাবের মধ্যে আনলে সমীকরণটি যে রূপ নেয়, তা হলো $R_h = \propto \frac{1}{ne}$ ·(3), যেখানে $\propto$ বেগ বন্টন

সম্পর্কিত অনুমানের (Assumption) উপর নির্ভর করে।

অর্ধপরিবাহীর গবেষণায় হল এফেক্ট

কণাতত্ত্ব তত্ত্বানুযায়ী কোন পরমাণুতে ইলেকট্রন-গুলি বিভিন্ন শক্তিস্তরে (Energy level) অবস্থান করে। যখন একাধিক পরমাণু সম্মিলিতভাবে কোন কেলাস গঠন করে, তখন পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলির (যোজ্যতা ইলেকট্রন) শক্তিস্তরগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। এই ক্ষেত্রে শক্তিস্তরগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থি একাধিক শক্তিস্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন পদার্থে অসংখ্য পরমাণু থাকায় বিভাজিত শক্তি-স্তরগুলি অসংখ্য এবং খুব কাছাকাছি অবস্থিত হবে। ফলে সেগুলি শক্তি-পটি (En ergy band) গঠন করবে এবং অবিচ্ছিন্ন বলে প্রতিভাত হবে। কোন শক্তি-পটিতে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ সংখ্যা পাউলী পরিবর্জন নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন শক্তি-পটিতে ইলেকট্রনের সংখ্যা সেই পটির জন্যে নির্ধারিত সংখ্যার সমান হলে সেটিকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ পটি বলা হয়। এই অবস্থায় এই পটির ইলেকট্রনগুলি পরিবহন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

শক্তি-পটিগুলির বিস্তার পরমাণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। পরমাণু-গুলির মধ্যে দূরত্ব যত কম হবে, শক্তি-পটিগুলির বিস্তার (Width) তত বেশী হবে এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে। নিম্নতর শক্তি-পটিকে বলা হয় যোজ্যতা পটি (Valence band) এবং উচ্চতর শক্তি-পটিকে বলা হয় পরিবহন পটি (Conduction band)। দুই পটির মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় নিষিদ্ধ পটি। কোন ইলেট্রনে শক্তি-স্তর নিষিদ্ধ পটির মধ্যে অবস্থিত হতে পারে না। অপরিবাহী ও ও অর্ধপরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে চরম শূন্য তাপমাত্রায় যোজ্যতা পটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে এবং পরিবহন পটি সম্পূর্ণরূপে শূন্য থাকে, ফলে সেগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। পরিবহন পটি আংশিক পূর্ণ থাকলে তবেই পদার্থটি পরিবাহী হয়। পরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পটির মান শূন্য। পরিবহন পটি শূন্য হলে এবং পরিবহন ও যোজ্যতা পটির মধ্যে ব্যবধান (অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটি) থাকলে যোজ্যতা পটি থেকে ইলেকট্রন পরিবহন পটিতে গেলে তবেই পদার্থটি পরিবাহী হবে। নিষিদ্ধ পটির মান কম হলে (1 ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি) তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আলোকসম্পাত প্রভৃতির দ্বারা ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে যোজ্যতা পটি থেকে পরিবহন পটিতে আনা যেতে পারে। এই অবস্থায় পদার্থটি বিদ্যুৎ পরিবহনে সক্ষম হবে। এই সব পদার্থ—যাদের নিষিদ্ধ পটির মান কম তাদের বলা হয় অর্ধপরিবাহী। এদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বেশী সংখ্যায় ইলেকট্রন যোজ্যতা পটি থেকে পরিবহন পটিতে যাবে। ফলে পদার্থটির পরি-বাহিতাও বৃদ্ধি পাবে। যোজ্যতা পটি থেকে ইলেকট্রন চলে যাওয়ায় সেখানে ইলেকট্রনের ঘাটতি হবে এবং যে স্থানে ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়, সেখানে একটি হোল (Hole) সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়, অর্থাৎ হোল হলো কোন অবস্থানে ইলেকট্রনের ঘাটতি। তাই হোলকে ধনাত্মক ধরা হয়। হোলগুলির ইলেকট্রন সংগ্রহের প্রবণতা থাকে। পার্শ্ববর্তী কোন ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে হোল বিলুপ্ত হয় এবং পার্শ্ববর্তী ঐ ইলেকট্রনটির অবস্থানে নতুন হোলের সৃষ্টি হয়। ফলে মনে করা যেতে পারে যে, পূর্বোক্ত হোলটিই যেন স্থান পরিবর্তন করেছে। হোল এবং ইলেকট্রনের স্থান পরিবর্তন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে বিক্ষিপ্তভাবে হয়। পদার্থে বিভব-প্রভেদ প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন ও হোলগুলি যথা-ক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িদ্বারের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে পদার্থটিতে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

এই ক্ষেত্রে ধনাত্মক হোল ও ঋণাত্মক ইলেকট্রন—উভয়েই তড়িদ্বাহী কণা। এই ধরণের অর্ধপরিবাহীকে বলা হয় নিজস্ব অর্ধপরিবাহী (Intrinsic semiconductor)। কোন পদার্থে নিষিদ্ধ পটির পরিমাণ বেশী হলে (কয়েক ইলেকট্রন-ভোল্ট) যোজ্যতা পটি থেকে কোন ইলেকট্রন পরিবহন পটিতে যেতে পারে না এবং পরমাণুতে যতই বেশী ইলেকট্রন থাকুক না কেন, পদার্থটির মধ্য দিয়ে কোন তড়িৎ-প্রবাহ হতে পারে না। এই ধরণের পদার্থগুলিকে বলা হয় অপরিবাহী।

পটি-তত্ত্ব (Band theory) অনুযায়ী পদার্থের শ্রেণী-বিভাগের (পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী, অপরিবাহী) পর হল এফেক্ট সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পটি তত্ত্বানুযায়ী গণনা করে হল গুণাঙ্ক সম্পর্কিত যে সমীকরণ পাওয়া যায়, তা সমীকরণ (2)-এর অনুরূপ: $R_h = \frac{1}{ne}$ (n = পরিবহন পটিতে ইলেকট্রন ঘনত্ব এবং e = তড়িদ্বাহী কণার আধান)। যেহেতু পরিবহন পটিতে কেবলমাত্র পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলি (Valence electron) (অর্থাৎ পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথের ইলেক্ট্রনগুলি) থাকে, একযোজী ধাতুর ক্ষেত্রে পরিবহন পটিতে ইলেকট্রন ঘনত্ব n ধাতুটিতে পরমাণু ঘনত্বের সঙ্গে সমান। অতএব একযোজী ধাতুর ক্ষেত্রে তড়িদ্বাহী কণার ঘনত্ব পরিবাহীতে পরমাণুর ঘনত্বের প্রায় সমান হবার ব্যাখ্যা পটি তত্ত্বে পাওয়া যাচ্ছে।

অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা তাপমাত্রার সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত হতে দেখা যায়, অবশ্য নিম্ন তাপমাত্রার উপর রোধের নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। হল এফেক্টের পরিমাপ থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ এবং উচ্চ তাপমাত্রার উপর অর্ধপরিবাহীর রোধের নির্ভরতা মূলতঃ তাপমাত্রার বৃদ্ধির সঙ্গে মুক্ত তড়িদ্বাহীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফল এবং নিম্ন তাপমাত্রার উপর অর্ধপরিবাহীর রোধের নির্ভরতা হ্রাস পাবার কারণ নিম্নতাপমাত্রায় তড়িদ্বাহী ঘনত্ব (Carrier concentration) তাপমাত্রার উপর খুব কমই নির্ভরশীল।

যদি পরিবহন পটি প্রায় শূন্য হয়, তবে সাধারণ ইলেকট্রন গ্যাস তত্ত্বের (Classical electron gas theory) দ্বারা পরিবাহিতা ও অন্যান্য ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু পরিবহন পটি প্রায় পূর্ণ হলে যে কয়টি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকবে অর্থাৎ হোলগুলি পরিবহন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং হোলের ঘনত্ব অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে তড়িদ্বাহী ধনাত্মক বলে মনে হবে এবং হল গুণাঙ্ক প্রথম ক্ষেত্রের হল গুণাঙ্কের বিপরীত চিহ্নযুক্ত (অর্থাৎ ধনাত্মক) চিহ্নযুক্ত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পটি-তত্ত্ব অনুযায়ী হল গুণাঙ্ক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক—উভয় চিহ্নযুক্তই হতে পারে।

একটি নিজস্ব অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন এবং হোল উভয়েই পরিবহন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, ফলে হল গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে উভয়েরই প্রভাব থাকবে। সুতরাং সমীকরণ (3) পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াবে—$R_h = -\frac{3\pi}{8e}\cdot\frac{n\mu_n^2 - p\mu_p^2}{(n\mu_n + p\mu_p)^2}$ ...(4)

এখানে n = ইলেকট্রন ঘনত্ব, p = হোল ঘনত্ব, μ_n এবং μ_p যথাক্রমে ইলেকট্রন ও হোলের গতিশীলতা (Mobility)। n অথবা p-এর একটি শূন্য হলে সমীকরণটি সমীকরণ (3)-এ পরিণত হয়।

পটি-তত্ত্বানুযায়ী নিম্নতাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থের পরিবাহিতা প্রায় শূন্য হবার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না; অর্থাৎ সংখ্যায় খুব কম হলেও কিছু মুক্ত তড়িদ্বাহী খুব কম তাপমাত্রাতেও অর্ধপরিবাহীতে বর্তমান থাকে। এর কারণ অর্ধপরিবাহীতে সর্বদাই কিছু অশুদ্ধি বর্তমান থাকে। দুটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি

ব্যাখ্যা করা যাক। জার্মেনিয়াম পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথে চারটি ইলেকট্রন থাকে। বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম কেলাসে যোজ্যতা পটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে এবং পরিবহন পটি সম্পূর্ণরূপে শূন্য থাকে। এখানে যোজ্যতা পটি ও পরিবহন পটির মধ্যে ব্যবধান 0·75 ইলেকট্রন ভোল্ট। সুতরাং খুব কম তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম কেলাস অপরিবাহী হলেও সাধারণ তাপমাত্রায় যোজ্যতা পটি থেকে ইলেকট্রন পরিবহন পটিতে গিয়ে তাকে পরিবাহী করে তোলে। জার্মেনিয়াম একটি নিজস্ব অর্ধ-পরিবাহী। একটি জার্মেনিয়াম কেলাসে কোন জার্মেনিয়াম পরমাণুকে কোন পঞ্চযোজী (যথা অ্যান্টিমনি) পরমাণুর দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে কেলাসে একটি ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটবে, কারণ অ্যান্টিমনি পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথে রয়েছে 5টি ইলেকট্রন। এই 5টি ইলেকট্রনের মধ্যে চারটি প্রতিস্থাপিত জার্মেনিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রনগুলির স্থলাভিষিক্ত হবে এবং একটি ইলেকট্রন চরম শূন্যের কয়েক ডিগ্রী মাত্র বেশী তাপমাত্রাতেই পরিবহন পটিতে চলে আসবে (কারণ পরিবহন পটিতে আসবার জন্যে এর প্রয়োজন মাত্র 0·01 ইলেকট্রন ভোল্ট) এবং কেলাসটিতে পরিবাহিতা পরিলক্ষিত হবে। চরম শূন্যে এই ইলেকট্রনটির শক্তি-স্তর নিষিদ্ধ পটির মধ্যে অবস্থিত। বেথে গণনা করে দেখিয়েছেন যে, ইলেকট্রনটির শক্তি-

2নং চিত্র

স্তর পরিবহন পটির তলদেশের ঠিক নিম্নে অবস্থিত (2নং চিত্র)। ফলে স্বল্প তাপমাত্রাতেই ইলেকট্রনটি পরিবহন পটিতে চলে এসে কেলাসটিকে পরিবাহী করবে। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম কেলাসে একটি জার্মেনিয়াম পরমাণুকে একটি ত্রিযোজী পরমাণুর (যথা বোরন) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলে একটি ইলেকট্রনের অভাব ঘটে (কারণ ত্রিযোজী পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা 3) অর্থাৎ একটি হোলের সৃষ্টি হয়। তাই হোলটির শক্তি-স্তর যোজ্যতা পটির উপরিভাগের খুব নিকটে নিষিদ্ধ পটির মধ্যে অবস্থিত (3নং চিত্র)। ফলে সামান্য পরিমাণ

3নং চিত্র

শক্তি অর্জন করলেই যোজ্যতা পটি থেকে ইলেকট্রন উপরিউক্ত হোলের শক্তি-স্তরে উন্নীত হয় এবং যোজ্যতা স্তরে একটি হোলের সৃষ্টি হয়—এই হোল সৃষ্ট হয়ে জার্মেনিয়াম কেলাসটিকে পরিবাহী করে তোলে। ফলে ত্রিযোজী কোন অশুদ্ধি থাকলেও খুব কম তাপমাত্রায় জার্মেনিয়াম কেলাসে পরিবহন ঘটতে দেখা যায়। এই ধরণের অশুদ্ধিগুলিকে বলে গ্রহীতা (Acceptor) অশুদ্ধি, আর পঞ্চযোজী অশুদ্ধিগুলিকে বলা হয় দাতা (Donor) অশুদ্ধি।

হল এফেক্টের সাহায্যে খুব সহজে অর্ধপরিবাহীতে অশুদ্ধির প্রকৃতি, অশুদ্ধিগুলি কিভাবে অর্ধপরিবাহীর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতায় প্রভাব বিস্তার করে, অশুদ্ধিগুলির জন্যে সৃষ্ট তড়িদ্বাহীর সংখ্যা তাপমাত্রার উপর কিভাবে নির্ভর করে প্রভৃতি বিষয় জানা যায়। হল এফেক্ট পদ্ধতির অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো

এই যে, এর দ্বারা অশুদ্ধির পরিমাণ চরমভাবে নির্ধারিত হয়। যদিও সবক্ষেত্রে হল এফেক্টের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, তবুও প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানের জন্যে এটি একটি মূল্যবান হাতিয়ার।

সমীকরণ (4) থেকে একটি আকর্ষণীয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়। কোন অশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে, যেখানে অশুদ্ধি গ্রহীতা শ্রেণীর, নিম্ন তাপমাত্রায় হোল প্রধান তড়িদ্বাহী। ফলে নিম্ন তাপমাত্রায় হল গুণাঙ্ক ধনাত্মক। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন ও হোল উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোন তাপমাত্রায় এমন হতে পারে যে, $n\mu_n = p\mu_p^2$; সে ক্ষেত্রে হল গুণাঙ্ক শূন্য হবে। এমনও হতে পারে যে, $n\mu^2_n < p\mu^2_p$; সেক্ষেত্রে হল গুণাঙ্ক ঋণাত্মক হবে; অর্থাৎ একই অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে কোন তাপমাত্রায় হল গুণাঙ্ক ধনাত্মক ও কোন তাপমাত্রায় ঋণাত্মক হতে পারে।

হল এফেক্টের প্রয়োগ

হল এফেক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবত: চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরের তাপমাত্রায় হল গুণাঙ্কের মান কার্যত: চৌম্বক ক্ষেত্রের মান-নিরপেক্ষ হয়। সমীকরণ (1) অনুযায়ী $B_z = (bv_h)/(R_hI)$। অতএব যদি কোন পদার্থের হল গুণাঙ্ক (R_h) জানা থাকে, তবে I এবং v_h পরিমাপ করলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করা যাবে। হল এফেক্ট প্রয়োগে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে অন্য কোন পদ্ধতিতে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন বা অসুবিধাজনক, সে সব ক্ষেত্রে হল এফেক্ট ব্যবহারকারী চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপক সহজেই ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া এই সব পরিমাপক আকারে বেশ ছোট হয়।

যদি হল নমুনাটিকে (Hall sample) একটি বায়ুকোর আবেশকের (Air cored inductor) মধ্যে রেখে আবেশকের মধ্যে I_x তড়িৎ-প্রবাহ ঘটানো হয়, তবে $B_z = ki_x$ (k = ধ্রুবক) হবে। সুতরাং $II_x = (bv_h)/(kr_h)$ ··(5) হবে। অর্থাৎ হল বিভব II_z-এর সঙ্গে সমানুপাতী। এই ক্ষেত্রে হল নমুনাটিকে একটি সরল অথচ সূক্ষ্ম (Accurate) অ্যানালগ গুণকরূপে (Analogue multiplier) ব্যবহার করা যায়।

কোন তড়িৎ-বর্তনীতে ব্যয়িত শক্তির হার অর্থাৎ বর্তনীর ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্যেও হল এফেক্টের সাহায্য নেওয়া হয়। এজন্যে এমন বর্তনী তৈরী করা হয়, যা থেকে এমন দুটি তড়িৎ-প্রবাহ একই সঙ্গে পাওয়া যায়, যাতে একটি তড়িৎ-প্রবাহ পরীক্ষণীয় বর্তনীর তড়িৎ-প্রবাহের সমানুপাতী এবং অপর তড়িৎ-প্রবাহ পরীক্ষণীয় বর্তনীর বিভব-প্রভেদের সমানুপাতী হয়। এদের মধ্যে একটিকে আবেশকের তড়িৎ-প্রবাহ I_x রূপে এবং অপরটিকে হল নমুনার তড়িৎ-প্রবাহ I রূপে ব্যবহার করলে সমীকরণ (5) অনুযায়ী সৃষ্ট হল বিভব পরীক্ষণীয় বর্তনীর ক্ষমতার সমানুপাতী হবে; অর্থাৎ উপরিউক্ত তন্ত্রটি (System) একটি ক্ষমতা পরিমাপক বা ওয়াট মিটাররূপে কাজ করবে। অনেক সময় অন্য কোন ক্ষমতা পরিমাপকের তুলনায় হল এফেক্ট ব্যবহারকারী ক্ষমতা পরিমাপক ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

পরিমাপ

যে পদার্থের ক্ষেত্রে হল বিভব পরিমাপ করতে হবে, তা একটি পাতলা পাতের আকারে (বেধ—কয়েক মিলিমিটার) নেওয়া হয়। পাতের দৈর্ঘ্য বরাবর (x-অক্ষ) তড়িৎ-প্রবাহ করানো হয় এবং পাতের সঙ্গে লম্বভাবে (z-অক্ষ) চৌম্বক ক্ষেত্র প্রযুক্ত হয়। y-অক্ষের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত তল দুটির পরস্পর বিপরীত দুই বিন্দুতে দুটি সূক্ষ্ম শলাকা সংযুক্ত থাকে। শলাকা দুটি একটি সুবেদী পোটেনসিয়োমিটারের (Sensitive potentiometer) সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু শলাকা দুটি ঠিকভাবে দুই বিপরীত বিন্দুতে যুক্ত না হলে (যা কার্যতঃ অসম্ভব) বিভব পরিমাপে ত্রুটি থেকে যাবে। চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক বিপরীতমুখী করলে এই ত্রুটি দূর হবে। নমুনা পদার্থের তাপমাত্রার পরিবর্তন করলে তাপতড়িতী ঘটনার (Thermoelectric effect) জন্যে পরিমাপে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, যদি শলাকা দুটির তাপমাত্রার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে। এই ত্রুটি দূর করবার জন্যে নমুনা পদার্থে তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ বিপরীতমুখী করা হয়।

বর্তমানে সাধারণ পোটেনসিয়োমিটার ও গ্যালভানোমিটারের পরিবর্তে আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিমাপের কাজে লাগানো হয়। শুধু যে ডিজিটাল ভোল্টমিটার (Digital voltmeter) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়—তাই নয়, যন্ত্রগণকের (Computer) সাহায্যে সরাসরি তাপমাত্রা বনাম হোল গুণাঙ্ক এবং পরিবাহিতা রেখচিত্রও (Curve) পাওয়া যায়। খুব কম তাপমাত্রায় যখন অর্ধপরিবাহীর রোধ খুব বৃদ্ধি পায়, তখন ডিজিটাল ভোল্টমিটারের পরিবর্তে তড়িৎমিটার (Electrometer) ব্যবহার করা হয়।

হল এফেক্ট সংক্রান্ত পরিমাপের জন্যে সব সময় নমুনা পদার্থটির আয়তকার হবার প্রয়োজন নেই। সর্বত্র সমান বেধযুক্ত অনিয়মিত আকারের নমুনার ক্ষেত্রে হল এফেক্ট সংক্রান্ত পরিমাপের একটি পদ্ধতি গড়ে তুলেছে ভ্যান ডার পাউ (Van der Pauw)। অবশ্য নমুনা পদার্থটি সম্পূর্ণরূপে সমসত্ত্ব না হলে পরিমাপে কিছু ত্রুটি থেকে যায়।

অ্যালনিকো সঙ্কর ধাতুর ঢালাই স্থায়ী চুম্বক

শ্রীসুধেন্দুকুমার দত্ত

ভূমিকা

প্রাকৃতিক স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ বহু প্রাচীন কালেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন হয়েছে বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে। প্রথম উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় 1917 সালে। তখন অধিকতর শক্তিশালী কোবাল্ট [Co] যুক্ত চৌম্বক ইস্পাত তৈরী হয়। 1930 সালের পর প্রথমে অ্যালুমিনিয়াম নিকেল আয়রন বা অ্যালনি [Alni] এবং তারপর অ্যালুমিনিয়াম নিকেল-কোবাল্ট আয়রন বা অ্যালনিকো [Alnico] শ্রেণীর চৌম্বক সঙ্কর ধাতুর প্রবর্তনে স্থায়ী চুম্বক তৈরীর ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটে। এই দুই প্রকারের সঙ্কর ধাতুই এখন অ্যালনিকো নামে খ্যাত। এর পর আসে ফেরাইট [Ferrite] চুম্বক। স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের উন্নয়নে সাম্প্রতিক অগ্রগতি সূচিত হয়েছে 1967 সালে—অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কোবাল্ট-স্থামারিয়ম [Samarium] চৌম্বক সঙ্কর ধাতুর উদ্ভাবনায়।

অ্যালনিকো শ্রেণীর চুম্বকের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশী ব্যাপক। লাউড স্পীকার পরিমাপক যন্ত্র, ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, টেলিফোন, ম্যাগনেটো [Magneto], টেলিভিশন-রিসিভার, থার্মোষ্ট্যাট [Thermostat], ম্যাগনেটিক কনভেয়ার [Conveyer], ম্যাগনেটিক সেপারেটার [Separator] ম্যাগনেটিক চাক [Chuck], ম্যাগনেটিক ড্রাইভ [Drive], ডেফ এড [Deaf aid] রেডার ম্যাগনেট্রন, [Rader magnetron], ওয়েভ গাইড আইসোলেটর [Wave guide isolator] এবং আরও অনেক যন্ত্রে অ্যালনিকো চুম্বক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষুদ্রায়তন চুম্বকের চাহিদাই বেশী। তিন চার গ্রাম পর্যন্ত ওজনের অ্যালনিকোর পর্যাপ্ত শক্তিশালী চুম্বক তৈরী সম্ভব।

প্রত্যেক উন্নত দেশেই প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক অ্যালনিকো চুম্বক নিজেদের এবং বিদেশী চাহিদা মিটাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যার প্রায় সমান সংখ্যক চুম্বক প্রতি বছর সেখানে তৈরী হচ্ছে।

ভারতে এখন নানাবিধ শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন চলছে। হরেক রকম যন্ত্রপাতি, দেশী মালমসলা দিয়ে তৈরী করবার প্রয়োজন হয়েছে এবং তৈরীর প্রচেষ্টাও চলছে। অ্যালনিকো স্থায়ী চুম্বকের চাহিদাও সেজন্যে ক্রমবর্ধমান। দুটি বেসরকারী কারখানায় এখন এই শ্রেণীর চুম্বক তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এদের উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ধাতুবিষয়ক প্রয়োগিক উন্নয়ন বিভাগের একটি সংস্থা আজ অনেক বছর যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় চুম্বক তৈরী করছে এবং টেলিফোন শিল্পের চুম্বক চাহিদাও আংশিক মিটিয়ে আসছে। এই সংস্থার বিজ্ঞানীরাই নিজেদের পরীক্ষাগারে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে 1956 সালে অ্যালনিকো শ্রেণীর সমসারক [Isotropic], এবং বিষমসারক [Anisotropice], ঢালাই [Cast] করা চুম্বক উৎপাদন ভারতে সর্বপ্রথম সুরু করতে সমর্থ হন।

স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ এবং চুম্বকের কর্মরেখা [Performance curve], অ্যালনিকো শ্রেণীর

চৌম্বক পদার্থের রাসায়নিক সংযুতি, মেটালার্জিক্যাল [Matallurgical] বৈশিষ্ট্য, চুম্বকের নক্সা (Design) বৈশিষ্ট্য, ঢালাই চুম্বক ও সংযুক্ত চুম্বক (Composite magnet) প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ ও চুম্বকের কর্মরেখা

1নং চিত্রে স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের হিস্টারিসিস লুপ (Hysteresis loop)। সংপৃক্তির পর চুম্বকন বল (Magnetising Force) সরিয়ে নিলে
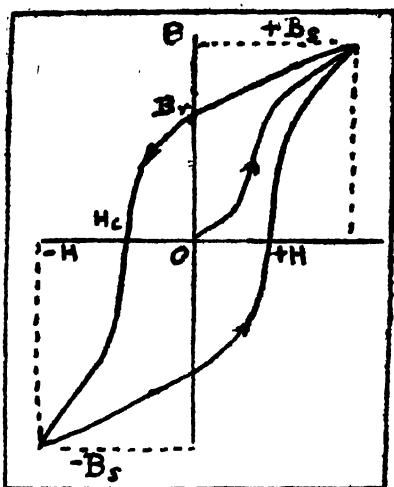
1নং চিত্র

সেটুকু ফেরিক (Ferric) আবেশ স্থায়ীভাবে থাকে, তাই চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমতা (Remanence) বা B_r। এই স্থায়ী চুম্বকত্ব লোপ করতে যতটা বিচুম্বকন (Demagnetising) বল প্রয়োগ দরকার, তাই হলো চৌম্বক পদার্থের বিচুম্বকন বল সহনশীলতা (Coercivity) বা H_c।

হিস্টারিসিস লুপের ক্ষেত্রফল যত বেশী হবে, স্থায়ী চুম্বক বা হার্ড (Hard) চৌম্বক পদার্থের কর্মশক্তি তত বাড়বে। Hc চৌম্বক পদার্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অস্থায়ী বা সফ্‌ট্ (Soft) চৌম্বক পদার্থের Hc খুব সামান্য থাকে। অ্যালনিকো শ্রেণীর স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের ন্যূনতম H_c হলো 440 ওয়েরস্টেড (Oersted)। চুম্বক সংহত চৌম্বক বর্তনীতে থাকলে চৌম্বক প্রভাব (Flux) বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। কোন ফাঁক (Gap) থাকলে 'ফ্লাক্স' বেরিয়ে আসে। বেশীর ভাগ প্রয়োগেই স্থায়ী চুম্বককে তার ফাঁকে 'ফ্লাক্স' যোগাতে হয়। চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী ফাঁকের শক্তি চুম্বক থেকেই আসছে এবং তা যোগাতে চুম্বকে আনুপাতিক বিচুম্বকন ঘটছে। বর্তনী উন্মুক্ত করা, বিচুম্বকন বল প্রয়োগ করবার সমতুল্য। চুম্বক তখন হিস্টারিসিস্ লুপের বামদিকের উপরিপাদে কর্মতৎপর। চুম্বকের বিচুম্বকন রেখা শুধু ঐ লুপের বামদিকের উপরিপাদের অংশটুকু, অর্থাৎ B_r বিন্দু থেকে Hc বিন্দু পর্যন্ত নেমে আসা রেখা। এটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, চুম্বকের কর্মশক্তি নির্দেশক রেখা বা কর্মরেখা। স্থায়ী চুম্বক তত্ত্বে এই রেখা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তবে চুম্বকের কাজ করবার বিন্দু (Working point) কর্মরেখার উপর বা তার ডান দিকে থাকে।

কর্মরেখার বিভিন্ন বিন্দুর স্থানাঙ্ক B বা H এবং গুণফলের (B×H) লেখচিত্রে (2 নং চিত্র) N বিন্দু B এবং H-এর সর্বোচ্চ গুণফল সূচিত করছে। কর্মরেখার P বিন্দুই (BH) সর্বোচ্চ বিন্দু অর্থাৎ P বিন্দুর স্থানাঙ্কের গুণফলই সর্বোচ্চ।

কোন স্থায়ী চুম্বকের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের চৌম্বক শক্তি, কর্মরেখার B এবং H-এর গুণফলের সমানুপাতিক।

চুম্বক P বিন্দুতে কাজ করবার সময়ই সর্বোচ্চ শক্তি যোগাবে। কাজেই চুম্বক পরিকল্পনা এমন ভাবেই করতে হয়, যাতে চুম্বকের কর্মবিন্দু, ব্যবহৃত চৌম্বক পদার্থের (BH) সর্বোচ্চ বিন্দুর যতদূর সম্ভব সন্নিকট থাকে। (BH) সর্বোচ্চ মানই স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের উৎকর্ষ বিচারের

মাপকাঠি। এই মান যত বেশী হবে, চুম্বক ততই শক্তিশালী হবে এবং চুম্বক তৈরীতে চৌম্বক পদার্থের পরিমাণও তত কম দরকার হবে। চুম্বকের আয়তন

2নং চিত্র

চৌম্বক পদার্থের (BH) সর্বোচ্চ মানের ব্যস্তানুপাতিক। প্রস্থচ্ছেদ এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে (BH) সর্বোচ্চ বিন্দুর স্থানাঙ্ক B এবং H-এর ব্যস্তানুপাতিক।

16·0 মেগা-গাউস-ওয়েরষ্টেড (Mega-Gauss-Oersted : M. G O) পর্যন্ত (BH) সর্বোচ্চ মানের চৌম্বক পদার্থ তৈরী সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের (BH) সর্বোচ্চ মান হলো —1% কার্বন ইস্পাতে 0·2, 6% ক্রোমিয়াম ইস্পাতে 0·3, 35% কোবাল্ট ইস্পাতে 1·0, সমসারক অ্যালনিকোতে 1·5—2·8, বিষমসারক অ্যালনিকোতে 3·5—8·5, প্ল্যাটিনাম-কোবাল্ট সঙ্কর ধাতুতে 9·2, এবং কোবাল্ট স্যামারিয়াম সঙ্কর ধাতুতে 16·0 M, G. O

অ্যালনিকোর রাসায়নিক সংযুতি

অ্যালুমিনিয়াম [A_l], নিকেল, [N_i], কোবাল্ট, তামা [C_u] এবং আয়রন [F_e] অ্যালনিকো তৈরীর প্রধান উপাদান। কিন্তু এদের সবরকম আনুপাতিক সমন্বয়ে প্রস্তুত সঙ্কর ধাতুই চৌম্বক ধর্মী নয়। সংযুতির খুব সীমাবদ্ধ পরিসরেই, স্থায়ী চৌম্বকধর্মী পদার্থ পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ কোবাল্টবিহীন সমসারক অ্যালনিকোতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ: A_l 10-13%, N_i 18-30%, C_u 2·5-4·0% বাদ বাকী আয়রন। কোবাল্টযুক্ত সমসারক অ্যালনিকোতে: A_l 8-10%, N_i 18-25%, C_u 0-8·0%, C_o 5-12% বাদবাকী আয়রন। বিষমসারক অ্যালনিকোতে: A_l 7-8%, N_i 12-15%, C_u 1·5-4·0%, C_o 15-25% বাদবাকী আয়রন থাকে। অ্যালনিকো তৈরীর জন্যে কোবাল্ট ব্যবহৃত হয়। তড়িৎবিশ্লিষ্ট উচ্চ বিশুদ্ধতাযুক্ত তামা ব্যবহার করা হয়। ঢালাই অ্যালনিকোতে ম্যাঙ্গানিজ, টাংষ্টেন, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম, দস্তা টিন, ম্যাগনেসিয়ম এবং আর্সেনিকের উপস্থিতি ক্ষতিকারক। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য মাত্রায় সিলিকন যোগ করলে চৌম্বক শক্তির উন্নতি হয়। কতক ক্ষেত্রে 4-6·5% টাইটেনিয়াম দেওয়া হয়; তাতে H_c বেশ বেড়ে যায়। ঢালাই চুম্বকে লম্বা স্তম্ভাকার দানা গড়লে 0·5/0·8% নিওবিয়াম সহায়ক হয়।

চুম্বক পরিকল্পনা বা ডিজাইন পদ্ধতি

অ্যালনিকো চুম্বকের গাত্রে সরু বা তীক্ষ্ণ কোণ পরিহার করতে হয়। ঢালাই চুম্বকে এসব স্থানে ফাটলের উদ্ভব হতে পারে। ব্লক এবং রিং আকারের চুম্বক ঢালাই সহজসাধ্য। চুম্বকে ছিদ্র রাখা হয় না। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত চুম্বকের কোন মাত্রায় অতি সঙ্কীর্ণ টলারেন্স (Tolerance) আরোপ করা হয় না। নক্সায় চুম্বকের ফাঁকের 'ফ্লাক্স' ঘনত্ব উল্লেখ করা হয়। অখণ্ড বহুমেরুবিশিষ্ট চুম্বক শুধু সমসারক চৌম্বক পদার্থ দিয়ে তৈরী করাই সহজ। বিষমসারক পদার্থের চুম্বকের নক্সায় চুম্বকনের অভিমুখ চিহ্নিত করতে হয়।

কোন চুম্বকে 'ফ্লাক্স' কেন্দ্রীভূত করতে হলে কাঁচা বা নরম লোহার (Soft iron) উপযুক্ত আকৃতি বিশিষ্ট মেরুখণ্ডের (Pole piece) সাহায্যে করা হয়। বড় চুম্বক করতে, ছোট ছোট খণ্ডে চুম্বক ঢালাই করে সেগুলি উপযুক্ত হিটিং ট্রিমেন্টের পর সংযুক্ত করে নেওয়া হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি

অ্যালনিকো শ্রেণীর ঢালাই চুম্বক উৎপাদনের জন্যে প্রথমতঃ উপযুক্ত চুল্লীতে ধাতব উপাদান-গুলি গলানো এবং ঢালাই করা হয়। তারপর ঢালাই চুম্বকের হিটিং ট্রিটমেন্ট, মেসিনিং এবং শেষ পর্যায়ে মেসিন-করা অচুম্বকিত চুম্বক খণ্ডের চুম্বকন এবং অভীক্ষণ (Test) করা হয়।

উচ্চ কম্পাঙ্ক (দু-হাজার প্রতি সেকেণ্ডের) বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিলিমেনাইট (Sillimanete) মুষাতে (Crucible) ধাতব উপাদানগুলি গলানো হয়। ধাতুগুলি ছোট ছোট টুক্‌রো করে নিতে হয়। অব্যবহার্য অ্যালনিকো চুম্বকও কতক পরিমাণে মিশানো যায়। গলন-ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়; গলিত সঙ্কর ধাতুর উপরিতলে অক্সাইড তৈরী সামান্যই হয়। বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত গোড়াতেই এমনভাবে স্থির করে নিতে হয়, যাতে ঢালাই চুম্বকে উদ্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুতি পাওয়া যায়। ভারী ধাতুগুলি গলে যাবার পর ঢালাই করবার অল্পক্ষণ আগে অ্যালুমিনিয়াম মিশানোই প্রশস্ত। অ্যালুমিনিয়াম 3-8% অপচয় হয়।

ঢালাইয়ের আগে তরল সঙ্কর ধাতু অতিতপ্ত (Super-heated) করে উপযুক্ত তাপমাত্রায় [1600-1650] সেঃ] উঠিয়ে নিয়ে চুল্লী কাত করে বালির ছাঁচে বা শেল-ছাঁচে [Shellmould] ঢালা হয়।

চুম্বক ঢালাই হয়ে ঠাণ্ডা হলে, [Gate], রাইজার [Riser] এবং রানার [Runner] বাদ দিয়ে চুম্বকগুলি আলাদা করে নিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

মেটালার্জিক্যাল বৈশিষ্ট্য ও হিটিং ট্রিটমেন্ট

আলোচ্য অ্যালনিকো সঙ্কর ধাতুগুলি রোলিং [Rolling] বা ফোর্জিং [Forging] যোগ্য নয়। মেসিনিং করেও আকার দেওয়া যায় না। নক্সানুযায়ী, ঢালাই করেই আকার দিতে হয়। তবে সামান্য গ্রাইণ্ডিং [Grinding] করা চলে। অ্যালনিকো চুম্বক ভঙ্গুর এবং কড়া প্রকৃতিযুক্ত। এগুলির মধ্যে কতকগুলি সমসারক চৌম্বক ধর্মযুক্ত; এগুলির চৌম্বক ধর্ম সব দিকে সমান। আবার কতকগুলি বিষমসারক বা অভিমুখী চৌম্বকধর্ম বিশিষ্ট; বাঞ্ছিত অক্ষে অনেক বেশী চৌম্বক শক্তির উদ্ভব হয়।

পূর্ণমাত্রায় চৌম্বক শক্তি পেতে হলে চুম্বকনের আগে চুম্বকের উপযুক্ত হিটিং ট্রিটমেন্ট অপরিহার্য।

কোমলায়ন করে অ্যালনিকো সঙ্কর ধাতুর ঢালাই চুম্বকের কড়া প্রকৃতি দূর করা যায় না।

ছাঁচে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢালাই চৌম্বক পদার্থের ম্যাট্রিক্সের [Matrix] গঠনে সমসত্ত্বতা থাকে না এবং একাধিক দশা [Phase] থাকতে পারে। ম্যাট্রিক্স থেকে বেরিয়ে আসা দশা ম্যাট্রিক্সে পুনরায় যথাসম্ভব দ্রবীভূত করবার জন্যে উপযুক্ত তাপমাত্রায় ট্রিটমেন্ট করা হয়; তাতে সম-সত্ত্বতাও আসে। এই কঠিন অবস্থার দ্রবণ [Solid solution] ট্রিটমেন্টের তাপমাত্রা রাসায়নিক সংযুতির উপর নির্ভর করে। এই তাপমাত্রা থেকে বিষমসারক অ্যালনিকো চৌম্বক ক্ষেত্রে [প্রায় 1000 ওয়েরস্টেড] এবং সমসারক অ্যালনিকো চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়াই যথোপযুক্ত দ্রুত হারে কুরী বিন্দু দিয়ে ঠাণ্ডা করা দরকার।

উচ্চতাপমাত্রা থেকে ঠাণ্ডা হবার পর নিম্নতাপমাত্রায় ক্ষেপণ ট্রিটমেন্ট [Precipitation treatment] দিতে হয়। এখানে

উল্লেখ্য এই যে, ম্যাট্রিক থেকে দশা সম্পূর্ণ বেরিয়ে না এসে ক্ষেপণোন্মুখ অবস্থায় থাকলেই চুম্বকে উচ্চ চুম্বক শক্তি পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যালনিকোর হিটট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে আভাস দেওয়া হলো—

(1) কোবাল্টবিহীন অ্যালনিকো—1050-1150° সেঃ তাপমাত্রায় উঠিয়ে বাতাসে প্রতি সেকেণ্ডে 0·5-5° সেঃ হারে ঠাণ্ডা করে 600-700° সেঃ তাপমাত্রায় তপ্ত করতে হবে।

(2) 20% এর বেশী কোবাল্টযুক্ত অ্যালনিকো—1200-1300° সেঃ তাপমাত্রায় উঠিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে 1-1·5° সেঃ হারে চৌম্বক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা করে পুনরায় 540-650° সেঃ তাপমাত্রায় তপ্ত করতে হবে।

হিটট্রিটমেন্টের জন্যে 1400° সেঃ এবং 1000° সেঃ সংবৃত [Maffle] চুল্লী ব্যবহৃত হয়। চৌম্বকক্ষেত্রে ঠাণ্ডার করবার জন্যে তড়িচ্চুম্বক [1000-1500] ওয়েরষ্টেড দরকার।

চুম্বক মেসিনিং

হিটট্রিটমেন্টের পর চুম্বকখণ্ডগুলি স্যাণ্ডব্লাষ্টিং (Sandblasting) করে পরিষ্কার করা হয়। তারপর ভিজা অবস্থায় গ্রাইণ্ডিং করা হয়। কেবল মেরু মুখই সাধারণতঃ গ্রাইণ্ডিং করে মসৃণ করা হয়ে থাকে। মেরুমুখ ছাড়া চুম্বকের অন্য ধার রং বা ধাতু অবক্ষেপ [Plating] করে সুদৃশ্য করা যেতে পারে।

চুম্বকন

স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ সংহত চৌম্বক বর্তনীতে রেখে চুম্বকন করলে পূর্ণমাত্রায় চুম্বকত্ব পাওয়া যায়। তাই অচুম্বকিত অবস্থায় চুম্বক যে যন্ত্রে ব্যবহৃত হবে, সেই যন্ত্রের চৌম্বক বর্তনীতে বসিয়ে চুম্বকন বিধেয়। চুম্বকন করবার জন্যে শক্তিশালী স্থায়ী বা তড়িচ্চুম্বক ব্যবহার করতে হয়। চৌম্বক পদার্থে চৌম্বক সংপৃক্তি পেতে হলে চুম্বকন বল চৌম্বক পদার্থের বিচুম্বন বল সহনশীলতার চার পাঁচ গুণ শক্তিশালী দরকার। 2500 অ্যাম্পিয়ার টার্ন (Ampere turn) যুক্ত তড়িচ্চুম্বক দিয়ে বেশ কয়েক শ্রেণীর অ্যালনিকো চুম্বকন সম্ভব।

মেরুখণ্ড এবং সংযুক্ত চুম্বক

সরলাকৃতির চুম্বক তৈরী সহজ। কিন্তু জটিল আকৃতির চুম্বকেরও বিস্তর প্রয়োগ আছে। জটিল আকৃতির চুম্বক সরলাকৃতির চুম্বকের যথাযথ বিন্যাসে মেরুখণ্ডের সাহায্যে তৈরী করা যায়। এক কিম্বা একাধিক স্থায়ী চুম্বক অংশের সঙ্গে কাঁচা লোহা বা অন্য অস্থায়ী চৌম্বক পদার্থের মেরুখণ্ড বা জোয়াল (Yoke) যোজনা করে সংযুক্ত জটিল আকৃতির চুম্বক তৈরী করা যায়। মেরুখণ্ড বা জোয়াল স্থায়ী চুম্বকের সঙ্গে অচৌম্বক বোল্ট (Bolt) দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়। অ্যারহেলডাইট (Arheldite) বা অন্য কোন রেজিন দিয়েও জোড়া দেওয়া যায়। এভাবে জোড়া দিয়ে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কেজি ওজনের সংযুক্ত চুম্বক তৈরী সম্ভব।

অভিক্ষণ

চুম্বক ঢালাইয়ের সঙ্গে, প্রতি ব্যাচে (Batch) একটি করে টেষ্ট পীচও ঢালাই করা হয়। হিটট্রিটমেন্টের পর এই টেষ্টপীচে B_r, H_c এবং (BH) সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট মানের পাওয়া যাচ্ছে কিনা, তা নির্ণয় করা হয়। এই মান গ্রহণযোগ্য হলে ব্যাচের চুম্বকগুলির ব্যবহারিক যোগ্যতা, ফ্লাক্স মিটার এবং সার্চকয়েলের সাহায্যে যাচাই করা যায়। ব্যবহার সন্তোষজনক—এরূপ একটি চুম্বক পাওয়া গেলে এটিকে ব্যবহারিক যোগ্যতার মানক ধরে নিয়ে এই একই আকৃতি এবং মাত্রার ও একই পদার্থের তৈরী চুম্বকের যোগ্যতা অতি সহজে ফ্লাক্সমিটার ও সার্চকয়েলের সাহায্যে যাচাই করা যায়।

উপসংহার

1. চুম্বক তৈরীর ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হবার জন্যে আরও নূতন কারখানা স্থাপনা দরকার।

2. চুম্বক তৈরীর জন্যে খুব বেশী বড় বৈদ্যুতিকচুল্লীর দরকার হয় না।

3 উচ্চ কম্পাঙ্ক বৈদ্যুতিক চুল্লী এখনও ভারতে তৈরী করা হয় নি; তবে তা তৈরীর সম্ভাবনা রয়েছে।

4. নিকেল, কোবাল্ট এবং কাঁচালোহা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। তবে কতক পরিমাণ নিকেল ও কোবাল্ট অদূর ভবিষ্যতে ভারতে উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। বিদেশ থেকে তৈরী চুম্বক আমদানী না করে চুম্বক তৈরীর কাঁচামাল আমদানী করে চুম্বক তৈরী করে চাহিদা মেটাতে পারলেও বেশ কিছু পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা বাঁচবে।

5. চুম্বক উৎপাদনের প্রকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধাতুতত্ত্ববিদ্ ভারতেই অনেক আছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

সায়েন্স ফিকশন

শ্যামলকুমার মজুমদার*

আমাদের ছোটবেলায় রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের বই পড়তে খুবই ভাল লাগতো। বিশেষ করে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের' বইগুলি। তার প্রায় সবকয়টাই পড়া হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'মিসমীদের কবচ', সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'নীল আলো', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'জয়ন্তের কীর্তি' প্রভৃতি বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে পড়া হয়ে যেত। অবশ্য শুধু যে রহস্যের বই ভাল লাগতো—তা নয়। অ্যাডভেঞ্চারের বইও স্কুলের ছেলেদের কাছে সমান প্রিয় ছিল। বিশেষ করে জুল ভের্নএর 'আশ্চর্য দ্বীপ' (কুলদা-রঞ্জন রায়ের অনুবাদ), এইচ. জি. ওয়েল্‌সের 'দ্য ফার্স্ট মেন অন দি মুন', বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' আর প্রেমেন মিত্রের লেখা ঘনাদার গল্প।

এখনকার ছেলেমেয়েরা কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই পড়ে কিনা জানি না, তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, সমরজিৎ কর ও অদ্রীশ বর্ধনের লেখা গল্প যে তাদের পড়তে ভাল লাগে, সেটা-আঁচ করতে পারি। বাংলা ভাষায় (শুধু বাংলা কেন, বোধ হয় সব ভারতীয় ভাষার মধ্যে) বিজ্ঞান-ধর্মী গল্প প্রথম লেখেন প্রেমেন মিত্র। এখনকার কালে রহস্য উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানে বিচিত্র আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে লেখা গল্প বা সংক্ষেপে সায়েন্স ফিকশন।

আমেরিকান এডগার এলান পো (1809-1849), ফরাসী জুল ভের্ন (1828-1905) ইংরেজ এইচ. জি. ওয়েলস (1866-1946) সায়েন্স ফিকশনের প্রথম লেখকদের অন্যতম। সায়েন্স ফিকশনের (এস. এফ. সিরিজ) অনেক ইংরেজী বই আজকাল বেরোচ্ছে। বোধ হয় বিদেশে, বিশেষ করে মার্কিন দেশে, এর কদর রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের চেয়ে কম নয়। কোন্ গল্প সায়েন্স ফিকশন আর কোন্‌টা শুধু ফিকশন ?

সায়েন্স ফিকশন বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে লেখা এক বিশেষ ধরণের গল্পের বই। ধরা যাক, 2222 সালে আমাদের পৃথিবী থেকে বৃহস্পতিগ্রহে মহা-

* কম্পিউটার সেন্টার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32।

কাশযান পাঠানো নিয়ে বড় বড় পাঁচটি দেশের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ের কি পরিণতি লেখক তা ফুটিয়ে তোলবেন কল্পনার নানা রঙে। কিন্তু লেখককে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে তার সময় লাগছে তিন-শ' পঁয়ষট্টি দিন (2222 সাল 'লিপ ইয়ার' নয়)। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। 2222 সালের ভিতর পৃথিবীতে বড় রকমের কোন ভৌগোলিক রদবদল হবে না—তা ধরে নওয়া গেল। লেখক গল্পের কোন জায়গায় এমন কোন মন্তব্য করবেন না, যা এই তথ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদি কোন অসঙ্গতি থাকে, তবে গল্পটি হবে নিছক কল্পনা, সায়েন্স ফিকশন নয়।

শুধু ভবিষ্যতে কি ঘটবে তাই নিয়ে বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প লিখতে হবে? মোটেই নয়। অতীতকে নিয়ে, এমন কি বর্তমানকে নিয়েও বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী লেখা চলতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গল্পের পটভূমি পৃথিবীকে না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ অতীত ও এখনকার পৃথিবীর অনেক কিছুই ইতিহাসের বই প্রভৃতি থেকে জানা যায়। বেফাঁস কিছু লিখলেই লেখককে জবাবদিহি করতে হবে। দরকার কি ঝামেলা পোয়াবার?

সায়েন্স ফিকশনে বিমলকুমার, হেমন্ত-মাণিক জয়ন্ত, রবীন আছে কি? আলবৎ আছে। প্রোফেসর শঙ্কুকে দেখা যাক। ওঁর দু-জন সহকর্মী প্রহ্লাদ ও বিধুশেখর। বিড়াল, নিউটনতো আছেই। অবশ্য বিধুশেখর কোন মানুষ নয়, এক জটিল কম্পিউটার। আর্থার ক্লার্কের মহাকাশ-চারী বিজ্ঞানীর নাম হাওয়ার্ড ফালকন। শোনা যায় বৃহস্পতি গ্রহের আবহাওয়া মণ্ডলে উনিই প্রথম নেমেছিলেন। প্রেমেন মিত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের হিরো গুলবাজ ঘনাদা (ঘনাদা গুল মারেন সত্য, কিন্তু তাঁর কাহিনীর মধ্যে বিজ্ঞানের সম্ভাব্য সত্যগুলি লুকিয়ে থাকে সব সময়েই !)

কি কি বিষয় নিয়ে সায়েন্স ফিকসন লেখা হচ্ছে? প্রথমেই আসছে মহাকাশ পাড়ি দেওয়া নিয়ে নানা রসালো গল্প। এই গল্পের সুরু জুল ভের্নের সময় থেকে। আজও এ নিয়ে গল্প লেখা ফুরলো না। সময়ের ভেলায় চড়ে ভবিষ্যতে পৌঁছে যাবার কল্পনাও বাদ যায় নি (এইচ. জি. ওয়েলসের লেখা 'টাইম মেশিন' নিশ্চয়ই অনেকের পড়া হয়ে গেছে)। সময়কে নিয়ে নানা গল্প ফাঁদা হয়েছে। সময়ের হেরফের করে জমাট গোয়েন্দা গল্পও লেখা চলে। যদি 'ভবিষ্যতে'র চোর পালিয়ে আসে বর্তমানে কিংবা তখনকার জেল থেকে পালানো আসামী যদি আশ্রয় নেয় 'ভবিষ্যতে', তবে তাকে কি করে ধরা যাবে? সময় কি ভাবে বয়ে চলে? নদীর স্রোতের প্রায়? বোধ হয় না। সময়কে নিয়ে অসময় অনেক মাথা ঘামাবার 'রিলেটিভ' ব্যাপার আছে। সায়েন্স ফিকশনে আজগুবি কল্পনা একেবারে বাতিল। এরপর পারমাণবিক অস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্রের গোপন কারখানা, কম্পিউটার লেবোরেটরীতে সৃষ্টি কৃত্রিম জীব প্রভৃতি নানা ধরণের বিষয় নিয়েও বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী লেখা হচ্ছে। কারোর কারোর ধারণা যে, এক-শ' বছরের মধ্যে আমরা কম্পিউটারকে চালাবো না, কম্পিউটারই আমাদের চালাবে। তখন আমরা কি করবো? ঘরে বসে কাঁদবো, না ভুল অঙ্ক করবো? আবার গামা রশ্মির কথা ভুলে গেলে চলবে না। এর প্রভাবে এক-শ' বছরের অনেক আগেই আমরা 'গামানুষ'ও হয়ে যেতে পারি। সবাইতো তলে তলে (ইমপ্রোশন) পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। সুতরাং আমরা গামা রশ্মির হাত (কটা হাত কে জানে) থেকে রেহাই পাবো কি করে?

এই সব ভয়ঙ্কর বিষয় নিয়ে লেখা গল্প পড়তে

কার ভাল লাগে? বিজ্ঞানের কলাকৌশলের কেরামতি নিয়ে লেখা সব গল্পই কি 'সিরিয়াস' ধরণের? তা নয় কিন্তু। বিজ্ঞানের অনেক খোস গল্প লেখা হয়েছে যেখানে পুরনো ঘটনাকে নতুন আবিষ্কারের আলোয় দেখা হচ্ছে। যেমন —লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির (1452-1519) মত শিল্পী আধুনিক কম্পিউটার যন্ত্রকে কি ভাবে কাজে লাগাতেন? কোপার্নিকাসের (1473-1543) গ্রহগুলির কক্ষপথ সম্পর্কিত যে গণনা শেষ করতে চার বছর সময় লেগেছিল, আধুনিক দ্রুতগতির কম্পিউটারে সেই গণনা (প্রোগ্রামিং-এর সময় বাদ দিয়ে) প্রায় কুড়ি মিনিটে করা যায়। কল্পনা করা যাক, যদি কোপার্নিকাস এখনকার একটা কম্পিউটার যন্ত্র পেতেন, তবে তাঁর কত সময় বেঁচে যেত, আরও কত গভীর তত্ত্ব ও জটিল গণনা তিনি করতে পারতেন। যদি গ্যালিলিও (1564-1642) পেতেন রেডিও-টেলিস্কোপ, তবে মহাকাশের 'অন্ধকূপের' সন্ধান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো কি? 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পাতায় অনেকে পড়ে থাকবেন যে, মহাকাশের অন্ধকূপ হচ্ছে একধরণের নক্ষত্র যাদের আলো গেছে নীবে, কিন্তু তাদের মহাকর্ষ শক্তি যায় নি ফুরিয়ে। এদের কাছে কেউ এলেই মহাকর্ষ শক্তি তাদের বেমালুম গিলে ফেলবে।

সায়েন্স ফিকশন হাল্কা ধরণেরও হতে পারে। বিজ্ঞানকে পিছনে রেখে অনেক লেখক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের গল্পও লিখেছেন। একটা গল্প এখানে বলছি। ডক্টর শেকারি একজন নক্ষত্র-বিজ্ঞানী। তিনি আরও বড় হতে চান, নাম করতে চান, চান যে সারা দুনিয়ার লোক তাঁর নাম জানুক। আইনস্টাইন লিখেছেন 'রিলেটিভিটি' থিয়োরী। সব ঘটনার মধ্যে একটা কিছু যোগসূত্র আছেই। এটাই রেলেভ্যান্স থিয়োরী, কিন্তু বিজ্ঞানী মহলের শেকারি পাত্তা পেলেন না। তখন উনি গ্যালিলিও ও কেপলারের গণনায় ভুল বের করতে লাগলেন। নাঃ, সবই নির্ভুল। আহাম্মকের (!!) দল কোন একটা ভুলও করে নি, যেটা বের করে বিশ্ববিখ্যাত হতে পারেন। ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে ওঠলেন। কোন নতুন নক্ষত্র আকাশে দেখা দিল নাকি? টেলিস্কোপে কিছু ধরা পড়লো না। হতভাগা নক্ষত্রের দল! এদিকে কাজ ঠিকমত না করায় লেবোরেটরী থেকে শেকারির চাকরী যায় আর কি। ভয়ে, উত্তেজনায় শেকারির পেটের অসুখ করলো। পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মারা গেলেন বৈজ্ঞানিক শেকারি। কিন্তু মারাত্মক সেই পেটের অসুখ, যার প্রথম বলি শেকারি। কারণ শেকারির মৃত্যুর পর লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, রোমে হঠাৎ হঠাৎ লোকে পেটের অসুখে মরতে লাগলো। দেখা গেল শেকারি যে রোগ-জীবাণুর আক্রমণে মারা গেলেন, ঐ একই রোগের জীবাণু অন্যেরও মৃত্যুর কারণ। বিজ্ঞানীরা অসুখটির নাম দিলেন 'শেকারির রোগ'। যে বিজ্ঞানী বেঁচে থাকতে বিখ্যাত হতে পারলেন না, মারা গিয়ে তাঁর গলায় এল অমরত্বের জয়মাল্য। বিফল বিজ্ঞানীর সফল মৃত্যু। শেকারীর বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টাটা সত্যই হাস্যকর, কিন্তু তাঁর মৃত্যু সত্যই বড় আফশোষের।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে বিজ্ঞানের কল্প কাহিনীর লেখকের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। শুধু বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাল পড়াশোনা বা জানা থাকলেই ভাল বিজ্ঞান-লেখক হওয়া যায় না; সেই সঙ্গে চাই লেখকের বিজ্ঞানীসুলভ মনোভাব ও বিজ্ঞানের গল্প লেখবার প্রতি আগ্রহ। তাহলেই তৈরী হবে একটা জমাট গল্প, যেটা পড়ে পাঠক শুধু বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠবে—তাই নয়, আনন্দও পাবে। এইখানে এসে—আশা করি—রিপ ভ্যান উইংকেলের গল্পটা মনে পড়বে না।

লুমিনেসেন্স

শৈলেশ দাশ*

আমাদের চোখের সামনে এমন অনেক পদার্থ দেখে থাকি, যেগুলি থেকে মনে হয় আলো নির্গত হচ্ছে। যেমন জীবজন্তুর চোখ, ফসফরাস প্রভৃতি। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় luminesent এবং এই বিশেষ গুণটিকে বলা হয় লুমিনিসেন্স।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা জানি কোন পদার্থকে বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা উত্তেজিত করা হলে পদার্থের পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রনগুলি তাদের নিজস্ব কক্ষ থেকে উপরের কক্ষে উঠে পড়ে। পরে যখন সেই সব ইলেকট্রন তাদের প্রাথমিক কক্ষে ফিরে আসে, তখনই তারা আলোক বিকিরণ করে থাকে। এ ছাড়াও অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন পদার্থের অণুগুলিকে যখন বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগে উত্তেজিত করা হয়, তখন তাদের গতিশক্তি (Kinetic energy) বাড়ে। ফলে পদার্থের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তখনই পদার্থটি আলো বিকিরণ করে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক E. Wideman-এর মতে কোন অণুসমষ্টিকে তার গতিশক্তি বৃদ্ধি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ব্যতিরেকেও উত্তেজিত করা সম্ভব এবং এই পরিস্থিতিতে পদার্থ থেকে যে বিকিরণ হয়, তার তিনি নাম দিলেন লুমিনেসেন্স। এই নতুন বিকিরণটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি কারচফের বিকিরণ সূত্র মেনে চলে না।

লুমিনেসেন্স সাধারণতঃ প্রতিপ্রভা (Fluorescence) কিংবা অনুপ্রভা (Phosphorescence) হতে পারে।

প্রতিপ্রভা হলো পদার্থের উপর বাইরে থেকে যে শক্তি প্রয়োগের ফলে পদার্থের অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের প্রাথমিক শক্তিস্তর থেকে বেরিয়ে অন্য এক উচ্চতর শক্তি-স্তরে উঠে যায়। পরে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখনই এই নতুন স্তরটি থেকে তাদের প্রাথমিক স্তরে নেমে আসে, তখনই প্রতিপ্রভা দেখা যায়। এই বিক্রিয়াটির জীবনকাল (Life time) এক সেকেণ্ডের বেশী হতে পারে না। দেখা গেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকে শক্তি-প্রয়োগের ফলে অণুগুলিকে উত্তেজিত করা হয়, ততক্ষণই এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারে এবং শক্তি প্রয়োগ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রক্রিয়ার বিলোপ ঘটে।

অনুপ্রভা—আমরা আগেই বলেছি—বাইরে থেকে শক্তিপ্রয়োগের ফলে পদার্থের অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ায় তারা নিজস্ব শক্তিস্তর থেকে উচ্চতর শক্তিস্তরে উঠে পড়ে এবং যখন তারা আবার তাদের প্রাথমিক স্তরে (Ground level) ফিরে আসে, তখনই প্রতিপ্রভা দেখা যায়। কিন্তু অনুপ্রভার বেলায় সমস্ত উত্তেজিত অণুগুলির ভিতর কিছু সংখ্যক অণু তাদের প্রাথমিক স্তরে ফিরে না এসে তারা আধা-স্থায়ী (Metastable) এক শক্তিস্তরে অবস্থান করে। এই আধাস্থায়ী শক্তিস্তর থেকে অণুগুলি প্রথমে কেবলমাত্র পূর্বের উচ্চতর শক্তিস্তরেই ফিরে আসতে পারে। এই জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা হলো এই দুই শক্তিস্তরের শক্তির বিয়োগ-ফলের সমান; অর্থাৎ উচ্চতর শক্তিস্তরকে যদি F দিয়ে, আধাস্থায়ী শক্তিস্তরকে যদি M দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তাহলে এই দুই

স্তরের ব্যবধান হবে E=F--M। এইবার অণুগুলি ঐ শক্তি গ্রহণ করে তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে, অণুগুলি অতঃপর F শক্তিস্তর থেকে তাদের প্রাথমিক শক্তিস্তরে (G) ফিরে আসে এবং তখনই অনুপ্রভা পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রক্রিয়াটি ঘটতে কত সময় লাগবে, তা নির্ভর করছে F—M শক্তি ব্যবধানের উপর। বেশী তাপমাত্রায় এই ঘটনাটি ঘটতে খুবই কম সময় লাগবে। কারণ M স্তরে থাকবার সময় অণুগুলির এই বেশী তাপমাত্রার ফলে F—M শক্তি গ্রহণে কোন অসুবিধা হবে না। তেমনি ভাবে বলা যেতে পারে, খুব কম তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়া ঘটতে অনেক সময় লাগবে। কারণ তখন M স্তরে থাকাকালে অণুগুলির F—M শক্তি গ্রহণে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব কম তাপ-মাত্রায় অণুগুলি M স্তরেই থেকে যাবে যতক্ষণ না তাদের পরিমাণমত শক্তি (তাপ) প্রয়োগ করা হবে, অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ না করলে তারা M স্তরেই থেকে যাবে।

অনেক খনিজ ফসফরের ক্ষেত্রে lumine-scnce পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্বে বর্ণিত দুটি বিক্রিয়ার একটিরও মধ্যে পড়ে না। এই তৃতীয় পদ্ধতিটির নাম recombination after glow। এটি পরিলক্ষিত হয় যখন আলোক-তরঙ্গ শোষণের ফলে কোন অণু থেকে সমস্ত ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবার পর আবার তারা অন্য কোন একটি উত্তেজিত অণুর সঙ্গে সংযোগ ঘটায় তখন; অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াকে (Luminescence), প্রতিপ্রভা এবং অনুপ্রভার থেকে আলাদা করতে গেলে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলবো এটি হচ্ছে দুই অণু-বিক্রিয়া, অর্থাৎ luminescence সংঘটিত হতে হলে কমপক্ষে দুটি অণুর প্রয়োজন। কিন্তু অন্য দুটি বিক্রিয়া সংঘটিত হতে হলে একক অণুতেই তা সম্ভব; অর্থাৎ তারা একক অণু-বিক্রিয়া।

এই তৃতীয় বিক্রিয়ার বিকিরণের তীব্রতা (Intensity) উত্তেজিত অণুর সংখ্যার বর্গের সমানুপাতিক এবং এর স্থায়িত্বকাল হবে ততক্ষণই যতক্ষণ না এক উত্তেজিত অণু থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনগুলি ঐ কেলাসের (Crystal) ভিতর চলাকালে অপর কোন উত্তেজিত অণুর দ্বারা অধিগৃহীত (Trapped) হচ্ছে। সাধারণতঃ স্থায়িত্ব-কালের মান এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র এবং কোনমতেই এক সেকেণ্ডের বেশী নয়।

আমরা দেখলাম যে, এই একক-অণু এবং দুই-অণু প্রক্রিয়া ঘটাতে গেলে উভয় ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন। এই শক্তির দ্বারা কিছুক্ষণ উত্তেজিত করবার পর যদি এই শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে এই প্রক্রিয়ারই মন্দীকরণ (Decay) দৃষ্ট হবে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকবে। যেমন একক অণু-বিকিরণের ক্ষেত্রে তা বিকিরণের প্রাথমিক তীব্রতার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু lumi-nescence-এর ক্ষেত্রে (দুই অণু পদ্ধতি) তা প্রাথমিক তীব্রতার উপর নির্ভর করে।

পদার্থকে বাইরে থেকে নানাভাবে উত্তেজিত করবার উপর luminescence-কে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

(1) ফটো-লুমিনেসেন্স (Photo-lumines-cence)—এটি পরিলক্ষিত হয় যখন পদার্থটিকে বাইরে থেকে আলোকশক্তি প্রয়োগে উত্তেজিত করা হয়।

(2) ইলেক্ট্রো-লুমিনিসেন্স (Electro-luminescence)—এটি পরিলক্ষিত হয় যখন বাইরে থেকে কোন আধানযুক্ত কণার সাহায্যে আঘাত করে পদার্থের অণুগুলিকে উত্তেজিত করা হয়।

(3) কেমি-লুমিনিসেন্স (Chemi-lumine-scence)—এটি ঘটে পদার্থটির ভিতর কয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে।

এগুলি হলো লুমিনেসেন্সের মূল প্রকারভেদ। তাছাড়াও একে সাধারণতঃ আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেগুলি হলো, Thermo-luminescence, Bio-luminescence, Crystalo-iuminescence, Sono-luminescence।

শক্তি প্রয়োগের ফলে পদার্থের সমস্ত অণুকে যখন উত্তেজিত করা সম্ভব হয় তখনই luminescence-এর তীব্রতা সর্বোচ্চ মানে পৌঁছয়। এর পর আর কোন ভাবেই এই মান বাড়ানো সম্ভব হয় না এই মানে পৌঁছুতে গেলে সাধারণতঃ প্রয়োজন-

(1) পদার্থটির ভিতর কয়েকটি দীপ্তি কেন্দ্রের উপস্থিতি।

(2) একটি আধানযুক্ত কণার (যেমন ইলেকট্রন) আঘাতের ফলে পদার্থের অণুগুলি উত্তেজিত হবার যথেষ্ট বেশী সম্ভাব্যতা।

(3) উত্তেজিত অণুগুলির উত্তেজিত অবস্থার স্থায়িত্বকাল (Life time) বেশী হওয়া।

লুমিনেসেন্স সম্বন্ধে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

লুমিনেসেন্স কোন পদার্থের কোন একটি বিশেষ গুণ নয়। এর জন্যে দায়ী পদার্থের ভিতর কয়েকটি অবিশুদ্ধ পদার্থের উপস্থিতি। জমাট অবস্থায় কিংবা তরল অবস্থায়ও কোন বিশুদ্ধ পদার্থে এই প্রক্রিয়াটি দেখা যায় না। যে সমস্ত পদার্থে এই বিক্রিয়া ঘটে, সেগুলি প্রায়ই সাদা রঙের। অন্ততঃপক্ষে বলা যেতে পারে যে, সেগুলি কোনটিই গাঢ় রঙের নয়। অধিকাংশ পদার্থকেই যখন তরল বায়ুর তাপমাত্রায় রাখা যাবে—তখন সেগুলির ভিতর এই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। পরোক্ষভাবে বলা যেতে পারে—এই তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়াটি অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হবে। সাধারণতঃ কোন পদার্থকে 100 থেকে 800° সে. উত্তপ্ত করলে পদার্থের ভিতর এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি লোপ পায়। কোন তরল পদার্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপ্রভা দেখা যায় না, যদিও অবশ্য কয়েকটি সান্দ্র তরলে After glow দেখা যায়।

অক্সিজেন, হ্যালোজেন, লোহা, নিকেল, অ্যানিলিন ফিনল প্রভৃতির উপস্থিতিতে পদার্থ থেকে এই গুণটি লোপ পায়। যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে সাধারণ আলোক-তরঙ্গ অতিক্রম করে, সেই সমস্ত পদার্থগুলিকে এই সাধারণ আলোক-তরঙ্গের দ্বারা উত্তেজিত করে এই বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থকে যদি অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে উত্তেজিত করা হয়, তাহলে পদার্থ থেকে প্রতিপ্রভা দেখা যাবে।

সঞ্চয়ন

শক্তি-সঙ্কট ও জ্বালানী কাঠ

শক্তি বলতে আমাদের পেট্রোলিয়ামের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। একদিকে এই পেট্রোলিয়ামের ক্রমক্ষীয়মান সঞ্চিত ভাণ্ডার আর অন্যদিকে এর বণ্টন ব্যবস্থায় নানা রকম গলদ আজকাল সংবাদপত্রের শিরোনামার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে এখনও শক্তি বলতে বনের কাঠকেই বোঝায়। এই কাঠের জন্যে তাদের কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই। রান্নার জ্বালানীরূপে এই কাঠ তারা ব্যবহার করে থাকে। আগে এই জ্বালানী সংগ্রহের ব্যাপারটা ছিল খুবই সহজ। কিন্তু বর্তমানে বনের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে জ্বালানী যোগাড়ের এই কাজটি কেবলই শক্ত হয়ে উঠেছে। কোন কোন জায়গায় কাঠ কুড়ুতে গিয়ে সারাটি দিন পর্যন্ত কেটে যায়।

আজকাল রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কাঠের নানা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ব্যবহার পদ্ধতির হদিস দিয়েছেন। তাঁদের কল্যাণে এখন কাঠ থেকে সেলোফেন কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি কত কি-ই না তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের এই বন-সম্ভারের অর্ধেকই ব্যয়িত হয় আদি ও সনাতন ব্যবহারের পথে। সেটি হচ্ছে জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার। রান্নার কাজে এই কাঠ প্রচুর ব্যবহার করা হয়। আর শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে উত্তাপ সৃষ্টির জন্যে কাঠ জ্বালানো হয়ে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ দরিদ্র দেশের দশ ভাগের নয় ভাগ লোকই প্রধান জ্বালানী হিসাবে কাঠ ব্যবহার করে। বিশ্বের জনসংখ্যা যতই বাড়ছে, নতুন গাছের সংখ্যা ততই কমতে সুরু করেছে। এর ফলে বিশ্বের নানা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জ্বালানী কাঠের সঙ্কট বর্তমানে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই সব অঞ্চলের উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্য আফ্রিকার অর্ধ মরু অঞ্চল আর সাহারা মরুভূমির প্রান্তবর্তী এলাকা প্রভৃতি এমনি আরও অনেক জায়গার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি, সি-তে অবস্থিত ওয়ার্লডওয়াচ ইনষ্টিটিউটের প্রবীণ গবেষক শ্রীএরিক পি এখোম নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একদিন সকালবেলা দেখতে পেলেন একদল মানুষ তাদের পিঠে বিরাট কাঠের বোঝা ভাল করে বেঁধে নিয়ে শহরে ঢুকছে। কাঠের ভারবাহী এই জনস্রোতের যেন আর বিরাম নেই। একের পর এক তাদের প্রবাহ চলছে। তিনি খুব অবাক হয়ে তাঁর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, এদের ঐ এক-একটি বোঝার দাম আর কতই বা হবে যে, ওগুলি বিক্রি করবার জন্যে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চার পাশের এত পাহাড়পর্বত ডিঙোচ্ছে? এটুকুও ইতস্ততঃ না করে বিস্ময়ের সঙ্গে ড্রাইভার বলে উঠল—"ওগুলি কাঠ সাহেব"। খুব দামী জিনিস। আজকাল কাঠমাণ্ডুর প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হলো কাঠের দাম। তাই ওরা যে কাঠ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার এক-একটি বোঝার দাম বর্তমানে কুড়ি টাকা। দু-বছর আগে এর দাম ছিল মাত্র ছ-সাত টাকা।

জ্বালানী কাঠ আর কাঠকয়লার দাম এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় দিনকে দিন কেবল বেড়েই চলছে। যারা জ্বালানীর এই

বর্ধিত দাম মেটাতে পারে, তারা কাঠ কেনে। তবে এজন্যে তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার কিছুটা ছাটাই করতে হয়। জীবনযাপনে যে ব্যয় হয়, তার অধিকাংশই লাগে কাঠের জন্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আপার ভোল্টার অন্তর্গত উয়াগাডুগোয় গড়ে প্রতিটি পরিবার তাদের আয়ের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী টাকা জ্বালানী কাঠের জন্যে ব্যয় করে থাকে। যাদের এত খরচ করবার সাধ্য নেই, তারা জ্বালানীর সন্ধানে আশেপাশের পল্লী অঞ্চলে বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হাঁটা পথে নতুন নতুন গাছের সন্ধান পেলে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে। তা সম্ভব না হলে গাছের পাতা, ছাল, ডালপালা, জঞ্জাল প্রভৃতি যা পায় তাই জ্বালিয়ে সংসারের প্রয়োজন মেটায়। চীনে জাতীয় বনমহোৎসব কার্যসূচী প্রায়ই ব্যাহত হয়। কৃষকদের কাঠের চাহিদা প্রচুর। তারা রাতের অন্ধকারে ছোট গাছগুলিকে কেটে নিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে

কাঠের অভাবের জন্যে যারা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে, তারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক, আর তাছাড়া কাঠের অভাব দুর্ভিক্ষেরও সূচনা করে না। এই সব কারণে জ্বালানী কাঠের সঙ্কটের দিকে বিশ্বের দৃষ্টি এখনও বিশেষ আকৃষ্ট হয় নি। একদিক থেকে চিন্তা করলে এই সমস্যাকে বিশ্ব-সমস্যার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কেননা, জ্বালানী কাঠের সঙ্কট, জ্বালানী তেলের সঙ্কটের মত অত বিরাট এবং ব্যাপক নয়। জ্বালানী কাঠের সমস্যা একটা স্থানীয় সমস্যা সামান্য কিছু এলাকা জুড়ে এর প্রকাশ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্বালানী কাঠের সঙ্কট পোয়াতে হয় অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণকে। আফ্রিকা, এশিয়া আর ল্যাটিন আমেরিকায় বনসংহারের কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এইভাবে বনসংহারের ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বিশ্বের পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটি গভীর সঙ্কট ডেকে আনবে। বন বিনাশ হলে ভূমি অবক্ষয়ের ফলে জমির উৎপাদন ব্যাহত হবে। মরুভূমি হয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে। তা ছাড়া, মাটির উর্বরতাও কমে যাবে। এ ছাড়া আছে মৃত্তিকার অবক্ষয়। সব মিলিয়ে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে। জ্বালানী কাঠের সমস্যা যে খাদ্যসমস্যা থেকে স্বতন্ত্র নয়—তা সুস্পষ্ট। এক সঙ্কট এড়াতে গিয়ে যে, আর একটা সঙ্কটের আমরা সম্মুখীন হয়ে পড়ি, তা বলাবাহুল্য।

1930-এর দশকের গ্রেট প্লেনসের 'ডাস্ট বোল' থেকে আমেরিকার লোকেরা এই শিক্ষা লাভ করে যে, খরাপ্রধান অঞ্চলে বন সংহার করা হলে বিপদ ডেকে আনা হয়। জন ষ্টাইনবেক তাঁর "দি গ্রেপস অব র‍্যাথ" বইতে মানুষ, জমি আর জলবায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার কথা বলেছেন। সাহারার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর আফ্রিকার বিরাট এলাকা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজস্থানে বিরাট অঞ্চল জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। ওখানেও ধূলিঝড় খুবই ব্যাপক। জ্বালানী কাঠ কুড়াবার লোকেরা যতই দলে ভারী হবে, বিশ্বে মরু অঞ্চল ততই প্রসার লাভ করতে থাকবে।

ভারতীয় উপমহাদেশে জ্বালানী কাঠের সমস্যা আর এক ধরনের সঙ্কট ডেকে এনেছে। এই সঙ্কট বন কেটে ভূমি অবক্ষয় ঘটানো বা তার ফলে বন্যাকে আমন্ত্রণ জানানো নয়। সেই সঙ্কট এসব থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু ক্ষতির দিক থেকে বিরাট ও ব্যাপক। এই সব অঞ্চলের প্রচুর লোক জ্বালানীরূপে গোবর ব্যবহার করে। কোন কোন এলাকায় তো পুরুষানুক্রমে গোবরই একমাত্র জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গোবর দিয়ে হাতে তৈরী ঘুটে, গুল

প্রভৃতি দিয়ে ঘর গৃহস্থালীর রান্নাবান্নার কাজ চলে। এইভাবে গোবরের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলছে। এর ফলে জমির উর্বরতাশক্তি ভয়ঙ্কর ভাবে কমে যাচ্ছে। জমির প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর জৈব উপাদান বাড়াবার ব্যাপারে গোবরের ভূমিকা অতুলনীয়। সার ছাড়াও তাপ উৎপাদনের জন্যে গোবরের প্রয়োগ হয়ে থাকে। আফ্রিকার সাহেলিয়ান অঞ্চলে, ইথিওপিয়া, ইরাকে এবং গাছপালাহীন অ্যানডিয়ান উপত্যকার এবং বলিভিয়া ও পেরুর ঢালু অঞ্চলে তাপ উৎপাদনের জন্যে গোবর প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কয়েক দশক ধরে এমন একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্যে আদর্শ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন, যার সাহায্যে গোবরের সার জাতীয় অংশ এবং অপচিত জৈব পদার্থগুলিকে রান্নার কাজের জন্যে মিথেন গ্যাসে এবং চাষাবাদের কাজের জন্য সুসমৃদ্ধ কম্পোস্ট সারে রূপান্তরিত করা যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে—নতুন নতুন বন সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের জ্বালানী কাঠের চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হলে আরও অনেক গাছ লাগানো প্রয়োজন। বিশ্বকে বাঁচাবার এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে। অপর দিকে আফ্রিকা, এশিয়া আর ল্যাটিন আমেরিকার বন কেটে উজাড় করে দেওয়ার আত্মঘাতী প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উদ্ভব ও তার মূল তত্ত্ব

সুবিনয় দাশগুপ্ত

কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটনের আমলে সনাতন বলবিদ্যা যে স্থান অধিকার করেছিল, প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন ও তাঁর সহযোগী বৈজ্ঞানিকদের সহায়তায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তার চেয়ে উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষতঃ পারমাণবিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রসার আরও-ব্যাপক ও গভীর। এই নূতন বলবিদ্যার জন্মের ইতিহাস ও ধীরে ধীরে তার রূপায়ণের কাহিনী সাধারণ বিজ্ঞানানুরাগী মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হবে।

প্রথম এই বিষয়ের সূচনা হয়েছিল একটি আদর্শ কালো বস্তুর বিকিরণের সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনে। এখন পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে 'আদর্শ কালো বস্তু' জিনিসটি কি—তা দেখা যাক। যে বস্তু কোন তাপমাত্রায় তার উপর এসে পড়া যে কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে নেয় (একটুও প্রতিফলিত বা সঞ্চালিত করে না), তাকে আদর্শ কালো বস্তু বলে। উত্তপ্ত করলে কোন আদর্শ কালো বস্তু প্রতি একক ক্ষেত্রফলে একক সময়ে যতটা শক্তি শোষণ করেছিল, ঠিক ততটাই বিকিরণ করে। বলা বাহুল্য, আদর্শ কালো বস্তু প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। একে অন্যভাবে তৈরী করা হয়েছে। কোন কালো বিকিরককে যদি একটি স্থির তাপমাত্রায় রাখা হয়, তবে একে বলে সমোষ্ণ ধারক (Isothermal enclosure)।

এর পর বিকিরিত শক্তি সম্বন্ধে দুটি সূত্র পাওয়া

গেল। একটি হলো, $E=\sigma T^4$ ...(1)
যেখানে E=প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ সে. মি. থেকে একটি কালো বস্তু যে পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে এবং T=পরম তাপমাত্রা, σ=একটি সার্বজনীন ধ্রুবক, যার মান শুধুমাত্র এককের উপর নির্ভর করে। 1879 সালে ষ্টিফ্যান (Stefan) এটিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন এবং 1884 সালে বোল্ট্জ্ম্যান (Boltzmann) এটিকে তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রমাণ করেন। ষ্টিফ্যান-বোল্ট্জ্ম্যান ধ্রুবকের σ-র গড়-মান 5.767×10^{-12} ওয়াট/বর্গ সে. মি./ (পরম তাপমাত্রা)^4 (—Landenberg)।

দ্বিতীয় সূত্রটি হলো অষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক Wien-এর সরণ সূত্র। 1893 সালে তাপগতিবিদ্যার সনাতন পদ্ধতি (Classical method) থেকে তিনি এই সমীকরণটি পান—

$$E\lambda\, d\lambda=\frac{a}{\lambda^5}f(\lambda T)d\lambda \quad \cdots(2)$$

যেখানে a একটি ধ্রুবক, $f(\lambda T)$, λT-র একটি অবিচ্ছিন্ন অপেক্ষক (Continuous function) এবং $E\lambda$, λ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে (অর্থাৎ λ ও $\lambda+d\lambda$-র মধ্যে বিকিরিত শক্তি।

এছাড়া তিনি আরও একটি সমীকরণ পান, $\lambda max\ T$=ধ্রুবক···(3)। এই ধ্রুবকটির মান প্রায় 0.2893 সে. মি. °পরম তাপমাত্রা। এখানে λmax হলো কোন বিশেষ তাপমাত্রা T-তে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে $E\lambda$-র মান সর্বোচ্চ হয়। (2) নং সূত্র থেকে দেখা যায়, যে $\lambda T=\lambda' T'$ হলে,

$$\frac{E\lambda}{E\lambda'}=\left(\frac{T}{T'}\right)^5 \quad \cdot(4)$$

সমীকরণ (2)-এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিকিরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (Mechaism) $f(\lambda T)$-কে বের করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এদিকে Kirchhoff দেখিয়েছিলেন যে, বিকিরণটির উপাদানের উপর সমোষ্ণ ধারকের বিকিরণ কোন মতেই নির্ভরশীল নয়। তাই যে কোন উপযুক্ত মডেলেই কাজ চলতে পারে।

Wien 1896 সালে বিকিরণের উৎস হিসাবে অসংখ্য আণবিক আকারের দোলক (যাদের গতিশক্তি বিকিরণের কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক) ধরে নিয়ে সনাতন তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব থেকে প্রমাণ করলেন যে,

$$E_\lambda=\frac{a}{\lambda^5}e^{-b/\lambda T} \quad \ldots(5)$$

এখানে a এবং b দুটি ধ্রুবক রাশি। এরপর 1900 সালে Raleigh এবং Jeans শক্তির equipartition-এর সনাতন নীতি থেকে আর একটি সমীকরণ পেলেন :

$$E\lambda=\frac{2\pi kT}{C\lambda^4} \quad \ldots(6)$$

এখানে c=আলোকের গতিবেগ ও k=ম্যাক্সওয়েল-বোল্ট্জ্ম্যান ধ্রুবক। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সমস্ত কম্পাঙ্কের স্থাণু তরঙ্গই (Stationary wave) একটি আদর্শ কালো বস্তু থেকে বিকিরিত হয়।

এর পর একটি কালো বস্তুর বিকিরণকে বর্ণালী-বিশ্লেষক (Spectrometer) দিয়ে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষামূলকভাবে $E\lambda$ এবং λ ও T-র মধ্যে একটি সম্পর্ক বের করবার চেষ্টা হতে থাকে। Kirchhoff প্রমাণ করেছিলেন যে, বিকিরকটি ও তার সংলগ্ন দেয়ালটি যদি একই তাপমাত্রায় সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে বিভিন্ন দিক বরাবর নির্গত বিকিরণের বর্ণালী সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন থাকে এবং বিকিরকটির অভ্যন্তরস্থ যে কোন বিন্দুতে যে কোন দিক-বরাবর নির্গত বিকিরণের বর্ণালীর সঙ্গেও অভিন্ন হয়। Paschen বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিয়ে এবং Lummer ও Pringsheim ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিয়ে পরীক্ষা করলেন। এই সব পরীক্ষায় যে সব লেখ পাওয়া গেল। তার ধরণ 1নং চিত্রে দেখানো হলো।

সবচেয়ে নীচের (x-অক্ষের কাছের) লেখটি নিম্নতম তাপমাত্রার জন্যে আর পরপর উপরের

লেখাগুলি যথাক্রমে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার জন্যে এই লেখগুলি থেকে দেখা যায়—
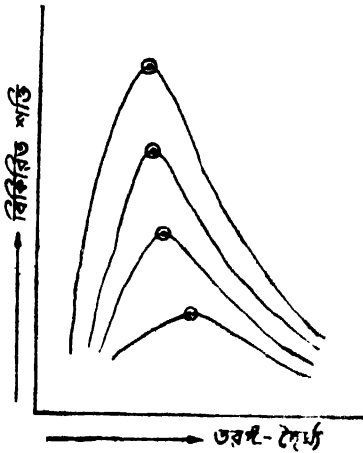
1নং চিত্র

বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিকিরিত শক্তি ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লেখ। যে কোন তাপমাত্রার লেখর সর্বোচ্চ বিকিরণের বিন্দুটিকে ছোট বৃত্ত দিয়ে ঘিরে দেখানো হয়েছে।

(1) যে কোন একটি তাপমাত্রার লেখ তার নিম্নতর যে কোন তাপমার লেখর সম্পূর্ণ বাইরে থাকে, (2) যে কোন বিশেষ তাপমাত্রায় বিকিরিত শক্তির মান একটা বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ হয়। তাপমাত্রা যত বাড়ানো হয়, সর্বোচ্চ বিকিরণের বিন্দুটিও তত ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দিকে সরে যেতে থাকে। গণনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি সর্বোচ্চ বিকিরণের বিন্দুই সমীকরণ (3) ও (4) মেনে চলে। (3) যে কোন একটি লেখ-র তাপমাত্রায় একক সময়ে বিকিরিত মোট শক্তির মান ঐ লেখ আর x অক্ষের মধ্যের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমানুপাতিক। প্রত্যেকটি লেখর ক্ষেত্রে এইভাবে (1) নং সমীকরণকে সাব্যস্ত করা যায়।

Wien-এর সমীকরণ (5) পরীক্ষালব্ধ লেখর সঙ্গে উচ্চশক্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অঞ্চলে (যেখানে তাপমাত্রা দু-হাজার পরম-এর কম এবং (λT)-র মান 0·3 সে. মি. পরম তাপমাত্রার কম) খুব ভাল মিলে যায়, কিন্তু কম শক্তি অঞ্চলে মেলে না। র‍্যালে-জীনস্-এর সূত্রটি আবার কম-শক্তি অর্থাৎ উচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অঞ্চলে অসীম পথ হিসাবে (Asymptotically) ঠিক, কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অঞ্চলে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের কাছাকাছিও যায় না। এছাড়া এই সূত্রানুযায়ী কোন বিশেষ তাপমাত্রায় $E\lambda$ র কোন সর্বোচ্চ মান থাকে না এবং সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিবেচনা করলে একক সময়ে বিকিরিত মোট শক্তি অর্থাৎ $\int_0^\infty E\lambda d\lambda$-এর মান সমস্ত তাপমাত্রাতেই ($T=O$ ছাড়া) অসীম। প্রত্যেকটি পরীক্ষালব্ধ লেখই এই দুটি সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যায়। এর পর বিজ্ঞানীরা এমন একটা সূত্র দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন, যেটা পরীক্ষার ফলাফলকে শূন্য থেকে অসীম পর্যন্ত সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেই মেনে চলবে। 1900 সালে এই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তাঁর সূত্র পরীক্ষামূলক ফলাফলের সঙ্গে সব জায়গাতেই খুব ভাল মিলে গেল। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক তাঁর সূত্রের কোন নিখুঁৎ তাত্ত্বিক প্রমাণ দিতে পারলেন না। এই জন্যেই প্ল্যাঙ্ক তাঁর মতবাদকে ঠিক 'সূত্র' বলতে চান নি বলেছেন 'প্রকল্প'। তার পর বহু দিন কেটে গেছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর Bose-Einstein Quantum statistics-এ এটিকে যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন।

Wien এবং র‍্যালে-জীনস্ যেমন নিজেদের ইচ্ছামত শক্তি বিকিরক এবং শক্তি শোষক ধরে এগিয়েছিলেন, তেমনি প্ল্যাঙ্ক ধরে নিলেন, যে কোন বিকিরকের মধ্যেই বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িদাহিত কণা সব রকম সম্ভবপর কম্পাঙ্কে সরল সমঞ্জস (Simple harmonic) গতিতে দুলতে থাকে। প্ল্যাঙ্ক এই কণাগুলির নাম দিলেন অনুনাদী (Resonator)। সে সময়ে অর্থাৎ 1900-1901 সালে ইলেকট্রনের কথা জানা ছিল না। পরে বোঝা যায় যে, ঐ কণাগুলি ইলেকট্রন

ছাড়া আর কিছুই না। প্ল্যাঙ্ক এই দোলকগুলিকে dipol দোলক (অর্থাৎ আণবিক আকারের hertzian দোলক) ধরে নিলেন। তিনি দেখলেন যে, পরীক্ষামূলক ফলাফলের সঙ্গে ঠিকভাবে মিলে যায় এমন সূত্র তৈরী করতে হলে প্রথমেই কয়েকটা খুব অদ্ভুত কল্পনা করে নেওয়া দরকার, যেগুলি প্রচলিত পদার্থবিদ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কল্পনাগুলি হলো :—(1) কোন দোলকের (অথবা ঐ ধরণের যে কোন প্রাকৃতিক শ্রেণীর Physical system) শক্তি অবিরামভাবে পরিবর্তিত হতে পারে না—এর শক্তির কয়েকটা বিশেষ সম্ভবপর মান (Discrte set of possible values) আছে। এই বিশেষ কয়েকটি মান ছাড়া অন্য কোন মানের শক্তি কোন দোলকের থাকতে পারে না। যখন কোন দোলকের শক্তি পরিবর্তিত হয়, তখন ঐ বিশেষ মানগুলির মধ্যে দোলকের শক্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে বা কমে। যখন কোন দোলক একটি শক্তিস্তর থেকে তার ঠিক নীচের বা উপরের শক্তিস্তরে লাফিয়ে চলে যায়, তখন ঐ দোলক যে শক্তি ত্যাগ বা গ্রহণ করে, সেই শক্তিই যথাক্রমে বিকিরিত ও শোষিত শক্তি।

(2) উল্লিখিত 'বিশেষ সম্ভবপর শক্তিস্তর'-গুলির ব্যবধান হলো একটি প্রাথমিক শক্তি একক (Fundamental energy unit) ϵ আর্গ। এই শক্তি একক বা শক্তির 'প্যাকেট'কে বলা হয় 'quantum of energy' অর্থাৎ কোন দোলকের শক্তি 0, ϵ, 2ϵ, $3\epsilon \ldots \gamma\epsilon \cdots$ [γ একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা] হতে পারে, কিন্তু $2{\cdot}5\,\epsilon$ শক্তির কোন দোলক থাকতে পারে না।

প্ল্যাঙ্ক প্রথমে বিকিরণজনিত অবমন্দন (Damping), Fourier series, ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে প্রমাণ করলেন যে, যদি E_ν প্রতি বর্গ সে.মি. থেকে প্রতি সেকেণ্ডে বিকিরিত শক্তি হয় এবং $\overline{E_\nu}$, ν কম্পাঙ্কের অনুনাদীর গড় শক্তি হয়, তবে,

$$E_\nu = \frac{2\pi \nu^2}{C^2}\,\overline{E_\nu} \qquad (7)$$

এর পর তিনি $\overline{E_\nu}$ বের করলেন, ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজ্‌ম্যান-এর সনাতন রাশিবিজ্ঞান সূত্র বলে যে, যদি শূন্য বিন্দু শক্তিস্তরে (Zero point energy level—এই শক্তি হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী একটি দোলকের শূন্য ডিগ্রী পরম তাপমাত্রার শক্তি) N_0 সংখ্যক দোলক থাকে, তবে শূন্য বিন্দু শক্তিস্তর থেকে ϵ আর্গ উপরের শক্তিস্তরে T^0 পরম তাপমাত্রায় $N_0e^{-\epsilon/KT}$ সংখ্যক দোলকের থাকবার সম্ভাবনা আছে, এখানে K—ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজ্‌ম্যান ধ্রুবক। এই সূত্রটি যে কোন দোলক বা কণাশ্রেণীর—যারা সনাতন রাশিবিজ্ঞান মেনে চলে—তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধরা যাক N হলো বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থিত দোলকের মোট সংখ্যা এবং N_0, N_1, $N_2 \cdots N_\gamma \cdots$, যথাক্রমে 0, ϵ, $2\epsilon, \cdots \gamma\epsilon, \cdots$ শক্তিস্তরের দোলকের সংখ্যা, সুতরাং

$$N = N_0 + N_1 + N_2 + \ldots + N\gamma + \ldots \text{ অসীম পর্যন্ত} \quad \ldots(8)$$

এখন এই দোলক শ্রেণীর মোট শক্তি যদি শূন্য বিন্দু শক্তিস্তর থেকে E পরিমাণ বেশী হয়, তবে, যেহেতু $\gamma\epsilon$ শক্তিস্তরের $N\gamma$ সংখ্যক দোলকের মোট শক্তি, $N\gamma.\,\gamma\epsilon$, সুতরাং

$$E = O \times N_0 + N_1.\ \epsilon + N_2.\ 2\epsilon + \cdots\cdots + N\gamma.\ \gamma\epsilon + \cdots\cdots \text{অসীম পর্যন্ত}$$
$$= \epsilon\,(N_1 + 2N_2 + \cdots \gamma N\gamma + \cdots \text{অসীম পর্যন্ত}) \quad \cdots(9)$$

যেহেতু,

$N\gamma = N_0 e^{-\epsilon\gamma/kT} = N_0 \kappa^\gamma$ [$\kappa = e^{-\epsilon/kT}$ বসিয়ে]

সুতরাং (8) থেকে পাই, $N = N_o (1+\alpha+\alpha^2+ \ldots \alpha^\gamma + \ldots$ অসীম পর্যন্ত)

$= \frac{No}{1-\alpha}$ যেহেতু ϵ, k, T, ধনসংখ্যা হওয়ায় α, 1-এর থেকে ছোট] এবং (9) থেকে, $E = N_o \epsilon (\alpha + 2\alpha^2 + \ldots + \gamma\alpha^\gamma + \ldots$ অসীম পর্যন্ত)

$= No\epsilon \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ [যেহেতু $\alpha <$]।

সুতরাং শূন্যবিন্দু শক্তিস্তর থেকে মাপা সুরু করলে প্রতিটি দোলকের গড়-শক্তি হবে,

$$\overline{E\nu} = \frac{E}{N} \cdot \frac{\alpha\epsilon}{1-\alpha} = \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/kT}-1}$$

9নং সূত্রে $\overline{E\nu}$-এর মান এবং $\nu = c/\lambda$ বসিয়ে পাই :—

$$E\lambda d\lambda = \frac{2\pi c}{\lambda^5} \cdot \frac{\epsilon\lambda}{e^{\epsilon/kT}-1} \qquad (10)$$

এখন পদার্থবিদ্যার মূল শাস্ত্র তাপগতিবিদ্যার সূত্র থেকে প্রমাণিত Wien-এর সরণ সূত্র মৌলিকভাবে সঠিক। সেই জন্যে প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ (10)-কে Wien-এর সমীকরণ (2) মেনে চলতেই হবে। সুতরাং (10) নং সমীকরণের $\frac{\epsilon\lambda}{e^{\epsilon/kT}-1}$ অংশটিতে λ এবং T-কে λT হিসাবে থাকতে হবে। এটা হওয়া সম্ভব যখন যে কোন তাপমাত্রা এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেই $\epsilon \propto \frac{1}{\lambda}$ অর্থাৎ $\epsilon \propto \nu$ [$\because \nu = \frac{c}{\lambda}$] এই ভেদের ধ্রুবককে h লিখে, একবর্ণী আলোর বিকিরণ ক্ষমতার সমীকরণটি দাঁড়ায়,

$$E_\lambda d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{ch/\lambda Tk}-1} d\lambda \ldots \qquad (11)$$

এখানে $E\lambda$-র মান শূন্য বিন্দু শক্তিস্তর থেকে মাপতে হবে। এখানে 'h' একটি নূতন ভৌত ধ্রুবক (Physical constant), এর নাম দেওয়া হয়েছে 'Planck's constant'। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (g) শূন্যে আলোকের গতিবেগ c ইত্যাদির মত h একটি মৌলিক প্রাকৃতিক ধ্রুবক। এর মান একক ছাড়া আর কোন ভৌত রাশির (Physical quantity) উপর নির্ভরশীল নয়। এই ধ্রুবকের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মান $(6{\cdot}6252 \pm 0{\cdot}0005) \times 10^{-27}$ আর্গ সেকেণ্ড। h-এর মাত্রা (Dimension) কাজ × সময়, অর্থাৎ 'action' বলে একে অনেক সময় 'action
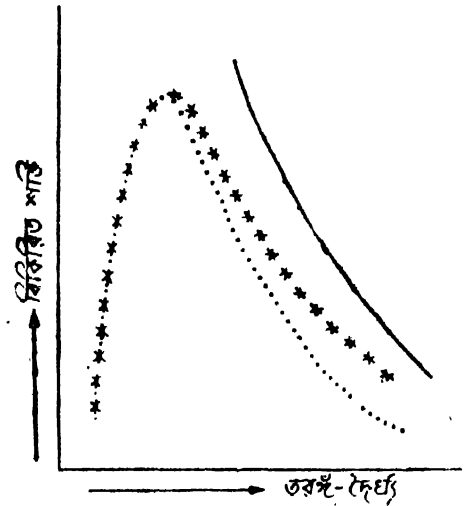
2নং চিত্র

এখানে কাটা [×], টানা রেখা [—], ফুটকি [···] এবং ভাঙা রেখা [– – –] দিয়ে যথাক্রমে প্ল্যাঙ্ক, র‍্যালে-জীন্স্, Wien এবং পরীক্ষামূলক ফলাফলের লেখ দেখানো হয়েছে। এর থেকে দেখা যায় যে, প্ল্যাঙ্ক সূত্র থেকে পাওয়া লেখ পরীক্ষামূলক ফলাফলের সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেই খুব ভাল মিলে যায়।

constant' বলা হয়। 2নং চিত্রে Wien, র‍্যালে-জীন্স এবং প্ল্যাঙ্ক-এর সূত্র থেকে পাওয়া লেখ এবং পরীক্ষামূলক ফলাফল দেখান হলো। প্ল্যাঙ্কের সূত্রটিকে এখানে খুব সোজা করে প্রমাণ করা হলো, কিন্তু আসলে জিনিসটি এত সোজা নয়। এর মধ্যে অনেক জটিলতা আছে।

পরে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, কোন দোলকের শক্তি আসলে

$\gamma h\nu$ নয় $(\gamma+\frac{1}{2})\, h\nu$ যেখানে γ, শূন্য অথবা কোন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। E. Schrödinger এটিকে তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রমাণ করেন। পরে বর্ণালীবিশ্লেষণ থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

কোয়াণ্টাম তত্ত্ব পদার্থবিত্তায় একটি নূতন সার্বজনীন ধ্রুবকের সূচনা করলো। পারমাণবিক বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে h-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। (11)নং সমীকরণ থেকে $\int_0^\infty E\lambda d\lambda$-র মান নির্ণয় করে স্টিফান-বোল্টজ্‌ম্যান সূত্র প্রমাণ করা যায় এবং দেখানো যায় যে

$$\sigma=\frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3}, \quad \text{আবার} \left(\frac{dE\lambda}{d\lambda}\right)_{\lambda=\lambda_{max}}=0$$

বসিয়েও প্ল্যাঙ্ক সমীকরণ থেকে Wien-এর সমীকরণ $\lambda_{max}\, T, b$ প্রমাণ করা যায়। যেখানে $b=ch/k\, 4{\cdot}9651$, 4·9651 সংখ্যাটি আসে একটি transcendental সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে। আবার λT যখন খুব ছোট, অর্থাৎ $ch/k\lambda T$ যখন খুব বড়, তখন

$e^{ch/\lambda kT}-1\approx e^{ch/\lambda kT}$ লিখে Wien-এর সমীকরণ (5) পাওয়া যায়। λT যখন খুব বড়) তখন $e^{ch/kT\gamma}=1+\frac{ch}{k\lambda T}$ বসিয়ে র‍্যালে-জীন্স সূত্র (6) পাওয়া যায়।

কোন দোলক অবিরামভাবে শক্তি দিতে বা নিতে পারে না। এই তত্ত্বটি সনাতন পদার্থবিত্তা অনুযায়ী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এই আপত্তিকর প্রকল্পটি করে নিয়েই প্ল্যাঙ্ক কালো বস্তুর বিকিরণের সমস্যাটিকে সুন্দরভাবে সমাধান করে দিলেন। এর পর 1905 সালে ফটোইলেকট্রিসিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন দেখলেন যে, তরঙ্গবাদ দিয়ে ঐ ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। একে ব্যাখ্যা করবার জন্যে তিনি ধরে নিলেন যে, বিকিরণ শুধু শোষিত বা নির্গত হবার সময়েই যে শক্তির packet হিসাবে থাকে, তা নয়—কোন স্থান দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার সময়ও বিকিরণ আলোকের গতিতে ভ্রমণকারী কয়েকটি localised শক্তি-কণা ‘ফোটন’ হিসাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে photo-electric effect ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বিকিরণের ‘কণা’বাদের সূচনা করলেন। পরে দেখা গেল যে, নিম্নতাপমাত্রায় কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ (আইনস্টাইন এবং Debye), কম্পটন-এফেক্ট, বর্ণালী নির্গমন প্রভৃতিও এই তত্ত্বকে একটু প্রসারিত করে নিলে (যথা আলোকে h/λ ভরবেগের এবং শূন্য ভরের কণা হিসাবে ধরে নিলে) ব্যাখ্যা করা যায়। তাই উপরিউক্ত আপত্তিকর মৌলিক প্রকল্পট মেনে নিতে বিজ্ঞানীরা বাধ্য হলেন। প্ল্যাঙ্ক তাই বললেন যে, সনাতন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি পারমাণবিক জগতের শক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খাটে না। প্ল্যাঙ্কের বৈপ্লবিক কল্পনাগুলি কেবলমাত্র সনাতন পদার্থবিত্তার প্রসারণ নয়। এটি প্রচলিত চিন্তাধারার একটি আমূল পরিবর্তন এনে দিল এবং এক নূতন বিষয় ‘কোয়াণ্টাম বলবিত্তার’ জন্ম দিল। এর কল্পনাগুলি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিললেও পরীক্ষামূলক ফলাফলের খাতিরে একে না মেনে নিয়ে উপায় নেই।

এখন বিকিরণ জিনিসটি আসলে কি দেখা যাক। নিউটন (1700) বলেছিলেন যে, আলো হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি দ্রুতগামী কণার সমষ্টি। interference, diffraction, polarisation, double-refraction প্রভৃতি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Heyghens, (1678) Young (1807), Frensel (1788-1827) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, আলো হচ্ছে একটি ভরহীন অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ। পরে 1867 সালে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব থেকে দেখা গেল যে, আলো হচ্ছে ‘তড়িচ্চুম্বকীয়

তরঙ্গ' অর্থাৎ কোন অগ্রগামী বিকিরণের যে কোন বিন্দুতে, এর দুটি পরস্পর লম্ব একই দশার (Phase) সরল সমঞ্জস কম্পনের উপাংশ আছে—একটি তড়িৎ ভেক্টর এবং অপরটি চৌম্বকী ভেক্টর। আলোক ভেক্টরটি এই দুটি উপাংশের প্রত্যেকের উপর লম্ব হয় এবং তড়িৎ, চৌম্বকী ও আলোক ভেক্টরটি যে কোন বিন্দুতে একটি দক্ষিণ হস্তের তন্ত্র (Right hande dsystem) তৈরী করে। কোন বিন্দুতে তড়িৎ ও চৌম্বকী ভেক্টরের মান ও দিক জানা গেলে ঐবিন্দুতে আলোক ভেক্টরেরও মানও ঠিক জানা যায়। দুটি দোলনের লব্ধি (Resultant) বলে আলোক ভেক্টরেরও একটি দোলন ধর্ম আছে, এই দোলনটি বিকিরণ যে দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তার উপর লম্ব এবং স্বভাবে তির্যক (Transverse)। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপরেই বিকিরণটি কোন্ শ্রেণীর (বিকিরিত তাপ, না আলোক ইত্যাদি), তা নির্ভর করে এবং দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রে তার রং নির্ভর করে।

এই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি পাওয়া গেল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা এর মধ্যে অন্যতম। Hertz (1867) পরীক্ষামূলক ভাবে তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ তৈরী করলেন। এই অবস্থায় তরঙ্গবাদ এবং কণাবাদ উভয় মতবাদের পক্ষেই সমান জোরালো যুক্তি পাওয়া গেল; এবং কোন মতবাদকেই খণ্ডন করা গেল না। উভয়ে বিকিরণের দুটি বিভিন্নধর্মী ব্যবহার ব্যাখ্যা করে এবং উচ্চ ও নিম্ন কম্পাঙ্কে যথাক্রমে কণা ও তরঙ্গ ধর্ম প্রকট হয়ে ওঠে। আলোর এই যুগ্ম ধর্মকে বিকিরণের 'তরঙ্গ-কণা দ্বৈতবাদ' বলা হয়।

এর পর ফ্রান্সের Louis de Broglie (1923) বললেন যে, পদার্থ-কণিকারও তরঙ্গ-ধর্ম থাকতে পারে। ফোটনের ক্ষেত্রে যে দুটি মৌলিক সমীকরণ পাওয়া গেল, সেগুলি হলো $\epsilon = h\nu$ এবং $\epsilon = mc^2$ (আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে)। এখানে m হচ্ছে একটি ফোটনের তুল্য (Equivalent) ভর অর্থাৎ যে ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ϵ পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে। অতএব,

$$h\nu = mc^2 \qquad (12)$$

$$\text{যেহেতু, } \nu = \frac{c}{\lambda}\text{, সুতরাং } \lambda = \frac{h}{mc} \qquad (13)$$

এই জন্যেই বিকিরণকে আপেক্ষিকতাবাদে h/λ ভরবেগের শূন্য ভরের কণা হিসাবে ধরা হয়। এর থেকে তিনি দেখালেন যে, আলোক বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সাধারণ বলবিজ্ঞার সূত্রে স্থিরভরকে শূন্য ধরলে পাওয়া যায়। এছাড়া আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ থেকে দেখিয়েছিলেন যে, জড় পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ একই সত্তার (Entity) বিভিন্ন রূপ, যারা পরস্পর পরিবর্তনশীল। সুতরাং উভয়ের মূল ভৌত ধর্ম একই হতে হবে এবং যে কোন একটির মূল ধর্ম (যথা আলোকের তরঙ্গ-কণা দ্বৈতবাদ) অপরটির ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ কণিকার ক্ষেত্রেও) প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইলেকট্রন প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ভরের কণার শূন্য ভরের ফোটনের মত কিছু ধর্ম থাকতে পারে। এর থেকে তিনি বললেন যে, যে কোন ধরণের চলমান কণাই (Material particle) এক ধরণের তরঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, যেটা ত্রিমাত্রিক দেশে সাধারণ আলোক বিকিরণের সূত্রানুযায়ী ছড়িয়ে পড়ে। ফোটনের মত এই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। এই সূত্র থেকে পাওয়া যায়—

$$\lambda = h/mv \qquad (14)$$

এখানে v কণাটির গতিবেগ।

C. J. Davission এবং L. H. Germer 1927 সালে নিকেল কেলাসের উপরিতলকে grating হিসাবে ব্যবহার করে এক ঝাঁক (Beam) ইলেকট্রনের diffration ঘটালেন এবং আরও দেখালেন যে, এই ইলেকট্রনগুলি 14নং সূত্র থেকে পাওয়া তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের মত

ব্যবহার করে। ইংল্যাণ্ডের G. P. Thomson ও জাপানের S. Kikuchi ও দ্রুতগামী ইলেকট্রনের Laue diffration pattern তুললেন পাতলা ধাতু ও অভ্রের পাত ব্যবহার করে এবং 14নং সমীকরণের সত্যতা প্রমাণ করলেন। de-Broglie-র তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরী করা হয়েছে। পরে হাইড্রোজেন আয়ন, হিলিয়াম আয়ন, নিউট্রন প্রভৃতির diffraction pattern তোলা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকাদের ক্ষেত্রে 14নং সূত্রানুযায়ী λ-র মান খুব ছোট হওয়ায় এই সব ক্ষেত্রে তরঙ্গ-ধর্মের অস্তিত্ব আজও পরীক্ষামূলক ভাবে দেখানো হয় নি। তবে ধরে নেওয়া যায় যে, তরঙ্গের মত ধর্মবিশিষ্ট একটা কিছু যে কোন ভরের চলমান পদার্থের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে।

প্রমাণ করা যায় যে, পদার্থের প্রকৃত বেগ (যাকে 'group velocity' বলা হয়) যদি v হয় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের বেগ (যাকে Phase velocity বলা হয়) যদি u হয় তবে,

$$uv = c^2 \qquad (15)$$

স্পষ্টতঃই সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রে $v = \frac{u}{\lambda}$ এবং $\lambda = h/mv$। সুতরাং কোয়ান্টায়িত অবস্থার সমীকরণ (12) থেকে (15) পাওয়া যায়। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে পাওয়া যায় যে, কোন পদার্থের বেগ কখনই c-র বেশী হতে পারে না। সুতরাং দশা-বেগের মান সব সময়েই c-র থেকে বেশী হবে। এই ঘটনায় পরিষ্কার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এর থেকে দেখবার যে, পদার্থ-তরঙ্গ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। এর বিস্তারের জন্তে কোন মাধ্যম দরকার হয় না এবং এই তরঙ্গটি যে ঠিক কি জিনিষ, সেটা এখনও বলা যায় না। একে ছবি এঁকে বা মুখে বলে বোঝানো অসম্ভব। অনেক সময় পরমাণুর মধ্যের ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনকে একটা মেঘ হিসাবে বর্ণনা করা হয়, যেটা কেন্দ্রীনকে (Nucleus) চারদিক দিয়ে ঘিরে থাকে। কিন্তু এই উপমাটির বহু অসঙ্গতি আছে। প্রকৃতপক্ষে বিকিরণ (বা পদার্থ) কি—তরঙ্গ না কণিকা ? এই সমস্যাটিকে সহজে মীমাংসা (Reconcile) করা যায় না। এটি বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি মূল সমস্যা। জগতের সমস্ত সত্তার অর্থাৎ entity-র (পদার্থ অথবা শক্তি যাই হোক না কেন) মূল ধর্মের ব্যাখ্যা একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক দিক থেকে করতে হবে। তাই সাধারণ বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন তত্ত্ব থেকে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানে আর একটা কথা চিন্তা করবার আছে। আমাদের macroscopic জগতে, অর্থাৎ যে জগৎকে আমরা খালি চোখে অথবা সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে পাই, সেখানে কেবলমাত্র দু-ধরণের গতি আমরা দেখি—একটি হলো কণার গতি এবং অপরটি হলো তরঙ্গের গতি। এই দুটি গতিবেগ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এবং এদের সমীকরণও সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা কিছুতেই তৃতীয় কোন ধরণের বেগ (কণা ও তরঙ্গের মাঝামাঝি) কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু microscopic জগতে অর্থাৎ যে জগৎকে আমরা কোন যন্ত্রেই দেখতে পাই না, তার নিয়মকানুন আমাদের জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই আমাদের অভিজ্ঞতায় যে ধরণের বেগকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে হয়, সেই ধরণের বেগ যে পারমাণবিক জগতেও থাকবে না—এমন কোন মানে নেই। সম্ভবতঃ এই জন্তেই পারমাণবিক জগতে তরঙ্গ ও কণা ধর্ম মূলতঃ একই, যেটা আমাদের অভিজ্ঞতায় অকল্পনীয়। আসলে আমরা এমন এক জগতের কথা আমাদের প্রচলিত ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইছি, যার নিয়মকানুন আদৌ আমাদের macroscic জগতের মত নয় যেহেতু এই

উভয় সঙ্কটের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত সত্তার মূল ধর্ম নিহিত আছে, সেহেতু দ্বৈতবাদ একটি অতি মৌলিক এবং প্রাথমিক তত্ত্ব। জগতের সমস্ত ঘটনার (রাসায়নিক বা অন্য কোন ধরণের) মূল ব্যাখ্যা নিহিত আছে এই তত্ত্বের মধ্যে এবং এই মতবাদ থেকেই বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্ব বা সূত্রের

তরঙ্গ-কণা দ্বৈতবাদের এই আপাতঃ কূট সমস্যাটিতে নূতন আলোক ফেললেন W. Heisenberg (1927) তাঁর বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা তত্ত্বে' (Uncertainty principle)। তিনি দেখলেন যে, পরীক্ষার সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি পারমাণবিক জগতে প্রযোজ্য নয়, কেননা পরীক্ষার যন্ত্র এবং পরীক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction) এখানে উপেক্ষণীয় নয়। তিনি matrik পদ্ধতিতে অতি জটিল গাণিতিক আলোচনা করে দেখালেন যে, কোন চলমান কণার অবস্থান এবং ভরবেগ একই সঙ্গে নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। যদি কোন নির্দেশাঙ্ক (ধরা যাক, x-নির্দেশাঙ্ক) নির্ণয়ে ভুল হয় Δx এবং ভরবেগের x উপাংশ নির্ণয়ে ভুল হয় Δp_x তবে, $\Delta p_x \Delta_x$ প্রায় $\frac{h}{2\pi}$-এর সমান অর্থাৎ $\Delta p_x \Delta_x$ এবং h-এর order সমান হয়। এই অনিশ্চয়তা মাপবার যন্ত্রের কোন খুঁত নয়, এটা প্রকৃতিরই একটা মূল নিয়ম। এইভাবে হাইসেনবার্গ নির্ণের নিশ্চিত পরিমাপের বদলে রাশিবিজ্ঞানের সম্ভাবনা ব্যবহার করলেন। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে সহজেই দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ ব্যবহার করে অবস্থান খুব নির্ভুলভাবে জানা গেলেও উচ্চশক্তি ফোটনের সঙ্গে সংঘর্ষে Compton effect অনুযায়ী ভরবেগের অনেকখানি পরিবর্তন হয় এবং ভরবেগ নির্ণয়ে অনেক ভুল থেকে যায়। বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে ভরবেগের খুব একটা পরিবর্তন না হলেও diffraction-এর জন্যে অবস্থান নির্ণয়ে অনেকটা ভুল থেকে যায়। যেহেতু $\frac{h}{2\pi}$ খুব ছোট ($1{\cdot}05\times 0L^{-27}$ erg. sec.), তাই এই অনিশ্চয়তা সমস্ত আকারের বস্তু এবং বিকিরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও বড় বস্তুর ক্ষেত্রে এটা পরীক্ষা করে দেখানো সম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে যন্ত্রের ত্রুটিই হাইসেনবার্গ অনিশ্চয়তা থেকে বেশী হয়। খুব হাল্কা কণা (হাল্কা পরমাণু, ইলেকট্রন নিউট্রন) ইত্যাদি ছাড়া তাই এই অনিশ্চয়তা উপেক্ষণীয় হয়। অবস্থান এবং ভরবেগ ছাড়া অন্যান্য কয়েক জোড়া ধর্মের ক্ষেত্রেও হাইসেনবার্গের সূত্রটি প্রযোজ্য। এই সব ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকারগুলিকে canonically conjugate dynamical operator বলে, যথা শক্তি ও সময়। এর থেকে দেখা যায় যে, যখন তরঙ্গ বা কণার মধ্যে একটি ধর্ম প্রকট হয়ে ওঠে, তখন অপরটি ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তাই কণাধর্মের থেকে অবস্থান নির্ণয়ের পর তরঙ্গধর্মের থেকে ভরবেগ মাপা যায় না; অর্থাৎ কোন তত্ত্ব কোন সময় কণা এবং কোন সময় তরঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে, কিন্তু কখনই একই সঙ্গে কণা এবং তরঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে না। তাই পদার্থ ও বিকিরণের এই দুটি ধর্ম পরস্পর বিরোধী নয়—পরস্পর পরিপূরক। এ ছাড়া 1927 সালে E. Schrödinger তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি সূত্র পেলেন। শ্রয়ডিঙ্গার এবং হাইসেনবার্গ আপাততঃ দৃষ্টিতে দুটি বিভিন্ন দিক দিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে গড়ে তুললেও পরে দেখা গেল তাঁদের পদ্ধতি মূলতঃ একই। তিনি কণার শক্তিকে কোয়ান্টায়িত করে নিয়ে এবং দ্য ব্রগলীর পদার্থ-তরঙ্গের সূত্র ব্যবহার করে যে সূত্র পেলেন, তা ত্রিমাত্রিক দেশে কোন কণার বন্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেল। সমকোণী নির্দেশাঙ্কে তাঁর সূত্রটি হলো :—

$$(E-V)\psi=O \quad ...(16)$$

এখানে m, E, V, যথাক্রমে কণাটির ভর ও মোট এবং স্থিতি (Potential) শক্তি এবং ψ কণাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্ৰ ব্রগলী-তরঙ্গের অপেক্ষক। এর গাণিতিক আলোচনার কোন পরিষ্কার ভৌত অর্থ দেওয়া যায় না, তবে Max Born দেখিয়েছিলেন যে, x, y, z বিন্দুটিকে ঘিরে মৌলিক আয়তন dx dy dz-এ ঐ কণাটির অবস্থানের সম্ভাবনা।$|\psi|^2$ dx dy dz—এই সূত্রটি ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ বিবৃত করে এবং কোন চলমান কণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনিশ্চয়তার অংশটিকে (Band of uncrtainty) প্রকাশ করে।

এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। চলমান কণার তরঙ্গ-ধর্মের অর্থ এই নয় যে, কতকগুলি সত্যকারের তরঙ্গ কণিকার সঙ্গে জড়িত থাকে। এ সম্বন্ধে বর্তমানে যেটুকু বলা যায়, তা হলো এক ঝাঁক চলমান কণা একটি train of waves-এর মত ব্যবহার করে। এর একমাত্র কারণ এই যে, কোন বিশেষ বিন্দুতে একটি কণিকাকে পাওয়ার রাশি-বিজ্ঞানীয় সম্ভাবনা যে সূত্রের সাহায্যে পাওয়া যায় (এখানে Schrödinger-এর সূত্র), সেটা তরঙ্গের সমীকরণের অনুরূপ। এর কারণটি কিন্তু আজও রহস্যময়। এমনও হতে পারে যে, এই মতবাদের ভবিষ্যতে পরিমার্জন প্রয়োজন। কিন্তু এই ধারণা নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোটামুটি কাজ চলে যাচ্ছে। একইভাবে বিকিরণও ঠিক চলমান তরঙ্গ নয়, একে বরং বলা যায়, এক ঝাঁক চলমান আলোক-কণিকা বা ফোটন। এর রাশি-বিজ্ঞানীয় বন্টন যে সূত্র থেকে পাওয়া যায়, সেটা তরঙ্গ-গতির সমীকরণের মত। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই বর্তমান তরঙ্গ এবং কণিকার দ্বৈতবাদের ভৌত অর্থ নিয়ে মাথা না ঘামিয়েই একে মেনে নিচ্ছেন। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীটির প্রধান উদ্ভাবক Max Born (1926)। তাঁর এই ধারণা যদি সম্পূর্ণভাবে সত্য নাও হয়, তবুও মোটামুটি সহজ ও কাজ চালাবার উপযোগী। বর্তমানে মনে করা হয় যে, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবতঃ খুব একটা ভুল নয়।

এইভাবে এক নতুন বিষয় তরঙ্গ-বলবিদ্যা বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জন্ম হলো। এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সাধারণ (General) এবং সমস্ত রকম তন্ত্রের (ভারী বা হাল্কা) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু একটি অণুর থেকে ভারী পদার্থের ক্ষেত্রে এই বলবিদ্যার সিদ্ধান্ত সনাতন নিউটনের বলবিদ্যার সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক হয়। কেননা বড় বস্তুর ক্ষেত্রে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার মান অন্যান্য ত্রুটির তুলনায় খুব ছোট বলে উপেক্ষণীয় হয়। এই বিষয়ের সমীকরণগুলি বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে ভালভাবে মিলে যায়, কিন্তু এর গাণিতিক প্রয়োগের ভৌত তাৎপর্য আদৌ বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেউ কেউ বলেন যে, এর তাৎপর্য নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল, কেননা এটা সম্ভবতঃ মানুষের বর্তমান বোধশক্তির আওতার বাইরে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

চাঁদ ও পৃথিবী

এপর্যন্ত পর পর মোট ছয়বার মানুষ চাঁদের বুকে নেমেছে, কিন্তু চাঁদের সৃষ্টিরহস্য ভেদ করা এখনও সম্ভব হয় নি বিজ্ঞানীদের পক্ষে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনা-চিন্তার শেষ নেই। একদল বিজ্ঞানীর মতে সৌরজগতের অন্য কোন স্থানে চাঁদের উৎপত্তি। পরে পৃথিবী তাকে উপগ্রহরূপে পেয়েছে। আর একদল বিজ্ঞানী বলছেন, একই সময়ে একই উপাদানে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের মতে, চাঁদ পৃথিবী যমজ গ্রহ। তৃতীয় আর একটি গোষ্ঠী বলেন যে, চাঁদ পৃথিবীরই একটি অংশ বিশেষ। আমাদের এই পৃথিবীগ্রহের ইতিহাসের আদিযুগে চাঁদ পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

চান্দ্রবিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষী প্রথিতযশা বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হ্যারল্ড ইউরে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থার ডক্টর জন ও-কীফে সম্প্রতি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চাঁদ যে এক সময় পৃথিবীরই অংশ ছিল, এই তত্ত্বটি খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

লণ্ডনে রয়েল সোসাইটির সাম্প্রতিক এক সভায় পঠিত এক গবেষণা-প্রবন্ধে ডক্টর ইউরে এবং ডক্টর ও-কীফে একটি রাসায়নিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। তাতে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, চাঁদের শিলাখণ্ডগুলি একদা এমন একটি অখণ্ড বিরাট শিলার অংশবিশেষ ছিল, যার মধ্যে পর্যাপ্ত গলিত লোহা ছিল। যদি আজকের এই চাঁদের কেন্দ্রস্থলে গলিত ধাতু থাকে, তাহলে তা সমগ্র ভাবে চাঁদের আয়তনের অনুপাতে ক্ষুদ্র। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের অনুপাতে অনুরূপ গলিত ধাতুপূর্ণ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল যতটা ছোট, চাঁদের গলিত ধাতুপূর্ণ কেন্দ্রস্থল তার চেয়ে অনেক বেশী ছোট।

উভয় বিজ্ঞানীই তাঁদের বিশ্লেষণে এই কথা বলেছেন যে, পৃথিবীতে গলিত ধাতুর উচ্চতর অনুপাত এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে যে, চাঁদ একদা পৃথিবীর অভিন্ন অংশ ছিল। এই তত্ত্বে আরও বলা হয়েছে যে, পৃথিবী আর চাঁদ পৃথক হয়ে যাবার পূর্বে পৃথিবীর প্রভূত পরিমাণ লোহা কেন্দ্রস্থলে চলে যায় এবং সেই সঙ্গে সোনা, প্ল্যাটিনাম এবং অন্যান্য অনেক দুষ্প্রাপ্য ধাতুও মিশে যায়। এটাই চাঁদের স্বল্প ঘনত্বের কারণ। দুষ্প্রাপ্য ধাতুর পরিমাণও যে নামমাত্রই পাওয়া যায়, তারও কারণ ঐ একই। পৃথিবী থেকে যে অংশটুকু বিচ্যুত হয়ে চাঁদের উদ্ভব হয়েছে, তা হচ্ছে ভূমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশের কাছাকাছি কোন অংশ, যেখানে লোহার অংশ খুবই সামান্য ছিল।

অ্যাপোলোর মহাকাশচারীরা যে সব চান্দ্র-শিলা সংগ্রহ করে এনেছেন, তাদের নমুনা পরীক্ষা করে এবং কম্পন-তরঙ্গ যেভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর দিয়ে যায়, তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, চাঁদের কেন্দ্রস্থলে ধাতব অংশ খুব সামান্যই। ডক্টর ইউরে এবং ডক্টর ও-কীফের মতে এই পরীক্ষার ফলে চাঁদের উদ্ভব সম্পর্কে অপর সব তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—1976

ঊনত্রিশত্তম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা
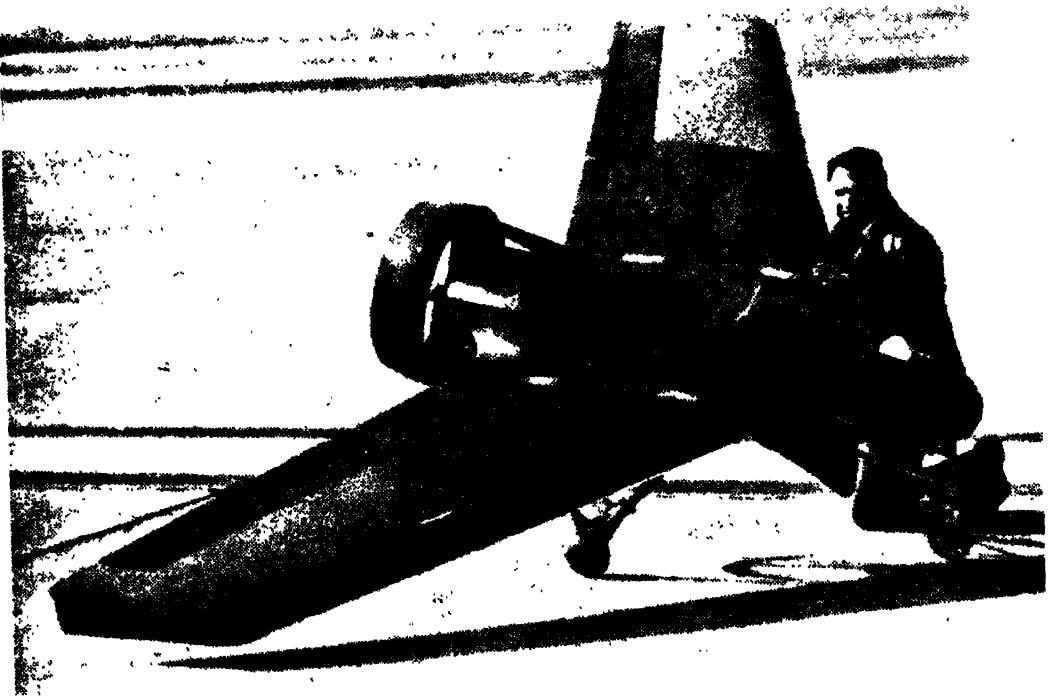
মোটরযাত্রীরা দূরবর্তী কোন অজানা রাস্তায় পথ হারিয়ে বিপদাপন্ন হলে, বৃত্তাকার রেল রোড ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের ভুলপথে চালিত হবার সম্ভাবনা ঘটলে অথবা রিফাইনারীতে চুরি বা নাশকতামূলক কার্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার লকহিড কোম্পানী এরোপ্লেনের মত চালকবিহীন এক প্রকার উড্ডয়ন যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে দূর-পরিচালন ব্যবস্থায় এটি পরিচালিত হবে। এতে সাধারণ ক্যামেরা, টেলিভিসন ক্যামেরা এবং লেসার ডেজিগনেটর প্রভৃতি যন্ত্র বসাবার ব্যবস্থাও আছে। এসব ছাড়াও সাধারণ চোখের মত ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত স্থানের ছবি দূর-পরিচালন ব্যবস্থায় ভূপৃষ্ঠস্থ কন্‌ট্রোল রুমে পরিষ্কার দেখা যায়।

জাতীয় পঞ্জী

পঞ্জী অথবা পঞ্জিকা মাস, তিথি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটার সময় প্রভৃতির নির্ঘণ্ট। বৈষয়িক, লৌকিক কাজকর্ম ও ধর্মীয় কৃত্যের জন্যে পঞ্জিকার প্রয়োজন। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থিতি নির্ণয় করে প্রবহমান কালকে বছর, মাস, দিনে পরিমাপ করা হয়। পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষপথের সঙ্গে নত হওয়ায় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে না; এজন্যে ঋতু পরিবর্তন হয়। 21শে মার্চ ও 23শে সেপ্টেম্বর দিবারাত্রি সমান দীর্ঘ; কারণ ওই দিন উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্যের প্রতি সমভাবে নত এবং সূর্যকিরণ লম্বভাবে বিষুবরেখার উপর পতিত হয়। মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে (21শে মার্চ) সূর্যরশ্মি বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। তারপর সূর্যরশ্মি ক্রমশঃ দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধে প্রবেশ করে। বরাহমিহির যে পঞ্জিকা সংস্কার করেছিলেন, সেই অনুযায়ী মহাবিষুবের পরদিবস আর্যদের নববর্ষের সূচনা। বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে, অর্থাৎ পয়লা চৈত্র নববর্ষ সুরু হতো। সূর্য প্রদক্ষিণ যেমন পৃথিবীর বার্ষিক গতি, শূন্যে ভূ-মেরুর দোলনহেতু বৃত্ত রচনা, সেরূপ পৃথিবীর অয়নগতি বা অয়ন চলন। অয়নগতিযুক্ত পাশ্চাত্য রাশিচক্রকে সায়ন রাশিচক্র বলা হয়। হিন্দু জ্যোতিষে রাশিচক্রের সঙ্গে পৃথিবীর অয়নগতি হিসাব করা হয় না বলে এই নিরপেক্ষ গণনাকে নিরয়ন রাশিচক্র বলা হয়। আমাদের পঞ্জিকায় নিরয়ন রাশিচক্র অনুসারে গ্রহাদির অবস্থিতি লিপিবদ্ধ থাকে। সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্রের পার্থক্য 22°। ইংরেজী বর্ষপঞ্জী (Gregorian Calendar) অয়ন গতি অর্থাৎ রবির গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন গ্রহের আকর্ষণের জন্যে পৃথিবীর গতিপথ অর্থাৎ দৃশ্যতঃ রবির অবস্থান ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়। সায়নবর্ষ বা ঋতুনিষ্ঠবর্ষ 365 দিন 5 ঘণ্টা 48·8 মিনিট। আর্যভট্টের সময়ের গণনা অনুযায়ী 365 দিন 6 ঘণ্টা 12·6 মিনিট, অর্থাৎ 23·8 মিনিট বেশী গণনা হয়েছে। বর্তমানে 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট। এর ফলে ঋতুগুলি আঠারো শত বছরে 30 দিন আগে আরম্ভ হবে এবং এই ব্যবধান ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং ঋতুগুলি এগিয়ে আসবে। ফলে গ্রীষ্মে ফুটবে বর্ষার ফুল, শীতে ডাকবে বসন্তের কোকিল, হেমন্তে পড়বে শীত, বসন্তে ফুল ফুটবে গ্রীষ্মের। ঋতুনিষ্ঠ বর্ষপঞ্জী কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক, কিন্তু নিরয়ন গণনা ঋতুনিষ্ঠ নয়।

জাতীয় পঞ্জিকা (রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ) ঋতুনিষ্ঠ বা সায়ন চক্র অনুযায়ী অয়ন চলন গ্রহণ করেই প্রণীত হয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাবিষুব সংক্রান্তিতে সূর্যের জ্যোতিষ্করাশি মেষরাশিতে গমন করে। তার পর দিন (বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাসের পর দিন), অর্থাৎ 1লা চৈত্র (22শে মার্চ) সৌর বছরের প্রথম দিন। 365 দিনে বছর। অধিবর্ষ 366 দিন।

বৈশাখ থেকে ভাদ্র—এই পাঁচ মাস 31 দিন। বাকী সাত মাস 30 দিন। অধিবর্ষে চৈত্র মাস 31 দিন।

বর্ষ নির্ণয়ের সংখ্যাকে অব্দ, সন (আরবী), সাল (ফার্সী) বলা হয়। কণিষ্কের কাল থেকে শক বর্ষ বা শকাব্দ গণনা করা হয়। রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে বঙ্গাব্দ প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অব্দ প্রচলিত, যেমন বিক্রমী সংবৎ, ফসলি, কোল্লাম, খৃষ্টাব্দ। হিজরী অমাবস্যার পর চন্দ্র দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। এটি চন্দ্রের গতিপথের উপর নির্ণীত হয় (চান্দ্র সন)।

শকাব্দ = বঙ্গাব্দ + 515
বঙ্গাব্দ = খৃষ্টাব্দ − 593
সংবৎ = বঙ্গাব্দ + 650

আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান দৃষ্টে যে সময় স্থির করা হয়, তারই নাম 'স্থানীয় সময়, কাজেই স্থানের অবস্থান অনুযায়ী স্থানীয় সময় বিভিন্ন। প্রমাণকাল (Standard time) তুলনা করবার জন্যে ও কাজকর্মের সুবিধার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এলাহাবাদের স্থানায় সময় ভারতের প্রমাণকাল। গ্রীণীচ শহরের স্থানীয় সময় পৃথিবীর পক্ষে প্রমাণকাল। যে কাল্পনিক মধ্যরেখা (O°) রেখা গ্রীণীচ শহরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু যুক্ত করেছে, তা হলো মূল মধ্যরেখা। এই রেখার পূর্ব ও পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় দেশান্তর বা দ্রাঘিমা (Longitude); যেমন—এলাহাবাদের দেশান্তর 82·5°E। আন্তর্জাতিক সীমা রেখা (International date line) মধ্যরেখার 180° পূর্ব বা পশ্চিমে। এরোপ্লেনে ভ্রমণ করবার সময় হাতের ঘড়ির সঙ্গে কোন দূরবর্তী স্থানের স্থানীয় সময় মিল হবে না, কারণ সূর্য সব জায়গায় এক সময়ে সর্বোচ্চ স্থানে থাকবে না।

অমূল্যধন দেব

তরঙ্গের বেগ নির্ণয়

আমরা জানি একটি পুকুরের স্থির জলে ঢিল ফেললে তির্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তা কিনারায় গিয়ে পৌঁছয়। আবার নদী কিংবা খালে এধরণের ঢেউ বা তরঙ্গ বয়ে যায়, তবে পুকুরের মত এক্ষেত্রে জলরাশি স্থির নয়, তা প্রবহমান। এই প্রবাহের গতি বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে সচল তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, তার বেগ নিম্নলিখিত পদ্ধতি থেকে বের করা যেতে পারে।
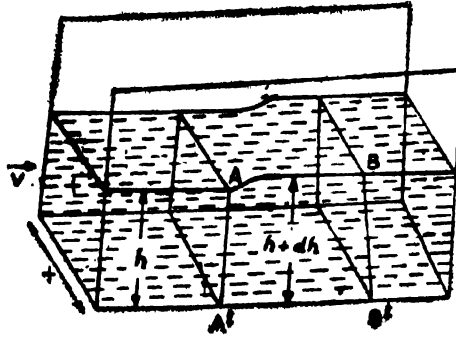
1নং চিত্র

1নং চিত্রে একটি খালের ছবি দেওয়া হয়েছে। এর বিস্তার x এবং জলতলের উচ্চতা h। প্রবহমান জলের বেগ v। ঢেউ বা তরঙ্গ সৃষ্টি হবার জন্যে BB′ স্থান উঁচু হয়েছে। AA′ এবং BB′ দুটি তল কল্পনা করা হলো, যাদের উচ্চতা যথাক্রমে h এবং h+dh। দুই তলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত জলের আয়তন সমান এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জলতল স্ফীত হয়ে ওঠে। কাজেই আয়তন ঠিক রাখতে গতিবেগ কমবে। মনে করা যাক, এই কমের পরিমাণ dv।

সুতরাং $v.\,h$ [আয়তন] $=(v-dv)\,(h+dh)$ [আয়তন]

$$=vh+vdh-hdv-dv.\,dh$$

dv এবং dh-এর মান ছোট হওয়ায় এদের গুণফলকে বাদ দিয়ে পাই,

$$vdh=hdv.$$

বা $\frac{v}{h}=\frac{dv}{dh}$ ……(1)

এখন AA′ তলে গড় পার্শ্বঘাত $=\frac{o+h\rho g}{2}.\ hx$

[$hx=AA'$ তলের ক্ষেত্রফল]

$$p_A = \frac{1}{2}h^2 \rho g x$$

এবং BB´ তলে গড় পার্শ্বঘাত $(p_B) = \frac{1}{2}(h+dh)^2 \rho g x$

∵ লব্ধি (Resultant) ঘাত,

$$p_B - p_A = \frac{1}{2}\rho g x \{(h+dh)^2 - h^2\}$$

$$= \rho g x h \ dh.$$

এই লব্ধিঘাত জলের ভরবেগকে বাড়িয়ে দেবে, কারণ গতিবেগে, dv' পরিমাণ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই লব্ধিঘাতের জন্যে ভরবেগের যেটুকু পরিবর্তন হয় $= m \times dv$

$$= vhx\rho dv \quad [m = v.hx.\rho]$$

সর্তানুসারে,

$$\rho g x h dh = vhx\rho dv$$

$$\text{বা } \frac{g}{v} = \frac{dv}{dh} \quad \cdots\cdots\cdots(2)$$

কিন্তু (1) নং সমীকরণ থেকে আমরা জানি

$$\frac{dv}{dh} = \frac{v}{h} \quad \cdots\cdots\cdots(3)$$

(2) এবং (3)-এর মধ্যে তুলনা করে পাই

$$\frac{g}{v} = \frac{v}{h}$$

$$\text{বা } v^2 = gh$$

$$\text{বা } v = \sqrt{gh} \quad \cdots\cdots\cdots(4)$$

(4) নং সম্পর্ক থেকে আমরা জলের উপরিতলে প্রবহমান তরঙ্গের বেগ নির্ণয় করতে পারি।

সুনীল বিশ্বাস

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 : ক্রীড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Sports Medicine) কাকে বলে ?

রজত মিত্র, কলিকাতা-3

প্রশ্ন 2 : মান সম্বন্ধে জানতে চাই ?

কল্যাণ চক্রবর্তী, কলিকাতা-6

উত্তর 1 : খেলাধুলা করলে শরীর এবং মন যে ভাল থাকে, তা আমরা সকলেই জানি। সম্প্রতি শারীরবৃত্তবিদ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রাদির উপরে নানারকম খেলাধুলার প্রভাব নির্ণয় করেছেন। তাঁদের এই সব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে একত্র শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ক্রীড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Sports Medicine) বলে। শ্রমের শারীরবৃত্ত, রোগ আরোগ্য, শ্রমের সাহায্যে রোগ-প্রতিরোধ, শ্রমের ফলে উৎপন্ন রোগ ও আঘাত, তার প্রতিকার এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যের উন্নতিসাধন প্রভৃতি বিষয় এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

আয়ুর্বেদে বাতব্যাধি নিরাময়ে শ্রমের সুফলের কথা উল্লেখিত আছে। সভ্যতার ইতিহাসে এই উক্তিই হলো ক্রীড়াচিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকেরাও নানা রোগের চিকিৎসায় শ্রম—তথা ক্রীড়ার উপযোগিতার কথা জানতেন। তারপরে সব যুগেই শারীরবৃত্তবিদ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা রোগচিকিৎসা শ্রম—তথা ক্রীড়াকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক কালে 1911 সালের পর থেকে বহু বিজ্ঞানীর মিলিত প্রচেষ্টায় ক্রীড়াচিকিৎসা-বিজ্ঞান অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। ভারতবর্ষে পাতিয়ালায় অবস্থিত জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা (Notional Institute of Sports) ক্রীড়া-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 1966 সাল থেকে ভারতে Sports Journal নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা আশা করেন, ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে ক্রীড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। ক্রীড়াচিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ গুরুত্বও তাই অনস্বীকার্য।

আশিস সিংহ

উত্তর 2 : ব্যবহারিক জীবনে আমরা যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করি, ক্রয় বা বিক্রয় করি, তার সঠিক মান (Standard) মূল্যের পরিবর্তে বাঞ্ছিত গুণসম্পন্ন হবে বলেই আশা করি। বাঞ্ছিত গুণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকলেই এটি সম্ভব। তখন দ্রব্য উৎপাদনকারী চেষ্টা করবেন, যাতে তার সামগ্রী নিম্নমানের না হয় এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদনকারীও সচেষ্ট হবেন, যাতে ন্যায্যমানের সামগ্রীর

উৎপাদন ব্যয় যথাসম্ভব কম হয়। যাদের উপর দ্রব্যাদি ক্রয়ের দায়িত্ব থাকে, তারা ন্যায্য মান বলতে উৎপাদনের উৎকর্ষ, ব্যবহারের যোগ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হবেন। ক্রেতা, বিক্রেতা, উৎপাদক এই ত্রিবিধ গোষ্ঠীর লক্ষ্য কিন্তু এক এবং তা উপযুক্ত মানসম্পন্ন দ্রব্য। অতএব কাউকেও এই উপযুক্ত মান স্থির করতে হয়। ভারতবর্ষে এই রকম মান স্থির করবার সংস্থার নাম ভারতীয় মানক সংস্থা। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর এই সংস্থা স্থাপিত হয় এবং এ পর্যন্ত আট হাজারের অধিক মান নিরূপিত হয়েছে। অনেকেই ক্রেতাই ISI ছাপ দেওয়া দ্রব্য বাজারে দেখে থাকবে। ISI মানে Indian Standards Institution। ISI ছাপ অর্থ বস্তুটি নির্ধারিত মানের। IS-1 আমাদের জাতীয় পতাকার মান নির্দেশক, অর্থাৎ জাতীয় পতাকার রং, আকার ইত্যাদি এতে বিধৃত আছে। IS-12 অফিসের চিঠিপত্র লিখতে কি রকম ভাবে প্যারা, সাব-প্যারা নম্বর করতে হয়, কি ভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিতে হয় ইত্যাদির নির্দেশক। বস্ত্রশিল্প, রসায়নশিল্প ইত্যাদি শিল্পের উৎপাদন I. S. অনুযায়ী হয়, নতুবা ইন্সপেক্টর প্রস্তুত দ্রব্য বাতিল করে দেবেন। বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সব মান নির্দিষ্ট হয়। শুধু শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের পক্ষে নয়, সকলের পক্ষেই মান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। ধরা যাক, আমরা তারিখ লিখি, 1লা বৈশাখ 1383; I. S. পদ্ধতি অনুযায়ী হবে 1383-বৈশাখ-1, অর্থাৎ বছর-মাস-দিন।

স্বাধীনতা লাভের আগে আমরা British Standard (B.S.) অনুসরণ করতাম। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে মালপত্র আমদানী করতে হতো, তখন অন্যান্য দেশের মাল সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই নিজস্ব মানক সংস্থা ও মান আছে। যেমন—রাশিয়ার GOST, আমেরিকার ASTM, ফ্রান্সের CNM, জার্মেনীর DIN, সুইজারল্যাণ্ডের VSM, জাপানের JIS, এমন কি, সেদিনের ইজরায়েল রাষ্ট্রের SI। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানক সংস্থাও আছে, যেমন I.S.O, VIC, ORE। প্রত্যেক দেশের মাল অন্য দেশের মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে যুক্ত থাকে, যাতে আন্তর্জাতিক পণ্য কেনা-বেচার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হয়। যদি মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হয়, তাহলে ক্রেতা পাওয়া যাবে—এমন আশা করা যায় না। শুধু ব্যবহারকারীর মান নয় ব্যবহার্যেরও মান আছে।

দেবকুমার গুপ্ত

বিবিধ

অসবর্ণ

সমাচার কর্তৃক নতুন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—দু-জন বৃটিশ বিজ্ঞানী উদ্ভিদ এবং প্রাণীর একটি করে কোষ মিলিয়ে নতুন একটি জ্যান্ত কোষ তৈরী করতে পেরেছেন।

এই বিজ্ঞানীদের নাম অধ্যাপক জ্যাক লুসি ও অধ্যাপক টেড কংকিং। এঁরা প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে দাঁড়ানো প্রাকৃতিক পাঁচিল ভাঙতে চলেছেন বলা যায়। মুরগীর রক্ত থেকে লাল কোষ এবং ইস্ট্—যা মাদক তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এবং গেঁজিয়ে তোলে, তার একটি কোষের মিশ্রণ ঘটানোর ফলে ওই নতুন কোষের উদ্ভব ঘটেছে। নতুন এই কোষটিতে প্রাণের লক্ষণ যা থাকবার তা আছে। শুধু অন্যান্য কোষের মত স্বয়ং-বিভাজনের ক্ষমতা নেই; অর্থাৎ এই নতুন কোষটি থেকে আপনা আপনি আরও কোষ সৃষ্টি হচ্ছে না। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হেটারোক্যারিয়ন।'

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে মানুষের দেহ-কোষ এবং ইতর প্রাণীর দেহ-কোষের এ-রকম মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কোষ তৈরী সম্ভব হবে। আপাততঃ মুরগী ও ইস্টের মিশ্রিত কোষের ফলে জাত নতুন প্রাণবন্ত কোষটি, বিশুদ্ধ জীব-বিজ্ঞান এবং পরে ক্যানসার গবেষণার কাজে লাগবে। তাছাড়া এথেকে সস্তায় প্রোটিন খাদ্য পাওয়া যাবে।

আফ্রিকা সরছে

এ. এফ. পি. কর্তৃক প্যারিস থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—ইটালিতে সম্প্রতি যে ভূমি-কম্প হয়েছে, তাতে এক হাজার মানুষ মারা যায়। সারা ইউরোপের মাটি কেঁপে উঠেছিল। এখানকার ভূকম্পন বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, আফ্রিকা মহাদেশ ক্রমশঃ ইউরোপ ও এশিয়ার দিকে সরে যাচ্ছে। তারই ফল ওই ভূমিকম্প।

পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত জিওফিজিক্যাল ডিটেকশন ইউনিটের সদস্য বার্নার্ড ম্যাসিনো ইটালির ভূমিকম্প সম্পর্কে বলেছেন, সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। এই ভূমিকম্প খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভূমিকম্পবিদেরা বলেছেন, আফ্রিকা মহাদেশ ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। এর ফলে চাপ পড়ছে আড্রিয়াটিক শেল্‌ফে এবং ভূমিকম্প হচ্ছে।

ভাবীকালের 'খনিকর্মী'

সমাচার কর্তৃক নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—কয়লা কাটবার জন্যে কর্মীদের আর হয়তো খনির ভিতরে যেতে হবে না। মাটির উপরে বসে সুইচ টিপলেই যন্ত্রই তাদের হয়ে কেটে দেবে। এরকম একটা যন্ত্রের কার্যকরী মডেল ইতিমধ্যেই তৈরী করে ফেলেছেন একজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক। ভারতের জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন করপোরেশনের এক প্রকাশনায় এই খবর বেরিয়েছে। বাইরে বসে খনিকর্মীরা তাঁদের ইচ্ছামত খাদের তলায় যে কোন জায়গায় যন্ত্রটিকে কাজে লাগাতে পারবেন। যন্ত্রটিকে পরিচালনার চাবিকাঠি থাকবে তাঁদেরই হাতে। একজন খনিকর্মী, গড়ে যতটা উৎপাদন করেন, এই যন্ত্র করবে তার দশগুণ বেশী। এই যন্ত্র যেদিন কাজে নামবে—সেদিন অবশ্য খুব দূরে নয়—তখন চাসনালার মত মর্মান্তিক খনি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা চিরতরে অন্তর্হিত হবে। যন্ত্র চলবে বিদ্যুতে। দুর্ঘটনা ঘটলে বড় জোর যন্ত্রটি নষ্ট হবে।

বৃহত্তম প্রাণী উদ্যান

সমাচার কর্তৃক চণ্ডীগড় থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—পাঞ্জাব সরকার এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে পাতিয়ালা-চণ্ডীগড় সড়কের ধারে উত্তর ভারতের বৃহত্তম প্রাণী উদ্যান গড়েছেন। এখানে দেশ-বিদেশের দুর্লভ প্রজাতির পশুপাখী রাখা হয়েছে। দু-শ' হেক্টর জায়গায় এই উদ্যানটি গড়া হয়েছে। সেখানে খোলা জায়গায় প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায়। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সিংহ এবং হরিণের এলাকা। কুড়ি হেক্টর জমি হরিণকে এবং বারো একর জমি সিংহকে ভোগদখল করতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই উদ্যানে রয়েছে চিতাবাঘ, ভালুক, বনবিড়াল সজারু, গিবন, প্রভৃতি।

উদ্যানটি আগামী বছর থেকে জনসাধারণ পরিদর্শন করতে পারবেন। উদ্যানের এক পাশে আছে ঘর্ঘরা নদী। নদীর বন্যা রুখতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। উদ্যানের মধ্যে দিয়ে একটি খাল বয়ে যাচ্ছে।

হারিয়ে-যাওয়া পাখী

সমাচার কর্তৃক বোম্বাই থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড এবং বোম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি কিছু দুর্লভ প্রজাতির পাখীর খোঁজখবর দিতে জনসাধারণকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যদি এই পাখীগুলি কোথাও দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠান।

এক জাতের প্যাঁচা আছে, তারা ছত্রাক খেয়ে বাঁচে। পশ্চিম ভারতের সাতপুরা পাহাড় এলাকা এবং পূর্ব ভারতের রাজমহল ও সিমলিপাল পাহাড়ের জঙ্গলে এদের আস্তানা। সচরাচর যে সব প্যাঁচা আমরা দেখি, তাদের গায়ে সাদা ছোপ থাকে অনেক। এদেরও তাই আছে—শুধু কপাল বাদে। 1914 সালে এদের দেখা গেছে বলে বইপত্রে উল্লেখ আছে। সেই শেষ, তারপর নিপাত্তা। এই প্যাঁচার নাম ব্লুইটস আউলেট। বিশ্বের আর কোথাও দুর্লভ।

জেরডনস কোরসার এক জাতের উড়নবাজ পাখী। গলায় সুন্দর আংটির মত বেড় আছে। বসবাস গোদাবরী নদীর অববাহিকা এবং দক্ষিণে পেন্নার উপত্যকায়। তাকে শেষ বার দেখা গেছে 1900 সালে। বইপত্রের রেকর্ড তাই বলে।

হিমালয়ের পাদদেশে থাকে লালঝুঁটি এক জাতের হাঁস। অন্ধ্রের নেল্লোর এবং মহারাষ্ট্রের জালনা এলাকায় মরশুমী সফরে আগত তারা। শেষ বার দেখা গেছে 1935 সালে।

ফল লাভ

সমাচার কর্তৃক নতুন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা গাছ ও তার ফুলের যৌন পরিবর্তনের এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ওই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় কয়েক রকমের ফল ও বীজের উৎপাদন খুব বেড়ে যাবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে যৌন পরিবর্তনের পদ্ধতি শতকরা 100 ভাগ স্ত্রী-বীজ উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারবে। স্ত্রী-বীজ থেকে স্ত্রী-গাছ ও স্ত্রী-ফুল এবং শেষে ফুলের বসতি ভেঙ্গে ফলে পরিণত হবে। বলা যায়, দিল্লীর বৈজ্ঞানিকদের এই সাফল্য ফল ও বীজ উৎপাদনে বিপ্লব এনে দেবে। আম, লিচু, নারকেল, কাজু বাদাম ইত্যাদি ফলের উৎপাদন এই পদ্ধতিতে খুবই বেড়ে যাবে। অবশ্য এসব এখনও গবেষণার পর্যায়ে আছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (ফোন : 55-0660) কলিকাতা-6। ইতি

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]
[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

অমূল্যধন দেব
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

লেখক/প্রকাশকের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা বিষয়ক বই দান করিবার জন্য লেখক/প্রকাশকদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে। গ্রন্থাগারের পাঠাগার ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দান হিসাবে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন-55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; যান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক এবং যান্মাসিক যথাক্রমে 19·00 এবং 9·50 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্ত বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:— প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।

2. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

3. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

4. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্তে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ জুলাই, 1976 সপ্তম সংখ্যা

জ্বালানী সেল—কি ও কেন?

অমলেন্দু ঘোষাল*

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে যখন দেখা গেল আমাদের চাহিদার তুলনায় প্রচলিত শক্তির উৎসগুলি (যথা—কয়লা, পেট্রোলিয়াম) অতি নগণ্য এবং আগামী শতকের শেষ নাগাদ হয়তো এগুলিও নিঃশেষিত, হয়ে যাবে তখনই বিজ্ঞানীরা ভাবতে সুরু করলেন নূতন কোন পদ্ধতিতে শক্তিকে কাজে লাগানো যায় কি না—তা বের করবার জন্যে। প্রচলিত পদ্ধতি-গুলির গুণাগুণ নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা সুরু হলো আর তখনই দেখা গেল প্রচলিত পদ্ধতিতে শক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে প্রচুর শক্তির অপব্যয় ঘটে—আর এই পর্যবেক্ষণই প্রেরণা যোগালো নূতন কোন পদ্ধতির কথা ভাবতে—যেখানে এই অপব্যয় রোধ করা সম্ভব হবে। সেই প্রেরণার ফল জ্বালানী সেল (Fuel cell)। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা শক্তি, শক্তির রূপান্তর ও সেল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবো।

শক্তি শব্দটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত কিন্তু কথাটির সম্যক সংজ্ঞা বোধ হয় এখনও ঠিকমত দেওয়া হয় নি। সাধারণতঃ শক্তি বলতে বোঝায়, যার সাহায্যে কোন কাজ করা হয় বা করবার চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে যে হাজার হাজার ঘটনা ঘটছে—'সে সবই ঘটবার কারণ হলো এক স্থান থেকে আর এক স্থানে' অদৃশ্য কোন কিছু'র প্রবেশের জন্যে। উনুনে

---

* রসায়ন বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ।

কেট্‌লীতে জল চাপিয়ে দিলে উনুন থেকে 'অদৃশ্য কিছু' কেট্‌লীতে প্রবেশ করে জলের উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলে। জেনারেটর থেকে 'অদৃশ্য কিছু' তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে বাড়ীতে আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়—এই 'অদৃশ্য কিছু'র প্রভাবেই মহাবিশ্বের যাবতীয় ঘটনা ঘটছে এবং একেই আমরা শক্তি বলি। শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে এবং এক এক রূপের এক এক ধরণের নাম। এই নামগুলি হলো তাপশক্তি, শব্দশক্তি, আলোকশক্তি, চৌম্বক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ও রাসায়নিক শক্তি। এই শক্তিগুলির মধ্যে রাসায়নিক শক্তি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলবো। এক টুক্‌রো কাঠ পোড়ালে তা থেকে তাপ ও আলো বের হয়ে আসে, জল জমে বরফ হয়ে গেলে তা থেকে তাপ বেরিয়ে আসে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে আগুন দিলে বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়—এগুলি সবই আমাদের অভিজ্ঞতা। প্রশ্ন হলো উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলির সময় যে শক্তির নিঃসরণ হয়ে থাকে, তার উৎস কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলা যায়—পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই তার রাসায়নিক গঠনের উপর নির্ভরশীল কিছু পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঐ পদার্থের কোন রাসায়নিক পরিবর্তনের সময়। এই শক্তিকেই রাসায়নিক শক্তি বলা যেতে পারে। তাপ-গতিবিদ্যার (Thermodynamics) পরিভাষায় এই শক্তিকে আন্তর শক্তিও (Internal energy) বলা হয়ে থাকে।

এরপর আসবো শক্তির রূপান্তর প্রসঙ্গে। শক্তির বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। জেমস্ প্রেসকট জুল প্রথম দেখালেন যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপশক্তি পেতে হলে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে, তার পরিমাণ সর্বদাই নির্দিষ্ট। শক্তির রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, একই অবস্থায় একই পরিমাণ এক প্রকার শক্তি সর্বদাই একই পরিমাণ অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন অন্যান্য প্রকার শক্তির তুলনায় তাপশক্তির ব্যবহারটা একটু বেয়াড়া ধরণের। এই খামখেয়ালীপনা লক্ষ্য করা যায় তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার সময়; যেমন—ধরা যাক ষ্টীম ইঞ্জিনের কথা। ষ্টীম ইঞ্জিনের বয়লারে তাপশক্তি দিয়ে উচ্চ চাপে জলকে বাষ্পীভূত করা হয়, পরে সেই বাষ্প দিয়ে পিস্টন ঠেলে চাকা ঘুরিয়ে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়। এই যান্ত্রিক শক্তি পাবার পর সেই বাষ্পকে আবার কাজে লাগাতে গেলে তাকে জলে পরিণত করে বয়লারে ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে এবং এই পদ্ধতির সময় বাষ্প উৎস থেকে যে তাপ শোষণ করেছিল, তার বেশ খানিকটা পারিপার্শ্বিকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়—ফলে শোষিত তাপশক্তির পুরোটা কাজে লাগানো গেল না। তাপ-গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এমন কোন ইঞ্জিন তৈরী করা মানুষের সাধ্যাতীত, যার সাহায্যে শোষিত তাপশক্তির শতকরা এক-শ' ভাগই কাজে লাগানো সম্ভব। তাই কোন ইঞ্জিন কত বেশী দক্ষতার, তা বিচার করা হয় শোষিত তাপের কতটা সেটি কাজে লাগাতে পেরেছে—তা থেকে। যদি Q পরিমাণ তাপশক্তি শোষণ করে W পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, তাহলে ইঞ্জিনের দক্ষতা হবে $\frac{W}{Q} \times 100$।

সাধারণ ষ্টীম ইঞ্জিনের কার্যরত অবস্থায় দক্ষতা শতকরা 4-8 ভাগ মাত্র। এর অর্থ সাধারণ ষ্টীম ইঞ্জিন যদি উৎস থেকে 100 ক্যালরি তাপ শোষণ করে, তবে তার মাত্র 4-8 ক্যালরি সেটি কাজে লাগাতে পারে; অর্থাৎ 96-92 ক্যালরি তাপশক্তি বাজে খরচ হয়ে যায়।

এবার আমরা আলোচনা করবো সেল (Cell) বা তড়িৎকোষ প্রসঙ্গে। আমরা পূর্বেই দেখেছি শক্তির বিভিন্ন রূপের মধ্যে দুটি রূপ হচ্ছে তড়িৎ-শক্তি এবং রাসায়নিক শক্তি। যেমন ইঞ্জিনের সাহায্যে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিকে রূপান্তরিত

করা হয়, ঠিক তেমনই সেল হচ্ছে এমন এক যন্ত্র, যার সাহায্যে তড়িৎশক্তি এবং রাসায়নিক শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। যদি বাইরে থেকে তড়িৎ পাঠিয়ে সেলের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে রাসায়নিক শক্তির প্রকাশ ঘটানো যায়, তবে সেই সেলকে বলে তড়িৎবিশ্লেষ্য সেল (Electrolytic cell); পক্ষান্তরে যদি সেলের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে বাইরে বিদ্যুত পাঠানো যায়, তবে সেই সেলকে বলা হয় গ্যাল-ভানিক সেল। আমরা বিশেষ জোর দেব এই শেষের সেলটির উপর। গ্যালভানিক সেলের ব্যবহার আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি। টর্চে, ট্র্যানজিস্টরে, হিয়ারিং এইডে যে সমস্ত সেল ব্যবহার করা হয়, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই রাসা-য়নিক শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে তড়িৎশক্তিতে। এখন প্রশ্ন তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি পাবার সময় যেমন আমরা দেখেছি পুরা তাপশক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব নয়, খানিকটা নষ্ট হবেই—রাসায়নিক এবং তড়িৎশক্তির পাস্পরিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে সেই ধরণের কোন শর্ত আছে কি না। প্রকৃতপক্ষে ঐ ধরণের কোন শর্ত নেই—যদিও খরচ হয়ে যাওয়া রাসায়নিক শক্তি আর উৎপন্ন তড়িৎশক্তির পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নয়। কি পরিমাণ রাসায়নিক শক্তি খরচ হয়ে গেল, তা জানা যাবে উৎপন্ন পদার্থের রাসা-য়নিক শক্তি [ধরা যাক এর পরিমাণ H_2] থেকে সক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক শক্তি [পরিমাণ H_1] বাদ দিয়ে। অর্থাৎ খরচ হয়ে যাওয়া রাসায়নিক শক্তির পরিমাণ $H_2 - H_1 = \Delta H$ । যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হলো তার মান অঙ্ক কষে দেখানো যায় nFE-এর সঙ্গে সমান হবে, যেখানে n=সক্রিয় পদার্থের যোজ্যতা (Valency); F=ফ্যারাডের ধ্রুবক (এর মান প্রায় 96,500 কুলম্ব) এবং E=উৎপন্ন তড়িচ্চালক বল (Electro motive force)। সাধারণতঃ দেখা যায় এরা পরস্পর সমান নয়; অর্থাৎ $\Delta H \neq nFE$, তাহলে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি কার সঙ্গে সমান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর এল তাপ-গতিবিজ্ঞানের দেওয়া এনট্রপির (Entropy) সংজ্ঞা থেকে। রাসায়নিক শক্তির সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলেছি যে, পদার্থের বিশেষ রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী ওর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তাই রাসায়নিক শক্তি। আবার শক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এর সাহায্যে কাজ করা যায়। তাহলে রাসায়নিক শক্তি দিয়ে কাজ করা যায়, কিন্তু এই কাজ করবার সময়ে কি আমরা সমস্ত রাসায়নিক শক্তিকেই আমাদের দরকারী কাজে পাব? উত্তর—না। কেবলমাত্র পরম শূন্য উষ্ণতা (যে উষ্ণতায় পৌঁছনো আমাদের ক্ষমতার বাইরে—তাপ-গতি-বিদ্যার তৃতীয় সূত্র) ছাড়া অন্য যে কোন উষ্ণতায় প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে কিছুটা অক্ষমতা থাকে লুকিয়ে, যার ফলে পুরা শক্তিকে সে পারে না কাজে লাগাতে এবং খানিকটা শক্তি হয়ে যায় আমাদের অব্যবহার্য। এই অক্ষমতার পরিমাণ নির্ভর করে পদার্থের প্রকৃতি এবং তার উষ্ণতার উপর। উষ্ণতা যতই বাড়তে থাকে—এই অক্ষমতাও ততই বাড়তে থাকে—আর এটাকেই মাপা হয় নতুন একটা নাম দিয়ে—বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন এনট্রপি। তাহলে পদার্থের রাসায়নিক শক্তি থেকে এই এনট্রপি-জনিত অব্যবহার্য শক্তির পরিমাণ বাদ দিলে ব্যবহার্য শক্তির পরিমাণ পাওয়া যাবে এবং তড়িৎকোষে এই ব্যবহার্য শক্তির পুরাটাই রূপান্তরিত হয় তড়িৎশক্তিতে। অঙ্ক কষে দেখানো যায় যে; রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় যদি এনট্রপির পরিবর্তনের পরিমাণ হয় ΔS এবং ঐ পরিবর্তনের সময়কার উষ্ণতা যদি $T°A$ হয়, তবে মোট রাসায়নিক শক্তি ΔH-এর মধ্যে $T\Delta S$ পরিমাণ হয়ে যাবে অব্যবহার্য। তাহলে ব্যবহার্য শক্তির পরিমাণ দাঁড়ালো ($\Delta H -$

$T\Delta S$)। এটাকে আমরা মুক্ত শক্তি (Free energy) বলবো। একে ΔG দ্বারা চিহ্নিত করলে $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$। সেলে যে রাসায়নিক শক্তি ও তড়িৎশক্তির পারস্পরিক রূপান্তর হয়, সেখানে রাসায়নিক শক্তির পুরাটা তড়িতে রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ

তড়িৎশক্তি (nFE) $= \Delta G$

[ঋণাত্মক চিহ্নের অর্থ বিক্রিয়ার ফলে মুক্ত-শক্তি কমে যায়]

ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা দক্ষতার হিসাব করেছিলাম যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তি দিয়ে ভাগ দিয়ে। সেলের ক্ষেত্রেও আমরা দক্ষতার হিসাব করতে পারি মুক্তশক্তিকে রাসায়নিক শক্তি দিয়ে ভাগ দিয়ে; অর্থাৎ দক্ষতা হবে—

$$\frac{\Delta G}{\Delta H} = \frac{\Delta H - T\Delta S}{\Delta H} = 1 \quad \frac{\Delta S}{\Delta H}$$

উপরের সমীকরণ থেকে দেখা যায় $\Delta S = O$ হলে দক্ষতার পরিমাণ হয় 1, অর্থাৎ শোষিত শক্তির শতকরা এক-শ' ভাগই কাজে লাগানো যায়। ΔS-এর চিহ্ন ঋণাত্মক বা ধনাত্মক হলে অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে (যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানান কারণে তা পাওয়া যায় না) দক্ষতা শতকরা এক-শ' ভাগের সামান্ত কম-বেশী হবে।

এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করা হলো, সেই তত্ত্বেরই উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে জ্বালানী সেল (Fuel cell)। সাধারণতঃ জ্বালানী (কয়লা, পেট্রোলিয়ামজাতীয় পদার্থ) পুড়িয়ে আমরা তাপশক্তি পেয়ে থাকি রাসায়নিক শক্তির বিনিময়ে। এই তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি পাই এবং প্রয়োজনবোধে সেই যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎশক্তি পেয়ে থাকি, অর্থাৎ সাধারণ জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায় নিম্নলিখিত ধাপগুলির ভিতর দিয়ে—

রাসায়নিক শক্তি $\xrightarrow{I}$ তাপশক্তি $\xrightarrow{II}$ যান্ত্রিক শক্তি $\xrightarrow{III}$ বিদ্যুৎশক্তি।

এই ধাপগুলির প্রত্যেকটি ধাপেই খানিকটা করে শক্তির অপব্যয় হবেই। উন্নত ডিজাইনের যন্ত্র তৈরী করে Iনং ও IIIনং ধাপে শক্তির অপব্যয় রোধ করা সম্ভব; কিন্তু IIনং ধাপে অপচয় রোধ আমাদের সাধ্যাতীত—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কাজেই প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ জ্বালানী পুড়িয়ে বিদ্যুৎশক্তি পেতে হলে প্রচুর শক্তির অপব্যয় হবেই। এখন যদি আমরা মাঝখানের II এবং IIIনং ধাপ বাদ দিয়ে জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, তবে এই অপচয় রোধ সম্ভব হবে এবং আমাদের যন্ত্রের দক্ষতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই রূপান্তর সম্ভব কেবলমাত্র সেলের মধ্যে। তাই জ্বালানী পুড়িয়ে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় (জারণ), সে বিক্রিয়া জ্বালানীকে সরাসরি না পুড়িয়ে সেলের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; অর্থাৎ আমাদের সেল তৈরী করতে হবে।

জ্বালানী সেল তৈরী করতে গিয়ে প্রথমেই যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি আমাদের কাজে লাগবার জন্যে বেরিয়ে আসে, তাহলো নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া—

জ্বালানী + জারক পদার্থ=জ্বালানী-জারিত পদার্থ + জারক-বিজারিত পদার্থ।

অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি মূলত জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া। বর্তমানে যে প্রক্রিয়াকে আমরা ইলেকট্রন-বিনিময় প্রক্রিয়া বলে জানি; অর্থাৎ বিক্রিয়ার ফলে জ্বালানী ইলেকট্রন হারায় এবং জারক ইলেকট্রন হারায় এবং জারক ইলেকট্রন পেয়ে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বাতাস বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালানীকে পুড়িয়ে এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করলে ইলেকট্রন-বিনিময় ঘটে চরম বিশৃঙ্খল

ভাবে এবং সেগুলির কোন 'নিয়ম মেনে না চলা' গতির জন্যে জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিক্রিয়াকে যদি জ্বালানী সেলের অ্যানোড ও ক্যাথোডে ঘটানো যায় [অ্যানোডে জ্বালানী হবে জারিত ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং ক্যাথোডে জারক হবে বিজারিত ইলেকট্রন গ্রহণ করে] তবে ইলেকট্রন-বিনিময় সুশৃঙ্খভাবে হয়ে থাকে এবং রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি করবে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। বর্তমান যুগে হাইড্রোজেন গ্যাসকে একটা উৎকৃষ্ট জ্বালানী হিসাবে ধরা হয়, কারণ এটি পোড়ালে প্রচুর তাপশক্তি পাওয়া যায়, যাকে প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে গেলে বেশ খানিকটা শক্তির অপচয় হয়। হাইড্রোজেনকে বাতাসে পোড়ালে যে বিক্রিয়া ঘটে, তা হলো—

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 = H_2O + \text{তাপশক্তি।}$$
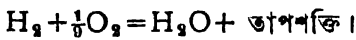
এখন হাইড্রোজেনের এই জারণ প্রক্রিয়াটা আমরা সেলের মধ্যে ঘটালে রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তি মারফৎ না গিয়ে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা যাবে। আর তা করতে হলে আমাদের এমন এক সেল বানাতে হবে, যার অ্যানোডে থাকবে হাইড্রোজেন, ক্যাথোডে অক্সিজেন এবং তড়িৎবিশ্লেষ্য হবে আম্লিক বা ক্ষারীয় জল, অর্থাৎ সেল হবে এই ধরণের

$$\begin{array}{lr} (-) & (+) \\ (Pt)\ H_2\ |\ H_2O\ (l)\ |\ O_2\ (Pt) & \end{array}$$

তাহলে বিক্রিয়াটা হবে এই ধরণের—

অ্যানোডে $H_2 - 2e \rightleftharpoons 2H^+$

ক্যাথোডে $\frac{1}{2}O_2 + H_2 + 2e \rightleftharpoons 2OH^-$

$$+ \overline{\quad H_2 + \frac{1}{2}O_2 - H_2O \quad}$$
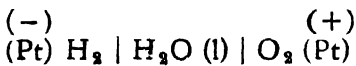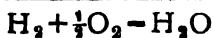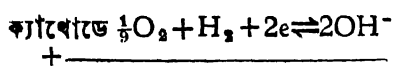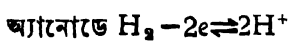
এই সেলের দক্ষতার পরিমাণ শতকরা 83 ভাগ এবং তড়িচ্চালক বল 1·23 ভোল্ট।

এর পর দেখা যাক প্রচলিত জ্বালানীগুলি ব্যবহার করে এই সেল তৈরী করা যায় কি না। প্রথমেই আসা যাক কয়লার প্রসঙ্গে। দুটি কারণে কয়লাকে জ্বালানী সেলে ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এর প্রথমটা হলো কয়লার জারণের ফলে জমে যাওয়া ছাই নিষ্কাশনের অসুবিধা, যা হয়তো বা উন্নত ধরণের সেল তৈরী করে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। দ্বিতীয় অসুবিধা হলো তড়িৎ-রাসায়নিক পরিবর্তনে কয়লা বা কার্বনের নিদারুণ অনাসক্তি। তাই অতি উচ্চ উষ্ণতা ছাড়া অন্য উষ্ণতায় সরাসরি ইলেকট্রন বর্জন বা গ্রহণ কোন কিছু করতেই কার্বন চায় না। এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হতে পারে যদি সেলের অ্যানোড এবং ক্যাথোডে কার্বন ও অক্সিজেনের বদলে অন্য কিছুকে জারিত এবং বিজারিত করি এবং এই জারণ এবং বিজারণের ফলে প্রাপ্ত পদার্থ-গুলিকে যথাক্রমে কয়লা ও অক্সিজেন দিয়ে বিজারিত ও জারিত করে গোড়ার পদার্থ-গুলিকে পুনরায় তৈরী করে ফেলি। যেমন ধরা যাক—যদি অ্যানোড এবং ক্যাথোডে নীচের বিক্রিয়াগুলি ঘটে—

$$Sn^{+2} - 2e \rightleftharpoons Sn^{+4}$$

এবং $Br_2 + 2e \rightleftharpoons 2Br^-$
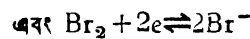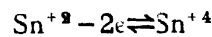
তাহলে তড়িৎকোষ ঠিকই থাকবে—বিক্রিয়াকে চালু রাখবার জন্যে Sn^{+4}-কে কয়লা দিয়ে বিজারিত করে আবার Sn^{+2} করে দিলেই হবে এবং Br^--কে বাতাসের অক্সিজেন দিয়ে Br_2 করে দিতে হবে; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সেই কার্বনেরই জারণ হলো। যাই হোক, এই বিষয়ে গবেষণা এখনও চলেছে এবং আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতে আমরা জ্বালানী সেলে কঠিন জ্বালানী ব্যবহারে সক্ষম হবো। বর্তমানে অবশ্য যে সমস্ত জ্বালানী সেল ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে প্রধানতঃ তরল বা গ্যাসীয় জ্বালানীগুলিকেই ব্যবহার করা

হচ্ছে। তরল জ্বালানীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মিথাইল অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল, ফরম্যালডিহাইড এবং হাইড্রাজিন। পক্ষান্তরে গ্যাসীয় জ্বালানীগুলির মধ্যে আছে ইথিলিন, বিউটেন, প্রোপেন, গ্যাসীয় গ্যাসোলিন, কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন। ক্যাথোডে জারক পদার্থ হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্সিজেনই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য জারক পদার্থ; যেমন—হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ক্লোরিন, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জ্বালানী সেলের আবিষ্কার শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করেছে এবং আমাদের শক্তি-সঙ্কটকে (Power crisis) চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে চলেছে। এই সেলের আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাসায়নিক কারখানায় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের সময় বিক্রিয়াগুলি ঠিক মত সেলের মধ্যে করতে পারলে উপজাত হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে। যেমন—সোডিয়াম অ্যামালগামের বিয়োজন ঘটিয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরীর সময় বিক্রিয়াটিকে ঠিকমত সেলে ঘটালে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। তাঁরা আশা রাখেন—আগামী দিনের যানবাহন চলবে জ্বালানী সেলের সাহায্যে—বাড়ীতে আলো জ্বলবে, পাখা ঘুরবে জ্বালানী সেল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সাহায্যে আর এর ব্যবহার হবে পরিচ্ছন্ন, কারণ প্রচলিত পাওয়ার স্টেশনগুলির মত এ থেকে বাতাস বা পরিবেশকে কলুষিত করবার মত কিছুই তৈরী হবে না।

কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়ার কথা ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স

অরুণকুমার ঘোষ*

[ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হচ্ছে—প্র. স.]

ভারতের বিজ্ঞানচর্চার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা সুবিদিত। কিন্তু প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কতটা উন্নত ছিল অথবা সেটা কতখানি আত্মনেপদী ছিল, তজ্জাতীয় বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে। আমাদের আলোচনার বস্তু আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা। অস্যার্থ, লোকচক্ষের অগোচরে সাধুসন্তের মত জীবনযাপন করে কেবলমাত্র আপন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আহৃত জ্ঞান সীমাবদ্ধ না রেখে পরীক্ষাগারে নানারকম সুযোগ-সুবিধার মধ্যে গবেষণা করা এবং তৎলব্ধ জ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য যথাযথ প্রকাশন। এই অর্থে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা ভারতের ইতিহাসে অনধিক দেড়-শ' বছরের ঘটনা।

পৃথিবীতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের জন্ম প্রাচীন হলেও বহু দিন সেই বিজ্ঞান মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী এবং চিন্তাবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানতঃ এর থেকে তার মুক্তি হলো ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপনের পর। ইণ্ডাষ্ট্রি অর্থে বড়সড় কারখানা। আসলে বিজ্ঞানই এই সব ইণ্ডাষ্ট্রির জন্ম দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ইণ্ডাষ্ট্রির

*নেহেরু বিজ্ঞান কেন্দ্র, বম্বে

নানারকম সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানকেও তৎপর হতে হলো। এখন আর রয়েসয়ে লোকচক্ষের আড়ালে বসে একান্ত নির্জনে স্বাধ্যায়ের উপায় রইল না। তড়িঘড়ি অন্যের চেয়ে আগে নানা-রকম সমস্যার সমাধান করে কোন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন যে করতে পারে, সেই-বাজার দখল করতে পারবে—এই ধরণের একটা চালিকাশক্তি ইণ্ডাষ্ট্রিকে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য করলো। এইভাবে একটা কর্মযজ্ঞ সুরু হলো। বহু লোক একসঙ্গে বিজ্ঞানচর্চায় অংশগ্রহণ করবার ফলে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটা জোয়ার এসে গেল। এককথায় ইণ্ডাষ্ট্রি তথা বিজ্ঞানের জগতে একটা বিপ্লবের জন্ম হলো। এসব উনিশ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। ঘটনার কেন্দ্রস্থল ইয়োরোপ।

ভারত বা বিশ্বের অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশ-গুলিতে অবশ্যই এই বিপ্লব হয় নি। কিন্তু সেই-সব জায়গায় এই বিপ্লবের ঢেউ নানাভাবে এসে আছড়ে পড়লো। প্রথমতঃ ধর্মপ্রচারক পাদ্রী-সাহেবেরা একহাতে বাইবেল, অন্যহাতে বিজ্ঞানের প্রসাদ—নানারকম ভোগ্যপণ্যের পশরা—নিয়ে হাজির হলেন। বক্তব্য, 'তোমরা প্রভুর অনুগামী হলে এই সকল জিনিসের অধিকারী হতে পারবে।' দ্বিতীয়তঃ, শাসককুলের পক্ষে ঔপ-বেশিক শাসন কায়েম করতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ; যথা—রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদির প্রয়োজন হলো। তৃতীয়তঃ, শোষণের সুবিধার জন্যে উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ—অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ফসিল জ্বালানী (কয়লা, পেট্রো-লিয়াম), বনজ সম্পদ ইত্যাদির ব্যাপক অনু-সন্ধানের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের আমদানী হলো। চতুর্থতঃ, প্রবাসী উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা, যাঁদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, নিজেদের অনুসন্ধিৎসার তাড়নায় নানারকম বিজ্ঞানচর্চা সুরু করলেন। পঞ্চমতঃ, উপনিবেশ-গুলিতে অন্ততঃপক্ষে প্রবাসী রাজকর্মচারী পরি-বারগুলির চিকিৎসার জন্যে কিছু হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন হলো। এসবের মাধ্যমেও বিজ্ঞানচর্চা সুরু হলো।

ভারত তখন বৃটিশ শাসনের একটি স্তম্ভ। কলকাতা তার রাজধানী। নানারকম সার্ভে, যথা—জমির জরীপ দপ্তর (1822), জিওজিক্যাল সার্ভে (1851), আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে (1859) ইত্যাদির হেডকোয়াটার্স কলকাতায়। টাকা-পয়সা তৈরীর জন্যে টাঁকশাল চালু হয়েছে। টেলিগ্রাফ লাইন বসেছে (1849-50)। রেলগাড়ীও অল্পস্বল্প চালু হয়েছে। এমন সময় প্রথম ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত) হলো (1857)। বিদ্রোহ চলবার সময় সৈন্য ও সংবাদ চলাচলের অসুবিধা থেকে শিক্ষা পেয়ে শাসক সরকার তড়িঘড়ি রেল[1] ও টেলিগ্রাফ[2] লাইনের সম্প্রসারণ করলেন। টাঁকশালে 1818 থেকে 1822 সালের মধ্যে ষ্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালানো সুরু হয়েছিল। অবশ্য তারও আগে ষ্টিম ইঞ্জিনের অল্পস্বল্প ব্যবহার হয় নি এমন নয়[3]। কিন্তু রেলগাড়ি চালু হতেই প্রচুর কয়লার চাহিদা হলো[4]। নিউক্যাসেলের কয়লার মান অনেক ভাল, কিন্তু অতদূর থেকে জাহাজ বোঝাই করে কয়লা আনবার ঝামেলা বিস্তর করে জাহাজ আসে তার ঠিক নেই। এইভাবে কয়লার জন্যে অপেক্ষা করে থেকে অন্ততঃ রেলওয়ে সার্ভিস চালানো যায় না। তার চেয়ে এই দেশেই যদি উন্নত মানের কয়লার হদিশ মেলে তবে অনেক সুরাহা। বেশী দূর নয়, কলকাতার কাছেই রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ায় উৎকৃষ্ট মানের কয়লা মিললো। এই জন্যেই পয়লা রেললাইন (পূর্বাঞ্চলে) কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত হয়েছিল।

কয়লা মিলল। অতঃপর ষ্টিম ইঞ্জিন দিয়ে যেসব ইণ্ডাষ্ট্রি এদেশে চালানো যায় তার চেষ্টা চললো। গঙ্গার দু-ধারে সার দিয়ে চটকল বসে গেল।

কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো হলো। বেশ একটা হৈ হৈ ব্যাপার সুরু হয়ে গেল।

এ তো গেল টেকনোলজি প্রসারের কথা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়েছিল অনেক আগে (1784) এশিয়াটিক সোসায়েটিকে কেন্দ্র করে। সোসাইটির জার্নাল Asiatic Researchs নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে 1788 সাল থেকে। Gleanings of Science নামে একটি জার্নালও বেশ কিছু দিন (1829-'31) চলেছিল[5]।

1835 সাল বরাবর কলকাতায় মেডিক্যাল এবং 1856 সালে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা হলো।

এই সমস্ত বিজ্ঞান চর্চায় কেবলমাত্র ইউরোপীয়ানরাই অংশগ্রহণ করতেন—এমন মনে করা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হবে না, যদিও প্রকাশনগুলিতে তাঁদেরই নাম পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই অধস্তন কর্মচারী শ্রেণীর দেশীয়দের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হতো। সুতরাং যেমন ভাবেই হোক, স্থানীয় অধিবাসীরা এই বিজ্ঞান চর্চায় অংশগ্রহণ করতে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যে (1876) 210, বৌবাজার স্ট্রীটে একটা নতুন ধরণের সমিতির জন্ম হলো। নাম ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স। মুখ্য উদ্যোক্তা—মহেন্দ্রলাল সরকার নামক এক ডাক্তার। ডাক্তারবাবু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র, কিন্তু অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি করেন। সঙ্গে জুটলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাফোঁ, তারাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ। পিছনে থাকলেন কৃষ্ণদাস পাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ।

1876 থেকে 1904 পর্যন্ত 210, বৌবাজার এই সমিতিতে বিজ্ঞানের পাঠন চলতে থাকলো। 1904 সালে মহেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুকাল আগে আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, এত বছর দুয়ারে ভিক্ষা করে তিনি যে অর্থ সংগ্রহ (বিজ্ঞানাগারের জন্যে) করতে পেরেছিলেন, সেই সময় যদি তিনি নিজের প্র্যাকটিসের দিকে যত্নবান হতেন, তবে অনেক বেশী অর্থ অ্যাসোসিয়েশনকে তিনি নিজেই দিয়ে যেতে পারতেন[6]।

মহেন্দ্রলালের দুঃখ পাবার হয়তো যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা 28 বছরের দীর্ঘ পরিশ্রমের যে-ফসল তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন, তাতে এরকম দুঃখ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাবৃত্তির একটা ফল হয়তো হয়েছিল। সাধারণ্যে কিছু সাড়া জেগেছিল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতামালায় এক সময় (1886) কয়েকজন মহিলাসমেত শ' তিনেক শ্রোতা হতো। মহেন্দ্রলাল, তারাপ্রসন্ন এবং লাফোঁ ছাড়া এই সময় বিনাপয়সার বক্তা জুটেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং নীলরতন সরকার।

1907 সালে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন কলকাতায় ভারত সরকারের অর্থদপ্তরে একজন অফিসার ছিলেন। তিনি অফিস ছুটির পর 210, বৌবাজার স্ট্রিটে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করলেন। মহেন্দ্রলালের পুত্র অমৃতলাল তখন সেখানে কর্ণধার।

রামনের পরবর্তী কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। সুধু রামনই বা কেন—1895 থেকে 1930—বিজ্ঞানচর্চার মানচিত্রে কলকাতা একটা উজ্জল বিন্দু। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু অবশ্য বিখ্যাত কাজটা ঢাকায় থাকতে করেছিলেন তবু তাঁর প্রেরণাস্থল যে কলকাতা, এটা সংশয়াতীত সত্য।

লক্ষণীয় যে, কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে বিজ্ঞানচর্চা গড়ে উঠেছিল, তার একটা স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ভিত্তি ছিল; অর্থাৎ টেকনোলজি বিস্তারের স্বাভাবিক স্তর হিসাবেই বিজ্ঞান এসে হাজির হয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তার নিজস্ব স্বাভাবিক বিকাশও হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, হয়তো পরাধীনতাজাত মনস্তত্ত্ব অথবা অর্থকৃচ্ছ্রতা বিজ্ঞানীদের অনেকটা স্বতন্ত্র হতে বাধ্য করেছিল। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রক্ষিত জগদীশচন্দ্র বসুর যন্ত্রপাতিগুলি তার সাক্ষ্য দেবে। এই স্বাতন্ত্রতা অব্যবহিত উত্তরকালে একাধিক সাফল্য অর্জন করেছিল।

1. 1853 সালে প্রথম রেল চলাচল সুরু হলেও সিপাহী বিদ্রোহের আগে খুব একটা সম্প্রসারণ হয় নি। বিদ্রোহের পর ব্যাপক সম্প্রসারণের কর্মসূচী নেওয়া হয়। 1868 সালে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় 1354 মাইল। সম সময়ে লণ্ডন এবং নর্থওয়েস্টার্ণ (ইংল্যাণ্ড) রেলপথের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ছিল 1328 মাইল।

2. প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন বসে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার (1849-50)। 1851 সালে তা' খেজুরী-বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 1854 সালে কলকাতা আগ্রা, 1855-এ আগ্রা-বোম্বাই, বোম্বাই-মাদ্রাজ এবং কলকাতা-পেশাওয়ার—এই 4000 মাইল টেলিগ্রাফ যোগাযোগ চালু হয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিতকালে 1859 সালের মধ্যে 11,500 মাইল টেলিগ্রাফ লাইনের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটানো হয় (দ্র. Doctoral Dissertation Jadavpur Univ., Saroj K. Ghosh, 1974)।

3. টাঁকশালের আগে কাগজ তৈরীর কলে স্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার হয় উইলিয়াম কেরীর তত্ত্বাবধানে (1820)। এই স্টীম ইঞ্জিনটি এর আগে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনি থেকে জল-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। কলটি শ্রীরামপুরে এখনও আছে।

4. কয়লা উত্তোলন এর আগে হতো লোহা তৈরী কিংবা আগুন জ্বালাবার জন্যে। 1774 সাল নাগাদ এক বৃটিশ কোম্পানী বীরভূম এবং পাঞ্চেত অঞ্চলে কয়লা তোলবার অনুমতির জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে আবেদন করেছিল, এমন দেখা যায়। এই কয়লা দামোদরের নদীপথে কলকাতা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় আসতো। পরবর্তীকালে স্থলপথ নির্মাণকালে যত্রতত্র সেতু তৈরীর ফলে জলপথগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অনেক নদী এর ফলে মজেও যায় (দ্র. India Today, রজনীপাম দত্ত)।

5. এই জার্নালটির একটু বিশেষত্ব ছিল। এর প্রত্যেক সংখ্যায় দুটি ভাগ ছিল—একটি বিলাতের জার্নালের মনোনীত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ বিভাগ; অন্যটি স্থানীয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ বিভাগ। পত্রিকার মলাটে গ্রাহকদের নাম ছাপা হতো। তাথেকে দেখা যায় একমাত্র Baboo Poorsun Coomer Thakur ছাড়া এর বাকী সব গ্রাহকই ছিলেন ইউরোপীয়ান।

6. দ্র Annual Report of the IACS (1902)

আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া

সাধনানন্দ মণ্ডল*

আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে বোঝা জীববিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেরই একটি মৌলিক শর্ত। কারণ সহজেই বলা যেতে পারে যে, এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে সারা বিশ্বে একমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌত-প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবজগতের অস্তিত্ব প্রাথমিকভাবে নির্ভর করছে আলোকসংশ্লেষণকারী সবুজ উদ্ভিদের সূর্যালোক শক্তিকে সদ্ব্যবহার করবার ক্ষমতার উপর এবং এই ক্ষমতাই বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটির জল থেকে প্রস্তুত করে একটি জৈব-রাসায়নিক পদার্থ—সারা জীবজগতের বেঁচে থাকবার জরুরী উপাদন—শ্বেতসার। বহুকাল আগে থেকেই আলোকসংশ্লেষণসংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রকল্পের উদ্ভব হয়েছে, কারণ প্রাথমিক মানবসভ্যতা ধান, গম ইত্যাদি শস্যকে রীতিবদ্ধভাবে চাষবাসের মাধ্যমে উৎপন্ন করতে গিয়ে সূর্যালোকের সঙ্গে উদ্ভিদ-জীবনের নিবিড় সম্বন্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের সময় থেকে আমরা দেখছি আলোকসংশ্লেষণ সম্বন্ধে মানুষের ধ্যানধারণাগুলি ক্রমশঃ বিজ্ঞানভিত্তিক হচ্ছে এবং আজও সারা বিশ্বজুড়ে সাধনা চলেছে এই প্রক্রিয়াটিকে জানবার এবং বোঝবার জন্যে।

আলোকসংশ্লেণ সংক্রান্ত এপর্যন্ত আমাদের যা জ্ঞান, তাতে দেখছি এই প্রক্রিয়াটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশের বিক্রিয়াগুলিতে আলো প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয় অংশের বিক্রিয়াগুলিতে আলো অপ্রয়োজনীয়। আলোকনির্ভরশীল অংশে দুটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়—অ্যাডেনোসিন-ট্রাই-ফসফেট সংক্ষেপে বলা হয় ATP এবং বিজারিত নিকোটিনাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিয়োটাইড ফসফেট সংক্ষেপে বলা হয় [$NADPH+H^+$]। এই পদার্থ দুটি ছাড়া আলোক অপ্রয়োজনীয় অংশ সম্পাদিত হবে না। আমরা এখানে আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোকনির্ভরশীল অংশটিরই আলোচনা করবো।

সূর্যালোকের বর্ণালীতে আমরা দেখেছি সাতটি রং এবং রংগুলির প্রত্যেকটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলাদা। বর্ণালীর সব অংশেই আলোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। আলোকসংশ্লেষণ ভাল হয় বর্ণালীর নীল-বেগুনী এবং লাল অংশে। একথা সুবিদিত যে, উদ্ভিদদেহের আলোকসংশ্লেষণকারী কলাতে ছড়ানো নানাবিধ রঞ্জক পদার্থ সূর্যালোক শোষণ করে। আলোকসংশ্লেষণপ্রক্রিয়ার আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি আলোসংশ্লেষণকারী কলায় অবস্থিত পুঞ্জীভূত রঞ্জকপদার্থগুলির আলোক-কোয়ান্টা শোষণের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। আলোকজৈবিক বিক্রিয়া ঘটবার আগে আলোক-শক্তিকে শোষিত হতে হবে। তাহলে আলোক-সংশ্লেষণ এক ধরণের আলোকজৈবিক বিক্রয়া, যেটির সূচনা হয় আলোকসংশ্লেশষণকারী রঞ্জক পদার্থের দ্বারা আলোক শোষিত হবার পর। এই সমস্ত রঞ্জকপদার্থের মধ্যে প্রাচুর্যে এবং গুরুত্বে সর্বাধিক হলো বিভিন্ন ধরণের ক্লোরোফিল অণুগুলি, যেমন ক্লোরোফিল-এ, বি, সি, ডি এবং ই। ক্লোরোফিল ছাড়াও নানাবিধ ক্যারোটিন এবং

---

* উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া।

জ্যান্থোফিল অণুগুলিতেও এই ধরণের আলোক-শোষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিজ্ঞানী এমারসন এবং চালমারস দেখেছেন যে, আলোকসংশ্লেষণের আলোকজৈবিক বিক্রিয়াতে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর [>680nm] ফলাফলকে হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর যুগপৎ ব্যবহারের ফলে বাড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ 690nm তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি আলোর দ্বারা সৃষ্ট কম কোয়ান্টাম উৎপাদনকে হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকে যুগপৎভাবে ব্যবহার করে বাড়ানো যায়। এই রকম দু-ধরণের অধ্যারোপিত আলো প্রয়োগের ফলে সম্পাদিত আলোকসংশ্লেষণ মাত্রা এই আলো দুটিকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োগের ফলে সম্পাদিত মাত্রা থেকে বেশী হয়। আলোকসংশ্লেষণের এই রকম বৃদ্ধিকে বলা হয় এমারসন ফলাফল (Emerson effect)। এই এমারসন ফলাফলের ব্যাপক গবেষণার ফলে আলোকসংশ্লেষণের আলোক-নির্ভরশীল অংশে একটি নতুন ধারণা জন্ম নিল। জানা গেল আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দুটি স্বতন্ত্র আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। রঞ্জক পদার্থের প্রকৃতিগত গবেষণা থেকে জানা গেল ক্লোরোফিলের দুটি রূপ—একটি সবচেয়ে বেশী আলো শোষণ করে 673nm-এ এবং অন্যটি করে 683nm-এ। এগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় ক্লোরোফিল-এ 673 এবং ক্লোরোফিল-এ 683। এছাড়া ক্লোরোপ্লাষ্টে আরও এক ধরণের দীর্ঘ তরঙ্গ শোষণকারী রঞ্জক পদার্থ থাকে, যার সর্বোচ্চ আলোক শোষণ হয় 700nm-এ। এটির নাম দেওয়া হয়েছে পি-700। এটির পরিমাণ খুবই কম এবং সম্ভবতঃ এটি ক্লোরোফিল-এ-রই একটি বিশিষ্ট রূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সবুজ উদ্ভিদের আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে দুটি অনুক্রমিক আলোকবিক্রিয়া কার্যকরী এবং প্রতিটি বিক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের আলোক শোষণকারী রঞ্জক পদার্থের দ্বারা সংগঠিত গোষ্ঠীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রঞ্জক পদার্থের দুই ধরণের বিশিষ্ট গোষ্ঠীকে বলা হয় আলোকপদ্ধতি I বা রঞ্জক পদ্ধতি I এবং আলোকপদ্ধতি II বা রঞ্জক-পদ্ধতি II। আলোকপদ্ধতি I-এর রঞ্জক পদার্থগুলি হলো ক্লোরোফিল-এ 683, পি 700, এবং সম্ভবতঃ ক্লোরোফিল-বি। আলোকপদ্ধতি II-এর জন্যে রঞ্জক পদার্থগুলি হলো ক্লোরোফিল-এ 673, ক্লোরো-বি এবং ফাইকোবিলিনগুলি। ক্যারোটিনয়েডগুলি উভয় পদ্ধতিতেই বর্তমান। অপেক্ষাকৃত বিজারিত ক্যারোটিনয়েড, যেমন—ক্যারোটিন অণুগুলি থাকে আলোকপদ্ধতি I-এ এবং অপেক্ষাকৃত জারিত ক্যারোটিনয়েড, যেমন জ্যান্থোফিল—ভাইয়োলাজ্যান্থিন এবং নিয়োজ্যান্থিন—পাওয়া যায় আলোকপদ্ধতি II-এ। এখন তাহলে দেখা গেল আলোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ার আলোকনির্ভরশীল অংশটি সম্পাদিত হতে দু-ধরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর প্রয়োজন রয়েছে। আলোক পদ্ধতি I সক্রিয় হবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে, কারণ সেখানের রঞ্জক পদার্থগুলি দীর্ঘ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে এবং আলোক পদ্ধতি II সক্রিয় হয় হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে, যেহেতু সেখানের রঞ্জক পদার্থগুলির আলোক শোষণ ক্ষমতা হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে সবচেয়ে বেশী হয়। একটি আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ফলবতী করতে প্রয়োজনীয় আলোকশোষণকারী রঞ্জক পদার্থের ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠীকে বলা হয় আলোক-সংশ্লেষণীয় সমবায় (Photosynthetic unit) বা কোয়ান্টাজোম। জানা গেছে, একটি আলোক-সংশ্লেষণীয় সমবায়ে প্রায় 250টি ক্লোরোফিল অণু থাকে। কোয়ান্টাজোমে রঞ্জক অণুগুলির ঘনিষ্ঠ এবং কখনও কখনও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল বিন্যাসের দরুণ রেজোন্যান্স (Resonance) পদ্ধতির মাধ্যমে শক্তি অভিপ্রায়ণ খুবই সম্ভবনাময় হয়ে ওঠে। এই ধরণের গঠনের মধ্যে ক্লোরোফিল অথবা অন্য

কোন সহকারী রঞ্জক অণুর দ্বারা শোষিত আলোক-কোয়ান্টাক এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্বচ্ছন্দে অভিপ্রারিত হতে পারে।

আলোকশক্তি শোষণ করবার ফলে রঞ্জক পদার্থগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন এই উত্তেজিত রঞ্জক অণুগুলি তাদের শোষিত বাড়তি শক্তি প্রদান করে পূর্বে বর্ণিত বিশিষ্ট ধরণের ক্লোরোফিল-এ পি-700-কে। পি-700-কে বলা হয় কৌশলী ক্লোরোফিল (Trap chlorophyll)। এই পি-700 হচ্ছে আলোক পদ্ধতি I-এর আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল। আলোচ্য শক্তি অভিপ্রায়ণ হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো শোষণকারী রঞ্জক অণু থেকে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোশোষণকারী রঞ্জক অণুর দিকে হবে। তার কারণ হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর শক্তি দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর শক্তি থেকে বেশী আর শক্তির বেশী থেকে কমের দিকে প্রবাহই প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। উত্তেজিত প্রারম্ভিক কোন অণু থেকে কৌশলী ক্লোরোফিলের দিকে শক্তি অভিপ্রায়ণকে নীচে দেখানো হলো:

সহকারী রঞ্জক অণু* + ক্লোরোফিল-এ$\longrightarrow$
সহকারী রঞ্জক অণু + ক্লোরোফিল-এ*
ক্লোরোফিল-এ* + কৌশলী ক্লোরোফিল$\longrightarrow$
ক্লোরোফিল-এ + কৌশলী ক্লোরোফিল*......(1)
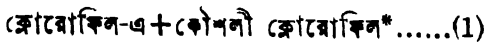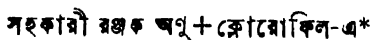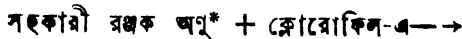
[* চিহ্ন অণুর উত্তেজিত অবস্থাকে নির্দেশ করে]

আমরা জানি আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মূল কথা হলো আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করা এবং এই রূপান্তরিত রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে রাসায়নিক বণ্ডে। রাসায়নিক বণ্ডে শক্তি সঞ্চিত থাকবার পূর্বাবশ্যকীয় শর্ত হলো যে, আলো শোষণের ফলে সৃষ্ট জারক (ইলেকট্রন গ্রাহক) এবং বিজারক (ইলেকট্রন দাতা) অণুগুলিকে স্থায়ী হতে হবে এবং তাদের অবস্থান এমন হতে হবে, যাতে তারা পুনর্মিলিত না হতে পারে। আর একবার এই রকম জারিত এবং বিজারিত পদার্থের জন্ম হলেই আলোক-সংশ্লেষণের আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমাপ্তি। একটি অণু A যখন উত্তেজিত কৌশলী ক্লোরোফিল থেকে বিচ্যুত একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তখন এই ইলেকট্রন স্থানান্তরকে প্রকাশ করা যায়:

কৌশলী ক্লোরোফিল* + A$\longrightarrow$কৌশলী ক্লোরোফিল$^+$ + A^-......(2)

যেখানে A^- নির্দেশ করে গ্রাহক অণুর বিজারিত অবস্থা এবং কৌশলী ক্লোরোফিল$^+$ নির্দেশ করে জারিত অবস্থা, যেখানে এই অণুটি আলোক শোষণের ফলে উত্তেজিত হয়ে একটি ইলেকট্রন পরিত্যাগ করেছে। একটি দাতা অণু D কৌশলী ক্লোরোফিল* থেকে বিচ্যুত ইলেকট্রনটির শূন্য স্থান পূরণ করে, যার ফলে D অণুটি জারিত হয় D^+ এ এবং জারিত কৌশলী অণুটি বিজারিত হয়ে স্বাভাবিক অনুত্তেজিত অবস্থায় ফিরে যায়।

কৌশলী ক্লোরোফিল$^+$ + D$\longrightarrow$কৌশলী ক্লোরোফিল + D^+......(3)
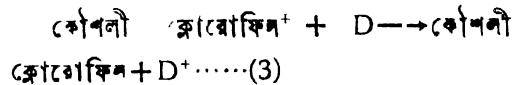
সমীকরণ (2) এবং (3) আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ারই প্রকাশক, যেহেতু আলোক কোয়ান্টাম শোষণের ফলে একটি ইলেকট্রনবিশিষ্ট ক্লোরোফিল অণুটি থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তার ফলে নানা রকম রাসায়নিক প্রজাতির (এখানে A এবং D) ইলেকট্রন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে। সমীকরণ (2) এবং (3)-এর সমন্বয়ে উদ্ভূত সমীকরণটি দিয়ে আলোকসংশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায়ের ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়:

$$A + D + h\nu \text{ (আলোকশক্তি)} \longrightarrow A^- + D^+ ......(4)$$
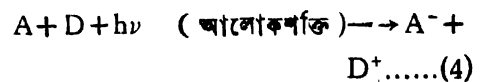
সবুজ উদ্ভিদ এবং শ্যাওলায় আলোকশক্তির দ্বারা বিভবশক্তির পরিবর্তনকে প্রকাশ করা যায় A + D-র A^- + D^+-এ পরিবর্তনের মাধ্যমে। সেখানে জল জারিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস

উদ্ভূত হয়, তৈরী হয় বিজারিত পদার্থ NADPH এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট বণ্ড (ADP+$H_3PO_4 \longrightarrow$ATP)। আলোকশক্তির এই রকম রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরই হলো আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর।

আলোকসংশ্লেষণে আলোকশক্তি ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রনকে নিম্ন তড়িতবিভবের দিকে চালিত করতে, যার ফলে বিপরীত দিকে অর্থাৎ উচ্চ তড়িৎবিভবের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এইরকম ক্রমশঃ নীচু মানের শক্তির দিকে ইলেকট্রন প্রবাহকে ব্যবহার করা হয়, ADP+ফসফেট$\longrightarrow$ATP—এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে চালাবার জন্যে এবং তার ফলে রাসায়নিক শক্তিকে সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। তড়িত-রসায়নবিদ্যা থেকে জানা যায়।

$$\Delta G = -nF\Delta E \qquad \cdots(5)$$

যেখানে ΔG গিব্‌সের মুক্তশক্তির পরিবর্তন, F ফ্যারাডে ধ্রুবক, n স্থানান্তরিত ইলেকট্রন সংখ্যা এবং ΔE তড়িতবিভবের ($\Delta E > O$) অর্থ মুক্ত-শক্তির মান কমে যাওয়া ($\Delta G < O$) এবং বিপরীত অবস্থায়, অর্থাৎ নিম্ন তড়িতবিভবের ($\Delta E < O$) অর্থ মুক্তশক্তির মান বৃদ্ধি পাওয়া ($\Delta G > O$)।

ইলেকট্রন পরিবহন পথ এবং জৈবিক শক্তিমত্তা (Bioenergetics)

আলোকপদ্ধতি II-এর বিক্রিয়া কেন্দ্রে অবস্থিত ক্লোরোফিল থেকে বিচ্যুত ইলেকট্রনের শূন্য স্থান পূরণ করে জল থেকে আসা ইলেকট্রন। আর তার ফলেই জল থেকে অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে আসে। জল জারিত হয় অক্সিজেন গ্যাস এবং হাইড্রোজেন আয়নে। জল জারিত হবার বিস্তৃত বিবরণ আজও জানা যায় নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, এই জারণপ্রক্রিয়ার সময় যেভাবেই হোক ম্যাঙ্গানিজ এবং ক্লোরাইড আয়ন লাগে। এখন তাহলে প্রশ্ন—উত্তেজিত ক্লোরোফিল অণু থেকে বিচ্যুত ইলেকট্রনের ভবিষ্যৎ কি?

জানা গেছে, এই বিচ্যুত ইলেকট্রন একসারি অণুর মাধ্যমে, যাদের বলা হয় 'ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল', আলোকপদ্ধতি II থেকে আলোকপদ্ধতি I-এ যায়। এই রকম ইলেকট্রন প্রবাহের সঙ্গে জড়িত অণুগুলির কিছু সংখ্যক হদিশ পাওয়া গেছে। তাছাড়া ইলেকট্রন স্থানান্তরের জন্যে অণু থেকে অণুর পর্যায়ক্রমের অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা নেই। যাই হোক, এপর্যন্ত তবুও কিছুটা জানা গেছে।

ইলেকট্রন যখন এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত হচ্ছে, তখন জারণ বিজারণ প্রক্রিয়ার জন্ম হচ্ছে। যে অণুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে, সেটি বিজারিত হচ্ছে এবং যেটি দান করছে, সেটি হচ্ছে জারিত। ইলেকট্রন কোন্ অণু থেকে কোন্ অণুতে যাবে, তা নির্ভর করবে অণুগুলির ইলেক-ট্রনের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার উপর। এই ক্ষমতাকে পরিমাপ করা হয় বিজারণ-জারণ বিভব দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বিজারণ-জারণ একটি মাপ, যার সাহায্যে কোন একটি বিশিষ্ট অণুর দ্বারা গৃহীত বা পরিত্যক্ত ইলেকট্রনের আপেক্ষিক তড়িতশক্তি পরিমাপ করা যায়। ইলেকট্রন প্রবাহে অংশ-গ্রহণকারী প্রতিটি অণুর জারিত এবং বিজারিত রূপকে ধরা যেতে পারে এক একটি তড়িদ্দ্বার অথবা অর্ধসেল; ক্লোরোপ্লাস্ট ঝিল্লীর মধ্যে অবস্থানকারী ওই রকম অর্ধসেলগুলি পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া করে, ফলে উচ্চ বিজারণ-জারণবিভব সমন্বিত অণুগুলির দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইলেকট্রন প্রবাহ ঘটে। আলোকসংশ্লেষণের ইলেকট্রন পরি-বহনে অংশগ্রহণকারী অণুগুলির অনুক্রমিক অবস্থিতি নীচে দেওয়া হলো।

আলোকপদ্ধতি [ক্লোরোফিল-এ$\rightarrow$প্লাস্টো-কুইনোন $\rightarrow$ সাইটোক্রোম-বি$_6$ $\rightarrow$ সাইটোক্রোম-এফ$\rightarrow$প্লাস্টোসায়ানিন]$\rightarrow$আলোকপদ্ধতি I [পি 700$\rightarrow$ফেরেডক্সিন]

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল ATP তৈরী হতে বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। এই শক্তি আলোক-সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে আসছে সূর্যের আলো থেকে। আলোক শোষণের ফলে ক্লোরোফিল অণুগুলি। উত্তেজিত হয় এবং অবশেষে ইলেকট্রন মোচন করে। এই পরিত্যক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় পূর্বে বর্ণিত অণুগুলির জারণ-বিজারণের মাধ্যমে। আগেই বলা হয়েছে তড়িত্তরসায়ন অনুযায়ী ইলেকট্রন ক্রমহ্রাসমান মুক্তশক্তির দিকে প্রবাহিত হয়; ফলে স্থানে স্থানে শক্তি পরিত্যক্ত হয়। [ব্যাপারটা যেন অনেকটা এই রকম। যাত্রী বোঝাই একটি ট্রেন ছুটছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। মধ্যবর্তী ষ্টেশনগুলিতে থামছে আর ক্রমশঃ যাত্রী নামছে। ফলে ট্রেনটি যতই গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি আসছে, তার যাত্রী সংখ্যাও তত কমছে। তারপর গন্তব্যস্থল পৌঁছলে দেখা গেল শেষ যাত্রীরা নামবার পর ট্রেনটি যাত্রীহীন।] ইলেকট্রনগুলিও শক্তি মোচন করতে করতে এক সময় পৌঁছে গেল তাদের গন্তব্যস্থলে। মাঝে মাঝে এই ভাবে পরিত্যক্ত মুক্তশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ ATP প্রস্তুত করে। কিন্তু যেখানেই মুক্তশক্তি পরিত্যক্ত হবে, সেখানেই কি ATP উৎপন্ন হবে? না, তা নয়। ADP এবং H_3PO_4 মিলে ATP হতে যতটা শক্তির প্রয়োজন, ততটা যদি পাওয়া সম্ভব হয় এই রকম শক্তি মোচন থেকে, তবেই ATP তৈরী হবে—অন্যথায় নয়। প্রতি অণু ATP তৈরী হতে মোটামুটি 8000 ক্যালরি শক্তি লাগে। আলোর সাহায্যে এইভাবে ক্লোরোপ্লাষ্টে ATP উৎপাদনকে বলা হয় ফোটোফস্‌ফোরাইলেশন। এটি আবার দু-ভাবে হয়। একটি হয় ইলেকট্রনের অচক্রাকারে প্রবাহের জন্যে, যেটি আলোক পদ্ধতি I এবং II-এর সমন্বয়ে ঘটে, নাম 'অচাক্রাকার ফোটো-ফস্‌ফোরাইলেশন'। অন্যটিতে ইলেকট্রন প্রবাহ চক্রাকারে হয়—যেটির জন্যে কেবল আলোক পদ্ধতি I-এর প্রয়োজন, নাম 'চক্রাকার ফটোফস-ফোরাইলেশন'।

অচাক্রাকার ফোটোফসফোরাইলেশন

এই পদ্ধতিতে ATP তৈরী হয় একমাত্র সাইটোক্রোম-বি$_6$ এবং সাইটোক্রোম-এফ্-এর মধ্যবর্তী স্থানে। এই দু-ধরণের সাইটোক্রোমের বিজারণ-জারণবিভবের পার্থক্য প্রায় 0.38v, ADP-র ফসফোরাইলেশন হবার পক্ষে যথেষ্ট। এই পদ্ধতিতে ইলেকট্রন প্রবাহ একদিকে হয়, অর্থাৎ আলোকপদ্ধতি II-এর ক্লোরোফিল থেকে বিচ্যুত ইলেকট্রনগুলি অবশেষে আলোকপদ্ধতি I-এর ফেরেডক্সিনকে বিজারিত করে। আবার এই ফেরেডক্সিন তার উপার্জিত ইলেকট্রনগুলি দেয় $NADP^+$-কে, যেটি বিজারিত হয় $NADPH + H^+$; এখানে প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন অণু দুটি আসে জল থেকে।

চক্রাকার ফোটোফসফোরাইলেশন

এই পদ্ধতির উপস্থিতি বোঝা যায় বিশিষ্ট কোন নিরোধক (Inhibitor) প্রয়োগ করে আলোকপদ্ধতি II-কে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে অথবা 683nm থেকে বেশী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করে। এরকম অবস্থায় শুধুমাত্র আলোকপদ্ধতি I সক্রিয় থাকে এবং জল থেকে কোন ইলেকট্রন বিচ্যুত হয় না, যেহেতু আলোকপদ্ধতি II চালু থাকে না। শুধুমাত্র আলোক পদ্ধতি I চালু থাকায় জল জারিত হয় না, সুতরাং অক্সিজেনও উদ্ভূত হয় না। আলোকপদ্ধতি II বন্ধ থাকবার দরুণ অচক্রাকারে ATP উৎপাদনও স্থগিত থাকে; তার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার হ্রাস পায়। এই রকম অবস্থায় জারিত $NADP^+$-র অভাব দেখা দেয়।

কারণ এই পদার্থটি পাওয়া যায় কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারণ করবার সময় NADPH+H^+ জারণের ফলে। সুতরাং যখন আলোকপদ্ধতি I-কে 683nm-এর থেকে বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক প্রয়োগে সক্রিয় করা হয়, তখন পি-700 থেকে ফেরেডক্সিনের দিকে প্রবাহিত ইলেকট্রনগুলি NADPH+H^+ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে না। এই অবস্থায় বিজারিত ফেরেডক্সিন জারিত হয়ে তার অর্জিত ইলেকট্রনগুলি সাইটোক্রোম-বি$_6$-কে প্রদান করে। তারপর সাইটোক্রোম-বি$_6$ ইলেকট্রনগুলিকে সাইটোক্রোম-এফ এবং প্লাস্টোসায়ানিনের মাধ্যমে ফেরৎ দেয় পি 700-কে। তাহলে এক কথায় ইলেকট্রন প্রবাহটি তার উৎসস্থলেই প্রত্যাবর্তন করলো, অর্থাৎ তারা এমন করলো একটি চক্রাকার পথে।

ইলেকট্রনের এই রকম চক্রাকার প্রবাহের ফলে ATP তৈরীর সম্ভাব্য স্থান দুটি। একটি ATP তৈরী হয় পূর্বে বর্ণিত সাইটোক্রোম-বি$_6$ এবং সাইটোক্রোম-এফ-এর মধ্যবর্তী অংশে এবং অন্যটি হয় ফেরেডক্সিন ও সাইটোক্রোম-বি$_6$-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে; এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের বিজারণ-জারণ বিভব বৈষম্য হলো 0·4 v, যার পরিমাণ ATP তৈরীর জন্যে যথেষ্ট।

আলোকসংশ্লেষণ সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের আজও অসম্পূর্ণ। যারা উদ্ভিদজগত তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করাও বাকী। দেখা যাবে—নতুন নতুন রকমারী তথ্য বেরিয়ে পড়বে এই আলোক-জৈবিক বিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে।

পরম শূন্যাঙ্ক ও পদার্থের প্রকৃতি

দেবীপ্রসাদ রায়*

অতি উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থার কথা আমরা আজকাল জানতে পেরেছি—এর নাম প্লাজ্মা স্টেট্ বা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। এই তাপমাত্রা এত বেশী যে, এখানে কোন বস্তুই তার যে সাধারণ তিনটি অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়—তার কোনটিতেই থাকতে পারে না, পরন্তু তারা আয়নিত অবস্থায় থাকে এবং এই আয়নিত অবস্থাকেই প্লাজ্মা স্টেট্ বলা হয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু আমরা যদি ঠিক উল্টাটা ভাবি, অর্থাৎ পদার্থের অবস্থাকে পরম শূন্যাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় চিন্তা করি, তাহলে দেখবো এখানকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নয় এবং ব্যবহারিক জগতের পক্ষে খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। এখন পরম শূন্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটা ধারণায় আসা যাক। বৈজ্ঞানিক চার্লস্-এর সূত্রানুযায়ী যে কোন তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন ঐ তাপমাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক। উপরিউক্ত ধর্মপ্রকাশী সমীকরণটি হলো—

$$v_t = v_0\left(1+\frac{1}{273}t\right) \text{ c.c.}$$

যেখানে $v_t \rightarrow t°c$ তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন

$v \rightarrow$ প্রাথমিক আয়তন।

এখন যদি আমরা o°c-এর নীচের দিককার পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো যে,

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজ, বাঁকুড়া।

$-273°c$-এ আয়তনের তাত্ত্বিক মান শূন্য হবে এবং উপরিউক্ত তাপমাত্রা $-273°c$—যেখানে আয়তন বলে কিছু থাকছে না তাকে বলা হয় পরম শূন্যাঙ্ক এবং $-273°c$ তাপমাত্রাকে শূন্যাঙ্ক ধরে যদি নতুন স্কেল তৈরী করি, তবে তাকেই বলা যাবে absolute scale। সেন্টিগ্রেডে যে কোন তাপমাত্রা $t°c$ এই স্কেলে হবে $(t+273)°A$। তাপীয়-গতিবিদ্যা (Thermodynamics) থেকেও এই ধরণের স্কেলের সপক্ষে আমরা পূর্ণ সমর্থন পাই।

কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে এই পরম শূন্যাঙ্কের অস্তিত্ব প্রকল্পিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রা সৃষ্টি করা খুব কঠিন—কার্যতঃ অসম্ভব। পরীক্ষাগারে এই তাপমাত্রা সৃষ্টির অপারগতা পদার্থবিদ্যার তাপীয়গতিবিদ্যা বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞানী নার্নস্ট (Nernst)-এর নামানুসারে এই সূত্রটিকে নার্নস্ট-এর সূত্র বা তাপীয়গতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্র বলা হয়। এই সূত্রানুযায়ী যে কোন সীমিত পদ্ধতি-মালাই অনুসরণ করা হোক না কেন—পরম শূন্যাঙ্ক তাপমাত্রা সৃষ্টি করা অসম্ভব।

বিজ্ঞানাগারে অবশ্য আমরা এই তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি পৌঁছতে পারি। শৈত্য উৎপাদনের জন্যে যে কয়েকটি পদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হলো।

(1) একটি গ্যাসের উপর উপযুক্ত চাপ প্রয়োগ করা।

(2) জুল-টমসন এফেক্ট ব্যবহার করা

(3) বিশেষ চাপ ও তাপে স্থিতিমান একটা গ্যাসকে হঠাৎ প্রসারিত করা।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলিতে একটি গ্যাসকে তরলায়িত করা যায় এবং স্বভাবতঃই আমরা $0°c$-র অনেক নীচের তাপমাত্রাগুলি বিজ্ঞানাগারে সৃষ্টি করতে পারি।

1857 সালে বৈজ্ঞানিক সিমেন্স শৈত্য উৎপাদনের একটি সুন্দর উপায় বের করেন, যার নাম হলো method of regenerative cooling। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে প্রচলিত উপায়ে একটি শীতল তাপমাত্রা সৃষ্টি করা হয়। পরে শীতল তাপাঙ্ককে শীতলতর তাপাঙ্ক সৃষ্টির কাজে লাগানো হয় এবং এই একই পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ ব্যবহারে অত্যধিক শৈত্য সৃষ্টি করা যায়। বিজ্ঞানী সিওে অত্যধিক শৈত্য উৎপাদনের জন্যে জুল-টমসন এফেক্ট প্রয়োগ করেন। জুল ও টমসন একটি গ্যাসকে সচ্ছিদ্র (Porous) একটি বস্তুর মধ্য দিয়ে হঠাৎ প্রসারিত হতে দেন। এই জাতীয় প্রসারণের ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা কমে যায়। বৈজ্ঞানিক সিওে এই পদ্ধতির সঙ্গে পূর্বোক্ত শীতল থেকে শীতল তাপমাত্রা সৃষ্টির পদ্ধতিটিকে যুক্ত করেন এবং বাতাসকে তরলায়িত করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞানী ডুয়ার (Dewar) ঐ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নিজ আবিষ্কৃত Dewar flask বা সুপরিচিত Thermoflask ব্যবহার করে হাইড্রোজেন তরলায়িত করেন; অর্থাৎ $252°c$ তাপমাত্রা সৃষ্টি করেন। মূলতঃ একই পদ্ধতি ব্যবহার করে কে ওনস্ (K. Onnes) হিলিয়াম তরলায়িত করে —$268.9°c$ তাপমাত্রা উৎপাদনে সক্ষম হন। কিন্তু পরম শূন্যাঙ্কের খুব নিকটে যেতে হলে adiabatic demagnetisation পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। খুব সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে এই পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা এইরূপ :—

আমরা জানি বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা চুম্বক সৃষ্টি করতে গেলে তাপ উৎপন্ন হয়। তেমনি চৌম্বকত্ব নিরসন করতে গেলে শৈত্য সৃষ্টি হয় এবং এই তত্ত্বটিকেই অতি শীতল তাপমাত্রা সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়েছে। একটি paramagnetic salt যেমন gadolinium sulphate $\{([Gd]_2 SO_4)_3 \cdot H_2O\}$ একটি বিশেষ আকারে কোন স্থায়ী চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে রাখা হয়, যার বাইরে থাকে তরলায়িত হিলিয়ামের প্রকোষ্ঠ ও ডুয়ার ফ্লাস্ক। প্রথমে তরল হিলিয়ামকে বাষ্পীভূত হতে

salt-এর তাপমাত্রা 1°A-এ নামিয়ে আনা হয়। এবার বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা ঐ salt-টিকে চুম্বকে পরিণত করা হয় এরপর পাম্পের সাহায্যে salt-টিকে তাপীয় অর্থে চতুষ্পার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেই salt-এর চৌম্বক ধর্ম নষ্ট হতে থাকে। ফলে salt-টির ভিতরে আণবিক পুনর্বিন্যাস ঘটে। প্রয়োজনীয় শক্তি ঐ তাপীয় অর্থে বিচ্ছিন্ন (Thermaly isolated) salt থেকেই আসে। তাপমাত্রা এই ভাবে 10^{-3}°c-এ নেমে আসে।

নিউক্লিয়ার প্যারাম্যাগ্‌নেটিক রেজোন্যান্সের তত্ত্ব প্রয়োগে উপরিউক্ত পদ্ধতির সংস্কার করলে 10^{-6}°c অবধি তাপমাত্রা বিজ্ঞানাগারে সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ম্যাগ্নেটিক রেজোন্যান্স সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা হচ্ছে। আমরা জানি সমস্ত মৌলিক পদার্থকণাই নিজ অক্ষের চারদিকে ঘোরে। বিদ্যুৎকণাবাহী পদার্থ কণার এই ঘূর্ণন (Spin) একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ এই মৌলিক পদার্থ-কণাগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুম্বকের মত ব্যবহার করে। এগুলিকে যদি একটি বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবাধীনে আনা হয়, তাহলে নিজ কক্ষের চারদিকে ঘোরা ছাড়াও একটি বিশেষ ধরণের আবর্তন দেখা যাবে, যেমনটি দেখা যায় একটি ঘূর্ণায়মান লাট্টুর বেলায়। এই প্রকার আবর্তনকে লারমর প্রেসেশন (Larmor precession) বলে। মনে করা যাক যে উক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে সমকোণে রেখে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র পদার্থকণাগুলির চারদিকে ঘোরানো হচ্ছে। যখনই ঐ ভ্রাম্যমান চৌম্বক ক্ষেত্রের একক সময়ে ঘূর্ণন-সংখ্যা পদার্থকণাগুলির নিজকক্ষের চারদিকে ঐ একক সময়ে ঘূর্ণন-সংখ্যার সমান হবে, তখনই ভ্রাম্যমাণ চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌম্বক শক্তি (Magnetic energy) হঠাৎ হ্রাস পেয়ে যাবে এবং এই হ্রাসপ্রাপ্তি ধরা পড়বে একটি অসিলোস্কোপে (Oscilloscope)। এই ঘটনাকেই বলা হয় ম্যাগ্নেটিক রেজোন্যান্স বা চৌম্বক অনুনাদ। যে সমস্ত পদার্থের অণু বা পরমাণুতে উপরিউক্ত ভাবে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মান শূন্য, তাদের বলা হয় ডায়াম্যাগ্নেটিক এবং যেখানে ঐ মান শূন্য নয়, তাদের বলা হয় প্যারাম্যাগ্নেটিক। তামা বা সোডিয়াম পুরাপুরিভাবে ডায়াম্যাগ্নেটিক, কিন্তু ওদের পরমাণুকেন্দ্রিক চৌম্বকক্ষেত্রের মান শূন্য নয়।

তাপীয় গতিবিদ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত সূত্র থেকে দেখানো যায় যে, যেহেতু নিউক্লিয়ার ম্যাগ্নেটিক মোমেন্ট-এর মান ইলেকট্রনিক ম্যাগ্নেটিক মোমেন্ট-এর মান অপেক্ষা অনেক ছোট, সেহেতু নিউক্লিয়ার প্যারাম্যাগ্নেটিক বস্তু অত্যধিক শৈত্য সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। 50—100 কিলো-গস্ মানবিশিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করলে হিমাঙ্কের নিকটর তাপমাত্রায় পৌঁছাবার জন্যে প্রারম্ভিক তাপমাত্রা 001°A হবার দরকার এবং সেই জন্যে সমস্ত পদ্ধতিটি দুটি পর্যায়ে গঠিত। প্রথম পর্যায়ে একটি ইলেকট্রন-পারম্যাগ্নেটিক বস্তু যেমন আয়রন-অ্যামোনিয়াম অ্যালাম, একটি নিউক্লিয়ার প্যারাম্যাগ্নেটিক বস্তু, যেমন তামা, এর সঙ্গে একটি তাপপরিবাহী বস্তুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। পূর্ব-বর্ণিত উপায়ে যদি প্রথম বস্তুটির চৌম্বক ধর্ম নিরসন করা হয়, তাহলেই প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক তাপ-মাত্রা অর্থাৎ ·001°A পাওয়া যাবে। এর পর সংযোগকারী বস্তুটি সরিয়ে নেওয়া হয় ও দ্বিতীয় বস্তুটি অর্থাৎ তাপমাত্রার উপর যদি চৌম্বক নিরসন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে 10^{-5}°A অবধি তাপমাত্রায় পৌঁছানো যাবে। অবশ্য পদ্ধতিটি কার্যতঃ খুবই জটিল। যাই হোক মোটা-মুটিভাবে অতিশীতল তাপমাত্রা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পন্থাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। এখন দেখা যাক—হিমাঙ্কের দিকে অগ্রসর হলে পদার্থের ধর্মের কি পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসঙ্গে

তরল হিলিয়ামের কথা আগে উঠবেই, কারণ এই পদার্থটি কতকগুলি অদ্ভুত ধর্ম প্রকাশ করে।

হিলিয়াম তরলায়িত হয় 4°A তাপমাত্রায়। এই তাপমাত্রা যদি আরও কমানো হয়, তাহলে দেখা যাবে 2·2°A তাপমাত্রা তরল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও হিলিয়াম আর একটি পরিবর্তনের মধ্যে যাচ্ছে। তরল হিলিয়ামের আপেক্ষিক তাপ-মাত্রার পরিবর্তন অনুসরণ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই বিশেষ তাপমাত্রাটি (2·2°A) ধরা পড়ে। আপেক্ষিক তাপ-তাপমাত্রা লেখচিত্র অথবা চাপ-তাপমাত্রা লেখচিত্রের গঠনানুযায়ী এই তাপমাত্রা-টিকে ল্যাম্‌ডা বিন্দু বলা যায়। এই বিন্দুর
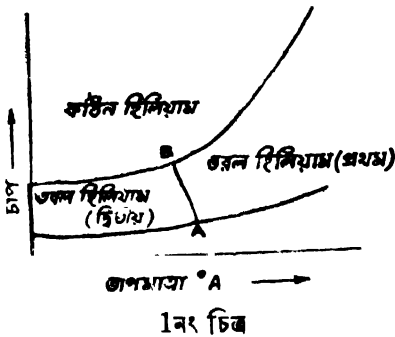
1নং চিত্র

উপরে তরল হিলিয়াম (প্রথম) ও তার নীচের তরল হিলিয়ামকে তরল হিলিয়াম (দ্বিতীয়) বলা হয় (1নং চিত্র)।

উক্ত তাপমাত্রায় অর্থাৎ 2·2°A-তে তরল হিলিয়াম (প্রথম) হঠাৎ স্থির, অচঞ্চল হয়ে যায়। তরলের উপর তল কাচের মত মসৃণ দেখায় এবং অন্তের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে এটাকে একটা নতুন অবস্থা বলে স্বীকার করতে হয়। এই নতুন অবস্থায় হিলিয়ামকে তরল হিলিয়াম (দ্বিতীয়) বলা হয়। ঐ বিশেষ তাপমাত্রা অর্থাৎ 2·2°A, যার পর এই অবস্থান্তর ঘটে। তাকে চাপ-তাপমাত্রা রৈখিক চিত্রের আকারানুযায়ী ল্যাম্‌ডা (λ) বিন্দু বলা হয়েছে আগেই। হিলিয়ামের এই নতুন অবস্থাকে তরল হিলিয়াম (দ্বিতীয়) আখ্যা দিলেও ওটা তরল কিনা, তা স্থির করে বলা যায় না। কারণ সাধারণ তরল পদার্থ যে সব ধর্ম প্রকাশ করে, তরল হিলিয়াম (দ্বিতীয়) কিন্তু তা প্রকাশ করে না। এই পদার্থ যে কোন পাত্র ভেদ করে চলে যেতে পারে। গ্যাসের অণুর চেয়ে এর অণুগুলি বেশী চঞ্চল (Mobile) অথচ তরলের সব সময় পাত্রের তলদেশ পূর্ণ করে থাকে। কঠিন হিলিয়ামও একে বলা যায় না, কারণ কঠিন হিলিয়াম সাধারণ চাপের 25 গুণ চাপের সাহায্যে তৈরী করা গেছে, যার সঙ্গে আলোচ্য পদার্থের কোন মিল নেই। কঠিন নয়, আবার গ্যাসও নয়—এই অদ্ভুত পদার্থকে তাই কি নামে অভিহিত করা হবে, সেটা বিজ্ঞানীদের খুব চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিজ্ঞানাগারে পরিলক্ষিত তরল হিলিয়ামের (দ্বিতীয়) কতকগুলি বিচিত্র ব্যবহারের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়। যেমন—যদি কোন ছোট পাত্রের তলদেশ তরল হিলিয়ামের (দ্বিতীয়) মধ্যে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে দেখা যাবে উক্ত পদার্থটি পাত্রটির গা বেয়ে উঠে পাত্রটি পূর্ণ করে দিচ্ছে। যদি পাত্রটিকে উপরের দিকে উঠানো হয়, তাহলে উক্ত পদার্থ পাত্রের গা বেয়ে উঠে আবার নীচে নেমে আসে। আবার যদি একটি পাত্র, যার দুই মুখ ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, তাকে তরল হিলিয়ামের (দ্বিতীয়) মধ্যে ডোবানো হয়, তাহলে দেখা যায় যে, প্রথমে তরল হিলিয়াম পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এখন তীব্র আলোর সাহায্যে একে উত্তপ্ত করলে উপরের সরু মুখ দিয়ে ঐ তরল ঝর্ণাধারায় বের হতে থাকবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই তরল খুব ভাল তাপ পরিবাহী।

এই সমস্ত ধর্মাবলী ব্যাখ্যার জন্তে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা এই তরল হিলিয়ামকে (দ্বিতীয়) কোয়ান্টাম ফ্লুয়িড বলেও অভিহিত করেছেন।

এবারে হিলিয়াম ছাড়া অন্যান্য পদার্থের গুণগত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

1911 সালে কে. ওনস্ পারদের তাপমাত্রা পরম শূন্যাঙ্কের কিছু উপরে রেখে তার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালেন এবং একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল 4°A তাপমাত্রায় পারদ তার রোধশক্তি (Resistance) হারিয়ে ফেলেছে। ওহম্-র (Ohm) সূত্র পর্যালোচনা করলে কিন্তু এই ঘটনা একটু বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। ঐ সূত্রানুযায়ী কোন তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও রোধের সম্পর্ক হলো

$I = \frac{E}{R}$ যেখানে $I \rightarrow$ বিদ্যুৎ-প্রবাহ

$E \leftarrow$ বিভব বৈষম্য

$R \rightarrow$ রোধ

এখন যদি রোধ হয় $= 0$ হয়, তাহলে $I = \frac{E}{0} = \infty$ অর্থাৎ অতি শীতল তাপমাত্রায় পারদের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে তা কখনো লুপ্ত হবে না এবং এই অবস্থায় পারদ অতিপরিবহন ক্ষমতা (Superconductivity) লাভ করে। এটা কি করে সম্ভব, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। কোন পরিবাহী ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বলতে আমরা বুঝি ইলেকট্রনের প্রবাহ। ধাতব পদার্থের স্ফটিকাকার (Crystal-stucture) পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, পরমাণুগুলি পরস্পরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে বিশেষ ভাবে সজ্জিত থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় ঐ পরমাণুগুলি তাদের প্রতিবেশী অপর দুটি পরমাণুর অন্তর্বর্তী স্থানে স্পন্দিত হয়। তাপমাত্রা বাড়লে স্পন্দন দৈর্ঘ্য (Amplitude) বাড়ে ও তাপমাত্রা কমলে কমে। কাজেই ঐ অন্তর্বর্তী স্থান দিয়ে যাবার সময় ইলেকট্রনগুলির সঙ্গে স্পন্দনশীল পরমাণুগুলির ধাক্কাধাক্কির সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলির স্বচ্ছন্দ গতি ঐ ধাক্কাধাক্কির ফলে ব্যাহত হতে পারে। তাপমাত্রা বাড়লে এই সম্ভাবনাও বাড়ে এবং তাপমাত্রা কমলে এই সম্ভাবনা কমে; অর্থাৎ তাপমাত্রা কমলে রোধও কমতে থাকে। অতিশীতল তাপমাত্রায় পরমাণুর অত্যল্প স্পন্দন-দৈর্ঘ্যের জন্যে ইলেকট্রন-প্রবাহ কোন বাধাই পায় না, যার ফলে ধাতুটি অতিপরিবাহীতে পরিণত হয়। যে তাপমাত্রায় এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে পরিবর্তক তাপমাত্রা (Transition-tamperature) বলা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এই তাপমাত্রা O°c-র বহু নীচে থাকায় বিজ্ঞানাগারে তা সৃষ্টি করা অথবা প্রয়োগের জন্যে ধরে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই কৃত্রিমভাবে যাতে এই পরিবর্তক তাপমাত্রাকে উপরের দিকে আনা যায়, তার চেষ্টা চলছে।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, যে সমস্ত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের পরমাণু-প্রতি মিলনাকাঙ্খী ইলেকট্রনের (Valency electron) সংখ্যা দুই থেকে আটের মধ্যে, তাদেরকে তাড়াতাড়ি অতিপরিবাহীতে পরিণত করা যায় এবং মিলনাকাঙ্খী ইলেকট্রনের সংখ্যা উপরিউক্ত সীমার মধ্যে যখন বিজোড়, তখন অতিপরিবহন ক্ষমতা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি অর্জন করা যায়; অর্থাৎ পরিবর্তক তাপমাত্রাকে পরম শূন্যাঙ্কের অনেক উপরে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। যেমন টেক্‌নিশিয়ামের কথা ধরা যাক। এই পদার্থটি পরমাণু কেন্দ্রের বিভাজন প্রক্রিয়ার সময় সৃষ্ট হয়। এর মিলনাকাঙ্খী ইলেকট্রনের সংখ্যা সাত এবং পরিবর্তক তাপমাত্রা 11°A। পিরিয়ডিক টেবলে টেকনিশিয়ামের আগের ও পরের মৌলিক পদার্থগুলি হলো মলিবডিনাম ও রুথেনিয়াম, মিলনাকাঙ্খী ইলেকট্রন সংখ্যা যথাক্রমে আট ও ছয়। এদের নিজস্ব

পরিবর্তক তাপমাত্রা পরম শূন্যাঙ্কের খুবই কাছে। কিন্তু যদি এই দুই ধাতু থেকে সমান অংশ নিয়ে একটি সঙ্কর ধাতু তৈরী করা হয়, তা হলে তার স্ফটিকাকার টেকনিশিয়ামের মত হবে এবং পরিবর্তক তাপমাত্রা হবে 10·6°A। এপর্যন্ত মলিবডিনামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু, যেমন—কলম্বিয়াম, বোরন, ফস্‌ফরাস ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অনেকগুলি অতিপরিবহী পদার্থ তৈরী করা হয়েছে। এমনকি স্বতন্ত্রভাবে অতিপরিবহন ক্ষমতা অর্জনে অক্ষম, এমন দুই ধাতুকে সংমিশ্রণ করে অতিপরিবহনক্ষম নতুন পদার্থ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। যেমন—সিলিকন আর কোবাল্ট। এর মধ্যে সিলিকন অপরিবাহী। কোবাল্টের ইলেকট্রন-সংখ্যা নয় এবং বেশ চুম্বকধর্মী। কিন্তু এদের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট একটি ঘন স্ফটিকাকার পদার্থ অতিপরিবহনে সক্ষম। এই বিশেষ স্ফটিকাকারটির নাম বিটা-টাংষ্টেন আকার। এতে আটটি পরমাণু একটি বিশেষ আকারে সজ্জিত থাকে। পরমাণুগুলির অন্তর্বর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত এবং পরমাণুপ্রতি গড়পড়তা ইলেকট্রন-সংখ্যা 4·5 আর 4·75। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত টিন ও কলম্বিয়ামের সঙ্কর ধাতুর পরিবর্তক তাপমাত্রা 18°A পর্যন্ত ওঠানো গেছে।

অতিপরিবহনক্ষম পদার্থ তৈরী করবার সম্ভাবনা প্রযুক্তিবিদ্যায় আজ যুগান্তর সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। তড়িৎ-বিদ্যার অতি সূক্ষ্ম মাপজোখের কাজ আজকাল অতিপরিবাহী পদার্থ দিয়ে হচ্ছে। এর সাহায্যে অতি সামান্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা সংকেত—কোনরূপ শক্তি ব্যয় না করেই ব্যবহার করা যায়। এসবই অতিশীতল তাপমাত্রায় পদার্থের ধর্ম অনুশীলনের ফল।

সঞ্চয়ন

কালকের আবর্জনা আজকের সম্পদ

ফেলে দেওয়া আবর্জনার কোন মূল্য এতকাল মানুষের কাছে ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সভ্য সমাজের সকল মানুষই নোংরা আবর্জনার স্তূপকে সোনার মত মূল্যবান মনে করে। কারণ, এথেকে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে।

মানুষের ফেলে-দেওয়া অবহেলিত ঘৃণ্য জঞ্জালরাশিকে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরের অনেক কারণই রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে দিকে দিকে হাহাকার পড়ে গেছে। যেটা চাই—সেটাই নাই। অ্যালুমিনিয়াম থেকে দস্তা কিংবা কাঠ থেকে জল—যাই ধরতে যাওয়া যায়, তাই নাগালের বাইরে। সব কিছুর ভাণ্ডার যেমন একদিক থেকে কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি দাম যাচ্ছে বেড়ে। সেই সঙ্গে কয়লা, তেল প্রভৃতি থেকে যে শক্তির উদ্ভব হয়, বিশ্বে বর্তমানে তার যে কি চাহিদা, তা কোন দিন ভাবাও যায় নি। এসব তো গেলই, সূচ্যগ্র মেদিনী পর্যন্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে জমি এক মহামূল্যবান সম্পদ। সব শহরই আশেপাশে হাত-পা ছড়িয়ে গায়ে-গতরে বেড়ে যাচ্ছে। শহরগুলিতে নিত্য নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে। দিকে দিকে গড়ে উঠছে মানুষের বাসভবন আর নানা শিল্প কারখানা। আবর্জনা ফেলবার মত বাজে জায়গা কোথায়?

এই সব নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিশেষজ্ঞ এবং সরকারী পদস্থ কর্মচারী কঠিন

আবর্জনাগুলি ফেলে দেবার পরিবর্তে সেগুলিকে নতুন পদার্থে পরিণত করবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। নিউ ইয়র্কের কুপার ইউনিয়নের প্রাক্তন ডীন অব ইঞ্জিনিয়ারিং এরোন টেলার বলেছেন যে, পরিবেশ দূষণকারী আবর্জনাগুলিকে দূরে ফেলে দিয়ে সেগুলির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ সন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। এগুলিকে কাজে না-লাগানো ফেলেরাখা অমূল্য সম্পদরূপে মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

মানুষের ফেলে-দেওয়া আবর্জনারাশির মধ্যে যে সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণ সংস্থা (ইপিএ) তার সমীক্ষা করে দেখেছে। এই সমীক্ষায় প্রকাশ, আমেরিকার একটি আদর্শ শহরের আবর্জনাস্তূপের মধ্যে যে কাগজ পাওয়া যায়, তার ওজন হচ্ছে আবর্জনার 53 শতাংশ। ফেলে-দেওয়া খাদ্যাংশ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থাকে শতকরা 8 ভাগ। কাচভাঙাও পাওয়া যায় 8 শতাংশ। ধাতব পদার্থ শতকরা 7 ভাগ। বাকী 24 শতাংশ হচ্ছে ঘাসের টুক্‌রা, ছেঁড়া কাপড়, রবার, প্লাষ্টিক আর অন্যান্য পাঁচমিশালী পদার্থে ভর্তি। মানুষ যে সব জিনিষ তৈরী করে অথবা যা যা ব্যবহার করে, সে সবের অন্তিম পরিণতি লাভ হয় আবর্জনার অবহেলিত স্তূপে।

আবর্জনারাশির মধ্যে যে সব কঠিন পদার্থ, সেগুলি আসলে এমন সব পদার্থের অংশ, যা পুরাপুরি ব্যবহৃত হয় নি। ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি বলে যেভাবেই হোক জঞ্জালে পর্যবসিত হয়েছে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন, মোড়কের কাগজ দুমড়ে-কুঁচকে ফেলে দেওয়া হয়, খালি কাচের বোতল, ইস্পাতের পাত্রের বেপাত্তা ঢাকনা এরকম ধরণের অনেক জিনিষ। এই সব জিনিষের যে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছে, তা কিন্তু নয়। তবে এগুলিকে ঐ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো চলে না। আবর্জনার মধ্যে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ, রবার, প্লাষ্টিক প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ থাকে, সেগুলিকে প্রথমে বেছে আলাদা করতে হয়। তারপর নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলি নতুন করে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে।

মানুষের ফেলে-দেওয়া জঞ্জালের অবিশ্বাস্য মহামূল্যের কথা বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞগণ এর নাম দিয়েছেন 'শহরের খনি'। ই পি এ-র সমীক্ষা অনুযায়ী একথা নির্ভুলভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র আমেরিকায় বছরে যে 12 কোটি 50 লক্ষ টন আবর্জনা ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলি যদি পুরাপুরি রূপান্তরের ব্যবস্থা করা করা হয়, তবে তা থেকে পুনর্বার ব্যবহার করবার মত অনেক জিনিষ পাওয়া যেতে পারে। যেমন, পাওয়া যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তির শতকরা 1 ভাগ। আর তা থেকে আমেরিকার লোহার চাহিদা শতকরা 7 ভাগ মিটতে পারে। তাছাড়া, শতকরা 7 ভাগ অ্যালুমিনিয়াম, 14 শতাংশ কাগজ এবং 20 শতাংশ টিনের প্রয়োজনও মেটানো সম্ভব।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই সীমিত। আবর্জনাকে নতুন পদার্থে পরিণত করবার ফলে প্রকৃতির সেই ক্রমক্ষীয়মান ভাণ্ডারের উপর থেকে চাহিদার চাপই যে শুধু কমে যায় তা নয়, ওতে বিদ্যুতের ব্যয়েরও অনেক সাশ্রয় হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—কাঠের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরী না করে যদি ফেলে-দেওয়া পুরনো কাগজ থেকে নতুন করে কাগজ তৈরী করা হয়, তাতে 68 শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ কম লাগে। শুধু তাই নয়, এতে নদীর জল 15 শতাংশ আর আবহাওয়া 60 শতাংশ কম কলুষিত হয়। খনি থেকে উত্তোলিত খনিজ কাঁচা মাল থেকে ইস্পাত উৎপাদনের চেয়ে ইস্পাতের ফেলে-দেওয়া বিভিন্ন টুক্‌রা থেকে ইস্পাত তৈরী করতে বিদ্যুতের ব্যয় 74 শতাংশ কম হয়। তাছাড়া, এতে পরি-

বেশও 86 শতাংশ কম কলুষিত হয়ে থাকে। কাচ-ভাঙা থেকে নতুন করে কাচের জিনিষ তৈরী করা অনেক সহজ। কেন না, কাচভাঙা খুব তাড়াতাড়ি গলে যায়, তাপও লাগে কম। অথচ কাঁচা উপাদান থেকে নতুন কাচ তৈরী করা এত সোজা নয়। অ্যালুমিনিয়ামের বেলাও তেমনি ঠিক একই কথা।

ফেলে-দেওয়া পদার্থের নব রূপায়ণের ব্যাপক প্রসারের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও আর্থিক আর প্রযুক্তিবিভাগত অনেক বাধার সম্মুখীন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র 2 শতাংশ শিল্পোৎপাদন নবরূপায়ণ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। অবশ্য কোন কোন জিনিষের ক্ষেত্রে এই আনুপাতিক হার অনেক বেশী। যেমন, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে 25 শতাংশ, তামার ব্যাপারে শতকরা 48 আর কাগজ ও দস্তার বেলায় 20 শতাংশ।

জঞ্জালের পাহাড়ের জিনিষগুলি নবরূপায়ণের ব্যাপারে এক এক জিনিষের এক এক ধরণের সমস্যা রয়েছে। কাচের বোতল আর ইস্পাতের পাত্রের উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকার লোকেরা প্রতি বছর 8 হাজার কোটি পাত্র এবং 3 হাজার 4-শ' কোটি বোতল ব্যবহারের পর ফেলে দেয়। অবিশ্বাস্য এই সংখ্যা অনুসারে শুধু ইস্পাতের মূল্যই দাঁড়ায় এক-শ' কোটি ডলার। ইলিনয়ের শিকাগো, ক্যালিফোর্ণিয়ার ওকল্যাণ্ড এবং জর্জিয়ার আটলান্টা সমেত 12টিরও বেশী শহরে জঞ্জালের পাহাড় থেকে ইস্পাত আলাদা করে নেবার জন্যে প্রচুর চুম্বক ব্যবহার করা হয়। ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রগুলির যেন কোন ক্ষয়-লয় নেই। আবর্জনার স্তূপে বিসর্জিত হবার পর বছরের পর বছর সেগুলি অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সেই জন্যে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা অ্যালুমিনিয়াম পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই যত্ন নিয়ে থাকেন।

প্লাস্টিকের জিনিষ আর রবারের টায়ার রূপান্তরের ব্যাপারে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে প্লাস্টিকের কোন বিকার ঘটে না। কিন্তু পোড়ানো হলে তা থেকে বিষাক্ত একটা গ্যাস বেরোয়। 'পলিভিনিল ক্লোরাইড' নামে এক ধরণের প্লাস্টিক পোড়ালে অত্যন্ত ক্ষয়কারী এক ধরণের অ্যাসিড বের হয়। এসব সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে যদি এমন ধরণের প্লাস্টিক উদ্ভাবন করা হয়, যা আগুনে পোড়ালেও কোন ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে না।

আমেরিকায় বছরে 18 কোটি পুরনো টায়ার বাতিল করে দেওয়া হয়। এগুলি পোড়ানো হলে প্রচুর অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া নির্গত হয়ে থাকে। এর ফলে পরিবেশ খুবই কলুষিত হয়। এই সব ফেলে-দেওয়া টায়ার নানাভাবে পুনর্বার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এথেকে রবারগুলিকে গুঁড়িয়ে নিয়ে পিচের সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তা তৈরী করা যায়। টায়ারের রবার অত্যধিক উত্তাপে গলিয়ে জ্বালানী তেল উৎপাদন করা চলে।

সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ যা আবর্জনার স্তূপ থেকে পাওয়া যায়, তা সম্ভবতঃ শক্তি। আমেরিকান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল ইনষ্টিটিউটের জনৈক ভাইস প্রেসিডেন্ট আর টমাস উইলসন বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জঞ্জাল থেকে প্রতি বছর যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা 29 কোটি ব্যারেল স্বল্প গন্ধক ঘটিত জ্বালানী তেলের সমপরিমাণ; অর্থাৎ ঘর-গৃহস্থালীর কাজে বর্তমানে যে পরিমাণ তেল লাগে, তার প্রায় পাঁচ শতাংশ। শহরের সমস্ত জঞ্জাল যদি সাধারণভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, তার পরিমাণ দাঁড়াবে আমেরিকার মোট উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির শতকরা ছ-ভাগ।

মিজুরির অন্তর্গত সেন্ট লুইয়ের অনেক বাড়ী গরম রাখা, আলোকিত করা হয়, জঞ্জাল পুড়িয়ে

যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তার সাহায্যে জঞ্জালকে পুড়িয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে এই শহরটি সমগ্র আমেরিকার পথপ্রদর্শক। 1972 সালেই ই পি এ-র সহযোগিতায় ইউনিয়ন ইলেকট্রিক কোম্পানী এভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরীক্ষামূলক কর্মসূচী রূপায়ণে ব্রতী হয়। এই সংস্থার কোন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জঞ্জালগুলিকে প্রথমে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়। তারপর বিদ্যুচ্চুম্বকের সাহায্যে যাবতীয় ধাতুকে পৃথক করে বের করে নেওয়া হয়ে থাকে। এই ধাতুর টুকরা পরে বিক্রি করে ফেলা হয়। এর পর যে দাহ্য জঞ্জালরাশি পড়ে থাকে, সেগুলিকে গুঁড়াকয়লার সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে জ্বালাবার জন্যে দহন চেম্বারে পুরে দিয়ে দহনকার্য সুরু করা হয়। বর্তমানে তিন-শ' টন আবর্জনা প্রত্যহ পোড়ানো হয়ে থাকে। এতে এই কারখানার মোট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের শতকরা প্রায় 15 ভাগ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটি এমন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে যে, পৌর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি সম্প্রসারণের জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তাঁরা সেন্ট লুই শহর ও তার আশেপাশের 7টি কাউন্টির সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহের কার্যসূচী হাতে নিয়েছে। 1977 সাল নাগাত ইউনিয়ন ইলেকট্রিক কোম্পানীকে বছরে 10 লক্ষ টন কয়লা কম কিনতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার সান ডিয়াগোতে আবর্জনা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটা সর্বতোভাবে আলাদা ধরণের প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার নাম পাইরোলাইসিস। জঞ্জালকে জ্বালানী তেলে রূপান্তরণই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। নোংরা আবর্জনার স্তূপ থেকে প্রথমে কাগজ, ফেলে-দেওয়া খাদ্যাংশ প্রভৃতি দাহ্য জৈব পদার্থগুলিকে আলাদা করে ফেলতে হয়। তারপর সেগুলি ধূলার মত মিহি গুঁড়ায় পরিণত করা হয়ে থাকে। এগুলিতে শেষে বিনা অক্সিজেনে 540 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ প্রয়োগ করা হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রতি টন আবর্জনার সরেস জাতের এক ব্যারেল জ্বালানী তেল উৎপন্ন হতে পারে।

নোংরা আবর্জনার ব্যাপক হারে নব রূপায়ণের পথে একটা বড় বাধা হচ্ছে আর্থিক সঙ্কট। আবর্জনার রূপান্তর ঘটিয়ে যে সব কাগজ, কাচ এবং নানা রকমের ধাতু পাওয়া যায়, সেগুলি যদি হাতে হাতে বিলিব্যবস্থার উপযোগী বাজার না মেলে, তা হলে এই প্রযুক্তিবিদ্যা মাঠে মারা যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন না, জঞ্জাল দিয়ে নীচুজমি ভরাট করবার চেয়ে ঐগুলি রূপান্তরণের কাজে যদি খরচ বেশী পড়ে যায়, তা হলে ঐ প্রকল্প টিকিয়ে রাখা দায়। এর একটা উত্তর অবশ্য নবরূপায়িত দ্রব্যসামগ্রীর নতুন নতুন ব্যবহার পদ্ধতির উদ্ভাবন। যেমন—ফেলে-দেওয়া নোংরা কাগজ থেকে তৈরী নতুন কাগজ ব্যাঙ্কের চেক ছাপানো থেকে টিসু কাগজ পর্যন্ত সব কাজেই নিঃসঙ্কোচে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষকেরা এও লক্ষ্য করেছেন যে, ভাল মিহি কাচের গুঁড়া রাস্তা তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের সঙ্গে মেশানো যায়। বেশী দামের কাঁচামালের পরিবর্ত হিসেবে রূপান্তরযোগ্য ফেলে-দেওয়া পুরনো জিনিষের ব্যবহারের প্রতি একটা গভীর প্রবণতা সকলের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এটা একটি বাড়তি লাভ বলা যেতে পারে।

এর ফলে এই আবর্জনা-রূপান্তরণ প্রকল্পের কাজ সারা দেশের মধ্যে এক ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপারে ওহায়োর ফ্রাঙ্কলিনে অবস্থিত ব্ল্যাক ক্লাউসন কোম্পানীর কাজকর্ম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই কোম্পানী তাদের কাঠের মণ্ড তৈরীর একটি যন্ত্রকে আবর্জনা থেকে মণ্ড প্রস্তুতের কাজে লাগিয়েছে। প্রথমে সব আবর্জনাকে চূর্ণ চূর্ণ করা হয়। তারপর

এগুলি মেশানো হয় জলের সঙ্গে। শেষে নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিকতর ভারী কাচ এবং বিভিন্ন ধাতুগুলিকে কাগজ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। কাগজের সেই তলানীগুলিকে পরিষ্কার করে নিয়ে শুকানো হয়। তারপর তা থেকে তৈরী হয় নতুন কার্ডবোর্ড, কাগজ এবং ওই ধরণের আরও নানা জিনিষ।

আবর্জনার এই নব রূপায়ণের কর্মকাণ্ড পুরাপুরি রূপদান করতে যুক্তরাষ্ট্রের এখনও হয়তো আরও দশ বছর সময় লাগবে। এই অভিনব কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেশের সুদক্ষ বিজ্ঞানী থেকে একজন সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই মধ্যে এই বোধটা এসে গেছে যে, মানুষের ফেলে-দেওয়া তুচ্ছ আবর্জনাকে সম্পদরূপে বিবেচনা করতে হবে এবং এগুলির রূপান্তরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে ব্যবহার করতে হবে। রূপান্তরণ পদ্ধতির যাদুস্পর্শে কালকের সংবাদপত্র আজকে এসে হাজির হচ্ছে মোটা কাগজের বাক্সরূপে; আগামী কাল এটাই আবার রূপান্তরিত হবে কার্ড বোর্ডে। একটি ইস্পাতের পাত্র রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে মোটরগাড়ীর ব্যাম্পারে। আবার সেটাই একদিন ঘুরে-ফিরে এসে উপস্থিত হবে নতুন আকাশচুম্বীপ্রাসাদের বীমরূপে। কাজেই দেখা যাচ্ছে—একটা জিনিস ব্যবহারের পর ফেলে দিলেই সেটি চিরতরে বাতিল হয়ে গেল না—সেটিকে নবরূপে নিত্য নতুন ব্যবহার করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বিশ্ব বনাম ইলেকট্রন

নারায়ণচন্দ্র রাণা

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এর কোথাও রয়েছে বিরাট ছায়াপথ, নীহারিকা, কোথাও বা আবার একাকী ইলেকট্রন; কেউ ছুটে চলেছে মহাগতিবেগে, আবার কেউ লক্ষ বছরে এক সেন্টিমিটারও নড়ে না; কারও স্থায়িত্ব কোটি কোটি বছর ধরে, আবার কারও বা সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও নয়। কারও অস্তিত্ব মানুষ ও যন্ত্র উভয়েই অতি সহজে ধরতে পারে, আবার কারও কোন প্রকার অস্তিত্বের টের পাওয়া যায় না। এই প্রতিটি ক্ষুদ্র-বিরাটের মধ্যে যে পার্থক্য, তাদের গুণাঙ্কবাচক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করলে তা আমাদের অনুভূতিতে অতি অল্পই ধরা পড়ে। যেমন মনে করা যাক, অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা (N), যার মান আমরা জানি $\simeq 6 \times 10^{23}$ বলে। তার ধারণা করা এক দুরূহ ব্যাপার। আমরা হচ্ছি এমন এক পর্যায়ের—যে স্থান থেকে অতি 'বড়' অতি 'ছোট' উভয়েই অনেক দূরে রয়েছে। পুরাতন এক ছটাক একটি লোহার বাটখারার মধ্যে ঐ 6×10^{23} সংখ্যক লোহার পরমাণু রয়েছে বলে যদি বলা হয়, তবে আমরা নেহাৎ মেনে নিই—মুখেও বলি, কিন্তু ভেবে দেখি না সংখ্যাটি কত বড়। আবার 342 গ্র্যাম চিনির মধ্যেও ঐ একই সংখ্যক চিনির অণু থাকে। এই চিনি দিয়ে বড় জোর দু-গ্লাস ভাল সরবৎ হয়। এখন এই সরবৎকে যদি পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জলে সমসত্ত্বভাবে মিশ্রিত করা হয়, তবে যে কোন জায়গায় এক গ্লাস জলে শতাধিক চিনির অণু পাওয়া যাবে, এমনি এই বিরাট সংখ্যা। কিম্বা এক একটি চিনির অণুর দাম যদি এক টাকা করে হয়, তবে ঐ 342 গ্র্যাম চিনি কিনতে যা দাম পড়বে, শুধু এক টাকার নোট হলে মোট যে সংখ্যক নোট লাগবে—সেই

বোটগুলি রাখতে গেলে ঘরে, গুদামে কোথাও রাখা যাবে না। সারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর সমানভাবে থরে থরে পাঁচ হাত উপর পর্যন্ত রাখলে তবে ধরানো যাবে। সে যাই হোক, আমরা প্রথমে বড় থেকে অতি বড় ও তারপর ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্র সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

বড় বড় বস্তু বলতে সাধারণতঃ ঘরবাড়ী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির কথা আমাদের মনে আসে। সেই আন্দাজে পৃথিবীটা তাহলে কত বড়? এর ভর বলতে আমরা বুঝি 6×10^{27} গ্র্যাম। সমস্ত পৃথিবীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে যদি অতি দীর্ঘ মালগাড়ীর বগিগুলি পর পর ভর্তি করা হয় এবং জনপ্রতি দশ হাজার কোটি বগির দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে ঐ কাজে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোক (তিন-শ' কোটি) লেগে যাবে, আর ট্রেনের পিছনের গার্ড গাড়ী চালাবার যে নীল আলোর সঙ্কেত দিবেন, তা ড্রাইভারের কাছে পৌঁছতে অন্ততঃ এক লক্ষ বছর সময় লাগবে (যদিও এই গোলাকার পৃথিবীর চার ধারে এক সেকেণ্ডে আলো সাড়ে সাত পাক ঘুরে আসতে পারে)। এহেন বড় পৃথিবী আবার সূর্যের কাছে এত ছোট যে, সূর্য যদি একটি সাধারণ আকারের গোলাকার কুঁজা হয়, তবে পৃথিবী একটি মটরদানা বই আর কিছুই নয়। এই অনুপাতে ঐ সূর্যরূপ কুঁজা থেকে পৃথিবীরূপ মটর দানা পর্যন্ত দূরত্ব হবে মাত্র 215 ফুট অর্থাৎ ঐ কুঁজা যেন তার মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা 215 ফুট দূরের একটি মটরদানাকে তার চারদিক ঘোরাচ্ছে আর ঐ প্লুটো তখন হবে একটি মুগের দানা, যা মাইল দশেক দূর দিয়ে ঐ কুঁজাটির আনুগত্য স্বীকার করে চিরকাল ঘুরেই চলবে। সেই অনুপাতে তখন চাঁদ থাকবে সরষের দানার মত হয়ে—পৃথিবী থেকে ফুটখানেক দূরে। আমাদের সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড় সব নক্ষত্র রয়েছে, তারা আবার লক্ষ লক্ষ গুণ ভারী হতে পারে। আমরা আকাশে খালি চোখে যত জ্যোতিষ্ক দেখি, তার সবগুলিই আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত। আমাদের এই ছায়াপথের ব্যাস বরাবর সবচেয়ে দ্রুতগামী আলোর পক্ষে যেতে যেখানে সময় লাগে এক লক্ষ বছর, সেখানে পৃথিবী থেকে সূর্যে যেতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে আট মিনিট, আর কাছাকাছি নক্ষত্রে যেতে লাগে বছরের পর বছর, নক্ষত্রগুলি যেন লণ্ডনে, কলকাতায়, নিউইয়র্কে ও টোকিওতে রাখা এক একটি টেনিস বলের মত। নক্ষত্রগুলি পরস্পর থেকে এই রকম দূরত্বে থেকেও আমাদের এই ছায়াপথে নাকি হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে, এতেই আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ফুরিয়ে গেল না। নাবিকেরাই জানে, মহাসমুদ্রে দ্বীপগুলি কত দূরে দূরে রয়েছে, ঠিক সে রকমভাবে এই বিশ্বভূমণ্ডলেও বহু নীহারিকা বা ছায়াপথ রয়েছে। তাদের সংখ্যা দু-পাঁচটি কিম্বা দু-দশ লাখ কিম্বা দু-দশ কোটি নয়, একেবারে কয়েক হাজার কোটি। আমাদের নীহারিকা বা ছায়াপথ থেকে সবচেয়ে কাছের যেটি, তার দূরত্ব মাত্র পনেরো লক্ষ আলোকবর্ষ, সেখানেও ঐ রকম বহু নক্ষত্র রয়েছে। তাই ভাবতে অবাক লাগে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতই না বড়! কিন্তু এই শুধু 'বড়' বলেই মনে হয়, কত বড় তার কোন সুস্পষ্ট বোধ হয় না।

একদিকে যেমন বড় যে কত বড় হতে পারে, তা আমরা দেখলাম, অন্যদিকে তেমনি বস্তু যে কত ক্ষুদ্র হতে পারে, তার মাপটাও জানা দরকার। একটি অণু যে কত ছোট—তার আন্দাজ ঐ অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা থেকে পাওয়া গেছে। অণুর চেয়ে আরও ছোট হলো পরমাণু, তার চেয়ে আর ছোট পরমাণুর কেন্দ্রীন, যার চার ধারে ঘোরে ইলেকট্রন। ইলেকট্রন তো ছোট, তার চেয়ে কেন্দ্রীনের উপাদানগুলি অর্থাৎ প্রোটন, নিউট্রন আরও ছোট। আমাদের দেহ প্রায় 10^{14} সংখ্যক কোষ দিয়ে গঠিত। এই কোষের এক একটিতে বহু কোটি পরমাণু রয়েছে। কোষের

কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস, তার মধ্যে রয়েছে ক্রোমোজোম, তার মধ্যে রয়েছে জিন। এক একটি জিনের মধ্যে বহু লক্ষ পরমাণু রয়েছে। তবুও এরা এত ছোট যে, একটি মানুষের সমস্ত কোষের মধ্যে যত জিন আছে, তাদের পাশাপাশি মালা করে সাজালে সেই মালা এত লম্বা হবে যে, পৃথিবী এবং চাঁদে ছুটি খুঁটি পুঁতে যদি জড়ানো হয়, তবে প্রায় কুড়ি হাজার পাকে সেটি শেষ হবে। এক ইঞ্চি সুতার উপর এককোষী ব্যাক্টিরিয়াকে পাশাপাশি সাজালে অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ হাজার ব্যাক্টিরিয়া ধরে যাবে। যাই হোক, ইলেকট্রন যে কত ছোট, এবার তার একটি মাপ দেওয়া যাক। মনে করা যাক, কলকাতার প্রত্যেকটি লোকের একটি করে করে বড় লাইব্রেরী রয়েছে। যার প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি-ত্রিশ হাজার বই রয়েছে। এখন আরও মনে করা যাক, প্রত্যেকে তাদের লাইব্রেরীর বইগুলি নিজেদের বারান্দার উপর নীচে সাজিয়ে রেখে এক প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ওদের সবাইকে অর্থাৎ ঐ কুড়ি-ত্রিশ হাজার বইকে মাত্র এক সেন্টিমিটার পুরু এরকম একটি বই করে ফেললেন। পরে সকলের ঐ চাপা বই নিয়ে এক জায়গায় উপর নীচে জড়ো করা হলো এবং আরও অতি প্রচণ্ড চাপ (সবই কল্পিত) দিয়ে সেই বইয়ের স্তূপের উচ্চতাকে মাত্র এক সেন্টিমিটার করে দেওয়া হলো; অর্থাৎ কলকাতার সকলের সমস্ত বইকে যেন চাপ দিয়ে মাত্র এক সেন্টিমিটার পুরু এরকম একখানা বই করা হলো। তখন সাধারণ একটি বইয়ের একটি পাতা নিশ্চয়ই প্রচণ্ডভাবে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আর সেই চ্যাপ্টা একটি পাতার বেধ ইলেকট্রন ব্যাসের সঙ্গে তুলনীয় হবে। নিউট্রন কিম্বা প্রোটন কণাগুলি কিন্তু ইলেকট্রনের শতাংশের চেয়েও ছোট। সুতরাং একটি নিউট্রন যদি একটি কাচের মার্বেলের মত হয়, তবে একটি ইলেকট্রন হবে একটি ছোটখাটো ঝোপের মত। ফলে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে যেন ঐ রকম একটি প্রোটন-মার্বেলের চারদিকে একটি বৃহৎ ইলেকট্রন-ঝোপ ঘুরতে থাকবে। এই অনুপাতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় মাইলখানেক। প্রসঙ্গক্রমে হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘোরবার গতিবেগেরও একটি পরিষ্কার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক, এক ফার্লং (220 গজ) ধরে রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড পাশাপাশি করে একটি রাস্তার উপর রাখা আছে, আর পৃথিবীর সমস্ত লোককে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আছে। এক এক জনকে ঐ বইগুলির সমস্ত পাতা শুধু উল্টিয়ে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একজনের শেষ হলে আর একজন—এইভাবে চলবে। সমস্ত লোককে ঐ কাজটি করতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় লাগবে। যদি এত দ্রুত সম্পন্ন হতো যে, সমস্ত কাজটি এক সেকেণ্ডে হয়ে গেল, তবে একটি লোকের একটি পৃষ্ঠা উল্টাতে যে সময় লাগতো, মাত্র সেই সময়ে একটি ইলেকট্রন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে কেন্দ্রীনের চারপাশে মাত্র একবার ঘুরে আসবে। এতই জোরে ইলেকট্রন ঘোরে—অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 7×10^{16} বার। হাইড্রোজেনের মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রন কিভাবে দূরে দূরে আছে, তার আন্দাজ আগেই দেওয়া হয়েছে। ফলে কোন বস্তুর মধ্যে আসলে বস্তুর পরিমাণ অতি সামান্যই থাকে। যেমন—আমাদের এই দেহটিকে কিম্বা একটি লোহার এক মন বাটখারাকে প্রচণ্ডভাবে যদি চুপ্‌সে দিয়ে ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনের মধ্যে কোন দূরত্ব না রাখা যেত, তবে তারা এত ছোট হয়ে যেত যে, খালি চোখে দেখা যেত না। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট $2{\cdot}6\times10^{79}$ সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন রয়েছে। তাদের সবাইকে পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে যে বিরাট বস্তুপিণ্ড হবে, নিঃসন্দেহে তার ভর পৃথিবীর ভরের 10^{28} গুণ হবে ($\simeq2{\cdot}1\times10^{55}$

প্রায়) অথচ ব্যাস হবে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের চেয়েও কম।

যাই হোক, বর্তমানে আবার প্রোটন ও নিউট্রনের গঠন-বৈচিত্র্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলে বস্তু তার বস্তুসত্তা ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের নিরেট বস্তুর ধারণা তাহলে কতখানি অবাস্তর! ধরতে গেলে কিছুই নয়, এমন পরিমাণ বস্তুকেও আমরা বিরাট ও নিরেট বস্তু বলে ভাবি। এ কি করে সম্ভব হয়? একটি ঘরে একটি লোক থাকলে কি ঘরটিকে লোকভর্তি দেখা যায়? তা তো কখনও হয় না। আসল রহস্য অন্য দিক দিয়ে। মনে করা যাক, একটি ধূপবাতি যার মুখে এক বিন্দু আগুন। এখন ধূপবাতিটিকে প্রচণ্ডভাবে দোলালে একটি আগুনের রেখার মত দেখায়, যার মূলে রয়েছে আমাদের দৃষ্টির সীমিত ক্ষমতা এবং দৃষ্টিরেশ (Persistence of vision), এরই দৌলতে আমরা ছেদকে ছেদ বলে ভাবি না, খণ্ড ক্ষুদ্রকে নিরবচ্ছিন্ন মনে করি, যেমন করে সিনেমার ছবিগুলিকে নড়াচড়া করতে দেখি। আসলে কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনের প্রচণ্ড গতির জন্যেই আমরা নিরেট এবং নিরবচ্ছিন্ন বস্তু বলে অনুভব করি, নতুবা ইলেকট্রন ও প্রোটনকে তো খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না (তাছাড়া পাউলি বর্জন নীতিও এজন্যে অনেকখানি দায়ী)।

যাই হোক, আমরা অতি ক্ষুদ্র কিম্বা অতি বৃহৎও নই; আমাদের আকৃতি ও গঠন মাঝামাঝি ধরণের। তাই এদিকে ও ওদিকে—উভয় দিকেই কিছুটা উঁকিঝুঁকি মারতে পারছি। আমরা যদি নিউট্রনের মত ছোট হতাম, তাহলে এই নক্ষত্রগুলির সম্বন্ধে কোন ধারণা করতেই পারতাম না। আবার যদি নক্ষত্রগুলির মত বড় হতাম তাহলে মাটির মানুষকে দেখতে পেতাম না—যেমন গায়ে একটি ধূলিকণা এসে পড়লে কোন টেরই পাই না, অথচ একটি ধূলিকণার মধ্যে শত কোটি কোটি (10^{15}) অণু তো রয়েছেই।

সত্য কথা বলতে কি, এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি যেন মহাশূন্য। সেই শূন্যের মধ্যে রয়েছে অতি সামান্য কিছু বস্তু এবং বিকিরণ, যার পূর্ণ-স্বরূপ মানুষ কোন কালে জানতে পারবে না। কারণ, বর্তমানের কণাতম বলবিদ্যা যে অনির্দেশ্য-বাদের জন্ম দিয়েছে, তার দ্বারাই বলা যেতে পারে যে, সব জানবার সূক্ষ্মতারই একটি সীমা আছে। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ব যে কি, তা বোধ হয় প্রকৃতি নিজেই জানে না—মানুষতো দূরের কথা।

পারিবারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি

জয়ন্ত বসু*

আমার এক বন্ধুর দুই সাবালক ভাই বেকার হয়ে বাড়ীতে বসে। বন্ধুটির সংসারে বেশ কিছুটা টানাটানি। তিনি প্রায়ই বলেন, 'আমাদের ভাগ্যটা বড় খারাপ যাচ্ছে।' আমার এক পরিচিত ব্যক্তি গ্রামে থাকেন, চাষবাস করে সংসার চালান। যে বছর ফসল ভাল হয় না, তাঁদের খাওয়া আধপেটা থেকে কমতে কমতে সিকিপেটা হয়ে যায়; তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বলেন, 'এ বছর কপাল বড় মন্দ।' আমার এক প্রতিবেশীর ন'টি ছেলেমেয়ে, তিনি এবার দশম সন্তানের জনক হতে চলেছেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: 'ওদের ভাগ্যে থাকলে ওরা ভালভাবেই মানুষ হবে।'

আসলে আমাদের দেশে অনেকেই আমরা ভাগ্যে বা কপালে বড় বেশী বিশ্বাস করি। যে কোন সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা, তার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজে বের করা এবং তাই থেকে সাধারণের পথের সন্ধান পাওয়া ও সেই পথে এগনো—বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির এই যে ধারা—আমাদের মধ্যে এর বড়ই অভাব। অথচ আমরা যদি সমাজে সত্যিকারের কোন পরিবর্তন আনতে চাই, তাহলে আমাদের ঘরে-বাইরে সর্বত্রই এই মনোবৃত্তির একান্তই দরকার। আমাদের বর্তমান সমাজ পরিবারভিত্তিক; পারিবারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়ে না উঠলে সমাজ-মানসে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার বিকাশ হবে না।

এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, গত 2—3 শতাব্দী ধরে সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার প্রয়োগের ফলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে মনুষ্যসমাজে এত ব্যাপক এবং এরকম দ্রুত হারে পরিবর্তন হচ্ছে যে, আগেকার দিনে তা কল্পনাও করা যেত না। বার্ট্রেণ্ড রাসেলের কথায় 'বিজ্ঞান নিজেকে অবিশ্বাস্য রকম ক্ষমতাশালী বিপ্লবী শক্তি হিসাবে প্রমাণিত করেছে।'

বিজ্ঞান সমাজে পরিবর্তন আনে মূলতঃ দু'-ভাবে:—এক নতুন নতুন উপকরণ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। দুই, মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার উন্মেষ ও প্রসার ঘটিয়ে। সমাজের সুষম উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞানের এ দু-ধরণের কার্যধারারই গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সকলের পক্ষে যা অবশ্য করণীয়, তা হলো—নিজের এবং আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার জন্যে সযত্ন প্রয়াস। আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে। আমাদের নিজের নিজের পরিবারে যাতে বৈজ্ঞানিক মেজাজ গড়ে ওঠে, সেদিকে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ যারা শিশু ও কিশোর, যারা সবে জীবনের পাঠ নিতে সুরু করেছে, তাদের মনে গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।'

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সব

---

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

রকম অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মনকে মুক্ত রাখা এবং বাস্তব জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বা বহু ঘটনার দ্বারা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং যা যুক্তিগ্রাহ্য, সহজ মনে তাকে স্বীকার করে নেওয়া। ধরুন, আপনি কোন লোকের কাছে শুনলেন, আপনার পরিবারে কখনই বসন্ত রোগ হবে না এবং সে জন্যে আপনারা ঠিক করলেন, আপনার পরিবারের কেউই কখনো বসন্তের টিকা নেবেন না। এটা একটি লোকের কথায় আপনাদের অন্ধবিশ্বাস, কারণ তাঁর কথার কোন সঙ্গত যুক্তি নেই, বরং এটাই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, টিকা নিলে বসন্ত রোগ হয় না বা হলেও তার প্রকোপ কম হয়। সুতরাং পরিবারের সকলের নিয়মিত ভাবে বসন্তের টিকা নেওয়াই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক আবার ধরুন, আপনার পরিবারে এরকম একটা ধারণা আছে যে, কোন বিশেষ পেশার লোককে দেখলে যাত্রা অশুভ হয়। এটা একটা কুসংস্কার, কারণ এটি নিঃসন্দেহে বহু ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় নি বা এর পিছনে কোন সঙ্গত যুক্তিও নেই। অতএব এ ধারণা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিপন্থী।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাবাবেগ অপেক্ষা যুক্তির স্থান অনেক উচ্চে। কোন বিষয় বিচার করতে হলে যতখানি সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। আমার ভাল লাগে কি লাগে না, তাই দিয়ে কোন কিছুর বিচার করা নয়, তার মধ্যে কতখানি সত্য আছে, সেটা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য, তাই দিয়েই বিচার করা হচ্ছে সঠিক পন্থা। ধরুন, কোন রোগে আমি শয্যাশায়ী। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার প্রিয়জনেরা আমার কাছে সবসময় বসে থাকুক। কিন্তু রোগটি যদি ছোঁয়াচে বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কেউ যাতে আমার কাছে বেশী না থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই হবে আমার কর্তব্য। অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক নয় যে, জীবনে ভাবাবেগ বা কল্পনার স্থান নেই। এগুলি না থাকলে জীবনের অনেকখানি মাধুর্যই কেবল নষ্ট হবে না, বিজ্ঞানের অগ্রগতিও বেশ কিছুটা ব্যাহত হবে। তবে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে এগুলির ভূমিকা গৌণ হওয়া উচিত। আমাদের খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য কাজ যদি মূলতঃ সত্যনিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই আমরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী হবো।

সামাজিক উন্নতি ও প্রগতির জন্যে মানসিকতার দিক থেকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হচ্ছে জিজ্ঞাসু মন। আমাদের চারদিকে যা কিছু দেখছি, যত ঘটনা ঘটছে, সেই সব সম্বন্ধে শিশুকাল থেকেই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থাকে। পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেই কৌতূহল আমরা অনেক সময় দমিয়ে দেই, অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে কিন্তু আমরা সেই কৌতূহল যত দূর সম্ভব বাড়িয়ে দিতে এবং তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। যদি কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমরা না জানি, তাহলে বই পড়ে বা অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করে অথবা সম্ভব হলে নিজেরাই পরীক্ষা করে উত্তর জেনে নেব। এই উত্তর খোঁজবার কাজে আমরা ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করবো, যাতে তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে নিজেরাই ক্রমশঃ উদ্যোগী হয়। কোন প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা খোঁজ করেও জানতে না পারি, তবে সেই প্রশ্নে উত্তর জানা নেই বলেই আমরা স্বীকার করবো। এতে লজ্জার কিছু নেই, বরং এতে ছোটরা এই সঠিক ধারণা লাভ করবে যে, অনেক প্রশ্নের উত্তর মানুষের এখনো অজানা, সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। বস্তুতঃ অজানা আছে বলেই তাকে জানবার চেষ্টার মধ্যে বিজ্ঞানের অন্যতম সার্থকতা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নিখুঁত সত্য আমরা কখনোই জানি না।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'গাণিতিক সূত্রগুলি যখন বাস্তব ঘটনার কথা বলে, তখন তারা নিখুঁত নয়। আবার সূত্রগুলি যখন নিখুঁত হয়, তখন তারা বাস্তব ঘটনার কথা বলে না।' তবে পরম সত্য আমাদের জানা না থাকলেও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা তার দিকে ক্রমাগত এগুচ্ছি।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির একটি অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে সব কিছুকে মাপজোখ করা ও পরিমাণগত ভাবে প্রকাশ করবার প্রবণতা। ধরা যাক, কয়েক মাস ধরে আপনার মনে হচ্ছে, আপনার ওজন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 'ওজন কমে যাচ্ছে'—কেবল এ কথা না ভেবে যদি আপনি নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে আপনার ওজন মাপেন এবং কি হারে ওজনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহলে আপনার সেই কাজে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। কিম্বা ধরুন, সন্ধ্যাবেলা আপনি বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে শুনলেন যে, তিনি বিকাল 4টা থেকে 5টার মধ্যে 7 বার টেলিফোনে আপনার সঙ্গে অফিসে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন বারই 'কানেকশান' পান নি। কতবার ও কখন তিনি টেলিফোন করেছেন, সেই সংখ্যা ও সময় যে তিনি খেয়াল করে রেখেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এ সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন।

জ্ঞান ও কর্ম বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সব কিছু সম্বন্ধে পরিমাণগত জ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা করা যেমন বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির একটি দিক, এর তেমনি আর একটি দিক হচ্ছে—আমাদের প্রয়োজন মেটানো ও জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার জন্যে জ্ঞানকে প্রয়োগ করবার নিরন্তর প্রয়াস। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি জানেন, জগৎ পরিবর্তনশীল—আজ যা নৈরাশ্যময় ও হতাশাপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, আমাদের জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে কাল আমরা তাকে আশার আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারবো। চরম দুর্দিনেও মানুষের শক্তিতে আশা ও বিশ্বাস রাখাই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির শেষ কথা।

N-রশ্মি ও নিউট্রন রেডিওগ্রাফী

অরিন্দম ঘোষ

X-রশ্মির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত, চিকিৎসাবিদ্যায় এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষায় যা অপরিহার্য, কিন্তু N-রশ্মি কি? আসলে N-রশ্মি হলো বিশিষ্ট গতিবেগের নিউট্রনের সমষ্টি। নিউট্রন একটি মৌল কণা। নিউট্রন ও প্রোটনের সমবায়ে যে কোন পরমাণুরই কেন্দ্রক গঠিত হয়। কাজেই নিউট্রনের সাহায্যে N-রশ্মি করতে গেলে পরমাণুর কেন্দ্রককে ভাঙতে হবে। X-রশ্মির সাহায্যে যেমন ফটোগ্রাফী নেওয়া যায়, তেমনি নিউট্রনগুচ্ছের সাহায্যেও কোন বস্তুর ফটো নেওয়া সম্ভব, যা নিউট্রন রেডিওগ্রাফী নামে পরিচিত। কিন্তু প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে নিউট্রন আবিষ্কৃত হলেও এর দ্বারা ফটো তোলবার রেওয়াজ তেমন বাড়ে নি, যেমন X-রশ্মির ক্ষেত্রে হয়েছে। এর অবশ্য কারণও আছে। X-রশ্মি যত সহজে উৎপন্ন করা সম্ভব, N-রশ্মি বা নিউট্রন তত সহজে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। নিউট্রনের মূল উৎস নিউক্লীয় চুল্লী। কণাত্বরক যন্ত্রের সাহায্যেও নিউট্রন সৃষ্টি করা যায়। যাই হোক, নিউট্রন রেডিওগ্রাফী নেওয়ার পদ্ধতি দিন দিন উন্নত হচ্ছে, কারণ নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর দ্বারা এমন কতকগুলি কাজ হয়, যা X-রশ্মির দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, N-রশ্মি বা নিউট্রন রেডিওগ্রাফী কখনও X-রশ্মিকে স্থানচ্যুত করবে না বরং এর পরিপূরক হবে।

নিউট্রন রেডিওগ্রাফী কি ভাবে নেওয়া হয়, তা জানতে হলে প্রথমেই বিভিন্ন পদার্থে, X-রশ্মির থেকে N-রশ্মির শোষণ বৈশিষ্ট্য যে বিভিন্ন, সেটা বোঝা দরকার। X-রশ্মি যখন কোন বস্তুর মধ্যে দিয়ে গমন করে, তখন তা বস্তুমধ্যস্থিত ইলেকট্রনগুলির সঙ্গে সংঘাতে আসে। কাজেই ইলেকট্রনসমৃদ্ধ বস্তু সহজেই X-রশ্মি শোষণ করতে পারে। যেমন হাড় বা সীসা, ইউরেনিয়াম, বিসমাথ ইত্যাদির ন্যায় ভারী পরমাণুগুলি; যেগুলির ভিতর দিয়ে আবার তাপীয় নিউট্রনগুলি (যাদের গড়-শক্তি 0·02 ইলেকট্রন-ভোল্ট) সহজেই চলে যেতে পারে। অন্যদিকে আবার এই নিউট্রনগুলি খুব ভালভাবে শোষিত হয় হাল্কা পরমাণু অর্থাৎ হাইড্রোজেন, লিথিয়াম, বোরন ইত্যাদি সমৃদ্ধ বস্তুতে; যেমন রবার, চামড়া, প্লাস্টিক ইত্যাদিতে। অথচ X-রশ্মি এই সব পদার্থের মধ্যে দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারে। কাজেই যদি একটি সীসার নলের মধ্যে কিছু পরিমাণ জল থাকে, তাহলে নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর সাহায্যে সীসার নলের মধ্যে জলের উচ্চতা বলে দেওয়া যায়; কারণ N-রশ্মি অর্থাৎ নিউট্রনগুলি সীসার মধ্যে দিয়েই সহজে ভেদ করে যেতে পারবে, কিন্তু জলের হাইড্রোজেনের দ্বারা শোষিত হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, নিউট্রনের উৎস হলো নিউক্লীয় চুল্লী। চুল্লীর মধ্যে নিউক্লীয় বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রচুর নিউট্রনের সৃষ্টি হয়, যা বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে পাই। এই নিউট্রনগুলি উচ্চতীব্রতার। এখন যে বস্তুটির নিউট্রন রেডিওগ্রাফ করতে হবে, সেটিকে নিউট্রনের উৎস ও ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্মের মাঝখানে রাখা হয়। যদি উৎস থেকে বহিরাগত নিউট্রনসমূহের গতি বা শক্তি খুব বেশী হয়, তাহলে তাদের হাইড্রোজেন বা হাল্কা মৌলযুক্ত কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চালনা করে গতি হ্রাস করানো হয়; অর্থাৎ

এদের তাপীয় নিউট্রনের পর্যায়ে আনা হয়। N-রশ্মির সঙ্গে অনেক সময়ে গামা-রশ্মি মিশ্রিত থাকে। এই গামা-রশ্মি থাকবার ফলে রেডিও-গ্রাফী অনেক সময় ভাল হয়। যেমন, ইউরে-নিয়াম বা ভারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার গামা-রশ্মিসমূহ বিভ্রাট ঘটায়। তাই এদের ফিল্টার বা পরিশোধন করবার দরকার হয়। এটা নানা ভাবে করা যায়। প্রথমতঃ এই গামা-রশ্মিমিশ্রিত N-রশ্মিকে এমন একটি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়, যেটি বিস-মাথের দ্বারা পূর্ণ। বিসমাথ খুব সহজেই গামা-রশ্মিকে শোষণ করতে পারে, কিন্তু N-রশ্মিকে পারে না। আবার অন্য এক উপায়েও গামা-রশ্মিকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। উল্লিখিত বস্তুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবার পর N-রশ্মিকে প্রথমে একটি ধাতব-পর্দায় ফেলা হয়। এখ N-রশ্মির তীব্রতার মাত্রানু-সারে পর্দাটি তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই পর্দাটিতে এখন ধরা থাকলো বস্তুটির তেজস্ক্রিয় ছবি। এইবার যদি ধাতব পদার্থটির পিছনে ফটোগ্রাফিক ফিল্ম রাখা হয়, তবে পর্দা থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ফিল্মটিতে বস্তুর রেডিওগ্রাফ উদ্ভাসিত করে। সাধারণতঃ 5 থেকে 10 মিনিট ধরে উদ্ভাসন করা হয়। এছাড়াও নিউট্রন রেডিওগ্রাফী নেবার আরও অনেক পদ্ধতি আছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নতির চেষ্টা চলছে।

এবার আমরা নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমেই আসা যাক ধাতুবিদ্যায় এর ব্যবহার নিয়ে। কোন ধাতব বস্তুতে যদি হাল্কা মৌল, যথা—হাইড্রোজেন, লিথিয়াম বা বোরন মিশ্রিত থাকে, তাহলে নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর সাহায্যে এদের ঘনত্ব বা এরা কিভাবে ধাতব বস্তুটিতে বিস্তরিত হয়ে আছে, তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, বোরন কার্বাইড মিশ্রিত জির্কোনিয়াম ধাতুর দণ্ড। এগুলি নিউক্লীয় চুল্লীতে নিউট্রন নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখন এই দণ্ডে বোরন ঠিক উপযুক্ত মাত্রায় আছে কিনা অথবা সমভাবে মিশ্রিত আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা রেডিওগ্রাফীর সাহায্যে করা যেতে পারে। কিন্তু X-রশ্মির দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। কারণ বোরন কার্বাইড এবং জির্কোনিয়াম প্রায় একই মাত্রায় X-রশ্মি শোষণ করে। কিন্তু N-রশ্মি বা নিউট্রনগুলি জির্কোনিয়াম অপেক্ষা বোরনের দ্বারা বেশী পরিমাণে শোষিত হয়। কাজেই নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর সাহায্য বোরনের বিতরণ পরীক্ষা করা সম্ভব।

এছাড়াও ধাতুবিদ্যায় নিউট্রন রেডিওগ্রাফের আরও প্রয়োগ আছে। যেমন, ধাতব বস্তুতে ভারী মৌল অর্থাৎ ইউরেনিয়াম বা সীসা ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে। এই সব মৌল X-রশ্মি অপেক্ষা N-রশ্মির কাছে অনেক বেশী স্বচ্ছ। এই সব ধাতব বস্তুর বেধ যখন মাত্র কয়েক ইঞ্চি হয়, তখন X-রশ্মি অপেক্ষা N-রশ্মির দ্বারা রেডিও-গ্রাফ নিতে অনেক কম সময় লাগে। এছাড়া তাপীয় নিউট্রনের আর একটা সুবিধা এই যে, কোন এক গুচ্ছ নিউট্রনের সাহায্যে ইউরেনিয়াম বা সীসার পরীক্ষার পর সেই একই গুচ্ছ অন্য পরীক্ষায় ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন কীট-পতঙ্গ বা জীববিদ্যার বিভিন্ন নমুনার পরীক্ষায় নিউট্রন রেডিওগ্রাফ খুব কাজের হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, নিউট্রন এই সব টিস্যুতে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্ট করে, যা এই সব নমুনার ক্ষেত্রে হানিকর। তাছাড়া অতিরিক্ত হাইড্রোজেনসমৃদ্ধ প্রাণী-টিস্যুতে N-রশ্মি সহজে ভেদ করে যেতে পারে না। হাইড্রোজেনের দ্বারা নিউট্রনের অতিরিক্ত শোষণ —এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ বস্তু, যথা—কাগজ, কাঠ, প্লাষ্টিক বা রাবার ইত্যাদি পরিদর্শন বা পরীক্ষা করা যায়। কোন বস্তুর মধ্যে হাইড্রোজেনের মাত্রা কম বা বেশী থাকলে

অথবা এই সব বস্তুর বেধ মাপবার দরকার হলে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা নিউট্রন রেডিওগ্রাফী অনেকটা সুবিধার হয়।

অনেক সময় একই জিনিসের X-রেডিওগ্রাফ এবং নিউট্রন রেডিওগ্রাফ নেওয়া হয়। যেমন ব্যাটারীর কথা ধরা যাক। ছুটি ব্যাটারী নেওয়া হলো—একটি নতুন এবং অপরটি ব্যবহৃত। ব্যাটারীর মাথার দিকে একটি প্রকোষ্ঠ আছে, যা নতুন ব্যাটারীর ক্ষেত্রে পেষ্টজাতীয় কোন পদার্থের দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই পেষ্ট হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ। এখন নতুন ব্যাটারীটির যদি নিউট্রন ও X-রেডিওগ্রাফ নেওয়া হয়, তবে ঐ খালি প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে X ও N রশ্মি সহজেই চলে যেতে পারবে; কিন্তু ব্যবহৃত ব্যাটারীর ক্ষেত্রে প্রকোষ্ঠে অবস্থিত হাইড্রোজেনসমৃদ্ধ পদার্থের দ্বারা নিউট্রন দারুণভাবে শোষিত হবে, অথচ X-রশ্মি শোষিত হবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নিউট্রন এবং X-রেডিওগ্রাফ একে অন্যের পরিপূরক হতে পারে এবং একই সঙ্গে ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়াও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর ব্যবহার বাড়ছে। মহাকাশ অভিযানে এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে ও হচ্ছে। যেমন অ্যাপোলো কার্যক্রমের প্রায় দু-শ' রকম কলাকৌশল নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন ধাতব সংযোগ ব্যবস্থার পরীক্ষা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মধ্যে কোন জলীয় পদার্থ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা ইত্যাদি। উড়োজাহাজের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর ব্যবহার করা হয়। যেমন টাইটেনিয়াম ওয়েলডিংয়ে হাইড্রোজেন ভেজাল বের করবার ক্ষেত্রে অথবা সীল করা বিভিন্ন কামরার মধ্যে তেল বা তেলজাতীয় কোন পদার্থ থাকলে তা নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব।

এছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অপসারী (Divergent) নিউট্রনগুচ্ছ বিশেষ কাজের হয়। এক্ষেত্রে নিউট্রনগুচ্ছ বা N-রশ্মি নিউট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। যেমন, ধাতুর একক কেলাসে হাইড্রাইড অধঃক্ষেপ পর্যবেক্ষণের কাজে বা অর্ধপরিবাহীতে বোরন, লিথিয়াম ইত্যাদির ব্যাপন পর্যবেক্ষণে নিউট্রনগুচ্ছকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিউট্রন প্রথম আবিষ্কৃত হয় 1932 সালে, আবিষ্কারক জেমস স্যাড্উইক এবং প্রথম নিউট্রন রেডিওগ্রাফী নেওয়া হয় 1935 সালে দু-জন জার্মান বিজ্ঞানী Kallman এবং Khun-এর দ্বারা। এর পর 1960 সাল পর্যন্ত এক্ষেত্রে খুব বিশেষ কিছু কাজ হয় নি। 1960 সালে Argonne National Laboratory-র বিজ্ঞানী Harold Berger নতুন করে এবং ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ করেন। যাই হোক, বর্তমানে নিউট্রন রেডিওগ্রাফীর ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান যেটা দরকার, তা হলো উপযুক্ত এবং সুলভ নিউট্রন উৎস ও যন্ত্রপাতির এবং উচ্চ তীব্রতার বৃহৎ নিউট্রনগুচ্ছের প্রচলন। এসব সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা হলেও এই বিষয়ে আরও মৌলিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান আমাদের দরকার এবং তাহলেই ভবিষ্যতে নিউট্রন রেডিওগ্রাফী—বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিদর্শনের উপযুক্ত হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্কট

হীরেন্দ্রকুমার পাল*

আমার এই নিবন্ধে শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে, আমরা আজ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি, সে প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে দু-চারটি কথা নিবেদন করবো। বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর জীবনে সুদীর্ঘ চার দশক কাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় এবং আপন অধ্যয়নের কাজে ব্যাপৃত থেকে যে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার হয়েছে, তা থেকে বুঝতে পারছি যে, আমাদের শিক্ষার এলাকা থেকে বর্তমান পঙ্কিলতা ও নৈরাজ্য অবিলম্বে দূর করতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে, তা থেকে পরিত্রাণ নেই। খাদ্যে, পানীয়ে, ওষুধপত্রে, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যে, প্রতি পদক্ষেপে আজ যে ভেজালের বেসাতি দেখতে পাই, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তার অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিদ্যা, তথা মননশীলতা ও কৃষ্টির ব্যাপারে অশুচির আমদানী কখনো শুভ হতে পারে না। জাতীয় জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কথাটা যে কতদূর সত্য, তার আঁচ তো আমরা ইতিমধ্যে পেতে আরম্ভ করেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থাকে অব্যাহতভাবে চলতে দিলে বৃহত্তম বিপত্তির জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। কিন্তু ব্যাধির মূল কোথায়, নিদানই বা কি না জেনে এবং সর্বাগ্রে তারই প্রতিকার এবং প্রতিরোধ না করে যে চিকিৎসাই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। পরীক্ষার হলে আজ উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ কি? আসল কারণ যে পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতির অভাব, সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রস্তুতির অভাবই বা ঘটছে কেন, তা গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। বলা বাহুল্য, এর কারণ একটি মাত্র নয়, বহু। প্রথমতঃ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত মানের উপযুক্ত সংখ্যক এবং দুর্মূল্য পাঠ্যপুস্তক কিনে পড়বার সামর্থ্য ক-জন ছাত্রের আছে? কলেজ, লাইব্রেরীর উপরইবা কতটা ভরসা করা যায়? সবাই লাইব্রেরীর দিকে তাকিয়ে থাকলে লাইব্রেরী তার সীমিত সম্বল দিয়ে একসঙ্গে একই পুস্তক দিয়ে ক-জনকে সাহায্য করতে পারে, সেকথাও বিবেচ্য। তদুপরি ধার করা বই তো বেশী দিন ধরে রাখাও যায় না।

একদিকে বিজ্ঞানের রাজ্যে অবিশ্রান্ত দ্রুত গতিতে নিত্য নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন হচ্ছে, আর সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার কলেবর ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে; অন্যদিকে বিদ্যায়তনে পূর্বনির্দিষ্ট আবশ্যিক ছুটিছাটা ছাড়াও অভাবিতপূর্ব স্থায়ী ও সাময়িক বিরতিও আছে। খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আজ এটা, কাল সেটা—বারো মাসে তেরো পার্বণ, যার কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না—নানা অজুহাতে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাতে যথেষ্টই ছেদ পড়ে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাহীন এ দিনগুলিও ছেড়ে দিলে বছরের কয়দিনই বা পড়াশুনার জন্যে উদ্বৃত্ত থাকে? এমতাবস্থায় কোন যাদুমন্ত্রেই

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ; বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

অধ্যাপকের পক্ষে ভারাক্রান্ত বিশাল সিলেবাস-সাগর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া যে সম্ভব নয়, সেটাও বুঝতে হবে। কোন কোন কলেজে আবার 45 মিনিটের পিরিয়ড চালু আছে। এ থেকেও বেশ কয়েক মিনিট বাদ পড়ে ছাত্রদের ক্লাস বদল, roll call এবং ব্ল্যাক বোর্ড মোছবার জন্যে। স্বল্প যে কয়েক মিনিট অবশিষ্ট থাকে নিয়মিত বক্তৃতার জন্যে তা অধীতব্য বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করে ছাত্রদের গোচরে পরিবেশন করবার পক্ষে পর্যাপ্ত বলে নিশ্চয়ই গণ্য করা চলে না। সিলেবাস শেষ না হবার দরুণ বাকী অংশগুলি ছাত্রকে নিজে নিজেই পড়ে নিতে হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যার মত দুরূহ বিষয়টি অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকে রপ্ত করা সাধারণ মেধার ছাত্রের পক্ষে সত্যই কঠিন ব্যাপার, ভাবার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও।

আমার মনে হয়, যে দিন পুরনো শিক্ষা প্রণালী বর্জন করে 'উচ্চ মাধ্যমিক' জগাখিচুড়ির প্রবর্তন হয় আমাদের দেশে, সে দিনই পরীক্ষার জমিতে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়েছিল। সে বৃক্ষই আজ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গলদ কেমন করে দুর্নিবার গোলযোগ ডেকে আনলো, তা-ই খুলে বলছি।

উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞানের যে অংশ প্রবেশ লাভ করছে, তা পুরনো আমলে কলেজের আই এস-সি ক্লাসে পড়ানো হতো। তার জন্যে প্রত্যেক কলেজে থাকতেন উপযুক্ত অধ্যাপক, থাকতো উপযুক্ত লেবোরেটরী, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামাদি। বিজ্ঞানের প্রাথমিক মানসিকতা তৈরীর জন্যে সুরু থেকেই অধ্যাপক তাঁর প্রতিটি বক্তব্য যথাযথ যন্ত্র ও experiment প্রদর্শনের মাধ্যমে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতেন। তাঁর বক্তৃতা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক হতো, অন্য-দিকে তেমনি বিষয়বস্তু বোঝবার, পরিপাক করবার এবং মনে রাখবার পক্ষে সহায়ক হতো। ক্লাসে experiment দেখে দেখে ছাত্রেরা শুধু যে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্টই হতো—তা নয়, তাদের বিজ্ঞান শিক্ষার বুনিয়াদও হতো শক্ত এবং সুদৃঢ়। আই এস-সি ক্লাসে বক্তৃতা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে এত experiment দেখবারও সুযোগ পেতো যে, উপরের ক্লাসগুলিতে বিশেষ ধরণের ছাড়া, অন্য কোন experiment না দেখলেও অধীতব্য বিষয় অনুধাবন করা অসুবিধাজনক হতো না এবং অধ্যাপকের বক্তব্য শুধু তাত্ত্বিক পর্যালোচনাতে নিবদ্ধ থাকলেও চলতো। অধ্যাপকের পাকা হাতে সম্পাদিত পরীক্ষাদি প্রত্যক্ষ করে ছাত্রেরা নিজেরাও নিপুণভাবে experiment করবার শিক্ষা পেতো; পক্ষান্তরে অধ্যাপক মহাশয়ও আপন বক্তব্য পরীক্ষার সাহায্যে সপ্রমাণ করতে পেরে এবং তাঁর শ্রোতৃবৃন্দের সম্ভাব্য সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করেছেন ভেবে, মনে মনে তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভ করতেন। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় কিন্তু কলেজের এই কাজটা গিয়ে বর্তেছে স্কুলের উপর। আর্থিক সঙ্গতি ক্ষীণ বিধায়, অধিকাংশ স্কুলেই উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষক নেই, নেই যথেষ্ট যন্ত্রপাতির সম্বল ও প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি দেখাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা। অথচ পদার্থবিদ্যা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বলে এই প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি দেখা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য। নামকাওয়াস্তে বা সাক্ষীগোপাল এক লেবোরেটরীর সাহায্যে চলছে বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রহসন। আর আজকালকার পাশ করা শিক্ষক, যিনি নিজেই ঐ পরীক্ষাগুলি দেখবার সুযোগে বঞ্চিত, যন্ত্রপাতি হাতে পেলেই কি তিনি সুচারুরূপে সেগুলি দেখিয়ে ছাত্রদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন? এমনও শোনা যায়, কোন কোন বিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার স্নাতককে দিয়ে পদার্থবিদ্যা অথবা পদার্থবিদ্যার স্নাতককে দিয়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ানো হচ্ছে।

যুক্তিটা হলো—বিজ্ঞানের স্নাতক তো! তাঁদের বিদ্যার ভাণ্ডারে যথোচিত মূলধনের অভাবে, জীবনসংগ্রামের তাড়নায় বিদ্যালয়ের বাইরে শক্তির অপচয় প্রভৃতি কারণে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষাদানের কাজে উৎসাহ, উদ্যোগের মাত্রা খুবই সীমিত হতে বাধ্য। অতএব স্পষ্টতঃই উচ্চমাধ্যমিকের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ সুষ্ঠু বিজ্ঞান শিক্ষার অনুকূল নয় বলা চলে।

কলেজে পদার্থবিদ্যা শিক্ষণের বর্তমান ধারা সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। ক্লাসে experiment দেখাবার পালা স্কুলের কাজ, স্কুলেই শেষ হয়ে গেছে ভেবে বক্তৃতায় পরিপূরক হিসাবে কোন experiment বা যন্ত্র দেখাবার আবশ্যকতা অথবা ঔচিত্য অনুভূত হয় না। তার জন্যে পর্যাপ্ত সময়ও নেই হাতে। কেন না, সামনে ভারাক্রান্ত, দুস্তর সিলেবাসের বিভীষিকা। ক্লাসে experiment দেখানো হয় না বলে নতুন কলেজগুলিতে তার জন্যে কোন যন্ত্রসম্পদ ও মজুদ রাখা হয় না। ওয়ার্কশপ-এর ব্যবস্থা না রেখেই নতুন কলেজ পদার্থবিদ্যায় অনার্স-ক্লাসের বক্তৃতা এখন প্রায় ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুঁথিতে ছাপার অক্ষরে যা লিখেছে, তাই চোখ বুজে বেদবাক্যরূপে সভক্তি গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করে যেতে হবে, ধারণার অস্পষ্টতা সত্ত্বেও। এছাড়া উপায় নেই। যন্ত্রপাতির অভাবের জন্যে শুধু কলেজের আর্থিক অনটনই দায়ী নয়; সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার কৃচ্ছ্রতা ও উচ্চমানের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদি বিদেশ থেকে আমদানী করবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। অথচ দেশেও সেগুলি তৈরী হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিৎ গড়ে উঠেছে ইলেকট্রন, এক্স-রে প্রভৃতি ঘটিত যে সব পরীক্ষার উপর, যেগুলি অন্ততঃ অনার্স ছাত্রদের দেখা উচিত—সেই সব পরীক্ষা প্রদর্শনের যন্ত্রপাতি ইদানীং গজিয়েওঠা বহু ত্রিতল প্রাসাদোপম অট্টালিকাবিশিষ্ট কলেজেরও নেই।

উচ্চ মাধ্যমিকে কি কি পড়ানো হয়েছে এবং কি ভাবে পড়ানো হয়েছে, আঁচ করতে না পেরে কলেজের অধ্যাপকেরা প্রায় সব জিনিষই ভূমিকাস্বরূপ নতুন করে পড়াতে বাধ্য হন, তাঁদের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার জন্যে। এতে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং স্কুলের শিক্ষারও সার্থকতা থাকে না। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, পঠিতব্য বিষয়ের কোন কোন অংশ উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ানো হয়ে গেছে ধরে নিয়ে অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতা থেকে ঐ অংশ সম্বন্ধে বাদ দেন। প্রকৃতপক্ষে সে অংশ পরে কলেজে পড়ানো হবে বলে হয়তো স্কুলেও বাদ পড়েছে। ফল দাঁড়ালো—সে অংশ পড়ুয়ার জ্ঞান-ভাণ্ডারে কোন কালেই স্থান পেলো না—না পেলো স্কুলে, না কলেজে। অতএব সেখানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা ভরাট হবার সুযোগ ছাত্রজীবনে কিম্বা ইহজীবনেও না ঘটবারই সম্ভাবনা।

আরও আছে। প্রাক-স্নাতক practical class-এর একটা অসঙ্গতিও এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করি। পুরনো যুগে নীচের ক্লাসে আগে থিয়োরী পড়ানো হয়ে গেলে উপরের ক্লাসে গিয়ে সে বিষয়ের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি করতে হতো। এতে ছাত্র এবং অধ্যাপক উভয়েরই কাজের সুবিধা হতো। চলতি নিয়মে কিন্তু থিয়োরী কবে পড়ানো হবে, তার নেই ঠিক, অথচ সংশ্লিষ্ট প্র্যাকটিক্যাল কাজটি আগেভাগে করে ফেলতে হবে। এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়া আর কি! এটা বুদ্ধির অগম্য যে থিয়োরী ক্লাসে যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা আলোচনা হলো না, সে বিষয়ক প্র্যাকটিক্যাল কাজ আগে কি করে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। experiment-এর ব্যাপারে থিয়োরী হলো পথ-প্রদর্শক। কি করতে হবে, কেন করতে

হবে, কি ভাবে করতে হবে, কোথায় কি পরিমাণ ভুল হতে পারে, কোথায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, experiment সম্বন্ধে কি কি মৌখিক প্রশ্ন হতে পারে, এসবের সঠিক ধারণা ছাড়া, কিছু না বুঝে ফাঁকা মনে শুধু অন্ধের মত আবোলতাবোল যন্ত্র নাড়াচাড়া করলেই কি প্র্যাকটিক্যাল করা হলো? বলা বাহুল্য, এতে experiment-এর প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ছাত্রকে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, তার হাতে যন্ত্র নষ্ট হয়, তাকে হাজারো ত্রুটির মাশুল গুণতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ অধ্যাপকের শরণাপন্ন হতে হয়। অধ্যাপকই বা ক-জন ছাত্রের দাবী মিটাতে পারেন এক সঙ্গে? আরো শোচনীয় ব্যাপার হলো, থিয়োরী পড়া যখন সমাপ্ত হয়ে যায়, তার আলোকে তখন experiment-এর পুনরাবৃত্তি করবারও আর যথেষ্ট সময় থাকে না। একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ এই সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নন

এই পরিস্থিতির মধ্যেই গড়ে উঠছেন, যাঁরা ভাবীকালের বিজ্ঞান শিক্ষাদাতারূপে আমন্ত্রিত হবেন। এর অশুভ, বিরূপ প্রতিফল যে চক্রবৃদ্ধি হারে প্রজন্মের পর প্রজন্মের উপর গিয়ে বর্তাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

বলা হয় যে, আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। তাই বলে সকলকেই বিজ্ঞানে 'উচ্চশিক্ষিত' হতে হবে এমন কি কথা? তবু প্রত্যেক পিতামাতাই চান নিজ সন্তানকে বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা দিতে। বছরে বছরে বিপুল সংখ্যক ছাত্র আসে অভিভাবকের তাড়া খেয়ে বিজ্ঞান পড়তে কলেজে। মেধা, আগ্রহ, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়ের মাপকাঠিতে এদের কয়জনের বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্যতা আছে, দুঃখের বিষয়, অভিভাবকেরা তা খতিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁরা আশাবাদী। আর কলেজের কর্তৃপক্ষ চান কলেজ চালু রাখবার জন্যে, তার আর্থিক দায়দায়িত্ব মিটাবার জন্যে, ছাত্র সংগ্রহ। কাজেই admission test-এর সময় যে ছাত্র অযোগ্য বিবেচিত হলো, তাকেও অনেক সময় ভর্তি করতে হয়। অতএব প্রতি বছরেই বিজ্ঞানের ক্লাসগুলি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ উচ্চ শিক্ষার প্রতি এক নির্বিচার মোহ আমাদের এমন পেয়ে বসেছে যে, জগতের অন্য কোথাও তার তুলনা মেলা ভার। উচ্চ শিক্ষার দিকে এই ঝোঁক সংযত করতে না পারলে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা বেশী।

একেই তো শিক্ষায় ব্যয়বাহুল্য, ভারাক্রান্ত পাঠ্যতালিকা, সঙ্কুচিত অধ্যয়নকাল, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি জগদ্দল পাষাণের মত ছাত্রসমাজের কাঁধে এসে ভর করেছে, তার উপর আবার চেপে বসেছে, বোঝার উপর শাকের আঁটির মত সমসাময়িক রাজনীতির প্রকোপ আর নানা 'ism'-এর সাধনা। এতে "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" নামক আপ্ত বাক্যটি আজ উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পটভূমিতে বুঝতে কষ্ট হয় না, কেন পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতিতে থাকে এত অপূর্ণতা, এত গলদ। যথার্থ শিক্ষিত হবার পরিবর্তে এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, যেন তেন প্রকারেণ একটা ডিগ্রী লাভ। তবে একথা খুবই সত্য যে, পরীক্ষার্থীরা সকলেই আগে থেকে টোকাটুকির মতলব এঁটে পরীক্ষার হলে ঢোকে না। কেউ কেউ অবাধে এই কর্ম করে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে দেখেই অন্যান্য নিরীহ ছাত্রেরাও প্রলুব্ধ হয়। দেখতে দেখতে দুর্নীতি সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে ও গণ-টোকাটুকিতে পরিণত হয়। ফলে, পরীক্ষার নামে চলে পরীক্ষার প্রহসন। এটা ভাবতেও কষ্ট বোধ হয় যে, যাঁরা ভাবী কালের শিক্ষকরূপে জাতি গঠনের কাজে ব্রতী হবেন, তাঁরাও সন্দেহের উর্ধ্বে জনমানসে চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারবেন না।

পরীক্ষার্থীদেরও উপলব্ধি করা দরকার যে, এই দারুণ বেকার সমস্যার যুগে শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ডিগ্রীর জোরেই চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। কেন না, বর্তমান রীতি অনুযায়ী প্রার্থীর জ্ঞান ও যোগ্যতা যাচাই হবে নির্বাচক মণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়, মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। এমতাবস্থায়, যথার্থ বিদ্যার পরিচয় না দিয়ে টোকাটুকির সাহায্যে পরীক্ষা পাশ-এর সার্থকতা কি, লাভই বা কোথায়? দুর্নীতিদগ্ধ অনার্স ডিগ্রী নিশ্চয়ই বিবেকসম্মত কিংবা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, যেহেতু দুর্নীতি এবং অনার্স পরস্পর বিরোধী ধারণা।

উল্টা পিরামিড সদৃশ এই শিক্ষা ব্যবস্থা কোন মহৎ উদ্দেশ্যই সাধন করতে পারছে না। অধিকন্তু একটি গোটা জাতিকে যে তিলে তিলে অধঃপাতে প্রেরণের পথ সুপ্রশস্ত করে দিচ্ছে, তার লক্ষণগুলি চোখের সামনেই একে একে প্রকট হয়ে উঠছে। ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি প্রমাণ করে দিচ্ছে প্রজ্ঞা, ধী এবং প্রতিভার ক্ষেত্রে আজ আমাদের কি নিদারুণ দৈন্য ও বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের অঙ্গনে আর একজন জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ অথবা মেঘনাদ সাহা পেতে কত কাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে—কে জানে? অতএব কালবিলম্ব না করে বিদ্যার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুর্জয় সমস্যা ও সঙ্কট আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার সমাধান ও প্রতিবিধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, প্রাক্‌স্বাধীনতা আমলের শিক্ষার ছকে অর্থাৎ চলিত উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থা তুলে দিয়ে দশম শ্রেণীতে প্রত্যাবর্তনের যে সিদ্ধান্ত শিক্ষানায়কেরা রূপান্তরিত করতে চলেছেন। তা একটি সঠিক পদক্ষেপ বলেই মনে করি। তবে এটাই শেষ কথা হতে পারে না। যে দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তার গভীরতা ও বিষক্রিয়া বিবেচনা করে আমাদের আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। একটা নতুন কিছু করবার উন্মাদনায় অধৈর্য হয়ে এবং উন্নত দেশগুলির অন্ধ অনুকরণেই মঙ্গল নিহিত ভেবে যে অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্য-কারিতার পরিচয় দেওয়া হয়ে গেছে, তাকে এখন কেবল দোষারোপ করে কোনই লাভ হবে না। বরং এখনই—এই মুহূর্তেই রাশ টেনে ধরতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থার এমন সুনিশ্চিত সংস্কার সাধন করতে হবে, যাতে জাতীয় জীবন তার সর্ববিধ ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে শুচি, শুদ্ধ ও ভাস্বর হয়ে ওঠে। তবেই জাতি জগৎ সভার যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। দেশের চিন্তানায়ক, শিক্ষাবিদ্ ও নেতৃবৃন্দের সামনে এটাই হলো আজকের দিনের প্রধান কাজ। মূল ব্যাধির সুচিকিৎসা হলে অন্যান্য উপসর্গ দূর হতে বিলম্ব হবে না।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক শুদ্ধোদন ঘোষ

অধ্যাপক শুদ্ধোদন ঘোষের জন্ম হয় 6ই জুলাই, 1896 সালে কলকাতার এক বিখ্যাত পরিবারে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় দায়রা জজ (Sessions Judge) ৺হরচন্দ্র ঘোষ এই পরিবারের একজন। অধ্যাপক ঘোষ অতিশয় মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি (গণিত অনার্স) (1918) পরীক্ষায় ও এম. এস-সি (মিশ্র-গণিত বর্তমানে ফলিত গণিত) (1920) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি এম. এস-সি পড়বার সময়ে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক তত্ত্ব (Mathematical theory of elasticity) তাঁর বিশেষ বিষয় হিসাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি আচার্য সত্যেন্দ্র-নাথের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

এম এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথমে স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক তত্ত্বে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং পরে উদগতি বিজ্ঞানেও (Hydrodynamics) গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি ফলিত গণিতে সার রাসবিহারী ঘোষ গবেষক-বৃত্তিধারী ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি ফলিত গণিতের তদানীন্তন 'সার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক'—অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের নির্দে-শনায় গবেষণা করেন। তিনি তাঁর গবেষণায় সাফল্যের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1925 সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, 1927 সালে মোয়াট (Mouat) পদক এবং 1928 সালে ডি. এস-সি ডিগ্রি পান। তাঁর গবেষণার জন্যে তিনি গণিতজ্ঞ হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। 1951 সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদামির (Indian National Science Academy) ফেলো (Fellow) নির্বাচিত হন।

1930 সাল থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে লেকচারার হিসাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যাপনা সুরু করেন। এর পূর্বে তিনি অল্পসময়ের জন্যে সাময়িকভাবে ঐ বিভাগে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন। 1960 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতের সার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক ও ফলিত গণিতের বিভাগীয় প্রধান হন এবং 1962 সালে অবসর প্রাপ্ত হন। তিনি স্বল্পকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন এবং ঐ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানও হয়েছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি সমস্ত ছাত্রদের ও সহ-কর্মিগণের প্রীতি, প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে-ছিলেন। তিনি স্থিতিস্থাপকতার গাণিতিক তত্ত্বে এবং উদগতি বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার নির্দেশনা দিতেন।

কলিকাতা গণিত সমিতি (Calcutta Mathematical Society) এক সময়ে তার ত্রৈমাসিক পত্রিকা (Bulletin) প্রকাশ করা নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছিল। সে সময়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলিকাতা গণিত সমিতিকে ঐ পত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি কিছু সময় ঐ সমিতির সম্পাদকীয় কর্মসচিবও (Editorial Secretary) ছিলেন। তাঁর জীবনসায়াহ্নে তিনি ঐ সমিতির সাম্মানিক সভ্যপদে বৃত হয়েছিলেন।

তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবন অধ্যাপনা, উচ্চতর জ্ঞানানুশীলন ও গবেষণায় উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। অনেকে এজন্যে তাঁর প্রতি

খুব প্রচারবিমুখ ছিলেন। মৃত্যুর (6ই মে, 1976) পূর্বে দীর্ঘকাল রোগভোগের সময় তাঁর ছাত্রেরা বিশেষ করে তাঁর দুটি শ্রদ্ধানুরতা ছাত্রী (ডক্টর লক্ষ্মী সান্যাল এম. এ., পি. এইচ-ডি. ও শ্রীমতী মীনা মজুমদার, এম. এস-সি) তাঁর সেবাশুশ্রূষার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

তিনি মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আহুত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এজন্যে তিনি 1921 সালে কিছু দিনের জন্যে কারারুদ্ধ হন। তিনি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সরল ও উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন করতেন এবং নিজের হাতে কাটা সুতার তৈরী খাদিবস্ত্রাদি ব্যবহার করতেন। তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা নিজের নাম উল্লেখ না করে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করেন এবং অনেক দুঃস্থ ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করেন। তাঁর মৃত্যুর সপ্তাহ খানেক আগে তাঁর ভাস্বর বিদ্যাভ্যাসের জীবনে কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে যে সব স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন, সেগুলি তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ করা হয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে ধন-ভাণ্ডার সৃষ্টির জন্যে। তাঁকে তাঁর মায়ের দেওয়া একটি মোহর (যা তিনি স্মারক হিসাবে রেখেছিলেন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে দান করেন এই সঙ্গে।

পরিমলকান্তি ঘোষ

অধ্যাপক শুদ্ধোদন ঘোষের স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। যাঁরা এই বিষয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তাঁরা দয়া করে বিভাগীয় প্রধান, ফলিত গণিত বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, 92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-700009 এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।—লেখক

পরিমল গোস্বামী

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিমল গোস্বামী 26শে জুন '76 পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সব সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, পরিমল গোস্বামী তাঁদের অন্যতম। 1897 সালে ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলা দেশের অন্তর্গত) রতনদিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা স্বর্গতঃ বিহারীলাল গোস্বামী ছিলেন সেকালের একজন নামকরা সাহিত্যিক। পরিমল গোস্বামীর বাল্যের লেখাপড়া পাবনা জেলার গ্রামে (অধুনা বাংলা দেশের অন্তর্গত)—রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য সাজাদপুরের কাছাকাছি। পনেরো বছর বয়সে পাবনার সাপ্তাহিক স্বরাজ পত্রিকায় সাপ্তাহিক সংবাদের লেখক হিসাবে সাহিত্য সাংবাদিকতার জগতে তাঁর প্রবেশ। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সেই জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বজায় ছিল।

বাল্যের লেখাপড়া শেষ করে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে তিনি শিক্ষালাভ করেন। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসে সাহিত্যের রসধারায় অবগাহন করেন। তাঁর শিল্পকথা ও সাহিত্যের পাঠ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। এম. এ পাশ করবার পর প্রবাসী, শনিবারের চিঠির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 1931 সালে কলকাতার এক বীমা কোম্পানীর প্রচার পুস্তিকা লেখবার চাকুরী করবার সময় তাঁর সম্পাদক জীবনের সুরু। ছোট বড় নানা কাগজে ছোট বড় স্কেচ লেখা সুরু করেন তারও আগে 1920 সালে। 1927 সালে বিচিত্রা পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি শনিবারের চিঠি সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া তিনি সচিত্র ভারত (সাপ্তাহিক), অলকা (মাসিক), নতুন পত্রও (মাসিক) সম্পাদনা করেছেন। 1945-1964 সাল পর্যন্ত তিনি যুগান্তর সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন। এক সময়ে নানা সংস্থায় প্রচার অধ্যক্ষরূপে এবং বেতার ভাষ্যকার হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। প্রবন্ধ, গল্প ও রম্য রচনায় তিনি খ্যাতিলাভ করেন। বিজ্ঞান, ভাষা, পরিভাষা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সাহিত্য কীর্তি ছাড়াও তাঁর আর একটি গুণ ছিল—তিনি বৈঠকী গল্পে মশগুল করে রাখতেন আসরকে।

1970 সালে যুগান্তর-অমৃতবাজার পক্ষ থেকে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—1976

ঊনত্রিশত্তম বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা
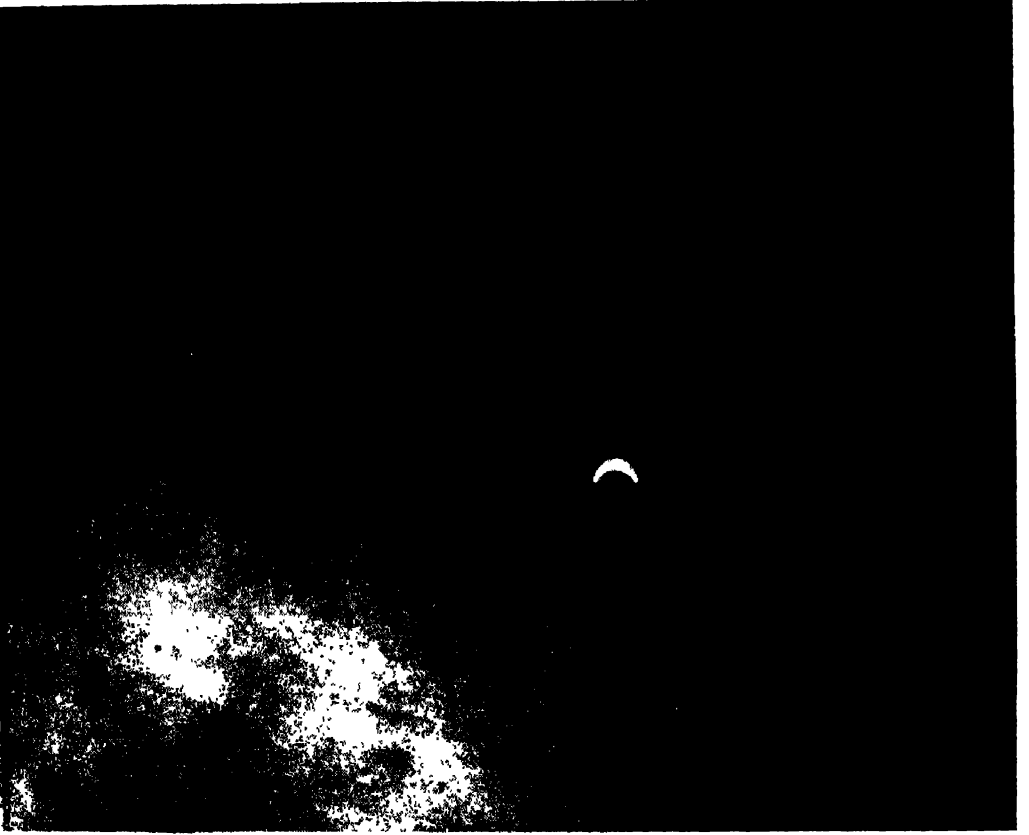
ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ভাইকিং-2 নামক রকেট মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠানো হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে এর মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করবার সম্ভাবনা। এই রকেটে স্থাপিত টেলিভিসন-ক্যামেরার সাহায্যে 20,600,000 কিলোমিটার দূর থেকে তোলা পৃথিবীর ফটোগ্রাফ।

হার্টল আলোকচক্রের সংশোধন এবং কয়েকটি নূতন পরীক্ষা

হার্টল নির্মিত আলোকযন্ত্রকে হার্টল আলোকচক্র বলা যায়। এরই সাহায্যে আমরা আলোকরশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রাবলী প্রমাণ করতে তো পারিই, অধিকন্তু স্বচ্ছ কঠিন মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কও নির্ণয় করতে পারি।

কিন্তু আমরা যদি হার্টল আলোকচক্রকে একটু নূতনভাবে তৈরী করি, তবে ঐ চক্রের সাহায্যে (1) তরলের (স্বচ্ছ) প্রতিসরণাঙ্ক, (2) ঐ তরল ও বায়ু-মাধ্যমের সন্ধি কোণ (Critical angle) ও (3) আপতিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর তরলের প্রতিসরণাঙ্কের নির্ভরতা—এই নূতন পরীক্ষা করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে হার্টলের আলোকচক্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণটা দেওয়া যাক। A দণ্ডের উপর স্থাপিত ও চারপাদে বিভক্ত একটি অংশাঙ্কিত চক্রের 0° কেন্দ্র প্রত্যেক পাদের পরিধি 0°–90° ডিগ্রীতে অংশাঙ্কন করা থাকে। চক্রকে অনুভূমিক অক্ষের চতুর্দিকে
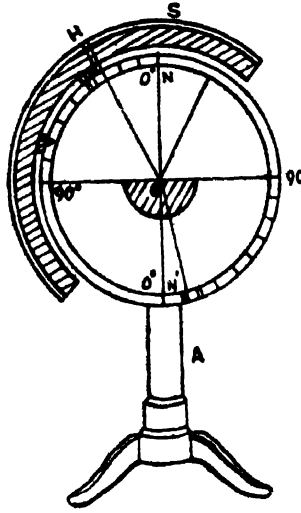
1নং চিত্র

লম্বতলে ঘোরানো যায়। সাধারণতঃ 90°–90° রেখা অনুভূমিক ও 0°–0° রেখা উলম্ব অবস্থায় থাকে। S ধাতব পর্দা চক্রের অর্ধেক পরিধি ঘিরে আছে। পর্দাকে হাতলের সাহায্যে ঘোরানো যায়। পর্দায় সরু ছিদ্র H থাকে, এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চক্রের গা ঘেঁষে 0° কেন্দ্রে ফেলা হয় (1নং চিত্র)।

আলোকচক্রের সংশোধন

আলোকচক্রের সংশোধন করবার পূর্বে প্রথমে একটি আয়তকার কাচপাত্র প্রস্তুত করতে হবে। কাচপাত্রের কাচ পাতলা হওয়া আবশ্যক। কাচপাত্রের দৈর্ঘ্য

মোটামুটি ব্যাসার্ধের চেয়ে সামান্য বেশী এবং প্রস্থ ব্যাসার্ধের চেয়ে সামান্য কম। বেধ সাধারণতঃ 1 ইঞ্চি হলেই ভাল। কাচ জোড়া দেবার আঠা দিয়ে পাত্রটি এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে কাচপাত্রের গায়ে আঠা না লাগে। পাত্রটি যাতে পরিষ্কার ও তাতে ছিদ্র না থাকে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এবার চক্রটিতে কিছু সংশোধন করতে হবে (i) তিনটি স্প্রীং ক্ল্যাম্প ঐ চক্রটিতে লাগাতে হবে, এদের মধ্যে দুটি কাচপাত্রের দৈর্ঘ্যানুযায়ী 90°—90° রেখার উপর এবং অপরটি কাচপাত্রের তলের দিকে প্রস্থানুসারে 0°—0° রেখার উপর। স্প্রীংগুলির দ্বারা কাচপাত্রকে চক্রের গায়ে আটকানো যায়। (ii) চক্রের নীচের অর্ধেকের বৃত্তাকার
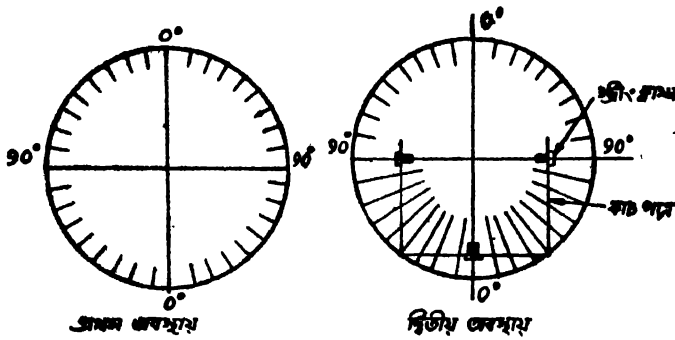
2নং চিত্র

স্কেল, যা 0° – 90° ভাগে কাটা থাকে, তার কিছু পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তনটা হলো স্কেলের দাগগুলিকে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে ব্যাসার্ধের অর্ধেক পর্যন্ত টানতে হবে (2নং চিত্র)। ফলে পাঠ নেবার সুবিধা হবে।

পরীক্ষাপর্ব—(1) তরলের প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয়

কাচপাত্রটি এমনভাবে চক্রের গায়ে বসাতে হবে, যাতে ঐ পাত্রের তরল তল এবং 90°—90° রেখা একেবারে মিলে যায়। ফলে তরলের উপর 0°—0° রেখা লম্বভাবে থাকে। এখন ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চক্রের কেন্দ্রস্থল দিয়ে তরলের উপর আপতিত হয়। আলোকরশ্মি তরলের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়। আপতন ও প্রতিসরণ কোণের পাঠ ডিগ্রী স্কেল থেকে নেওয়া হয়। প্রতিসরণ কোণের পাঠ সাবধানে এমন ভাবে নিতে হবে যে, পাঠ নেবার সময় দৃষ্টি যেন কাচপাত্রের উপর দিয়ে স্কেলের উপর লম্বভাবে পড়ে। তারপর $\mu=$ প্রতিসরণাঙ্ক $= \frac{\text{আপতন কোণের সাইন}}{\text{প্রতিসরণ কোণের সাইন}}$ এই সূত্রানুসারে প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। দেখা গেছে প্রতিক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফল উক্ত তরলের (যে তরল নেওয়া হয়) নিজ প্রতিসরণাঙ্কের (Standard value) সঙ্গে মিলে যায়।

পরীক্ষাপর্ব—(2) আপতিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (λ) উপর প্রতিসরণাঙ্কের (μ) নির্ভরতা বিশ্লেষণ

স্বচ্ছ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের মান আলোর বর্ণের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ এই মান আপতিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তটি এই—একই মাধ্যমের ক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে প্রতিসরণাঙ্ক হ্রাস পায়। তরলের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। এই সম্পর্কে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে x-অক্ষ ও তরলের
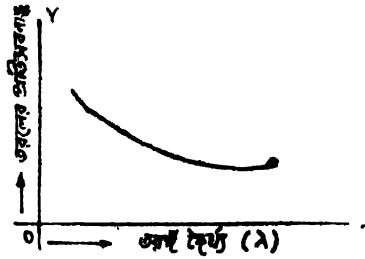
3নং চিত্র

প্রতিসরণাঙ্ককে y-অক্ষ বরাবর ধরে লেখচিত্র অঙ্কন করলে তার প্রকৃতি হবে 3নং চিত্রের মত। সব তরলের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

পরীক্ষাপর্ব—(3) বায়ু ও উক্ত তরলের মধ্যে সন্ধি কোণ নির্ণয়

সন্ধি কোণ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই পর্দাটিকে ঘুরিয়ে নীচের অর্ধবৃত্তে আনতে হবে। এবার ছিদ্রটিকে একটু একটু করে সরিয়ে এবং আলোকরশ্মি ফেলে দেখতে হবে যে, কোন্ আলোক রশ্মির ক্ষেত্রে প্রতিসরিত রশ্মি তরল তল অর্থাৎ 90° – 90° রেখা দিয়ে যায়। এই অবস্থায় আপতন কোণের যে পাঠ পাওয়া যাবে, তাই সন্ধি কোণ। এক্ষেত্রেও পাঠ নেবার সময় কাচপাত্রের উপর দিয়ে লম্বভাবে পাঠ নিতে হবে। একবার 0° থেকে ঐ অবস্থানে এবং পরে 90° থেকে ঐ অবস্থানে নিয়ে দু-বার পাঠের গড় নিলেই সন্ধি কোণের মান পাওয়া যায়। এথেকে সন্ধি কোণের বেশী কোণ করে আপতিত রশ্মি ফেলে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনও দেখানো যায়।

[এখানে তরল বলতে স্বচ্ছ তরল পদার্থ বুঝতে হবে। হার্টল আলোকচক্রটিতে মিনিট পর্যন্ত (ডিগ্রীকে 60 ভাগে ভাগ করে) স্কেল অঙ্কিত করা যায়, তবে পাঠ নেওয়া সঠিক হবে এবং মানও সঠিক পাওয়া যাবে। নতুবা সামান্য ভুল হওয়া খুবই সম্ভব।]

শ্রীসমরকুমার বসাক

মিটারের আশ্চর্য কাহিনী

সত্যের সাধনা করতে গিয়ে জ্ঞানতপস্বীরা যুগে যুগে নির্যাতন ভোগ করে গেছেন। কত না সক্রেটিস, আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও যে অন্ধতার শিকার হয়েছেন, তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মাপজোখের মান ঠিক করবার মত একটা নিরীহ ব্যাপার নিয়েও কি পরিমাণ উদ্ভট কাণ্ড ঘটতে পারে, সে কথা ভাবলে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

এযুগে দৈর্ঘ্য মাপবার একক হিসাবে মিটার-কিলোমিটারের ব্যবহার তো সারা বিশ্বে প্রচলিত। কিন্তু কখন কিভাবে এই পরিমাপ পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছিল, তা আজ আর কেউ মনে রাখে নি। সে ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি এক অপরাজেয় জীবনসংগ্রামের কাহিনী।

সময়কাল অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক। ফরাসী অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের দুই সদস্য ডোমিনিক ফ্রাঙ্কোই জিন আরাগো এবং জিন ব্যাপটিস্টে বায়ো তখন এক আশ্চর্য হিসাবনিকাশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন স্পেনদেশে। কাজ শেষ হবার পর বায়ো ফিরে গেলেন প্যারিসে। আরাগো কিছু টুকিটাকি কাজ সারবার জন্যে থেকে গেলেন এবং সেই থেকে যাওয়াটাই হলো কাল। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী ঠিক ঐ সময়টাতেই স্পেন আক্রমণ করলো। সঙ্গে সঙ্গেই বন্দী হলেন আরাগো। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হলো গুরুতর অভিযোগ। কি করেছিলেন তিনি?

1788-89 সালে ফ্রান্সের বহু শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে সরকারের কাছে অনুরোধ আসতে লাগলো দৈর্ঘ্য মাপবার একটা সাধারণ মান স্থির করে দেবার জন্যে। দেশের এক এক অঞ্চলে তখন এক এক রকমের মাপ প্রচলিত। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ব্যাপারে প্রায়ই দেখা দিত ঝগড়াঝাটি, অশান্তি। সমস্যা যে কতটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তা জাতীয় পরিষদের সামনে তুলে ধরলেন চার্লস ম্যারুইস এবং আটুনের বিশপ। বিষয়টিকে অত্যন্ত জরুরী বলে স্বীকার করে নিলেন ফরসী সরকারও।

ফরাসী অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের উদ্যোগে গঠিত হলো এক উচ্চশক্তিসম্পন্ন কমিটি। চার্লস ডি বোর্ডা, ল্যাগারেঞ্জ, মারকুইস ডি লাপ্লাস প্রভৃতি সেকালের বহু নামজাদা মানুষ ছিলেন ঐ কমিটির সদস্য। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্তরেখার যা দৈর্ঘ্য, তারই ক্ষুদ্র এক দশমিক ভগ্নাংশকে মাপের একক করা হোক। বহু দিন আগে বিশিষ্ট ভূগোলবিশারদ রাইগোবার্ট বন যে অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, কমিটির সিদ্ধান্ত তারও স্বীকৃতি বটে।

1791 সালের 30শে মার্চ কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করলো ফরাসী জাতীয় পরিষদ।

তাতে বলা হলো, নিরক্ষবৃত্তরেখার এক চতুর্থাংশ যতটা, তার কোটি ভাগের এক ভাগ হবে দৈর্ঘ্য মাপবার একক।

কিন্তু সিদ্ধান্ত এক জিনিষ, আর তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হলো অন্য জিনিষ। কিভাবে পাওয়া যাবে ঐ মাপের নির্ভুল হিসাবে, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। তবে বৃথা সময় নষ্ট না করে তক্ষুণি কাজের দায়িত্বভার দেয়া হলো দু-জন বিশেষজ্ঞ—স্পেনের মিচেইন এবং ফ্রান্সের ডিল্যাম্বারের উপর। তাঁরা একটি ভৌগোলিক বৃত্তাংশ ঠিক করে নিয়ে কাজে লেগে গেলেন। ফ্রান্সের ডানকার্ক থেকে স্পেনের মনট জুয়ি পর্যন্ত সোজা দূরত্বকে নির্বাচিত করা হলো নির্দিষ্ট বৃত্তাংশ হিসাবে।

বৈজ্ঞানিক অভিযান কিম্বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে সময়টা ছিল খুবই খারাপ। 1789 সাল থেকে সুরু হয়ে গেছে যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব। সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের মুণ্ড কাটা গেছে, সামনে চলেছে অভিজাতদের নিধনপর্ব। চারদিকে তখন ধ্বংস আর আতঙ্কের আবহাওয়া।

ডিল্যাম্বারের হিম্মৎ আছে। এমন একটা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে দ্বিধা করেন নি। বাধা দেখা দিয়েছিল অনেক। যে স্তম্ভগুলির শীর্ষে ঘণ্টা বাজতো, নেহাৎ ধনীদের তৈরী বলেই সেই বেল-টাওয়ারগুলিকে বিদ্রোহীরা বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অথচ সেগুলি থাকলে মাপজোখের কতই না সুবিধা হতো। ডিল্যাম্বার তখন বাধ্য হয়েই পর পর অনেকগুলি কাঠের গম্বুজ তৈরী করলেন। দূর থেকে যাতে সহজে লক্ষ্য করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে সাদা লিনেন দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো গম্বুজের চূড়া। স্থানীয় কৃষকেরা এতে দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিল। সাদা রং হলো নির্মম ফরাসী রাজতন্ত্রের প্রতীক। তারা মনে করলো সেই প্রতীককেই বুঝি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হচ্ছে। শেষে ঐ লিনেনের গায়ে লম্বালম্বিভাবে কিছু সরু সরু লাল-নীল ফিতা সেলাই করে দেবার পর তবেই ক্রুদ্ধ কৃষকদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হয়েছিল।

তবুও ফ্রান্সকে ভাল বলতে হবে। ধর্মান্ধ স্পেনে দেখা দিয়েছিল আরও মারাত্মক অবস্থা। সে দেশে রয়েছে উঁচু টাওয়ারওয়ালা অসংখ্য গীর্জা—যা সার্ভের কাজকে অনায়াসেই সহজ করে দিতে পারতো। কিন্তু মিচেইন সে সুযোগ পেলেন না। বিজ্ঞানী বলেই তাঁকে কোন গীর্জায় ঢুকতে দেয়া হলো না! স্প্যানিশ ধর্মগুরুদের চোখে তখন বিজ্ঞানী এবং ঈশ্বরবিরোধীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবুও যা হোক করে মিচেইন তাঁর দায়িত্বপালন করতে লাগলেন।

এই সময় ঐ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো প্লেগ মহামারী। বিপদে পড়লেন মিচেইন। জনসাধারণের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো, নচ্ছার বিজ্ঞানীটার পাপেই দেখা দিয়েছে কালব্যাধি। তিনি কেবল স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করবার অধিকারই হারালেন না, সেই সঙ্গে ভিনিগার ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হলো তার সব কাগজপত্র। ছোটখাটো উৎপাত তো চলতেই থাকলো।

ভীতসন্ত্রস্ত মিচেইন অবশেষে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির কাছে পাঠালেন পদত্যাগপত্র। কিন্তু তার জবাব আসবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

ফরাসী অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স নতুন উদ্যম নিতে দ্বিধা করে নি। মিচেইনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠানো হলো বায়ো এবং আরাগোকে, যাঁদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবারকার প্রস্তুতিপর্বে কোন ত্রুটি ছিল না। সরকার মঞ্জুর করলেন প্রয়োজনীয় অর্থ। ধর্মীয় নেতারা এগিয়ে এসে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। এমন কি একজন নামজাদা দস্যুসর্দার পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

স্পেনের কাজকর্ম নির্বিঘ্নে শেষ হলো। বায়ো ফ্রান্সে চলে গেলেন। কিন্তু মাপজোখের কাগজপত্র যাঁর কাছে রয়েছে, সেই আরাগোই বন্দী হয়ে থাকলেন স্পেনের কারাগারে। তাই সব কাজ শেষ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির পক্ষে আর কিছু করবার থাকলো না।

জেলে বসে আরাগো একদিন খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলেন—কি তাঁর অপরাধ। টাওয়ারগুলিকে চিহ্নিত করে তিনিই নাকি ফরাসী আক্রমণকারীদের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত আরাগোর মৃত্যুদণ্ডাদেশের খবরও ছিল ঐ কাগজে। প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতই তিনি শান্তচিত্তে অনিবার্যকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ালো অন্য রকম।

আরাগো জেল থেকে পালাতে পেরেছিলেন। সেখান থেকে সোজা চলে গিয়েছিলেন আলজিয়ার্সে। তারপর মার্সাই বন্দরগামী এক জাহাজে চেপে পাড়ি জমালেন ফ্রান্সে। কিন্তু কপালের দুর্ভোগ খণ্ডাবে কে? জাহাজটি গিয়ে পড়লো দুর্দান্ত স্প্যানিশ জলদস্যুদের কবলে। আবার সুরু হলো আরাগোর বন্দীজীবন। হতভাগ্য বিজ্ঞানী জেল থেকে জেলে ঘুরতে লাগলেন। এই সময় ভাগ্যও তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুরু করলো।

নেপোলিয়ানকে উপহার দেবার জন্যে সেই জাহাজে করে দুটি বাঘ পাঠিয়েছিলেন একজন ডাকসাইটে আফ্রিকান উপজাতীয় সর্দার। ঘটনাটা জানবার পর রেগে গিয়ে তিনি স্পেনকে এক চরমপত্র দিয়ে বসলেন। তাতেই কাজ হয়েছিল। বিপদগ্রস্ত স্পেন তখন আর শত্রুর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে চান নি।

বন্দী যাত্রীরা মুক্তি পেলেন। তাদের নিয়ে জাহাজটি আবার যাত্রা করলো মার্সাই অভিমুখে। কিন্তু পথ হারিয়ে জাহাজ গিয়ে হাজির হলো বোউগি নামে একটি জায়গায়। আরাগো সেখান থেকে ফিরে গেলেন আলজিয়ার্সে। তারপর থেকেই চললো তাঁর পথচলা এবং বন্দীত্ব বরণ করবার পর্যায়ক্রমিক পালা। একের পর এক ব্যর্থতা এসেছে, তবুও তিনি কখনো ভেঙে পড়েন নি। আরাগোর জীবনে সেটা ছিল এক শ্বাসরোধকারী দুঃসাহসিকতার রোমাঞ্চকর অধ্যায়। কিন্তু তা হলো অন্য কাহিনী।

অবশেষে তিনি একদিন ফ্রান্সে ফেরবার অনুমতি পেলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের

ব্যাপার হলো, তাঁর কোন কাগজপত্রই খোয়া যায় নি। সব সেলাই করে রাখা হয়েছিল। পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে এবং ঝুলিতে ছিল সার্ভের অনেক যন্ত্রপাতি। জীবনের উপর দিয়ে এত যে ঝড়ঝাপ্‌টা বয়ে গেছে, তবুও মাপজোখের হিসাবপত্রকে তিনি যক্ষের ধনের মতন আগলে রেখেছেন।

ডিল্যাম্বার এবং আরাগোর সেই হিসাবের উপর ভিত্তি করেই সুদক্ষ যন্ত্রবিদ এটিন্নি লিনয়ের তৈরী করেছিলেন মিটারের মাপকাঠি। দৈর্ঘ্যের সেই একককে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে। এই মাপ অনুযায়ী নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য হলো চার কোটি মিটার অথবা চব্বিশ হাজার কিলোমিটার।

সর্বপ্রথম, 1800 সালের 25শে জুন মিটারের মাপই একমাত্র বিধিসম্মত বলে আইন পাশ করেছিলেন ফরাসী সরকার।

1806 সালে ডিল্যাম্বার তাঁর প্রতিবেদনে লিখে গেছেন, "ফরাসী বিপ্লবের যা কিছু অবদান আমাদের স্মৃতিতে থেকে যাবে, তার মধ্যে এটির কথা বিশেষভাবেই আমরা মনে রাখবো।"

শৈলেশ সেনগুপ্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 : চীনালোহা কি বিজ্ঞানসম্মত নাম? চীনালোহা কি?

সুব্রত মণ্ডল, কলিকাতা-4

উত্তর 1 : চীনালোহা বলিয়া ধাতু-বিজ্ঞানে কোন নাম নাই, তবে চলিত কথায় চীনালোহা একটি প্রচলিত নাম। চীনালোহা কি তাহা জানিতে হইলে প্রথমে লোহা কি তাহা জানিতে হইবে। রসায়নশাস্ত্র অনুযায়ী বর্তমান মৌল সংখ্যা 105। লৌহ বা লোহা একটি মৌল, যাহার সঙ্কেত Fe, পারমাণবিক গুরুত্ব 55·85 এবং ঘনত্ব-7·9। বিশুদ্ধ লৌহ সাদা, উজ্জ্বল। আমরা বিশুদ্ধ লৌহ লেবরেটারীতে দেখিতে পারি। লৌহ নামে সচরাচর যে বস্তু দেখি, তাহা লৌহ ও কার্বনের একটি সঙ্কর।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অথর্ববেদ, বাজসেনয়ী সংহিতায়, লোহম্ লোহিত অয়স উল্লেখিত হইয়াছে। অয়স হইতে অয়স্কান্তমণি হইয়াছে। কোটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রে, মার্কো পলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতিতে লোহার উল্লেখ আছে। দিল্লীর কলঙ্কহীন লৌহস্তম্ভ আজও পৃথিবীর ধাতুবিদ্‌দের বিস্ময়। কি ভাবে

আমাদের দেশের ধাতুবিদ্যায় উন্নতমান তিরোহিত হইয়াছে, তা অন্য কাহিনী। আমরা ইস্পাত শব্দ পর্তুগীজ espado শব্দ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

আগে বলিয়াছি লৌহ আয়রন ও কার্বনের একটি সঙ্কর। প্রকৃতিতে লৌহ খনিজ হিসাবে পাওয়া যায়। ব্লাষ্ট ফারনেসে শোধন করিয়া প্রথম পিগ আয়রন পাওয়া যায়। পিগ বিশেষণটি শূকরের আকৃতি হইতে আহৃত। পিগ আয়রন হইতে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণীর লৌহ উৎপন্ন হয়। শিল্পজাত লৌহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—কাঁচা লোহা বা ঢালাই লোহা (Cast iron), পেটা লোহা (Wrought iron) ও ইস্পাত (Steel)। পেটা লোহার ব্যবহারিক প্রচলন কম। ইস্পাত বর্তমান প্রশ্নের বহির্ভূত। কাঁচা লোহা বা ঢালাই লোহাতে কার্বন 2.2—5 শতাংশ পর্যন্ত থাকে। ইহা ভঙ্গুর। কড়াই, রেলিং বড় বড় পাইপ প্রভৃতি ফাউণ্ড্রি কারখানায় ঢালাই করিবার সময় ইহা ব্যবহৃত হয়। ঢালাই উপযোগী এই লোহাকে অনেকে 'চীনা লোহা' বলিয়া থাকেন। চীন দেশের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। চীনালোহা চিনিবার রাসায়নিক ও ব্যবহারিক পদ্ধতি আছে।

দেবকুমার দত্ত

বিবিধ

আমের ভেষজগুণ

সমাচার কর্তৃক নূতন দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—আম এক ধরণের ক্যান্সার প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া আরও কয়েক রকম রোগের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। আঁশহীন খাদ্যের অভাবে যে সব রোগ শরীরকে আক্রমণ করে, আম খেলে সেই সবই প্রতিরুদ্ধ হবে। 'সায়েন্স রিপোর্টারে'র প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা কুড়িটির বেশী ফল ও সব্জি নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে, আমেই আঁশের ভাগ সবচেয়ে বেশী। খাদ্যবস্তুতে এই আঁশের অভাবেই মলাশয়ের ক্যান্সার ছাড়াও হার্নিয়া, অর্শ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, স্থূলতা এবং সম্ভবতঃ হৃদ্‌রোগের সমস্যা দেখা দেয়।

আঁশওলা খাদ্যবস্তুর গুরুত্ব অতি সম্প্রতি জানা গেছে। ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ডেনিস বার-কিটের নেতৃত্বে একদল গবেষক আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে গবেষণা চালাবার সময় এই তথ্য অবগত হন।

মার্কিন দেশে ফুস্‌ফুসে ক্যান্সারের পরেই মলাশয়ে ক্যান্সারের স্থান। পশ্চিমে ব্যবহৃত খাদ্যবস্তুতে আঁশের অভাবই এর কারণ বলে জানা গেছে। আফ্রিকার গ্রামবাসীরা আঁছাটা তণ্ডুল খায়, তাই তাদের মধ্যে এ সব রোগের প্রকোপ নেই। আফ্রিকায় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগ নেই, আর যুক্তরাষ্ট্রে বছরে তিন লাখ লোকের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচার হয়।

ঢেঁকি ছাঁটা চাল প্রভৃতি আঁশযুক্ত খাদ্য বহু রোগের প্রতিষেধক। আম ছাড়া আপেল, গাজর বেগুন, বাঁধাকপি, কমলালেবু, নাসপাতি, বীন, লেটুস, মটর, পিঁয়াজ, রসুন, শাক, শসা, টম্যাটো, কপি, কলা, আলু এবং শালগমও আঁশযুক্ত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞপ্তি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (ফোন: 55-0660) কলিকাতা-6। ইতি

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]

[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

অমূল্যধন দেব

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

লেখক/প্রকাশকের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা বিষয়ক বই দান করিবার জন্য লেখক/প্রকাশকদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে। গ্রন্থাগারের পাঠাগার ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দান হিসাবে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন-55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক যথাক্রমে 19·00 এবং 9·50 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয় ; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য ; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্ত বিজ্ঞান বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা :—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660। প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

3. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

4. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্তে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ অগাষ্ট, 1976 অষ্টম সংখ্যা

ভারতে জলদূষণ সমস্যার সমাধান-প্রয়াস

ললিতা পত্রী

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জল পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়, যদিও পরিষ্কার জল মানেই বিশুদ্ধ জল নয়। বিশুদ্ধ জল একটি তরল পদার্থ, যা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত এবং যার আণবিক সঙ্কেত H_2O। বিশুদ্ধ জলের pH 7। বিশুদ্ধ জল গবেষণাগারের বাইরে প্রায় কাজে লাগে না বলা চলে। পরিষ্কার জল বলতে আমরা বুঝি—আলোকস্বচ্ছ জল, যে জলে কোন ভাসমান পদার্থ বিস্তৃত থাকে না এবং যে জল সর্বপ্রকার রোগজীবাণু থেকে মুক্ত। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিকদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে এই পরিষ্কার জল সরবরাহ করেন। এই জলের pH 7-এর একটু কম, কারণ এই জলে কিছু পরিমাণ CO_2 গ্যাস দ্রবীভূত থাকে।

পরিষ্কার জল জাতীয় সম্পদ। জলসম্পদের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—স্বল্পজলা এবং সুজলা। জলসম্পদে দীন দেশ তথা স্বল্পজলা দেশের উদাহরণ আমাদের এই ভারত, যদিও আমাদের কবিরা ভারতকে সুজলা ভাবতে অভ্যস্ত। ভারত স্বল্পজলা—এই অভিমত নাগপুরের জাতীয় পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণাগারের পরলোকগত বিজ্ঞানী ডক্টর জি. কে. শেঠের। জমি ও জলের অনুপাতে ভারত স্বল্পজলা নয়; কিন্তু লোকসংখ্যা ও প্রাপ্ত জলের অনুপাতে ভারত স্বল্পজলা—একথা বলা যায়। জলসম্পদে ধনী তথা সুজলা দেশের উদাহরণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে স্বল্পজলা দেশে তো বটেই, সুজলা দেশেও পরিষ্কার জল দুর্মূল্য পদার্থ বলেই বিবেচিত হচ্ছে। কারণ কলকারখানার পরিত্যক্ত

আবর্জনারাশি এবং শহরের ময়লা নিঃসরণ অনেক সুজলা দেশেও সংরক্ষিত জলসম্পদের বিশেষ গুণগুলি বজায় রাখতে দেবার পক্ষে আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। সংরক্ষিত জলসম্পদের মধ্যে পড়ে শহরে জল সরবরাহের উৎস জলাধারসমূহ, ঝর্ণা, নদী এবং বিশেষভাবে সৃষ্ট হ্রদ বা প্রাকৃতিক হ্রদ।

পৃথিবী জুড়ে মানুষের বাঁচবার পরিবেশ দ্রুত দূষিত হয়ে পড়ছে। এই বিষয়ে বিশ্বের চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়কগণ এবং বিজ্ঞানীরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। জলের দূষণ অর্থাৎ সারা বিশ্বে যা water pollution নামে পরিচিত, তা পরিবেশ দূষণের একটা স্তর। কলকারখানার জঞ্জাল বা শহরের ময়লা ব্যতীতও এমন কিছু জলদূষক আছে, যা সাধারণ মানুষের চোখ এড়ালেও পরিবেশ-সতর্ক লোকের বা প্রতিষ্ঠানের চোখ এড়াতে পারে না। আমেরিকায় এরকম একটি সংস্থান আছে, যার নাম 'পরিবেশ রক্ষক প্রতিষ্ঠান' (Environmental Protection Agency, U.S.A.) এবং এই প্রতিষ্ঠান সতত ওয়াকেবহাল—কোথায় কি ধরণের পরিবেশ দূষণ ঘটছে। এদের প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ—রাস্তায় ছড়ানো গাড়ীর পোড়া ধোঁয়া নদী ও ঝর্ণার জলধারাগুলিকে দূষিত করে তুলছে এবং ব্রেক লাইনিং-এর অ্যাস্‌বেস্টস, টায়ারের রবার, টায়ার ও তেলের দস্তা এবং গ্যাসোলিনের সীসা দূষক পদার্থ। বর্ষার জলধারা এই সব দূষক পদার্থকে নদীতে বয়ে নিয়ে যায়। নানারকম রাসায়নিকের শূন্য আধারগুলিও বিশ্বের পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। আমেরিকার উক্ত পরিবেশ রক্ষক প্রতিষ্ঠানের আর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ—রাস্তার ধারে পড়ে থাকা রঙের শূন্যপাত্র রাখবার আধারগুলি বছরে মাটিতে ও জলে মেশায় 32,7C0 পাউণ্ড পারা, 4·4 মিলিয়ন পাউণ্ড সীসা এবং 1 মিলিয়ন পাউণ্ড ক্রোমিয়াম। পারা, সীসা, ক্রোমিয়াম প্রত্যেকটিই বেশী পরিমাণে দূষক পদার্থ। আমাদের দেশে ঠিক এই রকম কোন পরিবেশ রক্ষক প্রতিষ্ঠান নেই, যাদের প্রকাশিত সমীক্ষার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি—ভারতের কোথায় কিভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। নাগপুরের জাতীয় পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণার (National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur) তথা NEERI-এর প্রকাশিত সমীক্ষা অবশ্য বর্তমানে ভারতের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে সাহায্য করছে।

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ্যা (Environmental Engineering) বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা, যে শাখাটি বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞানসমূহের প্রয়োগ করে পরিবেশকে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলে। মোটামুটি বলা যায়, পরিবেশ যাতে কোনরকমে এমন দূষিত না হয়ে পড়ে, যার ফলে তা মানুষের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে, এটা দেখাই পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদ্‌দের মূল উদ্দেশ্য। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাদের মোকাবিলা করাটাই পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ্‌দের কাজ। জলদূষণ যেহেতু পরিবেশ দূষণের একটা স্তর, সেহেতু জলদূষণ সমস্যা মোকাবিলা করবার জন্যে পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া আইনের সাহায্যও প্রয়োজন। এমন আইন চালু রাখা উচিত, যাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এবং পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি বাধ্য হয় এই সব প্রতিষ্ঠানের পরিত্যক্ত জঞ্জাল ও জলের পরিবেশ-প্রযুক্তিসম্মত পরিচর্যা করতে। নদীতে জঞ্জাল ও দূষিত জল ফেলবার আগেই ওই পরিচর্যা আবশ্যিক ঘোষণা করা উচিত। বছর দুয়েক হবে—ভারতে একটি আইন চালু করা হয়েছে, যার নাম দূষণ নিবারণ এবং নিয়ন্ত্রণ (Prevention and control of pollution)। এই আইন অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় পর্ষদও গঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও এই রকম পর্ষদ

গঠিত হয়েছে বা হচ্ছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্ষদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্য পর্ষদগুলিকে দূষণ নিবারক ও নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত কলাকৌশল জ্ঞাত করা এবং নদীধারা ও কূপের জলকে যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করা। কেন্দ্রীয় পর্ষদ জলদূষণের নানাবিধ সমস্যার উপর আলোকপাত ও গবেষণার জন্যেও বিজ্ঞানীদের প্ররোচিত করছেন। কেন্দ্রীয় পর্ষদে মোট সতেরো জন সদস্য আছেন। এঁদের মধ্যে এমন তিনজন আছেন, যাঁরা কৃষি, মৎস্য চাষ এবং শিল্পের বিষয়ে অভিজ্ঞ।

দূষণ নিবারণ নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়েঃ (ক) নদীধারা সংরক্ষণ এবং নদীধারার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবস্থা যাতে নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা। (খ) জীবিত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জলজ প্রাণীরা জীবনরক্ষার্থে যে জল ব্যবহার করে, সেই জল রক্ষা করা এবং সেই জলের গুণগত উৎকর্ষ বাড়ানো। গৃহকর্মে, ব্যবসায়ে, শিল্পে, কৃষিতে, প্রমোদরঞ্জনার্থে এবং অন্যান্য আইনসম্মত ব্যবহারে যে জল লাগে, তার মান ঠিক রাখা। (গ) নিঃসরক পদার্থসমূহ এবং জলের গুণ বিচার করবার মানদণ্ড স্থির করা। নাগরিকদের কাছেও আশা করা হয় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপর্ষদগুলির তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়াবেন এবং তাঁদের পরামর্শ নেবেন—কিভাবে জঞ্জালাদির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং জাতীয় সম্পদ জলাধারগুলিকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন কেউ লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তি দেবার বিধান রাখা হয়েছে। এই আইন অল্পদিন প্রচারিত হয়েছে এবং শিল্পের পরিত্যক্ত পদার্থসমূহের সঠিক পরিচর্যা সংক্রান্ত কলাকৌশল এখনো আয়ত্ত করতে হবে এবং জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপর্ষদগুলি তাই বর্তমানে শিল্প ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিত্যক্ত পদার্থসমূহের রাসায়নিক পরিচর্যা করবার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করছেন। সরকার আরো একভাবে দূষণ সমস্যার মোকাবিলা করবার কথা ভাবছেন। সেই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আলাদা করা হবে, যেগুলি নদীধারাকে বেশী দূষিত করে তোলে। তাদের অতিরিক্ত কর দিতে হবে। পূর্ত ও গৃহনির্মাণ বিভাগ থেকে এরকম একটি আইনের খসড়া করবার কথা ভাবা হচ্ছে। এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হবে, তা দিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপর্ষদগুলির খরচ মেটানো হবে। পর্ষদগুলি বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে কত পরিমাণ দূষক পদার্থ পরিবেশে ছাড়া যাবে, তা নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং ঐ সঙ্গেই নির্দিষ্ট করে দেবেন গৃহের পরিত্যক্ত দূষকের পরিমাণ এবং জল দূষণ নিবারণার্থে আচরণীয় বিধিবিধান।

জলের উৎসসমূহ এবং এই সকল উৎসের দূষণ—বায়ুস্তর থেকে জল প্রধানতঃ চারটি উপায়ে মাটিতে আসে—বৃষ্টি, তুষার, শিশির কণা এবং শিলাবৃষ্টি হয়ে বা বাষ্পীভবন হবার ফলে এই জল আবার বায়ুস্তরে গিয়ে মেশে। উদ্ভিদের শ্বসনপ্রক্রিয়ার ফলেও জল বায়ুস্তরে মিশে যাবার সুযোগ পায়। বায়ুস্তরের জল পূর্বোক্ত চারটি উপায়ে আবার মাটিতে আসে। মাটি থেকে বায়ুস্তরে যাওয়া এবং বায়ুস্তর থেকে মাটিতে আসা জলের এই আবর্তনচক্র চিরন্তন। মাটিতে আসা জলই নদীরূপে বয়ে যায়, হ্রদরূপে সঞ্চিত দেখা যায়, অন্তঃসলিলা জলস্তরের রূপে ভূমধ্যে জলসাম্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে।

জল দূষিত হলে জলের ভৌত, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় এবং জৈব ধর্মাবলীর পরিবর্তন ঘটতে পারে। যে প্রকার ধর্মের বেশী পরিবর্তন লক্ষিত হয়, সেই ধর্মের নামানুসারে দূষণের নাম ধার্য হয়; যেমন—জলের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন

ঘটলে তাকে বলা হয়—ভৌতদূষণ (Physical pollution)। ভৌতদূষণ ঘটলে জলের স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধের পরিবর্তন দেখা যায়। জলের রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটলে বলা হয় রাসায়নিক দূষণ (Chemical pollution)। এই রাসায়নিক দূষণ ঘটে যখন জলে কোন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বিস্তৃত বা দ্রবীভূত থাকে। শারীরবৃত্তীয় ধর্মের পরিবর্তন লক্ষিত হলে বলা হয় জলের শারীরবৃত্তীয় দূষণ ঘটছে (Physiological pollution)। অনুরূপভাবে, জৈব ধর্মাবলীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হলে বলা যায় যে, জলের জৈব দূষণ ঘটেছে (Biological pollution)। যেভাবে কৃষিজপণ্যাদি রক্ষার জন্যে কীটনাশক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে এই চার প্রকার দূষণ এক সঙ্গেও ঘটতে পারে। কারণ ছড়ানো কীটনাশক দ্রব্যাদি শেষ পর্যন্ত নিকটস্থিত প্রবহমান নদীস্রোতে বা অন্তঃসলিলা জলস্তরে মিশে যায়।

নানা প্রকার কলকারখানার নানা রকম দূষিত জল হয়। কলকারখানার পরিত্যক্ত জল প্রবহমান নদীপথে বা ঝর্ণাধারায় ফেলা হলে তাদের জল দূষিত হয়। দূষক পদার্থের প্রকৃতি, প্রবহমান জলের প্রকৃতি এবং দূষক পদার্থ জলে কতটা পাতলা দ্রবণ তৈরী করছে, তার গাঢ়ত্বের পরিমাণ এবং প্রবহমান জলধারা কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এত সব বিবেচনা করে তবেই বলা সম্ভব জলে কতটা এবং কিরকম দূষণ ঘটছে। তাৎক্ষণিক বা তৎপরবর্তী প্রভাব কিছু না দেখা গেলেও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ময়লা জল নদীর ধারায় ফেলা হলে নদীর জলের দূষণ ঘটবেই। নিরত নদীধারায় এই ভাবে ময়লা জল ফেলা হতে থাকলে ঘটনাক্রমে একদা ঐ নদীধারা বড় রকমের ময়লা নিঃসরক নর্দমায় পরিণত হতে বাধ্য। বিদ্যাধরী নদীতে কলকাতার ময়লা ফেলে ফেলে এমন অবস্থা হলো যে, নদীটি অবশেষে মজে গেল। নদী থেকে নর্দমা এবং তৎপরবর্তী কিছুটা জলা জমি—এই হবে নদীর পরিণতি, যদি না নদীবক্ষে কলকারখানা বা জনবসতির ময়লা ফেলা বন্ধ হয়। কলকাতার বুকে মহাতীর্থ কালীঘাটের কাছে টালির নালা ওরফে আদি গঙ্গার জল এতদূর দূষিত হয়ে গেছে যে, ঐ জল খাওয়া তো দূরের কথা, স্নানের জন্যেও ব্যবহার করা আশঙ্কাজনক বলে পুণ্যলোভীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভাগীরথী বক্ষে অবিরত আবর্জনা নিক্ষেপ করে ভাগীরথীর জল নিত্য ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলছে। অথচ ভাগীরথীর জল ছাড়া কলকাতাসহ ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী তাবৎ শিল্পাঞ্চলের বসতিগুলির একটি দিনও চলে না এবং মাত্র এই একটি কারণেই বলা যেতে পারে যে, ভাগীরথীর জলকে দূষিত হতে দেওয়া মানে বিরাট এক জনসংখ্যাকে নিশ্চিত রুগ্ন জীবনযাপন করতে বাধ্য করবার ঝুঁকি নেওয়া।

আগেকার দিনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কম ছিল বলে শিল্পের পরিত্যক্ত আবর্জনাসমূহের দ্বারা পানীয় জলের উৎস নদীগুলির দূষিত হবার সম্ভাবনা ছিল কম। জলের দূষণের প্রতিকার ছিল মোটামুটি স্থানীয় সমস্যা। ছোট ছোট বসতি অঞ্চলে নানাবিধ রোগব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে স্থানীয় পুকুরের জল ফুটিয়ে ব্যবহার করতে বলা হতো। বড় আকারের শহর ছিল না বলে বড় আকারের জল সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল না। বহু ছোট ছোট গ্রাম বা গঞ্জে স্থানীয় নদী থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা হতো বা এখনো হয়। দ্রুত শিল্পপ্রগতির ফলে বিরাট জনসংখ্যাবিশিষ্ট নগরী-উপনগরী যেমন দ্রুত গড়ে উঠছে, তেমনি তাদের প্রয়োজনীয় জলের যোগান দেবার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যে জলের বিভিন্ন উৎসগুলিকে কাজে লাগাবার

চেষ্টাও চলছে। বলা যায়, পার্শ্ববর্তী নদীর জলই এই সব জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান উৎস। আবার পার্শ্ববর্তী নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে শিল্প উপনগরীগুলির যাবতীয় আবর্জনারাশি। শহরাঞ্চলের ময়লা নিষ্কাশন প্রণালীও অনেক সময় এই সব পার্শ্ববর্তী নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে স্থানীয় নদীগুলির জল ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের অযোগ্য পর্যায়ে দূষিত হয়ে পড়ছে। যদি মানুষ ঐ দূষিত জল ব্যবহার করতে নিতান্ত বাধ্য হয়, তবে মানুষের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে বসতি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী জলের উৎসগুলিকে কোনমতেই দূষিত হতে দেওয়া চলে না, একথা অনুভব করেই জলদূষণের প্রতিকারের প্রয়াস বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভ করছে। দূরদর্শী পরিকল্পনাহীন শিল্পবিস্তারের ফলে ভারতে জলদূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এর প্রতিকার সম্পর্কে এখনই সচেতন না হলে কালক্রমে এটি একটি মারাত্মক সমস্যারূপে প্রতিভাত হবে। এখন ভারতে নদীজলসম্পদে নিক্ষিপ্ত আবর্জনারাশি জলজ প্রাণীর বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা হারাবে; অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে একদা তৃষ্ণা নিবারক জলরাশি বর্তমান থাকলেও তা আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে না। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা তখন কি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে। যে কোন দেশেই জলদূষণ ভয়ঙ্কর সমস্যা এবং ভারতে তা ভয়ঙ্কর আরো এই কারণে যে, এখানে স্বল্পকালীন বৃষ্টিপাত ঘটে। বৃষ্টির জলের তোড় যে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত আবর্জনারাশি দ্রুত নদীর মোহানায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তারও সম্ভাবনা কম। ভারতে যথার্থ বৃষ্টিপাত হয় মাত্র তিন মাস। বছরের বাকী সময় নদী শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়। এই সময়ে দূষণ ঘটলে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, নদীর জল শুধু অপেয় হয়ে ওঠে না, নদীর জলে অনেক রোগজীবাণু বাহিত হয়ে বসতি অঞ্চলে রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ায়। নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত আবর্জনারাশির মধ্যে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকবার সম্ভাবনা এবং এই পদার্থগুলি শুধু স্বাস্থ্যহানিকরই নয়, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে, যদি না সময় থাকতে তৎপর হওয়া যায়। চাসনালা খনিতে ভয়াবহ জলপ্লাবনের দুর্ঘটনা ঘটবার পর চাসনালার দূষিত জল নিষ্কাশন করে ফেলা হয়েছিল দামোদর নদে। এর ফলে নিম্নদামোদরের জল দূষিত হয়ে যায় এবং নিম্নদামোদরের কূলবর্তী অধিবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন দামোদরের জল ব্যবহার না করেন। তেনুঘাট বাঁধ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ জল ছাড়বার জন্যে বিহার সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল—যাতে ঐ অতিরিক্ত জলের তোড়ে নিম্নদামোদরের বুকে প্রবাহিত হয়ে দূষিত জল নদীর মোহানায় বের হয়ে যেতে পারে। চাসনালা খনির জল দামোদরের বুকে না ফেলে উপায় ছিল না, আবার দামোদরের জলও যাতে মাত্রাতিরিক্ত অবিশুদ্ধ না হয়ে পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল বলেই তেনুঘাট বাঁধ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ জল ছাড়বার প্রশ্নটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতের পবিত্রতম নদী গঙ্গা, যার স্তোত্রে বলা হয় 'তব জলমহিমা নিগমে খ্যাত।' পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা কি কালক্রমে নিজেই পতিতদের বিনাশের কারণ হবে? নদীমাতৃক, তবুও স্বল্পজলা, ভারতের পবিত্র নদীগুলি আর কলুষিত হতে দিলে আমাদের অদূরদর্শিতাই প্রমাণিত হবে।

NEERI-র কর্মরত বিজ্ঞানীরা জলদূষণ সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করে কিভাবে এই দূষণ কমানো যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পশ্চিমী দুনিয়ায় অনুসৃত গড়ানো পরিস্রাবণ

(Trickling filter) বা সক্রিয় কর্দম (Activated sludge) পদ্ধতিগুলিতে অনেক বেশী খরচ পড়ে এবং এই পদ্ধতিগুলি কাজে লাগাতে গেলে দামী যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ঐসব যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে ব্যবহার করবার অর্থ আমাদের আর্থিক প্রগতির উপর চাপ সৃষ্টি করা। ঐ দুটি পদ্ধতি ছাড়াও অন্তবিধ যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা শিল্পের পরিত্যক্ত দূষিত জলকে দোষমুক্ত করা যায় বা শহরের ময়লানিষ্কাশক নর্দমার ময়লা জল এমনভাবে শোধিত করা হয়, যা আবার বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে ঐসব যন্ত্রপাতি নির্মিত হয় না। NEERI-এর বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, তা যেমন নতুন ধরণের তেমনি তাতে খরচও অনেক কম পড়ে। তবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলে প্রচুর জমির প্রয়োজন। প্রচুর জমি শিল্পনগরী বা শহরের কাছাকাছি না পাওয়া গেলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না। জমি ছাড়া বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে অন্যান্য খরচ অত্যন্ত কম পড়বে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং প্রচুর রোদ পাওয়া সম্ভব হলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করবার আর কোন বাধা নেই এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র বছরের অধিকাংশ সময় নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং প্রচুর রোদ দেখা যায়। একটি বড় আকারের অগভীর পুকুর কাটা হয়। শহরের অধিবাসীদের পরিত্যক্ত জঞ্জালে জৈব পোষকাদি (Organic nutrients) থাকে এবং প্রচুর রোদ পাবার ফলে পুকুরে কয়েক ধরণের অ্যালগি (Algae) বেশ ভালভাবে জন্মায় এবং বাড়ে। এই অ্যালগিগুলি আসলে কয়েক জাতের সবুজ আণুবীক্ষণিক জীব (Green microorganism) এবং এই অ্যালগির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্টিরিয়ার উপনিবেশও গড়ে ওঠে। এই ব্যাক্টিরিয়াসমূহ পুকুরের জৈব জঞ্জাল খেয়ে হজম করে এবং জলকে দোষমুক্ত করে। এই পুকুরের জল এবার সেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কোনপ্রকার দূষণের আশঙ্কা থাকে না। পুকুরটির নাম জারক পুকুর (Oxidation pond) বা স্থায়ীকরণ পুকুর (Stabilization pond)। যদি এই জারক পুকুর পদ্ধতি ঠিকমত অনুসরণ করা হয়, তাহলে পুকুরের পরিষ্কার জল থেকে কোন দুর্গন্ধ বের হয় না।

NEERI-এর বিজ্ঞানীদের পরামর্শমত আরেকটি পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির নাম জারক গর্ত (Oxidation ditch) পদ্ধতি। জারক গর্ত পদ্ধতিতে প্রথমে একটি গর্ত করা হয়। তারপর তার মধ্যে জঞ্জাল ফেলে রাখা হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা আগাগোড়া বাতাস বওয়ানো হয় এই জঞ্জালরাশির ভিতর দিয়ে। মাঝারি আকারের শহরগুলির পক্ষে জারক গর্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা সুবিধাজনক। জারক পুকুর পদ্ধতির মত এতে বিশালাকার জমির প্রয়োজন হয় না। সাংগঠনিক এবং চালু রাখবার খরচ বেশ কম পড়ে।

NEERI-এর বিজ্ঞানীদের মতে—শহরের ময়লা নিঃসরণ মোটেই কোন দুর্বহ সমস্যা নয়। ময়লা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এথেকেই অনেক সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়। ময়লার রাসায়নিক পরিচর্যার (Chemical treatment of sewage) দ্বারা যে জল বেরিয়ে আসে, তাতে প্রয়োজনীয় সকল পোষক, যথা—নাইট্রোজেনঘটিত, ফস্ফরাসঘটিত এবং পটাশিয়ামঘটিত যৌগসকল বর্তমান থাকে। ফলে ময়লার পরিচর্যা করে পাওয়া নিষ্কাশিত জলের সাহায্যে ভেড়ী তৈরী করে মাছের চাষও বাড়ানো যায়। এই জল পুনরায় শিল্পে ব্যবহার করতেও কোন অসুবিধা নেই। ভারতের কোথাও কোথাও তা করা হলেশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে জল সরবরাহ সমস্যার খানিকটা সমাধান হতে বাধ্য। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজের মত বড় শহরগুলিতে স্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির

জলের চাহিদার কিছু অংশ এভাবে মেটানো যেতে পারে এবং বোম্বাইয়ের কিছু কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই জল ব্যবহারের প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছে। পরিচর্যাকৃত ময়লাও নানারকম রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে ; এমন কি, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ কাজেও ব্যবহার করা যায় কিনা, তার পরীক্ষ-নিরীক্ষা চলছে।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের পুকুরগুলি স্বাস্থ্যসম্মত-ভাবে সংস্কার করে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হলে জলদূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত রাখা যাবে। পল্লী-অঞ্চলে পুকুরগুলির পাড়ে পাড়ে খানিকটা করে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিলে ব্লিচিং পাউডার থেকে জায়মান ক্লোরিন গ্যাস জলকে জীবাণুমুক্ত রাখবে। কয়েকটি গ্রামের ময়লা নর্দমার সাহায্যে দূরের কোন চাষের মাঠের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলে এবং সেখানে জারক পুকুর পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে—যেমন সেচের জল পাওয়া সম্ভব হবে, তেমনি গ্রামের ময়লা নিঃসরণও কোন স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। জল দূষণ এবং ময়লা নিঃসরণ সমস্যা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুটির সমাধান একই সঙ্গে করা বাঞ্ছনীয়।

নাইট্রোজেন বন্ধন : পশ্চাদ্‌পট, পদ্ধতি ও গুরুত্ব

মন্টু বসাক*

গাছ যে সমস্ত উপাদান মাটি থেকে সংগ্রহ করে, তার মধ্যে নাইট্রোজেন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে মাটিতে এই বিশেষ উপাদানটির সরবরাহ বজায় রাখা যায়। সাধারণতঃ যে জমিতে শুঁটিজাতীয় ডালশস্য চাষ করা হয়, সেখানে এদের চাষের সময় কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করবার দরকার হয় না বরং এদের চাষের পরই ঐ একই জমিতে দানাজাতীয় কোন শস্যের চাষ করলে নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার কম মাত্রায় প্রয়োগ করেও বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব। কারণ এই সমস্ত শুঁটিজাতীয় গাছ নিজেদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত নাইট্রোজেন ভাণ্ডার থেকে সরাসরি গ্রহণ করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে। এইসব গাছের শিকড়ে গুটি আছে, যেখানে এক প্রকার জীবাণু বাস করে, যাদের বিশেষত্বই হলো বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন বন্ধন করা। এছাড়া আরেক ধরণের জীবাণু মাটিতে আছে, যারা গাছের কোন রকম সহায়তা না নিয়েই স্বাধীনভাবে মাটিতে নাইট্রোজেন বন্ধন করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

নাইট্রোজেন বন্ধনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়—1830 দশকের গোড়ার দিকে মানুষের মনে ব্যাপারটা রেখাপাত করেছিল। তখনকার কিছু কিছু রসায়নবিদ্‌দের মনে প্রশ্ন জেগে-ছিল—গাছের বৃদ্ধির জন্যে প্রধান উপাদান হিসাবে দরকার নাইট্রোজেন। বায়ুমণ্ডলের শতকরা 78 ভাগ হলো নাইট্রোজেন, গাছ কি বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে পারে? এর পর অনেক বছর পার হয়ে গেলেও এর কোন সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি। সুদীর্ঘকাল বাদে 1950 সালে পুরনো

*ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নতুন দিল্লী

প্রশ্নটি আবার জোরালোভাবে বিজ্ঞানীদের মনে নাড়া দেয়। এবারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা সুরু হলো। এই সময়ে অনেকেই বিশ্বাস করতেন, নাইট্রোজেন বন্ধনকারী কোন জীবাণু থেকে যদি সক্রিয় এনজাইম (Enzyme) আলাদা করা যায়, তবেই এই পদ্ধতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। কিন্তু কাজটা বলা যত সহজ, করা অত সহজ হলো না। সুদীর্ঘকাল ধরে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কিছুই বের করা গেল না। এ জন্তেও অবশ্য বিজ্ঞানীরাই দায়ী ছিলেন। বর্তমানে নাইট্রোজেন বন্ধন পদ্ধতির অনেক তথ্যই জানা গেছে। কিন্তু আরও অনেক কিছু জানবার বাকী আছে। শুধুমাত্র গুটি পরিবারভুক্ত গাছেরাই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধন করে, একই পদ্ধতিতে অন্যান্য গাছ—যেমন ধান বা গমের পক্ষেও নাইট্রোজেন বন্ধন সম্ভব কিনা—এ প্রশ্ন নিয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন এবং ইতিমধ্যে কাজও অনেক এগিয়ে গেছে। এসম্বন্ধে পরবর্তী কোন প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে। বর্তমান প্রবন্ধে নাইট্রোজেন বন্ধনের পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

নাইট্রোজেন বন্ধন বলতে বোঝায়—বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে বিজারণক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করা। হ্যাবার পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মিলিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরী করা যায়, কিন্তু এতে অনেক বেশী চাপ, তাপ ও শক্তির প্রয়োজন। জীবাণুরা নিজেদের দেহের মধ্যে সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় অনেক কম শক্তির সাহায্যে নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া তৈরী করে। একটা জীবাণু যাকে মাইক্রোস্কোপ ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না, তার শরীরের মধ্যে এই রকম একটা শক্তিশালী বিক্রিয়া কি করে সম্ভব? এর উত্তর কুড়ি বছর আগেও আমাদের জানা ছিল না। গত দুই দশকে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারা গেছে। 1960 সালে প্রথম নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু Clostridium pasteurianum থেকে নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্তে দায়ী এন্‌জাইম আলাদা করা হয়। এন্‌জাইমটির নাম দেওয়া হয় নাইট্রোজিনেস (Nitrogenase)। এনজাইমটাকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে আছে মলিবডিনাম, লোহা ও প্রোটিন এবং অন্য অংশে আছে শুধু লোহা ও প্রোটিন। দুট অংশের কোনটাই একটা আরেকটাকে ছাড়া সক্রিয় নয়।

নাইট্রোজেন বন্ধনের প্রথম ধাপ, অর্থাৎ নাইট্রোজেন গ্যাসকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়ায় পরিণত করবার বিক্রিয়াকে এই এন্‌জাইমটি ত্বরান্বিত করে। এই ভাবে যে অ্যামোনিয়া তৈরী হয়, তা জীবকোষ নিজের বৃদ্ধির জন্তে প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরীর কাজে লাগায়। প্রোটিন তৈরীর এই বিক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে লেখা যেতে পারে।

অ্যামোনিয়া + শক্তি (ATP) $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ গ্লুটামিন

গ্লুটামিন + আল্‌ফাকিটো গ্লুটারেট + বিজারক (NADP) $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ 2 গ্লুটামেট।

প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়ার মধ্যবর্তী কোন পদার্থের উপস্থিতির ধারণা এখনও স্পষ্ট হয় নি।

নাইট্রোজিনেস এনজাইমের নাইট্রোজেন বিজারণের ক্ষমতা অতি সহজেই অক্সিজেন গ্যাসের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই এন্‌জাইমটি নিয়ে কাজ করতে হলে সব সময়েই অবায়ুজীবী (Anaerobic) অবস্থায় করতে হবে। আর এই কারণেই প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা এনজাইম আলাদা করতে ব্যর্থ

হয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁরা বায়ুজীবী (Aerobic) জীবাণু অ্যাজোটোব্যাক্টার (Azotobacter) নিয়ে কাজ করেছিলেন, কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস অপসারণের কোন ব্যবস্থা করেন নি। ফলে প্রতিবারই এনজাইমটি অক্সিজেনের স্পর্শে নষ্ট হয়ে যেত। 1960 সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী কারনাহান প্রথম Clostridium pasteurianum থেকে সক্রিয় এনজাইম আলাদা করেন। কারনাহানের সৌভাগ্য তাঁর জীবাণুটি ছিল অবায়ুজীবী। কাজেই প্রথম চেষ্টাতেই এনজাইম আলাদা করতে তিনি সফল হতে পেরেছিলেন। এথেকে এও জানা গেল যে, অক্সিজেন গ্যাসের উপস্থিতিই সব গণ্ডগোলের মূল এবং এ জন্তেই প্রথম দিকে অ্যাজোটোব্যাক্টার থেকে এনজাইমটি আলাদা করা যায় নি। পরে অবশ্য নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বায়ুজীবী সমস্ত জীবাণু থেকেই এনজাইমটি আলাদা করা হয়েছে। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, গাছের শিকড়ের গুটিতে লেগহিমোগ্লোবিন নামে একটি বিশেষ প্রোটিন থাকে, যা আশেপাশের অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে আংশিক অবায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। আরও দেখা গেছে, যে গুটিতে যত বেশী লেগহিমোগ্লোবিন থাকে, সেই গুটি নাইট্রোজেন বন্ধন করতে তত বেশী ক্ষমতাশালী। সমস্ত বায়ুজীবী জীবাণুর মধ্যেই কোন না কোন ব্যবস্থা থাকে, যা অতিরিক্ত অক্সিজেন অপসারণে সাহায্য করে.

নাইট্রোজিনেস এনজাইমের সক্রিয়তা কার্বন উৎসের সঠিক সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কার্বনের সম্ভাব্য কাজ হলো নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করা। সাম্প্রতিক কালে মুক্ত রাইজোবিয়াম (Rhizobium) দিয়ে পোষক (Host) গাছের অনুপস্থিতিতে নাইট্রোজেন বন্ধনের প্রমাণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানেও কার্বন উৎসের উপস্থিতি ও অক্সিজেনের অনুপস্থিতির বিশেষ দরকার।

রাইজোবিয়াম গাছের সঙ্গে মিলিতভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জীবাণু, যেমন—অ্যাজোটোব্যাক্টার ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium), এনটারোব্যাক্টার (Enterobacter) প্রভৃতি স্বাধীনভাবে বাস করে মাটিতে নাইট্রোজেনের যোগান দেয়। কোন কোন নীল-হরিৎ শ্যাওলা, যেমন—টলিপোথ্রিক্স (Tolypothrix), নস্টক (Nostoc) অ্যানবিনা (Anabaena) প্রভৃতি ধানের জলা জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে বিশেষ উপযোগী। নীল-হরিৎ শ্যাওলা নাইট্রোজেন ছাড়াও গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক বিভিন্ন পদার্থ, যেমন—অক্সিন (Auxin), ভিটামিন প্রভৃতির যোগান দেয়। অ্যাজোটোব্যাক্টার গাছের পক্ষে ক্ষতিকর ছত্রাক দমনে সাহায্য করে। আখ, গম, ভুট্টা, টম্যাটো প্রভৃতি ফসলের জমিতে অ্যাজোটোব্যাক্টার দিয়ে তৈরী জীবাণু-সার প্রয়োগ করে অতি সহজেই বেশী ফলন পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই সার তৈরী করে বাজারে বিক্রি করছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, জীবাণুর দ্বারা জৈবিক বন্ধনের ফলে প্রতি বছর আনুমানিক নয় কোটি টন নাইট্রোজেন মাটিতে সংযোজিত হচ্ছে।

নৃ-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে লোকউৎসবের মূল্যায়ন

রেবতীমোহন সরকার*

মানব সমাজে উৎসব একটি চিরন্তন প্রথা। বিভিন্নরূপী এবং বিভিন্নধর্মী উৎসব-সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের মনে এনে দেয় উম্মাদনা—জীবনের বাস্তববাদের টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত মানুষ উৎসবের আঙিনায় ক্ষণকালের জন্যে স্বস্তি-বোধ করে। মনের উপর প্রচণ্ড চাপ, চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রতিক্রিয়া উৎসবের আনন্দ অচিরেই লাঘব করে দেয়। মানুষ আবার নবকর্মোদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। এটিই হলো উৎসবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সমাজের ধারা অনুযায়ী সামাজিক রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজ-পিতারা সমাজের গতি-প্রকৃতি, সামগ্রিক পরিবেশ এবং সর্বোপরি মানুষের মনোগত ভাবধারার প্রতি দৃষ্টি রেখে নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। প্রতিটি উৎসব যাতে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং এদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাতে ব্যহত না হয়, তার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। এগুলিই হলো অলিখিত সামাজিক আইনকানুন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই সব সামাজিক আইন-কানুন ধর্মীয় বিধানের সাহায্যে বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক ধাপের মানুষের কর্মপদ্ধতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কধারার বিকাশে এই বিধান প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনার চত্বরে এই সব লোকউৎসবের বিশেষ মূল্য রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানব সমাজ কতকগুলি বিধিবদ্ধ নীতির প্রভাবে প্রভাবিত। উৎসব ও অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব রীতিনীতির সামগ্রিক বিকাশ ঘটে—প্রতিটি আচরণের প্রকৃতিও বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। নৃ-বিজ্ঞানী এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন ধারা ও ধারণার বিচার করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সমষ্টির মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার কথা আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ভারতীয় সমাজ বিশেষভাবে স্তরীভূত (Stratified)। এই স্তরীভূত সমাজ-ব্যবস্থার সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় হলো জাতিপ্রথা। ভারতীয় সমাজে এই জাতিপ্রথা বহু ঐতিহ্যপূর্ণ এবং এর মধ্যে বিভিন্ন যুগ ও কালের প্রভাব প্রতীত হয়। নানা জাতীয় কর্মের ভিত্তিতে এই জাতিগুলির সৃষ্টি এবং প্রতিটি জাতি এক-একটি পেশাকে কেন্দ্র করেই রূপলাভ করেছে। জাতিবিশিষ্ট সমাজ ধারার সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ আজকের নৃ-বিজ্ঞান আলোচনার একটি বিশেষ দিক। কিভাবে বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, প্রতিটি জাতির নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিভিন্ন জাতির পেশাগত দিক ও সামগ্রিক সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্থান নিরূপণ এবং বিভিন্ন জাতির শ্রেণিবিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে নৃ-বিজ্ঞানীরা বিশেষ দৃষ্টিদান করে থাকেন। সমাজে বিভিন্ন স্থানাধিকারী উচ্চ-নীচ জাতিগুলির মধ্যে একাধারে যেমন বহুমুখী পার্থক্য সূচিত হয়, অপর দিকে তেমনি সমস্ত ভিন্নতারূপী চিন্তাধারার পশ্চাৎপটে একটি বিশেষ সমন্বয়ের সুরও ধ্বনিত হয়। জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক

---

*নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

সংঘর্ষ আছে, অস্পৃশ্যতাবাদ একটি জাতিকে অপর একটি জাতি থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে, উচ্চ-নীচ জাতিগুলির মধ্যে রয়েছে মানসিক দ্বন্দ্ব কোথাও বা চরম নির্যাতন ও শোষণ। তবুও গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন জাতির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কর্মবলয় লক্ষিত হয়, তার মধ্যে নানা জাতির মানুষদের মধ্যে একটি বিশেষ বোঝাপড়া ও পরস্পর-নির্ভরশীলতার রূপ প্রকাশিত হয়ে উঠে। এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই বহু জাতি অধ্যুষিত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে।

ভারত গ্রামপ্রধান দেশ। দেশবাসীর বিরাট একটা অংশ বাস করে গ্রামে। গ্রামের অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই কৃষির কাজে জাতিভিত্তিক কর্মসম্পাদনের একটা বিশেষ রূপ বিকশিত হতে দেখা যায়। এই অর্থনীতিক ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বহু জাতির মানুষের অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহ বয়ে চলে। সমগ্র খণ্ডিত সমাজ-ব্যবস্থায় এক অখণ্ডের সুর প্রতিধ্বনিত হয়। তবুও সামাজিক চিন্তাধারায় জাতিতে জাতিতে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজে নিম্নস্থানাধিকারী জাতিগুলির উচ্চজাতিসমূহের ধর্মীয় সামাজিক জগতে প্রবেশের কোন অধিকার তো নাই-ই— এমন কি এতে পরোক্ষ অংশগ্রহণও অনেক সময় সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সময়ে সামাজিক দুঃস্থ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি চিন্তাধারা সমাজে উচ্চ ও নীচ স্থানাধিকারী জাতিগুলির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সূচনা করে এবং সেই উত্তেজনা অনেক সময় সামগ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার এইরূপ জাতিভিত্তিক সংঘর্ষ ও মানসিক উত্তেজনা প্রসূত বিভিন্ন ঘটনাবলীর নৃ-বিজ্ঞান কেন্দ্রিক আলোচনায় দেশ-বিদেশের বহু নৃ-বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার আলোকসম্পাতে এই সব জাতি ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং সমাজের সামগ্রিক মানসিকতায় এদের প্রভাব ও পরিস্থিতির বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্তরীভূত সমাজ-ব্যবস্থায় যেমন আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, অপরদিকে সমাজ পরিমণ্ডলে এমন কতকগুলি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যখন সেই আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলি সামগ্রিক জীবন-প্রবাহে বিলীন হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে যে জাতি-প্রথাকে আটকে রাখা হয়েছিল, তা মুহূর্তের কোন এক স্বতঃপ্রণোদিত চাপে ছিন্নভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে পড়েছে। নৃ-বিজ্ঞানের মতে মানব সমাজের এহেন পরিস্থিতির এক বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে—সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক সমাজমানসকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে এদের প্রয়োজন অবিসংবাদিত। লোকউৎসবের নৃ-বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়—উৎসবের আনন্দ যেমন একাধারে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তার করে, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত সমাজে ক্ষণিকের জন্যে ধর্মীয় সামাজিক বিধিনিষেধ অন্তর্হিত হয়। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকে না। উচ্চ ও নীচ জাতি, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি ধর্মীয় সামাজিক কর্মপদ্ধতির সীমারেখা একাকার হয়ে যায় সর্বজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে—সমগ্র সমাজ জাতিভেদ ভুলে গিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় একীভূত হয়ে পড়ে—এটিই লোকউৎসবের বিশেষত্ব। লোকধর্মের এটিই একমাত্র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। নৃ-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে স্তরীভূত জন-জনসমাজের, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী মানসিক বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় লোক-উৎসবের এই বিশেষ উন্মাদনা নানাভাবে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

লোকউৎসবে গ্রামীণ সকল সম্প্রদায়ের মানুষই

অংশগ্রহণ করে থাকে। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই এই জাতীয় উৎসবের সূচনা হয়। লৌকিক দেবদেবীদের প্রায় সকলেই অনার্য বংশ-সম্ভূত—যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় এদের রূপ ও পূজাপদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। সাধারণতঃ নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এদের আধিক্য দেখা যায়। এরাই এই সকল লৌকিক দেবদেবীর পূজার প্রধান হোতা। ভারতের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এদের প্রাধান্য দেখা যায়। পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে রয়েছে ধর্মরাজ, চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী। এদের পূজায় সাধারণতঃ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য রীতির কঠোরতাও এখানে নাই বরং নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের প্রাধান্যই এখানে বেশী। গ্রামীণ জীবনে এই সব লৌকিক দেবদেবী নানাভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রামে মড়ক লাগলে অথবা ঐ জাতীয় কোন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এই সকল লৌকিক দেবদেবীর প্রসন্নতাই একমাত্র কাম্য বলে বহুযুগের মানুষের ধারণা। এই সুসম্বদ্ধ ধারণাই মানুষকে জাতি-গত বাদবিসম্বাদ ভুলে গিয়ে একীভূত করে দেয়।

আমাদের এই প্রস্তাবনার উদাহরণস্বরূপ বীরভূম জেলার এক গ্রামের চণ্ডীপূজার পদ্ধতি এবং মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রকৃতির বিষয় উপস্থাপন করবো। এই বিশেষ লোক-উৎসবটিতে গ্রামের প্রতিটি মানুষই সমভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং প্রত্যেকেই এই উৎসবের সুষ্ঠু সম্পাদনের প্রতি যত্নবান হয়। অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবীর মত এই চণ্ডীদেবীর সঙ্গে আলোচ্য গ্রামটির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কোন এক বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্তে. আজ থেকে প্রায় 50-60 বছর আগে সারা গ্রামব্যাপী কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। তখন গ্রামীণ বৃদ্ধের দল উপায়ান্তর না দেখে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জাগ্রত এই চণ্ডীদেবীর নামে এই গ্রামটিকে উৎসর্গ করে দেয়। দেবীর উদ্দেশ্যে এই বলে প্রার্থনা জানানো হয় যে, যদি গ্রামটি মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়, তাহলে প্রতি বছর মহাআড়ম্বরে চণ্ডীদেবীর পূজার ব্যবস্থা করা হবে, আর জাতি, বর্ণ ও ধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি গ্রামবাসী দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করবে। আজও গ্রামের প্রতিটি মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে, সেদিন চণ্ডীদেবীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেই গ্রামটি মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই কাহিনীর মধ্যে প্রকৃত তথ্য যাই থাকুক না কেন, একথা অবিশ্বাস করা যাবে না যে, এই বিশ্বাসই গ্রামীণ জীবনের ছন্দে ছন্দে অনুরণিত হয়েছে—গ্রামীণ জীবনচর্যার প্রতিটি ধারায় এই বিশ্বাসের প্রবণতা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে রয়েছে।

আলোচ্য গ্রামটিতে 17টি জাতির বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, ময়রা, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কর্মকার, গন্ধবণিক, গ্রহাচার্য, কেওরট, বারুই, শুঁড়ি, বৈরাগী, বাগ্‌দী, ডোম, বাউড়ী এবং মুচি। গ্রামের সুরীভূত সমাজ-ব্যবস্থায় এই সতেরোটি জাতিই প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে বাগ্‌দী, ডোম, বাউড়ী ও মুচি—এই চারটি জাতি তথাকথিত অস্পৃশ্যতার পর্যায়ে পড়ে। এরা অজলচল জাতি। হিন্দুদের জাতি-প্রথা অনুসারে এদের ছোঁয়া জল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উঁচু জাতির লোকেরা গ্রহণ করে না। গ্রামের উঁচু জাতিদের সামাজিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা হয়। হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনায় এই নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কোন অধিকারই নাই। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমাদের আলোচ্য চণ্ডীদেবী এই অস্পৃশ্য জাতিদের ঘরেরই পূজিতা দেবী। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে বাউড়ী জাতির এক রমণী পুকুরের জলের মধ্যে একখণ্ড শিলা খুঁজে পায়।

কালক্রমে নানা ঘটনাবিচিত্রার মাধ্যমে সেই শিলাখণ্ডটিই জাগ্রতা দেবী চণ্ডী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং সমগ্র অঞ্চলটিতে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আজও এই চণ্ডীদেবী বাউড়ীদের বাড়ীতেই অধিষ্ঠিতা আর দেয়াশীর মাধ্যমে পূজিতা।

সর্বপ্রথমে গ্রামের মোড়ল চণ্ডীপূজার দিন স্থির করে অন্যান্যদের সহযোগিতায়। তারপর সারা গ্রামে সেই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের মাঝে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে রয়েছে চণ্ডীদেবীর বেদী। পূজার পূর্বদিন সেটিকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। বাউড়ী দেয়াশী মাথায় করে চণ্ডীদেবীকে নিয়ে আসে এখানে, তারপর বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারপর চলে পূজা-উৎসব। জাতি বর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ এই উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে। এই উৎসবের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এটিই এবং সমাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম উল্লেখ্য বিষয় হিসাবেও এটি স্বীকৃত। এই উৎসব প্রাঙ্গণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অন্তর্হিত হয়। এখানে কোন রকম স্তরীভূত পরিস্থিতির চিহ্নমাত্র নাই। ব্রাহ্মণ অবলীলাক্রমে একজন তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির পাশে বসে থাকতে পারে। মোট কথা অস্পৃশ্যতা বলে কিছুই এখানে থাকে না। কারণ তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি বাউড়ীই এই দিনের পূজার প্রধান পুরোহিত, তাই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বাউড়ীর প্রভাবই এই গ্রামীণ পূজা-উৎসবে সর্বাপেক্ষা বেশী। গ্রামের সামগ্রিক সামাজিক-ধর্মীয় জীবন-প্রবাহে বাউড়ী দেয়াশী সেদিন এক বিশেষ স্থানাধিকারী বলে বিবেচিত। উচ্চ-নীচ সব জাতির মানুষই দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-উপাচর প্রেরণ করে এবং সেগুলি বাউড়ী দেয়াশীর মাধ্যমেই দেবীর চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। এমন কি ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীত পূজাও এইভাবে বাউড়ী দেয়াশীর দ্বারা নিবেদিত হয়। বাউড়ী দেয়াশী পূজার সময় কোন রকম সংস্কৃত মন্ত্র ব্যবহার করে না অথবা কোন রকম ব্রাহ্মণ্য রীতিপদ্ধতিরও অনুসরণ করে না। অতি সাধারণভাবে এবং দেশজ ও চিরাচরিত প্রথায় এই পূজাকার্য সম্পাদিত হয়। পূজান্তে বাউড়ী দেয়াশী শ্রদ্ধাভরে ডাক দেয় গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে। দু-জনে পাশাপাশি দাঁড়ায় দেবীর সম্মুখে তারপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত এক-গাছি পৈতে নিয়ে দেবীকে উপহার দেয়। পূজার পর বাউড়ী দেয়াশীর ভর আসে। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে দেবী চণ্ডী সেই সময় বাউড়ী দেয়াশীর দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভর নামবার পূর্বে বাউড়ী দেয়াশী প্রথমে দেবীকে প্রণাম জানায়, তারপর পাশে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পা স্পর্শ করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ব দেয়াশী ভর নামলে গ্রামের সদ্গোপ জাতীয় মোড়ল সমগ্র গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে তার ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে বাউড়ী দেয়াশী মায়ের আশীর্বাদপূতঃ ফুল গুঁজে দেয়। এর পর গ্রামের ভাল-মন্দ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা প্রভৃতি বিষয়ে নানাকথা দেয়াশীকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এইভাবে পূজা শেষ হয়। গ্রামের প্রতিটি মানুষই বাউড়ীদের নিকট থেকে পূজার ফুল আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে এবং উপবাসীরা সেই ফুল মাথায় ঠেকিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে।

নৃ-বিজ্ঞানের আলোকে এই লৌকিক দেবীর পূজা এবং গ্রামীণ মানুষের কর্মপদ্ধতির ধারা বিশ্লেষণ করলে মানব সমাজব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হয়। এই সকল বিষয় কিন্তু কোন অসংলগ্ন চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া নয় অথবা এর মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাবয়বের অবতারণা করাও হয় নি। এই সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ লৌকিক দেবীর পূজার্চনার মধ্যে খুবই পরিচ্ছন্নভাবে বহুজাতিঅধ্যুষিত গ্রামীণ সমাজ-

ব্যবস্থার এক অখণ্ড রূপ ফুটে উঠে, বিভিন্ন জাতি-ভিত্তিক জীবনদর্শনের ভিন্ন ব্যঞ্জনা একই সুরে মূর্ত হয়ে উঠে। উৎসব প্রাঙ্গণে জাতিভেদ বিলীন হয়ে যায়—অস্পৃশ্যতার মাপকাঠি পরিবর্তিত হয়। মানুষে মানুষে যেন এক নতুন যোগসূত্র রচিত হয়। জাতিভেদ প্রথার কুফলের কথা বিচার করে আজকের সমাজ-ব্যবস্থা থেকে জাতি-ভিত্তিকতা সমূলে বিনাশ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। ভারতীয় সংবিধানে জাতিভেদ প্রথাকে রহিত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামীন জনমনে এখনও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যধারা একই খাতে বয়ে চলেছে। জাতি-ভিত্তিকতায় সমাজের নানাদিকের কর্মপ্রবাহ বয়ে চলেছে। জাতিপ্রথার প্রভাব সমূলে বিনষ্ট করবার জন্যে মানুষের মানসিক পরিবর্তন প্রয়োজন আর সেই সঙ্গে চাই পারিপার্শ্বিকতার আমূল পরিবর্তন। গ্রামীণ পরিবেশে লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনার মাধ্যমে যেভাবে সামগ্রিক সমাজ জাতি, বর্ণ ও ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়ে একীভূত হয়ে পড়ে—সেই ক্ষণিকের সুদৃঢ় অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ জাতি ও শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা রূপায়ণের কাজে বিশেষভাবে ব্যবহারের দাবী রাখে। উৎসব প্রাঙ্গণের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারার মাধ্যমে যুগযুগান্ত ধরে শ্রেনীবদ্ধ এবং স্তরীভূত সমাজের যে অখণ্ড এবং বৈষম্যহীন রূপ প্রতিভাত হয়ে চলেছে, তা নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ভূমিতে মানবমন ও সমাজধারার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পূজা-উৎসবের আনন্দের পশ্চাৎপটে যে রীতিবদ্ধ এবং বহু বিস্তৃত ও যুগান্তব্যাপী ঐতিহ্যের পরিপন্থী মানসিকতার উন্মেষ ঘটে থাকে, সামগ্রিক সমাজদর্শনে সেই ভাবধারার প্রতিফলনের ক্রিয়াবিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অবলোকন নৃ-বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

সঞ্চয়ন

রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে গবেষণার অগ্রগতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বদাই দুটি প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা চালানো হয়ে থাকে। তার প্রথমটি হলো রোগের মূল বা উৎপত্তি খুঁজে বের করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো কি করে সেই রোগের নিরাময় সম্ভব। গবেষণার জন্যে এবং রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ঐ দুটি উদ্দেশ্যই যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ঐ দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে বায়োমেডিক্যাল গবেষণার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে সে দেশে এবং সেই দুরূহ কাজে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হয়েছে। তার ফলে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জটিল রোগের উপর গবেষণা করে মূল্যবান সব ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হচ্ছে এবং দৈনন্দিন চিকিৎসার কাজে এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

সেদিক থেকে ইদানীংকালের বায়োমেডিক্যাল গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো পোলিওমাইলাইটিস, হামজাতীয় রোগ ও জার্মান মীজল্‌সের টিকার উদ্ভাবন। এই টিকা ব্যবহার করেও খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। সার্থকতায় উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সেই সব রোগের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন, যেসব ভাইরাসবাহিত রোগের টিকা ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত এবং প্রয়োগ করা হলেও তার ফলাফল সন্তোষজনক হয় নি নতুবা সেই রোগ একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জার

টিকা অনেক দিন পর্যন্তই কার্যকরী ছিল না। নতুন এক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যার দ্বারা মাঝে মাঝেই মানুষ আক্রান্ত ও কাবু হচ্ছে। তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে স্বভাবতঃই নতুন টিকার আবিষ্কার প্রয়োজন। যে টিকা বাজারে রয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ রোগমুক্তির সহায়ক নয়। আজ সেই অবস্থা পরিবর্তনের পথে। নতুন যে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া খুবই কম—এমন কি, এই টিকা এখন বাচ্চাদের উপরও অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া এই নতুন টিকা অনেক বেশী কার্যকরীও।

লেবোরেটরীতে প্রস্তুত এক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ব্যবহার করে অতি সম্প্রতি একটি টিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ভাইরাস উত্তাপে সংবেদনশীল। ঐ ধরণের ভাইরাস শরীরের অপেক্ষাকৃত শীতল অংশে দ্রুত জন্মায় আর দেহের উষ্ণ অংশে এদের মৃত্যু হয়। সেই জন্যে এই ভাইরাস ফুস্‌ফুসে বাড়তে পারে না, তার কারণ ফুসফুস উষ্ণ। অথচ অন্যদিকে এই বীজাণু অতি সহজেই নাক ও গলায় বাসা বাঁধতে সক্ষম হয়। টিকা দিলে মানুষের দেহে যে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়, এই ভাইরাস টিকাতেও তাই হয়। এই উত্তাপে সংবেদনশীল ভাইরাস-টিকা জীবদেহে এবং সেই সঙ্গে কিছু মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এই বিষয়টির উপর নতুন করে আলোকপাতও সম্ভব হয়েছে। তাতে ধরা পড়েছে, কি করে ইনফ্লুয়েঞ্জার এই রোগ-বীজাণু তাদের প্রজননগত গঠন পাল্টে নিজেকে টিকার সক্রিয় কর্মক্ষমতার হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়। এই বিষয়ের উপর গবেষণা ও অনুশীলনের পর টেনেসী অঙ্গরাজ্যের মেমফিসে অবস্থিত জুডস রিসার্চ হস্‌পিটালের ডক্টর রবার্ট জি ওয়েবষ্টার ও তাঁর সহকর্মীরা মত প্রকাশ করেছেন যে, এই নতুন বা পরিবর্তনশীল ভাইরাস বিভিন্ন ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে মিশে গিয়ে দেহকে সংক্রামিত করে, এটা জীবজন্তু এবং মানুষ—উভয়ের দেহেই ধরা পড়েছে।

এখন বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতি এইভাবে ইন-ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে বাঁচিয়ে রাখছে এবং এইভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক রোগরূপে দেখা দিচ্ছে। এই জ্ঞানলাভের ফলে কালক্রমে এমন একটি টিকা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে, যার মাত্র একটিতেই নানা ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আক্রমণের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে।

যকৃৎপ্রদাহ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তিনটি নতুন ধরণের টিকা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে দুটি তৈরী করেছেন মেরীল্যাণ্ড অঙ্গ-রাজ্যের বেথেসডার ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব অ্যালার্জি এণ্ড ইন্‌ফেক্‌সান ডিজিসেস-এর ডক্টর রবার্ট পারসেল ও তাঁর সহকারীরা এবং তৃতীয়টি তৈরী করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভেষজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। জীবজন্তুর উপর এই টিকা পরীক্ষা করে সুফল পাওয়া গেছে। উক্ত ভেষজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের গবেষক ডক্টর মরিস হিলম্যান এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এই টিকা এখন মানুষের দেহেও পরীক্ষা করবার উপযুক্ত। অন্যদিকে ব্যাক্টিরিয়াঘটিত রোগের চিকিৎসার জন্যে টিকার উদ্ভাবনের দিকেও ক্রমশঃ নজর দেওয়া হচ্ছে। ব্যাক্টিরিয়া ভাইরাস অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। কোন লোককে অনাক্রম্য করে তুলতে হলে যত সংখ্যক ব্যাক্টিরিয়া প্রয়োজন, তার দ্বারা মারাত্মক ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি একধরণের মেনিনজাইটিস রোগের প্রতিষেধক টিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইসেন্স পেয়েছে এবং মেনিনজাইটিস রোগের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আর এক ধরণের রোগের প্রতিষেধক টিকারও লাইসেন্স অচিরেই পাওয়া যাবে। এই দুই ধরণের টিকাই প্রস্তুত করা হয়েছে ঐ রোগের কারণ ব্যাক্টিরিয়া থেকে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ

জীবাণুসংক্রমণ প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত করতেও এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এই জীবাণুই শিশু ও বালক-বালিকাদের দেহে মেনিনজাইটিস রোগের কারণ। এই জীবাণুরই নাম 'হেমো-ফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা', যদিও এর সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা ব্যাধিতে ভোগে। এই রোগের একটা প্রধান কারণ এই জীবাণু। অতএব গবেষণায় সাফল্য লাভ করবার ফলে এই নতুন টিকা অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলে স্বীকৃত হবে। 'হেমোফিলাস ইনফ্লু-য়েঞ্জা'-জীবাণুবাহিত মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলবার আর একটি পন্থা আছে। সাধারণতঃ ছয় বা অনুরূপ বয়সের বাচ্চাদের শরীরে রোগ-বাহক জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে। তাই এখন বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, এই প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে নির্দোষ ব্যাক্টিরিয়া থেকে, যা সাধারণতঃ দেহের পাকস্থলী ও অন্ত্রে অবস্থান করে

তাই বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, শিশু ও বালক-বালিকাদের শরীরে প্রথম বয়স থেকেই যদি এই নির্দোষ ব্যাক্টিরিয়া জন্মানোর সাহায্য করা যায়, তাহলে যত দিন পর্যন্ত সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তারাই তাকে রক্ষা করবে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, শুধুমাত্র টিকা দিয়েই দেহের সমস্ত রকম রোগকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ফলে অনেক রোগও ক্রমশঃ কাবু হয়ে আসছে। এই রকম একটি ওষুধের নাম কেনোডি অক্সাইকোলিক অ্যাসিড। আগে গলস্টোন বা পিত্তপাথুরি রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতো। এখন এই ওষুধের দ্বারা তাকে আক্ষরিক অর্থেই গলিয়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। মিনেসোটা রাজ্যের রচেস্টারে মেয়ো-ক্লিনিকে এই ওষুধ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। 56 জন রোগীকে ছয় মাস চিকিৎসা করবার পর ঐ ওষুধ দিয়ে দেখা গেছে অর্ধেকেরও বেশী রোগীর গলস্টোনের আকার ক্ষুদ্রতর হয়ে এসেছে এবং 13 জনের সম্পূর্ণ গলে বেরিয়ে গেছে।

এই রকম আরো একটি ওষুধের কথা বলা যায়। এই ওষুধটি দিয়ে এখন মৃগীরোগ আয়ত্তে আনা সম্ভব হচ্ছে। ওষুধটির নাম 'কার্বোমাজে-পাইন'। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই ওষুধটির প্রচলনের লাইসেন্স দিয়েছে। 1960 সালের পর এই প্রথম মৃগীরোগ প্রতিষেধক নতুন ওষুধ লাইসেন্স পেল। এই ওষুধ মৃগীরোগীর দেহে এমন ক্রিয়া করে, যার ফলে যে রোগীর বর্তমানে প্রচলিত ওষুধে ফল হয় না বা হলেও সামান্যই হয়, সেও ভিতরে ভিতরে স্বস্তি অনুভব করে। বর্তমানে যে সব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, যেমন—'ডাই-ফেনিলহাই-ডানটোয়েন' তাতে মাত্র আংশিক কাজ করতো।

অবশ্য নতুন আবিষ্কৃত কার্বোমাজেপাইন এই কঠিন রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে শেষ কথা নয়, তবে যে সব ওষুধ এখন বাজারে আছে, সেই ক্ষেত্রে এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি রোগের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা বলা যায়। সেই রোগটি হলো বংশগত রোগ। সম্প্রতি গবেষকেরা জীব-দেহের পদার্থের জটিল রাসায়নিক বিপাকপ্রক্রিয়ার সূত্রে অনেকগুলি বংশগত রোগ আবিষ্কার করেছেন, যেগুলি মানুষের বুদ্ধিতে জড়তা এনে অথবা কোন যন্ত্রে বৈকল্য এনে পরিণামে মৃত্যু ঘটায়।

হৃদ্‌রোগের ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞা-

নিকদের গবেষণার বস্তুটা অগ্রগতি হয়েছে, অন্ত কোন ক্ষেত্রে তা হয় নি। প্রতি বছর সাড়ে বারো লক্ষ আমেরিকান এই হৃদ্‌রোগের শিকার হন এবং তার 50 ভাগেরও বেশী মানুষ ঐ রোগের আক্রমণে মারা যান। এর মধ্যে অর্ধেক রোগীই মারা যান কোন রকম চিকিৎসার সুযোগ না দিয়েই। এই কথাটা মনে রেখেই রক্তে প্রবাহিত মেদবহুল কোলেস্টেরল হ্রাস করবার ওষুধ মানবদেহে প্রয়োগ করে হৃদরোগের ঘটনা যাতে আর বাড়তে না পারে, ইদানীং তার প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য এই ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয় যে, এই কোলেস্টেরল হ্রাস করবার ওষুধ হৃদ্‌রোগে আক্রমণের ক্ষেত্রে সত্যকারের ফলপ্রদ ওষুধ কি না। গত দশ বছর ধরে এই নিয়ে গবেষণার পর 1975 সালে তার ভিত্তিতে যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে অবশ্য তেমন কোন সাফল্যের কথা নেই। গবেষক দলের চেয়ারম্যান বলেছেন যে, অবশ্য গবেষণার ফলে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, হৃদ্‌রোগে আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে অবশ্যই জীবনযাপনের ধারা পালটাতে হবে এবং রোগীকে সাবধানে থাকতে হবে। তিনি দুটি জিনিষ করতে বলেছেন, একটি হলো পর্যাপ্ত ব্যায়াম এবং অন্যটি হলো ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ। তাঁর মতে এই দুটি সুস্থ থাকবার পক্ষে অপরিহার্য।

হৃদ্‌রোগের চেয়েও মারাত্মক আর যে রোগটির বিরুদ্ধে মার্কিন বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তার নাম ক্যান্সার। এই রোগের ধন্বন্তরী প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে তাঁরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অবশ্য এখনও পর্যন্ত সে বিষয়ে তেমন কোন উন্নতি না হলেও তাঁদের গবেষণার কিন্তু বিরাম নেই। তবে এই সার্থকতা বা ব্যর্থতার দ্বারা কখনই সত্যকারের অগ্রগতিকে মাপা সম্ভব নয়। তবে এই বিষয়ে দ্রুত সাফল্যে পৌঁছবার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করবার ফলে তাঁরা খুবই মুশকিলে পড়েছেন। অথচ মূল গবেষণার মূল্যমানটা তাঁরা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না। তার একটা কারণ, গবেষণা ক্ষেত্রে রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে অনিশ্চয়তা। তাঁরা কখনই এমন গ্যারান্টিও দিতে পারছেন না যে, নির্দিষ্ট কোন একটি মৌলিক কাজ সার্থকভাবে নির্দিষ্ট একটা শুভ ফল দিতে সক্ষম হবে। আসল সমস্যা হলো কোন্ কাজটাকে মূল্যবান স্বীকার করে অর্থ সাহায্য দিয়ে যাওয়া এবং কোন্‌টিকে নয়—এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আগে থেকে পরিকল্পনা করে এটা বলা অবশ্যই সম্ভব নয়।

হতে পারে নিকট ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে অনেক রোগের সূত্র ও তার প্রতিরোধমূলক ওষুধ আবিষ্কারে ভেষজ-বিজ্ঞান হয়তো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। উপমা হিসাবে ধরা যাক ক্যান্সার রোগকে। এই রোগের মূল খুঁজে বের করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই রোগের প্রকৃতিই এমন যে, এই রোগের উৎসই খোদ মানুষের জীবনযাপনের প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাই এই সমস্যার সমাধান আদৌ সহজ নয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই বায়োমেডিক্যাল গবেষণা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রোগের মূল সূত্র নির্ণয় ও তার প্রতিরোধ শক্তি সম্বন্ধে ওষুধ আবিষ্কারের পক্ষে আশার আলো দেখতে সক্ষম হবে এবং তার দ্বারা বিশ্বের জনগণের সুস্থ জীবন গড়ে তোলবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।—এই বিশ্বাস মার্কিন বিজ্ঞানী ও গবেষক চিন্তাবিদ্‌দের আছে।

মরুভূমিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা

চিত্র দত্ত*

মরুভূমিঅধ্যুষিত গ্রামগুলিতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জলের সংস্থান করা দুরূহ ব্যাপার। রাজস্থানের গ্রামগুলিতে এই সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে জলের প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষের পানীয় হিসাবেই নয়, গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জলের প্রয়োজন সেখানকার অন্যতম অধিবাসী গরু, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতির জন্যে।

বর্তমানে শুষ্ক এই গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের জন্যে রাজস্থানে ডিজেল ও বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সে জল জলাধার থেকে নল বেয়ে গ্রামের বিভিন্ন অংশে দিয়ে যেতে যে খরচ পড়ছে, তার ব্যয় অস্বাভাবিক। স্বভাবতঃই আমাদের দেশের আর্থিক সংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকভাবে এই প্রচেষ্টা সম্ভব নয় বলে সরকারের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র শতকরা 15 ভাগ গ্রামের মানুষ এই সুবিধা পাচ্ছে। গ্রামের এই জলসরবরাহের ব্যবস্থা করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই সেখানে 30 কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। অথচ গ্রামের জলসরবরাহের ব্যবস্থা না করতে পারলে দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে চিহ্নিত এক বিরাট অংশকে বাদ দেওয়া হবে। গ্রামগুলিতে প্রায় শতকরা 80 ভাগ মানুষ বাস করে, তাদের উন্নতিই রাজ্যের উন্নতি। তাই মরুভূমিঅধ্যুষিত এই গ্রামগুলিতে জলের প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্যে প্রযুক্তিবিদেরা গভীর চিন্তা শুরু করেছেন।

রাজস্থানের এই সব গ্রামে কূপ ও ভূস্তর থেকে যে জল পাওয়া যায়, তা অস্বাভাবিকভাবে লবণাক্ত। এতে আছে প্রতি লিটারে প্রায় 1000 থেকে 6000 মিলিগ্রাম ক্লোরাইড এবং 2 থেকে 30 মিলিগ্রাম ক্লোরাইড।

তাই এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের জল শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয় প্রকল্পের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে।

বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে বিজ্ঞানীরা এই সব আধা মরুভূমিঅধ্যুষিত গ্রামে জল সরবরাহের জন্যে যে পরিকল্পনা করতে চাইছেন—তা হলো ছোট ছোট এলাকা নিয়ে এক-একটি প্রকল্প তৈরী করা। এতে জল সরবরাহের জন্যে অতিরিক্ত পাইপ এবং জলাধার লাগবে না এবং জলের এই ব্যবস্থার জন্যে তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে সূর্য ও বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগাতে চান। সমস্যাসঙ্কুল এই দুর্গম জায়গাগুলিতে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ এবং ডিজেলের ব্যবহার আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না।

তার পরিবর্তে প্রকৃতির অফুরন্ত দান সৌররশ্মি এবং বাতাসকে যদি ব্যবহার করা যায়, তবে বঞ্চিত এই গ্রামের মানুষগুলি তাদের জীবনযাত্রার এক সহজপথ খুঁজে পাবে।

আর্থিক দিক থেকে চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা সে সব জায়গায় এই প্রকল্প চালু করতে চাইছেন, যেখানে—

(1) বাতাসের গড় গতি 8 থেকে 10 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় এবং বছরের অধিকাংশ সময়ে এই গতি দিনে 10 থেকে 16 ঘণ্টা পাওয়া যায়।

(2) 50 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন পরিষ্কার মিষ্টিজল পাওয়া যায় না। এলাকার

---

*পূর্ত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভূস্তরের জলে অধিক পরিমাণে নোনা অংশ এবং ক্লোরাইড মিশে রয়েছে।

(3) সূর্যের তাপ যেখানে বেশী এবং অনেকক্ষণ ধরে থাকে এবং বছরের অধিকাংশ সময় আকাশ নির্মেঘ থাকে।

(4) বিভিন্ন কারণে সে এলাকার জলের প্রয়োজন দিনে 2,27,000 লিটারের বেশী নয়।

(5) ভূস্তরের জল সহজভাবে কম খরচে প্রকল্পের সামনে উত্তোলন করা যাবে।

(6) সুদূর প্রান্তরে বিদ্যুৎ-শক্তির অভাব এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সম্যক বিকাশ ঘটে নি।

(7) গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল, তাদের প্রধান উপজীবিকা গরু, ভেড়া এবং উটের উপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত শর্তগুলি মেনে নেবার পক্ষে রাজস্থানের অনেক গ্রামই রয়েছে। প্রায় মরুভূমির মত গ্রামগুলিতে সূর্য ও বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগাবার আদর্শ অবস্থা তৈরী হয়ে আছে সেখানে। বায়ুচালিত পাম্প ব্যবহারের জন্যে মিটার প্রতি ঘন্টায়। জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, জয়শল্মীর প্রভৃতি এলাকায় বায়ুর গতি অনুভূত হয়। তাছাড়া বায়ুর গতির আরো একটি উজ্জ্বল দিকও এই এলাকায় ছড়িয়ে আছে—তা হলো বছরে শতকরা 70 ভাগেরও বেশী দিন ধরে এখানকার বায়ুর গতি গড়-গতির চেয়ে বেশী জোরে প্রবাহিত হয়।

1নং চিত্রে মরুভূমিঅধ্যুষিত একটি গ্রামের জল উত্তোলন এবং বিশুদ্ধিকরণের বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে, পরিকল্পিত বায়ুচালিত পাম্প থেকে প্রতি দিন 6000 হাজার গ্যালন জল তোলা সম্ভব। মরুভূমিতে বসানো এই বায়ুযন্ত্রও পাখা (Rotor with aerofoil blade) 6 মিটার ব্যাসযুক্ত। অগভীর নলকূপের সাহায্যে এই বায়ুযন্ত্র 50 মিটার নীচু স্তর থেকে জল তুলতে পারে। বায়ুচালিত এই পাম্পসেটের ক্ষমতা শতকরা 20 ভাগ ধরলে উত্তোলিত জল পাম্প করবার জন্যে এই বায়ুযন্ত্র থেকে 0·24 অশ্বশক্তি-ক্ষমতা পাওয়া
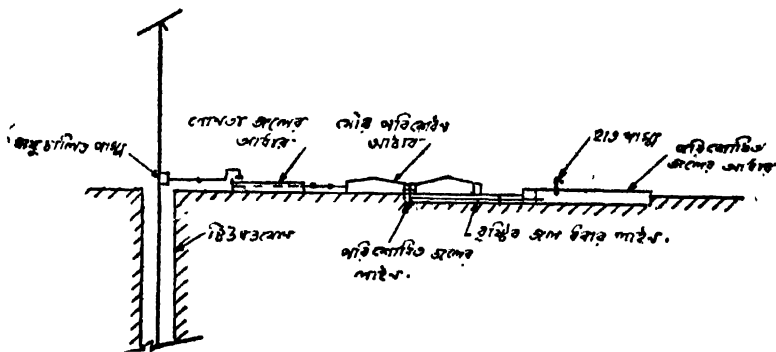
1নং চিত্র
মরুভূমিতে জল উত্তোলন ও পরিশোধন ব্যবস্থা

বায়ুর গতি যতখানি প্রয়োজন, রাজস্থানের অধিকাংশ গ্রামগুলিতে সে পরিমাণ বাতাসের গতি পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10 মিটার উঁচুতে বায়ুর গতি হলো 9 থেকে 12 কিলো- সম্ভব। পাম্প করা অপরিশোধিত এই জল পরবর্তী পর্যায়ে সৌরপরিশোধন জলাধারে (Flat type solar distillation stills) রাখা হয়। এই সৌরআধারে জলকে সূর্যের তাপে

উত্তপ্ত হতে দেওয়া হয়। সৌররশ্মির তাপ জলের উপর প্রতি দিন 500 থেকে 600 ক্যালরি হারে প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে পতিত হয়। সারা ভারতে সৌররশ্মির এত উত্তাপ শুধু রাজস্থানে পাওয়া সম্ভব। এখানে সূর্য দিনে 8 থেকে 10 ঘন্টা তাপ বিকিরণ করে এবং বছরে গড়ে 3200 ঘন্টা প্রখর সৌররশ্মি পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত প্রকল্পে অপরিশোধিত জলকে পরিশোধনের জন্যে কাচে-ঢাকা একটি জলাধারের মত করা হয়। এই আধারের তলদেশ ঈষৎ বাঁকাভাবে রয়েছে এবং জলাধারের গভীরতা খুবই কম। তাছাড়া এর উপর থাকে কংক্রিটের তৈরী সৌরজালি (Concrete solar still), যাতে বিকিরিত সৌরশক্তিকে নীচের নোনা জল গরম করতে এবং পরিশোধনের কাজে লাগানো যায়। কংক্রিটের এই জালি এ ভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে 1 বর্গমিটার জায়গা থেকে গড়ে 1 গ্যালন পরিশোধিত জল প্রতি দিন পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ-শক্তির মাপকাঠিতে এভাবে ধরা যায় যে, প্রতি বর্গমিটারে 3 কিলোওয়াট শক্তি দিনে উৎপাদিত হবে। এই জালিগুলির নির্মাণ পদ্ধতি এমনভাবে করবার চেষ্টা হয়েছে, যার ফলে প্রাথমিক নির্মাণের ব্যয় যতদূর সম্ভব কম হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশী কর্মক্ষমতা পাবার জন্যে তাপ ও বায়বীয় পদার্থের অপচয় খুবই কম হবে। 2নং চিত্রে বায়ুযন্ত্র এবং অন্যান্য জলাধারের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

পরিশোধিত জলের মধ্যে মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণ অপরিশোধিত জল ঢেলে দেওয়া হয়। তা না হলে জল খুবই বিস্বাদপূর্ণ হয়ে উঠে।

শুধুমাত্র ভূস্তরের জলের উপর নির্ভর না করে [illegible]ই জলাধারে বর্ষার সময়ে বৃষ্টির জল ধরে [illegible] পাওয়া [illegible] করা হয়, যাতে সে জলও [illegible]তে আ[illegible] করা যায়।

মানুষের নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে পূর্ণ পরিশোধিত জল প্রয়োজন, যা একটি লোকের জন্যে দিনে 22·7 লিটার দরকার হয়। কিন্তু অন্যান্য
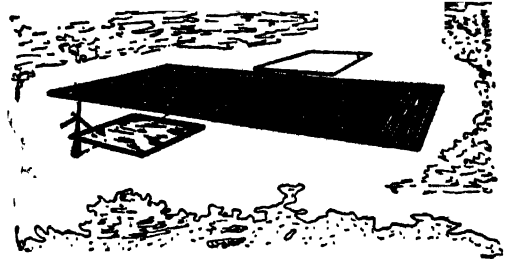
2নং চিত্র
বায়ুযন্ত্র ও অন্যান্য জলাধারের অবস্থান

জীবজন্তুর ব্যবহারের জন্যে অল্প পরিশোধিত জলের ব্যবস্থাও রাখা হয়ে থাকে। তবে নজর রাখা দরকার, যাতে তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সে জল হানিকর না হয়। এই ধরণের কিছু কিছু জল মানুষের প্রয়োজনে স্নান বা কাপড় কাচবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই প্রকল্পে আরো একটি ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে সারা বছরের জন্যে পানীয় জল সমানভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। তার জন্যে ভূমিতল সমান উঁচু ভূগর্ভস্থ এক জলাধার তৈরী করা হয়। জলাধারে সঞ্চিত এই জল যখন জল উত্তোলনে কোন অসুবিধা হয়, তখন পানীয় হিসাবে সরবরাহ করা যেতে পারে। পরিশোধিত জলাধারের উপর কিছু হাত-পাম্প লাগানো হয়, যা থেকে গ্রামের মানুষ প্রয়োজনীয় জল তাদের পাত্রে ভরে নিতে পারে। জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় জল মেটাবার জন্যে আলাদা এক জলের চৌবাচ্চা কিছু দূরে বসানো হয়।

এই প্রকল্প তৈরীর খরচ হিসাব করে দেখা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে এর জন্যে মাথাপিছু 500 থেকে 600 টাকা দরকার হয়। যার মধ্যে 400 টাকাই খরচ হয় কংক্রিটের সৌর

ভাল্বির জন্যে এবং বাকী টাকায় অন্যান্য খরচ হয়; যেমন—টিউবওয়েল, বায়ুযন্ত্র, জলধার, সরবরাহের জন্যে পাইপ প্রভৃতি। এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ খুব বেশী নয়। বছরে শতকরা 1·5 ভাগ খরচ পড়ে মূল লগ্নীকৃত খরচের উপর। জলের পরিমাণ ধরে এর খরচ 4 টাকা 80 পয়সা প্রতি হাজার গ্যালন জলের জন্যে। অন্যান্য জল পরিশোধন ও পাতনের প্রক্রিয়ায় (যেমন vapour compression, multiple effect evaporation, reverse osmosis) এই প্রক্রিয়ার তুলনা করলে দেখা যায়, 2,27,000 লিটার পর্যন্ত জলের জন্যে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে এই ধরণের ছোট প্রকল্প হাতে নিলে পরিশোধনের খরচ সবচেয়ে কম হয়। তাছাড়া জল থেকে ফ্লোরাইড মুক্ত করবার জন্যে সৌরশক্তির ব্যবহার সবচেয়ে সহজ উপায়। অন্যান্য ব্যবস্থা (যেমন ion exchange, chemical additives) আরো বেশী জটিল ও খরচসাধ্য।

সৌরশক্তি ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া আরো একটি সুবিধা এনে দিয়েছে। সুদূর গ্রামে যেখানে এই প্রকল্প তৈরী হয়, তা শহর বা উন্নত জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কোন অসুবিধা হবার কারণ নেই। স্বনির্ভর এই প্রকল্প থেকে 300 থেকে 2000 গ্রামবাসী তাদের পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জল মরুভূমি বা আধ মরুভূমি অঞ্চলে বাস করেও সহজভাবে পেতে পারে। হয়তো দেখা যাবে, সে এলাকায় কোন বিদ্যুৎ নেই। শহর থেকে বহু দূরে এই অঞ্চলে এত দিন পর্যন্ত গ্রামবাসীরা জল দূর থেকে ট্রাক, ট্রেন, গরুর গাড়ী বা নিজেরাই কাঁধে করে নিয়ে আসতো। সেই দুঃসহ অবস্থার মোকাবিলার জন্যে এই প্রকল্পসমূহ এক উজ্জ্বল সমাধানের পথ খুলে দিয়েছে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রথাগত শক্তির সঙ্কট দেখা দেওয়ায় প্রকৃতির এই অফুরন্ত শক্তিসম্পদ ব্যবহারের সুযোগ নতুন দিকের পথ উন্মোচিত করেছে।

পরিবেশ-বিজ্ঞান

রমেন দেবনাথ*

মানুষের মত জীবও একাকী বাঁচতে পারে না—আহার্য, আশ্রয় এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনাদি মেটাতে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের উপর সতত‌ই নির্ভর করতে হচ্ছে। জীবের এই পরিবেশ জৈব এবং অজৈব—এই দুটি উপাদানে গঠিত। সুতরাং জীব ও তার বাসস্থানের বা চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কসম্বলিত যে বিজ্ঞান, তাকেই বলা হয় পরিবেশ-বিজ্ঞান বা বাস্তব্য-বিদ্যা (Ecology)।

ইকোলজি কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ Oikos থেকে—যার অর্থ হচ্ছে বাসস্থান (Home); অর্থাৎ জীব ও তার বাসস্থানসম্পর্কিত বিদ্যাই হলো বাস্তব্য বিদ্যা বা পরিবেশ-বিজ্ঞান। এটি জীববিদ্যার একটি নবীনতর শাখা, যদিও 1878 খৃঃ জার্মান জীব-বিজ্ঞানী হেকেল ইকোলজি কথাটির প্রবর্তন করেন; তবু সাম্প্রতিককালে ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিতে ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আনুকূল্যে পরিবেশ-বিজ্ঞান এক নূতন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে

* প্রাণী-বিজ্ঞান বিভাগ, টি. ডি. বি. কলেজ, রাণীগঞ্জ।

এবং জীব-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে এটি পরিগণিত হয়েছে।

জীবের বাসস্থান—সমুদ্রের নোনাজল, পুকুর, নদীনালার মিঠা জল ও স্থলভূমি—পৃথিবীর সমগ্র জীবকুলের বসবাসের জন্যে—এই তিন প্রকারের বাসস্থান রয়েছে। এর মধ্যে সামুদ্রিক বাসস্থান সবচেয়ে বড় আর মিঠা জলের বাসস্থান সবচেয়ে ছোট। স্থলভাগের বাসস্থান সবচেয়ে পরিবর্তনশীল—এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাপমাত্রা −60°C থেকে 60°C; মৎস্য ছাড়া সর্বশ্রেণীর প্রাণী উদ্ভিদ এতে বর্তমান। অজৈব, জৈব—এই দুই প্রকার উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত জীবের বাসস্থান বা পরিবেশ।

অজৈব পরিবেশ

জীবকে বাঁচতে হলে আলো, বাতাস, জল ইত্যাদি উপাদান একান্ত অপরিহার্য—এদেরই বলা হয় অজৈব পরিবেশ, যা আবার দু-ভাগে বিভক্ত—ভৌত ও রাসায়নিক।

ভৌত পরিবেশ

মাটি, জল, বায়ু, আলো, তাপমাত্রা ইত্যাদি হচ্ছে ভৌত (Physical) পরিবেশের উপাদান।

বায়ু ও জল—এই দুটি হচ্ছে জীবের ভৌত পরিবেশের প্রধান উপাদান, যা বিশ্বের সমগ্র প্রাণীকে জলচর ও স্থলচর এবং উদ্ভিদকে জলজ ও স্থলজ—এই দুটি ভাগে ভাগ করেছে। বায়ু এবং জলের প্রধান বৈশিষ্ট্যাদির (যা প্রাণী ও উদ্ভিদকে নানানভাবে প্রভাবান্বিত করে) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো—

ঘনত্ব—বায়ু, জল ও জীবের প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্ব হচ্ছে যথাক্রমে 0·0013, 1·028 ও 1·028। সুতরাং দেখা যাচ্ছে; সমুদ্র-জলের ঘনত্ব প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্বের সমান (অর্থাৎ সমুদ্রেই প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটেছে), কিন্তু বায়ুর ঘনত্ব প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্বের চেয়ে 850 গুণ কম। বায়ু এবং জল—দুই মাধ্যমের এই ঘনত্বের হেরফের প্রাণী ও উদ্ভিদকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে।

চাপ—বায়ু ও জলের চাপ সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী—ক্রমবর্ধমান উচ্চতার সঙ্গে বায়ুচাপ কমতে থাকে আর ক্রমবর্ধমান গভীরতার সঙ্গে জলের চাপ বাড়তে থাকে। জলে চাপের এই আধিক্যহেতু মানুষ 4 কিঃ মিঃ-এর বেশী সমুদ্রগভীরে যেতে পারে নি অন্যদিকে সুউচ্চ পর্বতাভিযানে মানুষ সফল হয়েছে।

প্লবতা (Buoyancy)—ঘনত্বের তারতম্যজনিত বায়বীয় মাধ্যমের চেয়ে জলীয় মাধ্যমে জীব-দেহকে ঢের বেশী প্লবতা প্রদান করে, যার ফলে জলজ উদ্ভিদ জলচর প্রাণীর দেহের ওজন বা ভার বহন করবার জন্যে দৈহিক কাঠামোর (Supporting structure) খুব একটা দরকার হয় না; কিন্তু স্থলের প্রাণী-উদ্ভিদের ওজন বায়বীয় মাধ্যমের চেয়ে অনেক গুণ ভারী বলে তাদের শরীরের ভার বহন করবার জন্যে দৈহিক কাঠামো একান্ত দরকার, না হলে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব। তাই দেখা যায় আণুবীক্ষণিক প্রাণী, জোঁক, কেঁচো প্রভৃতি ছাড়া সমস্ত প্রাণীরই একটি শক্ত কঙ্কাল বা কাঠামো থাকে।

পরিবহন—জল এবং বায়ু—উভয়ই চলমান পদার্থ, বায়ু জলের চেয়ে দ্রুতগামী; কিন্তু বায়ুর চেয়ে জল ভারী বস্তু বহনে সক্ষম। বায়ুর সাহায্যে উদ্ভিদের পরাগকোষ পরিবাহিত হয়। প্রাণীর মধ্যে কীট-পতঙ্গকেই বায়বীয় মাধ্যম বেশী প্রভাবান্বিত করে। অনেক সময় ঘটনাচক্রে ভারী জন্তুজানোয়ারও বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়—যেমন 1947 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'মৎস্যবৃষ্টি'—মার্কস্‌ভিলাতে (Marksville) টর্ণেডোর ফলে মাছ উৎক্ষিপ্ত হয়ে বৃষ্টির সঙ্গে নীচে পড়ে।

চলাচলে বিঘ্ন—প্রাণীর চলাচলের সময় সাধারণতঃ বায়বীয় মাধ্যমের চেয়ে জলীয় মাধ্যম বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যার ফলে জলচর প্রাণীর চেয়ে স্থলচর প্রাণীর গতিবেগ বেশী।

মাটি—জল এবং বায়ুর পরে মাটিই হচ্ছে ভৌত পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উপাদান। স্থলভাগের সকল জীবের আশ্রয়স্থল হলো এই মাটি। জলের প্রাণী ও উদ্ভিদেরও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। মৃত্তিকাকণার আকারের তারতম্যহেতু মৃত্তিকার তিনটি অবস্থা রয়েছে—কাদা, পলি ও বালি

তাপমাত্রা—ভৌত পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তাপমাত্রা। জীব-মাত্রেরই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘিরে আছে এই তাপমাত্রার ব্যতিক্রমহীন প্রভাব। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জীবের অবস্থান তাপমাত্রাই নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তাপ-সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে প্রাণীদের দুই ভাগে ভাগ হয়েছে—শীতল শোণিত প্রাণী (Cold blooded); ও উষ্ণ-শোণিত প্রাণী (Warm blooded); প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রাণীদের নিজস্ব কোন দৈহিক তাপ-মাত্রা থাকে না। পরিবেশের যে তাপমাত্রা হয়, তাদেরও সেই তাপমাত্রা—পরিবেশের তাপ-মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের দৈহিক তাপ-মাত্রারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণীদের একটা নিজস্ব সুনির্দিষ্ট দৈহিক তাপ-মাত্রা থাকে, যা পরিবেশের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়। পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে উষ্ণশোণিত প্রাণী এবং উভচর সরীসৃপ হচ্ছে শীতলশোণিত প্রাণী।

আলো—কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া জীবমাত্রেরই আলো দরকার। উদ্ভিদের আলোকসংশ্লেষণে সূর্যালোক অপরিহার্য। আর আলোকসংশ্লেষণের ফলেই তৈরী হয় প্রাণীদের গ্রহণযোগ্য অক্সিজেন। দিন-রাত্রি হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে আলোকের তীব্রতারও পরিবর্তন ঘটে। স্থলভাগের চেয়ে জলভাগে আলোকের তীব্রতা কম। কারণ জলে প্রতিফলন ও প্রতিসরণহেতু শতকরা 10 ভাগ আলোকই নষ্ট হয়ে যায়

রাসায়নিক পরিবেশ

অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড—এই দুটি হচ্ছে জীবের রাসায়নিক পরিবেশের একান্ত অপরিহার্য উপাদান, যার মাধ্যমে জীবের মূল প্রক্রিয়া আলোকসংশ্লেষণ (উদ্ভিদ) ও শ্বসন (উদ্ভিদ, প্রাণী) প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিক্রিয়া দেখানো হলো—

$$CO_2+H_2O \xrightarrow[\longleftarrow]{\text{আলো}} C_6H_{12}+O_6+O_2$$

আলোকসংশ্লেষণ / শ্বসন
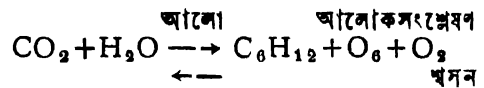
অক্সিজেন—বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সঙ্গে অক্সিজেন ভৌতভাবে মিশ্রিত থাকে এবং এবং এর পরিমাণ হলো শতকরা 21 ভাগ। স্থলভাগে অক্সিজেন মোটামুটি সমভাবেই বিস্তৃত থাকে, তবে ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্তরে ও উচ্চস্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। জলীয় মাধ্যমে অক্সিজেনের পরিমাণ কম—শতকরা 7 ভাগ মাত্র। কারণ অক্সিজেন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে; সুতরাং বায়ুমণ্ডলই হচ্ছে অক্সিজেনের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার। যে সমস্ত জীব অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বসনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে, তাদের বায়ুজীবী (Aerobic) প্রাণী বা উদ্ভিদ বলে। আর যারা অক্সিজেনের সাহায্য ব্যতিরেকে জৈব পদার্থকে পচিয়ে শক্তি উৎপাদন করে, তাদেরকে অবায়ুজীবী (Anaerobic) প্রাণী বা উদ্ভিদ বলে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড—অক্সিজেনের মত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সঙ্গে ভৌতভাবে মিশ্রিত। এর পরিমাণ খুবই কম—শতকরা 0'03 ভাগ, অক্সিজেনের তুলনায়

$\frac{1}{750}$ কম। জলের মধ্যে অল্প পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড মাত্র দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বেশীর ভাগ কার্বনডাই-অক্সাইড থাকে কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট আয়নে—যার ফলে জলীয় মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ স্থলভাগের চেয়ে বেশী। 1951 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রুবে (Rubey) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বায়ুমণ্ডলের চেয়ে সমুদ্র-জলে 50 গুণ বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। সুতরাং সমুদ্রই হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার—অক্সিজেনের ঠিক বিপরীত।

জৈব পরিবেশ

এ পর্যন্ত জীবের অজৈব পরিবেশের কথা বলা হলো, কিন্তু একটি জীবকে ঘিরে রয়েছে অন্যান্য জীবকুল এবং তা দিয়েই তৈরী হচ্ছে জৈব পরিবেশ। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

আহার্যকে ঘিরেই তৈরী হয়েছে জীবের-জৈব পরিবেশ। খাদ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে জীবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রস্তুতকারক ও খাদক। প্রথমোক্ত জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করতে পারে, যথা—সবুজ উদ্ভিদকুল, আর শেষোক্ত জীব হলো—যারা নিজেরা খাদ্য তৈরী করতে পারে না, তবে তৈরীকরা খাদ্যে ভাগ বসিয়ে জীবনধারণ করে; যথা—সমগ্র প্রাণীকুল। খাদক শ্রেণী আবার তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বভুক্—এই কয় রকমের হতে পারে।

খাদ্য-পরম্পরা বা খাদ্যধারা—খাদ্য-পরম্পরা হলো জৈব পরিবেশের পুষ্টিসম্বন্ধীয় একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খল বা ধারা, যাতে উদ্ভিদ ও প্রাণী এক সূত্রে গ্রথিত। এটি মূলতঃ খাদ্য-খাদকেরই সম্পর্ক, যেখানে খাদ্যশৃঙ্খলের পূর্ববর্তী জীবটি পরবর্তী জীবের খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সবুজ উদ্ভিদ হলো খাদ্যশৃঙ্খল বা ধারার মূল ভিত্তি, যারা আলোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করতে সক্ষম; তাই প্রস্তুতকারক জীব হিসাবে পরিগণিত। খাদ্যশৃঙ্খলের এই প্রস্তুতকারক উদ্ভিদ প্রাথমিক খাদক কর্তৃক ভুক্ত হয় (শাকভোজী), প্রাথমিক খাদক মাধ্যমিক খাদক কর্তৃক (মাংসাশী) এবং মাধ্যমিক খাদক আবার তৃতীয় পর্যায়ের (Tertiary) খাদক কর্তৃক ভুক্ত হয়। খাদ্যধারার শেষ পর্যায়ের জীবের মৃত্যু হলে পচনপ্রক্রিয়ার ফলে গঠিত নানান উপাদান প্রস্তুতকারক উদ্ভিদে গিয়ে আবার পৌঁছয়। এই খাদ্য-পরম্পরা জীবের পারস্পরিক অবস্থান বা জৈব পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ দান করে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে।

'উদ্ভিদ→পতঙ্গ→ব্যাঙ→সাপ→বাজপাখী'—এই খাদ্যধারায় দেখা যায় সবুজ উদ্ভিদ হলো প্রস্তুতকারক জীব, যা খাদ্যধারায় একদম প্রথম পর্যায়ে আছে—গাছের পাতা খেয়ে পতঙ্গ জীবনধারণ করে—যাকে বলা যেতে পারে শাকভোজী প্রাথমিক খাদক (Primary consumer), পতঙ্গ হলো ব্যাঙের খাদ্য, এ স্থলে ব্যাঙ হলো পতঙ্গভুক্ মাধ্যমিক খাদক (Secondary consumer), ব্যাঙ আবার সাপের খাদ্য—এস্থলে সাপ হলো তৃতীয় পর্যায়ের মাংসাশী খাদক (Tertiary consumer), আর সাপ হলো বাজপাখীর খাদ্য অর্থাৎ বাজপাখী হচ্ছে খাদ্যধারার শেষ পর্যায়। বাজপাখীর মৃত্যু হলে পচনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত নানান অপরিহার্য উপাদান সবুজ উদ্ভিদে গিয়ে পৌঁছয়।

খাদ্যধারায় জীবের সংখ্যাগত পিরামিড

জীবের জৈব পরিবেশে উপরিউক্ত যে খাদ্যধারা বা খাদ্য-পরম্পরা রয়েছে, তার বিভিন্ন পর্যায়গুলি ত্রিপার্শ্বীয় শঙ্কু অর্থাৎ পিরামিডের আকারে সজ্জিত থাকে, একে জীবের সংখ্যাগত পিরা-

মিড বলে। পিরামিডের সর্বনিম্ন ধাপ সবচেয়ে চওড়া এবং উপরের ধাপগুলি ক্রমশঃ সরু হতে থাকে অর্থাৎ পিরামিডের উপরের স্তরে জীবের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এই পিরামিডের সর্বাপেক্ষা নীচের স্তরে আছে অগণিত সবুজ উদ্ভিদ, যা পিরামিডের গোড়াপত্তন করে। এই মূল ধাপের পরবর্তী উপরের স্তরে আছে তৃণভোজী প্রাণী, যারা উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এর পরবর্তী স্তরে আছে প্রাথমিক মাংসাশী প্রাণী, যারা তৃণভোজীর ভক্ষক। এভাবে মাধ্যমিক, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় পর্যন্ত পিরামিডের ধাপগুলি পর পর উপরের দিকে সাজানো থাকে এবং নীচের ধাপের প্রাণীগুলি উপরের ধাপের প্রাণীর খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এতে উপরের স্তরে প্রাণীগুলি ক্রমশঃই আকারে বড় হতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবের সংখ্যাগত পিরামিডে নিম্ন পর্যায়ের (Descending order) জীবের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং উর্ধ্ব পর্যায়ের (Ascending order) প্রাণীর আকার ক্রমবর্ধমান—শেষতম পর্যায়ের ভক্ষক প্রাণী আকারে এত বড় যে, অন্য প্রাণীর পক্ষে তাকে আর শিকার বা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

জৈব পরিবেশের পুষ্টিসংক্রান্ত অন্যান্য সম্পর্ক

জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কটাই সব নয়, সহাবস্থান ও পারস্পরিক উপকারের সম্পর্ক ও জৈব পরিবেশে বর্তমান ; যথা—

সহভোজন (Commensalism)—এর আক্ষরিক অর্থ হলো এক টেবিলে বসে খাওয়া—এই ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রাণী একত্রে বাস করে। অনেক সময় এই সহাবস্থানে শুধুমাত্র একটি প্রাণীই উপকৃত হয়, কিন্তু তাই বলে অন্তের কোন ক্ষতি হয় না। স্পঞ্জের সঙ্গে একত্র অসংখ্য প্রাণী বাস করে। 12টি স্পঞ্জ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের সঙ্গে 683টি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী আছে। উইপোকা এবং পিঁপড়ের কলোনীতেও অন্যান্য প্রাণী বাস করে। সহভোজনের সহজলভ্য উদাহরণ হলো মড়াশামুকের খোলায় সাগরকুসুম ও সন্ন্যাসী কাঁকড়ার অবস্থান। মিথোজীবিতা (Symbiosis)—এটি একটি পুষ্টিসংক্রান্ত সম্পর্ক, যাতে পারস্পরিক উপকার সাধিত হয়। জীবজগতে মিথোজীবিতার অনেক মজার উদাহরণ আছে। এখানে কয়েকটির কথা বলা হলো।

লাইকেন—এটি উদ্ভিদজগতের এক বিস্ময়। শ্যাওলা ও ছত্রাক—এই দুই ভিন্নজাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণে এবং স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলে তৈরী হয় লাইকেন। সুতরাং লাইকেন অর্ধ-ছত্রাক আর অর্ধ-শ্যাওলা। পুরনো দালানের ছাদ, দেয়াল ও বড় বড় গাছে লাইকেন প্রায়ই দেখা যায়। এই সহাবস্থানের ফলে দুটি উদ্ভিদই উপকৃত হয়। ছত্রাক শ্যাওলার তৈরী খাদ্য খেয়ে বাঁচে, আর প্রতিদানে ছত্রাকের কাছ থেকে শ্যাওলা পায় জল এবং ছত্রাকের শিকড়ের সাহায্যে শ্যাওলা থাকে সুরক্ষিত।

প্রাণী-জগতেই মিথোজীবিতা বেশী দেখা যায়। উইপোকার পেটে বসবাসকারী এককোষী প্রাণী (এককোষী প্রাণীকে উইপোকা আশ্রয় দান করে, প্রতিদানে এককোষী প্রাণী উইপোকার সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে দেয়)। পিঁপড়ে ও অ্যাফিডের সহাবস্থান (অ্যাফিডের দেহ থেকে মিষ্টরস নির্গত হয়, প্রতিদানে পিঁপড়ে অ্যাফিডকে দেয় তৈরী খাদ্য), নীলনদের কুমীর ও একপ্রকার পাখীর মধ্যে একটি মজার মিথোজীবিতা দেখা যায়। কুমীরের মাড়িতে রক্তশোষণকারী জোঁক থাকে, যা পাখীটি মাঝে মাঝে এসে খেয়ে যায়, ঐ সময় কুমীর হাঁ-করে থাকে এবং কুমীরের মুখগহ্বর থেকে পাখীটি খুঁটে খুঁটে জোঁক খায়।

পরজীবিতা (Parasitism)—এটিও জীব-

জগতের পুষ্টিসংক্রান্ত একটি সম্পর্ক, যা মিথোজীবিতার ঠিক বিপরীত। এস্থলে পারস্পরিক উপকারের পরিবর্তে একের ক্ষতিসাধন করে অন্য জীব প্রাণধারণ করে। ম্যালেরিয়া, আমাশয় ইত্যাদি রোগের মূলে আছে এককোষী পরজীবী প্রাণী। আরো অনেক পরজীবী প্রাণী আছে, যার উপর নির্ভর করে পরজীবী প্রাণী বেঁচে থাকে, তাকে বলা হয় পোষক (Host) বা আশ্রয়দাতা।

জীব-গোষ্ঠী — অজৈব এবং জৈব পরিবেশের পারস্পরিক সমন্বয়ে গঠিত যে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল, তাকেই বলা হয় জীব-গোষ্ঠী। একের জীবনধারণের জন্যে অন্যের উপস্থিতি অপরিহার্য। এই জীব-গোষ্ঠীর ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে—কোন জীবই একা নয়, তাকে ঘিরে আছে জৈব ও অজৈব পরিবেশ।

চূড়ান্ত অবস্থা (Climax stage)—প্রতিটি জীব-গোষ্ঠীই নিজেদের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে এবং তা তখনই সম্ভব হয়, যখন জীবের খাদ্যধারায় যথাযথ সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে, যাতে সংখ্যার সমতা বজায় থাকে। এই অবস্থাকেই বলা হয় প্রকৃতির চূড়ান্ত অবস্থা; পরিবেশে পরিবর্তন হলে জীব-গোষ্ঠীর এই ভারসাম্য অবস্থা বিঘ্নিত হয়।

জীব-গোষ্ঠীর পারম্পর্য রক্ষা

জৈব বা অজৈব যে কোন পরিবেশের পরিবর্তন জীব-গোষ্ঠীর ভারসাম্য বা চূড়ান্ত অবস্থা বিনষ্ট হয়। অজৈব পরিবেশের কোন পরিবর্তন ঘটলে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ঐ জায়গায় জৈব-পরিবেশে বা প্রাণী-উদ্ভিদের মধ্যে, যারা এই পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে বাস করে প্রকৃতিকে কিছুটা পাল্টে নেয়। ক্রমে নূতন জীব-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে চূড়ান্ত অবস্থা ফিরে আসে। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থার ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে পুনরায় তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে জীব-গোষ্ঠীর যে প্রচেষ্টা, তাকেই বলা হয় পারম্পর্য রক্ষা। 1883 খৃষ্টাব্দে সুমাত্রা ও জাভার মধ্যবর্তী ক্রাকাতোয়া (Krakatoa) দ্বীপে যে বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাতে ঐ দ্বীপ থেকে প্রাণের চিহ্ন একেবারে মুছে যায়, কিন্তু ক্রমে ঐ দ্বীপে আবার জীব-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হতে থাকে এবং 23 বছর পর সেই নিষ্প্রাণ দ্বীপ আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। যদিও পূর্বেকার অবস্থা ফিরে আসে নি—তবু বিশেষজ্ঞদের মতে ক্রাকোতোয়া আবার পূর্বেকার চূড়ান্ত অবস্থার মুখে। কাজেই পরিবেশের শত পরিবর্তন হলেও একটা পারম্পর্য থেকে যায়।

বাস্তুসংস্থান পদ্ধতি

পরিবেশ-বিজ্ঞানের প্রধান ক্রিয়ামূলক একক (Basic functional unit)—যা জৈব ও অজৈব মাধ্যমে পরিচালিত হয়। চার প্রকার উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এই বাস্তুসংস্থান পদ্ধতি (Ecosystem)—

(1) অজৈব পদার্থ (Abiotic material), (2) প্রস্তুতকারক (Producer), (3) খাদক বা ভক্ষক (Comsuner), (4) পচনকারী (Decomposer)। পৃথিবীর সমগ্র জীব-গোষ্ঠীর উপর বাস্তুসংস্থান পদ্ধতি সার্থকভাবে কার্যকর হয়ে আসছে।

পরিবেশ-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক

প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ—মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবল ও প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় আনতে পেরেছে, বন কেটে বসত করেছে, খাল-বিল ভরাট করেছে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে যে প্রকৃতির চূড়ান্ত অবস্থাকে বিনষ্ট করে ফেলছে, সে দিকে তার খেয়াল নেই। কোন অঞ্চলের অজৈব বা জৈব পরিবেশের পরিবর্তন ঘটালে যে ঐ অঞ্চলের গোটা জীব-গোষ্ঠীরই ভারসাম্য বিঘ্নিত

হয়, তা আমাদের জানা দরকার। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। বৃক্ষাদিরোপণ, মাটির উর্বরাশক্তিবৃদ্ধি, নূতন গোচারণ ভূমি তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে।

কৃষি উৎপাদন—'অধিক ফসল ফলাও' প্রতিযোগিতায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক মনে হলেও পরিবেশ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। যথেচ্ছ এবং বেহিসাবী সার প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত জমির উর্বরাশক্তি কমিয়ে দেয় আর ডি. ডি. টি., ফলিডল ইত্যাদি কীটঘ্ন ওষুধের পরিকল্পনাহীন প্রয়োগের ফলে অপকারী পতঙ্গের সঙ্গে অনেক উপকারী পতঙ্গ এবং পশুপক্ষীরও বিনাশ ঘটে। সে দিক থেকে অপকারী পতঙ্গের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের চেয়ে জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control) বেশী স্থায়ী এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানসম্মত।

জনস্বাস্থ্য—জীবাণুবাহিত নানাপ্রকার রোগ-মহামারীর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে রোগ-জীবাণুর বাহক পতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীদের অজৈব এবং জৈব পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে অর্থাৎ পরিবেশ-বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, না হলে গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কোন ফল হবে না। ম্যালেরিয়া রোগের কথাই ধরা যাক—একপ্রকার এককোষী প্রাণী হলো এই রোগের জীবাণু—যা স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার সাহায্যে মানুষে সংক্রমিত হয়। এখন ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ করতে হলে মশার বিনাশ চাই, আর তার জন্যে দরকার মশার জৈব ও অজৈব পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা; অর্থাৎ মশার বাসস্থান, কিরকম তাপমাত্রায় এদের বংশবৃদ্ধি হয়, আর জানা দরকার মশার জীবন-ইতিহাস; অর্থাৎ বাস্তব্য-বিজ্ঞানে দৃষ্টিকোণ থেকে মশা বিনাশের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হতে হবে।

পরিবেশ দূষিতকরণ—পরিবেশ দূষিতকরণ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চিমনী থেকে নির্গত ধুম্রকুণ্ডলীর কার্বনকণা, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজনিত নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি অজৈব পরিবেশকে দূষিত করেছে। অন্যদিকে নদীর জলও শিল্পের বর্জনীয় পদার্থ থেকে দূষিত হচ্ছে। এর ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারা নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং পরোক্ষভাবে মানুষের জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিসহ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানব-কল্যাণের সঙ্গে পরিবেশ-বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আনুকূল্যে 1972 সালে কলকাতায় নিখিল ভারত পরিবেশ দূষিতকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী বিজ্ঞানীরাও যোগ দেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখবার ব্যাপারে সকল বিজ্ঞানীই একমত। ঐ বছরেই স্টকহল্‌মে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 27তম সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবীর পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যাতে ঠিক করা হয়েছে—প্রতি বছর 5ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসাবে পালন করা হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের স্থিতাবস্থা বা ভারসাম্য বজায় রাখা অর্থাৎ পরিবেশ সংরক্ষণে পৃথিবীর সমগ্র বিজ্ঞানীসমাজ অগ্রণী হয়ে উঠেছে, যার একমাত্র কারণ হচ্ছে—মানবজীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরিহার্যতা।

শক্তি-সঙ্কট ও শক্তির অপ্রচলিত উৎস প্রসঙ্গে

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

আধুনিক যুগে সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শক্তির ব্যবহার দিন দিন যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই আমাদের দেশের কয়লা, তেল এবং শক্তির তেজস্ক্রিয় উৎসসমূহ নিঃশেষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্যে তাই আমাদের শক্তির প্রচলিত উৎস-সমূহের (যথা—তেল, কয়লা প্রভৃতি) পরিবর্তে বিকল্প অপ্রচলিত উৎসের (যথা—সৌরশক্তি, বাতাসের শক্তি, ভূতাপীয় (Geothermal) শক্তি, সামুদ্রিক তরঙ্গ (Tidal) শক্তি প্রভৃতি) সন্ধান করতে হবে। শুধু যে প্রচলিত জ্বালানীর অপ্রাচুর্যের জন্যে শক্তির অপ্রচলিত উৎসসমূহের সন্ধান করা প্রয়োজন, তাই নয়—সাধারণভাবে প্রচলিত জ্বালানী ব্যবহারের কয়েকটি বাস্তব ক্ষতিকারক দিকও এর অন্যতম কারণ। সাধারণ জ্বালানীসমূহ পরিবেশকে দূষিত করে। কয়লা, তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানীসমূহের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শহরাঞ্চলের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে (অবশ্য বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির অন্য কারণও আছে), যা মানব-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। সাধারণ জ্বালানীসমূহ দেশের সর্বত্র সমভাবে বন্টিত নয়, কোন অঞ্চলে এগুলির পরিমাণ বেশী, কোন অঞ্চলে খুবই কম। এর ফলে দেশের অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে। প্রকৃতির এই অসাম্যের প্রতিকারের জন্যে তাই প্রয়োজন শক্তির এমন সব উৎস, যা দেশের সর্বত্র সহজেই লভ্য। শক্তির প্রচলিত উৎসসমূহের অসম বন্টনের ফলে দেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন খুবই কম হয়েছে। ফলে দেশের পল্লীঅঞ্চল সভ্যতার দান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে এবং শহরগুলির উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে। তাছাড়া তৈল উৎপাদনকারী দেশসমূহ বর্তমানে তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করায় শক্তি-সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়েক বছর আগে ভারতের এম. এস্. থ্যাকারের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে বলেন যে, বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে প্রচলিত জ্বালানীসমূহ এবং অনেক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি ছাড়াও শক্তির অপ্রচলিত উৎস (যথা—সৌরশক্তি, বাতাসের শক্তি, সামুদ্রিক তরঙ্গ-শক্তি, ভূতাপীয় শক্তি প্রভৃতি) দেশের উন্নয়নের জন্যে ব্যবহার করতে হবে। ফলে কমিটি পরামর্শ দেন যে, শক্তির অপ্রচলিত উৎসগুলি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা এবং উৎসগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ভারতের আশি শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। কিন্তু শহরের তুলনায় গ্রামের উৎপাদিকা শক্তি অনেক কম, কারণ শক্তির প্রচলিত উৎসগুলির সুযোগ থেকেও ভারতের অধিকাংশ গ্রাম বঞ্চিত। গ্রামে শক্তির উৎস মূলতঃ জ্বালানী

---

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী

কাঠ ও গোবর। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামে প্রয়োজনীয় শক্তির 40 শতাংশ পাওয়া যায় জ্বালানী কাঠ থেকে আর 20 শতাংশ গোবর থেকে। এছাড়া সেচের কাজে গরু, মহিষ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। একে পশুজাত শক্তির (Animal power) ব্যবহার বলা যেতে পারে। পশুজাত শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রতি হেক্টরে সেচের জন্যে পশুজাত শক্তির ব্যবহারে যদি খরচ হয় 1230 টাকা, ডিজেল ইঞ্জিনচালিত পাম্পের ব্যবহারে সেখানে খরচ হয় দু-শ' টাকার কিছু বেশী, আর বৈদ্যুতিক পাম্পের ব্যবহারে পঞ্চাশ টাকারও কম। এই হিসাব কয়েক বছর আগেকার। বর্তমানে মূল্যমান পরিবর্তিত হওয়ায় এই হিসাবে কিছুটা তারতম্য হলেও একটি তুলনামূলক চিত্র এথেকে পাওয়া যায়।

1973 খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রায় 16×10^6 কিলোওয়াট ক্ষমতা (Power) উৎপন্ন হতো। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হবার কথা ছিল। ভারতের শক্তি সমীক্ষা কমিটির হিসাব অনুযায়ী 1975-'76-এ ভারতের শক্তির চাহিদা 635×10^6 টন কয়লার দহনের ফলে সৃষ্ট শক্তির তুল্যমানের এবং 1980-81-তে 895×10^6 টন কয়লা দহনের ফলে সৃষ্ট শক্তির তুল্যমানের হবে। শক্তি ও সেচ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় পর্ষদের প্রতিবেদন অনুযায়ী 1980 খৃষ্টাব্দে মাথা পিছু শক্তির পরিমাণ আমেরিকায় যেখানে 14,000 কিলোওয়াট-ঘন্টা হবে, সেখানে ভারতের মাথা পিছু শক্তির পরিমাণ 250 কিলোওয়াট-ঘন্টা করবার জন্যেই অতিরিক্ত 50×10^6 কিলোওয়াট ক্ষমতা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সৌরশক্তি

শক্তির অপ্রচলিত উৎসগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম যার কথা মনে আসে, তা হলো সৌরশক্তি। সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি প্রতি দিন পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। এই শক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা গেলে শক্তি-সমস্যার বেশ কিছুটা সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, উত্তর চিলির একটি মরুভূমির 28 হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান বছরে যে পরিমাণ সৌরতাপ লাভ করে, তার পরিমাণ ঐ সময়ে সারা পৃথিবীতে কয়লা, তেল, গ্যাস ও কাঠের দহনে সৃষ্ট তাপের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার সম্ভাবনাপূর্ণ, বিশেষ করে অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে—যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব রয়েছে, কারণ শিল্পাঞ্চল অপেক্ষাকৃত সুলভে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। জল সরবরাহ, কৃত্রিম উপগ্রহে শক্তির অন্যতম উৎসরূপে, সৌরচুল্লী, সৌরইঞ্জিন, জলকে লবণমুক্ত করা, ঘর গরম রাখা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেনেগালের ডাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা সৌরশক্তি বিষয়ে গবেষণা করে একটি সৌরমোটর পাম্প তৈরী করেন। এটি সৌরশক্তি ব্যবহার করে প্রতি দিন 4/5 ঘন্টা ধরে ঘন্টায় 40 ঘনমিটার হারে জল 10 মিটার গভীর একটি কূপ থেকে উত্তোলন করতে পারে। সৌরতাপ সংগ্রাহকটির ক্ষেত্রফল 300 বর্গ মিটার। উজবেকিস্থানে একটি সৌরপাম্প ঘন্টায় 4/5 ঘনমিটার জল 20 মিটার গভীরতা থেকে উত্তোলন করতে পারে।

ইজরাইলের জাতীয় ভৌত গবেষণাগারের (N.P.L.) তত্ত্বাবধানে অ্যাটলিটের নিকট সৌরশক্তির দ্বারা উত্তপ্ত বিশেষ ধরণের পুষ্করিণী গড়ে তোলবার জন্যে গবেষণার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ ধরণের এই পুষ্করিণীতে বিভিন্ন গভীরতায় লবণের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়—পুষ্করিণীর উপরিভাগে লবণমিশ্রিত জলের ঘনত্ব প্রায় 1 এবং লবণমিশ্রিত জলের ঘনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে তলদেশে প্রায় 1·3 হয়। পুষ্করিণীর তলদেশ কৃষ্ণ বিউটাইল রবার অথবা

অন্ত কোন তাপ শোষক পদার্থের দ্বারা আবৃত থাকে। যার ফলে সৌরতাপ শোষণে পুষ্করিণীর তলদেশে জলের তাপমাত্রা প্রায় 90° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন গভীরতায় লবণ-জলের ঘনত্ব উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাতে জলের মধ্যে পরিচলন বাত্যা (Convection current) খুব কম হয়। জলের যে অংশে লবণের পরিমাণ কম, তা উচ্চতর ঘনত্বের লবণ-জলের সাপেক্ষে অপরিবাহী স্তররূপে কাজ করে এবং অপেক্ষাকৃত কম গভীরতায় উচ্চতর ঘনত্বের জলকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করে। এই ধরণের পুষ্করিণী থেকে 500 থেকে 5000 কিলোওয়াট পরিমাণ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকায় দুটি বৃহৎ আকারের সৌরশক্তি প্ল্যান্ট (Plant) গড়ে তোলবার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমটির প্রস্তাব দেন হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিলডার-ব্রান্ট ও হাস। এঁদের প্রস্তাবিত প্ল্যান্টে 1 বর্গমাইল এলাকার উপর আপতিত সৌরবিকিরণকে প্রতিফলিত করে একটি 1500 ফুট উচ্চস্তরের শীর্ষে অবস্থিত একটি সৌরচুল্লী ও বয়লারের উপর ফেলা হবে। এর ফলে বয়লারের জল এত উত্তপ্ত হবে যে, ম্যাগ্‌নেটো হাইড্রোডাইনামিক (Magneto-hydrodynamic) পদ্ধতিতে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এইভাবে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, তা জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হবে এবং তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হবে, তা জ্বালানী কোষে (Fuel cell) ব্যবহার করবার জন্যে সঞ্চিত থাকবে। এই জ্বালানী কোষ জেনারেটর চালনা করবার জন্যে গ্যাস-টারবাইনকে শক্তি সরবরাহ করবে।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ভিত্তি অ্যাডেল এবং মারজোরিক মাইনেল প্রস্তাবিত নীতি। এতে ইস্পাত-নির্মিত সৌরবিকিরণ সংগ্রাহক (Steel collecting surfaces) 'গ্রীন হাউস' (Green house) পদ্ধতিতে তাপ ধরে রাখে এবং এর ফলে তাপমাত্রা 540° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (গ্রীন হাউস পদ্ধতিতে তাপ কোন তাপ-স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না, কারণ তাপ-স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবার কোন পদার্থে শোষিত হয়ে তাপ যখন পুনরায় বিকিরিত হয়, তখন বিকিরিত তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পরিবর্তিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তাপের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত তাপ-স্বচ্ছ পদার্থটির তাপরোধী হয়ে পড়ে। ফলে তাপ ঐ পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু নির্গত হতে পারে না)। ধৃত তাপকে গলিত লবণের মধ্যে সঞ্চিত রাখা যেতে পারে এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ মোটামুটি কমই হবে।

ভারতের গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব পূরণের জন্যে সৌরশক্তি প্ল্যান্ট জরুরী ভিত্তিতে স্থাপন করা প্রয়োজন। তা ছাড়া যে সব স্থানের জলে লবণের পরিমাণ খুব বেশী, সেখানে সুলভে জলকে লবণমুক্ত করা এবং লবণ উৎপাদন করবার জন্যে সৌর-শক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বায়ু-শক্তি

বায়ু-শক্তির (Wind power)—ব্যবহার বেশ প্রাচীন। বায়ুচালিত কল (Wind mill) তার নিদর্শন। বর্তমানে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত বিস্তারিত গবেষণার ফলে বায়ুচালিত শক্তি কেন্দ্র (Wind-driven power station) গড়ে তোলবার সম্ভাবনা উজ্জল হয়েছে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাসের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সর্বত্র (সম্ভবতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চল ছাড়া) কোন না কোন উচ্চতায় বাতাসের একটি স্তর আছে, যেখানে

বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে 20-30 মিটার। শীত-কালে মধ্য অক্ষাংশের অঞ্চলগুলিতে বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পায় এবং বাতাসের উপরিউক্ত স্তরটির উচ্চতা 1½ কিলোমিটারের মত হ্রাস পায়; বায়ু-শক্তিকে কাজে লাগাবার পক্ষে ঘটনাটি সুবিধাজনক।

ভারতের বায়ু-শক্তিকে কাজে লাগাবার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য করেছেন ব্যাঙ্গালোরের National Aeronautical Laboratory-র বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণা মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের বায়ুচালিত কল এবং বায়ুচালিত বৈদ্যুতিক জেনা-রেটরের (Wind electric generator) তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিক, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাতাসের গতি-প্রকৃতি এবং শক্তির উৎস-রূপে তাকে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাতাসের বেগের উপযুক্ত বায়ু-চালিত কল নির্মাণ এবং বায়ুচালিত বৈদ্যুতিক জেনারেটরের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক যন্ত্রপাতির (Auxiliary equipent) পরিকল্পনা ও নির্মাণ সংক্রান্ত।

ভারতের 23টি অঞ্চলে বাতাসের বেগ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ছয়টি বিভিন্ন ধরণের বায়ু-চালিত বৈদ্যুতিক জেনারেটরের তুলনা করে দেখা যায় যে, ভারতের বায়ুপ্রবাহের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 7·5 কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যালাগিয়ার (Allagier) এবং 5 কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রো wvg-5 যন্ত্রছুটি ভারতে ব্যবহারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ভারতে 20টি অঞ্চলের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সেচ ও গৃহকর্মের জন্যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্যে WP-2 বায়ুচালিত জলের পাম্পের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করে দেখা যায় যে, যে সব অঞ্চলে বায়ুর বার্ষিক গড়-বেগ একটি নির্দিষ্ট মানের বেশী, সে সব অঞ্চলের WP-2 বায়ুচালিত জলের পাম্প ডিজেল পাম্পের তুলনায় অনেক কম খরচে জল সরবরাহ করতে পারে।

বায়ুচালিত জলের পাম্প জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে ভারতের বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত গবেষণা পর্ষদ (C.S.I.R.) একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন। তাছাড়া ভারতের সামরিক কৃষিক্ষেত্র-গুলিতে এবং সৈনিক স্কুলগুলিতে ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি বায়ুচালিত জলের পাম্প সরবরাহ করা হয়েছে।

মধ্য অক্ষাংশের অঞ্চলগুলিতে 10 থেকে 12 কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর বেগের মান মোটামুট স্থির থাকতে দেখা যায়। (এই মান 70—100 মিটার / সেকেণ্ডে)। এই সব অঞ্চলে উক্ত উচ্চতায় বায়ুর শক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুর শক্তি অপেক্ষা প্রায় 25 গুণ। সোভিয়েট রাশিয়ায় 15 কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, যা 8-10 কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুশক্তিকে ব্যবহার করে। সোভিয়েট রাশিয়ার Georgi Yakovlev-এর মতে যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় বায়ুশক্তির মাত্র এক সহস্রাংশ সদ্ব্যবহার করা যায়, তবে প্রায় 35×10^9 কিলোওয়াট-ঘন্টা (KWH) থেকে 40×10^9 কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ সুলভে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশেও বায়ুশক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

দরিদ্র দেশগুলির ক্ষেত্রে ভূতাপীয় শক্তি (Geothermal energy) শক্তির অন্যতম অপ্রচলিত উৎসরূপে পরিগণিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বাষ্প রয়েছে, তা উপ-যুক্তভাবে ব্যবহার করলে শক্তি-সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। বিভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে ভূতাপীয় শক্তির উৎসরূপে ব্যবহার করা যেতে

পারে। ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্তে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের তাপকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ কিরস্ (George Kiersch)-এর মতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাষ্পকে শক্তির উৎসরূপে বর্তমানে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাথেকে তা আরও কয়েক গুণ বেশী শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। যে সব দেশে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বাষ্পকে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়, সেগুলির মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যাণ্ড, চিলি, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ, এমনকি পশ্চিম আমেরিকা প্রভৃতি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের বাষ্পকে বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগানো হয়, যথা—বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করা, ঘর উত্তপ্ত করা প্রভৃতি।

ভারতে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় তিন শতটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎসরূপে সম্ভাবনাপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। উত্তর ভারতে পুগ্গা (Pugga) এবং মনিকরণ (Manikaran) এর উচ্চ তাপমাত্রার প্রস্রবণগুলিতে পরীক্ষা চালিয়ে National Geophysical Research Institute-এর বিজ্ঞানীরা এই প্রস্রবণগুলির নিকটে মোটামুটি গভীরভাবেই উচ্চ তাপমাত্রার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে খুবই আশা করেন। উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে শক্তির উৎসরূপে কাজে লাগানো বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।

সামুদ্রিক তরঙ্গ শক্তি

সমুদ্রের ঢেউকে (Tidal power) বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল পদ্ধতি জলবিদ্যুৎ (Hydroelectricity) উৎপাদনের পদ্ধতির অনুরূপ হলেও এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এর কারণ সমুদ্রের ঢেউয়ের আকার পরিবর্তনশীল। চাঁদ ও সূর্যের অবস্থানের উপর ঢেউয়ের আকার নির্ভর করে, তাছাড়া ঋতু এবং ভৌগোলিক অবস্থানও ঢেউয়ের আকার প্রভাবিত করে। বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে গবেষণা চললেও একমাত্র ফরাসী দেশে সম্প্রতি এরূপ একটি শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এটি থেকে বছরে প্রায় 550×10^6 কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভবনগর এলাকায় (এখানে ছোট ও বড় ঢেউয়ের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য 37 ফুটের মত) একটি সামুদ্রিক শক্তি কেন্দ্র (Tidal Power Station) স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

মৌমাছি পালন

নীলমণি রক্ষিত

প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে নতুন পথ আবিষ্কারের সাহায্য করে। মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রেও মানুষের এই চেষ্টার ব্যতিক্রম হয় নি। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের চেষ্টা পৃথিবীব্যাপী হচ্ছে। এথেকে প্রচুর পরিমাণে মধু লাভ করা যায়। এই মধু মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের একটি অত্যন্ত মূল্যবান খাদ্য। এই কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন একটি লাভজনক ব্যবসায়।

মৌমাছি পালনে কতকগুলি দিক থেকে আমরা লাভবান হয়ে থাকি। প্রথমতঃ, মৌমাছি ফুলের পরাগ-সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ফল ও শস্যের উৎপাদনে সহায়তা করে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, মৌমাছি কখনও এক শ্রেণীর ফুলের মধু সংগ্রহ করবার সময় সেই শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর ফুলে বসে না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ফুল থেকে মৌমাছি সংগ্রহ করে পুষ্টিকর খাদ্য-উপাদান—মধু। তৃতীয়তঃ, মৌমাছির মোম প্রসাধনশিল্পের এক অপরিহার্য দ্রব্য বলে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সমাদৃত। এমন কি; মৌমাছির বিষ ও রয়্যাল জেলী (Royal Jelly) এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। সতেরো-শ' শতাব্দী নাগাদ মৌমাছি পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি মানুষ প্রথম আকৃষ্ট হয়। এই সময়েই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির কলসীতে মৌমাছি পালনের প্রথা চালু হয়। আমাদের দেশ মৌমাছি পালনে আজও অনেক পিছিয়ে আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি, যেমন—রাশিয়া, আমেরিকা এই বিষয়ে অনেক উন্নত। এই সব দেশে কৃষি ও মৌমাছি পালনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালন সুরু করেন ডগলাস (Doglas) নামক এক ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ইংরেজ কর্মী। এর পরে করেন একজন পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নাগরিক মিশনারীদলের ফাদার নিউটন (F. Newton)। তিনিই প্রথম দক্ষিণ ভারতে কয়েকজন ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের কৌশল শিক্ষা দেন এবং নিজেও মৌমাছি পালন সুরু করেন। এই ভাবেই মৌমাছি পালন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। তাই F. Newton-কে ভারতের মৌমাছি পালনের জনক বলা হয়ে থাকে।

স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বঙ্গে এই শিল্পের প্রথম সুষ্ঠু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পশ্চিম বঙ্গের খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন। পশ্চিম বঙ্গে এই শিল্প সুরু হয় 1953-54 সালে। পরে এই কমিশন কতকগুলি জেলায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে মৌমাছি পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন।

পশ্চিম বঙ্গে যে সব আঞ্চলিক কার্যালয় আছে সেগুলি 24 পরগণার বারুইপুর, হুগলীর চন্দননগর, মেদিনীপুরের প্রতাপপুর, দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং ও জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে অবস্থিত। এই অফিসগুলিতে কয়েকজন করে ফিল্ডম্যান (Trainer) আছেন, যাঁরা মৌমাছি পালকদের এই বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন।

পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ চার শ্রেণীর মৌমাছি দেখা যায়।

1. ডাঁস বা পাহাড়ী মৌমাছি (Apis dorsta)

2. ভারতীয় মৌমাছি (Apis Indica)

3. ক্ষুদে মৌমাছি (Apis florea)

4. ডামার মৌমাছি (Dammar bee বা Trigona)।

ডাঁস মৌমাছি—এরা আকারে অন্ত সব মৌমাছির তুলনায় বড় এবং স্বভাবে বন্ত। এদের খোলা জায়গায় একটা মাত্র চাক তৈরী করতে দেখা যায়। এরা বট, পাকুড়, আম, গরাণ প্রভৃতি গাছের উঁচু ডালে চাক করে। এরা চাকের উপরের অংশে মধু ও পরাগ জমা রাখে এবং নীচের অংশে শাবকদের প্রতিপালন করে। এদের চাকের শ্রমিক ও পুরুষের কুঠুরীর (Cell) কোন পার্থক্য নেই। এরা পরিশ্রমী এবং ভাল মধু সংগ্রহকারী। এদের চাক থেকে কোন কোন সময়ে 25-40 কে. জি. পরিমাণ মধু পাওয়া যায়। এদের সুন্দরবন অঞ্চলে বেশী দেখা যায়।

ক্ষুদে মৌমাছি—এরা আকারে ভারতীয় মৌমাছির তুলনায় অনেক ছোট, তবে ডামার মৌমাছি অপেক্ষা বড়। এরা একটি মাত্র চাক তৈরী করে এবং অল্প পরিমাণে মধু সংগ্রহ করে। এদের পোষ মানানো সম্ভব হয় নি।

ডামার মৌমাছি—এরা আকারে পিঁপড়ের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং হুলবিহীন। মাটি এবং মোমের সাহায্যে চাক তৈরী করে। অতি সামান্ত পরিমাণে মধু সংগ্রহ করে।

ভারতীয় মৌমাছি—এই শ্রেণীর মৌমাছি আকারে ডাঁস মৌমাছি অপেক্ষা ছোট; কিন্তু ক্ষুদে এবং ডামার মৌমাছি অপেক্ষা বড়। এরা অন্ধকারে বসবাস করে। এরা দীর্ঘজীবী এবং মধু বেশী দেয়। একটি মৌমাছি পালনের বাক্স থেকে বছরে 8 থেকে 10 কিলোগ্রাম পরিমাণ মধু পাওয়া যায়; কিন্তু তা নির্ভর করে উপযুক্ত পরিবেশ এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের উপর। এই শ্রেণীর মৌমাছিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(1) সমতল এলাকার মৌমাছি এবং (2) পার্বত্য এলাকার মৌমাছি। যারা সমতল এলাকায় বসবাস করে, তারাই সমতল এলাকার (Plain type) মৌমাছি এবং যেগুলি পার্বত্য এলাকায় বসবাস করে, তাদের পার্বত্য এলাকার (Hill type) মৌমাছি বলে।

সাধারণতঃ সমতল এলাকার মৌমাছিদের কাঁঠাল, নারিকেল, খেজুর, বট, অশ্বত্থ, তেতুল, জাম প্রভৃতি গাছের কোটরের ভিতর এবং পুরনো বাড়ীর দেয়ালের ফাটলের ভিতর 1 ফুট থেকে 20 ফুট পর্যন্ত উচ্চে চাক বাঁধতে দেখা যায়। আমাদের দেশে এই চাক বেশী দেখতে পাওয়া যায় ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে। কারণ এই সময়ই নানারকম ফল, শস্য ও ফুলের সমারোহ থাকে। এই সময়ই চাক ধরে বাক্সে রেখে পালন করবার উপযুক্ত সময়।

কুঠুরী বা গর্তের ভিতর কুঠুরীর মুখের সঙ্গে লম্বভাবে পরস্পর পাশাপাশি সমান্তরালভাবে 5 থেকে 11টি চাক তৈরী করতে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর মৌমাছিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাক্সে রেখে পালন করা যায়, কারণ—

ক) এরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে বলে আধুনিক মক্ষিকাগৃহে (Bee box) থাকতে কোন অসুবিধা হয় না।

খ) এরা একাধিক চাক তৈরী করে এবং চাকগুলি পরস্পর পৃথক; তাই মক্ষিকাগৃহের ফ্রেমে অতি সহজেই চাক তৈরী করে এবং চাকগুলি পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়।

গ) মক্ষিকাগৃহে একবার ধরে রাখলে সহজেই পোষ মেনে যায়, যার ফলে নিজেদের আয়ত্তে

রেখে ভ্রাম্যমান মক্ষিকা পালনের উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

ঘ) অসময়ে (বর্ষাকালে) মৌমাছিদের কৃত্রিম খাওদাম ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবার দরুণ ওরা মক্ষিকাগৃহে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

বর্তমানে আমরা বাড়ীতে 2-1টি মৌমাছি-বাক্স (Bee hive) তৈরী করে অল্প সময়ের মধ্যে পরিচর্যার দ্বারা আর্থিক দিক থেকে এবং দেশের মধু এবং শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে লাভবান হতে পারি। কাজেই মধু, মোম, কৃষিফসল ও ফলোৎপাদনের স্বার্থেই মৌমাছি পালন শিল্পের বিকাশ ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বৈদ্যুতিক মোটরগাড়ীর ব্যাটারী

পেট্রোলিয়ামের অভাব সারা বিশ্বে কেবল বেড়েই চলেছে। এই কারণে মোটরগাড়ী চালাবার উপযোগী নতুন শক্তি সন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানীদের ভাবনার অন্ত নেই। বৈদ্যুতিক মোটরগাড়ীর জন্যে ব্যাটারী আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ব্যাটারীর ডিজাইনে নতুন কিছু পরিবর্তন আনতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাটারী-পরিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ীই পরিবহনের ব্যাপক ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের গাড়ীর খুব সীমিত ব্যবহারই এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে অনেকে মনে করেন, পেট্রোল-চালিত মোটর গাড়ীর ব্যয় দিন দিনই যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তার ফলে স্বল্প ব্যয়সাধ্য বৈদ্যুতিক গাড়ীর প্রচলন যে অচিরেই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা এই ধরণের অভিমত প্রকাশ করেন, চার্লি রবার্টস তাঁদের অন্যতম। জর্জিয়ার অন্তর্গত আটলান্টায় তাঁর বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ীর একটি এজেন্সী আছে। তিনি বলেছেন নতুন ধরণের এই গাড়ীর সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, এতে খরচ খুব কমই পড়ে। এই গাড়ীতে পেট্রোল বা অন্য কোনও জিনিষ যা পেট্রোল-চালিত গাড়ীতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে সব কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এই নতুন গাড়ী চলে বিদ্যুতের সাহায্যে। আর এক মাইল পথ যেতে বিদ্যুতের খরচ পড়ে প্রায় এক পেনি।

তবে বৈদ্যুতিক গাড়ীর যে অসুবিধা কিছু নেই—তা নয়। এই গাড়ী নিয়ে প্রথম যে সমস্যা তা হলো, তার ব্যাটারীর বিদ্যুৎ মজুত রাখবার ক্ষমতা সীমিত। সীসা ও অ্যাসিডে তৈরী প্রচলিত ব্যাটারীর অধিক বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখবার শক্তি নেই। ব্যাটারী পুনর্বার চার্জ করে নেবার পূর্ব পর্যন্ত খুব কম পথই গাড়ীর পক্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব। এই কারণেই মিঃ রবার্টসের গাড়ীগুলি প্রধানতঃ শহরের মধ্যেই চলাচলের উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। এই গাড়ীগুলির ব্যাটারী একবার চার্জ করবার পর 80 কিলোমিটার পথ চলতে পারে, অবশ্য তা নির্ভর করে আবহাওয়া, পথের বিস্তার, চলবার পথে গাড়ী থামানো, গাড়ী ছাড়া প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর।

সম্প্রতি মার্কিন সরকারের গবেষণাগারগুলির এক প্রতিবেদনে আরও শক্তিশালী নতুন ধরণের ব্যাটারী তৈরীর ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাটারী চালু হলে বৈদ্যুতিক

মোটর গাড়ীর প্রচলন যে ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানীরা নিকেল আর দস্তায় তৈরী এক নতুন ধরণের ব্যাটারী পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই ব্যাটারীর ওজন বর্তমানে প্রচলিত ব্যাটারীর চেয়ে বেশী হবে না, অথচ গাড়ী চলবে অনেক বেশী সময়।

যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার আর একদল বিজ্ঞানী একপ্রকার নতুন ব্যাটারী তৈরীর কাজে ব্যস্ত আছেন। এই ব্যাটারী তৈরী হবে লিথিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম আর আয়রন-সালফাইডে। এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই ব্যাটারী-চালিত গাড়ী আধুনিক পেট্রোল-চালিত গাড়ীর সমকক্ষ হতে পারবে। এই গাড়ী দ্রুত চলবার যেমন উপযোগী, পাহাড়ে ওঠবার ব্যাপারেও তেমনি। ব্যাটারী একবার চার্জ করে নিলে তিন-শ' কিলোমিটারেরও বেশী পথ এই গাড়ী চলতে পারবে। শুধু তাই নয়, এই গাড়ী রাতের বেলায় মাত্র তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পুনরায় চার্জ করে নেওয়া সম্ভব। তা ছাড়া এই ব্যাটারীর ওজনও বর্তমানে প্রচলিত ব্যাটারীর চেয়ে অনেক কম। অথচ এর বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখবার ক্ষমতা বহুগুণ বেশী। এই অভিনব ব্যাটরী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করে আসতে আরও দু-তিন বছর সময় লাগবে। আর এর উৎপাদন শুরু হতেও আরও কয়েক বছর বিলম্ব রয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা এই ব্যাটারীর ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে খুবই আশাবাদী।

সাঁতার সম্বন্ধে গবেষণা

সাঁতার সম্বন্ধে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, সাঁতারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী পটু। এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। দু-জন শারীরতত্ত্ববিদ্ এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল মেয়েদের পক্ষে আশার বিষয়।

গবেষণা চালানো হয়েছিল নিউ ইয়র্কের বাফালো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। শারীরতত্ত্ববিদ দু-জনের নাম ডক্টর ডেভিড আর পেনডারগাষ্ট এবং ডক্টর ডোনাল্ড ভাব্লিউ রেণী। এঁরা গত তিন বছর ধরে জলের নীচে মানুষের সাঁতার কাটবার ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। এই গবেষণার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাঁতারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী দক্ষ।

তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, জলের উপর বা নীচে যেখানেই হোক না কেন, একজন সুদক্ষ মহিলা সাঁতারুর তুলনায় একজন সাধারণ পুরুষ সাঁতারুকে একই কাজে মোটামুটি শতকরা ত্রিশ ভাগ বেশী পরিশ্রম করতে হয়।

ডক্টর পেনডারগাষ্ট বলেন যে, মহিলাদের বুকের কাছে অ্যাডিপোস টিস্যু বেশী থাকায় অর্থাৎ চর্বির পরিমাণ বেশী থাকায় তারা অনেক সহজে জলে ভেসে থাকতে পারে। মেয়েদের পায়েও চর্বির ভাগ বেশী। তাই ডক্টর পেনডারগষ্ট-এর মতে, সাঁতার কাটবার সময় পায়ের কাজেও তাদের সুবিধা হয় বেশী। তিনি বলেছেন, মেয়েদের পা জলে অনেক বেশী হাল্কা হয়, তাই পা ছোঁড়বার কাজটা সহজ হওয়ায় সাঁতার কাটতে তাদের অনেক সুবিধা হয়।

তিনি আরও বলেছেন, পুরুষের পায়ে পেশীই প্রধান, তাই অনেক ভারী। সেই জন্যে সব সময়ে দেহের তুলনায় তা নীচের দিকে নেমে থাকে। পা তুলতে বেশ পরিশ্রম করতে হয় তাদের।

রাসায়নিক পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণে মানুষের যে একারই হাত আছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিও এই ব্যাপারে সমান দায়ী। ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার ফ্রেশ ওয়াটার বায়োলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর জন উড এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

কোন কোন ধাতব পদার্থ কেমন করে আমাদের চারদিকের পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পরিমাণে বাড়তে বাড়তে একসঙ্গে জমা হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ এবং উচ্চস্তরের অনেক জীবজন্তুর স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই নিয়ে তিনি বছরের পর বছর গবেষণা করে কাটিয়েছেন।

ধাতব পারদ অত্যন্ত বিষাক্ত যৌগ। কুড়ি বছরেরও বেশী আগে বেশ কিছু জাপানী ছেলে এক রহস্যজনক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়, সেই থেকেই এই গবেষণার সূত্রপাত।

পারদ দূষিত বিষাক্ত মাছ খেয়ে ছোট এক ধীবরপল্লীর বাসিন্দারা কি নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীনই না হয়েছিল! একটা প্লাষ্টিক কারখানা থেকে এই পারদ এসে জমতো চারপাশের পরিবেশে। মাছের দেহের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকলো এই ধাতব পারদ। ধীবরপল্লীর বাসিন্দারা খেল এই মাছ। ফলে প্রায় 120 জন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রায় 42 জন প্রাণ হারালো এই ঘটনায়। সেটা 1953 সালের কথা। ইরাকের আর একটি ঘটনা। আমদানীকৃত এক কিস্তি দানাশস্য ভুল করে খাওয়ানো হলো মুর্গি ও অন্যান্য পশুদের। এতে ছত্রাক-নিবারক ওষুধ মেশানো ছিল। এই ওষুধ তৈরী হয়েছিল ধাতব পারদ থেকে। এর পরিণতি হলো ভয়াবহ। প্রায় 400 লোক প্রাণ হারালো, আরও প্রায় 400 লোক চিররুগ্ন হয়ে গেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি দিন যে 26 হাজার টন ক্লোরিন তৈরী হয়, তাতে পারদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডক্টর উডের ধারণা আমেরিকাতেও ঐরূপ বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটা আশ্চর্য নয়। তবে এই পারদ যে পরিবেশের মধ্যে মিশে যেতে পারে—সেই আশঙ্কা সম্পর্কে মার্কিন সরকার অবহিত আছেন।

ডক্টর উড সম্প্রতি বিজ্ঞান-লেখকদের এক সম্মেলনে বলেছেন, গত পাঁচ বছর ধরে মার্কিন সরকার পরিবেশ দূষণ রোধ করবার জন্যে প্রচুর কাজ করেছেন। কিন্তু এসব ধরণের ধাতব পদার্থ কি ভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও প্রয়োজন। জানা দরকার কোন্ কোন্ অঞ্চলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্যেই এটা দরকার। সব দেশের মানুষই এই সম্পর্কে আগ্রহশীল। এই সহযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে। এই দুটি দেশেরই সীমানায় আছে বড় বড় কয়েকটি হ্রদ, যার নাম গ্রেট লেক্স। এই হ্রদের জল দূষিত করবার জন্যে দায়ী ছিলেন ক্যানাডা সরকার ও ক্যানাডার শিল্প-কারখানার মালিকেরা। সেই দূষিত জল এসে পড়লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আবার যুক্তরাষ্ট্র থেকেও যে দূষিত জল ক্যানাডায় যাচ্ছে না, এমন নয়।

পরিবেশ দূষণে মানুষ আর প্রকৃতি কোথায় কতখানি হাত মিলিয়েছে, সেটাই ডক্টর উডের গবেষণার বিষয়।

ভারনার হাইসেনবার্গ স্মরণে

আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ভারনার হাইসেনবার্গ (Werner Heisenberg) 1976 সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 75 বছর।

1901 সালের 5-ই ডিসেম্বর জার্মেনীর ভুৎস-বার্গে (Wuerberg) হাইসেনবার্গের জন্ম। তাঁর পিতা আউগুষ্ট হাইসেনবার্গ ছিলেন প্রাচীন

ভারনার হাইসেনবার্গ

গ্রীকভাষার অধ্যাপক। অল্প বয়সেই বহু বিশিষ্ট অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান ভারনার। গণিতচর্চায় আত্মনিয়োগ করবার ইচ্ছায় প্রথমে তিনি অধ্যাপক লিণ্ডেমানের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু লিণ্ডেমান যখন শুনলেন, হেরমান ভাইলের 'দেশ, কাল ও পদার্থ' পড়ে হাইসেনবার্গ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে মনোসংযোগ করতে। সেই পরামর্শ শুনে সমারফেল্ডের কাছে হাইসেনবার্গ তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেই সময় সমারফেল্ডের বহু প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উলফ্-গাঙ পাউলির সঙ্গে হাইসেনবার্গের গভীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় এবং সে সৌহার্দ্য আজীবন অটুট ছিল।

তরল পদার্থের ত্বরিত প্রবাহের স্থিরত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে 1923 সালে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাইসেনবার্গ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর গোটিংগেনে অধ্যাপক ম্যাক্স বর্ন্-এর সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করেন। এই সময় পরমাণু বর্ণালী, বিশেষতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই বিষয়ে গবেষণারত থাকাকালে প্রখ্যাত ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীলস্ বোর-এর পারমাণবিক মডেল সংক্রান্ত কাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

আলোকের পারমাণবিক শোষণ, ষ্টার্কের বর্ণালীরেখা বিভাজন ক্রিয়া ইত্যাদি কিছু প্রাথমিক কাজ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, বোরের প্রস্তাবিত তত্ত্বের কয়েকটি জিনিষ (যেমন—ইলেকট্রনের বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার কক্ষপথ) নিরীক্ষণযোগ্য নয়। এথেকে তাঁর ধারণা হলো —পদার্থ-বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বে শুধু নিরীক্ষণযোগ্য তথ্যই থাকা উচিত। এই ধারণাকে কিভাবে

প্রতিষ্ঠিত করা যায়—সেই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হলেন।

1925 সালের জুন মাসে হাইসেনবার্গ হে-ফিভারে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে গোটিং-গেন ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। উত্তর সাগরের ছোট দ্বীপ হেলিগোল্যাণ্ডে তিনি আরোগ্য লাভের জন্যে যান। এখানেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা সঠিকভাবে দানা বাঁধে। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে—হেলিগোল্যাণ্ডে আমি একটা বিশেষ অন্তঃপ্রেরণা লাভ করেছিলাম। আমি উপলব্ধি করেছিলাম কালের (Time) পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি (Energy) অপরিবর্তনীয়। তখন গভীর রাত্রি, আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল সূত্রগুলির গাণিতিক রূপ দিতে কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম এবং অভীষ্ট লাভে সক্ষম হয়েছিলাম। তারপর সূর্যোদয় দেখবার জন্যে আমি পর্বতচূড়ায় আরোহণ করেছিলাম এবং আমার সমস্ত মন এক গভীর আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে হাইসেনবার্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে গতিবিদ্যা ও বল-বিদ্যার সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যার (On a new interpretation of kinematical and mechanical relations by means of the quantam theory) সুনির্দিষ্ট রূপ দেন।

1927 সালে হাইসেনবার্গ তাঁর বিখ্যাত 'অনির্দেশ্যবাদ সূত্র' (Indeterminacy principle) প্রকাশ করেন। এই সূত্রে একদিকে যেমন পদার্থবিদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত, অপরদিকে তেমনি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীও। একটা অন্ধ-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ ভেবেছিল—বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির চরম সত্তা (Ultimate reality) একদিন উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ থেকে জানা গেল—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বোধের জগতের পিছনে রয়েছে যে বাস্তব, তাকে উপলব্ধি করতে যে ছবিই কল্পনা করা হোক না কেন, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিকিরণের কণাধর্ম ও পদার্থের তরঙ্গ—এই দুটি আবিষ্কার হাইসেন-বার্গের অনির্দেশ্যবাদের মূল ভিত্তি। হাইসেনবার্গ বললেন—বস্তুকণার অন্তর্লীন এমন একটা বিচ্ছিন্নতা আছে, যা সনাতনী পন্থায় ধারণা করা যায় না। অণু-পরমাণুর জগৎ এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর জগৎ যে, আমরা যখন তাদের উপর পরীক্ষা চালাই, তখন তাদের অবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখা যায় না। আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলা-কালেই তাদের অবস্থান্তর ঘটে। সুতরাং সনাতনী তত্ত্বের মত সুনিশ্চিতভাবে তাদের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে যা করা যেতে পারে, তা হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে সম্ভাবনামাত্র।

1932 সালে জেমস চ্যাডউইক (James Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কার করবার পর হাই-সেনবার্গ জানালেন, এই নতুন মৌল কণাটি প্রোটনের মত পরমাণু কেন্দ্রীনের অন্তর্ভুক্ত। পরমাণুর কেন্দ্রীন প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে গড়া—এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি তত্ত্বীয় কেন্দ্রীন পদার্থ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। তিনি বললেন—প্রোটন ও নিউট্রন একই বস্তুর দুটি রূপ।

1927 সালে 26 বছর বয়সে হাইসেনবার্গ লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মেনীতে নাৎসী সরকার গঠনের পর বহু জার্মান বিজ্ঞানীকে দেশত্যাগ করতে হয়। হাইসেনবার্গ কিন্তু জার্মেনীতে ছিলেন। 1937 সালে তিনি এলি-জাবেথ সুমাকারকে বিবাহ করেন। এই সময় নানা বাধাবিপত্তি ও অপমানকর অবস্থার মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা কাজ করতেন। মহাযুদ্ধের সময় জার্মান পরমাণুশক্তি পরিকল্পনায় তিনি

ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু নাৎসী সরকারের কাছে পরমাণুশক্তি উৎপাদনের জন্যে তিনি কোন বড় রকম অর্থসাহায্য চান নি এবং তাঁকে বেশী অর্থ সাহায্য দেওয়াও হয় নি। কাজটি সফল করতে হলে যে বড় রকম অর্থকরী পরিকল্পনার প্রয়োজন, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেটা উপলব্ধি করেই তিনি এই কাজে আর অগ্রসর হতে উৎসাহ পান নি।

হাইসেনবার্গ জার্মেনী ও জার্মান সংস্কৃতিকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাই দেশের দুর্দিনে যুদ্ধবিগ্রহে ও চূড়ান্ত পরাজয়ে তিনি ও তাঁর পরিবার দেশবাসীর সঙ্গে দুর্দশা ভোগ করেছিলেন, কিন্তু দেশত্যাগ করে যান নি। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে তাঁর বাসস্থান বিধ্বস্ত হয় এবং যুদ্ধশেষে তাঁকে কিছু দিন বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরম আঘাতের পরও জার্মান জাতি বেঁচে ছিল তাঁদের সততা, অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের জোরেই। যুদ্ধোত্তর জার্মেনীর পুনর্গঠনের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল হাইসেনবার্গের মত দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানীদের। হাইসেনবার্গের তত্ত্বাবধানে বার্লিন, গোটিংগেন ও মিউনিকে ম্যাক্সপ্লাঙ্ক ইনষ্টিটিউট গড়ে ওঠে। তিনি এই তিনটি স্থানীয় ইনষ্টিটিউটে অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন।

1953 সাল থেকে হাইসেনবার্গ একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই গবেষণাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি এমন একটি তত্ত্বের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, যাতে পদার্থ-বিজ্ঞানের সকল সূত্রকে এক সূত্রে গাঁথা যাবে। তাঁর সেই প্রয়াস অবশ্য সফল হয় নি।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সংক্রান্ত অনন্য গবেষণার জন্যে 1932 সালে হাইসেনবার্গকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজ্ঞান জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ছাড়া দেশ-বিদেশের আরও বহু সম্মান তিনি লাভ করে-ছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন স্নেহশীল ও সুরসিক। তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ এবং নিজে যন্ত্রসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

1929 সালে হাইসেনবার্গ ভারত সফরে আসেন এবং সে সময় কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে তিনি একটি বক্তৃতাও দিয়ে-ছিলেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ : অষ্টম সংখ্যা

সূর্যকিরণের সাহায্যে পরিচালিত কৃত্রিম উপগ্রহের তাপীয় ইঞ্জিনের একাংশের ছবি। বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সিলিণ্ডারে ভর্তি করে space shuttle delivery ব্যবস্থায় মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানেই যন্ত্রাংশগুলিকে যথাযথভাবে এঁটে দিয়ে ইঞ্জিনটিকে কার্যকরী করা হবে। চিত্রের একপাশে এরূপ তিনটি সিলিণ্ডার দেখা যাচ্ছে। সূর্যালোক সংগ্রহের জন্য যন্ত্রটিতে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি দর্পণ সংলগ্ন আছে।

মেঘ-পরিচয়

নানা ধরণের মেঘ, আকাশের বিভিন্ন উচ্চতায় দেখতে পাওয়া যায়। কালবৈশাখীর বয়ে আনা স্তম্ভাকৃতি মেঘ আকাশের কোণে ভয়াল রূপ ধরে। বর্ষা সমাগমে ঘন কাল গুরুভার মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। বর্ষান্তে লঘুভার সাদা মেঘ ইতস্তত: ভেসে বেড়ায়। উচ্চ আকাশে গড়ে ওঠে লম্বা আঁশযুক্ত সাদা মেঘের গুচ্ছ। কোথায়ওবা স্তূপীকৃত মেঘের সুউচ্চ পাহাড়। কখনও দেখা দেয় স্তরে স্তরে সাজানো মেঘের বাহার। কখনও মেঘের চাদর সারা আকাশ ঢেকে থাকে। আকাশময় ছোট ছোট রূপালী টুকরা মেঘের বিচিত্র বিন্যাসও দেখা যায়। মেঘের আকার স্থির থাকে না। এক ধরণের মেঘের নানা ভঙ্গিমায় রূপান্তরিত হতে বেশী সময় লাগে না। নানা রকমের মেঘের সংমিশ্রণও একসঙ্গে আকাশে থাকে।

আন্তর্জাতিক মেঘ মানচিত্রাবলীতে বিভিন্ন প্রকারের মেঘগুলিকে মোটামুটি দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবী থেকে 6/18 কিলোমিটারের মধ্যে ভিত্তি করে তিন শ্রেণীর মেঘ গড়ে উঠে। এদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—

(1) সিরাস (Cirrus)—কোঁকড়ানো, সাদা লোমগুচ্ছের মত মেঘ, অনেকটা ধাবমান অশ্বের পুচ্ছাকৃতি। এগুলিকে অলক মেঘ বলা যেতে পারে (1নং চিত্র)।
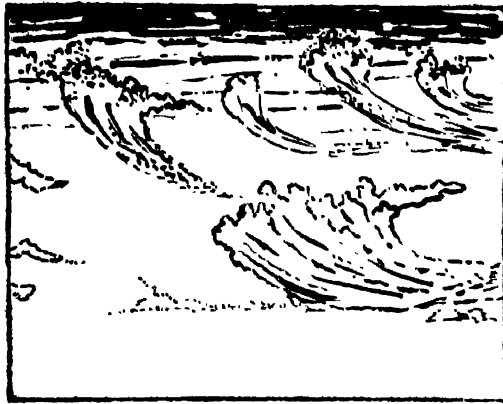
1নং চিত্র—সিরাস

(2) সিরোস্ট্র্যাটাস (Cirro-stratus)—দুধের মত সাদা, পাতলা চাদরের মত মেঘ। এই মেঘের আবরণ সূর্য বা চন্দ্রের চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয় তৈরী করে। এই মেঘগুলিকে অলকাস্তর মেঘও বলা চলে। (3) সিরোকিউমিউলাস (Cirro-cumulus) ছোট আঁশের মত বা বেলনাকার সাদা মেঘ; আকাশ জুড়ে সারিবদ্ধভাবে বা ঝাঁকে ঝাঁকে বিস্তৃত থাকে। এই জাতীয় মেঘকে পুঞ্জালক মেঘ বলা যায় (2নং চিত্র)।

পৃথিবী 2-8 কিলোমিটারের মধ্যে ভিত্তি করে আরও দুই শ্রেণীর মেঘ জমে। এদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—

2নং চিত্র—সিরোকিউমিউলাস

(1) অ্যালটোষ্ট্র্যাটাস (Alto-stratus)—ঈষৎ ধূসর, পুরুপর্দা বা ঢাকনার মত মেঘ। সূর্য বা চন্দ্র সম্পূর্ণ ঢাকা পড়তে পারে। এগুলিকে উচ্চস্তর মেঘ বলা যায়। (2) অ্যালটো-

3নং চিত্র—অ্যালটোকিউমিউলাস

কিউমিউলাস—সাদা বা ধূসর লম্বা ছাঁদে স্তূপ করা আংশিক আঁশযুক্ত মেঘ। এদের উচ্চ পুঞ্জ মেঘ বলা যায় (3নং চিত্র)।

পৃথিবা থেকে দুই কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত ভিত্তি করে পাঁচ রকমের মেঘ দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ—(1) ষ্ট্র্যাটাস—ধূসর মেঘ, স্তরে স্তরে সাজানো। মেঘের বহিরেখা স্পষ্ট। উর্ধ্বদিকে বিস্তৃতি সামান্য। এদের আস্তর মেঘ বলা যায়। (2) ষ্ট্র্যাটোকিউমিউলাস (Strato-cumulus)—স্তূপ করা পুরু স্তরযুক্ত, আঁশহীন সাদা বা ধূসর মেঘ। উর্ধ্ব বিস্তৃতি থাকে। ষ্ট্র্যাটাস মেঘের চেয়ে ঘন। এদের আস্তরিক পুঞ্জ মেঘ বলা চলে (4নং চিত্র)।

(3) নিম্বোষ্ট্র্যাটাস (Nimbo stratus) কালো অথবা ধূসর পুরু স্তরযুক্ত ঘোলাটে মেঘ। সূর্য সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে। এগুলিকে ঝঞ্ঝাস্তর মেঘ বলা যেতে পারে।

4নং চিত্র—ষ্ট্র্যাটোকিউমিউলাস
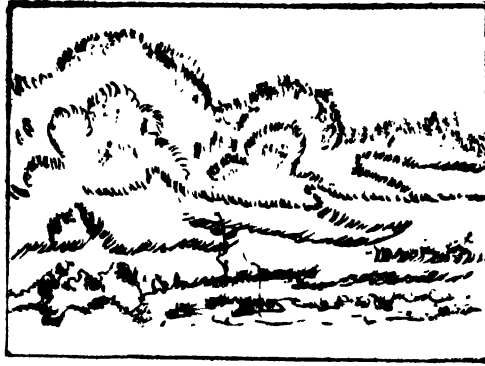
(4) কিউমিউলাস ত পেঁজা তুলার পাহাড়সদৃশ মেঘ; উপরিভাগ ফুলকপির উর্ধ্বভাগের মত । এর উর্ধ্বদিকে বিস্তার ও ঘনত্ব খুব বেশী। বহিরেখা স্পষ্ট।

5নং চিত্র—কিউমিউলাস

একে পুঞ্জ মেঘ বলা যায় (5নং চিত্র)। বর্ষান্তে স্ফীত কিউমিউলাসের টুক্‌রা অনেক সময় আকাশে ভেসে বেড়ায়।

(5) কিউমিউলোনিম্বাস (Cumulo-nimbus)—সাধারণতঃ কিউমিউলাসের ভারী সমাবেশ থেকেই কিউমিউলোনিম্বাস মেঘ তৈরী হয়। কিউমিউলোনিম্বাস, ঘন কালো ঘোলাটে, উর্ধ্বদিকে প্রসারণশীল বিশালাকৃতি মেঘ। বহিরেখা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে থাকে। এগুলি বিদ্যুৎগর্ভ ঝড়োমেঘ। এই মেঘগুলিকে পুঞ্জিত ঝঞ্ঝামেঘ বলা যেতে পারে (6নং চিত্র)।

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক নামগুলি ল্যাটিন ভাষা থেকে নেওয়া। আস্তর বা স্তর

ষ্ট্র্যাটাস; লোম বা অলক অর্থে সিরাস, স্তূপ বা পুঞ্জ অর্থে কিউমিউলাস, বৃষ্টি বা ঝঞ্ঝা অর্থে নিম্বাস এবং উচ্চ অর্থে অ্যালট্রো ব্যবহৃত হয়েছে।

6নং চিত্র—কিউমিউলোনিম্বাস

আন্তর্জাতিক মেঘ মানচিত্রাবলীতে সকল শ্রেণীর মেঘের আলোকচিত্র আছে। এখানে মাত্র কয়েক শ্রেণীর মেঘের রেখাচিত্র দেখানো হলো।

সুধেন্দু দত্ত

কয়লা

জ্বালানী তেলের দাম তেল উৎপাদক দেশগুলি অসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়ায় পেট্রোলিয়াম আমদানীকারী সব দেশ খুবই অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছে। দু-বছর আগেও তেলের জন্যে ভারতবর্ষকে ব্যয় করতে হতো বছরে 200 কোটি টাকা। এখন ব্যয় করতে হচ্ছে 1000 কোটি টাকা—তাও বৈদেশিক মুদ্রায়। সে তুলনায় রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ে নি। উন্নতিশীল দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি সেই জন্যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। পেট্রোলিয়ামের এই অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে, যার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহ এখন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি কয়লাসমৃদ্ধ দেশের সরকারের নজর এখন তাই বিকল্প শক্তির উৎস কয়লার দিকে। আসলে সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির মূলেই আছে কয়লা। কয়লার তাপের উপযোগিতা আবিষ্কারের পর থেকেই বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও তারও পরে কয়লার তাপ থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সাধিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কয়লা যুগান্তর এনে দিয়েছে এবং

সেই সঙ্গে বাড়িয়েছে আমাদের জীবনযাত্রার মান। জ্বালানী হিসাবে ব্যাপক হারে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার হয়েছে অনেক পরে। এর কারণ পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেল কয়লার থেকে অনেক সস্তায়। উপযোগিতা প্রায় একই রকম, অথচ জ্বালালে ধোঁয়া নেই। এখন আর পেট্রোলিয়াম সস্তা রইলো না, তাছাড়া পৃথিবীতে সঞ্চিত তেলের পরিমাণও কম—মাত্র 7620 কোটি টন। যে হারে তেল মাটি থেকে তোলা হচ্ছে, সেই হারে তুলতে থাকলে এই শতাব্দীর শেষের দিকেই প্রাকৃতিক তেলের সঞ্চয় প্রায় শেষ হয়ে যাবে।

অথচ পৃথিবীতে কয়লার ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত। এখনও পর্যন্ত ভূতত্ত্ববিদেরা যা খোঁজখবর করেছেন, তাতে জানা গেছে ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ কোটি টন। খনি-বিশেষজ্ঞেরা বলেন এর শতকরা 2 ভাগ অর্থাৎ মাত্র কুড়ি হাজার টন কয়লা এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে। সেই জন্যে সমস্ত কয়লাসমৃদ্ধ দেশ এখন কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি ও তেলের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহারের দিকে নজর দিয়েছে।

পৃথিবীতে কয়লার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় 250 কোটি টন—ভারতবর্ষে প্রায় 10 কোটি টন। আমেরিকা ও রাশিয়ায় সবচেয়ে বেশী কয়লা তোলা হচ্ছে—বছরে প্রায় 60 কোটি টন। প্রায় 100 কোটি টন কয়লা বছরে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে লাগে। অনেক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানী হিসাবে এখন পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার হয়। পেট্রোলিয়ামের বিকল্প হিসাবে কয়লার উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে।

কয়লা শুধু তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনেই প্রয়োজন হয় না; ইস্পাত উৎপাদনেও কয়লার প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রতি টন ইস্পাত উৎপাদনেব জন্যে এক টনের থেকে কিছু বেশী বিশেষ ধরণের কোকিং কয়লার প্রয়োজন হয়। 1972 সালে পৃথিবীতে ইস্পাতের উৎপাদন হয়েছিল প্রায় 60 কোটি টন—এর জন্যে কয়লা খরচ হয়েছে প্রায় 80 কোটি টন। সব শিল্পেরই মেরুদণ্ড হলো ইস্পাত। বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি হলো ইস্পাতের উৎপাদন ও তার মাথাপিছু খরচ। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই ইস্পাতের উৎপাদনও বেড়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে বাড়াতে হবে কয়লার উৎপাদনও।

ইস্পাত উৎপাদনের জন্যে যে কোক লাগে, তা কয়লা থেকে এক বিশেষ ধরণের বায়ুনিরুদ্ধ চুল্লীতে তৈরী হয়। এই পদ্ধতিতে যে গ্যাস পাওয়া যায়; তার থেকে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া, আলকাত্‌রা ও জ্বালানী গ্যাস। অ্যামোনিয়া থেকে তৈরী হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট, যা সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার হয়। জ্বালানী গ্যাস কলকারখানা, বাড়ীঘরে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়। আর আলকাত্‌রা থেকে পাওয়া যায় অসংখ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বিভিন্ন রকমের নিত্যপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি এই কালো থক্‌থকে আলকাতরা থেকে তৈরী হচ্ছে। রং, সুগন্ধি দ্রব্য, বিস্ফোরক পদার্থ, ওষুধ, কীটনাশক ওষুধ, ডেটল, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম কাপড়, ভারী লুব্রিক্যান্ট, রাস্তা তৈরী করবার পিচ, জল-নিরোধক আচ্ছাদন, আরও কত কি!

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কয়লা শুধু শক্তির প্রধান উৎসই নয়, ইস্পাত উৎপাদনে কয়লা অপরিহার্য আর কয়লার গ্যাস থেকে পাওয়া যায় হাজার হাজার রকমের জিনিষ, যা আমাদের প্রতিদিনই প্রয়োজন হয়। এখন চেষ্টা হচ্ছে কয়লাকে সস্তায় পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত করবার এবং আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকেরা তাতে সফলও হবেন।

ভারতবর্ষে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় 8300 কোটি টন—পৃথিবীর সঞ্চয়ের প্রায় এক ভাগ। আরও কয়লার সঞ্চয় আছে কিনা, তার জন্যে অনুসন্ধান চলছে। আমাদের বার্ষিক উৎপাদন এখন প্রায় 10 কোটি টন পৃথিবীর উৎপাদনের প্রায় 4 ভাগ। অনুমান করা যাচ্ছে, 2000 খৃষ্টাব্দে এই উৎপাদন বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে 20 কোটি টনে। আরও আশা করা যাচ্ছে, কয়লাশিল্পের চতুর্দিকে গড়ে উঠবে অনেক রাসায়নিক শিল্পের কারখানা ও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এই কয়লার উপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশ অচিরেই শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত এক দেশে পরিণত হবে।

রবীন্দ্রনাথ চট্টরাজ

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 : নাইলন কি তন্তুজ পদার্থ ?

সীমা দাস, কলিকাতা-6

উত্তর 1 : নাইলন তন্তু বিশেষ। তন্তু অর্থে আঁশ বোঝায় ; কিন্তু নাইলন তন্তু হলেও স্বাভাবিক ভাবে তা পাওয়া যায় না। সংশ্লেষিত উপায়ে বা কৃত্রিম উপায়ে এটি প্রস্তুত করতে হয়। থার্মো-রিভার্সিবল প্লাষ্টিক পলিঅ্যামাইড জাতীয় পদার্থ নাইলন। শাড়ী, মাছ ধরবার জাল, দড়ি, প্যারাসুট, টায়ার প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে নাইলনের প্রচলন আছে। অঙ্গারক অ্যাসিডের যৌগ-লবণ ও অ্যামোনিয়ামলব্ধ জৈব বিক্রিয়া থেকে এটি লভ্য।

নাইলন, রেয়ন, টেরিলিন, ব্যাকেলাইট, সিলিকোন প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু আমরা ব্যবহার করি, তা প্লাষ্টিকজাতীয় ; কিন্তু রাসায়নিক গঠন এদের এক নয় ; যেমন—রেয়ন সেলুলোজ শ্রেণীর, ব্যাকেলাইট ফেনলিক শ্রেণীর। গ্রীক Plastikos (To form) শব্দ থেকে প্লাষ্টিক আমাদের ভাষায় এসেছে। নবাগত হলেও এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দেবকুমার গুপ্ত

বিবিধ

মঙ্গলগ্রহে নিরাপদে ভাইকিং-1 মহাকাশযানের অবতরণ

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্ণিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—মহাবিশ্বজয়ে মানুষের আবার একটি সাফল্য। মার্কিন মহাকাশ-যান ভাইকিং-1 20শে জুলাই মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নেমেছে। এই যানে অবশ্য কোন মানুষ নেই।

আমেরিকার টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে মঙ্গলের মাটির প্রথম ছবি। প্রথম ছবি আসতে সময় লেগেছে 35 মিনিট। ভাইকিং-1 মঙ্গলের মাটি ছোঁবার 25 সেকেণ্ডের মধ্যে ক্যামেরা প্রথম ছবিটি তোলে। প্রতিটি ছবি তুলতে ক্যামেরার লাগে পাঁচ মিনিট। মহাকাশযান নামবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ছবির কোণার দিকে ওই যানেরই তিনটি পা দেখা যায়। পায়ের তলার দিকটার গড়ন চাকীর মত। যানটির রকেট চালু হয়ে শেষবারের মত তাকে ভূমিস্থ করে। ছবিতে দেখা যায়—যানটির আশেপাশে ধারালো, পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা বিশাল পাথর। সূচের মত ডগা। কাছাকাছি শুধু ওই রকম পাথর আর ধুলা, শুধু ধুলা। এই প্রথম মানুষ মঙ্গলগ্রহের ভূপ্রকৃতি এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পেল।

মঙ্গলের দিগন্তবিস্তৃত মাটির উপর ধারালো এবং সূচলো গড়নের পাথর ছাড়াও ছবিতে বালিয়াড়ি দেখা গেছে। বিজ্ঞানী ডক্টর টমাস মাচ বলেছেন, দিগন্তের দু-তিন কিলোমিটার উপরে তিনি একখণ্ড মেঘ দেখতে পেয়েছেন। মঙ্গলের মাঝখানে নুড়ি দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মনে হচ্ছে, মঙ্গলের মাটি বেশ নরম। তবে 600 কিলো ওজনের সন্ধানী যানটি মাটিতে বসে যায় নি।

ভাইকিং-1 নেমেছে মঙ্গলের উত্তর গোলার্ধে। এখানে আবহাওয়ামণ্ডল খুব পাতলা। পৃথিবী থেকে ঐ অবতরণক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছুতে ভাইকিং-1-এর 34 কোটি 40 লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে। তার কাছ থেকে বেতার-সঙ্কেত এই দূরত্ব পেরিয়ে আসতে উনিশ মিনিট সময় নিল। ভাইকিং-1 যাত্রা সুরু করেছিল গত বছর 20শে অগাষ্ট। লক্ষ্য ছিল মঙ্গলে পৌঁছবে এই বছর 4ঠা জুলাই। কারণ ওই দিন মার্কিন স্বাধীনতার দ্বি-শতবার্ষিকী। যেখানে নামবে বলে ঠিক করা হয়েছিল, পাঁচ সপ্তাহ আগে তা বাতিল করা হয়। ভাইকিং-1 মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছয় 19শে জুন। সেই দিন থেকেই সে কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে 20 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গার ছবি পাঠাতে থাকে। চারটি সম্ভাব্য অবতরণ ক্ষেত্রের ওই সব ছবি থেকে মঙ্গলপৃষ্ঠের বিস্তারিত মানচিত্র তৈরী করা গিয়েছিল। ভাইকিং-প্রকল্পের ভূতত্ত্ববিদ্‌রা ছবি দেখে বলেছিলেন—মঙ্গলের ভূখণ্ডের গঠন ও প্রকৃতি একেক জায়গায় একেক রকম। এমন কি একটি ছোট এলাকাতেও ওই বিভিন্নতা রয়েছে। 1972 সালে মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-9 যেসব তথ্য ও ছবি পাঠিয়েছিল, ভাইকিং-1-এর পাঠানো ছবি সেগুলির চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ।

মঙ্গলবিজয়ী এই মহাকাশযানের দুটি অংশ। একটি মঙ্গলের আকাশে কক্ষপথে থেকে পরিক্রমা করছে। দ্বিতীয়টি মঙ্গলে নেমেছে। প্রথম অংশটির সাহায্যেই রিলে পদ্ধতিতে পৃথিবীতে ছবি ও তথ্য পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। কক্ষপথ পরি-ক্রমারত এই অংশের ওজন 2250 কিলোগ্র্যাম। দ্বিতীয় অংশের ওজন 600 কিলোগ্র্যাম। 20শে জুলাই ভারতীয় সময় বিকাল দুটো-একুশ মিনিটে

বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুই অংশকে আলাদা করে দেওয়া হয়। প্রথম অংশে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। মঙ্গলের মাটি থেকে ছবি তোলবার কাজ এখনও একটা বছর চলতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নামতে দু-দুবার দেরী হয়েছে। এর কারণ ঠিক মত জায়গা মিলছিল না। সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল যন্ত্রই বলে দিচ্ছিল—মাটির কোথায় কেমন অবস্থা। দু-বারই মাটির অবস্থা ছিল রুক্ষ আর বন্ধুর। অবশেষে যেখানে নেমেছে, সেখানকার মাটির অবস্থা অনুকূল। মঙ্গলের এই এলাকার নাম ক্রাইসি। এটি মোটামুটি সমতল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইকিং-1-এর যাত্রা মঙ্গলগ্রহে প্রাণের সন্ধানে। এই মহাকাশযানের জন্যে যা খরচ হয়েছে পনেরো কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার।

ভাইকিং-1-এর এই সব ছবি বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই দরকারী। কারণ, এর পর মঙ্গলে নামছে ভাইকিং-2 আগামী 7ই অগাস্ট নাগাদ। এর নামবার জন্যে ভাল জায়গা এখনই বেছে নিতে হবে। ছবিগুলি পরীক্ষা করবার পর বিজ্ঞানীরা ভাইকিং-2 কে নির্দেশ দেবেন—কোথায় নামতে হবে।

মঙ্গলের রং লাল। তাকে লোহিতাঙ্গ বলা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে। জ্যোতিষচর্চায় কেউ কেউ এই গ্রহটি সম্পর্কে ভয়ের কথাও শোনান। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এর আগে যেটুকু জানা গিয়েছিল, তা হলো—তার বিশাল আগ্নেয়গিরি অলিম্পাস মনস-এর ব্যাস 860 কিলোমিটার। এর আয়তন পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়েও বড়। এই আগ্নেয়গিরি সমতল থেকে 24000 মিটার উঁচু। মঙ্গলের বিষুব যেখানে দু-ভাগ করেছে ম্যারিনারিস উপত্যকা। এটি চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে এত গভীর ও প্রশস্ত যে ভূতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন এর নিজস্ব আবহাওয়ার ব্যবস্থা এর মধ্যেই তৈরী হচ্ছে। বিষুবরেখা অঞ্চলটি 1800 কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে ম্যারিনারিস উপত্যকার কাছাকাছি। এই অঞ্চলটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানকাও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য চাঁদ, বুধ বা পৃথিবীর নেই। এটি কিন্তু বিপজ্জনক অঞ্চল। তবে সাইডোনিয়া নামে একটি অঞ্চলে জলের অস্তিত্ব থাকতে পারে। সাইডোনিয়ার আবহাওয়ামণ্ডলে পাঁচগুণ বেশী জলীয় বাষ্প আছে। ভাইকিং-1 মঙ্গলের আকাশে কক্ষপথ পরিক্রমাকালে যে তথ্য পাঠিয়েছে, তা থেকেই এই ধারণা এসেছে। যেখানে ভাইকিং-1 নেমেছে, তার নাম ক্রাইসি বা স্বর্ণভূমি। দেখে মনে হচ্ছে, আগে সেখানে একটা বিশাল হ্রদ ছিল। এখানে হয়তো অনেক নদীর জল এসে জমতো। এখানেই জৈব অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

শারদীয় সংখ্যা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা এবং প্রকাশন উপসমিতির সভ্যবৃন্দ

উনত্রিংশত্তম বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1976

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

মূল্য : তিন টাকা
(সডাক তিন টাকা পঁচিশ পয়সা)

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

বিজ্ঞপ্তি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (ফোন: 55-0660) কলিকাতা-6। ইতি

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]
[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ডাক দিয়েছেন দেশের সব মানুষকে—বিশ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণে। এসেছে সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্য—অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার। জনগণের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক এই বিশ দফা কর্মসূচী। জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে যখন আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি, সেই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন অতীত ইতিহাসকে অতন্দ্র প্রহরীর মত রক্ষণাবেক্ষণ করা—এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রতিটি মানুষকে শাণিত সজাগ চেতনা নিয়ে অতীত ইতিহাসের প্রাচীন স্থাপত্যকলার স্বাক্ষরবাহী দেবদেউল, গীর্জা, মসজিদ, মঠ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন।

অনেক ভাঙ্গাগড়ার সাক্ষী এই গঙ্গা-যমুনাবিধৌত বাংলাদেশ যুগ থেকে যুগান্তরে কত অসংখ্য মানুষ তার স্বপ্নসাধনা দিয়ে গড়ে তুলছে সৃজনধর্মী শিল্পকর্ম। বিবর্তনের ধারায় একদিন দেখা দিল এই মাটিতে মদগর্বী ক্ষমতালোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। শত চেষ্টায় তারা মুছে ফেলতে পারে নি জাতীয় ঐতিহ্যসমন্বিত পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু। মহাকালের অবক্ষয়কে উপেক্ষা করে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে আজও দাঁড়িয়ে আছে শতসহস্র পুরাকীর্তি। এদের দেখলে মনে হয়—"হে স্তব্ধ অতীত, কথা কও, কথা কও।"

বর্তমান দিনে জাতীয় সরকার ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার সাফল্য ও শক্তির মূল উৎস হল দেশের আপামর জনসাধারণ। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। তাই এই ক্ষেত্রে জনগণের কর্তব্য কি তা নীচে সন্নিবেশিত হল :—

১। পুরাকীর্তির অলঙ্করণ কাজসমূহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ—এই নীতি সবাইকে অবহিত করা প্রয়োজন।

২। পুরাকীর্তি বা উহার অলঙ্করণের উপরে নাম লেখা, দাগ কাটা বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষিদ্ধ। এই নিষেধের অমান্যকারীকে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করা উচিত।

৩। পুরাকীর্তির উপরে বা আশেপাশে গাছ জন্মালে জনসাধারণ যেন যৌথ প্রচেষ্টায় সেগুলি নির্মূল করেন এবং স্থানটি যথাসম্ভব আবর্জনামুক্ত রাখেন।

৪। জনসাধারণের নজর রাখা উচিত যে পুরাকীর্তির অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গণে যেন কেউ আগুন না জ্বালায় কেননা ধোঁয়ায় পুরাকীর্তির ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় ও অন্যান্য ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পুরাকীর্তির স্থলে সাধুসন্তদের ধুনি জ্বালানো বা বনভোজনের জন্য রান্না করা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত।

৫। ইদানীং নানারকম প্রত্নসম্পদ বা পুরাকীর্তির গাত্র থেকে অলঙ্করণাদি অপহরণের জন্য সমাজবিরোধী দুষ্টচক্র সক্রিয় আছে। এদের উপর কড়া নজর রাখা উচিত এবং এ জাতীয় কোন ঘটনার আভাস পাওয়ামাত্র স্থানীয় বি, ডি, ও, এস ডি ও এবং পুলিসের গোচরে আনা প্রয়োজন। ইতি—

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
রাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক যথাক্রমে 19·00 এবং 9·50 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন—55-0660।
2. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
4. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।
5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়

নতুন পথের যাত্রা-পথিক

চালাও অভিযান।

... ...

চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,

খেলবি কে আয় নতুন খেলা?

জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা

বাইবি কে উজান?

... ...

রাত পোহাবে প্রভাত হবে

গাইবে পাখী গান।

আয় বেরিয়ে সেই প্রভাতে

ধরবি যারা তান॥

জন্ম 24শে মে, 1899 মৃত্যু 29শে অগাষ্ট, 1976

কাজী নজরুল ইসলাম

তোমার মহাপ্রয়াণে আমরা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য ও কর্মীবৃন্দ—গভীরভাবে শোকসন্তপ্ত। তোমার পবিত্র স্মৃতির প্রতি নিবেদন করছি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভাইকিং-1-এর বর্ধিত যান্ত্রিক দণ্ড মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে গর্ত খুঁড়ে মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করেছে ছবিতে কালো অংশ এই মাটিতোলা গর্তের ছবি।
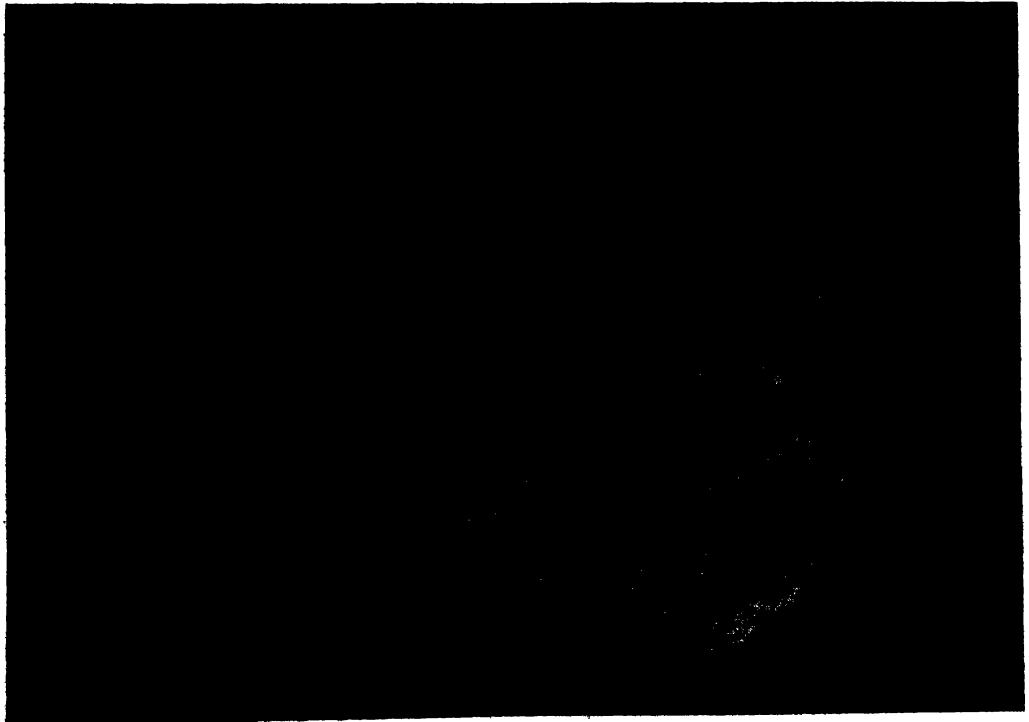
মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের মধ্যে বড়টি হলো ফবোস। ভাইকিং-1 কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফে এর পৃষ্ঠদেশে আগ্নেয়গিরির অসংখ্য জ্বালামুখের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1976 | নবম-দশম সংখ্যা

আমাদের কথা

আবার শরৎ আসিয়াছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জীবনে ইহা ঊনত্রিংশত্তম শরৎ। আজ মনে পড়ে 28 বৎসর আগেকার কথা। মনে পড়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাব্যতাকে কেন্দ্র করিয়া কত না আলোচনা, কত না তর্কবিতর্ক, কতই না সংশয়। সংশয়বাদীদের অন্যতম আশঙ্কা ছিল এইরূপ একটি পত্রিকা নিয়মিত মাসের পর মাস প্রকাশ করা কি সম্ভব? কিন্তু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রখর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে কুয়াসার জাল ছিন্ন হইয়া গেল। স্থির হইল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করিতেই হইবে। তদবধি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই দীর্ঘ 29 বৎসরে কত বাধা-বিপত্তি, কত অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু আচার্যদেব যতদিন জীবিত ছিলেন দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অমর আদর্শ আজিও আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

যাত্রাপথের প্রাক্কালে যাঁহারা আমাদের পথ-প্রদর্শক ও সঙ্গী হইয়াছিলেন, কালের অমোঘ নিয়মে তাঁহাদের অনেককেই আমরা হারাইয়াছি। নবীন বিজ্ঞানীর দল তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

জগৎ পরিবর্তনশীল—নবীনেরা পরিবর্তনের অগ্রদূত। চিন্তার নবীনতা সজীবতারই লক্ষণ। মূল আদর্শে অবিচল থাকিয়া, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া আমরা যেন অগ্রসর হইতে পারি—ইহাই আমাদের শারদ কামনা।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে চলিতে হইবে। এই চলার পাথেয় যোগাইবেন প্রবীণ ও নবীন বিজ্ঞানীর দল। তাঁহাদের লেখনী অজস্র ধারায় বিজ্ঞানের বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিয়া বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলুক এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' হউক তাঁহাদের উপযুক্ত মাধ্যম।

পরিশেষে আমাদের সকল পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহককে জানাই আমাদের শারদ অভিনন্দন।

খামআলু

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

খামআলু—একপ্রকার লতানো উদ্ভিদ। ইংরেজীতে এদের Yam বলা হয়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম Dioscorea। Dioscorea গণের এই উদ্ভিদগুলির প্রায় 600 প্রজাতি আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই সব গাছ দেখতে পাওয়া যায়। লতানো গাছগুলি সাধারণতঃ অন্য কোন সবল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ বা অন্য কোনও অবলম্বন জড়িয়ে উপরের দিকে ওঠে। এই সকল গাছের মাটির নীচে এক বা একাধিক খাদ্যপরিপূর্ণ কন্দ থাকে। এই কন্দগুলি মাটির ঠিক নীচে অথবা অনেক নীচে থাকে। খাদ্যপরিপূর্ণ এই সব কন্দের কয়েক প্রকার প্রজাতি বহু প্রাচীনকাল থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণপ্রধান বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আদিম মানুষ প্রথমে মাটির ঠিক নীচে যে কন্দগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি আহরণ করতো, পরে তারা দেখেছিল যে মাটির খুব নীচে যে সব কন্দ থাকে, সেগুলি খাদ্য হিসাবে বেশী সুস্বাদু। খনন করবার যন্ত্র তৈরী হবার পরে আদিম মানুষ এই সব কন্দকে তোলবার ব্যবস্থা করে।

বন্য অবস্থায় খামআলু গাছগুলি সাধারণতঃ বনের মধ্যে বা বনের শেষ সীমান্তে যেখানে মাটির নীচে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে এবং সহজে জল নিকাশ হতে পারে—এরূপ যায়গায় জন্মায়। খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবার জন্যে ক্রমে ক্রমে এদের চাষেরও প্রয়োজন হয়। ঠিক কোন্ দেশে এর প্রথম চাষের প্রচলন হয়—তা সঠিকভাবে জানা নেই। Dr. Goodwin (1939) তাঁর 'আফ্রিকা মহাদেশে কতিপয় খাদ্য-উদ্ভিদের উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, খুব সম্ভব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে এদের প্রথম চাষ সুরু হয়। তবে Ting নামক চৈনিক বিজ্ঞানী (Journal of Ag. Assoc. no. 186, 23-33, 1948) বলেছেন যে, Dioscorea esculenta (যার গুচ্ছ কন্দগুলি বেশ সুস্বাদু এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চাষ হয়) খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও চীনে পরিচিত ছিল এবং খুব সম্ভব তার আগে থেকেও ওখানে চাষ হতো। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রকার খামআলু পাওয়া যায় এবং বহু দিন থেকে এই সব আলু বিদেশে রপ্তানী হতো। 1936 সালের Kew Bulletin-এ এক প্রবন্ধে একাদশ শতাব্দীতে ভারত থেকে মাদাগাস্কারে খামআলুর কন্দ রপ্তানীর বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিখ্যাত ফরাসী উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ De Candolle তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (Origin of cultivated plants, 1939) বলেছেন যে, খামআলুর চাষ হয়তো খুব বেশী দিন পৃথিবীতে আরম্ভ হয় নি। Doctor Burkill—যিনি ভারতবর্ষে ও মালয়দেশে খামআলু নিয়ে বহু দিন গবেষণা করেছিলেন—তিনি বলেছেন যে, খামআলুর চাষ এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে খুব সম্ভব পৃথক পৃথক ভাবে সুরু হয়েছিল। অবশ্য এখন দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বিশেষতঃ পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত দেশেই এটি এক প্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে যে কোন শ্বেতসার পরিপূর্ণ খাদ্য কন্দকে আলু বলা হতো। মনে হয়, বহু পুরাকালে একমাত্র Dioscorea গণের খাদ্য-কন্দগুলিকেই আলু বলা হতো; ছোট ছোট কন্দগুলিকে খামআলু, চুপড়ী বা ঝোড়ার 'পিস্কা' ইত্যাদি নানাবিধ নামে অভিহিত করে। এই সব অসংস্কৃত নাম থাকবার জন্যে মনে হয়—ভারতবর্ষ আর্যগণের অধিকারে আসবার আগেই এখানে বহু জায়গায় খামআলুর চাষ প্রচলিত ছিল এবং খাদ্য হিসাবে তা বহুল ব্যবহৃত হতো।
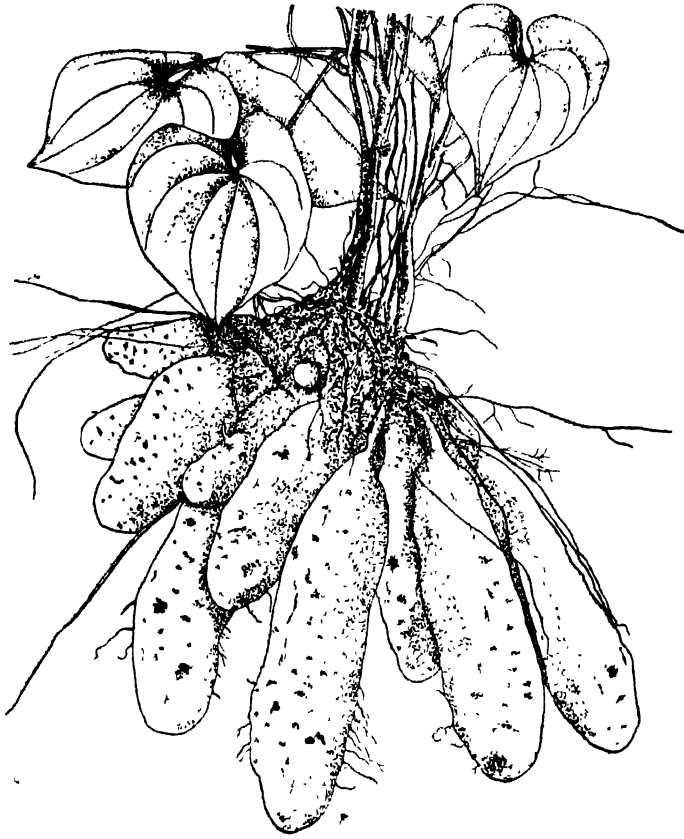
1নং চিত্র—Dioscorea esculenta-র টিউবার

আকারের বড় বড় কন্দগুলিকে 'চুপড়ী আলু বা ঝোড়া আলু বলা হয়। তারপর অবশ্য গোল আলু, লাল আলু, মধ্বালু (মিষ্টি আলু) রক্তালু, পিণ্ডালু (গোলাকৃতি আলু), শাঁকালু প্রভৃতি এদেশে এসেছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীরা এই কন্দকে 'বেঙ্গোনারি', 'বীর সাং', 'গেনাস্থ', 'কালাস্থ', 'কুস্থ', 'ক্রীম',

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার খামআলুর প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চার-পাঁচটি, যথা—D. esculenta, D. alata, D. bulbifera, D. pentaphylla ও D. belophylla-র কন্দ-গুলি ভারতের সকল প্রদেশে বনে-জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সাধারণতঃ D. esculenta (1নং চিত্র) ও D. alata-র (2নং

চিত্র) কন্দ অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু বলে এদের যথেষ্ট চাষও হয়। এই সব গাছের পাতার কোণে কাক্ষিক মুকুল গোল আলুর ছোট ছোট কন্দে পরিবর্তিত হয়। এগুলিকে বালবিল (Bulbil) বলে (3নং চিত্র)। এই সব বালবিল ভূগর্ভস্থ কন্দের উপরের অংশ এবং ছোট ছোট কন্দ হলে একটি পুরা কন্দ কন্দ চাষের জন্যে ব্যবহৃত হয়।
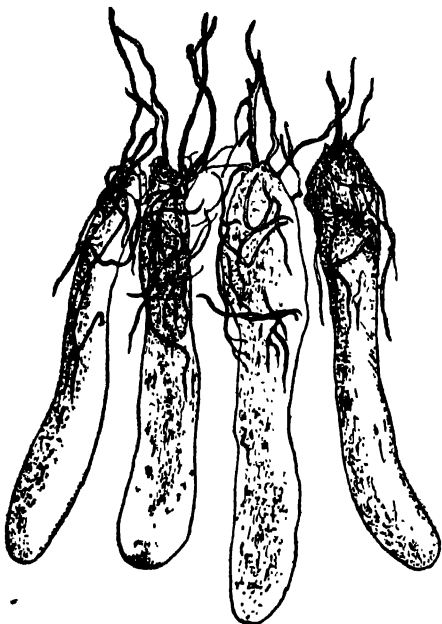
2নং চিত্র—Dioscorea alata র টিউবার

কন্দের চাষ

জমি তৈরী হলে প্রায় অর্ধ মিটার দূরে দূরে প্রায় 20 সেণ্টিমিটার উঁচু আল তৈরী করে অর্ধ মিটার দূরে দূরে কন্দের অংশগুলি পুঁততে হবে। খামআলুর গাছ মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে। এই কারণে জমি তৈরী করবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার, যেমন—গোবর, কম্পোষ্ট ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। যেখানে রাসায়নিক সারের সুবিধা আছে, সেখানে প্রতি হেক্টরে 50 kg নাইট্রোজেন ও ফসফেট সার ও 25 kg পটাশ সার গাছ লাগাবার আগে প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাছাড়া 3 মাস পরে আরো 25 kg নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা উচিত।

লতানো গাছগুলি সাধারণতঃ মাটিতে লতিয়ে বাড়তে থাকে। অথবা যাতে মাটির উপরে লতিয়ে বাড়তে পারে সে জন্যে বাঁশ, গাছের ডাল প্রভৃতি অবলম্বনও লাগানো হয়।

খামআলুর গাছের দু-প্রকার শিকড় থাকে। খাদ্য সংগ্রহকারী শিকড়গুলি মাটির নীচে খুব ছড়িয়ে থাকে এবং বেশ কয়েক মিটার লম্বা হয়। তাছাড়া কন্দগুলির গা থেকে ছোট ছোট অনেক শিকড় বের হয়।

কন্দগুলি আসলে ভূনিম্নস্থ কাণ্ড (Underground stem)। প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে এরা গ্রন্থিকাণ্ডাকৃতি (Rhisome) কন্দ (Tuber) বা গুঁড়িকন্দাকৃতি (Corm) হতে পারে। সাধারণতঃ পাঁচ থেকে আট মাসের মধ্যে কন্দগুলি পরিণত হয়। সেই সময় গাছের পাতাগুলি শুকিয়ে যায় ও পড়ে যায়। সেই সময় মাটি খুঁড়ে কন্দগুলি তোলা হয়। জমি চাষের প্রণালী ও সার প্রয়োগের তারতম্য অনুসারে হেক্টর প্রতি 5 থেকে 35 টন কন্দ উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে, D. esculenta-র উৎপাদন হেক্টর প্রতি 15 থেকে 27 টন পর্যন্ত হতে পারে। বন্য কন্দগুলি যখন কয়েক বছর ধরে মাটির নীচে অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে, তখন তাদের এক-একটির ওজন খুব বেশী হয়! সুন্দরবন অঞ্চল থেকে আমরা একটি গুঁড়িকন্দাকৃতি কন্দ তুলেছিলাম, তার ওজন 20 কিলোগ্র্যামের বেশী ছিল।

মাটি থেকে তোলবার পর কন্দগুলি বালি বা শুকনো মাটির নীচে কিছু দিন রেখে দেওয়া হয়। তারপর বিক্রীর জন্যে হাটে-বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।

খামআলুর খাদ্যমূল্য

খামআলুর খাদ্যমূল্য বিভিন্ন স্থানে ও প্রজাতি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার হয়। নানা প্রকার খামআলু বিশ্লেষণ করে গড়পরতা হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়—জল 71%, শ্বেতসার 23%, প্রোটিন 3% ও ছাই 1%। দেখা গেছে যে, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও লোহার পরিমাণ গোলআলু অপেক্ষা এতে বেশী থাকে, তবে ভিটামিন খুব কম থাকে। সুষম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হলে এর সঙ্গে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য অতি আবশ্যক।

বলে বিক্রীও খুব হয়। কলকাতা বা অন্য শহর অঞ্চলের বাজারে এটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রধান খাদ্য হিসাবে যেখানে খামআলু ব্যবহৃত হয়, দেখা গেছে—সেখানকার লোকেরা অপুষ্টিজনিত নানাবিধ রোগে ভোগে। তা সত্ত্বেও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ ঘানা ও পশ্চিম নাইজিরিয়াতে বহু লোক খাদ্যের জন্যে এই সব সহজলভ্য কন্দের উপর নির্ভর করে থাকে। ভারতবর্ষেও পার্বত্য অঞ্চলের
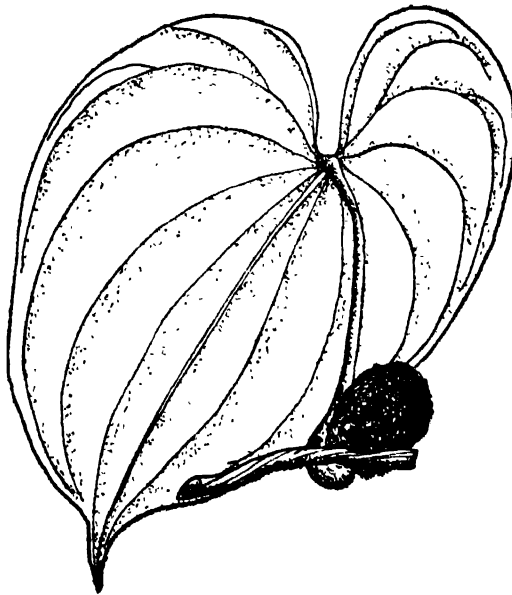
3নং চিত্র—Dioscorea bulbifera পাতার কক্ষে বালবিল

খামআলুর কন্দগুলি গরীব চাষী বিশেষতঃ পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসীদের এক প্রকার সহজপ্রাপ্য সস্তা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যউপকরণ। দেখা গেছে যে, আসাম, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের আদিবাসীদের মধ্যে খাদ্য হিসাবে এর প্রচলন খুব বেশী। এই সব জায়গায় হাটেও প্রচুর খামআলু আমদানী হয়। গোলআলু অপেক্ষা অনেক কম দাম

দরিদ্র আদিবাসীরা দুর্ভিক্ষের সময় সম্পূর্ণভাবে এই সব বন্য কন্দ খেয়ে বেঁচে থাকে।

এককালে ভারতে কতিপয় সুস্বাদু খামআলুর প্রচুর চাষ হতো। এদের কন্দগুলির একপ্রকার সুমিষ্ট আস্বাদ আছে। এই আস্বাদ ঠিক গোলআলুর মত নয়, তবে খুবই মুখরোচক। এই কারণে গোলআলু এদেশে আসবার আগে এই সব কন্দের খুব চাহিদা ছিল এবং তরকারী

হিসাবে খুবই ব্যবহৃত হতো। গোলআলুর চাষ দেশে খুব বেড়ে যাবার পর এবং সস্তায় গোলআলু পাওয়া সম্ভব হওয়ায় আজকাল আর এই সব কন্দের চাষ অনেক কমে গেছে এবং এই কারণে বাজারে বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে গোলআলু এই সব কন্দের ঠিক পরিপূরক নয়। গোলআলুর সঙ্গে একপ্রকার খামআলুর তরকারী খুবই মুখরোচক। এই কারণে শহরাঞ্চলের বাজারে যখন পাওয়া যায়, তখন গোলআলু অপেক্ষা বেশী দামেও এটি বিক্রী হয়।

ভেষজরূপে ব্যবহার

খাদ্যশস্য ছাড়া cortisone সংশ্লেষণের আদি উপাদান বিভিন্ন প্রকার steroidal saponin কোন কোন Dioscorea প্রজাতিতে পাওয়া যায়। ভারতে—Dioscorea prareri ও D. deltoidea-তে এই উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। D. prareri হিমালয় পর্বতের পূর্বভাগে উত্তরবঙ্গে, উত্তর বিহারে, নেপাল, সিকিম ও ভুটানে এবং আবর ও নাগা পর্বতমালাতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি বিষাক্ত। এজন্যে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। লেপ্‌চারা মাথার চুলের উকুন মারবার জন্যে ব্যবহার করে। D. deltoidea উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। এদের কন্দগুলি বেশ বড় হয়; তবে বিষাক্ত বলে এগুলিও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। প্রচুর saponin থাকে বলে, কন্দগুলি রেশম ও পশম পরিষ্কার করবার জন্যে ও মাথার চুল ধোয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ঔষধার্থে এই দুই কন্দজাতীয় গাছের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এই কারণে অনেক জায়গাতে এদের চাষ সুরু হয়েছে।

উপরিউক্ত Dioscorea গণের দু-প্রকার প্রজাতি ব্যতীত মেক্সিকো দেশের D. floro-funda, D. spiculiflora, D. menicena ও D. composita ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের D. hispoda থেকেও অধিক পরিমাণ diosgenin পাওয়া যায়। এই কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে এদের চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই প্রবন্ধের লেখক কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ভেষজ উদ্ভিদ বিভাগের প্রধান হিসাবে মেক্সিকো দেশ থেকে Dioscorea floribunda ও D. spiculiflora-র বীজ এনে এদেশে চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর গবেষণাগারের উদ্যানে এটি সহজেই জন্মেছিল। উৎপাদিত কন্দগুলির রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যে, সমতলভূমিতে এই জাতীয় Dioscorea থেকে diosgenin উৎপাদিত হতে পারে। লক্ষ্ণৌতে উৎপাদিত বীজ ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগারে প্রেরিত হয়েছিল। বর্তমানে এই সব Discorea প্রজাতির চাষ ও গবেষণা বিভিন্ন গবেষণাগারে চলছে।

কোন কোন Dioscorea প্রজাতির পাতাগুলি খুব সুন্দর দেখতে বলে আজকাল অনেক বাগানের বেড়ার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে এগুলি লাগানো হচ্ছে।

[D. esculenta, D. alata ও D. bulbifera-র চিত্র তিনটি আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া ডক্টর সুহিতা গুহ এঁকে দিয়েছেন। এজন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। —লেখক]

নীললোহিত

সঙ্কর্ষণ রায়

উত্তর বর্মার মিনবুতে আমার বাল্যকাল কেটেছে। সেখানকার একটি তেলের খনিতে বাবা ভূতত্ত্ববিদের কাজ করতেন। খনিতে যে সব বর্মী কাজ করতো, তাদের মধ্যে একজন বুড়োর সঙ্গে আমার ও আমার ভাইবোনদের খুব ভাব হয়েছিল। তার নাম ছিল উ-টিন। কাজের চেয়ে গল্পগুজবে তার মন ছিল বেশী। সুযোগ পেলেই আমাদের কাছে এসে সে নানারকম গল্প করে শোনাত।

উ-টিন তার যৌবনে মোগকের চুনির খনিতে কাজ করত। চুনি চেনবার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তার। চুনাপাথরের স্তর থেকে বেছে বেছে প্রচুর চুনি বের করেছিল সে। এমনিতে সে লেখাপড়া শেখে নি বিশেষ, কিন্তু চুনি এবং চুনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীলা সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তার কাছেই শুনেছিলাম যে, চুনি ও নীলা দুয়েরই উপাদান অ্যালুমিনা বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। চুনি ও নীলার রং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সে বলেছিল যে, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড‌ও দিয়ে গড়া কুরুবিন্দ (Corundum) নামক খনিজের কোন রং নেই; তা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এবং বিশেষত্ব হলো তার কঠোরতা। বস্তুজগতে হীরা কঠিনতম, কুরুবিন্দের স্থান তার নীচেই। কুরুবিন্দে যৎসামান্য ক্রোমিয়াম অক্সাইডের সংমিশ্রণ ঘটলে তার রং হয়ে ওঠে লাল। স্বচ্ছ লাল রঙের এই খনিজটিই হলো চুনি। চুনিকে ইংরেজীতে বলে রুবি। রুবি শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ruber থেকে। ruber-এর অর্থ হলো লাল। তার স্বচ্ছতা ভেদ করে বিচ্ছুরিত হয় রক্তরঙের দ্যুতি। অত্যাশ্চর্য রক্তরাগের জন্যে ভারতীয়েরা চুনিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন মাণিক্য। রক্তপদ্মের রং বলে তাকে পদ্মরাগও বলতেন তাঁরা।

কুরুবিন্দে বিন্দুপ্রমাণ টাইটেনিয়াম তাকে নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত করে। নীলকান্ত এই রত্নটিকে নীলা বা ইন্দ্রনীল বলে। ইংরেজীতে নীলাকে বলে স্যাফায়ার। স্যাফায়ার শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শব্দতত্ত্ববিদেরা একমত হতে না পারলেও স্যাফায়ার শব্দে নীল রংই বোঝায়। নীল আকাশের স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীলিমা নীলার মধ্যে প্রকট। এমন উৎকৃষ্ট নীল রং আর কোথাও দেখা যায় না। কোন কোন চুনি ও নীলাকে গোল করে কাটলে তাদের মধ্যে ছয় রশ্মিযুক্ত তারা দেখা যায়। তাদের বলা হয় তারামণি। তারামণির তারার উৎস হলো তার ভিতরকার গড়নের বিশেষ বিন্যাস।

চুনি ও নীলা খুব প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের চেনা। প্রাচীন কালের মানুষ বিশ্বাস করতো যে, বিষের ক্ষয় চুনি দিয়ে করা সম্ভব। নীলার মধ্যেও তারা ভেষজগুণের সন্ধান পেয়েছিল। কাজেই চুনি ও নীলা দুয়েরই খুব সমাদর ছিল তাদের কাছে।

উ-টিন বলেছিলেন, প্রাচীনকাল থেকেই যে চুনির এত সমাদর, তার প্রধান উৎস হলো বর্মার মোগক। শ্যাম ও সিংহলেও অল্পস্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু চুনির আসল ভাণ্ডার হলো মোগক। চুনির কথা বললেই মোগকের কথা আসে। বহু শত বছর ধরে মোগক থেকে চুনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় সভ্য দেশে রপ্তানী হয়েছে।

উত্তর বর্মার ম্যাণ্ডালে থেকে প্রায় নব্বই

মাইল উত্তর-পূর্বে চার হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে মোগকের চুনির খনি। এখানে শক্ত চুনাপাথরের মধ্যে চুনি প্রোথিত রয়েছে। জলের ক্রিয়ায় চুনি চুনাপাথর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীর বালিতেও প্রকীর্ণ হয়েছে। বর্মার রাজাদের তত্ত্বাবধানে এখান থেকে চুনি খনন করা হতো। এখান থেকে খুব বড় বড় আকারের চুনি পাওয়া গেছে। বিলাতে এই সব চুনি বিক্রী করে বর্মার রাজারা কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন।

উ-টিন বলে চলে, মোগকের চুনির খনিতে যখন কাজ করছি, তখন একদিন শান-স্টেটের রাজার মেয়ে এলেন মোগকে। মোগকে এসে এলেন খনি দেখতে। খনির খোঁড়াখুঁড়ির মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন মূর্তিমতী এক বিস্ময়ের মত। এমন অপরূপ সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না। ঠোঁট দুটি তাঁর চুনির চেয়েও লাল, আর তাঁর দু-চোখে হাজার নীলার নীল রং যেন জড়ো হয়েছে। দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না। খনি দেখতে এসে তিনি ফরমাশ দিলেন যে, তাঁর জন্যে সেরা চুনি ও নীলা সংগ্রহ করে দিতে হবে। চুনির রং হবে কবুতরের রক্তের মত লাল আর নীলা হবে রূপকথার নীলকান্ত ইন্দ্রমণির মত, যার রং শরৎকালের আকাশের মত নীল। মোগকের রুবি মাইন্‌সের এজেন্ট ছিলেন একজন খাস বিলিতী সাহেব। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন রাজকুমারীর জন্যে চুনি ও নীলা বেছে দিতে।

চুনি বেছে দিতে অবশ্য কোন অসুবিধা হলো না। খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চুনি মোগক থেকে পৃথিবীর সর্বত্র পাঠানো হয়েছে। 1875 খৃষ্টাব্দে বর্মার রাজা 37 ও 47 ক্যারাট ওজনের দুটি চুনি লণ্ডনে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রী করেছিলেন। গত এক-শ' বছরে অন্ততঃ পক্ষে এক-শ'টি বড় বড় চুনি মোগকের খনি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কাজেই রাজকুমারীর ফরমাশমত খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চুনি সংগ্রহ করতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি। পাথরের স্তূপ থেকে অনায়াসে খুঁজে বের করেছিলাম কবুতরের রক্তের মত লাল রঙের চুনি।

কিন্তু মুশকিল হলো নীলা নিয়ে। মোগকের খনিতে একদা খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নীলা পাওয়া যেত। তার নীল রঙের কোন তুলনা ছিল না। শ্যাম ও সিংহলের নীলার চেয়েও সেরা ছিল তা। মোগক থেকে আট মাইল পশ্চিমে বড় বড় নিবিড় রঙের নীলা পাওয়া যেত। 1921 খৃষ্টাব্দে এখান থেকে 958 ক্যারাট ওজনের প্রকাণ্ড এক টুকরো নীলা পাওয়া গিয়েছিল। তার নীল রং দেখে মনে হতো যেন আকাশের নীলিমা লীন হয়ে আছে তাতে। আজকাল অবশ্য মোগকে নীলা তেমন সহজলভ্য নয়। ভাল ভাল নীলা ইদানীং সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে। সিংহলের দক্ষিণ-পশ্চিমে রত্নপুর হলো রত্নভাণ্ডার। এখানে জলবাহিত নুড়ি ও বালির স্তূপের মধ্যে নীলা ও আরও অনেক রকম রত্ন জমেছে।

অনেক চেষ্টা করেও মোগকে যখন মনের মত নীলা পেলাম না, এজেন্ট সাহেব তখন আমাকে হুকুম দিলেন সিংহলের রত্নপুরে যেতে। গেলাম রত্নপুর। কিন্তু অনেক যত্ন করেও সেখানকার রত্নভাণ্ডার থেকে রাজকুমারীর সাধের নীলকান্ত মণি পেলাম না।

শেষ পর্যন্ত গেলাম কাশ্মীর। শুনেছিলাম পৃথিবীর সর্বপেক্ষা মূল্যবান নীলা কাশ্মীরেই পাওয়া গিয়েছিল। কাশ্মীরে নীলার খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি মজাদার গল্প শুনেছি। সুদূর অতীতে একজন বণিক গান্ধার (আফগানিস্থান) থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লী) দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা পাহাড়ের মধ্যে একটি খাদ দেখতে পেলেন। পাথর ধসে পড়ে সেই খাদের সৃষ্টি

প্রায় সাত-আট-শ' ভাল লেন্সের প্রয়োজন; ফলে আলোক-তরঙ্গ খুব দ্রুত শোষিত হয়ে যায়। তাই এ ব্যবস্থায় আজকাল আর কেউ আমল দেন না।

দূরপাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আলোক-তরঙ্গ ব্যবহার করতে হলে সুসংবদ্ধ লেসার রশ্মি ব্যবহার করবার কথাই সবচেয়ে বেশী ভাবা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে এই কাচের তন্তুর উপরই নির্ভর করতে হবে বলে প্রযুক্তিবিদ্‌দের অভিমত।

শ্রীদুলালকুমার সাহা*

---

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী।

বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েক ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র

বিজ্ঞানের অনেক বিষয়বস্তু আমরা স্কুলে পড়ে থাকি। সুদূর অতীত কাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানীর যৌথ সাধনা ও অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই বিজ্ঞানের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। আমাদের কাছে তা এখন প্রায় গল্প। এরকম একটা ছোট গল্প এখন বলবো।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা আমরা জানি। এর সাহায্যে কাছে রাখা ছোট জিনিষকে, এমন কি, যা খালি চোখে দেখা যায় না তাদের বড় করে দেখা যায়।

1650 খৃষ্টাব্দের কথা। হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট্ শহরের সকলেই জানতেন, ঐ শহরের একজন নাগরিক আছেন, যার মাথায় কি রকম যেন একটু ছিট্ আছে। উনি দিনের পর দিন কাচ ঘষে লেন্স তৈরী করতেন, আর তামার পাত দিয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নল তৈরী করে তার দু-প্রান্তে ঐ লেন্স লাগিয়ে যন্ত্র বানাতেন। ঐ যন্ত্র দিয়ে তিনি গায়ের চামড়া, বিভিন্ন প্রাণীর লোম, মাছির মাথার ঘিলু প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বেশ মজা পেতেন। তাঁর উদ্ভাবিত ঐ যন্ত্রকেই পৃথিবীর আদিম অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য আরও প্রায় ষাট বছর আগে 1590 খৃষ্টাব্দে জ্যানসন নামক এক ব্যক্তি প্রথম এই জাতীয় যন্ত্র তৈরী করেন।

লোকে পাগলই বলুক আর উপহাসই করুক—পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁর যা অবদান, তা চিরস্মরণীয়। ইনি হলেন বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েক, জন্ম 1632 খৃষ্টাব্দে। কথিত আছে, সুদীর্ঘ একানব্বই বছরের জীবনকালে তিনি প্রায় 239টি বিভিন্ন রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেন এবং তাদের সাহায্যে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

একদিন তিনি বাগানের টব থেকে এককোঁটা জল নিয়ে তাঁর যন্ত্রে পরীক্ষা করেন। তিনি তাতে অনেক কিছু দেখে অবাক হয়ে যান। দেখলেন—যাদের চেহারা এপর্যন্ত কোন মানুষ দেখে নি বা খালি চোখে দেখা যায় না—এরকম সব বিচিত্র জীব। তাদের গঠন ও

চলবার কায়দা বিভিন্ন রকমের। লঙ্কা ভিজানো পচা জলেও তিনি একদিন একই দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি ঠিক করলেন, ওদের আরও নিবিড় পরিচয় জানতে হবে এবং পরবর্তীকালে প্রমাণ করলেন, ঐ অদৃশ্য জীবেরা টবের জমা জলেই উৎপন্ন হয়। তাঁর এই গবেষণার ফলাফল তিনি রয়েল সোসাইটিতে পাঠান। এই আবিষ্কারকে প্রথমে রয়েল সোসাইটির কেউ বিশ্বাস করতে না পেরে তাঁর সমস্ত যন্ত্রপাতি চেয়ে পাঠালেন। যন্ত্রপাতিগুলি ছিল লিউয়েন-হোয়েকের প্রাণ। তিনি দিলেন না। তখন রয়েল সোসাইটি থেকে তাঁর কাছে সদলবলে প্রতিনিধি এসে (1677 খৃষ্টাব্দে) তাঁর যন্ত্রপাতি দেখে যান ; এমন কি, ফিরে গিয়ে লণ্ডন-বাসীদের দেখাবার জন্যে তাঁরা একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও কিছুটা লঙ্কা ভিজানো জল সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রথমে যাঁরা অবিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা দেখলেন লিউয়েনহোয়েকের কথা পুরাপুরি সত্য। সোসাইটির কর্তারা তখন লিউয়েনহোয়েককে অভিনন্দন জানালেন এবং রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত করে সম্মানিত করলেন।

পরবর্তীকালে মানুষের দাঁত, খাদ্যনালী প্রভৃতি জায়গাতেও ঐসব বিচিত্র জীব আছে বলে তিনি প্রমাণ করেন। তিনি আরও দেখলেন যে, খুব গরমে ঐসব জীব মরে যায়। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি বহুবার গরম কফি খেয়ে মুখ পুড়িয়েছেন।

বিভিন্ন অদৃশ্য প্রাণীর আকৃতি, লোহিত কণিকার আকৃতি প্রভৃতির উপরও তিনি বহু গবেষণা করেন। তাঁর বিভিন্ন আবিষ্কার জীবাণু-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

আমরা স্কুলে পরীক্ষাগারে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করি; আবার বই পড়ে জীবাণু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে থাকি। এসবের পিছনে বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েকের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আজকের দিনে তা গল্প বলে মনে হয়।

শ্রীদীপঙ্কর খাঁ*

* বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী।

মডেল তৈরী

তড়িচ্চুম্বক বিক্রিয়া

এখানে একটি পরীক্ষার বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় তড়িচ্চুম্বক বিক্রিয়া যেখানে সর্বাধিক তা নির্ণয় করা যায়। কোন গোলাকার তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তার মান যে কুণ্ডলীটির কেন্দ্রেই সর্বাধিক, এখানে তা দেখানো যায়। কুণ্ডলীটির কেন্দ্র নির্ণয়ের বিকল্প পদ্ধতি হিসাবেও এই পরীক্ষাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

চিত্রে একটি কুণ্ডলী C দেখানো হয়েছে। এটির ব্যাস প্রায় 6 সে. মি.। পাক সংখ্যা প্রায় 300। কুণ্ডলীটি তৈরী করবার জন্যে 26 বা 28 গেজের তার নেওয়া যেতে

পারে। তারটির মাঝখানে প্রায় 2 মি. মি. মোটা ও 2 সে. মি. লম্বা একটি দণ্ড L সুতার সাহায্যে ঝুলানো থাকে। প্রতি প্রান্তে একটি করে L-এর আকৃতিবিশিষ্ট ধাতব পাতের এক প্রান্ত রাং-ঝাল দিয়ে জোড়া থাকে। L আকারের তার দুটির অপর প্রান্ত দু-পাশে রাখা দুটি পারদ-পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়। একটি ছোট সমতল দর্পণ M সুতাটির সঙ্গে লাগানো হলো (চিত্র)। দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে একটি সূচক লাগানো থাকে। উপরে অবস্থিত একটি বিশেষ ধরণের পাটাতন P থেকে সুতাটি ঝুলানো হয় এবং ইচ্ছামত সুতাটিকে বাঁ-দিকে বা ডানদিকে কিংবা সামনে বা পিছনের দিকে সরিয়ে রাখা যায়—যার ফলে সূচকসমেত দণ্ডটি কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী যে কোন স্থানে ইচ্ছামত সরিয়ে ঝুলানো যায়।

ঝুলন্ত অবস্থায় দণ্ডটি সমসময়েই কুণ্ডলীটির সঙ্গে একটি তলে অবস্থান করে। পারদ পাত্র দুটির সঙ্গে ব্যাটারীর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বার যুক্ত করলে দণ্ডটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকবে। তখন দণ্ডটির চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। কুণ্ডলীটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালেও চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। সূচকসমেত দণ্ডটি ঘুরে গেলে 'আলো ও স্কেল' ব্যবস্থার মাধ্যমে দেখবার ব্যবস্থা আছে এবং তা মাপাও যায় (চিত্র)। যখনই দণ্ড এবং কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটানো হয়, তখন দণ্ডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের জন্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র এবং কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের জন্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের
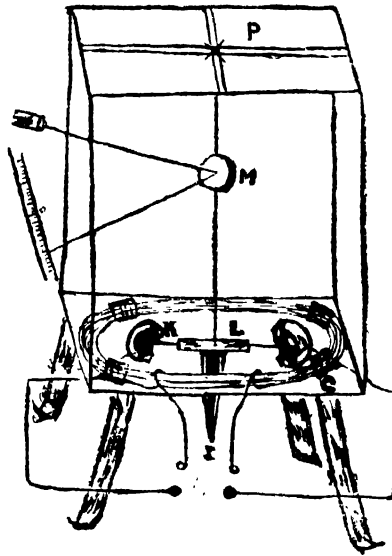
বিক্রিয়া ঘটে। এই বিক্রিয়ার জন্যে ঝুলন্ত দণ্ডটি কিছুটা ঘুরে গিয়ে সাম্যাবস্থায় এসে অবস্থান করে। এর ফলে সমতল দর্পণ থেকে আসা প্রতিবিম্ব স্কেলে পূর্বাবস্থান থেকে সরে যায়। এখন দণ্ডটির আলম্ব বিন্দুটির স্থান এদিক-ওদিক সরিয়ে এমন একটা অবস্থানে নির্দিষ্ট করা যায় যে, ঐ অবস্থানে সমতল দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি স্কেলে সর্বাপেক্ষা বেশী

কোণ উৎপন্ন করবে, অর্থাৎ দণ্ডটি সর্বাপেক্ষা বেশী ঘুরে গিয়ে সাম্যাবস্থায় অবস্থান করবে। তখন ঐ বিক্রিয়া হবে সবচেয়ে বেশী। সূচকটি তখন যে বিন্দু নির্দেশ করে, সেই বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত উল্লম্ব সরলরেখা কুণ্ডলীটির তলকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেটাই হবে কুণ্ডলীটির কেন্দ্র এবং তড়িচ্চুম্বক ক্ষেত্র দুটির মধ্যে বিক্রিয়ার সর্বাধিক্য স্থান। গণিতের সাহায্যেও এটি নির্ণয় করা যায়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের হাতে-কলমের কেন্দ্রে শ্রীআরতী পাল এটি তৈরী করেছে।

মঞ্জুয়া দে

(2)

স্থিতিশক্তি থেকে গতিশক্তিতে রূপান্তর

স্থিতিশক্তি থেকে গতিশক্তিতে রূপান্তরের একটি পরীক্ষা এখানে বর্ণিত হয়েছে। সহজেই অল্প খরচায় এটি করা যায়।

প্রায় আধ মিটার লম্বা একটি দণ্ড L একটি বিয়ারিং-এর সঙ্গে উল্লম্বভাবে আটকানো রয়েছে। দণ্ডটির মাথায় একটি পাতলা বড় চাকতি C (প্রায় 20 সে. মি. ব্যাসবিশিষ্ট) বসানো আছে। এই অবস্থায় দণ্ডসমেত চাকতিটি সহজে অনুভূমিক তলে ঘুরতে পারে। দণ্ডটির গায়ে বিয়ারিং-এর নীচে প্রায় দেড় মিটার লম্বা একটি দড়ি জড়ানো হলো। দড়িটির মুক্ত প্রান্ত কপিকল P-এর উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তা থেকে ওজন
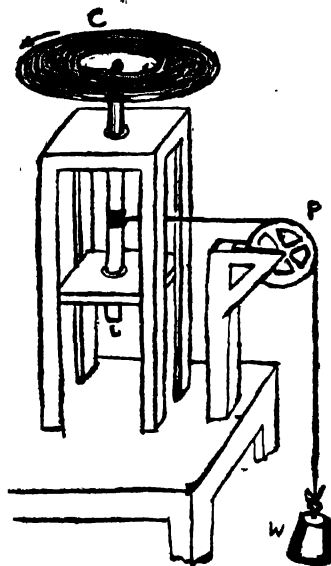
W ঝুলানো হলো। এখন সমস্ত ব্যবস্থাটি একটি উঁচু টেবিলে রেখে ওজনটিকে নীচের দিকে ছেড়ে দিলে নীচে নামবার সময় চাকতিটি স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হবে এবং ক্রমশঃ তার কৌণিক বেগও বৃদ্ধি পাবে।

ওজনটি ছেড়ে দেবার আগে ওজনটির শক্তি ছিল স্থিতিশক্তি। ওজন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণনশীল ঐ যন্ত্রটি গতিশক্তি পাবে এবং চাকৃতিটির গতিবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবস্থাটির গতিশক্তিও বৃদ্ধি পাবে। এই গতিশক্তি পাওয়া যায় ওজনটির স্থিতিশক্তি থেকে। বিয়ারিং-এ এবং কপিকলে ঘর্ষণজনিত বাধা উপেক্ষা করলে বলা যায়, যন্ত্রটির কোন নির্দিষ্ট সময়ে গতিশক্তি লাভ ও ঐ সময়ে ওজনটির স্থিতিশক্তি হ্রাস—সমান ; অর্থাৎ যে কোন সময়েই এই ব্যবস্থায় স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির যোগফল ধ্রুবক। এখন ঘর্ষণজাত বল না থাকলে দড়ির পুরো পাক খুলে গেলেও চাকৃতিটি ঘুরতে থাকতো এবং তখন উল্টো পাকে দড়িটা আবার জড়িয়ে যেত। ফলে ওজনটি উপরের দিকে উঠে যেত। ঐ অবস্থায় চাকৃতিটি ক্রমশঃ আরও আস্তে ঘুরতো এবং চাকৃতিটির ঘোরা বন্ধ হবার সময় ওজনটি আগের অবস্থায় ফিরে যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেন না, এই ব্যবস্থায় সব সময়েই ঘর্ষণজাত প্রক্রিয়ার জন্যে কিছু শক্তি অন্য ভাবে ব্যয় হয়।

চাকৃতিটির চারদিকে সুতা দিয়ে মজার মজার খেলনা ঝুলিয়ে এই পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গতিশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খেলনাগুলি ক্রমশঃ আরও বড় ব্যাস-বিশিষ্ট বৃত্ত করে ঘুরতে থাকে।

পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে শ্রীসিদ্ধার্থ ব্যানার্জী এটি তৈরী করেছে।

ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায়*

---

*পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

(3)

লোড-শেডিং-এর সময় স্বয়ংক্রিয় আলো

লোড-শেডিং-এর সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে দুর্ভোগে পড়তে হয়। এই দুর্ভোগ এড়াবার বহু রকম যন্ত্র আজকাল উদ্ভাবিত হয়েছে। এখানে একটি সহজ যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হলো। যে কেউ অল্প খরচায় তৈরী করে দেখতে পারে। তবে এটি একটি বিকল্প পদ্ধতি মাত্র।

চিত্রে এই যন্ত্রটি এঁকে দেখানো হয়েছে। যন্ত্রাংশগুলি হলো—

(1) আয়তাকার L-আকৃতির কাঠের খুঁটি। এটির একটি বাহু 5 সে. মি. ও অপরটি 8 সে. মি. লম্বা ;

(2) পেনসিল আকৃতির একটি লোহার নল ;

(3) তারের তৈরী স্প্রীং ;

(4) দেশলাই-এর কাঠি ও দেশলাই বাক্সের কিছু অংশ ;

(5) কেরোসিন তেলের ল্যাম্প বা মোমবাতি ;

(6) কাঠের পাটাতন ;

(7) তড়িচ্চুম্বক (তৈরী করে নিতে হবে) ;

(8) অন্তরিত তার ও কয়েকটি সরু পেরেক।

কিভাবে যন্ত্রটি কাজ করে, তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক। প্রথমে আয়তাকার খুঁটিটির বড় বাহুর প্রান্তদেশে (চিত্র) কিছুটা গোল খাঁজ কেটে পেনসিল আকৃতির নলটিকে পেরেকের সাহায্যে ঐ খাঁজে লিভার-ব্যবস্থায় লাগানো হলো।
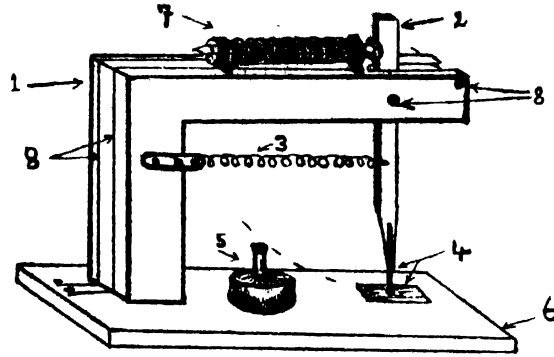
এবার নলসমেত আয়তাকার খুঁটি বা কাঠের ফ্রেমটিকে পাটাতনের উপর চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে—সেভাবে রাখা হলো। এই অবস্থায় তড়িচ্চুম্বকটিকে ক্ল্যাম্প দিয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা যাক। তারের তৈরী স্প্রীংটি ফ্রেম ও নলের সঙ্গে সংযুক্ত। তড়িচ্চুম্বকের তার দুটি উচ্চ বিভববিশিষ্ট তড়িৎ-কোষের সঙ্গে সংযুক্ত। সমপ্রবাহী তড়িৎ প্রবাহের মেন লাইনে (D. C. Main) লাগানোও যেতে পারে। তখন তড়িচ্চুম্বকের সঙ্গে শ্রেণী-সমবায়ে 40 ওয়াট বা 60 ওয়াটের একটি ল্যাম্প দিয়ে নিলেই চলবে। চিত্রে দেশলাই কাঠি যেভাবে নলের সঙ্গে আটকানো দেখানো হয়েছে—সেভাবে লাগাতে হবে। পাটাতনের উপর ঠিকমত জায়গায় ল্যাম্প বা মোমবাতি এবং দেশালাইয়ের বাক্সের অংশবিশেষ (যেখানে ঘষলে জ্বলে ওঠে) রাখা হলো।

কিভাবে যন্ত্রটি কাজ করে, তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক। তড়িৎ-প্রবাহ থাকাকালীন চুম্বক লোহার নলকে ধরে রাখে এবং তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হলেই তড়িচ্চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয় : ফলে স্প্রীং-এর টানে লোহার নল ডট্ ডট্ রেখা বরাবর ছুটে যায় এবং সে সময় দেশলাই কাঠির সঙ্গে দেশলাই বাক্সের অংশবিশেষের ঘর্ষণে কাঠিতে আগুন ধরে যায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে রাখা ল্যাম্পে বা মোমবাতিতে ঐ আগুন পৌঁছলে তা জ্বলে উঠে।

কাজে কাজেই তড়িৎ সরবরাহ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে কেরোসিন তেলের ল্যাম্প বা মোমবাতিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানো যেতে পারে। অবশ্য ল্যাম্প কত তাড়াতাড়ি

প্রজ্বলিত হবে, তা নির্ভর করে দেশলাই বাক্সের অংশবিশেষ, স্প্রীং-এর টান, চুম্বকের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা প্রভৃতির উপর। পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে এটি তৈরী করা হচ্ছে।

সঞ্জয়কুমার অধিকারী*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী

ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান

অঙ্কুরিত আলুর খাদ্যমূল্য কম: জমি থেকে আলু ওঠাবার পর হিমঘরে বা বাড়ীতে আলু রেখে দেওয়া হয়। পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ মাঘ বা ফাল্গুন মাসে জমি থেকে আলু তোলা হয়। ঐ আলু যখন জোলো হাওয়া পায়, তখন আলু থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়। এর ফলে আলুর ভিটামিন-সি ও শ্বেতসার কমে যায়। আলুর স্বাদও কমে যায়। হিমঘরে তাড়াতাড়ি আলু অঙ্কুরিত হয় না। তবে হিমঘরে থাকাকালীন হিমঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা যা থাকা উচিৎ, তা নানা কারণে ঠিকমত রাখা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এসব কারণ হলো —যখন-তখন হিমঘর থেকে আলু বের করা, হিমঘরের আলু রাখবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী আলু রাখা, লোড শেডিং, ভোল্টেজ হ্রাস-বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা করবার যন্ত্রের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি, বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন ইত্যাদি। এসব কারণে কয়েক মাসের মধ্যেই হিমঘরের আলুও অঙ্কুরিত হয়ে যায়। তাই আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকেই বাজারে যে আলু বিক্রী হয়, অনেক ক্ষেত্রে তা অঙ্কুরিত দেখা যায়। তবে যে সমস্ত হিমঘরে সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা থাকে, সেখানের আলু ভাল থাকে। বাড়ীতেও অনেক রকম দেশী পদ্ধতিতে অল্প পরিমাণে (একসঙ্গে বিশ-পঞ্চাশ বস্তা) আলু বেশ ভালভাবেই সংরক্ষণ করা যায়।

বিজ্ঞানীরা হিমঘরে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট আইসোটোপ রাখবার পরীক্ষা চালাচ্ছেন। বিশেষ ব্যবস্থায় হিমঘরে অল্প পরিমাণ (2/3 গ্র্যাম) তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট আইসোটোপ রেখে দিলে আলুকে একই অবস্থায় কয়েক বছর ধরে হিমঘরে রেখে দেওয়া যায়। এতে কোন ক্ষতি হবে না এবং আলুর খাদ্যমূল্য হ্রাস পাবে না।

বিজয় বল*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: 1. চোখের জলে জল ছাড়া কি অন্য কোন পদার্থ থাকে? চোখের জলের গুণাগুণ কি?

শ্যামলী কুণ্ডু, কলিকাতা-54

উত্তর: 1. চোখের জল নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে এখনও এবিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি।

মানুষের শরীরে বিশেষ এক ধরণের গ্রন্থি থেকে চোখের জল নির্গত হয়। এই জল হাল্‌কা দ্রাবকের সংমিশ্রণে তৈরী এবং তার সঙ্গে কিছু প্রোটিন, শর্করা ও রোগ-প্রতিষেধক এনজাইম থাকে। বিভিন্ন কারণে চোখ থেকে জল পড়ে। ধোঁয়া, পেঁয়াজের ঝাঁঝ, দুঃখ, ভয়, আবেগ, আঘাত, দৃষ্টিক্ষীণতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেই চোখ থেকে জল পড়ে। একই ব্যক্তির চোখ থেকে এসব কারণে যে জল বের হয়—তাদের রাসায়নিক উপাদানগুলির পরিমাণ সব ক্ষেত্রে এক হয় না। আবার বিভিন্ন ব্যক্তির বেলাতেও চোখের জলের উপাদান বিভিন্ন। এমন কি, একটি পুরুষের ও একটি নারীর কান্নার চোখের জলের উপাদান এক নয়—যদিও তারা একই কারণে কাঁদেন।

কান্নার কারণ এবং ফল হিসাবে অনেকে অনেক কথাই বলে থাকেন। তবে কান্না, কান্নার কারণের তীব্রতা হ্রাস করে—এটা সকলেরই জানা, অনেক সময় কান্না রোগীকে সুস্থ করেও তোলে। কান্নার সময় দেহ থেকে কিছু কিছু বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে আসে। দেহের মধ্যে ঐসব বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে এবং এদের রাসায়নিক উপাদান কি—এসবের সদুত্তর এখনও অজানা। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, দেহের ঐ সমস্ত পদার্থ চোখের উপশিরাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন গ্রন্থি থেকে সঞ্চিত জল বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে বেরিয়ে আসে।

কোন কোন রোগীর (বিশেষ করে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত) চোখের জল অনেক সময় হলদে রঙের হয়। এ-কারণে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, হয়তো চোখের জল বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিওফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞানপরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

সৃষ্টি করে মাড়ি ফুলে 'গোবিন্দর মা'র অবস্থা ('গাল ফুলো গোবিন্দর মা' প্রবাদটির রহস্য আমার জানা নেই)। তাছাড়া দাঁত খারাপ থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল নয়। কাজেই পোকা-খাওয়া দাঁত সহজ ব্যারাম নয়। তাকে আগেভাগে বাগে আনবার চেষ্টা করাই মঙ্গল।

দাঁতের ক্ষত মানব জাতির প্রায় একচেটে রোগ। বানর ছাড়া আর কোন নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর দাঁতে ক্ষত হতে দেখা যায় না। আদিম যুগে মানুষের নাকি দাঁতের ক্ষত থাকবার কোন ইঙ্গিত মেলে না। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের তালিকায় কম মেহনতি এবং সুস্বাদু খাদ্যের যত প্রচলন বাড়লো, দাঁতের ক্ষতও তেমনি বাড়লো। পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে শহরেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায়, প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও নানাপ্রকার দাঁতের রোগ ছিল। তার মধ্যে দাঁতে ছিদ্র বা ক্ষতের উল্লেখ আছে। ছিদ্রযুক্ত দাঁতকে বলা হতো 'দালন দন্ত'।

সব বয়সেই দাঁতের ক্ষত হতে পারে, যদিও শিশু বা কিশোরদেরই বেশী আক্রমণ করে। যে সব জায়গায় অনবরত ঘর্ষণ লাগে, সে সব জায়গায় ক্ষত কম হয়। কষের দাঁতে উপরের এবড়োখেবড়ো অংশেই বেশী ক্ষত দেখা যায়। দাঁতের ক্ষয় সাধারণতঃ ধীরে ধীরে ঘটে। সুতরাং ক্ষয়কে প্রতিরোধ করবার অনেক সময় পাওয়া যায়।

দাঁতে ক্ষত হবার সূত্রপাতে দাঁতের উপরিস্তরে চকখড়ির মত সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। দাঁতে লেগেথাকা খাদ্যকণা এবং জীবাণুর সংমিশ্রণে এই দাগ সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ ঐ দাগগুলি কাল্‌চে বা নীল্‌চে ধরণের হয়। তারও পরে দেখা যায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরার মত গর্তে পরিণত হচ্ছে। উপরিভাগের দাগের পরিসর দেখে কিন্তু ভিতরের ক্ষতের অনুমান করা যাবে না। কারণ নিম্নগামী গর্তের আকার কতকটা মোচার মত— উপরিভাগ সরু, ভিতরের দিকে মোটা।

দাঁতের মত শক্ত অঙ্গ ক্ষয় হয়ে যায় কি করে? আমরা যে খাদ্য খাই, তারই ছোট ছোট কণা লালার আঠালো অংশের জন্যে দাঁতের অমসৃণ জায়গাগুলিতে লেপ্‌টে থাকে— মুখ ধোবার পরেও। লেপ্‌টে থাকা খাদ্যকণাগুলির উপর কয়েক রকম জীবাণু এসে জড়ো হয়। খাদ্যকণাগুলি পচে কিছু অম্লরসের সৃষ্টি হয়। জীবাণু অম্লরস এবং কোন কোন অনুঘটকের ক্রিয়ায় দাঁতের এনামেল ক্ষয় হতে থাকে। এই ক্ষয় খুবই শ্লথ গতি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে দাঁত ধ্বংস করে যায়।

পোকা-খাওয়া দাঁত নাম দেবার জন্যে কিছু লোক এথেকে একটা লাভজনক ব্যবসার সন্ধান পেয়েছে। কিছুকাল আগে প্রায়ই শোনা যেত—এখনো কচিৎ কখনো শোনা যায়, দুপুরের দিকে কাঁধে ছোট্ট পুঁটলি ঝুলিয়ে বেদেনী মেয়েরা লম্বা সুরে হাঁক দিয়ে যায়—'বাত ভাল কো-র, দাঁতের পোকা বার কো-র!' ছেলেমেয়েদের দাঁতের যন্ত্রণার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে মায়েরা ডাকেন ঐ 'পোকা বারকরা'দের। তারা এসে বাড়ীর

লোকদের কাছ থেকে খানিকটা তুলো চেয়ে নিলে হয়তো বা একটু তেলও চাইলে—সেই তুলো পোকা-খাওয়া দাঁতের উপর রেখে মন্ত্র আওড়াতে লাগলো। তারপর যখন তুলো বের করা হলো, তখন দেখা গেল তুলোর উপর বড় বড় পোকা থিক থিক করছে। পোকাগুলি হলো অপরিণত মাছি (Maggots)। তার পোকা বের করাটা বেদেনীর হাতসাফাই। দাঁতের পোকা অতি সূক্ষ্ম জীবাণু—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে ক্ষত সৃষ্টির মূলে দাঁতে লেগে-থাকা খাদ্যকণার পচন এবং জীবাণুর বিক্রিয়া। এই জন্যে দাঁতের মসৃণ পৃষ্ঠ এবং যে সব স্থানে ঘর্ষণ বেশী লাগে, সেই সকল অংশে ক্ষত কম দেখা যায়। দাঁতের ক্ষত যে কোন বয়সেই হতে পারে। ক্ষত একবার দেখা দিলে সত্বর দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ সামান্য ব্যবস্থায় ক্ষতের প্রসার রোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং দাঁতের ক্ষত যাতে না হয়, সেই বিষয় সতর্ক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

দাঁতে লেগে থাকা খাদ্যকণাগুলিই যত নষ্টের মূল। নরম খাদ্য এবং মিষ্ট দ্রব্যই বেশী দাঁতে লেগে-থাকে। বিশেষ করে লজেঞ্চ, চকোলেট মুখে রাখবার অভ্যাস খুবই ক্ষতিকর। এগুলি আঠালো দ্রব্য বলে বেশী করে দাঁতে আটকে থাকে। সুতরাং প্রতিবার খাবার পর ভাল করে কুলকুচা করা এবং আঙ্গুল দিয়ে দাঁত ও মাড়ি ঘসে দেবার অভ্যাস রাখা উচিত। এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক।

সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা উচিত। যদিও সুস্বাস্থ্যের বা দেহের পুষ্টির সঙ্গে দাঁতের ক্ষত হবার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবুও খাদ্যে ভিটামিন-এ এবং ডি এবং ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস পরিমাণমত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এগুলি ছাড়া আর একটি রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে দাঁতের ক্ষতের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখা হায়। শরীরে যদি ফ্লুয়োরাইডের (Fluoride) অভাব হয়, তাহলে দাঁতের ক্ষত হতে দেখা যায়। খাদ্য এবং পানীয় জলের সঙ্গে আমরা ফ্লুয়োরাইড পেয়ে থাকি। তবুও মাঝে মাঝে শরীরে ফ্লুয়োরাইডের অভাব ঘটে। সেই সময়ে দুধ বা লবণের সঙ্গে ফ্লুয়োরাইড খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়। অনেক দেশের শহরে পানীয় জলের সঙ্গে ফ্লুয়োরাইড মেশানো হয়। আমাদের দেশেও কোন কোন জায়গায় পানীয় জলে ফ্লুয়োরাইড মেশাবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কোন কোন দাঁতের মাজনের সঙ্গে ফ্লুয়োরাইড ব্যবহার করে কোন সুফল পাওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

ক্ষত নিবারণের নিয়মগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হলো—

1. মাতৃগর্ভে থাকতেই দাঁত তৈরী হতে সুরু হয়—সুতরাং মায়ের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-এ এবং-ডি থাকা প্রয়োজন। মায়ের খাদ্যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্লুয়োরাইড থাকে তো শিশুর দাঁতে ক্ষত হবার সম্ভাবনা কম হবে।

2. শৈশবে মাতৃদুগ্ধ খেলে ক্ষত হবার সম্ভাবনা কম।

3. শক্ত খাদ্য এবং চিবিয়ে খাবার খাদ্য সুযোগ পেলেই খাওয়া উচিত।

4. চিনি, গুড়, লজেঞ্জ, চকোলেটজাতীয় খাবার যখন তখন এবং বেশীক্ষণ মুখে রাখবার অভ্যাস বর্জন করা উচিত।

5, প্রতিবার খাবার পর (বিশেষ করে মিষ্ট দ্রব্য খাবার পর) ভাল করে মুখ ধোওয়া উচিত। (এই অভ্যাসটি আজকাল উঠে যাচ্ছে। এঁটোকাঁটার ভয়েই হোক বা ছুঁচিবায়ের জন্যেই হোক, যখন তখন মুখ ধোবার অভ্যাস দাঁত ও মাড়ির পক্ষে স্বাস্থ্যকর)।

প্রত্যহ দু-বার করে দাঁত মাজা উচিত—একবার সকালে ও একবার রাত্রে। কোন কোন দন্ত চিকিৎসকের মতে তিনবার করে দাঁত মাজলে আরো ভাল হয়। ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজাই প্রশস্ত।

6. পানীয় জলে উপযুক্ত পরিমাণে (দশ লক্ষে এক ভাগ) ফ্লুয়োরাইড থাকা উচিত। এটি পূরণ করা পুর প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কর্তব্য।

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাইকেলের ইতিকথা

আমাদের মধ্যে অনেকেই সাইকেল ব্যবহার করে থাকি। সাইকেলের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত। 'বাই-সিক্‌ল্‌' শব্দটির অপভ্রংশ থেকেই বাই-সাইকেল বা সাইকেল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। চলতি ভাষায় একে বাইক-ও বলা হয়।

আজকের দিনে সাইকেলকে যে অবস্থায় বা যে রূপে দেখা যায়, তা একজন বা দু-জন লোকের দু-একদিন বা দু-এক বছরের চেষ্টায় হয় নি। প্রায় তিন-শ' বছর ধরে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে এই উন্নত রূপ পাওয়া গেছে। এ এক মজার ইতিহাস। এখানে তা নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

1690 খৃষ্টাব্দে দ্য সিভরাক্ নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক সর্বপ্রথম সাইকেলের মত যন্ত্র তৈরী করেন। একটি বড় লম্বা কাঠের ডাণ্ডার দু-দিকে তিনি দুটি চাকা এবং একদিকে একটি হাতল লাগানো (1নং চিত্র)। ডাণ্ডাটির মাঝখানে চট বা কাপড়জাতীয় বস্তুর তৈরী একটি গদিতে বসে দু-দিক দিয়ে মাটিতে পায়ের সাহায্যে চাপ দিয়ে ক্রমশঃ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারতেন। আজকালকার সাইকেলের মত প্যাডেল কিংবা দিক বদল করবার জন্যে হাতল ঐ জাতীয় সাইকেলে ছিল না। সে সময়ে ইংল্যাণ্ডের বাকিং-হামশায়ার শহরের একটি গীর্জার জানালায় ঐ জাতীয় সাইকেলের ছবি দেখা যেত। গীর্জার

ঐ ছবিটি কবেকার—তা নিয়ে দ্বিমত ছিল। তবে ঐটি 1779 খৃষ্টাব্দের আগের আমলের বলে কোন কোন জায়গায় উল্লেখ আছে।

1নং চিত্র—প্রথম সাইকেলের মত যন্ত্র (1690 খৃ.)

এর বেশ কিছুকাল পরে 1816 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে নীপ্‌স্‌ নামে একজন ফটোগ্রাফার আরেকটু উন্নত ধরণের সাইকেল তৈরী করেন। এ ব্যবস্থাতেও সাইকেলকে পা দিয়ে ঠেলতে হতো; তবে একজনের জায়গায় দু-জন লোকের একসঙ্গে বসবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে চাকা দুটির আকার ও গঠনের কিছু অদল-বদল ঘটিয়ে 1818 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ব্যারণ ভ্য ড্রাভারব্রণ সাইকেলের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। তখনকার দিনে এ জাতীয় সাইকেল শুধু মাত্র প্যারিসেই নয়, লণ্ডনেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঐ সময়ে কোন কোন ব্যবসায়ী লণ্ডনে এই সাইকেল তৈরী করে খুব চড়া দামে তা বিক্রী করতো। সাধারণ লোক তা কিনতে পারতো না। ধনী লোকেরাই ঐ সাইকেল চড়তো। একে বলা হতো—'ডাণ্ডি-হর্স' বা 'বাবু ঘোড়া'। কেউ কেউ আবার বলতেন 'হবি-হর্স', 'বিসিপীড্‌' ইত্যাদি। এভাবে ঠেলে-গুঁতিয়ে সাইকেল চড়বার বদলে অন্যভাবে আরও বেশী গতিতে, এমনকি ইচ্ছামত দিক বদল করে সাইকেল চালানোর কথা সে সময় অনেকেই ভাবতে সুরু করেন। কেননা মাটিতে পা দিয়ে এভাবে সাইকেল চালালে কিছুক্ষণ পরেই পা এবং কোমর ধরে যেত এবং বেসামাল হয়ে গেলেই পায়ে চোট লাগতো। তখন কেউ কেউ সামনের চাকাটা হাত দিয়ে ঘোরানোর কল্পনাও করেছিলেন।

প্যাডেল লাগানোর কথা প্রথম ভাবেন স্কটল্যাণ্ডের একজন কর্মকার। তাঁর নাম হলো ম্যাকমিলান। 1834 থেকে 1840 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'বাবু-ঘোড়া' ধরণের সাইকেলে হাতল, প্যাডেল এবং বসবার জন্যে ভাল গদি লাগিয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এর পরে 1846 খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের-ই গ্রেভিন ড্যালজেল নামে অন্য এক ব্যক্তি সাইকেলে প্যাডেল লাগানো ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেন এবং সামনের চাকায় নানা ধরণের প্যাডেল

জুড়ে সাইকেলের গতি বাড়াবার চেষ্টা করেন। ম্যাকমিলান এবং ড্যালজেল—এই দু-জনই হলেন সাইকেলের প্রকৃত রূপকার।

এরপর 1865 খৃষ্টাব্দে ল্যালমেট নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক অনেকটা আগের মতই সাইকেল তৈরী করেন এবং ফ্রান্স থেকে আমেরিকায় গিয়ে 'বাই-সিক্‌ল' নামে পেটেন্ট নিয়ে সর্বপ্রথম বাজারে সস্তায় তা বিক্রী সুরু করেন। তখন অনেকে ঐ সাইকেলের নাম দেন 'বোন-শেকার' বা 'হাড়-কাঁপানো' (2নং চিত্র)।
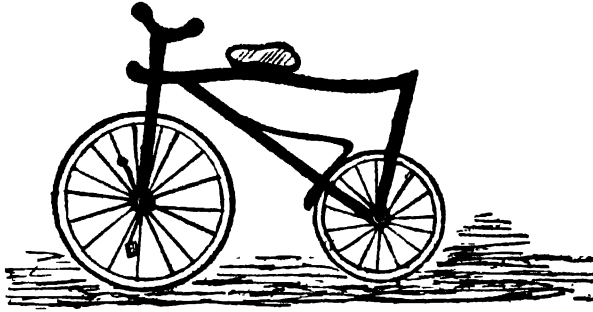
2নং চিত্র—'বোন-শেকার'

চাকা দুটি কাঠের তৈরী এবং বেশ মোটা, সামনের চাকাটি পিছনের চাকার তুলনায় কিছুটা বড়। সামনের চাকায় প্যাডেল লাগানো থাকতো। চাকাতে লোহার টায়ার লাগানো হতো। রাস্তা দিয়ে যখন জোরে চলতো তখন আরোহীকে বেশ ঝাঁকুনি অনুভব করতে হতো—যার জন্যেই এরকম নামকরণ করা হয়েছিল।
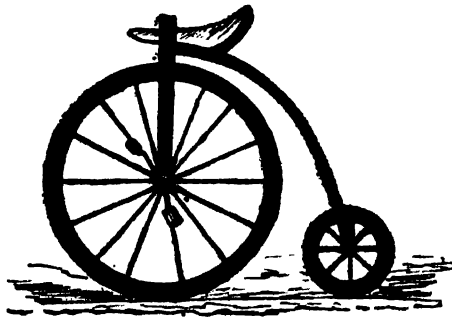
3নং চিত্র—'পেনি-ফার্দিং'

পরবর্তীকালে লোহার টায়ার বা বেড়ের বদলে মোটা নিরেট রবারের টায়ার লাগানো হয় এবং সামনের দিকে চাকাটা অনেক বড় (প্রায় দেড় মিটার ব্যাসের) ও পিছনের দিকের চাকাটা সে তুলনায় অনেক ছোট (প্রায় 20 সে. মি. ব্যাসের) করা হয়। এ জাতীয় সাইকেলকে বলা হতো 'পেনি-ফার্দিং' (3নং চিত্র)। বড় চাকার

সঙ্গে প্যাডেল লাগানো থাকায় একমাত্র লম্বা লোকেরাই ঐ সাইকেল স্বচ্ছন্দে জোরে চালাতে পারতো। প্রায় কুড়ি বছর ধরে এ জাতীয় সাইকেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু ছিল। বেঁটে লোকেদের পা প্যাডেল পর্যন্ত পৌঁছতো না বলে প্যাডেলটি সামনের চাকায় না লাগিয়ে—সামনের ও পিছনের চাকার মাঝামাঝি অংশে লাগানো হয়। এ ব্যবস্থায় গীয়ার ও চেনের সাহায্যে পিছনের চাকার সঙ্গে প্যাডেলটি সংযুক্ত থাকে (4নং চিত্র)। দুটি চাকা প্রায় এক মাপের নেওয়া হতো। এ জাতীয় সাইকেলকে

4নং চিত্র—'সেফটি-সাইকেল'
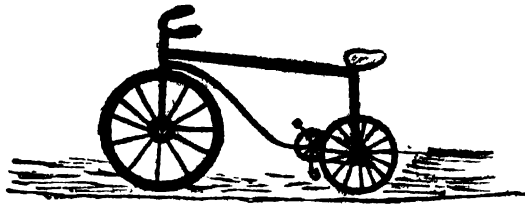
বলা হতো 'সেফটি-সাইকেল'। 1876 খৃষ্টাব্দে এটি তৈরী হয় এবং বাজারে চালু হয় 1885 খৃষ্টাব্দে। কাজে কাজেই লম্বায় ছোট লোকেদের পক্ষেও সাইকেল চড়া সম্ভব হলো। এই সময়ে তিন-চাকা বা চার-চাকাবিশিষ্ট সাইকেল বাজারে চালু হয়। সাইকেলে বলবিয়ারিং লাগানোর প্রথাও ঐ সময়ে সুরু হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় তখন বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরী হাল্কা ও ভারী সাইকেলের জনপ্রিয় প্রদর্শনী হতো। 'সেফটি সাইকেল'-এর মত একই রকম সাইকেল ঐ সময়ে 'রোভার' নামে বাজারে বিক্রী হতো।

এর কিছুকাল পরে 1889 খৃষ্টাব্দে বেলফাস্টের একজন ডাক্তার জে. বি. ডানলপ বায়ুপূর্ণ টায়ার আবিষ্কার করেন—যা উন্নতমানের সাইকেল তৈরীর ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছে। বায়ুপূর্ণ টায়ার লাগাতে সাইকেলের গতিও অনেক বেড়ে গেল এবং উঁচু-নীচু জায়গার উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে আগের মত ততটা বেগ পেতে হলো না।

এর পর সাইকেলে সংযুক্ত হলো ফ্রী-হুইল—1895 খৃষ্টাব্দে। এটি একটি বিশেষ ধরনের চাকা, যা সাইকেলের পিছনের চাকায় লাগানো থাকে। ফ্রী-হুইলযুক্ত সাইকেলে প্যাডেল করবার পর প্যাডেল থামালে সাইকেল এগিয়ে যাবে, অথচ প্যাডেল ঘুরবে না। এর ফলে ইচ্ছামত প্যাডেল করা যায় এবং বন্ধও করা যায়। এবং সাইকেল চালাতে অনেক কম পরিশ্রম করতে হয়।

সাইকেলে নিয়ে এর পর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। আজকের দিনে সাইকেলে বেশী গতির জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা, আরামের জন্যে ভাল গদি, থামানোর

জন্যে ব্রেক, পরিবর্তনীয় গীয়ার, বলবিয়ারিং, ফ্রী-হুইল, উন্নত ধরনের টিউব ও টায়ার—এ সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়েছে প্রায় গত তিন-শ' বছর ধরে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। সাইকেলের আধুনিক রূপ চিত্রে দেখানো হয়েছে (5নং চিত্র)।
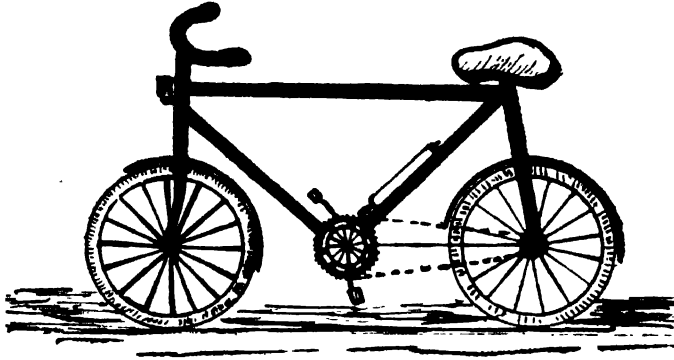
5নং চিত্র—সাইকেলের আধুনিক রূপ

টিউবে হাওয়া দেবার জন্যে এখন ছোট-বড় নানা ধরনের পাম্পার পাওয়া যায়। তখনকার দিনে এত ছোট পাম্পার তৈরী হয় নি; ফলে মাঝপথে কোন কারণে টিউবে হাওয়া কমে গেলে বা বেরিয়ে গেলে সাইকেলকে টেনে টেনে সাইকেলের দোকানে নিয়ে এসে হাওয়া দিতে হতো। ছোট পাম্পার যখন বের হয়, তখন একটা মজার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন তা বলা যাক।

পশ্চিম আফ্রিকায় কোন এক সাহেবের কাছে লণ্ডন থেকে (পাম্পার আবিষ্কৃত হবার পরবর্তীকালে) একবার একটি পাম্পারসমেত সাইকেল পাঠানো হয়। কোন একদিন ঐ সাহেব এক নির্জন জায়গা দিয়ে সাইকেলের চড়ে যাবার সময় একদল দস্যু তাঁকে আক্রমণ করতে আসে। সাহেবের কাছে আত্মরক্ষার জন্যে বন্দুক বা অন্য কিছু ছিল না। তিনি তখন সাইকেল থেকে নেমে পাম্পার নিয়ে দস্যুদের দিকে খুব জোরে জোরে এবং তাড়াতাড়ি পাম্প করতে সুরু করেন। দস্যুরা আগে কোন দিন পাম্পার দেখে নি। তাই পাম্পারের ফস্‌ফসানি শব্দে দস্যুরা ভীষণ ঘাবড়ে যায় এবং যার হাতে যা ছিল, ফেলে দিয়ে এদিক-ওদিক যেদিকে পারলো দৌড়ে পালিয়ে গেল। সাহেব তখন হাঁফ ছেড়ে বাকী পথটা নির্বিঘ্নে সাইকেলে চড়ে চলে যেতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে দুটি সীটবিশিষ্ট সাইকেল দেখা যায় (6নং চিত্র)। দু-জন আরোহী একই সঙ্গে আলাদা আলাদা প্যাডেল ঘুরিয়ে কম পরিশ্রমে এ-জাতীয় সাইকেল চালিয়ে থাকে। ফ্রেমটি এমনভাবেও তৈরী করা হয়, যাতে পিছনের সীটে কোন মহিলা আরোহীও বসে চালাতে পারে (6নং চিত্র)।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে ইঞ্জিন জুড়ে দেবার কথাও আগে থেকে অনেকেই ভেবেছেন। এ-জাতীয় ভাবনা প্রথম সুরু হয় 1885 খৃষ্টাব্দে। ইঞ্জিনযুক্ত
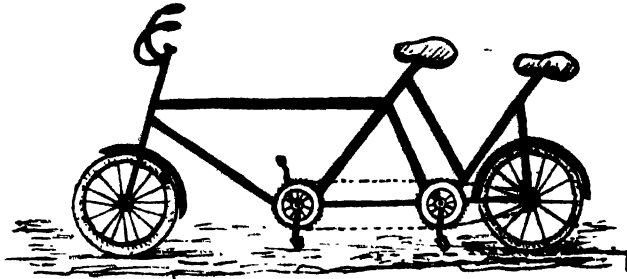
6নং চিত্র—দুটি সীটবিশিষ্ট সাইকেল

সাইকেলকে মোটর-সাইকেল বলা হয়। এ জাতীয় সাইকেল ক্রমশঃ উন্নত হয়ে বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, তার সঙ্গে আমরা পরিচিত।

আমাদের দেশে 1876 খৃষ্টাব্দে সাইকেল চালু হয়। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড থেকেই তা প্রথম আমদানী করা হয়েছিল বলে কথিত আছে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

জে. রবার্ট ওপেনহাইমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী (1904-1967)

1945 খৃষ্টাব্দের 16ই জুলাই, সোমবার। সময়, ভোর 5টা বেজে 29 মিনিট। নিউমেক্সিকোর মরুভূমির মধ্যে 'জিরো হিল' নামে পাহাড়টি থমথম করছে। জিরো হিলের চূড়ায় 100 ফুট উঁচু ইস্পাতের মিনার, ওজন তার 32 টন। মিনারের উপরে একটি ধাতব ক্যাপস্যুল, দেখে মনে হয় নিরীহ একটি ধাতুপিণ্ড। ঐ ক্যাপস্যুল থেকে অনেকগুলি তার মিনারের গা বেয়ে নেমে এসেছে মাটিতে। এইটিই হলো পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম-বোমা। বিজ্ঞানীদের মতে, এর কর্মক্ষমতা এমনই ভয়াবহ যে, এটি যার হস্তগত, সারা দুনিয়া তার মুঠোর মধ্যে।

প্রায় নয় মাইল দূরে এর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র। মরুভূমির বালির নীচে সব যন্ত্রপাতি, লোকজন। সেখান থেকে মাইলের পর মাইল লম্বা তার মিনারে গিয়ে পৌঁচেছে। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কয়েক শত বিজ্ঞানী, সেনাবাহিনীর কর্মীরা মেকানিক্স্ এবং যন্ত্রবিদেরা প্রস্তুত এবং এখানেই উপস্থিত আছেন ডক্টর জে. রবার্ট ওপেনহাইমার, অ্যাটম-বোমা কর্মকাণ্ডের নেতা।

5টা বেজে 30 মিনিট সেই জিরো হাওয়ার, যখন অ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হবে। জিরো হাওয়ারের আর 45 সেকেণ্ড দেরী, তখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক, ডক্টর যোশেফ ম্যাক্‌কিবেন, জটিল তারের জালে আচ্ছন্ন একটি যন্ত্রদানবকে সুইচ টিপে চালিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বৈদ্যুতিক পাল্‌সের সৃষ্টি হলো, যারা শেষ পর্যন্ত বোমাটিকে সক্রিয় করে তুলবে। সময় গণনা সুরু হলো। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সবাইকে বলা হলো মাটিতে শুয়ে পড়তে এবং সবাই চোখে পরলেন বিশেষ ধরণের রঙীন কাচের চশমা।

ঠিক 5টা বেজে 30 মিনিটে মিনারের চূড়ায় জ্বলে উঠলো একটি অগ্নিপিণ্ড; আগুনের লেলিহান শিখা ভোরের আকাশকে বিদীর্ণ করে লাল, কমলা এবং অপার্থিব এক শিহরণ জাগানো সবুজ রঙে চারিদিক রাঙিয়ে দিল। বিরাট, বিশাল ধূম্ররাশি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ালো, লম্বায় সাত মাইলেরও বেশী, বিরাট এক ছত্রাকের মতন। আর, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিক্ষুব্ধ ভয়াবহ এক গর্জন, চারিদিক কেঁপে উঠলো থর্‌থর্ করে। এরই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড তাপ, মনে হলো গোটা সূর্যটাই যেন নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হলো। আর এরই সঙ্গে বিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কতগুলি ট্যাঙ্ক অনুসন্ধানের কাজে এগিয়ে এলো। বিকিরণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্যে ট্যাঙ্কগুলির সর্বাঙ্গ সীসার আস্তরণে মোড়া। এদের মধ্যে ছিল দূর-থেকে নিয়ন্ত্রিত মাটি খোঁড়বার যন্ত্রপাতি। এ-সবেরই ব্যবস্থা করা হয়েছে ডক্টর ওপেন-হাইমারের নির্দেশে। এক-শ' ফুট ইস্পাতের মিনার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, নাচের বালি গলে গিয়ে তা পরিণত হয়েছে সবুজ কাচে। এক মাইল দূরত্বের মধ্যে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। সাড়ে চার-শ' মাইল দূরে, টেক্সাসের আমারিল্লোতেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল।

অগ্নিদগ্ধ মরুপ্রান্তর হতে ধ্বংসের বিবরণ একে একে এসে পৌঁছুতে লাগলো। বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমার পরম সন্তোষের সঙ্গে তা নথিবদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু মানুষ ওপেনহাইমার মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের চিন্তায় সন্দিহান হয়ে উঠলেন। অ্যাটম বোমার মতন বিশেষ ধরণের এবং বিরাট ক্রিয়াকাণ্ডের জন্যে মার্কিন সরকার যাঁকে ভার দিয়েছিলেন, সেই ওপেনহাইমার কি ধরণের বৈজ্ঞানিক, তিনি মানুষই বা কি ধরণের—এ বিষয়ে অনেকেই কৌতূহলী।

পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বেলায় দেখা গেছে যে, ছোটবেলায় তাঁরা খুবই সাধারণ; ভবিষ্যৎ সাফল্যের কোন ইঙ্গিতই তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু ওপেন-হাইমার ছোট থেকেই অসাধারণ। তিনি 1904 খৃষ্টাব্দে 22শে এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়েস হতে না হতেই দেখা গেল যে, অনেক ভূতাত্ত্বিক পাথর তাঁর সংগ্রহশালায় জড়ো হয়েছে, তিনি নিজের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে জীবাণু দেখতে

শিখেছেন, বেশ গুটিকতক বিদেশী ভাষা পড়তে শিখেছেন এবং ছবি আঁকা ও গানে কিছুটা দখল এসেছে। তাঁর পিতা-মাতা জার্মান-ইহুদী গোষ্ঠীভুক্ত, যথেষ্ট সম্পন্ন এবং তাঁরা ওপেনহাইমারকে এথিকাল কালচার স্কুলে পাঠাতেন। এই স্কুলটি বিশেষ ধরণের প্রতিভাধর ছাত্রদের জন্যে।

ওপেনহাইমারের বয়েস যখন বারো বছর, তখন দেখা গেল তিনি রসায়ন-বিজ্ঞানে কৌতুহলী হয়েছেন। প্রকৃতির ঘটনাগুলি যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম মেনে চলে এবং সর্বত্রই যে একটি বিশেষ পরম্পরা বর্তমান, এই তথ্য তাঁকে ঐ বয়সেই মুগ্ধ করে। তাঁর পিতামাতা তাঁর জন্যে একটি রসায়ন-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার তৈরী করে দেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে পড়াশুনায় সাহায্য করবার জন্যে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। দেখা গেল, এক বছরের কাজ কিশোর ওপেনহাইমার মাত্র ছয় সপ্তাহেই শেষ করলেন।

বই-পত্র এবং সাংস্কৃতিক নানা কাজের মধ্যেই বালক ওপেনহাইমারের জীবন কাটে। ঐ বয়সে ছেলেদের যে সব খেলাধূলায় এবং কাজে আগ্রহ দেখা যায়, ওপেনহাইমারের তাতে কোন উৎসাহই ছিল না। ক্রমেই সে লাজুক এবং নিঃসঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলো। ঘরের বাইরে সে যাতে সময় কাটাবার উৎসাহ পায়, সেজন্যে তার বাবা তাকে ছোট্ট একটা নৌকা কিনে দেন। ওপেনহাইমার তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে লঙ আইল্যাণ্ডের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে নৌকা বাইতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এথিকাল কালচার স্কুলের পড়া শেষ হলো. স্কুলের সেরা ছাত্র হিসাবে ওপেনহাইমার সম্মানিত হলেন। এর পর তাঁর বাবার সঙ্গে ওপেনহাইমার বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি রোম এবং গ্রীসের চারিদিক তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এছাড়াও ইউরোপের অন্য সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিও তাঁর দেখা হয়ে গেল। এই ভ্রমণের শেষে ওপেনহাইমার যখন বাড়ী ফিরলেন তখন ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালীয়, ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষায় তাঁর দখল অনেক বেড়ে গেছে। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, পুরনো সভ্যতার বিষয়ে পড়াশুনা করে তিনি ঐ বিষয়ে অধ্যাপনা করবেন।

উনিশ বছর বয়সে ওপেনহাইমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করেন, এবং সেখানে রসায়ন-বিজ্ঞানে ডিগ্রী পান। তিনি চার বছরের কোর্স তিন বছরে শেষ করে উচ্চসম্মানের সঙ্গে সেখানকার পড়াশুনা শেষ করেন।

1926 খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং কেম্‌ব্রিজের বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ পরীক্ষাগারে কাজ শুরু করেন লর্ড রাদারফোর্ডের সঙ্গে। রেডিওঅ্যাকৃটিভিটি এবং পরমাণু-বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত পথিকৃৎ লর্ড রাদারফোর্ড তখন পরমাণু-রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত।

কেম্‌ব্রিজেই ওপেনহাইমারের সঙ্গে বিখ্যাত পদার্থবিদ্‌ ম্যাক্স-বর্ণ্‌-এর সাক্ষাৎ হয়। ম্যাক্স বর্ণ্‌ ওপেনহাইমারকে গ্যোয়েটিনজেনে নিয়ে যান এবং সেখানকার নামকরা বহু গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান ওপেনহাইমার। এখানেই

ওপেনহাইমারের নিঃসঙ্গতা কাটে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রোফেসর বর্ণ-এর সঙ্গে গবেষণা করে 'অণুর শক্তির প্রভাব' সম্পর্কে একটি রচনা তিনি প্রকাশ করেন। রচনাটির উৎকর্ষ এত বেশী ছিল যে, ঐ কাজের জন্যে ডক্টর অব্ ফিলসফি ডিগ্রীতে তিনি ভূষিত হন। এর পর সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে এবং হল্যাণ্ডের লীডেনে তিনি আরও কিছু দিন পড়াশুনা চালিয়ে যান।

1928 খৃষ্টাব্দে 24 বছর বয়সে ওপেনহাইমার যখন আমেরিকায় ফিরে এলেন, তখনই পদার্থবিদ্ হিসাবে তাঁর সুনাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন থেকেই মানুষের কল্যাণের জন্যে পরমাণু কেন্দ্রের বিভাজন বিষয়ে তিনি চিন্তা করতে সুরু করেন। প্রায় সেই সময়েই কয়েক হাজার মাইল দূরে একজন প্রাক্তন রাজমিস্ত্রী হিটলার সারা দুনিয়ার মালিক হবার স্বপ্ন দেখেন এবং তাঁর স্বপ্ন সার্থক করবার জন্যে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগুতে সুরু করেন।

ওপেনহাইমার শেষ পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন, বিবাহ করেন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তাঁর দিনগুলি ভরে উঠে ; সঙ্গে থাকে তাঁর নানান ধরণের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম।

অধ্যাপনা করতে তাঁর খুব ভাল লাগতো। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ছাত্রেরা আসতে লাগলো তাঁর অধ্যাপনা শুনতে, গণিতের নানা তথ্য এবং 'নতুন পদার্থবিদ্যা' সম্বন্ধে তাঁরা অধ্যাপক ওপেনহাইমারের সঙ্গে আলোচনা করতো। যদিও তিনি নিজে কোন বিখ্যাত আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত নন, তবুও তাঁর উপদেশ এবং তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী অনেক বিখ্যাত আবিষ্কারকে সাহায্য এবং অনুপ্রাণিত করেছে। এ সম্পর্কে তাঁর সহকর্মী এবং নোবেল পুরস্কারবিজয়ী কার্ল. ডি. অ্যাণ্ডারসন ও ডিরাকের নাম করা যায়। অ্যাণ্ডারসন মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেন, আর ডিরাক পজিট্রন, মেসন প্রভৃতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার রহস্য উদ্ঘাটিত করেন।

সম্ভাবনাময় কর্মমুখর জীবন থেকে ওপেনহাইমাররা বঞ্চিত হলেন। তাঁদের একটি মাত্র সন্তান পিটার এবং তাঁদের বাড়ীটি ছিল একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানে অনেক জ্ঞানী-গুণী সমবেত হতেন, সংস্কৃতির নানান দিক নিয়ে আলোচনা হতো। তাত্ত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে সুরু করে প্রাচ্যদেশের শিল্প এবং দর্শনও এই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু শান্তির এই দিনগুলির অবসান হলো। 1941 খৃষ্টাব্দের 7ই ডিসেম্বর জাপান আক্রমণ করলো পার্ল হারবার এবং আত্মরক্ষার তাগিদে আমেরিকা জড়িয়ে পড়লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

আইনষ্টাইন প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে হুঁসিয়ার করে দিলেন যে, জার্মান ও ইটালীয় বৈজ্ঞানিকেরা একটি নতুন বোমা তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন,

এর ধ্বংসশক্তি অপ্রতিরোধ্য। শত্রুপক্ষ যদি পূর্বেই এই বোমা তৈরী করে ফেলে, তাহলে মুক্ত বিশ্বের পরাজয় অনিবার্য।

কিন্তু এই অ্যাটম বোমা তৈরী করা কোন একজন বৈজ্ঞানিকের সাধ্যের বাইরে। এর জন্যে প্রয়োজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টা। কে এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেবেন? এর জন্যে প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানের নানান শাখায় গভীর জ্ঞান। এই রকম একজনের নেতৃত্ব ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বৈজ্ঞানিকদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সংহত করে সফল করা সম্ভব নয়। এই প্রচেষ্টায় অনেক সমস্যার উদ্ভব হবে। এই সমস্যায় সিদ্ধান্ত নেবার এবং সমস্যার মোকাবিলায় এগিয়ে আসবার মতন জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী কোথায় পাওয়া যাবে? আমেরিকার নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিকেরা জে. রবার্ট ওপেনহাইমারের নাম প্রস্তাব করলেন। 1942 খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁকে অ্যাটম-বোমা কর্মকাণ্ডের নেতা নিযুক্ত করেন।

অ্যাটম বোমার মূলে কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজ করে? প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ক্ষুদ্রতম বস্তুকণিকার নাম দেন 'অ্যাটম'। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অ্যাটমিক ওজন ঠিক করা হয়। সর্বাপেক্ষা হাল্কা মৌলিক হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওজন ধরা হয় এক এবং সর্বাপেক্ষা ভারী ইউরেনিয়ামের অ্যাটমিক ওজন 238। 1897 খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পদার্থবিদ্ জে. জে. টমসন আবিষ্কার করেন যে, অ্যাটমকে ক্ষুদ্রতর অংশ ইলেকট্রনে বিচ্ছিন্ন করা যায়। 1914 খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের পদার্থবিদ্ নীল্‌স্ বোর অ্যাটমের আধুনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তখন জানা যায় যে, অ্যাটমের কেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎ-আধানের একটি কেন্দ্রীন আছে এবং এই কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি সর্বদাই ঘূর্ণনশীল। পরে সার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, এই কেন্দ্রীনের মধ্যে আছে পজিটিভ বিদ্যুৎ-আধানের প্রোটন এবং নিউট্রন কণিকা। প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে এরা একত্রিত হয়ে পরমাণুকেন্দ্রীনের সৃষ্টি করে। এই শক্তির বিরুদ্ধে পরমাণুকেন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করলে, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে কল্পনাতীত প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি হবার কথা। এই পরমাণুকেন্দ্রগুলির আয়তন খুবই ছোট; একটি সাধারণ অ্যাটমের মধ্যে দশ লক্ষের দশ লক্ষগুণ পরমাণু কেন্দ্রীন রাখা যেতে পারে।

1934 খৃষ্টাব্দে রোমে এনরিকো ফের্মি দেখান যে, ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করলে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন রূপান্তরিত হয়ে নতুন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই সূত্র ধরে লিজে মাইট্নার এবং অটো ফ্রিশ আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা আইসোটোপে ভেঙ্গে ফেলা যায় এবং এই সময়ে পরমাণু থেকে প্রচুর শক্তি নিঃসৃত হয়। এই পদ্ধতিকে 'কেন্দ্রীনের বিভাজন' বলে। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের বিভাজনের সময় এর মধ্যে থেকে নিউট্রন কণিকা বেরিয়ে

আসে এবং অন্য কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটায়। এইভাবে বিভাজন চলতে পারে একটি শৃঙ্খলের আকারে। এই শৃঙ্খল-পদ্ধতি অ্যাটম বোমার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অ্যাটম বোমা কর্মকাণ্ডের কাজ সুরু হয় নিউ মেক্সিকোর লস্ আলামসে। এখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আড়ালে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জে. রবার্ট ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে কাজ সুরু করেন। এটি লক্ষণীয় যে, মুক্ত বিশ্বকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিষ্ঠুর নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিজ নিজ দেশ থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন আমেরিকায়; যথা, জার্মেনী থেকে লিজে মাইট্নার এবং অটো ফ্রিশ্, ইটালী থেকে এনরিকো ফের্মি, নাৎসী-অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে নীল্স্ বোর এবং হাঙ্গেরী থেকে জিলার্ড এবং টেলার।

ওপেনহাইমার এই বিশাল কর্মকাণ্ডের নেতারূপে অমানুষিক পরিশ্রম সুরু করেন। সাধারণতঃ দিনে চার ঘণ্টার বেশী ঘুম তাঁর ভাগ্যে জুটতো না। প্রায়ই অফিসে স্যাণ্ডউইচ্ খেয়ে তাঁর ডিনার পর্ব শেষ হতো। তাঁর রোগাটে ছয় ফুট লম্বা শরীর আরও ক্ষীণ হয়ে এলো, কোট-প্যাণ্ট সব আলগা হয়ে শরীরের উপরে ঝুলছে—এই রকম অবস্থা। ওজন কমতে কমতে 130 পাউণ্ডে নেমে এলো। এই অবস্থায় দেখা যেত ওপেনহাইমার চারিদিকে চরকীর মতন ঘুরছেন, নানা জনের সঙ্গে নানান পরামর্শ, একে-ওকে উৎসাহিত করছেন, জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। দু-শ' কোটি ডলার এই কর্মকাণ্ডের জন্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে খরচ করা হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খল-পদ্ধতি নিয়ে কাজ হচ্ছে। টেনেসীর ওক্রীজে সাড়ে ছয় পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-235 তৈরী করবার জন্যে 75 হাজার লোক কর্মনিযুক্ত। পরে যখন জানা গেল প্লুটোনিয়াম মৌলটি ইউরেনিয়ামের মতনই বিভাজনযোগ্য অথচ তৈরী করা অনেক সহজ, তখন এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ডে আরও প্রায় 70 হাজার লোক নিযুক্ত করে একটি কারখানা খোলা হলো। অমানুষিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হলো এই কর্মকাণ্ডে, অত্যন্ত গোপনে এবং এরই ফলে লস্ আলামসের কাছে 1945 খৃষ্টাব্দে প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হলো।

বিস্ফোরণ চাক্ষুষ করবার পর ওপেনহাইমারের মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, তা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হলো অস্বস্তিতে। মানবজাতির সামনে যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ফুটে উঠতে লাগলো, তা তাঁর পক্ষে চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তিনি ঘোষণা করলেন, জনসাধারণকে এই মারণাস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ জানানো দরকার। তিনি প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের কাছে দাবী জানালেন যে, এই বোমা ব্যবহারের ব্যাপারে সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে, তা প্রকাশ করতে হবে এবং এর সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অবহিত করতে হবে। তাঁর এই ব্যবহারের ফলে তিনি মার্কিন সরকারের সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ান এবং 1953 খৃষ্টাব্দে তাঁর উপর পুলিশী

নজর রাখবার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এসব সত্ত্বেও অ্যাটম বোমা সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ ও নির্দেশের অনেকগুলিই সরকার স্বীকার করে নেন।

ওপেনহাইমার জানতেন, ঐ বিপুল শক্তি মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব। তিনি যখন আশা প্রকাশ করলেন যে, মানুষ এই শক্তির ভয়াবহ মারাত্মক দিক উপেক্ষা করে এর কল্যাণকর দিকগুলিই ব্যবহার করবে, তখন তাঁর মুখ দিয়ে সর্বযুগের সকল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠই ধ্বনিত হলো।

1963 খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সম্মতিক্রমে ডক্টর ওপেনহাইমারকে আমেরিকার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন 50 হাজার ডলারের এনরিকো ফেমি পুরস্কারে সম্মানিত করেন। ইটালীর বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। ওপেনহাইমারকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় অ্যাটম বোমা তৈরী করবার কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যে।

1947 খৃষ্টাব্দ থেকে ওপেনহাইমার প্রিন্সটনের ইনষ্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন—এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টররূপে।

সুনীলকুমার সিংহ*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

আলোক-তরঙ্গের মাধ্যমে দূর-সংযোজনের প্রচেষ্টা

দূরপাল্লার যোগাযোগ বা দূর-সংযোজন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার সুবিদিত। ভূপৃষ্ঠস্থ কেন্দ্রের প্রেরক-যন্ত্র থেকে অ্যানটেনার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কোণে এই তরঙ্গকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। আয়নমণ্ডল এই তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে এবং তা পৃথিবীপৃষ্ঠে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে। উপগ্রহের মাধ্যমে দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় আরও ক্ষুদ্র তরঙ্গ অর্থাৎ মাইক্রো-ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গতঃ কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 1000 মেগা হার্ৎজের (1 মেগাহার্ৎজ্ $=10^6$ হার্ৎজ্) বেশী হলে তাকে মাইক্রো-ওয়েভ বলা হয় (এক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0·3 সেন্টিমিটারের কম)। তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'সংবাদ' আদান-প্রদান। এখানে 'সংবাদ' কথাটি আক্ষরিক অর্থে সংবাদও হতে পারে কিংবা যে কোন ধরণের শব্দ—গান-বাজনা, চিত্র—এমনকি চলচ্চিত্রও হতে পারে।

আমরা জানি ট্রান্সমিটার যন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ উৎপাদন করা হয়। নিম্ন কম্পাঙ্কের সংবাদ বা সিগ্ন্যাল এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে

দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মডুলেশন। উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত মডুলেশন করা তরঙ্গ প্রেরক-অ্যানটেনার মাধ্যমে আবহাওয়ামণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ, যার মধ্যে নিম্ন কম্পাঙ্কের সিগন্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় বাহক-তরঙ্গ।

বাহক-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশী হবে, তার মধ্যে তত বেশী সিগন্যাল প্রেরণ করা সম্ভব। কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ শুধুমাত্র কথা এবং গান-বাজনার সঙ্কেত বহন করতে পারে। কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গ গান-বাজনা ছাড়াও চিত্র ফুটিয়ে তোলবার মত যথেষ্ট সঙ্কেত বহন করতে পারে।

কোন প্রচার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের বাহক-তরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। সেই কম্পাঙ্কের তরঙ্গ অন্য কোন কেন্দ্র ব্যবহার করতে পারে না, কেন না তাহলে কোন গ্রাহক-যন্ত্রে একাধিক সংবাদ একই সঙ্গে ধরা পড়বে।

আলোক-তরঙ্গের অর্থাৎ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের দৃশ্যমান অংশের অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের কথা চিন্তা করে দূর-সংযোজন প্রযুক্তিবিদেরা এই তরঙ্গকে দূর-সংযোজনের কাজে লাগাতে চাইলেন। তাঁদের অনেকেই ভাবলেন এ ব্যাপারে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করবার জন্যে। কিন্তু সঙ্কেতবাহী লেসার তরঙ্গকে আবহাওয়ামণ্ডল বেশী দূর যেতে দেয় না। দেখা গেল, অল্প কয়েক কিলোমিটার পথ যেতে না যেতেই আবহাওয়া-মণ্ডলের বৃষ্টিপাত, মেঘ, ধূলিকণা—এদের মাধ্যমে প্রেরিত লেসার রশ্মির অধিকাংশ শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের অশান্ত বায়ু লেসার তরঙ্গের মধ্যে নিহিত সঙ্কেতের উপর অবাঞ্ছিতভাবে পরিবর্তন এনে দেয়। উপরন্তু বক্রপথেও লেসারকে পাঠানো সম্ভব নয়—আয়নমণ্ডল লেসার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে না। এই সব বিভিন্ন কারণে লেসার তরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যমরূপে আবহাওয়ামণ্ডলের উপর ঠিক নির্ভর করা যায় না। কাজে কাজেই প্রয়োজন দেখা দিল, এমন একটি মাধ্যমের, যার মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মি যাওয়ার সময় শক্তিহীন হয়ে পড়বে না বা অবিকৃত হয়ে যাবে না।

মাধ্যম খোঁজবার চেষ্টার ফল হিসাবে প্রথম এল এক ধরণের বায়ুশূন্য নল, যার মধ্য দিয়ে সঙ্কেতবাহী আলোক-তরঙ্গ প্রেরণ করা যাবে। প্রয়োজনমত এই নলের মধ্যে আয়না এবং লেন্স থাকবে। এর পর এই নলেরই এক পরিবর্তিত রূপ পাওয়া গেল, যার অপর নাম গ্যাস-লেন্স। নলের মধ্যকার গ্যাসকে বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীর সাহায্যে তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ফলে নলের মধ্যেকার গ্যাসের প্রতিসরাঙ্ক নলের অক্ষ অঞ্চলে বেশী হয় এবং অক্ষ অঞ্চল থেকে যতই বাইরের দিকে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা বেশী হওয়ার জন্যে প্রতিসরাঙ্ক ততই কমতে থাকে। এই ব্যবস্থা আলোক-তরঙ্গকে নলের অক্ষীয় অঞ্চল ঘিরে চলতে সাহায্য করে। কেউ কেউ ভিতর দিকে পালিশ করা নলও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত প্রচেষ্টাগুলির কোনটাই যথাযথভাবে কার্যকরী হয় নি।

ইংল্যাণ্ডের স্ট্যাণ্ডার্ড টেলিকমিউনিকেশন লেবোরেটরীর চার্লস কাও এবং জি. এ. হক্‌ম্যান সর্বপ্রথম 1966 সালে একটি সম্ভাবনাময় পদ্ধতির কথা প্রচার করলেন। তাঁদের মতে আলোক-তরঙ্গকে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করতে হলে কাচের তৈরী তন্তু (Optical fibre) একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু কাচের তৈরী তন্তু দিয়ে কি ভাবে তা সম্ভব? যখন একটা বেশী প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যম থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমের দিকে আলো যায়, তখন আপতন কোণ যদি সেই মাধ্যমদ্বয়ের সঙ্কট কোণের বেশী হয়, তখন আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে; অর্থাৎ আলো প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে। কোন কোন কাচের তৈরী তন্তুর উপরে একটা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসারঙ্কের কাচের আস্তরণ থাকলে উপরিউক্ত ঘটনা ঘটা সম্ভব; অর্থাৎ একপ্রান্ত দিয়ে সেই তারের অক্ষ বরাবর কোন আলোকরশ্মি ঢুকলে তার পৃষ্ঠতল দিয়ে তা বেরোতে পারবে না। কেননা বের হতে চাইলেই আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে। এখানে দুই ধরণের কাচের তন্তু দেখানো হয়েছে (1নং চিত্র—ক ও খ)।
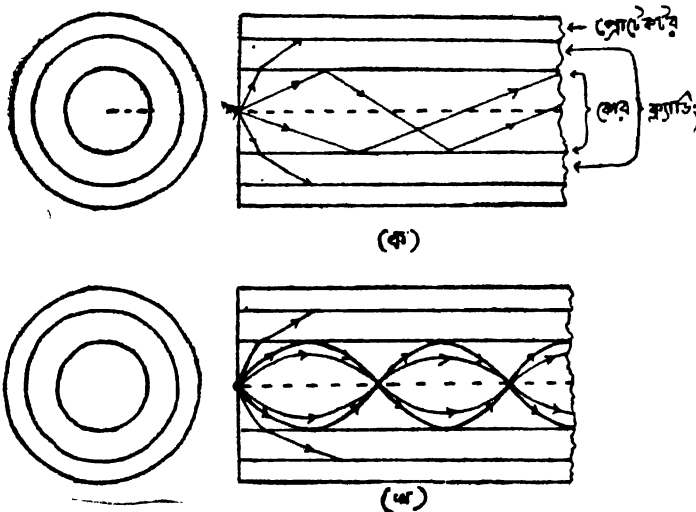
1নং চিত্র ক ও খ

তারের মূল অংশটিকে বলা হয় কোর এবং বাইরের আস্তরণকে বলা হয় ক্ল্যাডিং (Cladding)। চিত্রে খ-চিহ্নিত তন্তুটি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, অক্ষীয় অংশ থেকে যতই তার পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যাবে, ততই প্রতিসরাঙ্ক কম হবে, অর্থাৎ অনেকটা গ্যাস-লেন্সের মত। আজকাল চুলের চেয়েও সরু কাচের তন্তু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, যাতে আলোক-তরঙ্গ শোষিত হয় না বললেই চলে।

নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে কাচের তৈরী লেন্স রেখে সুসংবদ্ধ আলোক-তরঙ্গের মাধ্যমে দূর-সংযোজনের কথাও কেউ কেউ ভেবে থাকেন। এক্ষেত্রে লেন্সগুলি মাটির নীচে বায়ুনিরোধক নলের মধ্যে রাখবার কথাই তাঁরা বলে থাকেন। এ ব্যবস্থায় প্রতি কিলোমিটারে

অভাব একথা স্বীকার করিতেও যেন বাধে। বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে বাংলায় পঠন-পাঠন হয়, কারণ স্বরূপ বলা হয় মাতৃভাষায় পাঠ্য-বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়. শিক্ষাদাতাও মাতৃভাষায় সহজে শিক্ষার্থীর মনে দাগ কাটিতে পারেন। কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু মাতৃভাষাও যে শিক্ষণীয় বিষয়, একথা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেন না। আমরা এখনও বিদেশী উদাহরণ দিবার হীনমন্যতায় ভুগিতেছি। মাতৃভাষায় শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা মানে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ শিক্ষা না করিবার শামিল নয়। বাড়ীতে ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলের খাতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বাংলা বানান বর্তমান মাতৃভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে কি রকম অবহেলিত। "ইংরেজী শিখিতে পারি নাই, বাংলাও ভুলিয়া গিয়াছি"—এই রকম দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা ব্যাকরণের জন্য বরাদ্দ ঘণ্টা, ইংরেজী আমল অপেক্ষা অনেক কম, প্রতি ক্লাসে নূতন ব্যাকরণ বই পাঠ্য করা ইত্যাদি বিপত্তি আছে। আগে ক্লাস সেভেন হইতে টেন পর্যন্ত একই বাংলা এবং ইংরেজী ব্যাকরণ পড়িতে বা মুখস্থ করিতে হইয়াছে। চারি বৎসর একটি বই অধ্যয়ন করিলে কিছু বিদ্যা আয়ত্তে আসিবে, কিন্তু আজকাল চারি বৎসর এক ব্যাকরণ বই সাধারণতঃ কোন স্কুলেই পড়ানো হয় না। ইহা শিক্ষাদানের স্বার্থে নয়। কাজেই বাংলা ভাষার প্রতি মমতা জাগাইতে হইলে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা না শিখিলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার কি ভাবে সম্ভব হইবে ?

সরকারী স্তরে শৈথিল্যের অন্য একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের সামনে উপস্থিত করিব—যদিও বক্ষ্যমান নিবন্ধের পক্ষে ইহা গৌণ। 1956 খৃষ্টাব্দের 8ই ডিসেম্বর লোকসভায় আইন পাশ হয় যে, আমরা ভারতবর্ষে অতঃপর M.K.S.A. System অর্থাৎ মিটার-কিলোগ্র্যাম-সেকেণ্ড-অ্যাম্পিয়ার প্রথা বা সহজ কথায় মেট্রিক প্রথায় মাপজোখ করিব। কিন্তু আমরা সকলে কেন মেট্রিক প্রথায় এখনও অভ্যস্ত হই নাই ? বাজারে বিক্রেতা কিলোগ্র্যাম হিসাবে জিনিষ দেয়, দরজী ঠিক মিটারে কাপড় কাটে, আর আমরা অনেক অফিসে এখনও গজ ফুট করি। ডাক্তার বাবু এক-শ' ডিগ্রী জ্বর বলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় এখনও গজ-ফুটেই প্রশ্ন করা হয়। অবহেলা এবং শৈথিল্য জগদ্দল পাথরের ন্যায় আমাদের প্রগতির পথ রুদ্ধ করিতেছে। মনে হয়, বাংলা ভাষায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পড়ানো হয়, কিন্তু মূল ভাষাটা কেন শেখানো হয় না, তাহা খুঁজিতে গেলে ঐ অবহেলা, ঐ শৈথিল্যই প্রকট হইবে। এই জন্যই দৃষ্টান্ত এবং অতি সাম্প্রতিক উপরের এই দৃষ্টান্ত দিলাম। কথায় বলে, বিজ্ঞান যেখানে শেষ, কারিগরী বিদ্যা সেখানে সুরু। কথাটা খুব সত্য কিনা সন্দেহ হয়। আজকাল বিভিন্ন বিদ্যার যেমন বিশেষত্ব আছে, আবার বিভিন্ন বিদ্যার সংশ্লেষিত প্রয়োগও আছে। পরিবেশ-বিজ্ঞান একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ। কিন্তু যে বিদ্যাই বিশেষভাবে শিখি, আগে সাধারণ জ্ঞানলাভ করা চাই। বিজ্ঞানেরও ভাষা আছে, তাহা আয়ত্ত না করিলে বিজ্ঞান প্রচার করা সম্ভব নয়।

অনেকে বিজ্ঞান সাধনাকে বিজ্ঞান প্রচারের সমার্থক মনে করেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ প্রথমে সাধকের, পরে তিনি তাঁহার সিদ্ধির ফলাফল জনগণের কল্যাণে বিলাইতে পারেন। বিজ্ঞান প্রচার নিজের জন্য নয়, সমাজের সকলের জন্য। হাতে-কলমে কাজ করিবার জন্য আজকাল বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যে কোন ইনষ্টিটিউটে হাতে-কলমে কাজ করা যায়। মডেল তৈয়ার

করা করা যায়। মেধা প্রতিযোগিতার জন্য মডেল জোগাইয়া অর্থ উপার্জন করাও অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য প্রথমেই মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রথম বই রবার্ট মে কর্তৃক রচিত অঙ্ক পুস্তক। 1817 খৃষ্টাব্দে পুস্তকটি লিখিত হইয়াছিল। বিদেশীয় মিশনারীরা বিদেশে আসিয়া বাংলা ভাষা শিখিয়াছেন, তাহার পর প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানের প্রচার বাংলা ভাষায় করিয়াছেন। যাঁহারা পাঠ্যপুস্তক বাংলায় রচনা করিতেছেন, তাঁহারা বাংলা ভাষার সেবা করিতেছেন। সুরু হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতির যে সমস্ত বই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া অথবা মাইক্রোফিল্ম করিয়া একটি গবেষণা কেন্দ্র খুলিলে বিজ্ঞান প্রচারের একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস গড়িয়া তোলা সম্ভব। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পরিভাষা প্রণয়নেও আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন বাংলা ভাষা প্রচলনে উৎসাহী, তখন তাঁহারাও এই উদ্যোগকে সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা শক্তিশালী করিবেন—আশা করা যায়।

দুটি অবিস্মরণীয় চরিত্র

শঙ্কর চক্রবর্তী

(1)

প্রাণিবিদ কমল চৌধুরী

পৃথিবীতে সব দেশেই কিছু কিছু মানুষ দেখা যায়, যাঁরা বিজ্ঞানের কোন একটা বিষয়ে গবেষণা কাজের অধিকারী না হয়েও সে বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারেন। কমল চৌধুরী হলেন এরকম একজন মানুষ, প্রাণি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁর জ্ঞানের পরিধি যোন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

কমল চৌধুরীকে কলকাতা শহরের অনেক মানুষই চেনেন। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের প্রায় মোড়ের কাছাকাছি মধুক্ষরা নামে একটি মিষ্টির দোকানের মালিক ছিলেন তিনি। দোকানটি আপাততঃ আর চালু নেই। কমলবাবু এককালে বিরাট সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আজ তার প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। আসামে কিছু জমিজমা রয়েছে এই পর্যন্ত।

কমলবাবুর মধুক্ষরার নানাবিধ মিষ্টির তারিফ করেন নি, এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ভার। মধুক্ষরার নিখুঁতি ছিল কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ বস্তু। এসবই কিন্তু বাহ্য ব্যাপার। আমার কাছে কমলবাবুর একটি মস্তবড় পরিচয় ছিল, যে পরিচয়টা বোধ হয় অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। কমলবাবু হলেন একজন অত্যন্ত উঁচুদরের অপেশাদারী প্রাণিবিদ। প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে শুধু শুকনো জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না কমলবাবু। প্রাণীদের সম্বন্ধে এমন অগাধ ভালবাসা বড় একটা চোখে পড়ে না।

কমলবাবুর মধুক্ষরা ছিল আমাদের কাছে পান্থশালার মত! যে কোন সময়ে এসে কমল-

বাবুর সঙ্গে কোন বিষয়ে দু-মিনিট কথা বললেই প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। কমলবাবু দোকানে যে চেয়ারে বসতেন, তার পাশে একটি কাঠের বাক্সে একটি শুক্‌নো ছোট গাছের ডাল বসানো ছিল। সেই ডালের ওপর বসে থাকতো একটি লরিস। লরিস বাঁদরগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না, তবে অনেকটা বাঁদরের মত দেখতে। লেজবিহীন ছোট্ট একটি প্রাণী—চোখ দুটো গোল গোল ভাঁটার মত।

লরিস হলো প্রাইমেট বংশোদ্ভূত। প্রাইমেট আবার হলো সাধারণ বানর (New world ও Old world monkeys), চারটি নর-বানর (Anthropoid apes) যথা—গিবন, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং ও গরিলা এবং মানুষের আদি পূর্ব-পুরুষ। প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলে প্রাইমেটের আবির্ভাব হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সেই আদি প্রাইমেটের চেহারার সঙ্গে তাদের বর্তমান বংশধর লরিস, লেমুর প্রভৃতি প্রাণীগুলির নাকি অনেক মিল রয়েছে।

লরিস হলো বর্তমানে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের অধিবাসী। কমলবাবুর লরিসটিকে দেখলেই আমি আমাদের পূর্বপুরুষের সেই আদিম রূপটিকে মনে মনে ধ্যান করবার চেষ্টা করতাম।

অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী হলো এই লরিস, দেখলেই চট্‌ করে ওর ওপরে মায়া পড়ে যায়। কমলবাবুর তো ওর ওপরে ছিল প্রায় অপত্যস্নেহ। লরিস মাংসাশী প্রাণী নয়, তবে অন্যান্য নিরামিষ খাদ্য-বস্তুর সঙ্গে দু-চারটে পোকা বা ফড়িং পেলে তার কোন আপত্তি প্রকাশ পেত না। দিনের বেলায় লরিসটা ওর ছোট্ট আটপৌরে ঘরটি ছেড়ে বড় একটা বাইরে বেরোত না। চুপচাপ অলসভাবে বসে বা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিত সারাটা দিন। আসলে ওরা হলো নিশাচর প্রাণী। রাত হলেই গোটা ঘরটা জুড়ে ওর পরিক্রমা সুরু হয়ে যেত এবং পোকা ইত্যাদি ধরে খাওয়ার কাজটা এই সময়েই চলতো বেশী। কমলবাবুর সঙ্গে ছিল ওর মিতালির সম্পর্ক—সুযোগ পেলেই ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চড়ে বসতো। বাচ্চাছেলের মতই বেশী খেয়েদেয়ে লরিসটার মাঝে মাঝে পেটখারাপ করতো, তখন ওর ওপরে কমলবাবুর স্নেহযত্নের পরিমাণটা একটু বাড়তো আর কি!

কমলবাবুর দোকানে ছিল একটি ক্যামেলিয়ান বা বহুরূপী। ওর গায়ের স্বাভাবিক রংটা ছিল সবুজ—চেহারাটা একটু লম্বাটে গিরগিটির মতো। একটি বাঁশের বেড়ার ওপরে ও বসে থাকতো সবুজ লতাপাতার আচ্ছাদনের মধ্যে। ভয় পেলেই ওর গায়ের রংটা পাল্টাতে থাকতো—সবুজ পাতার মধ্যে ও যেন প্রায় মিশে যেত। বহুরূপীর খাওয়াটাই ছিল ভারী বিচিত্র। ওর প্রধান খাদ্য হচ্ছে জ্যান্ত ফড়িং। ফড়িংটার প্রায় এক ফুটের কাছাকাছি ও যখন এসে পৌঁছুতো, তখন বিদ্যুৎ-বেগে মস্ত লম্বা একটা জিভ্‌ বের করে ফড়িংটাকে নিজের মুখের মধ্যে টেনে নিত। বহুরূপীর খাওয়া দেখতে মধুক্ষরায় প্রায় ছোটখাটো একটা ভীড় জমে যেত।

একদিন সকালবেলা কমলবাবুর মধুক্ষরায় গিয়েছি, দেখি তিনি খুব শুক্‌নো মুখে বসে আছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতে বললেন, আমার মা গত তিন দিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। আমি ভাবলাম, কমলবাবুর ছোটমেয়ের হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে এবং ইতিবৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। শুনে তো চক্ষুস্থির, কমলবাবুর ছোট মেয়ে নয়, ওর বাড়ীতে যে Ressels Viper বা চন্দ্রবোড়া সাপটা রয়েছে, সে নাকি গত তিন দিন ধরে কিছু খাচ্ছে না, তাই কমলবাবুর গলা দিয়েও কিছু নামছে না। চন্দ্রবোড়ার খাদ্য হলো জ্যান্ত টিকটিকি—এরকম গোটা কয়েক টিকটিকি ওর মুখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ও তাদের স্পর্শও করছে না ও একেবারে নিথর, নিস্পন্দ

হয়ে পড়ে আছে, নিশ্চয়ই ওর শরীর খুবই খারাপ হয়েছে। কমলবাবু যেভাবে কথা বলছিলেন মনে হচ্ছিল যেন কোন মানুষের রোগের বর্ণনা দিচ্ছেন—ওঁর কথার মধ্যে স্নেহ যেন ঝরে পড়ছিল।

সেদিনই সন্ধ্যায় কমলবাবুর বাড়ীতে গেলাম, অসুস্থ চন্দ্রবোড়াটাকে দেখতে। সত্যিই ও খুব কাতর হয়ে পড়ে আছে। কমলবাবুর স্ত্রী বললেন, কমলবাবু নাকি জ্যান্ত টিকটিকি ধরে কাচের জারের মধ্যে একেবারে চন্দ্রবোড়াটার মুখের কাছে নামিয়ে দেন—যদি কোনরকমভাবে ছোবল মারে, তাহলে কি আর কিছু করবার থাকবে। ভদ্রমহিলা কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলেন নি—পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত কয়েকটি সাপের মধ্যে চন্দ্রবোড়া হলো একটি। এর বিষ একবার শরীরে ঢুকলে রক্তের লোহিত কণিকা এবং রক্তবাহী নালীগুলির দেয়াল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রক্তের জমাটবাধার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, রক্তের চাপ কমে আসে ও হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যু সংঘটিত হয়। চন্দ্রবোড়ার বিষক্রিয়া ঘটে তড়িদ্‌গতিতে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মৃত্যু অবধারিত।

কমলবাবুর বক্তব্য হলো, চন্দ্রবোড়াটা নিশ্চয়ই এটুকু বোঝে যে, আমি ওর কোন ক্ষতি করবো না, কাজেই ও আমাকে কামড়াবে কেন। কমলবাবু নিজে অবশ্য সাপ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন এবং সাপ ধরবার ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমরা আলোচনা করলাম, চন্দ্রবোড়াটাকে নিয়ে কি করা যায়। কমলবাবু বললেন, উনি Zoological Gardens-এর সুপারিনটেণ্ডেন্ট ডক্টর লাহিড়ীর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলেছেন। সাপটাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে ওষুধপথ্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। সাপটাকে চিড়িয়াখানাতেই দিয়ে দেবেন, কিন্তু এরকম অসুস্থ অবস্থায় ওকে তিনি কিছুতেই বাড়ী থেকে বিদায় করতে পারবেন না। ও সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপরে ও তাঁর বাড়ী থেকে যাবে, তার আগে নয়। আমার শুধু অভিভূত হবার পালা আর কি!

কমলবাবুর বাড়ীতে একটি ছোট Mouse deer ছিল। প্রাণীটি হরিণ বংশোদ্ভূতই, কিন্তু আকারে খুবই ছোট, মাথায় কোন শিং নেই। এত শান্ত, নিরীহ প্রাণী—চোখ দুটি ভারী সুন্দর, তার মধ্যে রয়েছে যেন অগাধ বিশ্বাসের এক ছবি, সংশয়ের লেশমাত্র নেই। একদিন কমলবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি, উনি Mouse deer-টাকে কোলে নিয়ে ওর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। ব্যাপার কি, না বেচারা ওর খাঁচার কাঠের রেলিং বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। কমলবাবুর কোলে ছোট হরিণটার চোখে সেদিন যে অসীম নির্ভরতার ছবি দেখেছিলাম, আমার আজও তা মনে আছে।

কমলবাবু এখন বেশীর ভাগ সময়েই আসামে থাকেন। প্রাণিবিজ্ঞানে অসীম দরদী এই মানুষটির অভাব বড় বেশী করে অনুভব করি—প্রাণিজগতের সঙ্গে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে এমন একটি মানুষকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

(2)
সর্পপ্রেমিক হুইটেকার

বছর পাঁচেক আগে মাদ্রাজ শহরে Snake Park দেখতে গিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে। উদ্দেশ্য সাপ দেখা এবং ওখানকার পরিচালক হুইটেকারের সঙ্গে আলাপ করা। পার্কে ঢুকতে যাব, দেখি সাইকেলে করে এক বিচিত্রবেশী সাহেব ভিতর থেকে গেটের দিকেই আসছে। বিচিত্র সাহেবই বটে—মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, পরণের আধময়লা জামাকাপড়ের অবস্থাও

ভাই—বাগানের মালির সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কোন তফাৎ নেই। পরিচয় হতে জানা গেল—ইনিই রোমিউলাস হুইটেকার। Snake Park-এর তরুণ অ্যামেরিকান curator বা তত্ত্বাবধায়ক এবং একজন বিশিষ্ট সর্প-বিজ্ঞানী। ভারতে প্রায় বারো বছর ধরে বসবাস করছেন এবং দক্ষিণ ভারতে world wild life fund-এর আঞ্চলিক প্রতিনিধিরূপে বর্তমানে মাদ্রাজে একটি Snake Park, সাপের বিষ উৎপাদন, এবং সাপ সম্বন্ধে একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলবার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

হুইটেকারের সাইকেলের কেরিয়ারের ওপর একটি বাক্সের দিকে আমাকে কৌতূহলী হয়ে তাকাতে দেখে ও হেসে বললো—ওর মধ্যে সাপ রয়েছে। কথা বলবার ভাবটা এমন যেন ওটা বিশেষ কোন একটা ব্যাপারই নয়। কি সাপ জানতে চাইলে ও নিস্পৃহভাবে জানালো এই গোটা কয়েক Russells Viper (চন্দ্রবোড়া), Cobra (গোখ্‌রো ও কেউটে) এবং Krait। প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিষাক্ত ও মারাত্মক সাপ। সাপগুলি ও নিজেই ধরেছে এবং বিষ সংগ্রহ করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। বহু প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরীর কাজে এই বিষের দরকার হবে।

সর্পপ্রেমিক হুইটেকার আমাকে প্রথম থেকেই গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কথায় কথায় বললো—ও সাপ ধরতে শিখেছে দশ-বারো বছর বয়েস থেকে, সাপ সম্বন্ধে ভীতি ওর কোন দিনই ছিলই না। ওর বক্তব্য হলো—সাপের স্বভাব-প্রকৃতি সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হলে সাপ নিয়ে নাড়াচড়া করবার সময় হঠাৎ সাপের কামড়ে মারা পড়বার সম্ভাবনাও থাকে না।

সাপ সম্বন্ধে হুইটেকারের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ নাকি হলো অস্ট্রেলিয়ার Tiger snake—এ কোবরারই সগোত্র, কিন্তু এর বিষ কোবরার বিষের চেয়েও চল্লিশ গুণ বেশী মারাত্মক। এশিয়ার সর্পকুলের মধ্যে Krait হলো সবচেয়ে বিষাক্ত।

ভারতবর্ষে প্রায় পঞ্চাশ রকমের বিষাক্ত সাপ রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত এবং ভেষজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি হলো—চন্দ্রবোড়া, কোবরা, Krait এবং Sawscaled viper। প্রথম তিনটি সাপকে ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু চতুর্থটিকে শুকনো এবং মরুময় অঞ্চলেই বেশী চোখ পড়ে।

চন্দ্রবোড়া নড়াচড়া খুব বেশী পছন্দ করে না এবং দিনের বেলায় দৃষ্টির আড়ালে কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। ওর জিহ্বা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ঘ্রাণশক্তিও অত্যন্ত জোরালো। রাত্রি বেলা এ ধীরগতিতে শিকারের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ে এবং ওর প্রিয় খাদ্য হলো ব্যাং, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী। চন্দ্রবোড়া যদিও অত্যন্ত সাবধানী এবং মন্থরগতি, উত্তেজিত হলে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে, জোরালো হিস্‌হিস্‌ ধ্বনির সঙ্গে ছোবল মেরে বসবে। মাদী চন্দ্রবোড়া ওর ডিমগুলিকে শরীরের মধ্যেই তা দেয় এবং একসঙ্গে চল্লিশটির মত বাচ্চা প্রসব করতে পারে।

ভারতে সবচেয়ে পরিচিত সাপ হলো কোবরা (গোখ্‌রো ও কেউটে)। কোবরা ভয় দেখাবার জন্যে তার ফণা উদ্যত করলেও আসলে নিতান্তই ভীরু প্রকৃতির এবং তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো কাল কেউটে—এরা সত্যিই অকুতোভয়, কোন কিছু পরোয়া না করে একেবারে সোজা তেড়ে আসে। কোবরার খাদ্য হলো ব্যাং, গিরগিটি, ইঁদুর এবং অন্যান্য সাপ।

মাদী কোবরা বা কেউটে বারো থেকে পঁচিশটির মত ডিম প্রসব করে কোন পুরনো

উইয়ের ঢিবি বা ইঁদুরের গর্তের মধ্যে রেখে দেয় এবং ষাট দিনেরও বেশী তার চার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে এবং এবং তা দিয়ে চলে। বাচ্চাগুলি ডিম ফুটে বেরিয়েই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে—আত্মরক্ষার জন্তে একটি ছোট ফণা, একজোড়া ছোট বিষদাঁত এবং বিষের থলি বা গ্ল্যাণ্ড নিয়েই ওরা জন্মায়। একটি পূর্ণবয়স্ক কোবরার দৈর্ঘ্য প্রায় এক মিটারের মত

Krait সাপের দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় মিটারের মত এবং এও নিশাচর। এরা এমনিতে অত্যন্ত নিরীহ এবং খোঁচাখুচি করলে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। একমাত্র পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিলেই এ কামড়ায়। এর বিষদাঁতগুলি খুবই ছোট, কিন্তু বিষের প্রভাব কোবরার চেয়েও অনেক বেশী মারাত্মক।

সাপেরা সাধারণতঃ দশ থেকে তিরিশ বছরের মত বাঁচে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাপেদের শারীরিক বৃদ্ধি যেমন ঘটতে থাকে, তেমনি খোলস পাল্টানোর ব্যাপারটাও চলতে থাকে। অন্যান্য প্রাণীর মত সাপেরাও নানাবিধ রোগের আক্রমণের শিকার হয়। বাইরে ছাড়া অবস্থায় সাপেরা ঠিক কতদিন বাঁচে, এটা এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি।

সর্পপ্রেমিক হুইটেকার বর্তমানে ভারতের আরো কয়েকটি জায়গায় snake park গড়ে তোলবার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

মঙ্গল সমাচার

শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস*

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ—পাঠশালায় এই ভাবে পড়তে পড়তে আমরা মুখস্থ করেছি নয়ে নবগ্রহ। নয়টি গ্রহের মধ্যে মঙ্গলও একটি। সূর্যকে কেন্দ্র করে যে উপবৃত্তাকার কক্ষগুলিতে এই গ্রহগুলি পরিভ্রমণ করছে, মঙ্গল তাদের চতুর্থটিতে পরিক্রমা করে; আর আমাদের পৃথিবী পরিভ্রমণ করে তৃতীয়টিতে। সেদিক থেকে ভাবলে মঙ্গল নিশ্চয়ই আমাদের এক প্রতিবেশী গ্রহরাজ্য। সূর্যের কাছের দিকে অপর প্রতিবেশী গ্রহ হলো শুক্র। দ্বিতীয় কক্ষে এর অবস্থান। উপগ্রহের কথা বাদ দিলে যে দুটি প্রতিবেশী গ্রহে আমরা যেতে পারি, তারা হলো মঙ্গল এবং শুক্র। আমাদের এই পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রে 1969 সালেই মানুষ গিয়ে ফিরে এসেছে। সেখানকার রহস্য আজ আর আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত নয়। এই সাত বছরে চন্দ্র সম্বন্ধে বহু বিষয় বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়ে নতুন করে আর কিছু বলছি না। এই চন্দ্রাভিযানের পর মার্কিন বিজ্ঞানীরা মঙ্গলাভিযানে উদ্যোগী হয়েছেন। হাতে নিয়েছেন ভাইকিং প্রকল্প।

মহাবিশ্বজয়ে মানুষের আবার একটি সাফল্য। 1976 সালের 20শে জুলাই—ক্যালিফোর্ণিয়া শহরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ভারতীয় সময় বিকাল পাঁচটা তেইশ মিনিট সতেরো সেকেণ্ড; বিজ্ঞানীরা খুশীতে চেঁচিয়ে উঠলেন,—'নেমেছে! নেমেছে!!' বলে। টেলিভিশন পর্দায় ফুটে উঠলো মঙ্গলের মাটির প্রথম ছবি। অজস্র মানুষ হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা-53

পৃথিবীতে চলে এসেছে মঙ্গলের এই ছবি। হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং-1-এর মঙ্গলের মাটি ছোঁয়ার কথাই বলছি—বলছি বিজ্ঞানের এক চমক লাগানো, এক রহস্যজাল ছিন্ন করবার অভিনব কাহিনী।

ভাইকিং-1-কে নামানো হয়েছে মঙ্গলের উত্তর গোলার্ধে। পৃথিবী থেকে এই অবতরণ ক্ষেত্র পর্যন্ত যেতে ভাইকিং-1-কে 34 কোটি 40 লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের যে দূরত্ব, এটা তার দেড়গুণেরও বেশী। তাই আলোর গতিবেগের সমান হয়েও বেতার-সঙ্কেত এই দূরত্ব পেরিয়ে আসতে সময় নিয়েছে উনিশ মিনিট। খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে আসে যে, ভাইকিং-1 কতদিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করলো? গত বছর অর্থাৎ 1975 সালের 20শে অগাষ্ট মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভাইকিং-1 যাত্রা সুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার দ্বি-শত বার্ষিকীর (4ঠা জুলাই 1976) এটিকে মঙ্গলের মাটিতে নামানো। কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়।

এবার একটু অতীতের দিকে ফিরে তাকানো যাক। এটাই কি মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান অবতরণের প্রথম ঘটনা? না। ইতিপূর্বে 1971 সালে 7ই ডিসেম্বর সোভিয়েট দেশের প্রথম মানব আরোহীবিহীন মহাকাশযান মার্স-3 যে সাফল্য অর্জন করেছিল, তাকে নিয়ে এটি হলো দ্বিতীয় সাফল্য। মার্স-3 মঙ্গলগ্রহে জীবনের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, তা প্রমাণ করতে পারে নি। মার্স-3 যা পারে নি, এবার ভাইকিং-1 কি তা পারবে? এই প্রশ্ন আজ সকলের মনে উঁকি মারছে। চাঁদকে ঘিরে যেমন বিভিন্ন রূপকথার কাহিনী বিরাজ করতো বা এখনও করে, তেমনি মঙ্গলকে ঘিরেও কিছু কিছু ধারণা আমাদের মধ্যে বর্তমান। এমনি এক ধারণার সন্ধান মেলে দার্শনিক ও বিজ্ঞানী স্পেন্সার জোন্সের 'লাইফ ইন আদার ওয়ার্লডস্' গ্রন্থে। তিনি সেখানে বলেছেন, 'মঙ্গলগ্রহে যে উদ্ভিদ জগৎ আছেই, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস যখন এই গ্রহটিতে গিয়ে আমরা উপস্থিত হবো, দেখব সেখানকার জৈবিক সভ্যতা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।'

এখন থেকে প্রায় এক-শ' বছর পূর্বে ইটালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিয়ভান্নি সিয়াপেরেল্লি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলের বুকে কতকগুলি সরলরেখা দেখতে পান এবং ঐগুলির সূক্ষ্ম চেহারা দেখে এগুলিকে সভ্য মানুষের কাটা খাল বলে মনে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লাপ্লাসের কসমোজেনিক ল' (ব্রহ্মাণ্ডের গঠনতত্ত্ব) অনেকেই বিশ্বাস করতেন; তাঁরা মনে করতেন যে, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর চেয়ে পুরনো এবং সেখানে মনুষ্য অপেক্ষা উন্নততর সভ্যতা বিদ্যমান। এ সবই ইতিহাসের পুরনো কথা, যার ভিত্তি অনেকটাই অনুমান। বর্তমান শতাব্দীতে মঙ্গল সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে, তার মূল বক্তব্য হলো সেখানে জলের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেখানকার মাটি পৃথিবীর মত নয়—অনেকটা ব্রাউন হিমেটাইট বা লোহার অক্সাইড ধরণের। বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশী বলে মনে হয়েছে। এসব অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পিছনে রেখে বর্তমানে ভাইকিং-1 আমাদের কি তথ্য দেয়, সে দিকে লক্ষ্য করা যাক।

ভাইকিং-1 যেখানে নেমেছে, সেই এলাকার নাম ক্রাইসি—স্বর্ণভূমি। সেখান থেকে প্রথম যে ছবি সে পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে, তাতে আকাশের রং নীল দেখাচ্ছিল। পরে অবশ্য ধরা পড়েছে যে, মহাকাশযানের ক্যামেরা সেখানে গিয়ে রং চিনতে ভুল করেছিল। মার্কিন বিজ্ঞানী ডক্টর কারল সাগান ঐ ক্যামেরার বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন, 'মঙ্গল গ্রহের আকাশ

লাল। তবে তার মাটির মত অতটা লাল নয়। একটু ফিকে লাল।' এছাড়া ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর টমাস মাচ বলেছেন, "চাঁদের চেয়ে মঙ্গলের সঙ্গেই পৃথিবীর সূর্য ওঠে, সকাল হয়—সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা হয়। মজার কথা হলো যে, দুপুরে বেশ গরম হলেও সেখানকার সকালগুলি কন কনে হাত কাঁপানো ঠাণ্ডা। তখন আবহাওয়ার তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের (ফারেনহাইট) 122 ডিগ্রীর নীচে নেমে যায়। আস্তে আস্তে রোদ উজ্জ্বলতর হতে থাকে এবং উড়ন্ত ধূলার লাল্‌চে রং মঙ্গলের রোদে ছড়িয়ে গিয়ে আকাশকে রক্তিম করে ফেলে।

ভাইকিং-1 মঙ্গল গ্রহে এখনও প্রত্যক্ষ প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পায় নি। প্রশ্ন থেকে যায়, তবে কি পরোক্ষ কিছু পেয়েছে? আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের এক শ্রেষ্ঠ উপাদান নাইট্রোজেন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। ভাইকিং-1 মঙ্গলগ্রহে সেই নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া সেখানে আরগন গ্যাসও আছে—তাও খুব কম নয়। ভাইকিং প্রকল্পের অজৈব রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত শাখার নেতা ডক্টর প্রিস্টলে টোলমিন বলেছেন, 'মঙ্গলের মাটিতে লোহা, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, টাইটেনিয়াম আর অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে।' এছাড়া ঐ শাখারই ডক্টর বেনটন ক্লাক বলেছেন, 'সেখানে আরসেনিক অথবা অন্য কোন যৌগিক পদার্থ মেলে নি—যা পৃথিবীর মাটিতে থাকলে তাকে উর্বর করে তুলতো। তবে পরীক্ষার যা ফলাফল পাচ্ছি, পার্থিব জীবনের অনুকূল অবস্থার সঙ্গে তার সঙ্গতি রয়েছে। এই সঙ্গতি থেকেই বোঝা যায়, কোন না কোন আকারে মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনা নাকচ করা যাবে না।'

আবার ভাইকিং-1 যে সব ছবি পাঠিয়েছে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করছেন এবং বলেছেন সেখানে এমন কিছু দেখা যাচ্ছে না, যাতে মনে হতে পারে যে, পৃথিবীর মত জীবনধারা সেখানেও বহমান। সেখানে দেখা যাচ্ছে না কোন উদ্ভিদ—না গাছপালা, না ঝোপ-ঝাড়। তাই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কারল সাগান মন্তব্য করেছেন, 'গাছপালা কিছুই নেই, লোকজন তো নেই-ই। ছবি দেখে তো মনেই হয় না যে, মঙ্গলের উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ব্যাপক সজীবতা রয়েছে'—তবে তিনি একথাও বলেছেন, 'পৃথিবীর মেরু অঞ্চলেও তো একরকম জীবাণুর সন্ধান মেলে। মঙ্গলে তেমন কোন প্রাণের অস্তিত্ব অবশ্য ছবি দেখে নাকচ করা যায় না।'

1965 থেকে 1971—এই সময়ের মধ্যে মার্কিনীদের মেরিনার প্রকল্প থেকে কিছু কিছু তথ্য পূর্বেই পাওয়া গেছে। এই সব তথ্যের মূল বক্তব্য হলো মঙ্গলের বায়ু-চাপ পৃথিবীর বায়ু-চাপের দু-শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র। অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র শূন্য দশমিক এক শতাংশ। জল আরও কম, শূন্য দশমিক শূন্য এক শতাংশ। সেখানে সূর্য থেকে অতিবেগুনী রশ্মির বর্ষণ অবারিত। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো যে, পৃথিবীর মত মঙ্গলের পরিমণ্ডলের ভ্যান অ্যালেন বলয়ের মত কোন চৌম্বক আচ্ছাদন নেই। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঐ আচ্ছাদনের জন্যে মহাকাশ থেকে ছিট্‌কে আসা মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি। মঙ্গলের আবহাওয়া মণ্ডলে এ-ধরণের আচ্ছাদন না থাকায় সেখানে জীবনের অস্তিত্ব ভাবাও অসম্ভব। সুতরাং জীবনের অস্তিত্বের পক্ষের থেকে বিপক্ষের যুক্তিগুলি প্রবল থেকে প্রবলতর বলেই মনে হচ্ছে।

এপর্যন্ত যাই বলা হোক না কেন, মঙ্গল সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার সময় এখনও আসেনি। ভাইকিং প্রকল্প সবে সুরু হয়েছে। ভাইকিং-1-এর পর ভাইকিং-2 মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করেছে।

যদি এবার মঙ্গল গ্রহে সত্যই প্রাণের সন্ধান মেলে, তবে মানুষ অন্ততঃ এই ভেবে সান্ত্বনা পাবে যে, এই বিশাল বিশ্বে তারা একা নয়; পৃথিবীর বাইরেও তাদের বন্ধু আছে। তাই আমরা এখন দুই গ্রহের বন্ধু মিলনের প্রতীক্ষায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অতিভারী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত

অবশেষে অনেক জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অতিভারী মৌলিক পদার্থের (Super-heavy elements) অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। 1976 সালের জুনে সংক্ষিপ্ত আবিষ্কার সংবাদের আকারে ও পরে বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী প্রকৃতি-জাত খনিজে 116, 124 ও 126 পরমাণু সংখ্যার মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও আগে প্রকৃতিতে প্ল্যাটিনাম খনিজ থেকে রিনিয়াম (Rhenium) মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কারের পর—এই প্রথম আর কয়েকটি প্রকৃতিজাত মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল—যেগুলির ভর-সংখ্যা 350-এরও অধিক হতে পারে।

অবশ্য রিয়্যাক্টর ও কণাত্বরণ যন্ত্রে 92 সংখ্যক ইউরেনিয়ামের পর 105 সংখ্যক পর্যন্ত পরমাণু কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য অনুমান করা হচ্ছিলো যে, এই সব কৃত্রিম স্বল্পায়ু নূতন মৌলিক পদার্থগুলি থেকে ভারী কোন কোন পরমাণু বেশ স্থায়ী হতে পারে। 114 সংখ্যক পরমাণু নিশ্চয়ই এরকম হবে। অনুমানের কাছাকাছি 116 সংখ্যক পরমাণু এখন পাওয়া গেল। এই সব ভারী মৌলিক পদার্থের উৎস খনিজ নিয়ে কিন্তু বহু দিন ধরে গবেষণা চলেছে। এই সব খনিজ পদার্থে বলয়রেখা (Halo) দেখা যায়। এই বলয়রেখাগুলি খনিজের ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের আল্‌ফা কণা থেকে উদ্ভূত। ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম পরমাণুর অবস্থানকে কেন্দ্র করে আল্‌ফা কণা-গুলি খনিজের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে রেখার সৃষ্টি করে। আল্‌ফাকণার নির্দিষ্ট শক্তির জন্যে এই রেখা বলয়ের সৃষ্টি করে।

অভ্র, কর্ডিয়েরাইট প্রভৃতি খনিজে এরকম বলয় পাওয়া যায়। 1926 খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞানী শেষোক্ত খনিজে এমন কতকগুলি বৃহদাকার বলয়ের সন্ধান পান যে, তা 12—15 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি আলফা কণা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। অথচ কোন স্বভাবজ আলফাবিকিরক নিউক্লিয়াস এত শক্তিশালী আলফা কণা বিকিরণ করে না। 1968 খৃষ্টাব্দে সীবর্গ অনুমান করেছিলেন যে, 110 থেকে বেশী পরমাণু সংখ্যার মৌলিক পদার্থ থেকে এরকম আল্‌ফা কণা বেরোতে পারে। 1970 খৃষ্টাব্দে জেন্ট্রি এরকম বলয়ের উৎস ভারী মৌলিক পদার্থ থেকে এই আবিষ্কারের দাবী করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ তখনও পাওয়া যায় নি।

বর্তমান এই সব বলয়ের কেন্দ্রস্থল আলাদা করে শক্তিশালী প্রোটনের সংঘাতে প্রাপ্ত এক্স-রশ্মি বিশ্লেষণ করে জেন্ট্রি এবং তাঁর সহযোগীরা প্রমাণ করেছেন যে, এই সব পদার্থ 116, 124, ও 126 সংখ্যক পরমাণুর। 114 ও 125 সংখ্যক পরমাণুর ক্ষীণ অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

এই সব পদার্থ বেশী পরিমাণে পৃথক করে তার রাসায়নিক ও নিউক্লির বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা হচ্ছে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, এই সব পরমাণুর সংখ্যা 300 থেকে 310-এর মধ্যে হবে। মাডগাস্কার বাইওটাইট অভ্র খনিজে এই সব পদার্থ পাওয়া গেছে। এই খনিজ থেরিয়ামসমৃদ্ধ মোনাজাইট খান থেকে আহরণ করা হয়েছিল।

মেণ্ডেলিভিয়ামের সঙ্গে মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণীর যে শততম মৌলিক পদার্থটি জন্ম নিয়েছিল ও আরও নূতন কৃত্রিম পদার্থের আবিষ্কার হয়ে চলেছিল, অতিভারী মৌলিক পদার্থের এই আবিষ্কারে তা ভবিষ্যতে নূতন কলেবরে বেড়ে উঠবে—এরকম আশা করা যায়।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

"বঙ্গ জননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোন ফল পাইব না, একথা বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বঙ্গসন্তানদের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরণ আবশ্যক; কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে প্রকৃষ্ট পথ ত্যাগ করিয়াছেন।·········যদি (তাঁহাদের আবিষ্কৃত) এই তত্ত্ব কেবল বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশীরা অমূল্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনত করিত।

ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণসমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের ছল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশ আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরিগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশা মাত্র।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ : নবম-দশম সংখ্যা
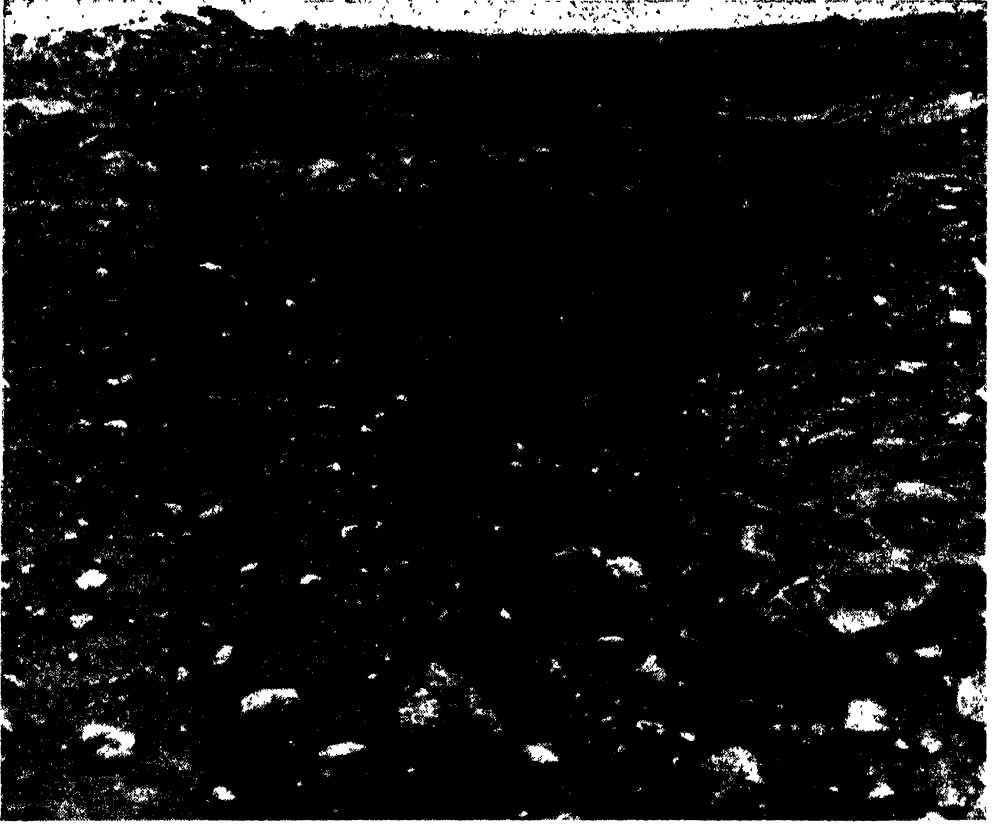
মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে মাটি এবং বিভিন্ন আকৃতির ছোট-বড় শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে।
ভাইকিং-1 কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।

টমাস আলভা এডিসন

বিজ্ঞানের যাদুকর টমাস আলভা এডিসনের জন্ম 11ই ফেব্রুয়ারী, 1847 খৃষ্টাব্দে। সাতটি সন্তানের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। পিতার অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু তবুও তিনি সাধারণভাবে স্কুলের শিক্ষা পেয়েছিলেন মাত্র তিন মাস। এর কারণ, তাঁর নানারকম প্রশ্নবাণে উত্যক্ত হয়ে শিক্ষক মহাশয় সব সময় তাঁকে উপহাস করতেন। তাঁর মা শিক্ষিকা ছিলেন। অনুসন্ধিৎসার জন্যে পুত্র এভাবে নাকাল হচ্ছে—একথা জানতে পেরে টমাসের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতেই তুলে নেন।

সে যুগের রীতি অনুযায়ী মাত্র বারো বছর বয়সেই এডিসনকে অর্থোপার্জনের জন্যে বেরিয়ে পড়তে হলো। জীবিকার জন্যে তিনি 'News boy' হলেন। তাঁর প্রধান কাজ হলো নিকটবর্তী ষ্টেশন মিচিগান দিয়ে চলাচলকারী একটি ট্রেনে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করা। অল্পদিনের মধ্যেই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ওই ট্রেনেরই একটি কামরায় তিনি একটি লেবোরেটরী গড়ে তুললেন। শুধু তাই নয়, এই সময় তাঁর নিজস্ব একটি প্রেসও ছিল। আর তাই দিয়ে চলন্ত গাড়ীর কামরাতেই 'The Grand Trunk Herald' নাম দিয়ে একটি খবরের কাগজ ছাপিয়ে তা যাত্রীদের কাছে বিক্রি করতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর।

এরপর তিনি ওই রেলপথেরই ষ্টেশনে ষ্টেশনে খবরের কাগজ ফেরি করবার কাজ নিলেন। একদিন মাউন্ট ক্লেমেন্স ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ দেখলেন ষ্টেশন মাষ্টারের ছোট্ট ছেলেটি আপনমনে রেল লাইনের উপর দিয়ে চলেছে, এদিকে সাক্ষাৎ যমদূতের মতন একটি মালগাড়ী গড়িয়ে গড়িয়ে ঠিক সেইদিকেই যাচ্ছে। তিনি ছুটে গিয়ে বাচ্চা ছেলেটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। কৃতজ্ঞ ষ্টেশন মাষ্টার এজন্যে তাঁকে টেলিগ্রাফের কার্যপ্রণালী শিখিয়ে দিলেন।

এই নতুন বিদ্যা অর্জনের ফলে তাঁর এক নতুন কর্মময় জীবনের সূচনা হলো। মাত্র ষোল বছর বয়সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়েতে টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন। আর সেই থেকেই একজন টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসাবে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল এই হলো যে, তিনি ক্রমশঃ বিদ্যুৎ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠলেন।

1869 খৃষ্টাব্দে এডিসন নিউইয়র্কে এলেন। তখন তিনি প্রায় কপর্দকশূন্য। কারণ ইতিপূর্বে তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি জিনিষ বাজারে বিক্রি করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। একজন বন্ধুকে বলেকয়ে তিনি যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, সেই অফিসে রাত্রে ঘুমাবার অনুমতি আদায় করে নিলেন। এই প্রতিষ্ঠান 'ষ্টক-টিকার' (Stock-ticker)

যন্ত্র তৈরী করতেন। এর সাহায্যে শেয়ার বাজারের ওঠা-নামার খবর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করা হতো।

এডিসন এখানে আসবার কয়েক দিন পরেই অফিসের 'স্টক-টিকার' যন্ত্রটি বিকল হয়ে গেল। অন্যেরা যখন যন্ত্রটি মেরামত করবার চেষ্টা করছিলেন, তখন এডিসন বেশ মনোযোগ দিয়ে সব দেখছিলেন। একে একে সবাই যখন ব্যর্থ হলেন, তখন এডিসন এগিয়ে এলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রটি মেরামত করে দিলেন। তাই দেখে খুশী হয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার তখনই তাঁকে মাসে তিন-শ' ডলার মাইনেতে চাকুরীতে বহাল করে নিলেন। তখনকার মত বেশ ভাল মাইনে বলতে হবে।

এডিসন তখন এইরকম আরও যত যন্ত্র ছিল, সব একে একে পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর নিজেই আরও উন্নত ধরণের একটি যন্ত্র তৈরী করে ফেললেন। একটি কোম্পানীর প্রধান তাঁর কাছ থেকে ওই যন্ত্রটির পেটেন্ট কিনে নিতে চাইলেন। এডিসন ভেবেছিলেন এজন্যে খুব বেশী হলে হয়তো হাজার পাঁচেক ডলার পেতে পারেন। কিন্তু ওই কোম্পানী এজন্যে তাঁকে দিল 40,000 ডলার! এ এক অভাবনীয় ব্যাপার।

এই টাকা দিয়ে এডিসন একটি লেবোরেটরী স্থাপন করলেন এবং নূতন উদ্যমে গবেষণা সুরু করে দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর।

তাঁর যে শুধু উদ্ভাবনের শক্তি ছিল, তা নয়। অন্যের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির উন্নতিসাধনের এক অদ্ভূত ধরণের প্রতিভা ছিল এডিসনের। 1868 খৃষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী ক্রিষ্টোফার শোল্‌স সর্বপ্রথম টাইপ-রাইটার যন্ত্রের পেটেন্ট নেন। তবে এর অনেক ত্রুটি ছিল। 1874 সাল নাগাদ এডিসন এর প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। আর সেই থেকেই অফিসের কাজে টাইপ রাইটার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো।

ইতিমধ্যে এডিসনের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। 1876 খৃষ্টাব্দে এডিসন নিউ-জার্সির অন্তর্গত মেন্‌লো পার্কে একটি নূতন এবং পূর্ণাঙ্গ লেবোরেটরী প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নবীন বিজ্ঞানীর জীবনে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কারণ একজন প্রথম সারির আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এখানেই। তাই এডিসনের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে এই লেবোরেটরীটি সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে।

ওই বছরই আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসে যুগান্তর। কিন্তু এই যন্ত্রের অনেক ত্রুটি ছিল। এডিসন এর অনেক উন্নতিসাধন করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি সর্বত্র সমাদৃত হলো।

এদিকে একজন টেলিগ্রাফার হিসেবে ঘুরতে ঘুরতে 1877 খৃষ্টাব্দে এডিসন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানাপোলিস টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতে এলেন। এখানে অবিরত এত টেলিগ্রাম আসে যে, তার সঙ্গে তাল রেখে কাজ করা কঠিন। এডিসন বুদ্ধি খাটিয়ে একটি যন্ত্র তৈরী করলেন। এতে একটি সিলিণ্ডারের গায়ে জড়ানো একটি কাগজে

টেলিগ্রাফবার্তা লিপিবদ্ধ হতো। তারপর ধীরে ধীরে সিলিণ্ডারটি ঘুরিয়ে এডিসন সেই বার্তা পুনরুদ্ধার করে নিতেন। এ-নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। হঠাৎ একদিন তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন—সিলিণ্ডারটি তাড়াতাড়ি ঘোরালে তা থেকে সুরের মত একপ্রকার শব্দ নির্গত হয়। এর অল্প দিন আগেই তিনি টেলিফোন নিয়ে গবেষণা করেছেন। এজন্যে শব্দ-তরঙ্গ সম্পর্কে বহু তথ্য তাঁর জানা ছিল। কাজেই এই দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হলো—যদি টেলিগ্রাফের শব্দ-সঙ্কেতের মত মানুষের কণ্ঠস্বর এভাবে কাগজে বা অন্য কোন পাতলা ধাতব পাতের উপরে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া যায়, তাহলে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সেই কণ্ঠস্বরকে নিশ্চয়ই পুনরুৎপাদন করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতি সাধারণ একটি যন্ত্রের নক্শা এঁকে তাঁর এক পরিচিত কারিগরকে যন্ত্রটি তৈরী করতে দিলেন।

যন্ত্রটি তৈরী হবার পর মোম-মাখানো একটি কাগজ তার ভিতর দিয়ে টেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বললেন—"Who-oo-oo". এই কাগজটিকে ফের আবার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে টেনে নেবার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইলেন। খুব অস্পষ্ট হলেও শব্দটি পুনরায় শোনা গেল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ 18ই জুলাই, 1877।

অগাষ্ট মাসেই তিনি আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এতে ছিল একটি ধাতব সিলিণ্ডার। তার ভিতর দিয়ে অক্ষদণ্ডের গায়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্ক্রুর মত প্যাঁচানো খাঁজ কাটা। তার গায়ে আবার একটি টিনের পাত জড়ানো। একটি হাতল ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারটি ঘুরে যেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে একপাশ থেকে অন্য পাশে সরে যায়। ইস্পাতের একটি কাঁটা সিলিণ্ডারের খাঁজ বরাবর টিনের পাতের উপর চেপে থাকে। এই কাঁটাটি অন্য দিকে একটি চোঙের এক প্রান্তে পাতলা পর্দার মত গোলাকার একটি চাক্তির সঙ্গে আট্কানো। চোঙের সামনে কথা বললেই শব্দানুযায়ী চাক্তিটি কাঁপতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে টিনের পাতের উপর কাঁটাটির কখনও জোরে আবার কখনও আস্তে চাপ পড়ে। এভাবে টিনের পাতের উপর শব্দ-কম্পনের রেকর্ড তৈরীর ব্যবস্থা হলো। যন্ত্রটি ঠিক করে নিয়ে এডিসন হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে চোঙের সামনে এই কথা কয়টি বললেন,—

"Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow"

এর পর শব্দের পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্যে যন্ত্রটি আবার ঠিক করে নিলেন এবং ঠিক আগের মতই হাতলটি ঘোরাতে লাগলেন। এবার ঐ কথাগুলি আবার শোনা গেল—কিছু অস্পষ্ট হলেও চমকপ্রদ। কারণ যন্ত্র এই প্রথম মানুষের মত কথা উচ্চারণ করলো।

পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করে এডিসন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কারণ প্রাথমিক পরীক্ষাতেই এতটা সাফল্য তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

এডিসন এই যন্ত্রের নাম দিলেন 'ফোনোগ্রাফ'। প্রথম প্রথম স্টেনোগ্রাফারদের কাজের সুবিধার জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। চিঠিপত্রের ডিক্‌টেশন এতে রেকর্ড করা হতো। স্টেনোগ্রাফার পরে তার সুবিধামত এই ডিক্‌টেশন শুনে চিঠিপত্র টাইপ করে দিত। আজকাল বড় বড় অফিসে যে ডিক্‌টাফোন ব্যবহার করা হয়, তাকে ফোনোগ্রাফেরই উন্নত সংস্করণ বলা চলে।

টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেল এবং তাঁর সহকারী টেইণ্টার 1866 খৃষ্টাব্দে একটি নতুন যন্ত্রের পেটেণ্ট নিলেন, তার নাম 'গ্র্যাফোফোন'। এতে ধাতব সিলিণ্ডারের পরিবর্তে মোমের সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হলো। তাছাড়া ঘড়ির মত স্প্রিং'য়ের সাহায্যে সিলিণ্ডারটি ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হলো। এর ফলে এমন ব্যবস্থা হলো, যাতে রেকর্ডটি আপনা থেকেই একটা নির্দিষ্ট বেগে ঘুরতে পারে, হাত দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে যা কখনও করা যায় না। এবারে স্বর আরো স্পষ্ট, আরো স্বাভাবিক হলো।

সঙ্গে সঙ্গে এডিসনও তাঁর যন্ত্রের উন্নতিসাধন করলেন। এতে রেকর্ড করবার ব্যবস্থা আগের চেয়ে ভাল হলো। তাছাড়া তিনিও মোমের সিলিণ্ডারের উপর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করেন। এই যন্ত্রটি আগের চেয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় হলো। ধীরে ধীরে গ্রামোফোন-শিল্পেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এডিসনই হলেন এই নূতন পথের দিশারী।

এদিকে ডায়নামো আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ সহজলভ্য হয়। তখন অনেকেই বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালাবার কথা ভাবতে থাকেন। এই ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হয় 'আর্ক-দীপ' (Arc-lamp)। প্যারিস এবং ইংল্যাণ্ডের অনেক জনবহুল শহরে এরূপ দীপ ব্যবহার করা হয়। এডিসন ভাবলেন, এমন ছোটখাটো বৈদ্যুতিক বাতি বানাবেন, যা পড়বার ঘরে কিংবা অফিস ঘরে অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে।

কোন পরিবাহী তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকলে তারটি উত্তপ্ত হয়। যে পদার্থের রোধ (Resistance) বেশী, সেই পদার্থ দিয়ে কুণ্ডলী বানালে বেশী তাপ উৎপন্ন হয়। আবার তার যত সরু করা যায়, রোধ তত বেশী হয়। আর তাপের মাত্রা বেশী হলে তারটি ভাস্বর হয়ে আলো দিতে থাকে। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই বৈদ্যুতিক বাতি (Electric lamp) আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

এডিসন এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। কিন্তু সমস্যা হলো—কি দিয়ে ফিলামেণ্ট (Filament) বা সরু তার তৈরী করা যায়। যা দিয়েই তিনি ফিলামেণ্ট তৈরী করেন না কেন, তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অবশেষে 1879 খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি কার্বনের ফিলামেণ্ট তৈরী করে একটি বায়ুশূন্য বাল্‌বের মধ্যে রাখলেন। তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার পর ফিলামেণ্ট পুড়ে গেল না, আর কাজ চলাগোছের আলো এথেকে পাওয়া গেল। এডিসন এবং তাঁর সহকর্মীরা ক্রমাগত দু-দিন ধরে এর উপর নজর রাখলেন, কিন্তু বাতির ফিলামেণ্ট অটুট রইলো, পুড়ে গেল না। বিজ্ঞানীর নতুন নামকরণ হলো—'মেনলো পার্কের যাদুকর' (The Wizard of Menlo Park)।

এদিকে ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ উইল্‌সন স্বোয়ানও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গবেষণা করে অনুরূপ কার্বন বাতি প্রস্তুত করেন। 1880 খৃষ্টাব্দে একটি এক্‌জিবিশনে (বা, প্রদর্শনীতে) সর্বপ্রথম তা দেখানো হলো। এই নিয়ে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকর্দমা হতে পারতো। কিন্তু তাঁরা আপোষে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেন। তাই পরবর্তীকালে এরূপ বাতির নাম দেওয়া হয় 'এডিস্বোয়ান' ল্যাম্প (Ediswan lamp)।

এই সামান্য সূচনা থেকেই কালক্রমে উন্নত ধরণের আরও অনেক রকম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার এখন আর কোন সমস্যাই নয়। বিদ্যুৎ যদি বর্তমান সভ্যতার প্রাণশক্তি, তাহলে বিদ্যুতের আলো অবশ্যই এই সভ্যতার প্রাণ-প্রদীপ। আর সেই প্রদীপ সর্বপ্রথম জ্বালিয়েছিলেন বিজ্ঞানী এডিসন।

ফোনোগ্রাফ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এডিসন হঠাৎ চলচ্চিত্র সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে হয় ফোনোগ্রাফের সিলিণ্ডারের গায়ে পর পর কতকগুলি ছবি বসিয়ে তারপর ঘোরালে হয়তো সচল ছবি দেখা যাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি ছোট ছোট অনেকগুলি ফটো তুলে সেগুলি পর পর এঁটে দিলেন সিলিণ্ডারের গায়ে। আর ছবি দেখবার ব্যবস্থা করলেন একটি শক্তিশালী লেন্সের ভিতর দিয়ে। হাতল ঘোরাতেই একটার পর একটা করে ছবি লেন্সের সামনে আসে। তাতে ছবি যেন সচল হয়ে উঠে।

এই সময় এডিসন জানতে পারলেন যে, ফটোগ্রাফীর মালমসলা সংক্রান্ত ব্যবসায়ী ইষ্টম্যান সেলুলয়েডের ফিল্ম তৈরী করেছেন। এডিসন অর্ডার দিযে খানিকটা লম্বা ফিল্ম তৈরী করিয়ে আনলেন। এর মধ্যে পরপর কতকগুলি ছবি তুললেন, নিজের উদ্ভাবিত 'মুভি-ক্যামেরা'র সাহায্যে। এই ছবি দেখাবার জন্যে এডিসন নতুন একটি যন্ত্র তৈরী করলেন। তার ভিতর দিয়ে এই ফিল্ম পাঠানো হলো এবং জোরালো আলোর সাহায্যে তা আলোকিত করা হলো। একটি বড় লেন্সের সাহায্যে সেই ছবি 'প্রোজেক্ট' করে ফেলা হলো পর্দার উপর। এবারে ফল হলো আরও চমৎকার। এডিসন যন্ত্রটির নাম দিলেন 'কিনেটোস্কোপ' এবং এই অবিষ্কারের পেটেণ্ট নিলেন 1893 খৃষ্টাব্দে।

ফিল্মের দৈর্ঘ্য মাত্র পঞ্চাশ ফুট—তেরো সেকেণ্ডেই ছবি শেষ। তবুও এ-থেকেই পাওয়া গেল চলচ্চিত্রের প্রকৃত আনন্দ। এইভাবেই সুরু হয় চলচ্চিত্রের বিজয়াভিযান এবং অল্প দিনের মধ্যেই তা সবদেশেই জনচিত্ত জয় করে ফেলে একটি সুলভ অথচ বিস্ময়কর আনন্দের উপকরণ হিসাবে।

কালক্রমে ফিল্মের দৈর্ঘ্য অনেক বাড়ানো হয়েছে, চলচ্চিত্রেরও অনেক উন্নতি হয়েছে একথা ঠিক। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে, যেমন—প্রতিটি ছবির মাপ, পর্দার মাপ, স্প্রোকেট হুইল-এর (বা, দাঁতওয়ালা চাকার) ব্যবস্থা ইত্যাদিতে আজও বিশেষ কোন পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয় নি। এ থেকেই এডিসনের অপূর্ব প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

এডিসন তাঁর জীবিতকালে এক হাজারেরও বেশী রকমের পেটেন্ট নেন। এই রেকর্ড অতিক্রম করা কারও পক্ষে কোন দিন সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না।

অপূর্ব প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানীর কর্মময় জীবনের অবসান হয় 1931 খৃষ্টাব্দের 18ই অক্টোবর। মহাকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-4

দাঁতের ক্ষয়

পোকা-খাওয়া দাঁতের কথা সবাই জান। প্রথম দিকে দাঁতের ক্ষতে বিশেষ কোন কষ্ট থাকে না। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে—দাঁতের উপর দিক বা পাশ থেকে খানিকটা যেন ক্ষয়ে গেছে। ক্ষয়ে-যাওয়া অংশটি ক্রমশঃ ছোট গর্তে পরিণত হলো। তখন খেয়াল হলো দাঁতটি পোকায় খেয়েছে। যদি ব্যবস্থা না নেওয়া যায় তো দাঁতের গর্ত বড় হতে হতে ক্রমে দাঁতের অংশবিশেষ বা হয়তো সবটাই নষ্ট করে দিল। একেই বলে দাঁতের ক্ষত (Caries tooth)।

যদি সামনের দাঁতে ক্ষত হয়, লোকের সামনে হাসবার উপায় নেই। হাসলেই পোকা-খাওয়া দাঁত বেরিয়ে পড়বে। শুধু কি দেখতে বিশ্রী, যন্ত্রণার ঠেলায় অস্থির। যখন তখন দাঁতে যন্ত্রণা হতে থাকে। হয়তো মাঝ রাতে যন্ত্রণা সুরু হলো তো সারারাত ঘুমই হলো না (যদি না হাতের কাছে বেদনানাশক কোন বটিকা থাকে)। এছাড়া আরো অসুবিধা আছে। কিছু খেতে গেলেই গর্তের মধ্যে খাদ্যকণা ঢুকে গিয়ে মাড়ির প্রদাহ

হিন্দু কলেজ থেকে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করে মহেন্দ্রলাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়বার জন্যে ভর্তি হন। মেডিক্যাল কলেজে সে সময় চিকিৎসাশাস্ত্রাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মহেন্দ্রলালকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি সেগুলি ব্যবহার করবারও অনুমতি পান। এখানে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন্সের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপক Dr. Thomas Thompson F. R. S-এর সান্নিধ্যে এসে মহেন্দ্রলাল উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রভাবিত হয়ে ওঠেন। Dr. Thompson made special provision for the teaching of botany and scholaraships were offerd for the proficency of the subject of botany for the first time.

1858 খৃষ্টাব্দে উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্যে মহেন্দ্রলাল দু-বছরের জন্যে 16 টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন এবং 1861 খৃষ্টাব্দে L. M. S পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

মেডিক্যাল কলেজে একবার চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক Dr. Archer পঞ্চম বার্ষিক ছাত্রদের চোখের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোন ছাত্রই সে প্রশ্নগুলির কোন উত্তর দিতে না পারায় দূর থেকে মহেন্দ্রলাল উচ্চকণ্ঠে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিয়ে দেন—যদিও তখন মহেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মহেন্দ্রলালের উত্তর শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যান। অধ্যাপক Dr. Archer তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিয়মিত চক্ষুচিকিৎসাগারে উপস্থিত থাকবার অনুমতি দেন। পরে মহেন্দ্রলাল চোখের গঠন ও কার্যপ্রণালী প্রসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'Bethune Soceity'-র সভাতেও মহেন্দ্রলাল চোখ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিয়ে গুণিজনের কাছে প্রশংসা অর্জন করেন।

L. M. S. পাশ করবার পর মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। 1863 খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সর্বোচ্চ M. D. ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। জগবন্ধু বসুও তাঁর সঙ্গে M. D. পাশ করেন। এঁদের পূর্বে চন্দ্রকুমার দে-ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম M. D. পাশ করেন।

1865 খৃষ্টাব্দে ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর চেষ্টায় বৃটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হয়। এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে মহেন্দ্রলাল তীব্র ভাষায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিন্দা করে বক্তৃতা দেন। আমাদের দেশে তখন হোমিওপ্যাথি সম্পূর্ণ নতুন, কেবল মাত্র বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র দত্ত ঐ বিষয়ে চর্চা ও চিকিৎসা করতেন।

মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার প্রথম সম্পাদক ও 1866 খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সহঃ-সভাপতি হন। 1867 খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সমিতির বঙ্গীয় শাখার 4র্থ অধিবেশনে দেখা যায়—মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের সমক্ষে প্রচলিত চিকিৎসাধারার ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করে হোমিওপ্যাথির উচ্চ প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন। এই ঘটনায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজ খুবই উদ্বেগ প্রবোধ করেন এবং মহেন্দ্রলালকে সমাজচ্যুত করা হয়। এই সময় মহেন্দ্রলাল খুবই কষ্টের মধ্যে পড়েন। আঘাত খেয়েও মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি ত্যাগ করলেন না বরং অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সমকালীন চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথম সারির একজন চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

1855 খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলালের বিবাহ হয়।

1860 খৃষ্টাব্দে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মায়। পুত্রের নাম অমৃতলাল। ঐ বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য নিযুক্ত হন। 1868 খৃষ্টাব্দে সেনেটের সভ্যগণ তাঁকে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন-এর প্রতিনিধিরূপে সিণ্ডিকেটে নির্বাচিত করেন।

গভীর দুঃখের বিষয়, মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথির একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হবার জন্যে তখন অনেক ডাক্তার তাঁর M. D. ডিগ্রি বাতিল করবার এবং ফ্যাকাল্টি থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্রলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দু-খানি যুক্তিপূর্ণ পত্র দেন। সেই পত্র পড়ে সিনেটের সকল সভ্যই মহেন্দ্রলালের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন।

মহেন্দ্রলাল চার বছর ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-এর ডিন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি দশ বছর সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তিনিই উপাচার্যের কাজ পরিচালনা করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যখন দেশীয় উপাচার্য মনোনীত করবার কথা ওঠে, তখন মহেন্দ্রলালের নামই প্রস্তাবিত হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ সরকার মনোনীত করে পাঠালেন একজন সরকারী কর্মচারীকে।

1896 খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বোর্ড অব স্ট্যাডি ইন বোটানি' স্থাপিত হয়, মহেন্দ্রলাল হন তার প্রথম সভাপতি।

বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ, এদেশের ছাত্রেরা যাতে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার জন্যে তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। তিনি তাই পাঁচ-শ' টাকা মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে দান করেন।

1868 খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন।

সম্ভবতঃ এই মাসিক পত্রিকাই ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম মেডিক্যাল জার্নাল। 1869 খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট সংখ্যায় 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিনে' ভারতীয়দের বিজ্ঞান চর্চার জন্যে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ থেকেই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসভা স্থাপনের সুচিন্তার সূচনা ঘটে।

1876 খৃষ্টাব্দে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মহেন্দ্রলাল গুণিজনদের নিয়ে স্থাপন করেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স।' এই অ্যাসোসিয়েশনই ভারতবর্ষে প্রথম বৈজ্ঞানিক বেসরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর কর্ণধার ও প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মহেন্দ্রলাল।

এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনার মুহূর্তের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। 1871 খৃষ্টাব্দের 30শে জুন, ইংরেজ সরকারের এক আদেশে 1872 খৃষ্টাব্দ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর গভর্ণমেন্ট কলেজে বি, এ-ক্লাস বন্ধের নির্দেশের ফলে বহরমপুর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ এর বিরুদ্ধে এক সভার আয়োজন করেন। বাংলাদেশের তখনকার গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে কলেজের সমস্যা সম্বন্ধে নানা অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন। রায় লচপৎ সিং বাহাদুর সেই সভায় বহরমপুর কলেজের উন্নতির জন্যে এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। টেম্পল সাহেব এই অর্থের তহবিলের নাম দেন 'প্রিন্স অব ওয়েলস ফাণ্ড'। কারণ সে সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত দর্শনে আসেন। লাট সাহেবের এই ব্যবস্থায় কথা শুনে মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না, তখন রিচার্ড টেম্পল উক্ত অর্থ বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের হাতে দেবার নির্দেশ দেন। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা করে মহেন্দ্রলাল উক্ত অর্থের উপযুক্ত মর্যাদা দেন।

1894 খৃষ্টাব্দে 27শে নভেম্বর এখানে তিনি জীববিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বাংলাদেশের দিকপাল বানওয়ারীলাল চৌধুরী, ডক্টর নীলরতন সরকার, আচার্য গিরীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর সহায়রাম বসু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে নিজেদের যুক্ত করেন। সহায়রাম বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে প্রথম পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর ছত্রাক সম্বন্ধীয় গবেষণার প্রবন্ধ অ্যাসোসিয়েশনের প্রসিডিংসে মুদ্রিত হয়।

মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পর ডক্টর অমৃতলাল সরকার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে বঙ্গজননী তথা ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ, কে. এস কৃষ্ণাণ প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে।

সি. ভি রামণের যুগান্তকারী আবিষ্কার রামণ-এফেক্ট 110 নম্বর বহুবাজার স্ট্রীট, অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় থেকে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হবার পর সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। 1930 সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার জয় করেন। সি. ভি. রামণের দক্ষিণ হস্তরূপে 'রামণ এফেক্ট' আবিষ্কারের অন্যতম সহায়ক কে. এস. কৃষ্ণাণও খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ওঁরা দু-জনেই সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলোও ছিলেন।

ইংরেজ সরকার 1877 সালে মহেন্দ্রলালকে অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেটপদে নিযুক্ত করেন। 1902 সালে স্বাস্থ্যের কারণে উক্ত পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। 1883 সালে ভারত সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। 1887 সালে মহেন্দ্রলাল কলিকাতায় শেরিফ মনোনীত হন। পরে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য হয়েছিলেন। তিনি বহুকাল পৌর সংস্থার কমিশনার ছিলেন, ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল সদস্য, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1897 সালে পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁকে 'অনারেরি ডক্টর ইন্ ল' উপাধিতে ভূষিত করে।

মহেন্দ্রলাল বৈদ্যনাথ ধামে কুষ্ঠ রোগীদের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়ে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে কুষ্ঠরোগীদের জন্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রীর নামানুসারে আশ্রমের নাম দেন রাজকুমারী লেপার অ্যাসাইলাম।

মহেন্দ্রলাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে অনেকবার ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন। একসময় জনৈক ভক্ত পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভু আপনার উপদেশ শুনে সকল ভক্তই চোখের জল ফেলেন, কিন্তু ডক্টর সরকার কখনও একবিন্দু অশ্রুও ফেলেন না।' উত্তরে পরমহংসদেব বলতেন 'ছোট হ্রদে হাতি নামলে জল তোলপাড় করে, কিন্তু সমুদ্রে নামলে কিছুই হয় না।' আজ থেকে 72 বছর আগে 1904 খৃষ্টাব্দে 23শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব আকাশে সবে সূর্যের সোনালী রশ্মির আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, ধীরে ধীরে মহেন্দ্রলালের জীবনদীপ মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। নেমে এলো কলকাতার বুকে শোকের কালো ছায়া। আমরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর শতবর্ষ-পূর্তিতে তাঁর প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

[এই রচনায় আমরা যেখান থেকে সাহায্য নিয়েছি :—1. নরেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞানাচার্য ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার। একত্রিংশৎ মৃত্যুবার্ষিকী।

11ই ফাল্গুন, 1341 সাল, কলকাতা। 2. Calcutta University Calendar 1908. 3. Centenary Volume, Calcutta Medical, College 1835-1935. 4. Kreshnath College Centenary Volume, Berhampur, West Bengal 1853-1953. 5. Reports of Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta 1859-1908. —লেখক]

মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা

জয়ন্ত বসু*

কলকাতার বি. বি. ডি. বাগে টেলিফোন ভবনের ছাদের উপর বিরাট ঝুড়ির মত দেখতে তিনটি বস্তু আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে—কি কাজে লাগে ঐগুলি? এর উত্তর হলো—ঐগুলি বিশেষ ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান। এই ব্যবস্থায় মাইক্রো-তরঙ্গ (Microwave) নামে সূক্ষ্ম বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়

গত 30 বছরে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে যে দেশ-দেশান্তরে টেলিফোনের কথাবার্তা, টেলিভিসনের ছবি ইত্যাদি পাঠানো হচ্ছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

রেডিওর সংকেত বহন করে যে সব বেতার-তরঙ্গ, সেগুলির দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক শ' মিটার হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, তার চেয়েও অনেক ছোট হলো মাইক্রো-তরঙ্গ। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঊর্ধ্বতম সীমা 30 সেন্টিমিটার। নিম্নতম সীমা আগে ধরা হতো এক সেন্টিমিটার; এখন সাধারণভাবে এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গকেও মাইক্রো-তরঙ্গ বলা হয়।

আমরা জানি, বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কমে, তার কম্পাঙ্ক (Frequency) তত বাড়ে। রেডিওর জন্যে ব্যবহৃত বেতার-তরঙ্গের ঊর্ধ্বতম কম্পাঙ্ক যেখানে কয়েক মেগাহার্ৎজ (সংক্ষেপে মে. হা.—MHz : 10^6Hz), মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সেখানে এক গিগাহার্ৎজ (গি. হা.—GHz : 10^9Hz থেকে কয়েক শ' গিগাহার্ৎজ পর্যন্ত হতে পারে।

বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেশী হলে যোগাযোগের দিক থেকে একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তা বেশী সংকেত বহন করতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কম্পাঙ্ক 1 মে. হা. হলে সেই তরঙ্গ যেখানে একটি রেডিও স্টেশনের শব্দ-সংকেত বয়ে নিয়ে যেতে পারে, কম্পাঙ্ক 1 গি. হা. হলে ঐ রকম হাজারখানেক সংকেত একসঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া তরঙ্গের পক্ষে সম্ভব হয়।

মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগকারী স্থানে প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র থাকে। প্রেরক-যন্ত্রে মাইক্রো-তরঙ্গ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। শব্দ বা ছবির সংকেতকে প্রেরক যন্ত্রে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে উপযুক্ত পদ্ধতিতে মাইক্রো-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তরঙ্গ-পরিচালক (Wave guide) নামক বিশেষ

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ধরণের ফাঁপা ধাতব নলের মধ্য দিয়ে ঐ মাইক্রো-তরঙ্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রাথমিক অ্যান্টেনায়। এই অ্যান্টেনা সাধারণতঃ 'হর্ন অ্যান্টেনা' নামক শঙ্কুআকৃতিবিশিষ্ট একটি ধাতব নল। এই অ্যান্টেনা থাকে একটি প্রকাণ্ড অধিবৃত্তাকার (Parabolic) প্রতিফলকের ফোকাসে। সেই প্রতিফলকটি মূল অ্যান্টেনা হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক অ্যান্টেনা থেকে নির্গত মাইক্রো-তরঙ্গ এতে প্রতিফলিত হয়ে মোটামুটি সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছরূপে আকাশ-পথে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয় গ্রাহক স্টেশনের অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনায় সেই মাইক্রো-তরঙ্গ এসে উপস্থিত হলে তা কেন্দ্রীভূত হয় অ্যান্টেনাটির ফোকাসে রক্ষিত প্রাথমিক অ্যান্টেনায় এবং সেখান থেকে চলে যায় তরঙ্গ-পরিচালকের মাধ্যমে গ্রাহক-যন্ত্রের পরিবর্ধকে। পরে মাইক্রো-তরঙ্গ থেকে শব্দ বা ছবির সংকেতকে বৈদ্যুতিক আকারে বের করে নেওয়া হয় এবং তাকে রূপান্তরিত করা হয় মূল শব্দ বা ছবির অনুরূপ সংকেতে। টেলিফোন ভবনের ছাদের উপর প্রকাণ্ড ঝুড়ির মত দেখতে যে বস্তুর কথা গোড়ায় বলা হয়েছে, তা আসলে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনা। বহু ক্ষেত্রে মাইক্রো-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্যে একই অ্যান্টেনা ব্যবহার করা হয়; প্রেরিতব্য ও সংগৃহীত মাইক্রো-তরঙ্গকে তখন পৃথক করে নেবার ব্যবস্থা থাকে।

রেডিওর জন্যে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ দূর দেশে পাঠানো হয় পৃথিবীর আয়নমণ্ডলকে প্রতি-ফলক হিসাবে কাজে লাগিয়ে। এই আয়নমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 50 থেকে 500 কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত। প্রেরক-যন্ত্র থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূরের গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে উপস্থিত হয়। মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কিন্তু যথেষ্ট বেশী হওয়ায় তা আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয় না, আয়নমণ্ডল ভেদ করে উর্ধ্বাকাশে চলে যায়। সেজন্যে এই তরঙ্গকে দূরে পাঠাতে হলে অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ঐ ব্যবস্থা দু-রকম হতে পারে:—(1) ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত অনেকগুলি রিপিটার স্টেশন বা রীলে ব্যবহার করে; (2) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।

প্রেরক-যন্ত্রের অ্যান্টেনা থেকে কোন নির্দিষ্ট দিকে মাইক্রো-তরঙ্গ নিক্ষেপ করলে তা দৃষ্টিরেখা (Line of sight) বরাবর মোটামুটি সরল রৈখিক পথে প্রবাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতার জন্যে এই তরঙ্গ পৃথিবীর কোন স্থান থেকে স্থানান্তরে বেশী দূর যেতে পারে না। প্রেরক-যন্ত্র ও গ্রাহক-যন্ত্রের অ্যান্টেনাকে পাহাড়ের চূড়ায় বা উঁচু টাওয়ারের উপর স্থাপন করে এই দূরত্ব কিছু বাড়ানো যায়। পৃথিবীর কোন স্থান থেকে অনেক দূরের কোন স্থানে মাইক্রো-তরঙ্গ পাঠাতে হলে ঐ দুটি স্থানের মধ্যে প্রায় 50 কিলোমিটার অন্তর অন্তর রিপিটার স্টেশন স্থাপন করা হয়। প্রেরক-যন্ত্রের অ্যান্টেনা থেকে মাইক্রো-তরঙ্গ প্রথম রিপিটার স্টেশনের একটি অ্যান্টেনায় পৌঁছলে সেখানে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় পরিবর্ধিত হয় এবং সেই পরিবর্ধিত তরঙ্গ অন্য একটি অ্যান্টেনার মাধ্যমে বিপরীত দিকে দ্বিতীয় রিপিটার স্টেশনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে পর পর রিপিটার স্টেশনের মধ্য দিয়ে গিয়ে মাইক্রো-তরঙ্গ পরিশেষে গ্রাহক স্টেশনের অ্যান্টেনায় উপস্থিত হয়।

মাইক্রো-তরঙ্গের প্রবাহের পথে নানা কারণে তার কিছুটা শক্তিক্ষয় হয় বলে রিপিটার স্টেশনে পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকে। রিপিটার স্টেশন লোকজন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। কোন যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটলে নিয়ন্ত্রণকারী স্টেশনে তা ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়ে থাকে।

ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টেলি-ভিসনের সংকেত বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকগুলি রীলে ব্যবহার করে যে মাইক্রো-তরঙ্গ

গোলযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে বলা হয় 'ইওরোভিশন'। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। কেবল টেলিভিশনের জন্যেই নয়, রেডিও, টেলিফোন, টেলেক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। একটিমাত্র মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করে কয়েক হাজার টেলিফোনের কথাবার্তা একসঙ্গে পাঠানো যেতে পারে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এই ব্যবহারই সমধিক প্রচলিত।

দুটি দূরবর্তী স্থানের মধ্যে মাইক্রো-তরঙ্গ সংযোগের সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অনেকখানি উচ্চতায় হওয়ায় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে। এজন্যে প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো মাইক্রো-তরঙ্গ উপগ্রহ মারফৎ দূরের গ্রাহক স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। বিপুল জলরাশি পেরিয়ে আন্তর্মহাদেশীয় মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারই এখন একমাত্র সমাধান।

যোগাযোগকারী উপগ্রহ দু'-ধরণের হতে পারে, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ কেবল প্রতিফলকের মত কাজ করে—প্রেরক ষ্টেশন থেকে আগত মাইক্রো-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে গ্রাহক স্টেশনের দিকে পাঠিয়ে দেয়। সক্রিয় উপগ্রহে মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে সেই তরঙ্গকে পরিবর্ধিত আকারে গ্রাহক স্টেশনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহে জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেরক-যন্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত শক্তির অতি সামান্য অংশই গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে উপস্থিত হয়। 1960 সালে একো (Echo) নামক উপগ্রহের ক্ষেত্রে এই অংশ ছিল 10^{18}-এর মধ্যে মাত্র এক ভাগ। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। পরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হওয়ায় প্রধানতঃ সক্রিয় উপগ্রহকেই যোগাযোগকারী উপগ্রহ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। 1962-63 সালে টেল্স্টার নামক সক্রিয় উপগ্রহটির কথা আমরা অনেকেই শুনেছি।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ ভূপৃষ্ঠ থেকে কতখানি উচ্চতায় থাকবে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই উচ্চতা কয়েক শ' কিলোমিটার হয়, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্যে বেশ অনেকগুলি উপগ্রহের প্রয়োজন, কারণ যে-কোন উপগ্রহ এক দিগন্ত থেকে উঠে অন্য দিগন্তে নেমে যেতে খুব বেশীক্ষণ সময় লাগে না এবং দৃশ্য আকাশ থেকে উপগ্রহটি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই (বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুটা আগেই) অন্য একটি উপগ্রহের সেখানে উপস্থিত হওয়া দরকার। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগের জন্যে এক সময় 50টি উপগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যদি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের উচ্চতা প্রায় 35,000 কিলোমিটার হয় এবং এই কক্ষপথ ঠিক বিষুবরেখার উপর বরাবর থাকে, তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির পর্যায়কাল ও উপগ্রহটির আবর্তনের পর্যায়কাল সমান হবার ফলে ভূপৃষ্ঠের কোন এক জায়গায় মাথার উপর উপগ্রহটি স্থির অবস্থায় আছে বলে মনে হয়। এই ধরণের উপগ্রহকে বলা হয় সমলয় (Synchronous) উপগ্রহ, বা ভূ-স্থির (Geostationary) উপগ্রহ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের প্রায় চার-দশমাংশ স্থান এই উপগ্রহের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে। এই রকম তিনটি উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সব অঞ্চল জুড়ে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হতে পারে। আমেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত সিন্‌কম (Syncom) উপগ্রহগুলি ছিল এই ধরণের।

1964 সালে 11টি দেশের মধ্যে চুক্তির

ফলে যে আন্তর্জাতিক উপগ্রহ যোগাযোগ সংস্থা (সংক্ষেপে INTELSAT : ইনটেলস্যাট) গড়ে ওঠে এবং যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা 80-এরও বেশী, সেই সংস্থার পক্ষে উৎক্ষিপ্ত ইনটেলস্যাট উপগ্রহগুলি সবই সমলয় উপগ্রহ। এই উপগ্রহ অনেকগুলি প্রেরক-গ্রাহকজোড়ের মধ্যে একই সময়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ভূপৃষ্ঠে থেকে যে মাইক্রো-তরঙ্গ সঙ্কেত বহন করে উপগ্রহে যায়, তাহা কম্পাঙ্কে 6 গে. হা.। সেই সঙ্কেতকে যে মাইক্রো-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে উপগ্রহ থেকে গ্রাহক ষ্টেশনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তার কম্পাঙ্ক 4 গে. হা.। এই রকম মাইক্রো-তরঙ্গ 12টি পৃথক টেলিভিসনের

যোগাযোগকারী উপগ্রহের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'অর্বিটা' (Orbita) ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে অবস্থিত কয়েকটি উপগ্রহ ব্যবহার করে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুদূর উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যবস্থা প্রথমতঃ প্রচলিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় বাহক বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ছিল 800 থেকে 900 মে. হা. অর্থাৎ মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের চেয়ে কিছু কম। পরে কয়েক গিগাহার্ৎজ কম্পাঙ্কের মাইক্রো-তরঙ্গ বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের দেশেও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিছু কিছু
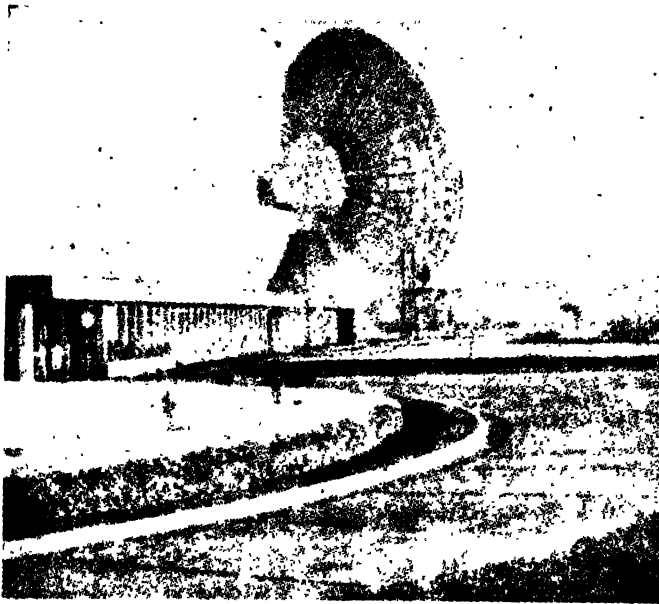
1নং চিত্র—আর্ভির মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ কেন্দ্র। পশ্চাৎপটে পাহাড়ের সারি।

সঙ্কেত বা কয়েক হাজার টেলিফোনের কথাবার্তা একসঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আরও উচ্চ কম্পাঙ্কের মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করে আরও বেশী সঙ্কেত এক সঙ্গে পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে।

কাজ হয়েছে। 5-6 বছর আগে পুনা থেকে 80 কিলোমিটার উপরে মহারাষ্ট্রে আর্ভি নামক গ্রামে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে (1নং চিত্র)। জায়গাটি চারদিকে

পাহাড় দিয়ে ঘেরা থাকায় অবাঞ্ছিত মাইক্রো-তরঙ্গ সংকেত (Microwave noise) এখানে এসে পৌঁছতে পারে না। ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত ইন্‌টেলস্যাট-3 নামক ভূ-স্থির উপরে টাওয়ারে সংলগ্ন অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনায়। (3নং চিত্র)। তারপর সেই মাইক্রো-তরঙ্গ থেকে মূল শব্দ বা ছবির সংকেত বের করে নিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
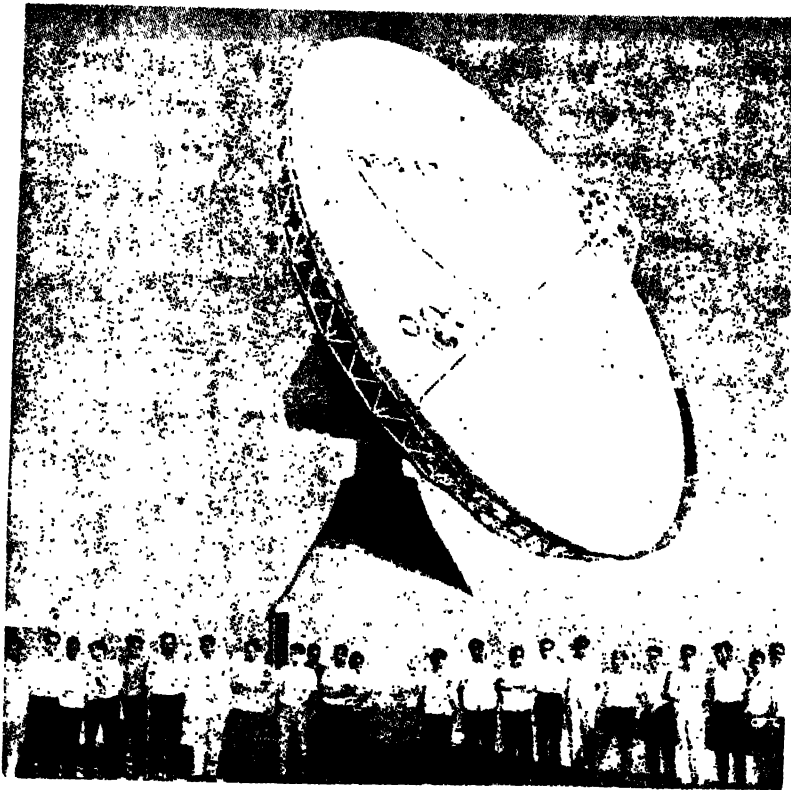
2নং চিত্র—আর্ভিতে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ কেন্দ্রের অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনা সামনে কেন্দ্রটির ইঞ্জিনীয়ারের দল।

উপগ্রহের মাধ্যমে কেন্দ্রটি বহু বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। কেন্দ্রটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে বিরাট অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনা, যার ব্যাস 29·7 মিটার ও ওজন প্রায় 200 টন (2নং চিত্র)। উপগ্রহ থেকে অ্যান্টেনায় মাইক্রো-তরঙ্গ সংগৃহীত হলে কয়েকটি রিপিটার ষ্টেশনের মাধ্যমে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোম্বাইয়ের 17-তলা একটি বাড়ির ছাদের

আবার কোন সংকেত বিদেশে পাঠাতে হলে মাইক্রো-তরঙ্গে ভর করে তা আসে বোম্বাই থেকে আর্ভিতে এবং সেখানকার কেন্দ্র থেকে উপগ্রহ মারফৎ চলে যায় তার গন্তব্যস্থলে।

সম্প্রতি যে সাইট (SITE: উপগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষামূলক পরীক্ষা) ব্যবস্থায় ATS-6 উপগ্রহ ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে

টেলিভিসনের সংকেত পাঠানো হয়েছে, সেই সংকেতকে প্রথমতঃ দিল্লী ও আমেদাবাদ থেকে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেই কেবল
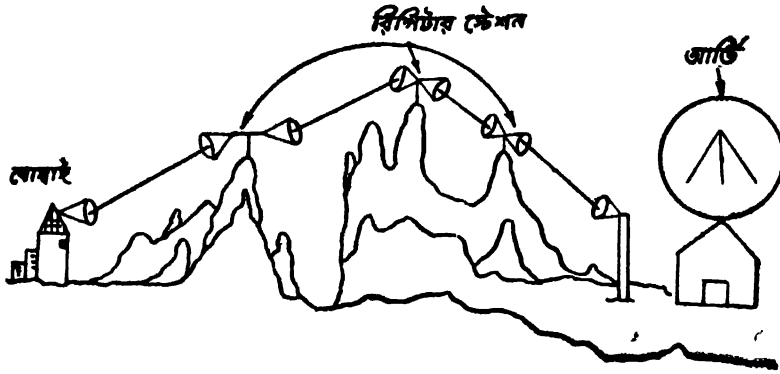
3নং চিত্র—আর্ভি থেকে বোম্বাই পর্যন্ত মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা

6 গে. হা. কম্পাঙ্কের মাইক্রো-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে পাঠানো হয় উপগ্রহটিতে।

বহু নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হবার ফলে নয়, মহাকাশ পাড়ি দিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

প্রাণিদেহে গুরুধাতু এবং ধাতুতুলের (Metalloid) বিষক্রিয়া

ললিতা পত্রী*

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সব মিলিয়ে এপর্যন্ত 105টি মৌলের অস্তিত্ব জানা যায়। এদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশের উপর ধাতু শ্রেণীভুক্ত। বাকীগুলি অধাতু এবং ধাতুতুল (Metalloid)। ধাতুর বিশেষ বিশেষ গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ধাতব ঔজ্জ্বল্য, প্রসার্যতা, তাপ এবং বিদ্যুৎ-পরিবহনক্ষমতা, ঘাতসহনীয়তা এবং ধনাত্মক আয়ন গঠন। যে মৌলগুলির মধ্যে ধাতব এবং অধাতব উভয় প্রকার ধর্মাবলীর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে বলা হয় ধাতুতুল। দৃষ্টান্ত—আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে যে সব মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব 23-এর বেশী, মোটামুটি সেগুলিই গুরু ধাতু শ্রেণীভুক্ত। ব্যতিক্রম—রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, ষ্ট্রনশিয়াম, বেরিয়াম এবং ইটি্রয়াম। গুরুধাতুর ঘনত্ব জলের তুলনায় প্রায় 5 গুণ বেশী। 68টি ধাতুকে মোটামুটি গুরুধাতু বলা যায়। অধিকাংশ গুরুধাতু জলে খুবই সামান্ত পরিমাণে থাকে, বলা যায়—লিটার পিছু কয়েক মিলিগ্রাম বা তারও কম। গুরুধাতু অধিক পরিমাণে প্রাণিদেহের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিকূল। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে গুরুধাতু বেশী পরিমাণ ছড়িয়ে পড়ছে। গুরুধাতু প্রাণি

*বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলিকাতা-6

দেহে কি পরিমাণে প্রবিষ্ট হয়েছে, মোটামুটি তার উপরেই বিষক্রিয়া কি রকম হবে, তা নির্ভর করে। পরিমাণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে। তার কোনটি বোঝা গেছে, কোনটি যায় নি।

প্রাণিদেহে কোষের বৃদ্ধি ও বিপাকীয় কাজ-কর্মের অন্তরক হয়ে ওঠা গুরুধাতুর বিশেষ ধর্ম। অবশ্য কতটা অন্তরক হবে, তা নির্ভর করে পরিমাণের উপর। প্রায় সব গুরুধাতুই বেশী পরিমাণে নিশ্চিত ক্ষতিকারক এবং কিছু কিছু গুরুধাতু খুব সামান্য পরিমাণে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরের বিভিন্ন এনজাইম গুরুধাতুর উপস্থিতির দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। লঘু তড়িদ্‌ধনাত্মক, অর্থাৎ হাই-ড্রোজেনের চেয়ে কম তড়িদ্‌ধনাত্মক কিছু কিছু মৌল, যথা—পারা, তামা, রূপা এনজাইমগুলির অ্যামিনো, ইমিনো, সালফহিড্রিল প্রভৃতি মূলকের সঙ্গে এইভাবে এনজাইমের স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট করে। কিছু কিছু গুরুধাতু কোষ-পর্দার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কোষ-পর্দার প্রবেশ্যতা (Permeability) ধর্মের পরিবর্তন ঘটায়। দেহকোষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ধাতব আয়ন গুরুধাতুর আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে দেহের কোষগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

পরিমাণ ছাড়াও গুরুধাতু শরীরে কোন্ পথে প্রবিষ্ট হয়েছে এবং তার ফলে কি ধরণের যৌগ উৎপন্ন হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে বিষ-ক্রিয়ার প্রকাশ কি রকম হবে। দেহের নানাবিধ জৈব যৌগের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোন ধাতু লঘু বিষ (Less toxic) বা তীব্র বিষ (More toxic) প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত—পারা মিথাইল মূলকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তীব্র বিষ হয় এবং তামার আয়ন স্যালিসাইল অ্যালডক্সিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লঘু বিষ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ধাতু সালফার যৌগ গঠন করলে তা ধাতুর হাইড্রক্সাইড বা অক্সাইড যৌগের তুলনায় লঘু বিষ হয়, কারণ দেহরসে (Body fluid) অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইডের তুলনায় সালফাইড কম দ্রাব্য।

শুধু জলজ প্রাণী নয়, মানবদেহের পক্ষেও বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্যে কিছু কিছু গুরুধাতুর সামান্য পরিমাণে উপস্থিতি আবশ্যক। রক্তের অন্যতম উপাদান লোহা এক মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত। দেহে যদি কিছু পরিমাণ এক প্রকার কোবাল্ট যৌগ ভিটামিন বি-12-এর ঘাটতি ঘটে, তবে পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া নামক রক্তাল্পতার প্রকাশ দেখা যায়। লোহা, কোবাল্ট ছাড়াও ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, দস্তা এবং তামা শুধু মানুষ নয়, অসংখ্য জলজ প্রাণীরও জীবনধারণের জন্যে অতীব আবশ্যক।

পরিবেশ দূষণের ফলে নানাভাবে গুরুধাতু শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার সুযোগ পায়। বিশেষতঃ পানীয় জলে গুরুধাতুর পরিমাণ বেড়ে গেলে তা প্রাণিদেহের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। পানীয় জলের মাধ্যমে গুরুধাতুর যৌগ বা ধাতু সরাসরি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রাণিদেহে কোন্ ধাতু কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ধাতুবিশেষের ধর্মের উপর নির্ভর করে। কিছু কিছু গুরুধাতু কোন কোন শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং শরীরে কি-ধরণের বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

পারা—প্রকৃতিতে কোথাও কোথাও মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পারা সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় (Inert)। জলে অদ্রবণীয়। অতএব, মুক্ত পারা জলদূষক (Water pollutant) নয়, এরকম বলা বাহুল্য। মুক্ত পারা এবং পারার অজৈব যৌগ বাতাসে বা অন্য কোনভাবে সংস্পর্শিত মিথাইল মূলকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিথাইল মার্কারি যৌগ উৎপন্ন হয় এবং এই যৌগ মানবদেহের পক্ষে তীব্র বিষতুল্য। অনেক সময় মিথাইল

মার্কারি না হয়ে ঐ শ্রেণীর অ্যালকিল মার্কারি যৌগ উৎপন্ন হয়।

সিনাবার আকর পারার সালফাইড যৌগ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। অসংখ্য পারার যৌগ ঔষধ, কীটনাশক, বিস্ফোরক, রঞ্জক (Pigment) এবং ফোটো এনগ্রেভিং পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশে পারার পরিমাণ বাড়ছে এবং শুধু তাই নয়, এমন সব যৌগ হয়ে বাড়ছে, যা মানবদেহের পক্ষে তীব্র বিষ বলে আশঙ্কা করবার কারণ আছে। মুক্ত পারা তরল এবং তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়; কারণ শরীর পরিপাক প্রণালী থেকে মুক্ত পারা বিশোষণ করতে পারে না। কিন্তু তরল মুক্ত পারা বাষ্পীভূত করবার কালে তার বাষ্প নাকে গেলে কিছু কিছু বিষক্রিয়া দেখা যায়। পারার অ্যালকিল যৌগ সহজেই শরীরে বিশোষিত হয় এবং বিশোষ্য এই সব পদার্থের পরিমাণ পরিবেশে প্রতিদিন বাড়ছে। খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে অল্প অল্প পারার যৌগ গ্রহণ করতে করতে এমন একটা সময় আসে, যখন দেহকলাতে পারার জৈব যৌগের গাঢ়ত্ব বিপদ-সীমার বেশী হয়ে যায়। দেহে দীর্ঘকালব্যাপী পারা প্রবেশ—প্রাণীকে প্রথমে বিষণ্ণ করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের মিনামাতা এবং নিগাতা অঞ্চল এর চরম দৃষ্টান্ত। নিকটস্থ একটি অ্যাসেটালডিহাইড এবং ভিনাইল কারখানা থেকে মিনামাতা উপসাগরে শিল্পের পরিত্যক্ত দূষিত জল ও আবর্জনা ফেলা হতো। ঐ জলে প্রচুর পরিমাণে পারার জৈব ও অজৈব যৌগ থাকতো। ঐ অঞ্চলের জেলেদের মধ্যে এক ধরণের রোগের প্রকোপ মহামারীরূপে দেখা দিল। রোগটির নাম দেওয়া হলো মিনামাতা। 121 জন মিনামাতা রোগ-গ্রস্তের মধ্যে 46 জন মারা যায়। জেলেদের এই রোগে আক্রান্ত হবার কারণ তারাই ঐ মাছ ধরতো এবং খেত। মিনামাতা রোগীদের এক-তৃতীয়াংশ নিতান্ত শিশু এবং বালক-বালিকা। তাদের অনেকেই মাতৃজঠরে থাকাকালীন মায়ের শরীর থেকে ঐ রোগের বিষ নিজের শরীরে বহন করেছে। ঐ অঞ্চলের তাবৎ মৎস্য-ভোজী প্রাণিকুল, যথা—বিড়াল, কুকুর, শূকর এবং সমুদ্রপাখী সকলেই পারার বিষক্রিয়ার মিনামাতা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তৃণ-ভোজী প্রাণীরা, যথা—খরগোশ, ঘোড়া এবং গরু ঐ রোগাক্রান্ত হয় নি। আলামাগোর্ডো আমেরিকার নিউমেক্সিকোর অন্তর্গত। একটি পরিবারের সকলের চোখ অন্ধ হয়ে গেল এবং তাদের স্নায়ুতন্ত্রও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল শূকরের মাংস খাবার পর। অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ শূকরটি কীট-পতঙ্গনাশক পারার যৌগ মেশানো দানাশস্য খেয়েছিল। ইরাণ এবং জাপান থেকেও এই রকম তথ্য পাওয়া গেল। পারার যৌগের দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কীট-পতঙ্গনাশক হিসাবে পারার যৌগের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ালে 1976 সালের 18ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার পরিবেশ সংরক্ষক প্রতিষ্ঠান সারা দেশে জীবাণুনাশক ও ছত্রাক-নাশক হিসাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্য পারার সর্বপ্রকার যৌগ উৎপাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রঞ্জন-বার্ণিশ-ল্যাকার শিল্পে—এমন কি, তৃণাচ্ছাদিত খেলার মাঠেও পারার যৌগ ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো। দানাশস্য রক্ষা করবার কাজেও পারার যৌগ ব্যবহারযোগ্য নয় ঘোষিত হলো। এক রঞ্জন শিল্পেই শতকরা 90 ভাগ পারার যৌগ কীট-পতঙ্গনাশক হিসাবে প্রযুক্ত হতো। নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার ফলে পরিবেশে পারার প্রবেশ 98·5% নিয়ন্ত্রিত হবে। কীট-পতঙ্গ-নাশক পারার যৌগ খুব একটা বিপজ্জনক নয়, কিন্তু পরিবেশে এসে তা মিথাইল মার্কারি বা

অ্যালকিল মার্কারিজাতীয় যৌগে রূপান্তরিত হয় এবং খাদ্য পানীয়ের মাধ্যমে ঐ বিষ সহজে শরীরে বিশোষিত হয়। ঐ জাতীয় পারাবিষ গন্ধ শুঁকেই হোক, আর খেয়েই হোক, শরীরে প্রবেশ করলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, এমন কি প্রাণীর মৃত্যুও ঘটে।

ক্যাডমিয়াম—পর্যায়সারণীতে দস্তা, ক্যাডমিয়াম এবং পারা গ্রুপ IIBভুক্ত। এদের রাসায়নিক ধর্মেও অনেক সাদৃশ্য আছে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর, ইলেকট্রোপ্লেটিং, সিরামিক্স, পিগমেন্টেশন, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি শিল্পে ক্যাডমিয়াম ব্যবহৃত হয়। কীটপতঙ্গনাশক, কৃমিবিনাশক এবং রূপার কলঙ্কপ্রতিরোধক হিসাবে ক্যাডমিয়াম যৌগ ও ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত। গ্যালভানাইজড্ আচ্ছাদন নির্মাণে ব্যবহৃত দস্তার সঙ্গে অল্পপরিমাণ ক্যাডমিয়াম থাকে। পানীয় জলের উৎস ক্যাডমিয়াম মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে যদি পার্শ্ববর্তী জনবসতি এবং শিল্পাঞ্চলের অশোধিত আবর্জনা পানীয় জলের উৎস নদীতে ফেলা হয়। নদীর পলি এবং শহরের ময়লাতে বেশ কিছু পরিমাণ ক্যাডমিয়াম জমে যেতে পারে। ক্যাডমিয়ামের বিষক্রিয়া তীব্র। ক্যাডমিয়াম শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হলে ইটাই-ইটাই নামক একপ্রকার রোগ হয়। এই রোগে অস্থি কোমল হয়ে যায়, দেহ কুঁচকে যায় এবং রোগীকে যন্ত্রণাময় মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ক্যাডমিয়াম প্রলেপিত আধারে খাদ্য, পানীয় রাখা হলে সেই সব খাদ্যের, পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে ক্যাডমিয়াম বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য নিয়ামকেরা তজ্জন্যে জল সরবরাহ ও খাদ্যসংরক্ষণে ক্যাডমিয়াম প্রলেপিত আধার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ক্যাডমিয়াম সংস্পর্শিত বরফের টুকরা বা আইসক্রিম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাকস্থলীতে তীব্র প্রদাহ ঘটায়। ক্যাডমিয়াম যৌগ শরীরে প্রবিষ্ট হলে ঝিমধরা, বমিবমি ভাব, বমি এবং উদরাময় হতে দেখা যায়।

দস্তা-শিল্পে দস্তার ব্যবহার বহুবিধ। গ্যালভানাইজিং, সঙ্কর ধাতু, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, প্রিন্টিং প্লেট—কোথায় না দস্তার ব্যবহার দেখা যায়। দস্তার যৌগ ঔষধশিল্পে, প্রসাধনদ্রব্য প্রভৃতে, রঞ্জনশিল্পে ব্যবহৃত হয়। কীটপতঙ্গনাশক হিসাবেও দস্তার যৌগের ব্যবহার আছে। দস্তার যৌগের অধিকাংশ জলে দ্রবণীয়। কাজেই শিল্পের পরিত্যক্ত জল পানীয় জলের উৎস নদীতে ফেলা হলে দস্তার যৌগ পানীয় জলে মিশবে, এটাই স্বাভাবিক। খুবই বেশী পরিমাণ দস্তা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। 675 থেকে 2280 মিলিগ্রাম ক্ষতিকর পরিমাণ হতে পারে। 675 মিলিগ্রামের নীচে দস্তার কোন ক্ষতিকর ক্রিয়ার কথা জানা যায় নি। বস্তুতঃ দস্তা মানবদেহের পুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক উপকারী মৌল। সাধারণ ভাবে মানবদেহে 10 থেকে 15 গ্রাম দস্তা প্রতিদিন গৃহীত হয়। দস্তা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় ইঁদুরকে দস্তাঘাটতি খাদ্য দিয়ে দেখা গেছে ভ্রূণের মস্তিষ্কের আয়তন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জেনেটিক পদার্থ ডি. এন-এ-র সংশ্লেষণ ব্যাহত হয়। বেশী দস্তাঘাটতি থাকলে ইঁদুরের ভ্রূণের মস্তিষ্ক অপরিপুষ্ট হয়। যেসব গর্ভবতী ইঁদুরকে দস্তাঘাটতি খাদ্য খাওয়ানো হয়েছিল এবং অপরিপুষ্ট রাখা হয়েছিল, তাদের সন্তানেরা বয়স্ক হলে দেখা গেল যে, সন্তানেরা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক প্রকৃতির হয়েছে। ভ্রূণাবস্থায় বা তারপর দস্তাঘটিত খাদ্যের অভাবই কোন কোন মানুষের আক্রমণাত্মক প্রকৃতির অন্যতম কারণ কিনা, তা এখনো অনুসন্ধানের বিষয়।

লোহা—লোহা, কোবাল্ট, নিকেল পর্যায়সারণীর একটি বিশেষ ত্রয়ী (Triode)। প্রাণিদেহে লোহার উপস্থিতির গুরুত্ব অপরিসীম। পানীয়জলে অতিমাত্রায় লোহা থাকা ক্ষতিকর। বেশী

লোহাঘটিত খাদ্যগ্রহণে কোষ্ঠকাঠিন্যের উৎপত্তি হয়। শরীরে লোহাঘটিত খাদ্যের ঘাটতিতে রক্তাল্পতা দেখা যায়। লোহার সব যৌগ থেকে লোহা শরীরে বিশোষিত হতে পারে না। বিশেষ বিশেষ যৌগ থেকে লোহা শরীরে শোষিত হয় বলে রক্তাল্পতা দেখা দিলে চিকিৎসকেরা ঐ সব যৌগঘটিত ঔষধসেবনের বিধান দেন। লোহা দেহের পক্ষে অপরিহার্য বলে রেচিত (Excreted) লোহার পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় খুবই কম (দৈনিক মূত্রে 100 মাইক্রোগ্রামের মত)।

কোবাল্ট—প্রাণিদেহে পুষ্টির জন্যে কোবাল্ট প্রয়োজনীয়। নিউক্লিয়ার টেক্‌নোলজি, চীনামাটি, কাচশিল্পে এবং টাংস্টেন কার্বাইড যন্ত্রপাতি নির্মাণে কোবাল্ট ব্যবহৃত হয়। বেশী মাত্রায় শরীরে প্রবিষ্ট হলে কোবাল্ট যৌগ শরীরে বমি-বমিভাব এবং বমির উপসর্গ সৃষ্টি করে।

নিকেল—নিষ্কলঙ্ক (Stainless) ইস্পাত, নানাবিধ সঙ্কর ধাতু এবং নিকেল প্লেটিং শিল্পে নিকেলের ব্যবহার হয়। এই সব শিল্পে উৎপন্ন অবাঞ্ছিত যৌগ নিকেল কার্বনিল। এটি তীব্র বিষ। নিকেল কার্বনিল ছাড়া অন্য নিকেল যৌগ থেকে পৌষ্টিক প্রণালীতে নিকেল বিশোষিত হয় না। নিকেল কার্বনিল যৌগই নিকেল বিষক্রিয়ার কারণ। শরীরে অল্প নিকেল বিশোষিত হলে বিষক্রিয়া খুব তীব্র হয় না। তীব্র বিষক্রিয়ার লক্ষণ—মাথার যন্ত্রণা, ঘুমঘুম ভাব, বমিবমি ভাব এবং বমি, বুকে ব্যথা, বুক আঁট হওয়া (Tightness of the chest), শ্বাসসঙ্কোচ, শুকনো-কাশি, দ্রুত শ্বসনক্রিয়া, সায়ানোসিস এবং চূড়ান্ত দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ।

তামা—তামার পরিবহনক্ষমতা এবং ক্ষয়রোধ ধর্মের জন্যে তামার বাসনপত্র, তামার বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, তামার পাইপ, তামার আচ্ছাদন ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক ভূপৃষ্ঠ (Surafce) জলে তামার পরিমাণ প্রায় লিটার পিছু 0.05 মিলিগ্র্যাম। শিল্পের পরিত্যক্ত আবর্জনা এবং পিত্তলের (তামার সঙ্কর ধাতু) উপরে জলের ক্ষয়কারক ক্রিয়ার ফলে উপরিউক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণ তামা জলে আসে। জলে অবাঞ্ছিত শ্যাওলানিবারক হিসাবে ব্যবহৃত তামার যৌগ জলে তামার পরিমাণ বাড়ায়। তামা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং দৈনিক 2·0 মিলিগ্রাম দেহে প্রয়োজন। বেশী তামা বমি করায় এবং যকৃতের ক্ষতি করে।

সীসা—সীসা শরীরে অস্থিতে ধীরে ধীরে স্থিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান (Cumulative) বিষক্রিয়া দর্শায়। কাজেই সীসা ক্রমবর্ধিষ্ণু বিষ। কোন কোন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া জলে সীসার পরিমাণ লিটার পিছু 0·4-0·8 মিলিগ্র্যাম। পাহাড়ী এলাকায় চুনাপাথর ও সীসার আকর গ্যালিনা একত্রে দেখা গেলে ঐ অঞ্চলের জলে বেশী সীসা থাকবার সম্ভাবনা। শহরে জল সরবরাহের মাধ্যম সীসার নল। নলের সংস্পর্শ হেতু খুব সামান্য পরিমাণ হলেও সীসা জলে আসতে পারে। শিল্পের পরিত্যক্ত আবর্জনার ফলে দূষক সীসা যৌগের পরিমাণ বাড়ে। ছাপাখানায় দীর্ঘদিন যারা সীসার সংস্পর্শে কাজ করতে বাধ্য হয়, তাদের অনেকেই সীসকশূলরোগে আক্রান্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা, সীসকশূল, ধীরে ধীরে পেশীর নিষ্ক্রিয়তা, বিশেষতঃ বাহুযুগলের নিষ্ক্রিয়তা সীসার বিষক্রিয়ার ফল।

ক্রোমিয়াম—3 যোজ্যতা ও 6 যোজ্যতা-বিশিষ্ট উভয় প্রকার ক্রোমিয়াম যৌগ শিল্পে বহু-পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ধাতুর পিক্‌লিং এবং প্লেটিং প্রণালী, অ্যালুমিনিয়ামের অ্যানোডীকরণ (Anodization), চর্মশিল্প, বিস্ফোরক নির্মাণ, সিরামিক্‌স, কাগজশিল্প, রঞ্জদ্রব্যশিল্প ইত্যাদিতে 6 যোজ্যতাবিশিষ্ট ক্রোমিয়াম যৌগ ব্যবহৃত হয়। 3 যোজ্যতাবিশিষ্ট ক্রোমিয়াম যৌগ বস্ত্রশিল্প এবং বস্ত্ররঞ্জনে, সিরামিক্‌স, কাচশিল্প ও

ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হলেও 6 যোজ্যতাবিশিষ্ট ক্রোমিয়াম যৌগের তুলনায় শিল্পে কম ব্যবহার করা হয়। পরিমাণ বেশী হলে ক্রোমিয়াম দূষক পদার্থ। ক্রোমিয়াম বিষক্রিয়ার উপসর্গ স্পষ্ট জানা যায় নি। 1 মিলিয়ন ভাগ জলে 1 গ্র্যাম ক্রোমিয়ামবিশিষ্ট জল দীর্ঘ দিন পান করেও স্বাস্থ্যের আপাত কোন ক্ষতি হয় নি। নাকে শুঁকলে ক্রোমিয়াম যৌগ ক্যান্সার উৎপাদক, কিন্তু খেলে কি হয়, তা স্পষ্ট নয়।

আর্সেনিক—ধাতুর কাঠিন্য বাড়াতে ধাতুর সঙ্গে আর্সেনিক মিলিয়ে নানারকম সঙ্কর ধাতু তৈরী করা হয়। আর্সেনিকযুক্ত কাচ তাপসহ। রাসায়নিক শিল্পে, রঞ্জক দ্রব্য উৎপাদনে চর্মশিল্পে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ কীটপতঙ্গনাশক। ছত্রাকনাশক আর্সেনিক যৌগ কাঠসংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ঔষধশিল্পেও আর্সেনিকের ব্যবহার আছে। স্বাভাবিক মানবশোণিতে লিটারপিছু 0.2—1.0 মিলিগ্র্যাম আর্সেনিক আছে। শাকসব্জী কাঁচা-কলের মাধ্যমে দেহের প্রয়োজনীয় আর্সেনিকের চাহিদা মেটে। রসুনে আর্সেনিক যৌগ আছে। শরীরে আর্সেনিক যৌগের বিষক্রিয়া বহুজ্ঞাত। 100 মিলিগ্র্যাম আর্সেনিক শরীরে ঢুকলে তীব্র বিষক্রিয়া এবং 130 মিলিগ্র্যাম ঢুকলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। দীর্ঘ দিন অল্প অল্প আর্সেনিক জমা হয়ে মৃত্যু ঘটায়। দক্ষিণ আফ্রিকার এক জায়গায় পানীয় জলের উৎস কূপের জল আর্সেনিক মিশ্রিত হয়ে বিষাক্ত হওয়ায় প্রচুর লোক মারা যায়। ঐ জল বিশ্লেষণ করে লিটার পিছু 12 মিলিগ্র্যাম আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল। ত্বকে ক্যান্সার এবং সম্ভবতঃ যকৃতে ক্যান্সার পানীয় জলে আর্সেনিক প্রাধান্যের জন্যে ঘটেছিল, এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিছু দিন আগে নিউজিল্যাণ্ডে গো-মড়কের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গোচারণক্ষেত্রের নিকটবর্তী পানীয় জলে আর্সেনিক মিশ্রিত হয়ে বিষক্রিয়ায় গো-মড়ক ঘটে।

অ্যান্টিমনি—সঙ্কর ধাতু নির্মাণে অ্যান্টিমনি ব্যবহৃত হয়। শরীরে অ্যান্টিমনি প্রয়োজন, একথা প্রমাণিত হয় নি, কিন্তু মাত্রাধিক্য শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়, তা প্রমাণিত হয়েছে। বিষক্রিয়ার উপসর্গ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার অনুরূপ। এছাড়াও ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। ত্বকে উদ্ভেদ এবং নিউমোনিয়া হতে দেখা গেছে। মাত্রা কম হলে মৃদু বিষ। দীর্ঘকাল ধরে কম মাত্রায় প্রযুক্ত হতে হতে তীব্র বিষের তুল্য ক্রিয়া দর্শায়। 1949 সাল থেকে সিস্টোসোমিয়াসিস আরোগ্যের জন্যে সূচীকাভরণ (ইঞ্জেকসন) পদ্ধতি দ্বারা অ্যান্টিমনি পটাসিয়াম টার্ট্রেট শিরায় শিরায় প্রয়োগ করা যায়।

সেলেনিয়াম—রঞ্জনশিল্প, কাচশিল্পে, ফটোইলেক-ট্রিক সেল নির্মাণে আংশিক পরিবাহক (Semiconductor) নির্মাণে, রবার শিল্পে সালফারের পরিপূরকরূপে সেলেনিয়াম বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সঙ্কর ধাতু এবং কীটপতঙ্গনাশক প্রস্তুতিতে সেলেনিয়ামের ব্যবহার আছে। সেলেনিয়াম বিষক্রিয়ার উপসর্গ স্পষ্ট নয়। অনেকটা আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার মত। মাটিতে সেলেনিয়াম বেশী ছড়ানো থাকলে তা দানাশস্যে সঞ্চারিত হয় এবং খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে। গন্ধকপরমাণু বিশিষ্ট প্রোটিন যৌগের গন্ধক পরমাণু সেলেনিয়াম পরমাণুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে সেলেনিয়াম শরীরে প্রবেশ করে প্রোটিন অণুতে উক্তরূপ পরিবর্তন ঘটাবার ফলে শরীরে অসুস্থতা দেখা দেয়। গবাদিপশুর এই অসুস্থতা অ্যালকালি ডিজিজ নামে পরিচিত। সেলেনিয়াম প্রোটিন যৌগ রোগাক্রান্ত গবাদিপশুর ক্ষরিত দুধেও পাওয়া গেছে। মানবদেহে সেলেনিয়াম এই ধরণের বিষক্রিয়া ঘটায় কিনা, তা এখনো অনুসন্ধানের

বিষয়। দেহে সামান্ত পরিমাণ সেলেনিয়াম পুষ্টির জন্তে আবশ্তক মনে হয়। ইঁদুরের লোহিত রক্তকণায় গ্লুটাথিওন পারঅক্সিডেজ নামক এনজাইমটিতে সেলেনিয়াম আছে এবং এই সেলেনিয়াম কোষের মধ্যে পারক্সাইডের দ্বারা সম্ভাবিত অবাঞ্ছিত জারণ নিবারণ করে। সেলেনিয়াম অভাবে উক্ত এনজাইমের ক্রিয়া নষ্ট হয় এবং ইঁদুরের যকৃৎ আক্রান্ত হয় (Hepatic necrosis), ভেড়ার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, গবাদিপশু ও শূকরের যকৃৎ বিকৃতি (Hepatic dystrophy) দেখা যায়। এই সব রোগে সেলেনিয়াম লবণ শরীরে প্রবেশ করালে দ্রুত আরোগ্য লাভ ঘটে।

জলীয় পরিবেশে প্রাণিদেহের উপর গুরু ধাতু এবং ধাতুতুলের বিষক্রিয়া বিষয়ে বিশদ কিছু জানা যায় নি, পারা এবং ক্যাডমিয়ামজনিত মহামারীর ঘটনা দুটি ছাড়া। জীবদেহে দীর্ঘকাল অনুপ্রবেশের ফলে কি জীবের বিষসহন ক্ষমতা বেড়ে যায়? দেহ থেকে বিষ দূর করতে কিরকম সময় লাগে, তাও সঠিক জানা যায় নি এবং প্রশ্ন, আদৌ সম্পূর্ণ দূর করা যায় কি! তজ্জন্তে বিষধাতু ও ধাতুতুলের রাসায়নিক, জৈব রাসায়নিক ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজন। জেনেটিক গুরুত্ব আদৌ আছে কিনা, থাকলে তার তাৎপর্য কি? এককভাবে বা যৌথভাবে বিষক্রিয়া ঘটাতে কি পরিমাণ ধাতু বা ধাতুতুল প্রয়োজন? বিষক্রিয়ার উপসর্গাবলী কি কি? গুরু ধাতুর ক্যান্সার উৎপাদনে বংশগতি নিয়ন্ত্রণে এবং টেরাটোজেনিক ভূমিকা কি?

ভারতে ICMR, CSIR-এর মত সংস্থানগুলি যৌগভাবে জলে গুরুধাতুর উপস্থিতি ও তজ্জনিত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়, অবস্থাভেদে পদ্ধতিভেদ হয়। এটা অসুবিধাজনক, কারণ স্থিরমান নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে ওঠে। জলে গুরুধাতুর অত্যল্প পরিমাণ উপস্থিতি বিশ্লেষণের কাজেও ঘোরতর অন্তরায়।

ভারত সরকার পানীয় জলে কত পরিমাণ গুরুধাতু এবং ধাতুতুল থাকতে পারবে, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তালিকা—1 দ্রষ্টব্য)।

তালিকা—1

যৌগ	অনুমোদিত উপস্থিতি মি. গ্রা/লি.	অধিক মি. গ্রা/লি.
আর্সেনিক		0·2
ক্রোমিয়াম (6)		—
তামা	1.0	3.0
লোহা	0.3	1.0
সীসা	—	0.1
ম্যাঙ্গানিজ	0.1	0.5
সেলেনিয়াম		0·5
দস্তা	5.0	15.0

পরিবেশে গুরুধাতুর বিষ ছড়ানো বিষয়ে সরকার সচেতন হয়েছেন। জনস্বাস্থ্যরক্ষাকামীদের কাছে এটা আশীর্বাদ।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার

অমূল্যধন দেব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য:

"বাংলা ভাষায় মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য"।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আঠাশ বৎসর এই আদর্শ সামনে রাখিয়াই চলিবার পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এই আদর্শ নিয়াই চলিবে। স্বর্গত জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচারে খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান আহরণ করিতে মাতৃভাষা প্রতিবন্ধক নয়, ইহা অনেক বাঙালী বিজ্ঞানী পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসু, দীক্ষান্ত ভাষণ, বাংলাতেই দিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলা ভাষায় সমাবর্তন বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা বর্তমানে রাষ্ট্রও উপলব্ধি করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, বিভিন্ন ভাষণে জনগণকে বিজ্ঞান-সচেতন করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু যতটা আশা করা গিয়াছিল, কার্যতঃ ততটা অগ্রসর হওয়া যায় নাই, এইকথা অস্বীকার করা যায় না। "গাঁও মে বিজলী" যাইতেছে, কিন্তু "গাঁও মে বিজ্ঞান" এখনও অনেক দূর। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাহার ক্ষমতানুযায়ী এই প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

অনেকে মনে করেন, আগে বাংলা পরিভাষা তৈয়ার হউক, তাহার পর বিজ্ঞান প্রচার হইবে। পরিভাষা বিজ্ঞান প্রচারের অন্তরায় নয়। পরিভাষা আপনি গড়িয়া উঠে। আমাদের বাংলা ভাষায় সেই পোর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের আগমনের সময় হইতেই অনেক বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। "ভাষা বহতা নীর"। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রভাষায় বড় বড় অভিধান বহু অর্থব্যয়ে সঙ্কলন করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিভাষা নিদারুণ হাস্যকর শোনায়, তাহার নমুনা অনেক পাঠকই অবগত আছেন। vanity bag—কোটানি বা ডিবিয়া, telephone—কান ফুস্ ফুস্ ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিভাষা কমিটি করিয়াছেন। কারগরী বিষয়ে অনেক পরিভাষা করা হইয়াছিল এবং লেখকও যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বা কারগরী বিষয়ক প্রচার বাড়িয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইয়াছে। জনমানসে সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান-উপন্যাস সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইলে বিজ্ঞানের দিকে কিছু পাঠকের দৃষ্টি ফিরিবে ইহা আশার কথা। সরকারী কাজে বাংলার ব্যাপক ব্যবহার হইলে মাতৃভাষার উন্নতি সাধিত হইবে এবং বিজ্ঞান প্রচারেও ইহার প্রতিফলন হইবে। আমাদের রাজ্যে, সরকারী স্তরে বাংলার প্রচলন এখনও ফলপ্রসূ হয় নাই। মন্ত্রীদের আশ্বাস, বাংলা ভাষা প্রেমিকদের আন্দোলন, সংবাদপত্রের সমর্থন সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। পরস্পর দোষারূপ করা, টাইপ যন্ত্রের, লঘুলিপিকারের অভাব ইত্যাদি অন্তরায় আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু ব্যাধির উপশম হয় না। আন্তরিকতার

ক্রোমোসোমের বিশ্লেষণ করবার পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন দেশের নবজাতক শিশুর মধ্যে শতকরা 0·5টি ক্ষেত্রে ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। যদি ক্রোমোসোম রঞ্জিত করবার আধুনিক পদ্ধতি (যেমন Fluorescent staining ও Giemsa staining) প্রয়োগ করা হতো, তাহলে এর সূক্ষ্ম ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়তো এবং বিশৃঙ্খলার হার বেড়ে গিয়ে সম্ভবতঃ শতকরা একটি শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যেত। ক্রোমোসোমের সংখ্যায় ও আকৃতিতে তিন-শ'র বেশী প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। কিন্তু কি কারণে তা ঘটে, সে সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

ক্রোমোসোমের সংখ্যায় যে ধরণের তারতম্য দেখা যায়, তাদের মধ্যে সাধারণতঃ ডাউন (Down), ক্লাইনেফেলটার (Klinefelter) ও টারনার (Turner), সিনড্রোম (Syndrome) উল্লেখযোগ্য। মানুষের প্রতিটি দেহকোষে 23 জোড়া ক্রোমোসোম থাকে, তাদের মধ্যে 22 জোড়াকে অটোসোম (Autosome) বা অযৌন ক্রোমোসোম এবং বাকী এক জোড়াকে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম বা যৌন-ক্রোমোসোম বলে। সুস্থ স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেহকোষে যৌন-ক্রোমোসোম জোড়াটিকে যথাক্রমে XX ও XY দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মানুষ তার 23 জোড়া ক্রোমোসোমের প্রতি জোড়ার একটি ক্রোমোসোম পিতার নিকট থেকে এবং অপরটি মাতার নিকট থেকে পায়। যৌন-ক্রোমোসোমের ক্ষেত্রে পুত্র-সন্তানেরা মাতার নিকট থেকে একটি X ও পিতার নিকট থেকে একটি Y ক্রোমোসোম পায়, কিন্তু কন্যা-সন্তানেরা পিতা-মাতা উভয়ের নিকট থেকে একটি করে X ক্রোমোসোম পেয়ে থাকে। অযৌন-ক্রোমোসোমগুলিকে আকৃতি অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যায় নম্বর দেওয়া হয়। লম্বায় সবচেয়ে বড় ক্রোমোসোম জোড়াটিকে এক নম্বর, তার চেয়ে ছোট জোড়াটিকে দু-নম্বর এবং এইভাবে সবচেয়ে ছোট জোড়াটিকে বাইশ নম্বর দেওয়া হয়। যে সব শিশুর দেহকোষে 21 নম্বরের দুটি ক্রোমোসোমের পরিবর্তে তিনটি থাকে, তাদের মধ্যে ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণ দেখা যায়। এই সব শিশু মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ভোগে এবং অল্প বয়সেই মারা যায়। 35 বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক মাতার যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে শতকরা একজনের ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণ দেখা যায়। যেসব পুরুষের দুটি X এবং একটি Y ক্রোমোসোম থাকে, তাদের ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোমের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। তারা সাধারণতঃ মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ভুগে থাকে। যে সব স্ত্রীলোকের দেহকোষে লিঙ্গ নির্ধারক একটি মাত্র X ক্রোমোসোম থাকে, তারা আকৃতিতে বেঁটে হয় এবং তাদের কোন ঋতুস্রাব হয় না। এই জাতীয় রোগের লক্ষণকে টারনার সিনড্রোম বলে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু রোগীর যৌন-ক্রোমোসোমের সংখ্যায় যদি কোন বিশৃঙ্খলা থাকে, তা সহজে যৌন-ক্রোমেটিন (Sex chromatin) পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই পরীক্ষায় রোগীর গালের অভ্যন্তরে মাংসপেশী থেকে কিছু কোষ বের করে এবং পরে তা রঞ্জিত করে কোষকেন্দ্রের প্রান্তভাগে একটি কালো রঙের স্পটের অনুসন্ধান করা হয়। 1949 সালে ওয়েষ্টার্ণ অন্টেরিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মুরে বার (Dr. Murray L. Barr) কোষকেন্দ্রের কালো অংশকে প্রথম আবিষ্কার করেন, তারপর থেকে তাঁর নাম অনুসারে এর নাম দেওয়া হয় বার বডি (Barr body)। একটি কোষে যত সংখ্যক X ক্রোমোসোম থাকে, তার তুলনায় এক সংখ্যক কম বার বডি দেখা যায়। সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দেহকোষে যথাক্রমে একটি ও

দুটি X ক্রোমোসোম থাকে, ফলে পুরুষের দেহ-কোষের ক্ষেত্রে কোন 'বার বডি' দেখা যায় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা একটিমাত্র দেখা যায়। এই কারণে স্বাভাবিক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে যথাক্রমে 'ক্রোমেটিন-নেগেটিভ' ও ক্রোমেটিন পজিটিভ বলে। এখন ক্রোমেটিন পরীক্ষায় যদি কোন পুরুষের দেহকোষে বার বডি দেখা যায়, তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাদের যৌন-ক্রোমোসোমের সংখ্যায় কোন বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের বিশদ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

রক্তের শ্রেণী পরীক্ষায় চিকিৎসক মাতা ও সন্তানের বিরুদ্ধ রক্তের শ্রেণীর অস্তিত্ব জানতে পারেন। যদি মাতা O এবং সন্তান A অথবা B রক্তশ্রেণীভুক্ত হয়, অথবা মাতা যদি Rh নেগেটিভ এবং তাঁর গর্ভস্থ সন্তান Rh পজিটিভ রক্তশ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে সন্তানের হিমোলিটিক (Hemolytic) রোগ হবার এবং পরিণামে মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। কোন রোগের সঙ্গে রক্তশ্রেণীর সম্বন্ধের কথা জানা থাকলে রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। ডক্টর এফ ফোগেল ও ডক্টর মণীষ চক্রবর্তী বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের লোকদের উপর এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, A ও AB রক্তশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা B ও O রক্তশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের তুলনায় বসন্তরোগে বেশী আক্রান্ত হন এবং ঐ রোগে তারা বেশী মারা যান। অন্য সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, O এবং A রক্তশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের যথাক্রমে ডিয়োডেনাল আলসার এবং পেটের ক্যান্সার হবার প্রবণতা বেশী।

বংশগত রোগ নিরাময় করবার পদ্ধতি

যদি কোন বংশগত রোগের কারণ জানা থাকে, তাহলে অনেক সময় পরিবেশের পরিবর্তন করে রোগকে বশে অথবা এর প্রকোপকে বহুলাংশে কমানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ফেনিলকেটোন্যুরিয়া (Phenylketonuria) রোগের উল্লেখ করা যায়। সংক্ষেপে এই রোগকে পি-কে-ইউ (P. K. U) বলে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতি দশ হাজার শিশুতে একজন। রক্তে ফেনিল অ্যালেনিন অ্যামিনো অ্যাসিডের আধিক্যে এই রোগের সৃষ্টি হয়। মানুষ যেসব খাদ্য খায়, তার থেকে ফেনিল অ্যালেনিনের উৎপত্তি। যকৃতে ফেনিল অ্যালেনিন হাইড্রোক্সিলেজনামক এনজাইমের অভাবে ফেনিল অ্যালেনিন জৈব রাসায়নিক পদার্থটি টাইরোসিন পদার্থে রূপান্তরিত হয় না, ফলে রক্তে ফেনিল অ্যালেনিনের আধিক্য ঘটে এবং সন্তানের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। এই সব রোগীর প্রস্রাবে ফেনিল পাইরুভিক অ্যাসিড নির্গত হয় এবং তা ফেরিক ক্লোরাইডের সংস্পর্শে প্রস্রাবের রং নীল বর্ণ হয়। প্রস্রাব হবার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা না করলে ঐ অ্যাসিডের অস্তিত্ব ধরা যায় না। বর্তমানে bacterial inhibition পরীক্ষায় শিশুর রক্তে ফেনিল অ্যালেনিনের আধিক্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে। শৈশব থেকে রোগীদের যদি ফেনিল অ্যালেনিনবিহীন খাদ্য দেওয়া যায়, তাহলে তাদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে না এবং পরবর্তীকালে তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—যেমন গ্যালাক্টোসেমিয়া। এটিও একটি বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধি। শিশুরা সাধারণতঃ মাতার দুধে যে ল্যাক্টোজ থাকে, তা তাদের শরীরের অন্তর্গত এনজাইমের সাহায্যে প্রথমে গ্যালাক্টোজ এবং পরে তা গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। প্রতি পঁচাত্তর হাজারে একটি শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশেষ এক এনজাইমের (Galactose-1-phosphate uridyl transferase) অভাবে তারা গ্যালাক্টোজকে গ্লুকোজে

রূপান্তরিত করতে পারে না, ফলে রক্তে গ্যালাক্টোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের বিপাক বিশৃঙ্খলায় শিশুর লিভার ও মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের চোখে ছানি পড়ে। শৈশবকাল থেকে রোগগ্রস্ত শিশুদের মাতার দুধের পরিবর্তে যদি ল্যাক্টোজবিহীন কিন্তু গ্লুকোজ-সমন্বিত গরুর গুঁড়া দুধ দেওয়া যায়, তাহলে এই শিশুদের মস্তিষ্কবিকৃতি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইনসুলিনের সাহায্যে যে বংশগত ডায়াবেটিস রোগকে বশে আনা হয়, তার খবর অনেকেই জানেন। কিন্তু ইনসুলিন নেওয়া বন্ধ করলে রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে। কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে, আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা ডায়াবেটিস রোগীদের এবং ভবিষ্যতে যাদের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের অল্প বয়সে সনাক্ত করবার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে ডায়াবেটিস রোগের প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাবকে বহুলাংশে কমানো যেতে পারে।

ভেষজ-বিজ্ঞান ও প্রজনন-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভেষজ-প্রজনন-বিজ্ঞান (Pharmacogenetics) নামে বিজ্ঞানের নতুন এক শাখার সৃষ্টি হয়েছে। ভিন্ন ব্যক্তিতে কোন বিশেষ ওষুধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করাই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। গত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় প্রিমাকুইন, পেমাকুইনজাতীয় ম্যালেরিয়ার ওষুধ ম্যালেরিয়াঅধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর প্রয়োগ করবার ফলে কিছু-সংখ্যক ব্যক্তির রক্তকণিকা ভেঙে গিয়ে রক্তশূন্যতা রোগে ভুগতে দেখা যায়। যখন এই ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, তারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল যে, যাদের রক্তে Glucose-6-phosphate dehydrogenase নামে এনজাইমের অভাব ছিল, তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মহারাষ্ট্রের পার্সী সম্প্রদায়, মধ্য-প্রদেশের মাহার অধিবাসী এবং কোহিমায় নাগাদের মধ্যে শতকরা দশ থেকে পনেরো জনের রক্তে এই এনজাইমের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

Rh-নেগেটিভ রক্তশ্রেণীভুক্ত মাতার গর্ভে বিরুদ্ধ রক্তসঞ্চারের ফলে Rh-পজিটিভ রক্ত-শ্রেণীভুক্ত গর্ভস্থ সন্তানের যে রক্তস্বল্পতা রোগে মৃত্যু হয়, বর্তমানে তা কম ঘটে থাকে। প্রথম সন্তান প্রসব হবার 72 ঘন্টার মধ্যে মাতার শরীরে অ্যান্টি Rh-গামা গ্লোবিউলিন প্রবেশ করানো হয়। এই পদার্থটি গর্ভস্থ সন্তান থেকে যে Rh-পজিটিভ অ্যান্টিজেন মাতার শরীরে ঢোকে, তা নষ্ট করে দেয়। ফলে মাতার শরীরে Rh-পজিটিভ অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় না এবং তার পরবর্তী সন্তান রোগগ্রস্ত বা মৃত হয়ে জন্মাবার আশঙ্কা থাকে না।

প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ

যদি পিতামাতার কোন সন্তান জন্মপঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করে বা বংশগত রোগে ভুগে থাকে, তখন তাদের ঐ ধরণের সন্তান ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা আছে কি না, তা জানবার জন্যে তারা সাধারণতঃ চিকিৎসকের কাছে গিয়ে থাকেন। শুধু যে তারা নিজেদের সন্তান সম্বন্ধে জানতে চান, তা নয়। অনেক সময় তারা তাদের নীরোগ ও রোগগ্রস্ত সন্তানের ছেলেমেয়েরা সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে কি না, তাও জানতে উদগ্রীব হন। এসব ক্ষেত্রে প্রজনন-বিজ্ঞানে বিশারদ চিকিৎসকেরা রোগীর বংশ-ইতিহাস, রোগের লক্ষণ, কোন বয়সে তার প্রথম প্রকাশ প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ (Genetic counselling) দিয়ে থাকেন।

মানুষের বিভিন্ন বংশগত রোগ ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জিনের প্রভাবে উৎপত্তি। এই জিনগুলি ক্রোমোসোমের মধ্যে সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

ক্রোমোসোমের মাধ্যমে সন্তান পিতামাতা থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জিন পেয়ে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে পিতামাতার বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে যে বৈশিষ্ট্য সন্তানে প্রকাশিত হয়, তাকে প্রকট (Dominant) বৈশিষ্ট্য এবং যেটা অপ্রকাশিত থাকে, তাকে প্রচ্ছন্ন (Recessive) বৈশিষ্ট্য বলে। প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর লিঙ্গ অনুগামী বৈশিষ্ট্যগুলি যৌন-ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

যেসব বংশগত রোগ বা বিরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকট, প্রচ্ছন্ন অথবা লিঙ্গ-অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের উত্তরাধিকার সূত্র আমাদের জানা আছে। এসব ক্ষেত্রে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়া সহজ। যদি কোন ব্যক্তির রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং রোগটি যদি প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে তার পরবর্তী সন্তানটি ঐ ধরণের রোগগ্রস্ত হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা 50 শতাংশ। যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক দম্পতির কোন সন্তান প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যালবিনো (Albino) বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানে ঐ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করবার সম্ভাবনা 25 শতাংশ। এইভাবে বলা যেতে পারে, যদি কোন স্ত্রীলোকের বাবা অথবা ভাই হিমোফিলিয়া বা রক্তক্ষরণকারী রোগে ভোগেন, তাহলে তার অর্ধেক সংখ্যক পুত্র-সন্তানের ঐ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় সম্ভাবনার সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী না করে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে সন্তানটি সুস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে কিনা। যদি কোন স্ত্রীলোকের বংশে কারোর হিমোফিলিয়া রোগ না থাকে এবং তিনি যদি কোন হিমোফিলিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সুস্থ ভাইকে বিয়ে করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, তার কোন ছেলে-মেয়েরা ঐ রোগে ভুগবেন না। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জিন পরিব্যক্তির ফলে রোগগ্রস্ত সন্তান জন্ম হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন নীরোগ ব্যক্তির ভাই অথবা বোন প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন রোগে (যেমন অল্প বয়সে চোখে ছানিপড়া রোগ) ভোগেন, তাহলে তার কোন সন্তানে ঐ রোগ প্রকাশ হবার আশঙ্কা থাকে না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন বংশগত রোগ অথবা জন্মগত বিকৃতি কোন বিশেষ পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের উত্তরাধিকার সূত্র আমাদের জানা নেই। যদি এই ধরণের পরিবার (Familial) রোগ ও জন্মগত বিকৃতি পরিবারে বিভিন্ন সন্তানে কি হারে ঘটে, তার তথ্য জানা থাকে, তাহলে পিতা-মাতাকে তাদের পরবর্তী সন্তান রোগগ্রস্ত বা জন্মপঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করবে কিনা, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

বংশগত রোগের বাহককে (Carrier) জৈব রাসায়নিক পরীক্ষায় সনাক্ত করে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সিক্‌ল্‌সেল অ্যানিমিয়া অথবা গ্যালাকটোসেমিয়া রোগের জিন অলক্ষ্যে বহন করলে তাদের কোন সন্তানের ঐ রোগ হবার সম্ভাবনা 25 শতাংশ।

বর্তমানে অ্যামনিওসিনটিসিস (Amniocentesis) বা গর্ভভেদ পদ্ধতির সাহায্যে গর্ভস্থ ভ্রূণ রোগদুষ্ট কি না, তা কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা সম্ভব। গর্ভাধানের চার পাঁচ মাস পরে সূক্ষ্ম সিরিঞ্জের সাহায্যে মাতার পেট থেকে অল্প পরিমাণ গর্ভজল (Amniotic fluid) বের করা হয়। এই গর্ভজলে ভ্রূণ থেকে খসে পড়া সূক্ষ্ম কোষ থাকে। পরীক্ষাগারে এই কোষের বৃদ্ধি করানো হয় এবং তাদের মধ্যে কোন রকম ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলা আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। শরীর থেকে

রক্ত নেবার ন্যায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট থেকে গর্ভজল বের করা অত সহজ নয়। গর্ভভেদ পদ্ধতি গ্রহণে চিকিৎসকের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন। কখনও কখনও গর্ভজলে মাতার দেহকোষ চলে এসে ক্রোমোসোম বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

গর্ভভেদের সাহায্যে প্রধানতঃ ডাউন সিনড্রোম সম্পর্কিত ক্রোমোসোম-বিশৃঙ্খলা নির্ণয় করা হয়। 35 বয়স উর্ধ্বে যে সব স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করেন, এই পদ্ধতির সাহায্যে তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রোমোসোম বিশ্লেষণ করা যায়। এর কোন বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে দুষ্ট ভ্রূণের গর্ভপাত করানো যেতে পারে। গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, তা ক্রোমোসোম বিশ্লেষণ করে আগের থেকে বলা যায়। মাতা যদি হিমোফিলিয়া রোগের বাহক হন, তাহলে তার পুত্র-সন্তান ঐ রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র হবে বলে জানা গেলে ভ্রূণের বিনাশ সাধন করা যেতে পারে। গর্ভজল ও গর্ভজলে খসে-পড়া ভ্রূণের সূক্ষ্মকোষ থেকে অনেক এনজাইমের অস্তিত্ব জানা যায়। বিশেষ এনজাইমের অভাবে কোন বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত ব্যাধি হবার সম্ভাবনা থাকলে তা গর্ভজল পরীক্ষা করে আগে থেকেই ভ্রূণের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। hexosaminidase A নামক এক এনজাইমের অভাবে সন্তানে মারাত্মক টে-স্যাক্স্ (Tay-Saces) রোগে মৃত্যু ঘটে। এই রোগ সাধারণতঃ এক বিশেষ ইহুদী সম্প্রদায়ের সন্তানদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। ভাবী সন্তানে এই রোগ দেখা যাবে কি না, তা গর্ভজল পরীক্ষা করে বলা যায়।

বংশগত রোগ নিরাময়ের পরিণাম

প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শে বংশগত রোগের নিবারণ, নিরাময় বা উপশম করা গেলেও জনসমাজ থেকে ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যের জিনের মাত্রাকে কতদূর হ্রাস করা যাবে, তা বলা শক্ত। ক্ষতিকর প্রকট জিন ও লিঙ্গ-অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের যদি বন্ধ্যাকরণ অথবা নির্জীব করা হয় অথবা তারা স্বেচ্ছায় সন্তানোৎপাদন না করেন, তাহলে অনিষ্টকর জিনের মাত্রা প্রতি পর্যায়ে কমতে থাকবে এবং তা কখনই জিন পরিব্যক্তি হারের কম হবে না। যে সব ব্যক্তি প্রকট এবং লিঙ্গ-অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন রোগে ভুগছেন, তাদের যদি চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ করা যায়, তাহলে প্রকট জিনের মাত্রা এক পর্যায়ে এবং লিঙ্গ-অনুগামী জিনের মাত্রা চার পর্যায়ে বেড়ে গিয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যে সব ব্যক্তি অনিষ্টকর প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন রোগে ভুগে থাকেন, তাদের নির্জীব করা হলে জনসমাজে (Population) প্রচ্ছন্ন জিনের মাত্রা বিশেষ হ্রাস পায় না। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের আধুনিক চিকিৎসায় সুস্থ করা হলে জিনের মাত্রা পরবর্তী পর্যায়ে খুব সামান্য বৃদ্ধি পাবে। আগামী দু-শ' অথবা তিন-শ' বছরে প্রচ্ছন্ন জিনের মাত্রা আশঙ্কাজনক বৃদ্ধি পাবার আগেই হয়তো রোগ নিরাময়ের নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হবে।

যদি প্রচ্ছন্ন জিনের বাহক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের পরস্পরে বিবাহ করতে বারণ করা হয় এবং তারা যদি প্রত্যেকে সুস্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ যারা ক্ষতিকর জিনের বাহক নন, তাদের বিবাহ করেন, তাহলে বাহক পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমে বংশগত রোগের প্রচ্ছন্ন জিন সঞ্চার করে জনসমাজে এর মাত্রা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবেন। কিন্তু বাহক পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরস্পর বিবাহ করে পরিবার পরিকল্পনার সাহায্যে যদি সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখেন, তাহলে জনসমাজে ক্ষতিকর জিনের মাত্রা হ্রাস পাবে।

ডাউন সিনড্রোমবিশিষ্ট সন্তানের শতকরা 60 জন 35 বছর উর্ধ্বে মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে থাকে। অ্যামনিওসিনটিসিসের সাহায্যে দুষ্ট ভ্রূণের সনাক্ত করে যদি তাদের গর্ভপাত ঘটানো যায়, তাহলে জনসমাজ থেকে উপরিউক্ত ধরণের সন্তান জন্ম হবার সম্ভাবনা শতকরা 50-এর বেশী কমে যাবে। তাছাড়া গর্ভজলে যেসব এনজাইম আছে, তাদের সাহায্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের রোগ নির্ণয় করে যদি দুষ্ট ভ্রূণের বিনাশ করা যায়, তাহলে প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রোগের মাত্রাও হ্রাস পাবে।

মন্তব্য ও উপসংহার

অনেক ব্যক্তি হয়তো বলবেন, যেখানে কলেরা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে এখনও প্রতি বছর হাজার হাজার লোক মরছে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ও খাদ্যে ভেজাল খেয়ে যেখানে লোকেরা নানা রকম ব্যাধিতে ভুগছে, যেখানে বিষাক্ত পরিবেশ ও আবহাওয়া বিভীষিকা হয়ে জনস্বাস্থ্য নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, সেখানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা বাতুলতা মাত্র। এই সব ব্যক্তির উক্তিতে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জনস্বাস্থ্য স্বার্থের খাতিরে এই সব সমস্যার সমাধান যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সে বিষয়ে কারোর দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু এই সব সমস্যার সমাধান না হলে যেসব ব্যক্তি বংশগত রোগের যন্ত্রণা সকলের অলক্ষ্যে নীরবে সহ্য করেছেন, তাদের চিকিৎসার কি কোন সুযোগ-সুবিধা থাকবে না? তাদের আধুনিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে রাখবার কোন যুক্তি নেই। মানব কল্যাণে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে যেখানে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, সেখানে এই বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে কেন আমরা অপারগ হবো?

বংশগত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করবার জন্যে বড় বড় হাসপাতালে একটি মেডিক্যাল জেনেটিক্স বিভাগ খোলা যেতে পারে। এই বিভাগ জনসাধারণকে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়া ছাড়া বংশগত রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা করা, বংশগত বাহকদের সনাক্ত করা, গর্ভস্থ ভ্রূণ বা সন্তানের রোগ নির্ণয় করা ও মানব প্রজনন-বিজ্ঞানের গবেষণা করবার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এই বিভাগের সঙ্গে প্রসূতি বিভাগ, শিশু চিকিৎসা বিভাগ ও পারিবারিক পরিকল্পনা বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণ থেকে সিক্‌ল্-সেল-অ্যানিমিয়া ও থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক এবং ফেনিলকেটোনুরিয়া রোগগ্রস্ত শিশুদের পৃথক (Screening) করা ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু কোন পরিবারে এই ধরণের বংশগত রোগগ্রস্ত সন্তান যদি থাকে, তাহলে তার নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাদের দুটি রোগের জিন বহন করবার সম্ভাবনা আছে, তাদের খুঁজে বের করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতি হাসপাতালে বংশগত রোগীদের একটি প্রজনন রেজেষ্ট্রি রাখা যেতে পারে। ব্যক্তির নামে, ঠিকানা, জাতি, ধর্ম ছাড়া বংশগত রোগের নাম, লক্ষণ এবং পরিবারে কার কার মধ্যে ঐ রোগ দেখা গেছে, তার যাবতীয় তথ্য এই রেজেষ্ট্রিতে রাখা হবে। যতই রোগীর সংখ্যা বাড়বে, ততই রেজেষ্ট্রির ফাইল মোটা হতে থাকবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এর সাহায্যে বংশগত রোগীর অনেক কিছু তথ্য অল্প পরিসরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এই সব তথ্য সংগৃহীত হলে পরিবারে কোন ব্যক্তির বংশগত রোগ হবার তথ্যভিত্তিক সম্ভাবনা (Empirical risk) বের করা যাবে। জনসমাজে বিভিন্ন বংশগত রোগের প্রাদুর্ভাব জানতে এবং তাদের মূল্যায়ন, অনুধাবন ও নিবারণ করতে বংশগত রোগীর রেজেষ্ট্রিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি কোন রোগীকে

সনাক্ত করতে ও তার বংশ-ইতিহাস জানতে প্রজনন-রেজেষ্ট্রি হবে একটি মস্ত বড় তথ্য ভাণ্ডার (Data bank)।

কলকাতায় অনেক হাসপাতাল আছে, কিন্তু কোথাও তেমন উল্লেখযোগ্য মেডিক্যাল জেনেটিক্স বিভাগ নেই। এই বিভাগ স্থাপনে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অর্থ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর অভাব। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি হাসপাতালে একটি মেডিক্যাল জেনেটিক্স বিভাগ স্থাপন না করে অনেকগুলি হাসপাতাল একত্র মিলে একটি মেডিক্যাল জেনেটিক্স সেন্টার গঠন করা যেতে পারে। এই সেন্টার থেকে সব হাসপাতালই প্রয়োজনীয় ট্রেনিং, পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করবেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও মানব প্রজনন-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এমন একজন ব্যক্তি হবেন এই সেন্টারের অধ্যক্ষ। তাঁকে সাহায্য করবেন pediatrician, serologist, haematological geneticist, human biochemical geneticist, human cytologist ও statistician। দলবদ্ধভাবে কাজ করলে মেডিক্যাল জেনেটিক্স সেন্টার স্থাপনের উপকারিতা জনসাধারণ উপলব্ধি করবেন।

রোগগ্রস্ত ও জন্মপঙ্গু সন্তান শুধু পিতামাতার কাছে বোঝা নয়, সমাজের কাছে, দেশের কাছে তারা ভারস্বরূপ। পিতামাতাদের মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তারা অনেক সময় নিজেদের অহেতুক দোষী বলে মনে করেন এবং সমাজে তারা লজ্জার মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন না। ভারতবর্ষে প্রতি বছর এক কোটি বিশ লক্ষ শিশু জন্মায়। এদের মধ্যে শতকরা যদি একজনও বংশগত রোগগ্রস্ত, মস্তিষ্কবিকৃতি সম্পন্ন অথবা বিকলাঙ্গ হয়, তাহলে প্রতি বছরে গড়ে এক লক্ষ বিশ হাজার শিশু এই ধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। সমাজে এদের পুনর্বাসনের ব্যয় অকল্পনীয়। প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ ও অ্যামনিওসিনটিসিসের সাহায্যে এদের জন্মহার কমিয়ে যদি অর্ধেকও করা যায়, তাহলে অনেক পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি আনা সম্ভব হবে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ ও রবীন্দ্রমোহন দত্ত

ভারতবর্ষের যে কয়টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে 1876 খৃষ্টাব্দে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স অন্যতম।

মহেন্দ্রলাল কেবল একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না—তিনি এদেশের মানুষের মধ্যে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে এবং মানুষের মঙ্গলে বিজ্ঞানকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, সে কথা যদিও বহু বাঙালীর মন থেকে আজ বিস্মৃত, তবুও তাঁর অবদানের স্বীকৃতি লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে ভারতবাসীর মানসপটে।

হাওড়া জেলার পাইকপাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে 1833 খৃষ্টাব্দের 2রা নভেম্বর এক দরিদ্র পরিবারে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তারকনাথ, মাতা অঘোরমণি দেবী। মহেন্দ্রলাল যখন মাত্র 5 বছরের শিশু, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অসহায় অঘোরমণি দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার নেবুতলায় তাঁর এক ভাইয়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন।

অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মহেন্দ্রলাল এখানেই প্রথম পাঠশালার শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইংরেজী শিক্ষা নেন ঠাকুরদাস দে মশাইয়ের কাছে। সাত-আট বছর বয়সে পাঠশালার পাঠ শেষ করে ভর্তি হন হেয়ার সাহেবের স্কুলে। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সকলের চোখে মেধাবী ছাত্র হিসাবে চিহ্নিত হন।

1842 খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে বাঙালীর জাতীয় বন্ধু হেয়ার সাহেব পরলোকগমন করেন। সেই সময় মহেন্দ্রলাল কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং বেশ কিছু দিন স্কুলে না যাওয়ায় তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়। হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন উমাচরণ মিত্র, তিনি মহেন্দ্রলালকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হবার অনুমতি দেন।

ছাত্রাবস্থায় মহেন্দ্রলাল মাতুলালয়ের প্রায় সমস্ত কাজকর্ম তো নিজে হাতে করতেনই, এমন কি বাজারহাট পর্যন্ত মাথায় করে আনতেন। তাঁর জীবনে এমন অনেক রাত গেছে, যে রাতে রাস্তার আলোর সাহায্যে ক্লাসের পাঠ তৈরী করতে হয়েছে। পিতার মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরেই মহেন্দ্রলাল মাতৃহারা হন। অনাথ মহেন্দ্রলালের কিন্তু লক্ষ্য ছিল স্থির—মনে ছিল বিদ্যার্জনের তীব্র বাসনা। প্রধান শিক্ষক উমাচরণ বাবুর কাছে তিনি শিখলেন সহজ ও বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষা।

1849 খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল পরীক্ষায় হেয়ার স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে জুনিয়ার স্কলারশীপ লাভ করে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হেয়ার স্কুলের অগণ্য শিক্ষকদের প্রতি, বিশেষ করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীনাথ ঘোষের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। মহেন্দ্রলাল যখন বাঙলা দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, কথিত আছে 1395 সালের কোন এক সময়ে শ্রীনাথ ঘোষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মধ্যরাত্রে সে সংবাদ যায় মহেন্দ্রলালের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীনাথ ঘোষ মশাইকে দেখতে যান। শোনা যায়, মহেন্দ্রলাল রাত্রে নাকি কোন রোগী দেখতে যেতেন না।

হয়েছিল। যাদের গায়ে ঝলমল করছিল নীল রঙের অনেকগুলি পাথর। এই নীল পাথর দেখে বিস্ময়ে নিথর হলেন যাত্রীরা। অনেকগুলি পাথর সংগ্রহ করে তাঁরা খচ্চরের পিঠে চাপালেন। তারপর তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে এই পাথরগুলির বিনিময়ে লবণ কিনলেন। পাথরগুলি যে নীলা, তা জানতে অবশ্য অনেক সময় লেগেছিল। কিন্তু পাথরগুলির নীল রং সকলকে মুগ্ধ করে। কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে দুর্গম জানস্কার পর্বতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই নীলার খনিতে অনেক কষ্টে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। সেখানে অনেক সন্ধানের পর পেয়ে গেলাম নিবিড় নীল ইন্দ্রনীল মণি, যা দিয়ে হয়তো ইন্দ্রমণির হার তৈরী হতো।

আমার সংগ্রহ করা চুনি ও নীলা নিয়ে মোগক রুবি মাইন্‌সের এজেন্ট সাহেব শান-স্টেটের রাজবাড়ীতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি শুনলেন যে, চুনি ও নীলায় রাজ-কুমারীর আর প্রয়োজন নেই। রেঙ্গুনের একজন মার্কিন রত্নব্যবসায়ী কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রস্তুত চুনি ও নীলা রাজকুমারীকে উপহার দিয়েছেন। খনির চুনি ও নীলার চেয়ে তারা নাকি অনেক সুন্দর এবং সুলভ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মেনীতে এই জাতীয় চুনি ও নীলা নাকি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাদের রং, স্বচ্ছতা ও জৌলুস নাকি আসলকেও ছাপিয়ে যায়। কৃত্রিম চুনি ও নীলা দেখে রাজকুমারী নাকি মুগ্ধ হয়েছেন।

মোগকে ফিরে এসে এজেন্ট সাহেব আমার সংগ্রহ করা চুনি ও নীলাটি আমাকে দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, রাজকুমারী যখন গ্রহণ করেন নি, তখন এগুলি আমারি প্রাপ্য।

পাথর দুটি হাতে নিয়ে আমি যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করি। যা এতদিন আমার কাছে পরম মূল্যবান ছিল, তার আর কোন মূল্যই যেন রইল না আমার কাছে। মানুষের মূল্যবোধ যখন সর্বদাই বদলাচ্ছে, তখন চরম মূল্য কাউকেই দেব না ঠিক করলাম। চুনি ও নীলার টুকরো দুটি নদীর জলে ফেলে দিয়ে আমি মোগক ছেড়ে মিনবুতে এলাম।

মদ্যপান ও অপরাধপ্রবণতা

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের প্রায় সব দেশে মদ্যপান বহু ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। পরিমিত মাত্রায় পানীয়রূপে মদ্যপানের রেওয়াজ আধুনিক সমাজেও স্বীকৃত। চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ক্ষেত্রবিশেষে ভেষজ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে মদ্যের ব্যবহার সুপরিচিত। তবে অপরিমিত ও মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্তি জন্মায়, শারীরিক ও মানসিক নানারূপ ক্ষতি হয় এবং নানাপ্রকার নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় অপরাধের কারণ ঘটে।

অপরাধ ও মদ্যপান

যদি রক্তে মদ্যের মাত্রা শতকরা পাঁচ ভাগ থাকে, তবে তা মদ্যপায়ীর পক্ষে নিরাপদ-সীমা গণ্য করা হয়—এইরূপ মাপকাঠি বহুদেশে স্বীকৃত। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপানের নিরাপদ-সীমা শতকরা দশ ভাগ। সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক দিল্লী ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ পায়, রাত্রে মোটরচালকদের শতকরা চল্লিশ জন মদ্যপান করে। কিন্তু এই সমীক্ষায় মদ্যপানজনিত মত্ততা ও মদ্যপায়ীর রক্তে বর্তমান মদ্যের মাত্রার পারস্পরিক সম্পর্কের কোন উল্লেখ ছিল না।

পথ-দুর্ঘটনা বা অন্য কোন দণ্ডনীয় অপরাধ এবং মদ্যপানের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা, ভারতে এখনও সে বিষয়ে কোন উদ্যোগ বা সমীক্ষা করা হয়েছে বলে শোনা যায় নি। কেন্দ্রীয় জাহাজ ও চলাচল মন্ত্রক পথ-নিরাপত্তা বিষয়ে যে সমীক্ষকদল নিয়োগ করেন, 1972 সালে সেই দলের সমীক্ষায় প্রকাশ পায়, প্রচলিত মোটর ভেহিকিলস্ অ্যাক্টের 117 ধারার মত্ত অবস্থায় মোটর চালনার জন্যে শাস্তিদানের বিধান আছে সত্য, কিন্তু মদ্যপায়ীর রক্তে মদ্যের মাত্রা কতখানি থাকলে তা সহ্য-সীমা তথা নিরাপদ-সীমার মধ্যে হবে এবং সেই সীমা অতিক্রম করলে মত্ততার অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব, সে সব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। ফলে অভিযুক্ত মোটরচালক প্রকৃতপক্ষে মত্ত অবস্থায় মোটর চালিয়েছিল কিনা, তা বিচারকের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় না; বিচারককে শুধুমাত্র প্রচলিত নিয়মানুসারে মেডিক্যাল রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে হয়। যদি পাকস্থলী বা রক্তে মদ্যের অস্তিত্বের কথা মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ থাকে, তবে দুর্ঘটনা বা মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, মাত্র এই সব তথ্যের উপর বিচারককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই সব বিবেচনার পর উক্ত সমীক্ষকদল মদ্যপায়ীর রক্তে শতকরা পাঁচ ভাগ মদ্যের মাত্রা আইনতঃ নিরাপদ-সীমা স্থির করা এবং এই নিরাপদ-সীমা অতিক্রম হবার অভিযোগ প্রমাণিত হলে জরিমানা করবার সুপারিশ করেছিল।

নিরাপদ-সীমা অতিক্রান্ত হলে পথ-দুর্ঘটনার আশঙ্কা কতখানি হয়? সমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, মদ্যপানীয় রক্তে শতকরা পাঁচভাগ পর্যন্ত মদ্যের মাত্রা নিরাপদ ও তা ছাড়িয়ে গেলে আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। মাত্রা দশভাগ উঠলে বিপদাশঙ্কা ছয় থেকে সাত গুণ বেড়ে যায় এবং মাত্রা পনেরো ভাগ উঠলে বিপদাশঙ্কা চব্বিশ গুণ বেশী হয়ে যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় প্রকাশ, পৃথিবীজুড়ে যত পথ-দুর্ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে মদ্যপানজনিত মত্ততার কারণে অন্ততঃপক্ষে শতকরা 50 ভাগ ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রে এক সমীক্ষায় প্রকাশ, সে দেশে বছরে গড় 55,000 জন পথ-দুর্ঘটনায় মারা যায়—তার অর্ধেক ও সে দেশে যত নরহত্যা ঘটে, তার অর্ধেক মদ্যপানজনিত কারণে ঘটে, এবং যত আত্মহত্যা ঘটে, তার শতকরা পঁচিশজনের রক্তে মদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নরহত্যা ও ঘরভেঙ্গে ডাকাতির ক্ষেত্রে শতকরা ষাটটি অপরাধ মদ্যপানের সূত্রে ঘটতে লক্ষ্য করা গেছে। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ধারণা, 'ভোদকা'ই তিনেম বা শয়তান।

মদ্যপানের প্রভাব ও পরিণাম

মদ্যপান করলে তার কিছু অংশ পাকস্থলীতে শোষিত হয়, বাকী অংশ অন্ত্রের মধ্যে চলে যায় ও সেখান থেকে রক্তস্রোতে সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়। পাকস্থলীতে কিরূপ ও কতখানি খাদ্যবস্তু বর্তমান, পানীয়ের মধ্যে মদের মাত্রা, মদ্যপায়ী পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীব কিনা, তার শারীরিক গঠন, পুষ্টি, যকৃৎ ও পাকস্থলীর অবস্থা কেমন ইত্যাদি বিষয়ের উপর মদ্য কত দ্রুত শোষিত হয়, তার গতিবেগ নির্ভর করে।

খালিপেটে খেলে দ্রুত শোষিত হয়; আর একবার রক্তস্রোতে গিয়ে মিশলে দেহের সর্বত্র চালিত হয়ে যায় এবং প্রস্রাব ইত্যাদি তরল অংশে জলীয় অংশের হারাহারি মাত্রায় মদ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। পাকস্থলীতে মোটামুটি ঘণ্টায় 7 থেকে 10 গ্রাম মাত্রায় শতকরা 90 ভাগ মদ অক্সিজেন সহযোগে জারিত হয়ে যায় এবং বাকী অংশ প্রস্রাব, ঘাম, মুখের লালা ও মায়ের দুধের ভিতর গিয়ে হাজির হয়।

যাহোক, মদ্যপান ও অপরাধের মধ্যে অনেকখানি সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। মস্তিষ্কের নানা এলাকা জুড়ে নানাপ্রকার কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে। সবচেয়ে উন্নত ধরণের কাজকর্ম, যেমন—আচার-ব্যবহার, বিচার-বিবেচনা ও আত্ম-সমালোচনা নিয়ন্ত্রণের জন্যেও স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র সুনির্দিষ্ট আছে। যে মুহূর্তে মদ মস্তিষ্কে এসে পৌঁছয়, সেই মুহূর্তে এই সব নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের তৎপরতা দমে যায়। এই সব নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র সাধারণতঃ যে সব নিবারণমূলক কাজকর্ম করে, তাদের তৎপরতা মদের সংস্পর্শে বিশেষভাবে দমে যায়। তখন মদ্যপায়ী কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার ও ভাবাবেগ প্রকাশে সংযম হারিয়ে ফেলছে বলে বোধ করে। তখন আত্মপ্রত্যয় যেন বেড়ে যায়, কর্মের পরিণাম কি হবে না হবে, সে বিষয়ে কোনরূপ দুশ্চিন্তা থাকে না। মত্ততা যত বাড়তে থাকে, বোধশক্তি ও কুশলতাদ্যোতক চলাচল ক্ষমতা ততই বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাহত হতে থাকে। মদ্যপায়ী তখন অত্যন্ত পুলকিত বা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে অথবা উত্তেজনা বা বিরক্তির বশীভূত হতে পারে। কোন কোন প্রবল প্রবৃত্তি সংযম-শৃঙ্খল-মুক্ত হয়ে পড়ে এবং তার উপরই সব কিছু নির্ভর করে। তারপর সঞ্চালিকা ও বোধশক্তিসংক্রান্ত কোষসমূহ বিবশ হয়ে পড়ে; সমূহ কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে সংযত আচার-ব্যবহার করবার প্রবৃত্তি জন্মায়। সেই প্রবৃত্তি ব্যাহত হয়ে পড়ে; কথাবার্তা জড়িয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে এবং পা কেঁপে কেঁপে টলে পড়তে চায়। অবশেষে, শ্বাসপ্রণালী বিবশ হয়ে যায়, মদ্যপায়ী 'কোমা' বা বেহুঁশ অবস্থায় চলে যায় এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস হতে থাকে।

মোট কথা, মদ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক তৎপরতায় ক্রমশঃ নাক গলিয়ে মদ্যপায়ীর মানসিক অবস্থায় একটা অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়। সংক্ষেপে এই হলো মদ্যপানের কীর্তি। এরূপ অস্থায়ী অথচ পরিবর্তিত অবস্থায় পড়লে মদ্যপায়ী অপরাধপ্রবণ

হতে পারে ; পথ-দুর্ঘটনা এই সব অপরাধের মধ্যে অতি সাধারণ অপরাধ। মদ্যপান মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে চিরস্থায়ী ক্ষতিসাধন করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে নানারূপ বিকারও ঘটতে পারে।

মদ্যপানজনিত এই সব প্রতিক্রিয়া হ্রাস বা বৃদ্ধি মদ্যপায়ীর বয়স, ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, মদ্যপানের অভ্যাসের উপরও নির্ভরশীল। তাছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন সময়ানুসারে মদ্যপান মদ্যপায়ীর উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

রক্তে মদের মাত্রা ও সেই মাত্রায় কতভাগ মদ্যপায়ী কিরূপ প্রভাবিত হয়, তার গড়পড়তা ধারণা নীচের ছক থেকে লক্ষণীয় :

ছক

মদ্যের মাত্রা (প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে মিলিগ্র্যাম মদ্য) (1)	শতকরা কতজন মদ্যপায়ী কিরূপ প্রভাবিত হয় (2)
(1) 50-এর নীচে	(1) অতি অল্পসংখ্যক মদ্যপায়ীর মধ্যে মত্ততার লক্ষণ দেখা যায়। তবে প্রায় শতকরা 10 জন মদ্যপায়ীর মধ্যে নৈপুণ্যপূর্ণ কাজকর্ম করবার দক্ষতা হ্রাস পায়। কার্যক্ষেত্রে ধরা হয়, এই মাত্রায় মদ্যপায়ী সকলেই স্বাভাবিক আচরণবিশিষ্ট ছিল।
(2) 90 থেকে 120	(2) পরীক্ষাধীন মদ্যপায়ীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে মত্ততার লক্ষণ দেখা যায়।
(3) 150	(3) প্রায় শতকরা 47 জন মত্ত হয়েছিল।
(4) 200	(4) শতকরা 83 জনই মত্ত হয়েছিল।
(5) 250 থেকে 300	(5) শতকরা 90-95 জন মত্ত হয়েছিল।
(6) 400	(6) সকলেই 'কোমা'গ্রস্ত বা বেহুঁশ, অথবা প্রাক্-বেহুঁশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল।
(7) আনুমানিক 500	(7) মারাত্মক গণ্য করা হয়।

মদ্যপানের নিরাপদ-সীমা :

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পথ-দুর্ঘটনা সংক্রান্ত অপরাধ মদ্যপানজনিত অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম। নির্দিষ্ট নিরাপদ-সীমার উপর মদ্যপান করলে, চালকদের মোটর চালনা করতে নিষেধ করা হয়। দেশে দেশে এই নির্দিষ্ট নিরাপদ-সীমা ভিন্ন ভিন্ন ; নীচের চকে তা দেখানো হয়েছে :

ছক

দেশ	প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে মদ্যের মাত্রা
(1) যুক্তরাষ্ট্র	(1) 50 মিলিগ্র্যামের নীচে স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার 150 মিলিগ্র্যামের উপর—মত্ততা।
(2) বৃটেন	(2) 80 মিলিগ্র্যামের উপর—মত্ততা।
(3) ডেনমার্ক	(3) 100 মিলিগ্র্যামের উপর—মত্ততা।
(4) নরওয়ে	(4) 50 মিলিগ্র্যামের উপর—মত্ততা।
(5) সুইডেন	(5) 150 মিলিগ্র্যামের উপর—মত্ততা।

মদ্যপানের লক্ষণ নির্ণয়ের মাপকাঠি

কোন ব্যক্তি মদ্যপান করেছে কিনা, তা কি কি লক্ষণ থেকে বুঝা যায়। মোটামুটিভাবে, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার থেকে বুঝা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে আচার-ব্যবহার মদ্যপানের সঠিক লক্ষণ নয়। মানসিক বড় রকমের ধাক্কা খেলে বা মস্তিষ্কের মৃদু বিশৃঙ্খলা ঘটলে, সেরূপ ব্যক্তির আচার-ব্যবহার থেকে মনে হতে পারে, সে বুঝি মদ্যপান করেছে। পাইরোজোলোন ও পিরিমিডিন গোষ্ঠীর কোন কোন বেদনানাশক কতিপয় ভেষজ, ঘুম-পাড়ানী ও অবসাদক গোষ্ঠীর কোন কোন ভেষজ সেবনেও মদ্যের মত আচার-ব্যবহার করতে লক্ষ্য করা যায়।

তাছাড়া, সমসংখ্যক পানপাত্রপূর্ণ মদ্যপান করবার পরও কোন ব্যক্তিকে অপর আর কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী মত্ত আচার-ব্যবহার করতে লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং কোন ব্যক্তি মদ্যপান করেছে কিনা সে বিষয়ে সন্তোষজনক ধারণা করতে হলে রক্তে কি পরিমাণ মদ বর্তমান, এইরূপ বস্তু-নির্ভর মাপকাঠি স্থির করা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য প্রস্রাব এবং নির্গত নিঃশ্বাসেও মদের পরিমাণ নির্ণয় করে মদ্যপানের মাত্রা জানা যায়; তবে এই মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম নিখুঁৎ।

বোম্বে প্রোহিবিশন অ্যাক্ট (1949) আইনে মদ্যপান করেছে সন্দেহে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো বা তার রক্তে মদের শতকরা মাত্রা নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে।

অ্যাসেটাবুলারিয়া

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

অ্যাসেটাবুলারিয়া নামক সামুদ্রিক শ্যাওলা গত 40/45 বছর যাবৎ কোষ-বিজ্ঞানীদের কাছে অতি পরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত প্রজাতি অ্যাঃ. মেডিটেরানীয়া দেখতে অতি সুন্দর ধরণের সবুজ ব্যাঙের ছাতার মত। অতি সরু একটি দণ্ডের আগায় একটু মুক্তপৃষ্ঠ ছোট ছাতাটিকে delicate wine cup-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকে। 300 বছর আগেকার বইতেও এর সুন্দর ছবি ও বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু 45 বছর আগে বিজ্ঞানী Hämmerling প্রথম আবিষ্কার করেন যে, এটি একটি এককোষী উদ্ভিদ। তিন সেঃ মিঃ লম্বা একটি কোষ, শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে তাই নয়, সাধারণ কাঁচি দিয়ে কেটে নিউক্লিয়াস আলাদা করেও নেওয়া যায়। স্বভাবতঃই এই ব্যাপারে কোষ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হলো। আজ জীবন-বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রের পক্ষেই অবশ্যপাঠ্য এই অ্যাসেটাবুলারিয়ার বিবরণ। কিন্তু অ্যাসেটাবুলারিয়া যে কত বিরাট আকারের হতে পারে, তা এখনও অনেকেই জানেন না। দশ সেঃ মিঃ লম্বা একটি অ্যাসেটাবুলারিয়া জার্মেনীর এক Natural History Museum-এ রয়েছে এটা জেনেছি ক্রসেলসে অ্যাসেটাবুলারিয়ার গবেষকদের কাছে,—আমি নিজে এটা দেখি নি। কিছু দিন আগে Nature পত্রিকায় বেরিয়েছিল যে, জার্মান সাগর থেকে কুড়ি সেঃ মিঃ লম্বা এক ধরণের অ্যাসেটাবুলারিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। 1895 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লিনিয়ান সোসাইটির

*ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা

সোসাইটির পত্রিকায় Hermann একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা থেকে জানা যায়, বৃটিশ মিউজিয়ামে 25 সেঃ মিঃ লম্বা একটি অ্যাসেটাবুলারিয়া ছিল। এটি সংগ্রহ করা হয়েছিল এশিয়ার কোন সমুদ্র থেকে, তবে ঠিক কোথা থেকে, সে খবরটি এই প্রবন্ধে নেই। ভারত এবং সিংহল থেকেও দুটি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তবে এগুলি অ্যাঃ মেডিটেরানীয়ার চেয়েও ছোট।

অ্যাসেটাবুলারিয়ার সংরক্ষণ

সম্প্রতি ব্রুসেল্ থেকে কিছু অ্যাঃ মেডিটেরানীয়া সংগ্রহ করেছি। এগুলি দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র তীর থেকে নিয়ে এসে ব্রুসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার বায়োলজী বিভাগে নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রকৃতিতে যে কোষগুলি পাওয়া যায়, তার উপর inorganic salt-এর একটি শক্ত আবরণ থাকতে পারে, কিন্তু লেবোরেটরীতে যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়, তাতে কোষগুলি নরমই থাকে। আমার এখানে তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে (20° সেন্টিগ্রেড) চার মাসে 0·1 সেঃ মিঃ লম্বা কোষ 3-3·5 সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করেছে। এগুলি রাখা হয়েছে সমুদ্রের জল অটোক্লেভ করে, তার সঙ্গে আরও কিছু inorganic salt এবং earth extract মিশিয়ে তৈরী মিডিয়ামের মধ্যে। 1970 খৃষ্টাব্দে Sheppard একটি ফর্মুলা বের করেছেন সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে এই মিডিয়াম প্রস্তুত করবার জন্যে, কিন্তু এখনও অনেক লেবোরেটরীতেই সমুদ্রের জল এবং earth extract ব্যবহার করা হয়। সামুদ্রিক শ্যাওলা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে earth extract-এর ব্যবহার অনেক দিন থেকেই সুপ্রচলিত। এই এক্সট্রাক্টের মধ্যে অনেক organic compound ইত্যাদি থাকে। 8/10 দিন অন্তর অন্তর মিডিয়াম বদ্‌লাতে হয়। এছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে আলোর দিকে। লেবোরেটরীতে সাধারণ 12 ঘণ্টা আলোতে (1000-1500 লুক্স্) এবং 12 ঘণ্টা অন্ধকারে রাখা হয়। এই সব মাপজোখ না করেও কোষগুলির অবস্থা, বিশেষ করে সবুজ রং দেখে আলোর তীব্রতা এবং আলোকিত সময়ের পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে সহজেই কোষগুলিকে লেবোরেটরীতে বাঁচিয়ে রাখা যায়। 20° সেঃ তাপমাত্রাই লেবোরেটরীতে 'অপটিম্যাল' বলে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ এই তাপে কোষগুলি সবচেয়ে ভালভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু দক্ষিণ ফ্রান্সের সাগর-জল অনেক সময় এর চেয়ে বেশী উত্তপ্ত থাকে। সে হিসাবে আমাদের দেশে room temperature-এ অর্থাৎ 30° সেঃ তাপেও কোষগুলির সজীব থাকা উচিত।

নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজ্‌মের পারস্পরিক সম্বন্ধ

কোষ বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাইক্রোম্যানিপুলেটারের মত সূক্ষ্ম এবং দামী যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোষ থেকে নিউক্লিয়াস বাইরে নিয়ে এসে অন্য কোষে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু অ্যাসেটাবুলারিয়ার বেলায় অভিজ্ঞ লোক শুধু কাঁচি ও ফরসেপস্ নিয়ে খালি চোখেই একাজ করতে পারেন। অনভিজ্ঞ লোকও সহজেই কাঁচি দিয়ে গোড়ার দিকে (অর্থাৎ ছাতার বিপরীত দিকে) কেটে দিতে পারেন। এইরূপে একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস যুক্ত এবং একটি বিরাট নিউক্লিয়াসবিহীন অংশ পাওয়া যাবে। নিউক্লিয়াসবিহীন অংশও কয়েক সপ্তাহ বা একাধিক মাস ধরে থাকতে পারে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ছাতা জন্মাতে পারে।

বর্তমানে এই সব সমস্যা মলিকিউলার বায়োলজীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে। নিউক্লিয়াস থেকে খুবই দীর্ঘস্থায়ী বার্তাবহ আর. এন. এ (Messenger RNA) বেরিয়ে আসে সাইটোপ্লাজ্‌মে।

নিউক্লিয়াস কেটে বাদ দেবার পর এই আর. এন. এ. এর সাহায্যে কোষটি বৃদ্ধিলাভ করতে পারে।

নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে Hämmerling-এর পুরাতন কাজ এবং তার নূতন মূল্যায়ন কোষ-বিজ্ঞানীদের কাছে অতি সুপরিচিত। বর্তমান নিবন্ধে আর একটি দিকের কথা উল্লেখ করছি। 1953 খৃষ্টাব্দে Beth লক্ষ্য করেছিলেন নিউক্লিয়াসবিহীন কোষের আগা কেটে দিলে সেখান থেকে ছাতা জন্মায় আরও দ্রুত অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থাকলে কোষের বৃদ্ধি হয় আরও মন্থরগতিতে। 1955 সালে ব্রাশে (Brachet) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, নিউক্লিয়াসবিহীন কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণ নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের চেয়ে পরিমাণে বেশী। অতএব মনে হয়, নিউক্লিয়াস থেকে শুধু বার্তাবহ আর. এন. এ. নয়, এই আর. এন. এ-র ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যেও আর এক রকম 'বার্তা' সাইটোপ্লাজমে বেরিয়ে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজের গবেষণা থেকে জানতে পেরেছি যে, এক রকম sulphur-যুক্ত, প্রধানতঃ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ নিউক্লিয়াসের অবর্তমানে দুই-আড়াই গুণ বেশী পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়। কোষগুলিতে যখন প্রথম অতি ছোট আকারের ছাতা জন্মায়, সেই সময় এই 'নিয়ন্ত্রক বার্তা' নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে ঐ পদার্থের সংশ্লেষণ কমিয়ে দেয়। ছাতা জন্মাবার আগে নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং নিউক্লিয়াসবিহীন কোষে সংশ্লেষণ মাত্রার পার্থক্য দেখতে পাই নি।

বর্ষপঞ্জীর চরিত্র

অরূপরতন ভট্টাচার্য

যে পঞ্জিকা আমরা ব্যবহার করি, তা কতটা বিশুদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত?

গুণাগুণ বিচারের পূর্বে তাহলে তার মূল্যের দিকে লক্ষ্য করা দরকার। পঞ্জিকার প্রয়োজন কেন এবং সে আমাদের কি উদ্দেশ্য সাধন করে?

পঞ্জিকার দুটি উদ্দেশ্য। এক—পঞ্জিকা একটি বর্ষপঞ্জী, দিন, তারিখ এবং মাসের হিসাবযুক্ত এবং লৌকিক নানাবিধ কাজে এটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; অর্থাৎ তারিখ নির্দেশে এবং সময়ের বিচারে এটির অপরিহার্য ভূমিকা আছে, যা ভিন্ন কর্তব্যকর্ম অসম্পূর্ণ গণ্য হয়। দুই—বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তিথিনির্ভর। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যক্তিগত শুভকার্য এবং পূজাপার্বণ প্রভৃতি সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলির সময়কাল তিথি অবলম্বনে নির্ণীত হয়। পঞ্জিকায় সেগুলির উল্লেখ থাকে।

বর্তমানে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির সাধারণভাবে এই দুটি উদ্দেশ্য থাকলেও, মূলতঃ পঞ্জিকাগুলি হওয়া উচিত ঋতুনিষ্ঠ বর্ষপঞ্জী। প্রাচীন কালে তারকা-নির্ভর যে সময় বিভাজন পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে প্রচলন লাভ করেছিল—জীবনধারণের প্রয়োজনে ঋতু নির্ণয় ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। পঞ্জিকার প্রধান উপযোগিতা ছিল সেখানে। যে বর্ষ-মাসের দ্বারা কৃষিকার্য নির্ণয় করা সম্ভব, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতুর পূর্বাভাস দেওয়া যায়, উপযোগিতা হিসাবে সেই রকম বর্ষ গণনা পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে বাংলা পঞ্জিকা আমাদের হাতে হাতে ফেরে, তা ঋতুনিষ্ঠ বর্ষপঞ্জী নয়। কেন নয়?

আমাদের ভারতীয় পঞ্জিকা নিরয়ণ পঞ্জিকা। এই নিরয়ণ পঞ্জিকার অসুবিধা হলো এই যে, বছরের প্রথম মাসের সূচনার পূর্বেই ঋতু ভিত্তিক বর্ষসূচনা হচ্ছে।

এ কালে বৈশাখ মাসের সূচনা কখন? হয় 14ই এপ্রিল, না হয় 15ই এপ্রিল। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে এ সূচনা বিলম্বিত। যে ইংরেজী পঞ্জিকার ব্যবহার সর্বত্র নজরে আসে, সে পঞ্জিকা সায়ন, রবির গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে ভারতীয় পঞ্জিকা নিরয়ণ পদ্ধতিবিশিষ্ট। আমাদের বর্ষ সূচনা হওয়া উচিত মহাবিষুব সংক্রান্তির পর দিন থেকে। তাহলে ঋতু আরম্ভের সঙ্গে বর্ষ সূচনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়। অন্যথা ঋতুরা এগিয়ে আসে। গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয় গ্রীষ্মের পূর্বে। অন্য ঋতু সম্পর্কেও সেই কথা। কে না চায় গ্রীষ্মের ফল গ্রীষ্মেই আমাদের রসনা তৃপ্ত করুক, বর্ষার ফুল বর্ষাতেই ফুটুক, শীতের হাওয়ায় যে নাচন লাগে, সে যেন লাগে প্রকৃত শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে।

মহাবিষুব সংক্রান্তি 21শে মার্চ। তাহলে 22শে মার্চ সেই নির্ধারিত দিনটি। বিষুববৃত্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তের ছেদ বিন্দুতে সংক্রমণ। বিষুববৃত্ত equator এবং ক্রান্তিবৃত্ত ecliptic। সূর্য মহাকাশে পূর্বমুখী একটি নির্দিষ্ট গতিতে বৃত্তাকার পথে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। এই পথটিই ক্রান্তিবৃত্ত। ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুববৃত্তের ছেদবিন্দু দুটির একটিতে বাসন্ত বিষুব দিন অন্যটিতে শারদ বিষুব দিন। বাসন্ত বিষুব দিন 21শে মার্চ, শারদ বিষুব দিন 23শে সেপ্টেম্বর। এই দুটি দিনের সর্বত্র দিবামান এবং রাত্রিমান সমান। বর্ষ সূচনা হওয়া উচিত বাসন্ত বিষুব দিনের পর দিন 22শে মার্চ থেকে।

কিন্তু বছরের সূচনায় আজ পার্থক্য ঘটেছে এবং বিশুদ্ধিকরণের অভাবে সে পার্থক্য বেড়ে চলেছে। বর্তমানে গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষসূচনা 14 বা 15ই এপ্রিল। 22শে মার্চ থেকে 14/15ই এপ্রিলের পার্থক্য কম নয়।

কিন্তু এই পার্থক্যের কারণ কি? এবং কেন এই পার্থক্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে?

অয়নচলন বা precession of the equinoxes এর কারণ। এই অয়নচলনের জন্যে বসন্তকালে যে দিবসে দিবারাত্রির মান সমান হয়, ক্রমে তা 30শে চৈত্র বা বর্ষান্ত দিবসের পূর্বেই সংঘটিত হতে লাগলো। অয়নচলন পশ্চিম অভিমুখী, বার্ষিক পরিমাণ 50·2 সেকেণ্ড। তাহলে প্রতি বছরই ঋতুচক্রের সূচনা হয় ওই পরিমাণ সময় পূর্বে। এমনিতে এই পরিমাণ মারাত্মক নয়, কিন্তু 72 বছরে সে পরিমাণ 1 দিনের সমান।

ভারতীয় পঞ্জিকা সর্বশেষ পরিমার্জিত হয় আর্যভটের (জন্ম : 476 খৃষ্টাব্দ) সময়ে। আর্যভট যে পঞ্জিকা গ্রহণ করেন, তা ছিল নিরয়ণপদ্ধতিবিশিষ্ট—মেষ, বৃষ প্রভৃতি বারো রাশির ভ্রমণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে বর্ষসূচনা এবং ঋতুচক্রের প্রারম্ভের পার্থক্য আজ 72 বছরে 1 দিনের হিসাবে প্রায় 23 দিনে এসে পৌঁচেছে।

ভারতবর্ষে এই জাতীয় সৌরপঞ্জীর প্রচলন আছে পশ্চিম বাংলায়, আসামে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে এবং কেরলে। সৌরমাসের নামগুলিও সর্বত্র এক নয়। আমরা যে মাসটিকে বৈশাখ মাস নামে অভিহিত করি, দক্ষিণ ভারতে সেটাই চিত্তিরাই নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই সৌরপঞ্জীর প্রচলন নেই।

লৌকিক কার্যে দিন-তারিখ নির্ধারণে চান্দ্র পঞ্জীর ব্যবহার যে সব প্রদেশে, সেখানেও অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, অন্ধ্রে ও কর্ণাটকে এক ধরণের মার্গের প্রচলন আছে। সৌরমাসের মধ্যে যে অমাবস্যা হয়, তার পর দিন প্রতিপদ থেকে ওই মাস আরম্ভ হয়। সংশ্লিষ্ট সৌরমাসের নামে ওই মাসের নাম। অন্য প্রদেশে ওই চান্দ্রমাসই ব্যবহার করা হয় বটে,

কিন্তু এর আরম্ভ 15 দিন পূর্ববর্তী পূর্ণিমা থেকে। তাহলে ভারতবর্ষে তিন ধরণের দিনপঞ্জী গণনা-পদ্ধতির প্রচলন আছে। এক—সৌর, দুই—অমান্ত চান্দ্র, তিন: পূর্ণিমান্ত চান্দ্র।

ভারতীয় পঞ্জিকার ক্ষেত্রে আরও অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বছরের সুরুও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার। কোথাও সৌর বৈশাখ থেকে, কোথাও বা সৌর ভাদ্র থেকে বছর গণনা হয়। যে সব প্রদেশে চান্দ্রপঞ্জী প্রচলিত, সে সকল স্থানে কোথাও চান্দ্র চৈত্র থেকে। কোথাও চান্দ্র আষাঢ় থেকে। কোথাও চান্দ্র কার্তিক থেকে বছরের আরম্ভ হয়ে থাকে।

সৌরপঞ্জিকার ক্ষেত্রে সূচনার দিনটিতে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্য সাধারণভাবে 1 দিনের বা 2 দিনের। পূর্বে বলেছি, ভারতবর্ষে সৌরপঞ্জিকা প্রচলিত আছে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে। পশ্চিম বঙ্গে রবির সংক্রমণ অর্থাৎ এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন দিবসকে মাসের শেষ দিন বলে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে ওই দিনটি মাসের শেষ দিন নয়। সেখানে ওই দিনটি মাসের প্রথম দিন হিসাবে নির্দিষ্ট। আবার অঞ্চলবিশেষে সংক্রান্তির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা আছে। সৌরপঞ্জিকায় পশ্চিম বঙ্গে সংক্রান্তি দিবস যদি রাত 12টার পূর্বে হয়, তবে সেই দিনই সংক্রান্তি বা মাসান্ত। কিন্তু যদি রাত 12টার পরে হয়, তবে পরের দিনই সংক্রান্তি বা মাসান্ত। পশ্চিম বঙ্গে যেখানে মধ্যরাত্রের পূর্বাপর ভেদে সংক্রান্তি দিবস নির্ণীত হয়, উড়িষ্যায় সেইরকম সূর্যোদয়ের পূর্বাপর ভেদে সংক্রান্তি দিবসের গণনা হয়ে থাকে; আবার সেখানে সংক্রান্তি দিবসই মাসের প্রথম দিন।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গে একই সৌরপঞ্জীর ব্যবহার হলেও, এখানে দুরকমের পঞ্জিকার প্রচলন আছে। এক—দৃক্‌সিদ্ধ, দুই—প্রাচীনপন্থী। এই দু-ধরণের পঞ্জিকার প্রচলনের জন্যে এখানে অনেক সময়ে একই দিন দুটি ভিন্ন তারিখ দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে, লক্ষ্য করা যায়। এরকম বৈষম্য কদাচিৎ হয়, এমন কথা বলা যায় না, ফলে কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই বিস্তর অসুবিধা অনুভূত হয়। দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকায় রবির অবস্থান সূত্র আধুনিক পর্যবেক্ষণলব্ধ। অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী পঞ্জিকায় যে রবির অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তার সূত্র দেড় হাজার বছর আগেকার গবেষণালব্ধ। ফলে রবির অবস্থান নির্ণয়ে সামান্য প্রভেদ হলেই সংক্রান্তি দিবসে পার্থক্য ঘটে। সুতরাং দুই পঞ্জিকায় মাসের শেষ তারিখ ভিন্ন হয়। তখন পরবর্তী মাসের সূচনা-তেও হেরফের লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য প্রাচীন। তার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি আমাদের গর্বের বিষয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি প্রাচীনকালে উন্নত ভারতীয় চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে গবেষণালব্ধ উন্নততর এবং সূক্ষ্মতর ফল সে কারণে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে—এমন চিন্তা এবং মনোভাব সঙ্গত নয়। বৈদিক যুগে 366 দিনে বর্ষ ধরা হতো। আর্যভটের সময়ে সে পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। পর্যবেক্ষণজাত ফলে বর্ষমান 365 দিন 6 ঘণ্টা 12 মিনিট (মিনিট পর্যন্ত) বলে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বর্ষমান প্রায় 365 দিন 6 ঘণ্টা 9 মিনিট। পুরাতন মান অশুদ্ধ হলে তা বর্জন করা বিধেয় এবং আধুনিক সূক্ষ্মতর মান গ্রহণই অভিপ্রেত। কিন্তু প্রাচীনপন্থীর ক্ষেত্রে আজও তা অনুসৃত হয় নি। নিঃসন্দেহে এ দুর্ভাগ্যের কথা।

তিথি সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। হিন্দু-দের ধর্মকৃত্য নির্ণীত হয় তিথি অবলম্বন করে। ধর্মকৃত্যের সঙ্গে তিথির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তিথি কি ? চন্দ্র এবং সূর্যের অবস্থানের পার্থক্য

থেকেই তিথির গণনা হয়ে থাকে। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তনের ক্ষেত্রে চন্দ্র যে মুহূর্তে সূর্য থেকে 12 অংশ অগ্রসর হয়, সেই মুহূর্তেই প্রতিপদ তিথির পূর্ণতা ঘটে। এইভাবে 24 অংশ অগ্রসর হলে দ্বিতীয়া তিথি, 36 অংশে তৃতীয়া তিথিও অনুরূপভাবে অন্যান্য তিথিগুলি 12-র গুণতক হিসেবে নির্দিষ্ট। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ে যদি কোথাও অশুদ্ধির উদ্ভব হয়—তাহলে? তখন তিথির ক্ষেত্রেও পার্থক্য বা হেরফের পরিলক্ষিত হবে এবং তিথি গণনাতেও অশুদ্ধ ফল পাওয়া যাবে। দেড় হাজার বছর পূর্বেকার যে সব সূত্র অনুযায়ী প্রাচীনপন্থী পঞ্জিকার গণনা, সেই সূত্রগুলি অবলম্বনে এখন আর বিশুদ্ধ বা সূক্ষ্ম রবি ও চন্দ্রের অবস্থান পাওয়া সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে তিথি নক্ষত্রাদির সময় বিশুদ্ধ সময় থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্যুতির পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

পঞ্জিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্যের ফলে বর্তমানে ভারতবর্ষে পঞ্জিকা গণনা পদ্ধতি প্রায় 30 রকমের।

এই কারণে একটি সর্বভারতীয় পঞ্জিকা প্রচলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গত 70-80 বছরের পঞ্জিকার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পঞ্জিকা সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতেরা অবহিত হয়েছেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। ফলে অনেকগুলি পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্রাদির পরিশুদ্ধ মান পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সর্বভারতীয় প্রচেষ্টায় একটি বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় বর্ষপঞ্জী প্রণয়নের প্রয়োজন। না হলে লৌকিক ব্যবহারে যে পঞ্জিকা প্রদেশ হিসেবে আদর্শ, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমন্বয় সাধনের অভাবে তা জাতীয় বর্ষপঞ্জী হিসাবে গৃহীত হবার পক্ষে অনুপযুক্ত থেকে যায়।

জাতীয় বর্ষপঞ্জী প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হবার পরে এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ দেখা যায় আজ থেকে প্রায় 25 বছর পূর্বে 1952 খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে ভারতের জাতীয় সরকার এই দেশে বর্ষপঞ্জী গণনার ঐক্যবিধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁরা একটি পঞ্জিকা প্রণয়নের কথা চিন্তা করেন, যে পঞ্জিকাটি হবে বিজ্ঞানসম্মত, সর্বভারতীয় এবং সকলের গ্রহণযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ 1952 খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে একটি Calendar Reform Committee গঠন করেন। এর সভাপতি নির্বাচিত হন ডক্টর মেঘনাদ সাহা এবং সম্পাদক শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী। কমিটি বিবরণী পেশ করেন 1955 খৃষ্টাব্দে। বিবরণীতে একটি সর্বভারতীয় পঞ্জিকার প্রস্তাব পেশ করা হয়। এটি সর্বভারতীয় লৌকিক কার্যে ব্যবহারের উপযুক্ত। এই পঞ্জিকাটি সায়ন বা ঋতুনিষ্ঠ বর্ষভিত্তিক।

সর্বভারতীয় এই পঞ্জিকায় কোন্ অব্দ ব্যবহৃত হবে? কমিটি বলেন, শকাব্দ। এই পঞ্জিকায় বর্ষসূচনা 22শে মার্চ। প্রথম মাস চৈত্র, এটি 30 দিনযুক্ত। অতিবর্ষে 31 দিন। অতিবর্ষের সূচনা একদিন পূর্বে 21শে মার্চ। শকাব্দের 1882, 1886, 1890, 1894 প্রভৃতি বর্ষ অতিবর্ষরূপে গণ্য হবে। বৈশাখ মাস এই পঞ্জিকার দ্বিতীয় মাস। দ্বিতীয় মাস থেকে ষষ্ঠ মাস তার পর্যন্ত 31 দিন এবং সপ্তম মাস আশ্বিন থেকে শেষ মাস ফাল্গুন পর্যন্ত 30 দিন। এইভাবে সর্বভারতীয় পঞ্জিকার সঙ্গে ইংরেজী পঞ্জিকার একটি স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

আমাদের দেশের প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির পারস্পরিক অসামঞ্জস্যের জন্যে এবং ঋতুগুলির সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধের অভাবের জন্যে এতদিন পর্যন্ত ধর্মকৃত্যে এবং কৃষির প্রয়োজনে দিন ও তারিখযুক্ত কোন সার্থক বিধি প্রণয়ন সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আমাদের মাসের দিনগুলি ছিল অনির্দিষ্ট, তার

সূচনা এবং শেষের তারিখ ছিল প্রতি বছরই ভিন্ন ভিন্ন। ইংরেজী বর্ষপঞ্জী এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট একটি ধারা বহন করে। তার 'ত্রিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর' কিন্তু আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকার ক্ষেত্রে সে রকম কিছু বলবার উপায় ছিল না। জাতীয় পঞ্জিকায় বিবিধ অসুবিধাগুলি দূর করে একটি আদর্শ রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

জাতীয় পঞ্জিকা প্রবর্তনের তারিখ 1957 খৃষ্টাব্দের 22শে মার্চ, আজ থেকে 21 বছর পূর্বে। শকাব্দের হিসাবে এই তারিখ ছিল 1879 শকাব্দ, 1লা চৈত্র। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। আদর্শজাতীয় বর্ষপঞ্জীর উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় প্রচার এবং স্বীকৃতি লাভ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজও জনসাধারণের সঙ্গে তার তেমন কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।

পদার্থবিস্তায় বাস্তবতার বিভিন্ন দিক

মহাদেব দত্ত

বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার মতই পদার্থ-বিস্তাও বাহিরের জগতের বস্তুর কতকগুলি মূলগত ধর্ম (গুণাগুণ) লইয়া আলোচনা করে। এই আলোচনা করিবার জন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বাহিরের বস্তুর মূলগত গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে ও সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বাহিরের বস্তুর প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে তত্ত্ব গড়িয়া তোলে। স্বভাবতঃই এই তত্ত্ব যথাসম্ভব একদিকে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন ও তত্ত্ব গ্রথিত করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রভাবে ও অপরদিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাপজোখে বিশেষ পদ্ধতির নিরপেক্ষ হওয়া সর্বতোভাবে কাম্য। এই চেষ্টাই পদার্থবিস্তার বাস্তবতা আলোচনার সূত্রপাত। এই জন্ত পদার্থবিস্তার জ্ঞানতত্ত্বে বিভিন্ন যুগে (বিশেষ করিয়া যখনই কোন মৌলিক তত্ত্ব গ্রথিত করা হইয়াছে) বাস্তবতা নিরূপণের জন্ত সূত্র গ্রথিত হইয়াছে।

বর্তমান পদার্থবিস্তাকে সামগ্রিকভাবে গ্যালিলিও, নিউটনের তত্ত্বের উপর গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। নিউটন তাঁহার বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক আলোচনায় চারটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। এই চতুর্থ নিয়মে বলা হয় যে, বিজ্ঞানের আলোচনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে যাহার সমর্থন পাওয়া যায় না, এইরূপ কোন কল্পনার সাহায্য লওয়া উচিত নয়। ইহাই বাস্তবতা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাধারণ আলোচনায় 1916 সালে আইনস্টাইন এই নিয়মটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে নিউটন নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমর্থিত নয়—এইরূপ কল্পনা তাঁহার তত্ত্বে গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য এই ব্যাপারে বিস্তৃত বিশ্লেষণ বিজ্ঞানী ম্যাক করিয়াছিলেন। আইনস্টাইনও ম্যাকের ওই আলোচনা গ্রহণ করেন ও সনাতনী পদার্থবিস্তার (Classical physics) মূলগত তত্ত্বে পরিবর্তন করিয়া আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব গ্রথিত করেন। আবার পরে বোর (Bhor), হাইসেনবার্গ (Heissenberg), বোর্ণ (Born) নিউটনের উক্ত নিয়মটি আরও বিশ্লেষণ করিয়া কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনাবিস্তার মূলগত প্রয়োগ সমর্থন করেন।

অধুনা বিজ্ঞানের এই বাস্তবতা সম্বন্ধে নিয়ম সূত্রাকারে গ্রথিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

এই প্রণয়নার সময় তত্ত্বকে কিভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিমাপ করিবার পদ্ধতি নিরপেক্ষ করা যায়, সেই বিষয়েও বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। বিজ্ঞানে পরিমাপ করিবার পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে বাস্তবতার নিয়মটি সূত্রবদ্ধ করিতে হইবে, সেই বিষয়ে সতর্ক চেষ্টা চলিতেছে।

1916 সালে আইনস্টাইনের বিখ্যাত প্রবন্ধে সনাতনী পদার্থবিদ্যায় পরিমাপের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, এই পদ্ধতি মূলতঃ একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের কঠিন দণ্ড ও তাহার নানা গতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তত্ত্বকে বাস্তবরূপ দিতে গেলে ইহাকে কঠিন দ্রব্যের সর্বপ্রকার গতি-নিরপেক্ষ হইতে হইবে। বর্তমানে পদার্থবিদ্যার তত্ত্বে মূল সূত্রগুলিকে এইরূপে লেখা হইতেছে।

পদার্থবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতে দূরে অবস্থিত বস্তুগুলির দূরত্ব নিরূপণে চেষ্টা হইয়াছে এবং এই দূরত্ব নিরূপণে আলোক রশ্মি বা অনুরূপ বিকিরণের সাহায্য লইতে হয়। এই কারণে সনাতনী পদার্থবিদ্যার নতুন রূপ দিতে হয় এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং অপেক্ষিকতা তত্ত্বের আলোচনায় বাস্তবতা রাখিতে হইলে তত্ত্বের মূল সূত্রগুলিকে কঠিন দ্রব্যের নানা গতি ও আধার আলোক রশ্মি বা অনুরূপ বিকিরণের উপর নির্ভরশীল পরিমাপের পদ্ধতি-নিরপেক্ষ হওয়া চাই। এই বিষয়ে আগেই অনেক বিশ্লেষণ হইয়াছে, তবে মনে হয় আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যখন বৃহৎ আকারের বস্তুর মাপজোখ করা হয়, তখন সাধারণতঃ ধরা হয় বস্তুটির অবস্থা মাপজোখের উপর নির্ভরশীল নয়; কিন্তু যখন অণু, পরমাণু ও নানা মৌলিক কণা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মাপজোখ করা হয়, তখন মাপজোখের পদ্ধতি ক্ষুদ্র কণাগুলির অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এই সকল ক্ষেত্রে বাস্তবতার মূল নিয়ম কিরূপ লইতে হইবে, তাহার সূত্র গ্রথিত করিবার কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তবে এখনও কিছু আলোচনার সুযোগ আছে।

আবার যদি উক্ত ক্ষুদ্র কণাগুলির চেতনা থাকে, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাপজোখ পদ্ধতির সময় কণাগুলি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিবে, আবার বাহিরের প্রভাবে কিছু পরিবর্তন ঘটিবে। কাজেই এই সকল আলোচনা স্বভাবতঃই আরও জটিল। তবুও কোন কোন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। যাত্রা সুরু হইয়াছে মাত্র, ফলাফল এখনও অজানার ভবিষ্যতের গহ্বরে।

সুন্দরবনের বাঘ বাঁচানো একটি জাতীয় প্রয়াস*

কল্যাণ চক্রবর্তী

প্রকৃতি আপন খেয়ালে সদা ব্যস্ত রয়েছে নিত্য নব সৃষ্টির খেলায়। তার সব সৃষ্টির সেরা হচ্ছে 'প্রাণী'—আদিতে যা একান্তই বন্য—এমন কি, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানুষ—সে মানুষ পর্যন্ত। ক্রমে অভিযোজন আর বিবর্তনের পথ বেয়ে প্রাণী-মাত্রেরই ঘটে পরিবর্তন—দেহে, মনে, আচারে ও ব্যবহারে। এই পরিবর্তন যখন চরমে পৌঁছয়, তখনই আমরা তাকে বলি সংস্কৃতি—সভ্য যার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মানুষ

অথচ আশ্চর্য এই যে, আমরা অর্থাৎ মানুষেরা মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রতি মমত্বহীন অন্ততঃ ব্যাপকার্থে। প্রাণীকুলের মধ্যে যারা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বর্জন করে আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিতে পারলো, তাদের আমরা আশ্রয় দিলাম নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে; আর যারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখতে চাইলো—তাদের প্রতি হলাম নির্মম। এক চরম প্রতিপক্ষ ভেবে তাদের হননে হলাম মত্ত—ঘাতকের ভূমিকা পালন করে নিজেদের ভাবতে সুরু করলাম মহাবীর্যবান, যা সত্যই হাস্যকর। আমাদের সেই নির্বোধ খেলায় পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষিত হয়ে গেল কত জানা-অজানা প্রাণী—যাদের রূপের ছটা বিমুগ্ধ করতে পারতো রূপগ্রাহী রসপিপাসু জনকে। আমাদেরই নির্বোধ আচরণ আর অকারণ জিঘাংসায় লুপ্ত হতে বসেছিল সাহসিকতা, বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, সৌন্দর্য এবং এক গা-ছমছম করানো ভীতিমিশ্রিত শিহরণ জাগাবার মত প্রাণী—যাকে আমরা কেউ ডাকি শের, কেউ বলি ব্যাঘ্র কেউ বা বলি tiger এবং আরও কত নাম।

কিন্তু মনুষ্য সমাজে অকারণ হত্যাকারী আর নির্বোধদের কথাই শেষ কথা নয়। সমাজের যাঁরা 'দেব চেতনায়' সমৃদ্ধ অংশ, সংখ্যায় যদিও তাঁরা কম—তাঁরা সুন্দরকে রক্ষা করতে সর্বদাই বদ্ধপরিকর; বদ্ধপরিকর সৃষ্টির মধ্যে সাম্যের ভিত্তিকে বজায় রাখতে। তাদেরই আকুতিতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে হলেও অব্যাহত গতি অনুভূত হতে থাকে এবং অবশেষে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ' শব্দটি একটি আন্তর্জাতিক রূপ পায়—যে আন্তর্জাতিক রূপেরই বাস্তব রূপায়ণ ঘটলো ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ জাতীয় কর্তব্যরূপে ঘোষিত হবার মধ্য দিয়ে। এই ঘোষণারই সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবায়ন 'Project Tiger' বা 'ব্যাঘ্র প্রকল্প'।

ব্যাঘ্র প্রকল্প কি এবং কেন, তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠেই সুন্দরতম রূপে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: 'Project Tiger abounds in irony. The country that has for millennia been the most famous haunt of this great animal now finds itself struggling to save it from extinction. The project is a comment on our long neglect of our environment as well as our new-found but most welcome concern for saving one of nature's most magnificent endowments for posterity……'

প্রকৃতির এ এক অত্যাশ্চর্য মহিমামণ্ডিত

---

* সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প।

দানকে তার নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবার সুষ্ঠু বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিরই নাম রাখা হলো 'ব্যাঘ্র প্রকল্প'।

সুন্দরবন ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্ত আটটি স্থানে এই ব্যাঘ্র প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। স্থানগুলি হচ্ছে আসামের মানস, বিহারের পালামৌ, উড়িষ্যার সিমলিপাল, উত্তরপ্রদেশের করবেট, রাজস্থানের রনথম্বোর, মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা, মহারাষ্ট্রের মেলঘাট ও কর্ণাটকের বন্দীপুর।

জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘ বিশ্ব মানচিত্রে সুন্দরবনকে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। জীব-বিজ্ঞানরূপ পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে এই ব্যাঘ্রপ্রাণী। তাই এই প্রাণীর সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংরক্ষণের প্রথম ও প্রধান উপজীব্য হচ্ছে—এই প্রাণী যে সকল অন্যান্য প্রাণী বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল, তাদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ। অর্থাৎ বন ও বন্য প্রাণী নিয়ে গড়ে ওঠা বিরাট ও সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ নিহিত আছে। তিনটি মৌলিক উপাদান, যা ব্যাঘ্রকুলকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অপরিহার্য অর্থাৎ যথেষ্ট আশ্রয়স্থল, যথেষ্ট শিকার-প্রাণী ও যথেষ্ট অলবণাক্ত জল। প্রথম দুটির অবশ্য সুন্দরবনে অভাব নেই, কিন্তু শেষোক্তটির অভাব প্রকট। তাই এ প্রকল্প অঞ্চলে এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া চলছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডক্টর হিউবার্ট হেনড্রিকের গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সুন্দরবন বাঘের মানুষখেকো অভ্যাস ও ভয়াভহতার সঙ্গে জলের লবণাক্ত ভাগ ও জোয়ারের জলের ওঠানামার একটি ধনাত্মক, স্পষ্ট ও নিশ্চিত সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এই সকল তথ্য আরও গবেষণা ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হলে সুন্দরবন বিশ্বের কাছে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে আর জনসাধারণ সে সম্ভাবনার সুফল গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে সুন্দরবনের থেমে থাকা অর্থনীতিতে গতি সৃষ্টি হবে—পর্যটন বা অন্যান্য সৃষ্টিধর্মী কর্মকাণ্ডের মধ্যে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহারের পথ খুঁজে পেলে জাতীয় জীবনে তা হবে এক অভূতপূর্ব আশীর্বাদ।

কিন্তু সুন্দরবনের দুর্গম জল জঙ্গলের এই বিরাট সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্য নির্ভর করছে জনসাধারণের সহযোগিতার উপরে, কারণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথায়:

'Project Tiger is a national endeavour. It can succeed only with the full co-operation of the Central and State Governments and the support of the people......'

আমি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর এই উদাত্ত প্রত্যাশার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পরিকল্পনা

জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

অসমাপ্ত 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা' প্রণয়নের পর 1948 থেকে 1974-75 সনের মধ্যে আমি গোটা চার-পাঁচ সাধারণভাবে প্রবন্ধ লিখেছি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে। তাতে অনেক কথা লিখেছি, অনেক রকম আর্জি পেশ করেছি। কোন ফল হয় নি। তথাচ ইদানীং কালে কিছু কিছু আলোচনা-প্রবন্ধ ও বিষয়ানুযায়ী পরিভাষার তালিকা প্রকাশিত হতে দেখেছি। বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানও বেরিয়েছে। কিন্তু এদের ব্যবহার কোন প্রবন্ধ বা পাঠ্যপুস্তক লেখকেরা করেছেন কিনা তার সাক্ষ্য পাই নি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পরিকল্পনা যে কত শক্ত, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। নিয়ম করে যে পারিভাষিক শব্দ মনোনীত বা তৈরী করা যায় না, সে কথা আমি বহু পূর্বে লিখেছি। যুক্তিতর্কজাল বিস্তার করে যে সিদ্ধান্ত করা যায়। তাও যে কেউ মেনে নিয়েছেন—এ দৃষ্টান্ত দেখি না।

পরিভাষা সম্বন্ধে বহু পত্র-পত্রিকা ঘেঁটেছি এবং বিষয়ানুযায়ী একটা প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী আমার 'সংকলন' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। আশা ছিল যে, কেউ হয়তো কোন দিন এর সদ্ব্যবহার করবেন। কেউ করেন নি, মনে হয় ভবিষ্যতেও কেউ করবেন না। বুঝতে পারছি কারণ অনেক। সে কারণগুলি বিশ্লেষণ করেও যে ফললাভ হবে, এমন সম্ভাবনা কম।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরিভাষার অভাবে বাংলায় অনুবাদ বিজ্ঞান গড়ে উঠে নি। তবু বলা যায় যে, ভাবার্থ ও অনূদিত শব্দের মিশ্রণে বহু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

বিজ্ঞানে এখন পাঠ্যপুস্তক রচনা হচ্ছে প্রচুর। একই বিষয়ের পুস্তকে একই শব্দের বিভিন্ন পারিভাষিকের পরিবেষণে পরিভাষা পূর্বের চেয়ে অধিকতর জটিল হয়ে উঠছে। তার কারণ লেখকদের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারে অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অনেকের ধারণা এরূপ ব্যবহারে যোগ্যতম শব্দের আপনা হতেই টিঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একথা সাহিত্য পরিষদের পারিভাষিক সমিতির যুগে (1301-1320) শোনা গিয়েছিল, এখনও তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় oxygen ও hydrogen-এর পরিভাষা অম্লযান ও উদযানের আবির্ভাব ও তিরোভাব বিস্ময়কর না হলেও কৌতুকাবহ। হঠাৎ যে হয়েছে তাও নয়, খুব খানিকটা রগড়ে বিগড়ে দেওয়ার পর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন চালু হয়েছে। আরেকটি শব্দ নার্ভের কথা উল্লেখ করছি। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী nerve অর্থে স্নায়ু অকাট্য যুক্তিতে sinew-র পরিভাষা বলে পরিগণিত হলেও অপ্রতিহত প্রভাবে আবহমান-কাল বাংলা ভাষায় চলে আসছে। অথচ স্নায়ু-দৌর্বল্য বা স্নায়ুবিকার ঘটলে প্রতিষেধক ওষুধ হিসাবে 'নার্ভভিগর' 'নার্ভটনিক' 'নার্ভিয়ল' শব্দ ব্যবহার করতে বাধছে না। ভাষা গতিশীল, পরিপাক শক্তিও কম নয়। সুতরাং স্নায়ুর প্রতি নির্দয় চিরনির্বাসনদণ্ড প্রয়োগের সময় এখনও অতীত হয়ে যায় নি।

নারীত্বের ধ্রুব অনুশাসন অবহেলা করে তাবার সতীত্ব বজায় রাখবার জন্যে অনন্তবিত্তশালী সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়াম

চর্চা করে বাংলা পরিভাষা তৈরী করা যায়। এতে হিতে বিপরীত না হলেও পারিভাষিক মুখোচ্চার্য শব্দগুলি, তা যে ভাষারই হোক না কেন, মাঠে মারা যায়, অপঘাত মৃত্যু ঘটে। cell-কে সেল না করে 'কোষ', kidney-কে কিডনী না করে 'বৃক্ক' atom-কে অ্যাটম না করে 'পরমাণু' করে চালালেই ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করা হবে বলে অনেকের বিশ্বাস; পরন্তু, এগুলিকে চেয়ার, টেবিলের মতো ভাষায় হজম করে নিলে বিজ্ঞান বাংলা ভাষাকে সুপ্রসন্ন নয়নে দেখবে। দেখবে যে মানুষ সতীত্বের চেয়ে নারীত্বের পূজারী বেশী।

আর তা ছাড়া, দাঁতভাঙা, মাথাভাঙা শব্দ নিয়ে বিজ্ঞানে আমাদের কারবার। সেগুলির প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। সেগুলিকে আজ না হয় কাল গ্রহণ করতেই হবে, তবেই তো বিজ্ঞানে 'রথ দেখা কলা বেচা' সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানে অনূদিত পারিভাষিক প্রতিশব্দ যে থাকবে না এমন কথা বলি না। সেগুলি হবে ভাষার পুষ্টিসাধনে সংস্কৃতি ও রুচির কষ্টিপাথর। আমি একাজে চার রকমের পরিভাষা হতে পারে বলে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। কারও সমর্থন পাই নি বলে মনে করি তা অগ্রাহ্য হয়েছে। আরও যা প্রস্তাব করেছিলাম, তা আলোচ্য, এখানে তার পুনরুল্লেখ করলাম না।

সম্প্রতি 'দেশ' সাপ্তাহিকে (17ই জুলাই, 1976 পৃ: 827-831) সমরজিৎ কর বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে পরিভাষার পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করেছেন বলে আনন্দিত এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে প্রবৃত্ত হলাম বলে দুঃখিত। তাঁকে ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থাপন করবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনতার বিজ্ঞান

আশিস সিংহ

শারীর-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ভাবতে গেলে আমার মনে পড়ে ভেসালিয়াসের সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথা। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ এই ভেসালিয়াস পরীক্ষাভিত্তিক জীব-বিজ্ঞানের অন্যতম স্থপতিও ইনি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্যালেন বলে গিয়েছিলেন, হৃৎপিণ্ডের বাম ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যবর্তী পেশীনির্মিত বিভাজক প্রাচীরের গায়ে আছে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য ছিদ্র, সেগুলির মধ্যে দিয়ে রক্ত দক্ষিণ ভাগ থেকে বাম ভাগে যায়। হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে পণ্ডিতেরা একথা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম যিনি স্পষ্ট ভাষায় এই ভুল উক্তির বিরোধিতা করেন—তিনি ভেসালিয়াস। এই তরুণ বিজ্ঞানী সেদিন বিদ্রোহ করে বলেছিলেন ও অনেকটা এই রকম—আমি তো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেও বাদের দেখতে পেলাম না গ্যালেনের সেই আনুমানিক ছিদ্রগুলির অস্তিত্ব! আমার সন্দেহ নেই। রক্তকে যদি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ থেকে বামে প্রবাহিত হতেই হয়, তবে তার যাওয়ার অন্য কোন পথ নিশ্চয়ই আছে।

আজকের সবাই মানবেন, ভেসালিয়াসের এই উক্তির মধ্যে যে পরীক্ষানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। জীব-বিজ্ঞানকে আকাশকুসুমের কাল্পনিক

থেকে এইভাবে সেদিন মুক্ত করে এনেছিলেন তিনি, প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন সাধারণ বুদ্ধিগম্য আমাদের সহজাত জগতে। বিজ্ঞান, তথা যে কোন মানবিক সংস্কৃতি, যখন অতিলৌকিকের অনুমানকে পরিহার করে সাধারণ বুদ্ধি তথা পরীক্ষানির্ভর হয়ে ওঠে, তখনই তা জনসাধারণের প্রকৃত সম্পদে পরিণত হয়। পণ্ডিতেরা বলেছেন, এটিই হলো ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অবদান। আর জীববিজ্ঞানে এই অবদানের বীজ বপন করেছিলেন ভেসালিয়াস।

পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদরত ভেসালিয়াস

প্রারম্ভে যে ছবিটির কথা বলেছি, সেটি সম্ভবতঃ স্থূলভাবে, রেনেসাঁসের কিছুটা অবদানকে প্রমাণ করেছে। ছবির ঘটনাস্থল পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে আছেন শবব্যবচ্ছেদরত ভেসালিয়াস, তাঁর চারপাশে ভিড় করে আছেন সাধারণ মানুষের জনতা; এমন কি, দোতলাতেও দু-একটি মুখ দেখা যাচ্ছে। 'জনতা' কথাটি এখানে সচেতনভাবেই আমি ব্যবহার করলাম। কেন না টেবিলের নীচে দুই ব্যক্তিতে বোধ হয় দেনা-পাওনার কথা হচ্ছে, তখন সময়টা ছিল এমন যাতে যাবতীয় নতুন কথাকে এই জনতার পরীক্ষায় পাসমার্ক পেতেই হয়েছে। হাজার বছরের বিশ্বাসের আয়েসী আশ্রয়কে এক কথায় কেউ কখনও ছেড়ে দেয় না। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত পরীক্ষা পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিরও নানা ত্রুটি ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এটি কোন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিই ছিল না। কিন্তু এমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার একটি ঐতিহাসিক সুফল ফলেছিল এই যে, যে কথাগুলি শেষাবধি পাসমার্ক পেয়েছিল, সেগুলি তখন থেকেই জনসাধারণের সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয়েছিল। এই সব নতুন কথাবার্তা কিছু দিনের মধ্যেই সমাজমননে একসঙ্গে দানা বেঁধে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তথা নতুন নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিল এবং এর পর থেকে নানাবিধ স্বার্থবুদ্ধির ক্রমাগত আক্রমণ থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলো জনসাধারণই।

এই শেষ উক্তিটি হয়তো কোন কোন মহলে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাওয়ার স্থান এটি নয়। আমাদের বক্তব্যের জন্যে বর্তমানে তার কোন প্রয়োজনও নেই। বরং এখানে দৃষ্টিপাত করা যাক বিলাতের Nature পত্রিকার শতবার্ষিকী সংখ্যার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে। 'Is it safe to look back' শীর্ষক ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গত শতবর্ষের বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার সাফল্যের খতিয়ান প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে—"বিজ্ঞান রচনা আজকাল ক্রমে আগের চেয়ে দুর্বোধ্যতর হয়ে উঠেছে।"

...প্রসঙ্গতঃ এই প্রশ্নও তোলা উচিত যে, কোন নবাবিষ্কৃত বিষয় যদি কেবল দক্ষ পারদর্শী বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে বৃহত্তর

তাৎপর্যে তাকে আবিষ্কার বলা চলে কি?...... আবিষ্কার একমাত্র তখনই তার যথার্থ মূল্য পায়, যখন তা অন্যান্য ব্যক্তিদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে।

—Nature (1লা নভেম্বর, 1969 সংখ্যা, পৃঃ 420)

এই ক্ষোভকাতর বাস্তব মন্তব্যটিকে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে স্মরণে রেখেও আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, রেনেসাঁসের বেশ পরেও—বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতি সমাজের তাৎক্ষণিক অ্যালার্জী অপনোদিত হয়ে বিজ্ঞান যখন জনমননে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার পরেও—পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কল্পকাহিনী, ছড়া, কবিতা প্রভৃতি রচনা এবং হাতে-কলমে বিবিধ ছোটখাট কর্মের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানকে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক অধিকারে ব্যাপ্ত করে দেবার প্রচেষ্টা সর্বদা সক্রিয় হয়ে আছে। প্রসঙ্গতঃ এবার আমাদের দেশের প্রাসঙ্গিক অবস্থার কিঞ্চিৎ সারসংক্ষেপ করা যাক।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুষঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবেশের প্রথম দিকে মিশনারী সাহেব এবং বিভিন্ন ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙালী মনীষী দেশীয় ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সাধারণের অধিকারে ছড়িয়ে দেবার জন্যে কলম ধরেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কালে একদিন এই আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা নানান দেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করেই পল্লবিত হয়ে উঠবে। এই প্রত্যাশা আজও তেমন ফলপ্রসূ হতে পারে নি। সুরু থেকেই এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন ও পরিচালনে পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রায় অন্ধতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই 'ইমিটেশন বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'ইমিটেশন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'-গুলির সঙ্গে চারপাশের সমাজের কোন দিনই কোন সজীব সংযোগ স্থাপিত হয় নি। সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা তথা সমাজের দৈনন্দিন কিংবা গুরুতর প্রয়োজন—সব কিছুর দিকেই ঐরূপ ইমিটেশনের দৃষ্টি বরাবর উদাসীন ছিল।

ফলতঃ ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকে বিজ্ঞানের সজীব চর্চার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে মিলনক্ষেত্র রচনা করেছিল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষমতাই কোন দিন সঞ্জাত হয় নি। ভেসালিয়াসের সেই ছবিটির অনুরূপ কোন দৃশ্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কখনও কি দেখা গেছে? বিদেশী শাসকের মতলবসম্পৃক্ত আনুকূল্যে বিজ্ঞানকে আমাদের দেশে জনতার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন, আমাদের বিজ্ঞানচর্চার গড়নে মূর্তিমন্ত হয় নি। অথচ সবচেয়ে পরিতাপ এবং পরিহাসের বিষয় হলো এই যে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজের হৃত জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বস্তু এবং যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকেরাও এই প্রয়োজনটির কথা বুঝেছিলেন। অর্থাৎ রোগ এবং ঔষধ উভয়ের চরিত্র সম্যক অনুধাবনের পরেও কেবল প্রয়োগ-পদ্ধতির ত্রুটির জন্যে ঔষধটি শেষাবধি নিষ্ফল হয়েছে।

আর শুধু এই নিষ্ফলতাতেই সর্বনাশের শেষ হয় নি। সামান্য খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, আধুনিক বিজ্ঞানের আগম সত্ত্বেও আমাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দেশীয় চর্চা যা অবশিষ্ট ছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের আগমনের অল্প দিনের মধ্যেই তাও গেল শুকিয়ে। বস্ত্রশিল্পের বিলোপের ঘটনা রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত বলে সকলেরই জানা। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'বিজ্ঞানের ইতিহাসে' এই সময়ে আমাদের গৌরবময় ইস্পাত শিল্পের অবনতির দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (1ম

সং, 1958, পৃঃ 98) দেখা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেও খোদ বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রে একটি সেতু নির্মাণের জন্যে ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহারের সুপারিশ করছেন ইংরেজ কারিগরবৃন্দ। তারপরে এক-শ' বছরও তো অতিক্রান্ত হয় নি। ইস্পাত শিল্পে আমাদের বর্তমান দৈন্যের কাহিনী কি ফেনিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে? এসব ঘটনার সার সংক্ষেপ করলে একটি মাত্র সরল সত্যই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে—সেটি হলো, আধুনিক বিজ্ঞান ভারতীয় সমাজে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার উৎখাত করে হৃত জীবনীশক্তির পুনঃসঞ্চারে বিফল তো হয়েছেই, অধিকন্তু যেটুকু স্বকীয়তা সেদিনও আমাদের অবশিষ্ট ছিল, তার অবনতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং এইভাবে সমগ্র সমাজকে একটি ছাঁচে ঢালা 'ইমিটেশন সমাজে' পরিণত করবার চেষ্টা করেছে।

এমনটি কেন হলো? যদি বলি, এর একমাত্র কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান এদেশে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয় নি, তাহলে সম্ভবতঃ সমর্থকের অভাব হবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের অব্যবহিত পূর্বের দিকপাল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানের সামাজিক মূল্যায়নে হাত দেওয়া যাক। একথা তো মানতেই হবে যে, আমাদের জমিতে এমন দিকপাল প্রতিভার স্ফুরণ মাত্র দুই পুরুষেই নিঃশেষ! যে-অপরিশীলিত জনগণ কোন দেশের যাবতীয় পরিশীলনের চিরায়ত ধাত্রী, তাদের ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে ফেলে রাখলে এমনটি হতে বাধ্য। কেন না, সর্বদেশে সর্বকালে নিত্য নতুন প্রতিভার যোগান অব্যাহত রাখবার দায়িত্ব এই ধাত্রীভূমির উপরেই স্বাভাবিকভাবে বর্তায়। আবার কেবল প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাই নয়, বিজ্ঞান চর্চার অতি প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক পরিমণ্ডল রচনা করে এই ধাত্রীভূমিই। আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের যন্ত্রনির্মাণ প্রচেষ্টার কথা ভাবা যাক। তিনি তাঁর অতি পরিশীলিত বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞান কর্মের জন্যে প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি নিজ তত্ত্বাবধানে দেশী কারিগরদের দ্বারাই প্রস্তুত করিয়ে নিতেন। এটি আমাদের দেশে ছিল একটি চমৎকার সূচনা। কোন দেশের বিজ্ঞান-চর্চার অনুষঙ্গে যন্ত্রশিল্প যদি সমান তালে গড়ে না ওঠে, তবে অচিরাৎ পিছুটান পড়ে মূল চর্চার উপরেই। অধুনা এই পিছুটান ক্রমশঃ আমরা বুঝতে পারছি। অথচ সুরুতে সূত্রপাতটি কত বিজ্ঞানসম্মত ছিল! এই প্রসঙ্গে এসে আমার মনে পড়ে গ্যালিলিও আর তার চশমা বিক্রেতা বন্ধুটির মিথোজীবী (Symbiotic) সম্পর্কের কথা। এই বন্ধুটি গ্যালিলিওর দূরবীণের জন্যে লেন্স তৈরী করে দিতেন। যন্ত্রনির্মাতার সঙ্গে বিজ্ঞানীর এইরূপ মিথোজীবিতা বিজ্ঞানচর্চায় অতি প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান আমাদের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক অধিকারে ব্যাপ্ত হয় নি বলেই জগদীশচন্দ্র যা আরম্ভ করেছিলেন, শেষ অবধি তা শুভফলপ্রদ হয় নি।

এবং এহ বাহ্য! মননশীল ব্যক্তিরা জানেন, দুটি অব্যবহিত অনুচ্ছেদে যা বললাম, তাতে অতি অল্পই বলা হলো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতা যে কোন পরিশীলনকর্মকে লক্ষ্য এবং মাত্রা থেকে বিচ্যুত করে। এই ত্রুটি থেকে তাকে একমাত্র রক্ষা করতে পারে পারিপার্শ্বিক সমাজের সঙ্গে ব্যাপকতর সংযোগ। জীবন এবং তাবৎ জৈবকর্মে যে নমনীয়তা স্বাভাবিক, পরিশীলন কর্মে সেই নমনীয়তা সঞ্চারের দ্বারা এই সংযোগ পরিশীলনকর্মকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত এবং সজীব করে। গোড়া থেকেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা সমাজ সম্পর্ক বঞ্চিত হওয়ায় সমাজ যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিজ্ঞানচর্চা তা থেকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। আজও কোন সামাজিক লক্ষ্যমুখী বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যই সৃষ্টি হয় নি আমাদের।

প্রসঙ্গান্তরে মনে পড়ছে বার্লিন-শিক্ষ অধ্যাপক স্লো-রচিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের কথা। The U. S. is the world leader শীর্ষক এই প্রবন্ধে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-চর্চায় সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার শীর্ষস্থান অধিকারের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গত শতাব্দী থেকে বেশীরভাগ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রধানতঃ জার্মান প্রভাবে গোড়া থেকেই বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে (অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের মত ছাত্র-শিক্ষণকেন্দ্র হিসাবে নয়) গড়ে উঠেছে এবং এই সব কেন্দ্রে আদি প্রবণতা ছিল ফলিত বা সমাজপ্রয়োজনমুখী বিজ্ঞানের গবেষণায়; দ্বিতীয়তঃ গত বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীবাদের নর্তন-কুর্দনে ইউরোপের নানাদেশ থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষী একই সঙ্গে আমেরিকায় এসে ডেরা বাঁধেন এবং আমেরিকান সমাজের সঙ্গে অচিরে খাপ খাইয়ে নিতেও এঁরা সমর্থ হন এবং তৃতীয়তঃ এই সব আগন্তুক প্রতিভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ধীরে ধীরে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এমন অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, যাতে এখন যে-কোন ছোট শহরে অবস্থিত একটি কলেজেও সাধারণ বিজ্ঞান-গবেষকের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়। সুরুতে যে-সব কলেজের পত্তন হয়েছিল মুখ্যতঃ ফলিত বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে, পরে সেখানেও শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা ব্যাহত হয় নি। একদিকে যেমন সমাজ প্রয়োজনমুখী বিজ্ঞানগবেষণার প্রবণতা সে দেশে শুদ্ধ (Pure) ও ফলিত—উভয় বিজ্ঞানকে সঞ্জীবিত করেছে, তেমনি আর একদিকে কলেজে কলেজে বিজ্ঞানগবেষণা বহুধা ব্যাপক হয়ে দেশে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানকর্মের উপযুক্ত একটি মজবুত পটভূমি রচনা করেছে। এই পদ্ধতিতেই আমেরিকা আজ পৌঁচেছে শীর্ষস্থানে।

আর আমরা? ঐতিহাসিক বা বর্তমান—বিজ্ঞানচর্চার কোন গণ্য পটভূমিকাই আমাদের নেই। চারপাশের নিজস্ব সমাজের সঙ্গে আজ আমাদের বিজ্ঞানীদের কর্মের যোগ তো নেইই—এমন কি, মননেরও নয়। আমরা জানি, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, রামন—এঁদের সকলেরই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ ছিল অতি নিবিড়। কিন্তু আজকের কয়জন ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মী ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারকরূপে গণনীয়? যদি তা না হন, তবে কোন্ আদর্শ তাঁরা ধারণ করছেন, যা আত্মস্বার্থের অতীত, যা মহাপরিসর? রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই অনবদ্য কলিটি আমার মনে আসছে:

> সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই
> কেবল কাজে
> বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে।

আমাদের যাবতীয় বিজ্ঞানকর্মের মূল সুরটি কি? প্রসঙ্গতঃ এখানে আরও একটি কলি উদ্ধার করা যেতে পারে।

> পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়,
> পাছে ছিন্নতারের জয় হয়।

আমার বিবেচনায়, আমাদের যাবতীয় বিজ্ঞানকর্মে আজ এই 'ছিন্নতারের' দৌরাত্ম্য!

এই জন্যেই উঁচু সরকারী মহল থেকে যদিও বা মাঝেমধ্যে সমাজমুখী বিজ্ঞান পলিসির কথা বলা হয়, বিজ্ঞানকর্মীদের অন্তরে তা কোন নবীন অর্থ বহন করে না, কেবল কথার কথা হয়েই থাকে। যে-সমাজ মুখ্যতঃ আমাদের অপরিচিত, যে-সমাজে দৈবাৎ আমরা জন্মেছি মাত্র, কিন্তু মনন অথবা কর্মের দ্বারা যাকে আমরা সম্যক-ভাবে অধিকার করি নি এবং যাকে অধিকার ব্যতিরেকেই আমাদের দিনগত পাপক্ষয়ে তাৎ-ক্ষণিক কোন বাধা দেখা দেয় না, তাকে পুরা-পুরি পাশে সরিয়ে রেখেই আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞানকর্ম এগিয়ে চলেছে। 'পাপ' কথাটি এখানে আমি সচেতনভাবেই ব্যবহার করলাম।

যে-পঙ্কিল পরিবেশে আমাদের বিজ্ঞানচর্চা চলে আর কোন অভিধায় তাকে চিহ্নিত করবো? কাজে ফাঁকি, ব্যক্তিগত স্বার্থের তাড়নায় দলাদলি এবং নানান অন্যায় অপরাধ সম্পাদন, ভয়ে অথবা লোভে অন্যায়ের প্রতিবাদে অনীহা, এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' ('বলাকা'র 37তম কবিতা, প্রথম পংক্তি—দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন?) —তা আমাদের লেবোরেটরীর বিজ্ঞান-জগতে এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা অতএব এই জগৎ থেকে বেরিয়ে কোন ব্যক্তি যদি দেশী-বিদেশী সমাজবিরোধী স্বার্থের কাছে ক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হন, তাহলে বিস্ময় কি যুক্তিসঙ্গত হবে? হলডেন একদা 'শিক্ষার ক্যাপিটালিজ্ম্' নামক একটি ধারণার উল্লেখ করেছিলেন। আমার বিবেচনায়, বিজ্ঞান-জগতের এবম্বিধ মালিন্যের উৎসে আছে 'বিজ্ঞানের ক্যাপিটালিজ্ম্।' অর্থ-নৈতিক ক্যাপিটালিজ্মে অর্থ যেমন কিছু ব্যক্তির সামাজিক প্রতিপত্তির হাতিয়ার এবং নানাবিধ সামাজিক নোংরামীর উৎপাদক, আমাদের দেশে বিজ্ঞানও তেমনি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে একই সামাজিক ভূমিকা পালন করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের চিরায়ত মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব, আধুনিক বিজ্ঞান যার অপসারণে ব্যর্থ হয়েছে বলে আগেই উল্লেখ করেছি।

ক্যাপিটালিজ্ম্ সমাজদেহে যে-বিষ সঞ্চর করে, তার প্রতিষেধকরূপে সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা দেন সমাজ-বিজ্ঞানীরা। এই কথাটি আমি মানি এবং এও মানি যে, সমাজতন্ত্র কেবল সমবন্টনমাত্র নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ এটি। 'বিজ্ঞানের ক্যাপি-টালিজ্ম্' থেকে উদ্ভূত বিষের প্রতিষেধনের জন্যে 'বিজ্ঞানের সমাজতন্ত্র'ই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রথমাঙ্গে বিজ্ঞানের সমবণ্টন এবং দ্বিতীয়াঙ্গের কাজ হবে বিজ্ঞাননির্ভর জীবনবোধ গঠনের দ্বারা সমাজের সাংস্কৃতিক বনিয়াদের আধুনিকী-করণ।

কাজটি এখনই আমরা এইভাবে সুরু করতে পারি। উঁচু মহলে বিজ্ঞান-পলিসিকে সমাজমুখী করবার পাশাপাশি প্রত্যেক বিজ্ঞানকর্মীর ক্ষেত্রে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় এবং কিছু সময়ের জন্যে সমাজসংযোগ আবশ্যিক করা হোক। এই সমাজসংযোগ কেবল কোন বিজ্ঞানবিষয়ের বক্তৃতাদানে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, অবশ্যই দেখতে হবে, দৈনন্দিন জীবন এবং মননের সমস্যা-সমাধানে বিজ্ঞানের ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়াই যেন বিজ্ঞানকর্মীদের এই সমাজ-সংযোগের মূল লক্ষ্য হয়। কিভাবে কৃষি জমির মাটি পরীক্ষা করতে হয়, বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগের পদ্ধতি কি, ধানের উৎপাদনে ঘাটতি হলে গম এবং আর কি কি খেয়ে আমরা স্বাস্থ্যের হানি না ঘটিয়ে খাদ্যসমস্যার মোকাবিলা করতে পারি, খেসারি ডালকে নির্বিষ করা যায় কি ভাবে, সৌর শক্তির বিবিধ ব্যবহারকে সুলভ করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে, গরুর গাড়ী, নৌকা প্রভৃতি গ্রামীণ যানবাহনের উন্নতিসাধন, অল্প খরচে গৃহনির্মাণ, পানীয় জল সমস্যার সমাধান, জলে ডোবাসহ অন্যান্য আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিকার—এমনি হাজারো বিষয়ের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক সমাধানের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা একদিকে যেমন আমাদের জনসাধারণকে আধুনিক বিজ্ঞানে দীক্ষিত করবেন ঠিক তেমনি খনার বচন, লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতি ও অন্যান্য কারিগরী জ্ঞান—এই সব লোকবিজ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ ও তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবেন। আমি হলডেনের দেখাদেখি কিছু সহজ কিন্তু পরিশীলিত বিজ্ঞানকর্মও জনসাধারণকে দিয়ে করাবার পক্ষ-পাতী। হলডেন একবার ইংল্যাণ্ডের খনি শ্রমিক-দের দিয়ে কয়লাখনি থেকে দুটি দুষ্প্রাপ্য জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী সেদিন তাঁর

এ-কাজের সমালোচনা করেছিলেন। জবাবে 'শিক্ষার ক্যাপিটালিস্ট' অভিধাটি হলডেন উচ্চারণ করেছিলেন এই সমালোচকদের প্রসঙ্গেই। এভাবে হাতে-কলমে বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে এগোলে জনসাধারণের বিজ্ঞানশিক্ষা যে সম্পূর্ণতর হবে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। পুষ্টিসমীক্ষা, খাদ্যসমীক্ষা, তরুলতা, পশুপক্ষীর সমীক্ষার সঠিক পদ্ধতি সাধারণ মানুষকে শিখিয়ে নেওয়া তেমন কঠিন নয়। বিজ্ঞানকর্মীরা নেতৃত্ব দিলে একাজের দায়িত্ব অনায়াসে সাধারণের হাতে দেওয়া যায়। এমন কি, আমাদের এই প্রাচীন দেশের মঠ, মন্দির, শুশুনিয়া প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রাদির বৈজ্ঞানিক প্রহরার দায়িত্বও দেওয়া যেতে পারে জনসাধারণেরই হাতে।

এই প্রস্তাবের সম্ভাব্য সমালোচকদের সঙ্গে আমি একমত যে, কোন অঞ্চলের জনমণ্ডলীর সমগ্রকে হয়তো' আমরা সক্রিয়ভাবে এখনই ঈদৃশ বিজ্ঞানকর্মের অংশীদার করতে পারবো না। আমার কিন্তু মনে হয়, যতজনকে পাওয়া যাবে, তাতেই লাভ। আমরা তো দেখেছি আমাদের দেশে, বছর পঁচিশেক আগেও, এক এক তল্লাটের সজীব সাংস্কৃতিক জীবন বিধৃত ছিল যাত্রা, বাউল বা কীর্তনের ছোট ছোট গোষ্ঠীর কর্মধারায়। তারও আগে দেখা মিলত কবিয়াল আর কথকঠাকুরদের। একজন কবিয়াল বা কথকঠাকুরের দ্বারা লোক-শিক্ষার স্বেচ্ছিক সঞ্চার ঘটতো এক একটি বিরাট জনপদে। অবস্থাটা বিজ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শেষ অবধি যদি তাই হয়, তবু সে অবস্থাটা অবশ্যই হবে এখনকার চেয়ে ভাল। সকলকে পেলে তো ভালই, প্রতি অঞ্চলে অন্ততঃ যদি গুটিকয় এমন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যাঁরা বিজ্ঞানে জীবনযাপন করবেন তাহলে তাঁদের কর্মধারায় প্রতি অঞ্চলে আমরা সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করতে পারবো, যা সমাজভিত্তের কাঙ্ক্ষিত বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের চালকশক্তির জন্ম দেবে। ঈদৃশ পরিবর্তনের অভিলাষ অনেক দিন ধরেই অনেকের ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। এর জন্যে আর কোন বিকল্প পন্থা আমার আপাততঃ চোখে পড়ছে না।

পথে বেরোলেই আজকাল ছোটবড় নানাবিধ জমিদার চোখে পড়ে। গদীতে, দপ্তরে, ট্রামে, বাসে, পথে যাঁরা সহচর অবস্থাবিশেষে তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন জমিদার। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক একটি স্থায়ী ইমিটেশন এঁরা প্রত্যেকে। কারণে অকারণে কুণ্ডলী পাকিয়ে এঁরা ফণা তোলেন। ঘরের টান, পরের টান, মাটির টান সব টান ছাড়িয়ে সমাজের নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবনের মত এঁরা তখন মুখর। এই গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, অসংযত অসুন্দর জনপিণ্ডই আমাদের জনতার বর্তমান রূপ।

একটু ভেবে দেখলেই স্বীকার করবো, এই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব আজ কমবেশী আমাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে সক্রিয়। এই কারণে বিজ্ঞান প্রচারের কাজে একটি ভয়ও আছে। নবীন বিজ্ঞানের নবলব্ধ অধিকার কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মনে উক্ত মধ্যযুগীয় মনোভাবটিকে উস্‌কে দিতেও পারে। বিজ্ঞানের সমবন্টনে উদ্যোগী হয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতেই হবে যেন তা না হয়। অন্যথায় আমাদের তাবৎ উদ্যোগ পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে এবং আমরা বিজ্ঞান নয়, বর্তমান বিজ্ঞান জগতের অসুস্থ পরিবেশটিকেই চারদিকে ছড়িয়ে দেব মাত্র।

প্রতিবিধানকল্পে কেউ কেউ হয়তো এখানে এসে সর্বহারা সংস্কৃতির কথা বলবেন। কিছু দিন পূর্বে আমিও সম্ভবতঃ সর্বহারা মনস্বিতার কথাই বলতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি ঈশোপনিষদ পড়েছি; ফলে রক্তের অভ্যন্তরে আমার মনে পড়েছে যে আমি ভারতীয়; এবং যে মানুষেরা চিরপথিক, অভ্যস্ত আয়েস থেকে মানবসমাজকে বারবার যাঁরা মুক্ত করেছেন 'চরৈবেতি' মন্ত্র

উচ্চারণে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেছেন 'সীমানা ভাঙার দল' (দ্র-শ্যামলী গ্রন্থের 'চিরযাত্রী' কবিতা), তাঁদের সর্বহারা বলে মেনে নেওয়া আমার ঐতিহ্যের অনুপন্থী নয়। নিজস্ব অধিকারে বিত্তবান হয়েও যে মানুষ লোভের দ্বারা ভোগ করেন না, অন্তর্নিহিত কোন আদর্শ অথবা তার প্রতীক কোন পুরুষের প্রতিভূরূপে নির্মোক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন জীবনকে, কর্ম করতে করতেই যিনি জীবনযাপন করতে চান, পরশ্রমজীবী হতে যিনি আগ্রহী নন, এবং একদিকে বিশুদ্ধ বিদ্যা আর অন্যদিকে অবিদ্যা তথা কায়িক শ্রম ও কারিগরী জ্ঞান—কোনটির প্রতিই যিনি উন্নাসিক নন (দ্র. ঈশোপনিষদ 1ম, 2য় ও 11শ শ্লোক), কোন সর্বহারা নয়, একমাত্র সেই বিত্তবানই আত্মস্বার্থের অতীত বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির সঞ্চার করতে পারেন সমাজে। বৈদান্তিক দর্শনের আশ্রয়ে একদা আমাদের সমাজে এই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল; এই মনোভাবের ফসল রূপে সেদিন একদিকে লোকায়ত অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করে ডাকের বচন, খনার বচন পাওয়া গিয়েছিল, অন্যদিকে উন্নতি ঘটেছিল প্রধানতঃ নানাবিধ ফলিত বিজ্ঞানের। প্রবন্ধের শিরোনামে 'জনতা' বলতে আমি প্রভু কর্ণওয়ালিসের বাছাদের বোঝাই নি, এমনতর মানুষের সমাবেশ বোঝাতে চেয়েছি, যাঁরা সর্বহারা নন, বিত্তবান কিন্তু লালসার দ্বারা কোন বস্তুকে অধিকারে যাঁরা অনাগ্রহী, যাঁরা বিদ্যা ও অবিদ্যাকে এবং প্রকাশলোক ও তার আদিগত মহাসম্ভাবনাময় তমিস্রলোককে সমজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় (দ্র. ঈশোপনিষদ—9ম থেকে 14শ শ্লোক), এবং ফলে যে দুঃসাহসী পথিকবৃন্দ এক বন্ধুপথে নিত্যই সমবেত আর প্রস্তুত রয়েছেন বিজ্ঞানসহ সমূহ সংস্কৃতি ও সমাজের রথটিকে আলোকময় সুনিশ্চিত বর্তমান থেকে বারবার অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে টেনে নেবার জন্যে।

সেই অন্ধকার যার ছায়াকন্দরে মৃত্যু এবং অমৃত সমভাবে সন্নিবিষ্ট: যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রজনন-বিজ্ঞানের ভূমিকা

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

প্রজনন-বিজ্ঞান জীব-বিজ্ঞানের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা। মানুষের বংশগত রোগের নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্যে বর্তমানে এই বিজ্ঞানের প্রয়োগ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুরু হয়েছে। যাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্প খবরাখবর রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, আধুনিক চিকিৎসায় কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পরিবেশগত রোগকে অনেক পরিমাণে বশে আনা হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে দুরারোগ্য বংশগত রোগকে তেমন আনা সম্ভব হয় নি বরং তার প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে। সুতরাং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে বংশগত রোগের প্রতিকার ও প্রতিবিধান করা যে প্রয়োজন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বংশগত রোগ নির্ণয় করবার পদ্ধতি

যখন কোন রোগী দুরারোগ্য রোগ নিয়ে ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে আসেন, তখন চিকিৎসকদের কর্তব্য রোগীর নিকট থেকে জেনে নেওয়া যে, তার কোন আত্মীয়স্বজন ঐ ধরণের রোগে ভুগেছেন কি না। যদি কেউ ভুগে থাকেন, তাহলে তিনি রোগটিকে বংশগত সন্দেহ করে সতর্ক ও সচেতন হবেন। আগের থেকে সতর্ক হলে রোগকে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে সুবিধা হয় এবং তার আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসক রোগীর পরিবারের বংশলতিকা (Pedigree) রচনা করে এবং তা পর্যালোচনা করে রোগের বংশানুক্রমিক ধারা জানতে পারেন। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা অথবা মাতা যদি রোগগ্রস্ত থাকেন এবং বংশলতিকার প্রতি পর্যায়ে (Generation) কোন না কোন সন্তানে রোগটি আত্মপ্রকাশ করে, অথবা যদি পুরুষেরা কোন রোগে বেশী আক্রান্ত হয় এবং তা বংশলতিকায় এক পর্যায় অন্তর আবির্ভূত হতে দেখা যায় অথবা দম্পতির কোন সন্তানে হঠাৎ কোন বংশগত রোগ বা বিরূপ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়, চিকিৎসক তখন এই ধরণের বংশগত রোগের উত্তরাধিকার সূত্র সহজে নিরূপণ করতে পারেন। যদি তিনি জানতে পারেন যে, রোগীর পিতামাতা নিকট আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, তখন স্বভাবতঃ বংশগত রোগের আবির্ভাব সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ করতে পারেন। রোগীর বংশইতিহাস ও তার পূর্বপুরুষের মধ্যে অন্য জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে কি না, চিকিৎসক তা জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিলে তার পক্ষে রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করতে সুবিধা হয়। রক্তস্বল্পতা যদি আদিবাসীর সঙ্গে রক্তসম্পর্ক থাকে, তখন রোগকে সিক্‌ল্-সেল অ্যানিমিয়া বলে সন্দেহ করা যেতে পারে; কেননা আমাদের দেশে এই রোগের কারণ সাধারণতঃ তাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। অনুরূপভাবে যদি আগের থেকে জানা যায় যে, রোগী কোন কালে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাহলে চিকিৎসক পরিব্যক্তিকে (Mutation) রোগের একটি কারণ বলে অনুমান করতে পারেন।

মানুষের দেহকোষের কেন্দ্রে যে ক্রোমোসোম থাকে, তার স্বাভাবিক সংখ্যায় ও আকৃতিতে কোনরকম গণ্ডগোল হলে, নানারকম রোগ ও বৈশিষ্ট্যের অভ্যুদয় ঘটে। গত দুই দশকে

---

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন—

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা এবং প্রকাশন উপসমিতির সভ্যবৃন্দ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'সত্যেন্দ্র ভবন'

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6, ফোন : 55-0660

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কিছু পূর্বতন সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে। উপযুক্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রিকা সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের নিকট অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

"সত্যেন্দ্র ভবন"

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ফোন: 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞপ্তি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (ফোন : 55-0660) কলিকাতা-6। ইতি—

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]
[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	পূর্ণপৃষ্ঠা	অর্ধপৃষ্ঠা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট	150·00 টাকা	80·00 টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদপট	150·00 টাকা	80·00 টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদপট	200·00 টাকা	—
দ্বিতীয় প্রচ্ছদপটমুখী পৃষ্ঠা	120·00 টাকা	65·00 টাকা
পঠনীয় বিষয়বস্তুমুখী পৃষ্ঠা	120·00 টাকা	65·00 টাকা
বিষয়-সূচীর নিম্নে	—	75·00 টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	.01000টাকা	55·00 টাকা
প্রথম প্রচ্ছদপট সিকিপৃষ্ঠা	100·00 টাকা	
সাধারণ সিকিপৃষ্ঠা	30·00 টাকা	

বিজ্ঞাপনের এই হার কেবলমাত্র এক রঙের জন্য। বার্ষিক এবং যাণ্মাসিক চুক্তিবদ্ধ হলে যথাক্রমে শতকরা $7\frac{1}{2}\%$ এবং শতকরা 5% রিবেট দেওয়া হয়।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন : 55-0660

বিজ্ঞপ্তি

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন

পরিষদ সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগতির জন্য পরিষদ চলাকালীন পরিষদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন হাজরা ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে দপ্তরের প্রবীণ কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামসুন্দর দে ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলালচন্দ্র সাহার সহিত উক্ত বিভাগ চলাকালীন আলাপআলোচনা করিতে পারিবেন। অবশ্য পত্রাদি কর্মসচিবকে যথাবিধি পাঠানো যাইবে; তাঁহার সহিত পূর্বে যোগাযোগ করিয়া পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা করিতে পারিবেন। পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই বিষয়ে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে। ইতি

তাং 27.11.76
'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
ফোন : 55-0660

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।

3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্ত বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা:—প্রধান সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ফোন—55-0660।
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিমাপ, ওজন মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণতঃ চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' পুস্তক সমালোচনার জন্তে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের নিকট আবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করবার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। একারণে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ, বিশেষতঃ লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের রচিত কিংবা প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তকাদি এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-কে দান করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন।

আগামী জানুয়ারী, 1977 থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করবার চেষ্টা চলছে। এই বিভাগে নবম শ্রেণী থেকে সুরু করে বি. এস. সি. (পাশ ও অনার্স কোর্স), এম. এস. সি., কারিগরী, মেডিকেল প্রভৃতি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে নতুন, এমনকি বাড়ীতে অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকাদি দান করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পুস্তকাদি প্রেরণ করবার ঠিকানা :

"সত্যেন্দ্র ভবন"
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ | ডিসেম্বর, 1976 | দ্বাদশ সংখ্যা

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চা

প্রথমে সাধারণভাবে আলোচনা করা যাক যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1974-1979) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বিকাশের (Development) বা উন্নতির জন্যে কি পেয়েছে। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দেড় বছর গত হওয়ার মুখে ইউ. জি. সি. (U. G. C.—University Grants Commission—বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান সংস্থা) সেপ্টেম্বর 1975-এর দ্বিতীয়ার্ধে এক পরিদর্শক দল বা কমিটি (Visiting Committee) পাঠিয়েছিলেন, এই পরিকল্পনা কালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের প্রস্তাবগুলির মূল্যায়ন করে ইউ. জি. সি-র. কাছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন (Report) দেবার জন্যে। এই পরিদর্শক দলের আহ্বায়ক (Convener) ছিলেন স্বর্গত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের পুত্র অধ্যাপক গোপাল এবং এই দলে ছিলেন সচিবসমেত মোট আঠারো জন (—অবশ্য এখানে এই সংখ্যাটির কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই)। এর আগে গণি কমিটির (Ghani Committee) প্রতিবেদন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে, ইউ. জি. সি. এবার বিকাশের জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দরাজ হাতে অনুদান দেবেন এবং তদনুরূপ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন দশ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্যে। অবশ্য তার পরে ইউ. জি. সি. তাঁদের জানিয়ে দেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় তিন কোটি টাকার বেশী অনুদান পাবেন না—এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। তাই এবার সমস্ত উচ্চাশা ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা ক্ষুদ্র আকারের প্রস্তাব দিলেন ওই আর্থিক সীমার একটু উপরে—এর মধ্যে এবারও সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়েন্সেসের (Satyendranath Bose Institute of Physical Sciences) জন্যে অনুদানের প্রস্তাবটিও রইলো (—বিশ্ববিদ্যালয়ের

সিণ্ডিকেটে ফেব্রুয়ারী, 1974-এ গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে এই ইনষ্টিটিউটটি স্থাপিত হয়)। পরিদর্শক দলের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে ইউ. জি. সি. যে অনুদান মঞ্জুর করেছেন, তা ওই আর্থিক সীমার অনেক নীচে—উপদেশ দিয়েছেন প্রচুর—এবিষয়ে কোন কার্পণ্য নেই এবং দোষত্রুটি দেখিয়েছেন বেশ কিছু। সবই সুচিন্তিত বলে ধরে নিতে হবে, কেন না, এই সব সিদ্ধান্তে আসতে ইউ. জি. সি-র. সময় লেগেছে পরিদর্শনের পরে প্রায় দশ চান্দ্র মাস—যাই হোক, অন্ততঃ যে কোন স্তরে ছাত্রসংখ্যায় ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তো। পরিদর্শক দলের মন্তব্যাদি যা ইউ. জি. সি. বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠিয়েছেন, তাতে (প্রতিবেদনের 6·12 অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে যে গণি-কমিটির সুপারিশমত এই বিশ্ববিদ্যালয়জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান (Institution of national importance) বলে গণ্য হবে কিনা, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিবেচিত হবার পূর্বে এর চরিত্র সর্বভারতীয় ও জাতীয় হওয়া প্রয়োজন —শিক্ষক মণ্ডলীর নিয়োগে ও ছাত্র ভর্তি করবার ব্যাপারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' (Open door policy) অবলম্বন করা উচিত এবং দেশের সকল অংশ থেকে মেধাবী শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্র আকৃষ্ট করা উচিত। এই মন্তব্যটি মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়—শিক্ষক নিয়োগে বা ছাত্র ভর্তি করাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন 'রুদ্ধদ্বার নীতি' (Closed door policy) নেই। আর মেধাবী শিক্ষক আকৃষ্ট করবার কথায় ওই প্রতিবেদনের 6·23 অনুচ্ছেদে যে কলকাতার মত বড় শহরে বাসস্থানের সমস্যা একটা খুব বড় সমস্যা—শিক্ষকদের বাসস্থানের অভাবই বোধ হয় এই বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার বাইরে থেকে মেধা (Talent) আকর্ষণ করতে পারছে না। এই অভাবের একটা ক্ষুদ্র অংশ পূরণের জন্যে একটি ছোট অনুদানের সুপারিশও ওই প্রতিবেদনে আছে। অবশ্য জানা নেই, সজ্ঞানে বা ভ্রমবশতঃ পরিদর্শক দল এর মেধাবী শিক্ষক আকর্ষণের পথে আর একটি আর্থিক অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করেন নি। সেটা হলো যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভাতার হার (যা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভাতার হারের সমান —রাজ্য সরকারের নির্দেশে) কলকাতায় বা কলকাতার বাইরে অবস্থিত বহু উচ্চশিক্ষা / গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতার হার থেকে অনেক কম এবং এটাও বাইরে থেকে মেধাবী শিক্ষকদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার পক্ষে একটি অন্তরায় (অবশ্য একথা বলতেই হবে কচিৎ কদাচিৎ দু-একজন অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন)। শোনা যায় তদানীন্তন উপাচার্য মহাশয় এই বিষয়েও পরিদর্শক দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হলে এই অন্তরায়টি থাকতো না। আর একটি ত্রুটি পরিদর্শক দলের নজরে পড়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, তাই কোন কোন বিভাগ অন্তর্জননের (Inbreeding) দোষে দুষ্ট। তাঁরা বোধ হয় জানেন যে, বিদেশেও উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে এমন বিশেষ বিষয়ের উচ্চমানের চর্চা হয়, যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই উচ্চমানে চর্চা হয় না, সেখানেও এমনটি ঘটে থাকে—তাতে শিক্ষার / গবেষণার মানের অবনতি হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই বিদেশে বা স্বদেশে অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার / গবেষণার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়াই যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হবার পথে বাধা হয়, তবে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে মেধাবী ছাত্র এনে তাদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রশিক্ষণ (Training) দেবার পর

বিদায় করে দিতে হবে সুযোগ্য হলেও। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ জ্ঞানার্জনের (Specialization) যত সুবিধা আছে, অনেক জায়গায়ই তা নেই। সুযোগ্য মেধাবী ছাত্র বিশেষজ্ঞ হয়ে যদি সে তার বিষয়ে কাজ করবার সুবিধা না পায়, তবে সে বিদেশে পাড়ি দেবার চেষ্টা করবে এবং সফলও হবে। গত কয়েক বছর এখানকার শিক্ষা-জগতে যে অশান্তি চলেছিল তাতে বাইরের মেধাবী ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা দূরের কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু স্নাতক এদেশেই অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেছে শান্ত পরিবেশে উচ্চশিক্ষার জন্যে। এই অশান্তির জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করা চলে কি?

এবার বিশেষভাবে বিজ্ঞান বিভাগগুলির সম্পর্কে যা অনুদান পাওয়া গেছে এবং প্রতিবেদনে যা মন্তব্যাদি আছে, সেদিকে একটু নজর দেওয়া যাক। পরিদর্শক দল সাধারণভাবে স্থানাভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং কয়েকটি বিভাগে তীব্র স্থানাভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (আর বালীগঞ্জে বিজ্ঞান কলেজস্থিত একটি বিভাগে যে স্থানের প্রাচুর্য আছে, তাও উল্লেখ করেছেন) এবং এই বিষয়ে কিছু কিছু পরামর্শও দিয়েছেন এবং অনুদানের সুপারিশও করেছেন। ইউ. জি. সি. যে অনুদান মঞ্জুর করেছেন এ জন্যে তা স্থানাভাবের সুরাহা হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ চৌদ্দটি, তার মধ্যে মাত্র চারটি বিভাগে একটি করে প্রোফেসর পদের জন্যে অনুদান পাওয়া গেছে আর রীডার বা লেকচারার পদও মঞ্জুর হয়েছে অতি স্বল্প সংখ্যক। বেশীর ভাগ বিভাগেরই লেবোরেটরীর জন্যে অনুদান পাওয়া গেছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আর একটি বড় বিভাগের লাইব্রেরীর জন্যে অনুদান দেওয়া হয়েছে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ বছরে গড়ে ছয় হাজার টাকা করে। সেই বিভাগটিকে আবার একটি নতুন বিষয়ে পুরাপুরি আলাদা স্নাতকোত্তর পাঠক্রম খুলতে বেশ জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জাতীয় প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে।

প্রতিবেদনে কোন কোন বিভাগ সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য করা হয়েছে, কোন কোন বিভাগ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে, আবার কোন কোন বিভাগের সাম্প্রতিক কাজ মনঃপুত না হলেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে এমন মন্তব্য আছে, যথা—প্রতিবেদনের 8.3 অনুচ্ছেদে (পদার্থবিদ্যা বিভাগ সম্পর্কে) বলা হয়েছে—"The Physics department has a glorious tradition, having had men like C. V. Raman, S. N. Bose, M. N. Saha, S. K. Mitra among its past professors. In recent years, it had not been able to keep up this tradition. However the Committee could see that ground was now being prepared for its revival. With the newly appointed staff, and the bright students it attracts, the Committee hopes that the department will again take its place among the front-rank physics department in the country." ["—সি. ভি. রামন, এস. এন. বোস, এম. এন. সাহা, এস. কে মিত্র এঁদের মত ব্যক্তিরা এই বিভাগে পূর্বে অধ্যাপক থাকায় এই বিভাগটির উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। অধুনা এই বিভাগটি এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে নি। যাহোক, কমিটি দেখতে পেয়েছেন যে এর পুনরুজ্জীবনের জন্যে ভূমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। কমিটি মনে করেন যে, নবনিযুক্ত শিক্ষক মণ্ডলী এবং এই বিভাগের প্রতি আকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রদের সহযোগে এই বিভাগটি আবার দেশের

মধ্যে পুরোগামী পদার্থবিদ্যা বিভাগগুলির মধ্যে তার স্থান করে নেবে।"]

ফলিত গণিত (Applied Mathematics) বিভাগ সম্পর্কে পরিদর্শক মণ্ডলী তাদের প্রতিবেদন দিয়েছেন (প্রতিবেদনের 8·4 অনুচ্ছেদ)। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে "The department recently created Professor S. N. Bose Institute within it to commemorate the memory of the Late National Professor S. N. Bose. * * * Professor S. N. Bose Institute is doing useful work in organising national and international symposia and seminars. It should be helped in these efforts. However, it should continue to be part of the department (and not become a separate Institute) serving as an umbrella for seminars, symposia and non-traditional inter-departmental post-graduate course programme. The department may be given a professorship in theoretical physics to help in these programmes."

[—"স্বর্গত জাতীয় অধ্যাপক এস. এন. বোসের স্মৃতিরক্ষার জন্যে সম্প্রতি বিভাগটি তার ভিতরে এস. এন. বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। *** প্রোফেসর এস. এন. বোস ইনস্টিটিউট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম ও সেমিনার করে সার্থক কাজ করছে। এর এই সব প্রচেষ্টায় সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এটা (পৃথক ইনস্টিটিউট না হয়ে) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং সাধারণভাবে চলতি নয়—এমন আন্তর্বিভাগীয় স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের আধাররূপে বিভাগের অংশ হিসাবে চলাই বাঞ্ছনীয়। এই সব কাজে বিভাগটিকে সাহায্যের জন্যে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের একটি পদ দেওয়া যেতে পারে।"] ইউ. জি. সি. ফলিত গণিত বিভাগে এই প্রোফেসরপদ সৃষ্টির জন্যে অনুদান দিয়েছেন। ইউ. জি, সি. এই ইনষ্টিটিউটের জন্যে এই বিভাগে দুটি সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (SeniorResearch Fellowship) সৃষ্টির জন্যে অনুদানও দিয়েছেন এবং রাজ্য সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ হলে এই পদগুলির জন্যে আর্থিক দায়িত্ব বহনে সম্মত হয়েছেন।

পরিমলকান্তি ঘোষ

বিজ্ঞান—সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে

মহাদেব দত্ত

আজ সভ্য মানুষ জীবনধারণের জন্যে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্যে সতত বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। দেশ-উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি প্রধানতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক। সমাজ সংস্কারের জন্যেও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রয়োজন।

এসব কারণে বিজ্ঞান সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে স্বভাবতঃই স্থান পায়। সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে বিজ্ঞানের যে সংবাদ প্রচারিত হয়, ঐ সব সংবাদে পরিবেশিত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির উপর বৈজ্ঞানিকদের মন্তব্য সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবনের মূল ঘটনা ও গবেষণা-পারষদের পরিচয় প্রচারিত হয়।

বিজ্ঞানের যে সকল সংবাদ, যেমন—কে কে নোবেল পুরস্কার পেলেন, কবে চাঁদে লোক পাঠানো হলো প্রভৃতি প্রচার করা হয়, সেগুলির মধ্যে যেগুলি তথ্যভিত্তিক, সে বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তথ্যভিত্তিক সংবাদ না থাকলেও কিছু কিছু সংবাদ সৃষ্টি করে প্রচার করা হয়, যা সাধারণ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে সংবাদ হিসাবে প্রচার করা হয়। সংবাদপত্রে প্রচারিত হলো ক্যানসার আর দুরারোগ্য নয়, সঠিক ওষুধ বের হয়েছে। এই সংবাদে ক্যানসার রোগীরা উৎফুল্ল হয়েও বিশেষজ্ঞদের কাছে জানলেন যে, তাদের জীবনের আশা নেই। স্বভাবতঃই তাঁরা বিজ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ক্যান্সারসংক্রান্ত খুব একটা ছোট তথ্যকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে এসব সংবাদ প্রচার করা হয়। এসব প্রকৃত বিজ্ঞান-সংবাদ নয়, এ বিজ্ঞানের নামে রূপকথা। সাধারণতঃ সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে (যা বিজ্ঞানের গবেষণা-পত্র প্রকাশের সাময়িকী নয়) বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের যে সব আলোচনা বের হয়, সে সব সাধারণ শিক্ষিতদের, এমন কি ঐ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী নন—তাঁদের কাছে মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের ঐ শাখার সঙ্গে বিশেষ-ভাবে পরিচিত, তাঁদের কাছে তা মূলগত ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ। স্থানাভাবে এই বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখানো বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানী সম্বন্ধে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাও বহু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। যেমন ধরা যাক, 1964 সালে একটি তরুণ বিজ্ঞানীর সম্বন্ধে যে সব সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তাতে ঘোষণা করা হয় যে, তাঁর সমতুল্য বিজ্ঞানী বিরল। কোন কোন সংবাদপত্রের মতে নিউটন, আইনস্টাইন, সত্যেন বোসও তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়। সংবাদপত্রে সে কি আলোড়ন! পরে জানা গেল যে, ঐ বিজ্ঞানীর যে তত্ত্ব নিয়ে হৈ-চৈ, তা তখনও প্রকাশিতই হয় নি। ঐ তরুণ বৈজ্ঞানিক ও তাঁর অধ্যাপকের সংবাদপত্রে দেওয়া একটা সংবাদকে ভিত্তি করেই আলোড়ন। পরে ঐ অধ্যাপকই ঐ তত্ত্ব আংশিক প্রত্যাহার করে নেন। আরও মজার ব্যাপার নিউটন, আইনস্টাইন, ও সত্যেন বোসের মূল অবদান মূলগত বিজ্ঞান। অপর পক্ষে উক্ত তরুণ বিজ্ঞানী ও তাঁর অধ্যাপকের তত্ত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক করে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচারিত অনুমান মাত্র। আবার এসব প্রচারিত সংবাদ অসঙ্গতি ও দোষ-ত্রুটিতে পূর্ণ। যেমন ধরা যাক, 1974 সালে বিশ্ববিশ্রুত এক বিজ্ঞানীর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত

বিজ্ঞান কেন্দ্রে গবেষণামুখী প্রশিক্ষণ পাঠ-ক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিজ্ঞানীকে বিদগ্ধ বিজ্ঞানী বলে অভিনন্দন জানানো হলো। 1976 সালের জুলাই মাসে অপর এক বিজ্ঞানীকে দুটি সংবাদপত্রে বিশ্ববিশ্রুত দু-জন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন বলে ঘোষণা করা হলো। 1976 সালে অগাষ্ট মাসে একটি আলোচনায় উপরিউক্ত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সমস্ত শিক্ষকদের অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। ঐ শিক্ষকদের মধ্যে 1974 সালের বিদগ্ধ বিজ্ঞানী ও 1976 সালের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীও ছিলেন। আরো মজার ব্যাপার, এসবই করলেন একজন কাগুজে বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ! অবশ্য ঐ বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞের ধারণায় যদি 'বিদগ্ধ' মানে বিশেষরূপে দগ্ধ হয়, তাহলেও দু-বছর পর তাঁকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা যেতে পারে! এমন হতে পারে যে, ঐ বিশেষজ্ঞের কাছে 'বিশ্ববিশ্রুত' 'বিশ্ববিস্মৃত'-র একই অর্থ। অনুরূপভাবে গবেষণা কেন্দ্রের পরিচয় দেবার ছলে কখনো কোন গবেষণা কেন্দ্রকে আদর্শ, বিশ্ববিখ্যাত বলে ধরা হয়। আবার পরের কোন বিবরণে ঐ বিজ্ঞান গবেষণা বা শিক্ষা কেন্দ্রকে অতি হেয় ও নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করা হয়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে কেন এরূপ হয় এবং এর প্রতিবিধান সম্ভব কিনা? মনে হয়, এসবের প্রধান কারণ সংবাদপত্রে ও বিজ্ঞান সাময়িকীতে যাঁরা সাধারণতঃ বিজ্ঞান-সংবাদ পরিবেশন করেন, আলোচনা করেন, তাঁরা তথাকথিত পদাধিকারী বিশেষজ্ঞ বা কাগুজে বিশেষজ্ঞ। এঁদের প্রাধান্যই এসব ব্যাপারে বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চাঁদে প্রথম মহাকাশযান যেদিন পৌঁছুলো তখন বহু সংবাদপত্রেই আচার্য বোসের মন্তব্যই স্থান পেয়েছিল তথাকথিত বিজ্ঞানীদের মন্তব্যের পরে। প্রকৃত বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞান-গবেষণা সাময়িকীতে প্রবন্ধ প্রকাশই তাঁদের বিজ্ঞান জগতের পরিচিতি বলে মনে করেন ও সাধারণ সাময়িকীতে প্রবন্ধ প্রচারে বিশেষ উৎসাহিত হন না। আর তাঁরা যেভাবে আলোচনা করেন; তাতে অতিরঞ্জন বা চমকপ্রদ করবার প্রয়াসও সাধারণতঃ বর্জন করেন। এজন্যে আবার সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে তাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না।

জনমানসে বিজ্ঞান প্রচার সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে বিজ্ঞান-সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশে বিশেষ কার্যকরী পন্থা। কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে এসব সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে উদ্দেশ্য সফল তো হচ্ছেই না বরং বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারার সঙ্গে জনসাধারণের বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিজ্ঞান অতি-প্রাকৃত ঘটনা (Miracle) নয়, বিজ্ঞানের দৃষ্টি-ভঙ্গী, চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি সাধারণ মানুষকে পরিচয় করালে তবেই সমাজের ও দেশের প্রকৃত উপকার হবে। কিন্তু তথাকথিত পদাধিকারী ও কাগুজে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এসব করা কি সম্ভব?

প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিন

আনিসুর রহমান খুদা বখ্স্*

যে ওষুধটি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর হৈ-চৈ পড়ে গেছে—সেই প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিন কিন্তু প্রথম আবিষ্কৃত হয় মানুষ আর ভেড়ার শুক্ররস থেকে। আর এটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু দু-জন আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের। কুর্জ্রোক্ এবং লিএব নামক দুই স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ 1930 সালে ভেড়ার গর্ভাশয়ের ছোট ছোট টুকরা যখন শুক্ররসের মধ্যে রাখলেন, তখন তাঁরা অবাক হয়ে দেখতে থাকেন—সেই টুক্রাগুলির সঙ্কোচন এবং প্রসারণ। তাঁরা কি তখন জানতেন যে, তাঁদের এই সামান্য পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালে চিকিৎসা-জগতে এবং বিজ্ঞান-জগতে একটা সাড়া এনে দেবে! তাঁদের এই পর্যবেক্ষণ যখন তাঁরা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতে প্রকাশ করলেন, তখন সুইডেনের এক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এই তথ্য লুফে নিলেন এবং শুক্ররসের কোন্ নির্দিষ্ট অংশে এই মাংসপেশী সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ ঘটছে, তা বের করতে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে লাগলেন। বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রম বৃথা গেল না--তিনি শুক্ররসের মধ্য থেকে এক ধরণের অম্লধর্মী স্নেহজাতীয় (Acidic lipid) পদার্থ আলাদা করে তার নাম দিলেন প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিন (পি. জি.)। তারপর থেকে কত যে বৈজ্ঞানিক প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিনের আশ্চর্য গুণের সন্ধানে তাঁদের অক্লান্ত নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন, তার ইয়ত্তা নেই এবং যতই প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিনের উপর কাজ চললো, ততই এর অদ্ভুত অনেক গুণাবলী জানা গেল, যা মানুষের উপকারে লাগে। বেশ কয়েক ধরণের প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিন পাওয়া গেল দেহের বিভিন্ন অংশে, যেমন—ফুসফুস, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদিতে। সবচেয়ে আশা জাগালো এর কতকগুলি গুণ, যার চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে অনেক দুরূহ রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে অতি সহজেই। বিগত দশকে বেশ কয়েকটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রও হয়ে গেলো এই প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিনের গুণাবলী বিশ্লেষণ সম্পর্কে এবং এর সার্থক প্রয়োগের কাহিনীও শোনালেন অনেক চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক। একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচনে সবাই খুশী। এবার নিশ্চয়ই একটা সর্বরোগহর ওষুধ বের হবে, যার প্রয়োগে দূর হবে বন্ধ্যাত্ব, ভাল হয়ে যাবে পাকস্থলীর ক্ষতরোগ (Peptic ulcer), হাঁপানী, হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপ, মূত্ররোগ, এমনি আরও কত রোগ। কিন্তু যে গুণটি প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিনকে আরও সম্ভাবনাময় করে তুলেছে, সেটি হলো এর প্রয়োগে গর্ভনিরোধ এবং নির্বিঘ্নে গর্ভপাতও সম্ভব; অর্থাৎ জনবৃদ্ধি সমস্যার সমাধানও এতে নিহিত আছে।

এখন এর রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। 13 ধরণের প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিন আলাদা করা গেছে—এর প্রত্যেকেই একটি মূল যৌগের রূপান্তর। এই মূল যৌগটি অর্থাৎ প্রোস্টিনোইক অ্যাসিডটি 20টি কার্বন অণুর দ্বারা গঠিত এবং এই অণু, যা একটা পঞ্চভুজ সংবৃত্তাকারে সাজানো থাকে, আর থাকে দুটি অ্যালিফ্যাটিক পার্শ্বশৃঙ্খল। এই অ্যালিফ্যাটিক পার্শ্বশৃঙ্খল বিভিন্ন মাত্রায় অসম্পৃক্ত বা প্রতিস্থাপিত হলে একে একে পাঁচ ধরণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে

---

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

ভিন্ন প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিনের উৎপত্তি হয়। এদের নাম যথাক্রমে—প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন A, B, E, F এবং 19-হাইড্রোক্সি (19-hydroxy)। আর এদের মধ্যে চিকিৎসা জগতে প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন E এবং F-এরই কদর বেশী।

প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিনের রাসায়নিক ধর্ম যখন জানা গেলো, তখন চেষ্টা চললো কি করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে তা তৈরী করা যায়। বস্তুতঃপক্ষে ভ্যানওর্‌প্‌ এবং বার্গষ্ট্রমের চেষ্টাতে তাও সম্ভব হলো—কতকগুলি অত্যাবশ্যক স্নেহজাতীয় অম্লকে (Fatty acid) ধাপে ধাপে বিক্রিয়া ঘটাবার ফলে। এই বিক্রিয়া ঘটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎসেচক (Enzyme) রূপে কাজ করলো সেই ভেড়ারই শুক্রথলি (Vesicular glands)। অক্সিজেনের (O_2) উপস্থিতিতে এবং গ্লুটাথাইওনের সহযোগিতায় (Co-factor) হোমো এবং লাইনো-লিনিক অ্যাসিড (Homo এবং Lino-lenic acid) ও অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড (Arachidonic acid), all-cis-cicosa 5, 8, 11, 14, 17—pentanaenoic acid থেকে পি জি E_1, E_2 এবং F_2 তৈরী করা সম্ভব হলো। কিন্তু এত গেলো পরীক্ষাগারে অল্পমাত্রায় প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন তৈরী করবার কথা। এদিকে পি. জি.-র চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চললো। কিন্তু চাইলেই তো আর সহজে কিছু পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকেরাও ছাড়বার পাত্র নন। ধৈর্য ও সাধনার ফলে তাঁরা এগিয়ে চললেন সাফল্যের পথে। তাঁরা অপরিসীম চেষ্টা চালাতে লাগলেন কি করে বেশী মাত্রায় তৈরী করা যায় প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন। গবেষণার ফলে একধরণের প্রবাল থেকে পি. জির কাঁচা উপাদান তাঁরা আবিষ্কার করলেন, যা থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিতে বেশী মাত্রায় পি. জি. তৈরী করা যাবে। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী পি. জি. কিন্তু প্রাকৃতিক পি. জি-র চেয়ে গুণগত দিক দিয়ে অর্ধেক শক্তিশালী।

জানবার তো শেষ নেই! তাই বৈজ্ঞানিকেরা এবারে ভাবলেন, বেশ তো দেখা যাক না—কি পদ্ধতিতে এই পি. জি. দেহের মধ্যে কাজ করে। এবারে কাজটা কিন্তু সহজ হলো না। অনেক ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও সঠিক কর্মপদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করতে পারলেন না। তাই বলে তাঁরা যে পুরাপুরি ব্যর্থ হলেন তাও নয়। তাঁরা মোটামুটিভাবে জানতে পারলেন যে, পি. জি. অন্ততঃ স্নায়বিক মাধ্যমে পরিবাহিত হয় না এবং এরা সম্ভবতঃ দেহের বিভিন্ন কোষের উপর সরাসরি প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এও তাঁরা বললেন যে, এই কোষগুলির হয়তো কিছু নির্দিষ্ট অংশ (Receptors) আছে, যেখানে পি. জি. গিয়ে যুক্ত হয়। সম্প্রতি আরও জানা গেছে যে, ভেসোপ্রেসিন ও আরও কতকগুলি হর্মোনের কর্মপথ রোধ করে অ্যাডিনোসিন মনোফস্‌ফেট-চক্রের (Cyclic AMP) উৎপাদনে বাধা দিয়ে তারা তাদের নিজেদের কাজ করে। কিন্তু খুবই রহস্যজনক যে, এই প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিনই আবার অ্যাডিনোসিন মনোফস্‌ফেট-চক্রের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যখন কোষে অন্য কোন হর্মোনের প্রভাব থাকে না। আবার এমনও অনেক কোষ আছে, যাদের স্নায়বিক বা হর্মোনের মাধ্যমে উত্তেজিত করলে পি. জি. নির্গত হয়। অনেক সময় পি. জি.-র পেশী-উদ্দীপক কাজ আবদ্ধ ক্যালসিয়ামের এবং ক্যালসিয়াম-নির্ভর ATP-ase নামক উৎসেচকের নিষ্ক্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

ওষুধ হিসাবে প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিনের সম্ভাবনা

গর্ভনিরোধ এবং গর্ভপাত—আফ্রিকাতে একশ্রেণীর উপজাতির মধ্যে অদ্ভূত একটি রীতির প্রচলন আছে। যদি প্রসবের সময় কোন অসুবিধা দেখা দেয় কিংবা স্বাভাবিক প্রসবে কোন বাধার সৃষ্টি হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিকে তার স্বামীর শুক্ররস (Semen) খেতে দেওয়া

হয়। ওদের ধারণা এতে প্রসূতির উপর নেমে আসে এক স্বর্গীয় আশীর্বাদ, যার ফলে প্রসূতির স্বাভাবিকভাবেই প্রসব হওয়া সম্ভব। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার—প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত সহজেই প্রসব হয়। ওদের এই ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না, কিন্তু ওরা কি জানতো যে, এর ভিতরেই নিহিত ছিল বিজ্ঞানের এক নিগূঢ় তত্ত্ব! আর কেই বা জানতো যে, এর উপর ভিত্তি করেই উগাণ্ডার কাম্পালাবাসী এক ডাক্তার, সুলতান করিম, চিকিৎসা জগতে এক নতুন পদ্ধতির সূচনা করবেন। ডাঃ করিম কিছু দিন থেকেই ভাবছিলেন প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিনকে প্রসব-সূচনার কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা। কিন্তু কে দেবে তাঁকে সে সুযোগ। যদি ফল বিপরীত হয়? হঠাৎ একদিন সুযোগ এসে গেলো এবং সে সুযোগ এলো আকস্মিকভাবে। তাঁর কাছে অজ্ঞান অবস্থায় এক অবিবাহিতা গর্ভবতী যুবতীকে আনা হলো। জানা গেলো, সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলো। ডাঃ করিম সূক্ষ্মভাবে তাকে পরীক্ষা করলেন এবং বুঝলেন যে, গর্ভাশয়ের মধ্যে ভ্রূণটির মৃত্যু ঘটেছে। অনতিবিলম্বে ঐ ভ্রূণকে দেহের বাইরে বের করে না আনলে প্রসূতির মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু প্রসূতির উপর অস্ত্রোপচারও সম্ভব নয়, কারণ তার দেহ সে ধকল সইতে পারবে না। তাহলে উপায়! ডাঃ করিম ভাবলেন, যার মৃত্যু অনিবার্য তাকে বাঁচাতে সব রকমের ঝুঁকি নেওয়া যায়। তিনি মনস্থির করে ফেললেন। তাঁর সহকর্মীরাও স্বীকার করে নিলেন যে, একে বাঁচাবার কোন প্রচলিত উপায় আর নেই। তখন ডাঃ করিম খুব স্বল্পমাত্রায় ঐ মেয়েটিকে প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন এফ-আল্‌ফা (PGFα) শিরার মধ্যে দিয়ে ইন্‌জেকশন করে দিলেন। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন—কি জানি কি হয়! অবাক বিস্ময়ে তারা দেখলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রসূতির মধ্যে প্রসব-সূচনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; সত্য সত্যই কিছুক্ষণের মধ্যেই ভ্রূণ স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমেই বেরিয়ে এলো এবং প্রসূতি নিরাময় হয়ে উঠলো। ডাঃ করিম পি. জি.-র এই আশাতীত ফললাভে উৎসাহিত হয়ে বেশ পর পর কয়েকটি প্রসূতিকে একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালালেন এবং তাঁদের এই পরীক্ষার বিবরণ বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতে প্রকাশ করলেন। সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন পড়ে গেলো। বহু দেশে পি. জি.-র প্রয়োগ পরীক্ষিত হতে লাগলো। সবাই ফলও আশাপ্রদ পেতে লাগলেন। অবশ্য কুফল যে কিছুই ছিল না, তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রয়োগে প্রচণ্ড বমি, মাথা-ঘোরা, কোন নির্দিষ্ট পেশী সঙ্কোচন প্রভৃতি নানা রোগের লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো। কিন্তু সবাই স্বীকার করলেন যে, সাত থেকে তেইশ সপ্তাহের ভ্রূণকে শতকরা এক-শ' ভাগই গর্ভপাত করানো যায়।

হাঁপানিতে প্রয়োগ—পি. জি. E_2 প্রয়োগে শ্বাসনালীর সম্প্রসারণের ক্ষমতাকে হাঁপানি রোগের উপশমে প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। কিন্তু পীটার স্মিথ নামে কিংস্‌ কলেজ হাসপাতালের একজন ডাক্তার দেখালেন যে, পি. জি. E_2 প্রয়োগে যে শ্বাসনালীর প্রসারণ হয়, সেটি সম্ভব হয় একটি প্রচণ্ড কাশি হবার পর। তিনি আরও দেখলেন হাঁপানির জন্যে যে আইসোপ্রেনালিন নামক ওষুধ ব্যবহৃত হয়, তার চেয়ে পি. জি. E_2 কম কার্যকর। কিন্তু নিরাশ হবার কিছু নেই, কারণ এই পি. জি. পরিবর্তনযোগ্য অণুর সমাবেশে গঠিত। কাজেই এই আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি যে, কাশি ছাড়াই শ্বাসনালীর সম্প্রসারণ করবার উপযোগী কোন পি. জি. যৌগ এক দিন না এক দিন বের হবেই।

হৃদ্‌রোগসংক্রান্ত কার্যকারিতা—পি. জি.-ই

এবং পি. জি.-এ (P. G. E and P. G. A) রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে; কিন্তু হৃদ্‌ঘাত (Heart rate) বাড়ায়, কার্ডিয়াক আউটপুট এবং মায়োকার্ডিয়াল ফোর্স (Cardiac output and myocardial force) বাড়ায়। সুতরাং যাদের উর্ধ্ব রক্তচাপ, তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি খুবই আশার কথা।

পৌষ্টিক ক্ষরণসংক্রান্ত—প্রচুর পরিমাণে পৌষ্টিক ক্ষরণ হওয়া পৌষ্টিক ক্ষত সৃষ্টি হবার এক প্রধান কারণ। এক ধরনের পি. জি. E_2 প্রতিযোগ (Analogue) মানুষের পৌষ্টিক ক্ষরণ বেশ কয়েক ঘণ্টা কমিয়ে দিতে পারে। এতে অন্য কুফলও বেশী নেই।

এছাড়াও পি. জি.-র সাহায্যে অনেক রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা আছে। যেমন—স্নেহাজাতীয় পদার্থের ভাঙন রোধ করে (ইনসুলিনের কার্যকারিতা অনুকরণে) বহুমূত্র রোগের সমাধানে সাহায্য করে।

এক কথায় বলতে গেলে ভবিষ্যতে চিকিৎসা-জগতের এক বিরাট এলাকা জুড়ে থাকবে প্রোষ্টাগ্ল্যাণ্ডিনের প্রয়োগ।

পুরুলিয়ার শিল্প—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

দুর্গাশঙ্কর মল্লিক

বিহারের মানভূম জেলা শিল্পের সম্ভাবনায় ।। 1956 খৃষ্টাব্দে মানভূমের সমস্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পনগরী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধ এলাকাগুলিকে বিহারের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বাকী 2407 বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বর্তমান পুরুলিয়া জেলাকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং পুরুলিয়ার ভাগ্যে জোটে নি কোন বৃহৎ শিল্প বা কোন বৃহৎ খনিজ সম্পদ। খরাপীড়িত এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বাঞ্চলের খনি বিশেষতঃ শিল্প অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে এর অবস্থান। জেলার সদর শহর পুরুলিয়ার 56 মাইল দূরে টাটানগর, 72 মাইল দূরে রাঁচি, 52 মাইল দূরে ধানবাদ, 94 মাইল দূরে আসানসোল এবং 100 মাইল দুর্গাপুর। ক্রমবর্ধমান, বিরাট সম্ভাবনায় উজ্জ্বল বৃহৎ শিল্পনগরী বোকারো পুরুলিয়া থেকে মাত্র 35 মাইল এবং জেলার সীমানা থেকে 7 মাইল দূরে। আবার মুরী একেবারে এই জেলার সীমানায়। ঘাটশীলাও এই জেলার সীমানা থেকে একেবারে দূরে নয়। শুধুমাত্র রাস্তার অভাবই এই দূরত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অপরদিকে প্রকৃতিও একেবারে এই জেলাকে বঞ্চিত করে নি। তার সম্পদের বেশ কিছুটা এই জেলার ভাগ্যে জুটেছে। সুতরাং পুরুলিয়ার বর্তমান প্রায়ান্ধকার হলেও ভবিষ্যৎ যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। কৃষিনির্ভর এই জেলা খাদ্যের দিকে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নেহাৎ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার শিকার না হলে এর নিজস্ব উৎপাদনই জেলার মোটা ভাতের সংস্থান করতে সক্ষম। যদি কৃষির পাশাপাশি শিল্পকে স্থান করে দিতে পারা যায়, তাহলে আর পুরুলিয়া একটি অনুন্নত গরীব জেলা বলে পরিগণিত হবে না। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পুরুলিয়ার শিল্প সম্ভাবনা।

পুরুলিয়া জেলার ভবিষ্যৎ শিল্পসম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ণের পূর্বে শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে—এখানে শিল্পায়নের সম্ভবনা কতখানি।

(1) কাঁচামাল—কৃষিসম্পদ—কৃষিই এই

জেলার প্রধান অবলম্বন। এই জেলার বাসিন্দারা প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন করেই তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। শিল্পায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় কৃষিসম্পদ উৎপাদনের কথা এই জেলার চাষীদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত।

বনজসম্পদ—পুরুলিয়া জেলার মোট এলাকার এলাকার 14 ভাগ জঙ্গলে আবৃত। অযোধ্যা, বান্দোয়ান, পঞ্চকোট এবং কাশীপুর এলাকার মধ্যেই এই বনাঞ্চল অবস্থিত। এই বনাঞ্চলে বড় বড় গাছ বিশেষ পাওয়া যায় না। শাল, মহুয়া, কেন্দু প্রভৃতি সাধারণ গাছই এই বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। এছাড়া নানা জাতের গুল্ম ও ছোট ছোট গাছগাছড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং বৃহৎ কাষ্ঠশিল্পের সম্ভাবনা বিশেষ নেই। বিড়ির পাতা অর্থাৎ কেন্দু গাছের পাতা পুরুলিয়ার দক্ষিণ বনভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মহুয়ার জঙ্গল থেকে মহুয়া এবং তৈল-জাত বীজের পরিমাণও যা পাওয়া যায়, তা নেহাৎ কম নয়। কুল, পলাশ এবং কুসুম গাছে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষার চাষ হয়ে থাকে। রঘুনাথপুর এবং কাশীপুর এলাকায় রেশমের চাষও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়ুর্বেদীয় অথবা ভেষজ-রসায়নের জন্যে প্রচুর গাছগাছড়া, ফল-মূল বনাঞ্চলের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ—খনিজ সম্পদে পুরুলিয়া জেলা সমৃদ্ধ না হলেও খনিজ সম্পদের পরিমাণ নেহাৎ নগণ্য নয়।

কয়লা—পুরুলিয়া জেলার রাণীপুর, পার-বেলিয়া, শালতোড়, বামুরিয়া এবং নেতুরিয়ার মোট 5টি কয়লাখনি আছে। নেতুরিয়া থানার কয়লাখনিগুলিতে 5·3 মিলিয়ান টন ভাল জাতের কয়লা এবং 11 মিলিয়ন টন মাঝারী জাতের কয়লা বর্তমান বলে ধারণা।

চীনামাটি বা চায়না ক্লে—রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত শালতোড়, পুরুলিয়া থানার কলাবনি, ঝালদা থানার শ্রাবণডি এবং মাহাতমারায় চায়না ক্লে-র মোট পরিমাণ 12 লক্ষ টন। খাতরাতে বছরে 700 টন চায়না ক্লে উৎপন্ন হচ্ছে।

চুনাপাথর—ঝালদা থানায় মোট চুনাপাথরের পরিমাণ 20 মিলিয়ন টন। এই চুনাপাথর পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট তৈরীর জন্যে উপযুক্ত। বর্তমানে বছরে 30,000 টন চুনাপাথর খনি থেকে তোলা হচ্ছে; এছাড়া রঘুনাথপুরের কাছে হাঁসাপাথরে এবং পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে 1 মিলিয়ন টন চুনাপাথর আছে। পুরুলিয়া মফস্বল থানায় কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ চুনাপাথর পাবার সম্ভাবনা আছে। এই চুনাপাথর ক্যালসিয়াম কারবাইড তৈরীর বিশেষ উপযুক্ত।

ফেলস্‌পার—পুরুলিয়া, পাবা, রঘুনাথপুর এবং কাশীপুর থানায় প্রচুর ফেলস্‌পার পাওয়া যাবে। এখনও সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ধারিত হয় নি। রঘুনাথপুরের বেনাগাড়িয়াতে প্রতিদিন 20 টন হিসাবে 20 বছর যাবৎ ফেলস্‌পার পাওয়া যেতে পারে। সিরামিক্স প্রভৃতির জন্যে এর উপ-যোগিতা অত্যন্ত বেশী।

তামা—তামাখুনে আকরিক তামার পরিমাণ 8000 টন। ধাতব তামার পরিমাণ শতকরা দু-ভাগ। এই তামা কপার সালফেট উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফ্লোরস্পার—ঝালদা থানার বেলাখো পাহাড়ের পাদদেশে 10,000 ফ্লোরস্পার রয়েছে। ইস্পাত, এনামেল এবং রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করতে এর প্রয়োজন হবে। এছাড়া ডলোমাইট, নোয়াইট, সিলিকা রক বা কোয়ার্টজ্‌ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপরন্তু এই জেলার নিকটেই ধানবাদের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সিংভূমের তামার খনি, লোহার খনি এবং ইউরেনিয়ামের খনিও এই জেলার শিল্পসম্ভাবনার পথে বিশেষ সহায়ক।

জল—কৃষি এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। কিন্তু পুরুলিয়ায় জলের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জনসাধারণের ব্যবহার্য জলের চাহিদা পর্যন্ত ঠিকমত মেটানো যায় না। কিন্তু পুরুলিয়া নদীসমৃদ্ধ। কংসাবতী, কুমারী এবং দ্বারকেশ্বর এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এছাড়া দামোদর এবং সুবর্ণরেখা এই জেলার সীমান্ত নদী। ছোট ছোট বাঁধের সাহায্য অনায়াসেই জলের চাহিদা মেটানো যায়। দামোদরের উপর পাঞ্চেৎ বাঁধ থেকে মাত্র 40 মাইল দীর্ঘ খাল খুঁড়ে কংসাবতীর সঙ্গে যোগ করে দিলে জলের সমস্যা বহুল পরিমাণে কমে যাবে। কৃষি এবং শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাও সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ—ছোট, বড় বা মাঝারী যে কোন শিল্পের জন্যে প্রয়োজন যথেষ্ট বিদ্যুৎ। পুরুলিয়া জেলার মধ্যেই রয়েছে সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নিকটেই D.V.C.-র জল-বিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি। তবুও পুরুলিয়া জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত কম। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রশ্ন সুদূরপরাহত। 2490টি গ্রামের 55টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। 1973-74 সালে সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আরও 150 M.W. বিদ্যুৎ তৈরী হলে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ব্যাপকভাবে সম্ভব হবে।

পরিবহন—নিকটবর্তী শিল্পনগরীগুলি, খনি অঞ্চল এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। পুরুলিয়া রেলপথে হাওড়া-খড়্গপুর, আসানসোল, টাটানগর, রাঁচি, গোমো এবং সিংভূমের লৌহখনির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাছাড়া সড়ক পথেও টাটানগর রাঁচি, ধানবাদ, বোকারো, আসানসোল ও দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া বাকী শাখা সড়কগুলিকে আরও ভাল পরিবহনযোগ্য করে তোলা এমন কিছু ব্যয়সাধ্য হবে না।

বাজার—উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসাবে চারিপাশের শিল্প সংস্থা এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা উৎকৃষ্ট বাজার হিসাবে গণ্য করা চলে।

কারিগর—পুরুলিয়া জেলায় উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরের যথেষ্ট অভাব। কিন্তু অপটু কারিগরের অভাব নাই। বরং এই জেলা থেকে এই ধরণের কারিগর অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। যতদিন পর্যন্ত এই জেলার কারিগরদের উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত না করা যায়, ততদিন বাইরে থেকে দক্ষ কারিগর আনবার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে লোহার কাজে, তাঁতের কাজে, লাক্ষার কাজে এবং বাসনকোসন তৈরীর জন্যে দক্ষ কারিগরের অভাব হবে না। 1970 সালের শেষাশেষি জেলা কর্ম-বিনিয়োগ অধিকর্তার কাছে 7339 জন বেকার নাম রেজিষ্ট্রী করেছিল। তাদের মধ্যে শতকরা 92 জন অপটু, বাকী 8 জন বিভিন্ন কাজে দক্ষ।

আবহাওয়া—পুরুলিয়া জেলার জলবায়ু সাধারণভাবে স্বাস্থ্যকর। মুক্ত বায়ু, শুষ্ক আবহাওয়া, হজমকারী জল পুরুলিয়া জলবায়ুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এই সমস্ত দিক বিচার করে দেখলে পুরুলিয়ার শিল্প সম্ভাবনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

পুরুলিয়া জেলার বর্তমান শিল্প—পুরুলিয়া জেলায় এখনও পর্যন্ত কোন বৃহৎশিল্প গড়ে ওঠে নি। এ পর্যন্ত যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মোট 236টি মোট শিল্প পরিচালনা করছেন। সেগুলি হলো :

1. খাদ্য ও পানীয়—8, 2. তামাক—3, 3. তাঁতবস্ত্র—11, 4. কাষ্ঠশিল্প (আসবাবপত্র ব্যতীত)—3, 5. আসবাব শিল্প—3, 6. ছাপাখানা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প—2, 7. রসায়ন ও রাসায়নিক

দ্রব্যাদি—10, 8. খনিজ অধাতু শিল্প—9, 9. কাঁসা ও পিতল শিল্প—16, 10. ধাতুশিল্প—6, 11. যন্ত্রশিল্প—7, 12. বৈদ্যুতিক যন্ত্রশিল্প—1, 13. যানবাহন মেরামতি—7, 14. অন্যান্য 5।

পুরুলিয়া জেলার শিল্পসম্ভাবনা :—বৃহৎ শিল্প—1. ইস্পাতশিল্প—পুরুলিয়া লৌহ খনি অঞ্চল এবং কয়লা খনি অঞ্চলের খুবই নিকটে। সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জ এলাকা থেকে হিমাটাইট জাতের লৌহ আকরিক এবং ধানবাদ, আসানশোল এবং রাণীগঞ্জ অঞ্চল থেকে কয়লা আমদানী করে সহজেই ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি বার্ণপুরের নিকটে মধুকুণ্ডায় একটি সঙ্কর ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলবার প্রস্তাব করে-ছিলেন। এই শিল্প রূপায়ণের জন্যে 45 কোটি টাকার প্রয়োজন হবে এবং সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে 5 বছর। প্রাথমিক অবস্থা 5000 এবং সম্পূর্ণ হলে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান 10,000 লোকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু সরকারী অবহেলায় এই প্রস্তাব কল্পনা মাত্র। পুরুলিয়া শহরের নিকটেই টামনা নামক স্থানে একটি মাঝারি ইস্পাত শিল্প প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে।

সিমেন্ট শিল্প :—সিমেন্ট শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় চুনাপাথর এবং ক্লে এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই জেলায় বৃহৎ সিমেন্ট কারখানার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিশেষ করে সিমেন্টের বর্তমান চাহিদা পূরণের কথা চিন্তা করে এই জেলার ঝালদা অঞ্চলে সিমেন্ট শিল্প স্থাপনের চিন্তার রূপায়ণ যত ত্বরান্বিত করা যায়, ততই মঙ্গল। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়েও চিন্তা করেছেন।

মাঝারী শিল্প—সিরামিক্স শিল্প :—পঞ্চকোট পাহাড়ে যে চীনামাটি পাওয়া যাবে, তার সাহায্যে আদ্রা-আসানসোল রেলপথের পাশে যে কোন স্থানে সিরামিক্স শিল্প গড়া যায়। ইতিমধ্যেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে এবং সিরামিক্সের ছোট শিল্প গড়ে তোলবার ব্যাপারে তারা বিশেষ আগ্রহী।

কাগজ শিল্প—পুরুলিয়ার জঙ্গলগুলিতে প্রচুর বাঁশ, ঘাস ও কাগজশিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া যায়। এগুলির সদ্ব্যবহার করবার জন্যে অনায়াসেই কাগজের কারখানা গড়া যায়। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট শিল্প—বোকারো, জামসেদপুর, বার্ণপুর দুর্গাপুর ও কুলটি প্রভৃতি স্থানের ইস্পাত শিল্পগুলির দূরত্ব এই জেলার সীমানা থেকে বেশী দূরে নয়। মুরীর অ্যালুমিনিয়াম কারখানা জেলার সীমানার ওপারে। ঘাটশীলার তামা কারখানা জেলার নিকটেই। সুতরাং ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং তামার সংশ্লিষ্ট কারখানা গড়ে তোলবার পক্ষে পুরুলিয়া উপযুক্ত স্থান। এদিকে বিশেষ করে ভাববার অবকাশ রয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প—প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার বন্ধ করে, স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং অন্যান্য সুবিধার দিকে নজর রেখে বহু ধরণের ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিনির্ভর শিল্প :—(ক) ফল ও শব্জী সংরক্ষণ, (খ) খান্দসারী চিনি, (গ) ঠাণ্ডাঘর, (ঘ) শুষ্ক আলু ভাজা (Dehydrated potatoetchips), (ঙ) কীটনাশক দ্রব্যাদি, (চ) মিশ্র সার, (ছ) কৃষি যন্ত্র-শিল্প, (জ) রাইস্ ব্রান তেল, (ঝ) সার।

প্রাণীনির্ভর শিল্প—(ক) হাড় গুঁড়া, (খ) গো-মহিষাদির সুষম খাদ্য, (গ) পোলট্রির জন্যে সুষম খাদ্য।

খনিনির্ভর শিল্প—(ক) মৃৎশিল্প, (খ) বিদ্যুৎ-অপারিবাহী পদার্থ, (গ) অধঃক্ষিপ্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেট, (ঘ) চুন, সুরকি, (ঙ) অপার বাহী রং, (Air drying), (চ) টাইল ও অগ্নিসহ ইট, (ছ)

অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, (ভ) ব্লিচিং পাউডার, (ম) কার্বাইড শিল্প।

প্রয়োজনীয় নির্ভর শিল্প—(ক) পাইরোজেন যুক্ত পাতিত জল, (খ) মোটর মেরামতির কারখানা (গ) যন্ত্রচালিত লণ্ডী, (ঘ) মোটরের যন্ত্রপাতি, (ঙ) ছুরি, কাঁচি, কোদাল, কুড়ুল ইত্যাদি শিল্প, (চ) লাক্ষাজাত শিল্প, (ছ) বেকারী, (জ) ইট শিল্প, (ঝ) মুরগী, হাঁস, ছাগল, ভেড়া পালন।

বনসম্পদ নির্ভর শিল্প—(ক) মধুপ্রস্তুত শিল্প, (খ) খেলনা শিল্প, (গ) আসবাব শিল্প, (ঘ) ভেষজ শিল্প. [এই শিল্পগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য Small Scale Industries Service, 111/112, B. T. Road Calcutta-35 থেকে পাওয়া যাবে।]

হিমোগ্লোবিনোপোথস—সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া

অসিতবরণ দাস-চৌধুরী*

প্রবন্ধের শিরোনামটি পাঠকগণের নিশ্চয়ই অপরিচিত লাগবে। অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন-জনিত একটি মারাত্মক বংশানুক্রমিক রোগের নাম সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া†। বর্তমান প্রবন্ধে মানুষের হিমোগ্লোবিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এই রোগটি কি, তা বোঝবার চেষ্টা করবো। হিমোগ্লোবিন বস্তুটি কি, তা বুঝতে হলে মানুষের রক্ত থেকে আরম্ভ করতে হবে। একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির (যার ওজন প্রায় 70 কে. জি হবে) দেহে রক্তের পরিমাণ থাকে 6300 সি. সি অর্থাৎ প্রায় 6 লিটার। রক্তের জটিল তরল-পদার্থ, যাকে আমরা প্লাজ্মা বা রক্তরস বলি, তা প্রায় 55% এবং বাকী 45% বিভিন্ন প্রকার কোষ বা কণিকা। এই বিভিন্ন প্রকার কণিকার মধ্যে লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে যথাক্রমে প্রায় 5000000 লোহিত কণিকা (নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে) ও 4000-10000 শ্বেত কণিকা থাকে, অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি শ্বেত কণিকার জন্যে 700 লোহিত কণিকা থাকে। লোহিত কণিকা গোলাকার, উভাবতল (Biconcave), নিউক্লিয়াসবিহীন এবং এর ব্যাস 7·3μ‡। এই লোহিত কণিকাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু। একটি লোহিত কণিকার মধ্যে বহু হিমো-গ্লোবিন অণু থাকে। যে অক্সিজেন না হলে মানুষ কিছুতেই বাঁচতে পারে না, সেই অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়া হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ। সুতরাং হিমোগ্লোবিন আমাদের বেঁচে থাকবার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। হিমোগ্লোবিনের জন্যে লোহিত কণিকাকে লাল রঙের দেখায়। হিমোগ্লোবিন একটি যুগ্ম প্রোটিন (Conjugated protein); হেইম (Haem) একটি লৌহধারক বস্তু এবং গ্লোবিন (Globin) একটি মৌলিক প্রোটিন (Simple protein)। হিমোগ্লোবিনের অণুতে লৌহের পরিমাণ প্রায় 34% এবং একটি সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহের সম্পূর্ণ রক্তে, হিমোগ্লোবিনে সর্বসাকুল্যে মাত্র 3 গ্র্যামের মত লৌহ থাকে।

†হিমোগ্লোবিনের অভাবহেতু মানুষের দেহে যে রক্তাল্পতা দেখা দেয়, তাকে এক প্রকারের অ্যানিমিয়া (Anaemia) বলা হয়।

*নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700019

‡1μ=1/1000 মিলিমিটার

একটি হিমোগ্লোবিন অণুর মধ্যে চারটি হেইম থাকে এবং এগুলি গ্লোবিন প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত (1নং চিত্র)।

এক্স-রে ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফির (X-ray crystallography) সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, হিমোগ্লোবিন অণু সুসমঞ্জসভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। এর আয়তন 55×55×70° অ্যাংষ্ট্রম ইউনিট* এবং আণবিক ভার 66700। গ্লোবিন প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন খুব ভালভাবে জানা গেছে। মানুষের গ্লোবিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস অনুযায়ী সাজালে এরূপ দাঁড়াবে—লিউসিন (Leucine), ভ্যালিন (Valine), অ্যাস্পারটিক অ্যাসিড (Aspartic acid), অ্যালানিন (Alanine), লাইসিন (Lysine), হিষ্টিডিন (Histidine) ফেনাইল অ্যালনিন (Phenylalanine), গ্লুটামিক অ্যাসিড (Glutamic acid), থ্রেয়োনাইন (Threonine), প্রোলিন (Proline), গ্লাইসিন (Glycine), টাইরোসিন (Tyrosine) আরজিনিন (Arginine), ট্রিপটোফেন (Tryptophane), মেথিয়োনাইন (Methionine) এবং সিসটিন (Cystine)। গ্লোবিন প্রোটিন দুটি α (Alpha) এবং দুটি β (Beta) পলিপেপটাইডমালার† (Polypeptide chain) দ্বারা গঠিত। সাধারণ নিয়মানুযায়ী হিমোগ্লোবিনকে X_2 Y_2 এই ফরমুলায় প্রকাশ করা হয়। এখানে X_2 বলতে একজোড়া α পলিপেপটাইডমালা এবং Y_2 বলিতে একজোড়া β, γ, δ অথবা ϵ বোঝায়। পলিপেপটাইডমালার প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।
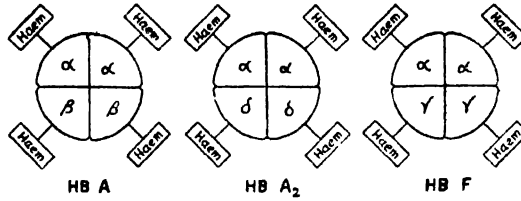
1নং চিত্র—স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের অণুসমূহ, α-আলফা পলিপেপটাইডমালা, β-বিটা পলিপেপটাইড মালা, γ-গামা পলিপেপটাইডমালা ও δ-ডেল্টা পলিপেপটাইডমালা।

(1) হিমোগ্লোবিন-A......$\alpha_2\beta_2$

(2) হিমোগ্লোবিন-F......$\alpha_2\gamma_2$

(3) হিমোগ্লোবিন A_2...... $\alpha_2\delta_2$

(4) গাওয়ার হিমোগ্লোবিন

(ক) গাওয়ার হিমোগ্লোবিন I...ϵ

(খ) গাওয়ার হিমোগ্লোবিন II $\alpha_2\epsilon_2$

দেহের সমগ্র হিমোগ্লোবিনের 95-97% হিমোগ্লোবিন-A, 1·5-3% হিমোগ্লোবিন-A_2, এবং 0·5% হিমোগ্লোবিন-F। গাওয়ার হিমোগ্লোবিন মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে তিন মাস থাকবার পর লুপ্ত হয়ে যায়। হিমোগ্লোবিন-F ভ্রূণের 11 থেকে 12 সপ্তাহ এবং 20 থেকে 35 সপ্তাহ বয়সে, সমগ্র হিমোগ্লোবিনের যথাক্রমে 1·2% এবং 10% থাকে। তার পরে এটি হঠাৎ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং জন্মসময়ে সমগ্র হিমোগ্লোবিনের 80% থাকে। জন্মের পরে 6 মাস বয়সে ঐ পরিমাণ কমে দাঁড়ায় প্রায় 1-2%।

পূর্বেই বলেছি হিমোগ্লোবিন-A একজোড়া α পলিপেপটাইডমালা ও একজোড়া β পলিপেপটাইডমালার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক α পলিপেপটাইডমালা 141টি অ্যামিনো অ্যাসিডের

*1Å = 10^{-8} সেন্টিমিটার

†কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড পর পর একসঙ্গে মালার মত জুড়ে থাকলে তাকে পেপটাইড বলা হয় এবং কতকগুলি পেপটাইড পুনরায় ঐভাবে একসঙ্গে থাকলে তাকে পলিপেপটাইডমালা বলা হয়।

দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেক β পলিপেপটাইড-মালা 146টি অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা গঠিত। সুতরাং হিমোগ্লোবিন-A অণুতে 4টি পলিপেপটাইডের মালায় সর্বসাকুল্যে 574টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবে। পূর্বে তাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পলিপেপটাটাইডমালা একটি করে হেইম-এর সঙ্গে যুক্ত (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এটি সহজেই লক্ষ্য করা যাবে যে, হিমোগ্লোবিন A, হিমোগ্লোবিন-A_2 এবং হিমোগ্লোবিন-F-এর মধ্যে অবশ্যই একজোড়া α পলিপেপটাইডমালা থাকবে, কিন্তু পার্থক্য হবে দ্বিতীয় জোড়া পলিপেপটাইড মালায়, যেগুলি ঐ তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে β, γ ও δ।

হিমোগ্লোবিন সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার পর এবার আমরা সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবো। গ্লোবিন-S আবিষ্কার করেন। অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন-S-জনিত রোগকেই সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া বলা হয়। পরবর্তীকালে আমেরিকার লিনাস পাউলিং এবং ইংল্যাণ্ডের ভি. এম. ইনগ্রাম এই রোগের রহস্য সমাধান করেন। পাউলিং হিমোগ্লোবিন থেকে উদ্ভূত এই রোগকে আণবিক রোগ (Molecular disease) বলে আখ্যা দেন। এটি প্রথমে লক্ষ্য করা যায় যে. আফ্রিকায় বংশোদ্ভব বহু লোকের রক্তের লোহিত কণিকাকে অক্সিজেন-অভাবের মধ্যে রাখলে লোহিত কণিকগুলি সিকেলের অর্থাৎ ধান কাটবার কাস্তের মত অর্ধ চন্দ্রাকৃতি (2নং চিত্র) হয়ে যায়। যাদের রক্তে উপরিউক্ত বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়, তাদেরকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক শ্রেণীর লোকের এক শতাংশেরও কম রক্তকণিকায় উপরিউক্ত বৈলক্ষণ্য প্রকাশ

2নং চিত্র—অক্সিজেনের তারতম্যের জন্যে হিমোগ্লোবিন রক্তকণিকায় যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। যে ব্যক্তি হিমোগ্লোবিন-A-র জন্যে হোমোজাইগাস তার রক্তকণিকা স্বাভাবিক থাকবে। যে ব্যক্তি হেটেরোজাইগাস অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন-A ও হিমোগ্লোবিন-S তার রক্তে খুব কম পরিমাণ অভাবে সিকেল তৈরী হবে এবং যে ব্যক্তি হিমোগ্লোবিন-S-র জন্যে হোমোজাইগাস তার রক্তে কম পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবেই সিকেল তৈরী হবে।

1910 সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হেরিক নামে একজন ডাক্তার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের গ্রেনাডা নামক স্থান থেকে আগত অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত নিগ্রো যুবকের দেহে প্রথম হিমো-পাবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ সুস্থ, অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হয় না, সেজন্যে তাদেরকে সিকেল-সেল ট্রেইট (Sickle-cell trait) আছে বলা হয়। রোগের এই অবস্থাটির

নাম সিকলেমিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণীর কমসংখ্যক লোকের খুব মারাত্মক অ্যানিমিয়া হয় এবং বেশীর ভাগই জননক্ষমতা লাভ করবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই শ্রেণীর লোকের এক-তৃতীয়াংশের বেশী রক্তকণিকায় সিকেল ট্রেইট বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে বলা হয় সিকেল-সেল অ্যানিমিক্স (Sickle-cell anaemics) এবং রোগটিকে বলা হয় সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া (Sickle-cell anaemia)।

এই সিকেল-সেল বৈশিষ্ট্যটি একজোড়া জিন-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যাদের রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক, তারা $Hb_1{}^A$ হোমোজাইগাস* ($Hb_1{}^A$ $Hb_1{}^A$) হবেন, যাদের সিকেল-সেল ট্রেইট, তারা $Hb_1{}^S$ হেটেরোজাইগাস* ($Hb_1{}^A$ $Hb_1{}^S$) হবেন এবং সিকেল-সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত লোকেরা $Hb_1{}^S$ হোমোজাইগাস ($Hb_1{}^S$ $Hb_1{}^S$) হবেন।

এইবার জৈব রসায়ন আণবিক বিজ্ঞানিগণ হিমোগ্লোবিন S-কে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন, তা দেখা যেতে পারে। পূর্ব উল্লেখিত আমেরিকার নোবেল পুরস্কারবিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পাউলিং পেপার ইলেকট্রোফোরেসিস (Paper electrophoresis) প্রয়োগ-কৌশলের দ্বারা দেখালেন যে, হিমোগ্লোবিন-A এবং -S দুটি ধনাত্মক মেরুর দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ তারা নিজেরা ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গেল যে, হিমোগ্লোবিন-S, হিমোগ্লোবিন-A-এর তুলনায় ধীর গতিতে ধনাত্মক মেরুর দিকে যায় (3নং চিত্র)। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত
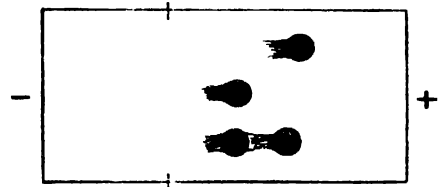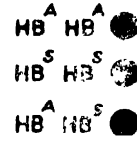
3নং চিত্র—বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হিমোগ্লোবিনের গতির প্রকৃতি।

বিজ্ঞানী ভি, এম, ইনগ্রাম হিমোগ্লোবিন-A ও হিমোগ্লোবিন-S-এর রাসায়নিক পার্থক্য আবিষ্কার করেন। এই দুই হিমোগ্লোবিনের α পলিপেপটাইডমালা একই রকম, কিন্তু হিমোগ্লোবিন-A-এর β পলিপেপটাইডের 6 নম্বর স্থানে অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লুটামিকের পরিবর্তে অ্যামিনো অ্যাসিড ভ্যালিন থাকলে তাকে হিমোগ্লোবিন-S বলা হয় (4নং চিত্র)। সেজন্যে হিমোগ্লোবিন S-কে এই $\alpha_2{}^A\beta_2{}^6$ Glu—Val ফরমূলায় লেখা হয়। গ্লুটামিক অ্যাসিড ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত, কিন্তু ভ্যালিন তড়িৎবিহীন। এই তড়িৎ পরিবহনের পরিবর্তনের জন্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে পৃথক প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই তড়িৎ পরিবহনের পরিবর্তনের জন্যেই কম পরিমাণ অক্সিজেনে লোহিত কণিকা সিকলিং অর্থাৎ কাস্তের মত বিকৃত রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় হিমোগ্লোবিন কেলাসিত হয়ে যায় এবং কেলাসিত হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহন

* কোন প্রাণীর ক্রোমোসোমের সঞ্চারপথে (Locus) যদি সমজিন (Alike gene) থাকে, তবে তাকে হোমোজাইগাস (Homozygous) বলা হয়। কিন্তু তারা যদি বি-সম (Different gene) হয়, তবে তাকে হেটেরোজাইগাস (Heterozygous) বলা হয়।

করতে পারে না। সিকেল-সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির ($Hb_1^S Hb_1^S$) দেহের রক্তের 70% হিমোগ্লোবিন-S এবং বাকী 30% হিমোগ্লোবিন-A। যাদের মধ্যে সিকেল-সেল ট্রেইট ($Hb_1^A Hb_1^S$) আছে, তাদের রক্তে 25·45% হিমোগ্লোবিন S থাকে।

যে, আপাতদৃষ্টিতে সিকেল-সেল অ্যানিমিয়াকে মনুষ্যজাতির পক্ষে এক ভয়াবহ মারাত্মক রোগ মনে হলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম বিচার করলে তা মনে হবে না। কারণ এটি প্রমাণিত সত্য যে, সিকেল-সেল জিনের জন্তে অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন S-এর জন্তে যারা হেটেরোজাইগাস ($Hb_1^A Hb_1^S$), তারা প্লাস-
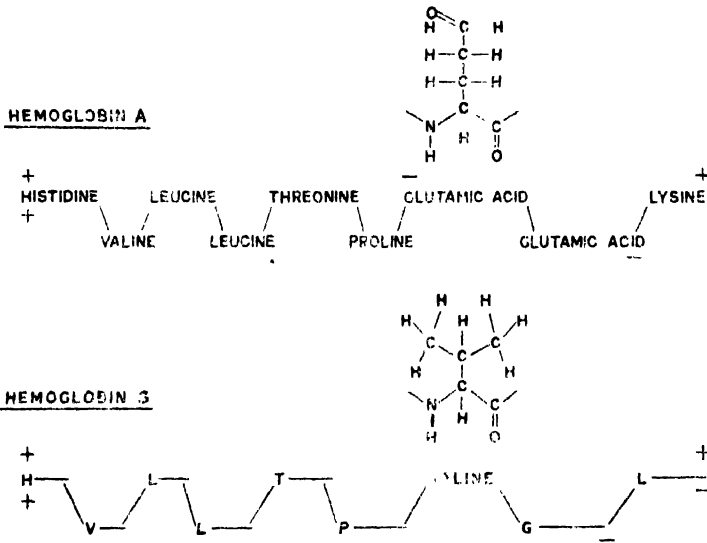
4নং চিত্র—হিমোগ্লোবিন A ও S-এর ষ্ট্রাকচারাল ফরমূলা। হিমোগ্লোবিন-S-এ হিমোগ্লোবিন-A-র গ্লুটামিক অ্যাসিডের স্থান ভ্যালিনদ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে।

উপরিউক্ত বিশদ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হিমোগ্লোবিন-A-এর β পলিপেপটাইডের একটি মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তে অন্ত একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ঐ স্থানে এলে হিমোগ্লোবিনটি নিজে সম্পূর্ণ অন্ত হিমোগ্লোবিনে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের দেহে কি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। হিমোগ্লোবিনের α ও β পলিপেপটাইডের নানা রকম অ্যামিনো অ্যাসিডের স্থান পরিবর্তনের জন্তে বহু নূতন অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি হয়, তবে রক্ষা এই যে, খুব কম সংখ্যকই আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

পরিশেষে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন

মোডিয়াম ফেলসিফেরাম (Plasmodium falicifarum) নামক জীবাণু থেকে উদ্ভূত ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে। কোন জনসংখ্যাতে হিমোগ্লোবিন S-এর জন্তে হোমোজাইগাস ($Hb_1^S Hb_1^S$), খুব কমসংখ্যক লোকেরা জননক্ষমতা লাভ করবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সঙ্গে বেশী সংখ্যক লোকেরা হিমোগ্লোবিন S-এর হেটেরোজাইগাস ($Hb_1^A Hb_1^S$) অবস্থায় ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনুকূলে যায় এবং সেই জন্তেই এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, বিশ্বের ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যেই হিমোগ্লোবিন S-এর আধিক্য।

মৌলের উৎস সন্ধানে

অনিলকুমার দে*

পর্যায়-সারণীর (Periodic Table) মৌল পদার্থগুলি কি ভাবে উদ্ভূত হলো এবং পৃথিবীতে কি ভাবে স্থান পেলো—এই সব অতি মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির রহস্য। আমাদের পৃথিবী হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম [পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic number) 1 থেকে 92) পর্যন্ত মৌল পদার্থের দ্বারা গঠিত। এই গঠন-রহস্য তথা মূল সৃষ্টির রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান করতে হলে বিজ্ঞানীদের সাধনার গতিপথ বেয়ে আমাদের কল্পনাকে বিস্তৃত করতে হবে 650 কোটি বছর আগে সৃষ্টির ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা দেবাদিদেব ব্রহ্মা। সীমাহীন, অন্তহীন মহাশূন্যে ধ্যানসমাহিত আদিদেব ব্রহ্মার ধ্যাননেত্র উন্মীলিত হবার মুহূর্তটি সৃষ্টির ব্রাহ্ম মুহূর্ত। কোটি সূর্যের প্রভা বিচ্ছুরিত করে অগ্নিনির্ঝর শত শত স্রোতে উৎসারিত হয়ে দিকে দিকে সারা বিশ্ব প্লাবিত করলো। সেই অগ্নিময় সৃষ্টির কোটি কোটি বছর পরে শান্ত হলো বিষ্ণুর মঙ্গলময় শঙ্খনাদে—মহাছন্দে বন্দী হলো গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। এই পৌরাণিক কাহিনীর মূল সুরের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যগুলির আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়।

সুদূর পদার্থ (Remote matter) সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা চলেছে বহু বছর ধরে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিজ্ঞানী (Cosmologist) ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে। তাঁরা গবেষণা কেন্দ্রীভূত করেছেন পৃথিবীতে ও সৌরমণ্ডলে মৌল পদার্থগুলির আপেক্ষিক প্রাচুর্যের (Relative abundance) তথ্যের উপর এবং সৃষ্টিতত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁরা অমূল্য তথ্য আহরণ করেছেন ভূত্বক, মহাসমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের গঠন-বিশ্লেষণের দ্বারা। তাছাড়া সুদূর নীহারিকা, নক্ষত্র থেকে বিকিরিত আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের অভ্যন্তরস্থ মৌলগুলি সনাক্ত করা যায়। এমন কি দূর-দূরান্তের ছায়াপথ বেয়ে হাইড্রোজেনের কলধ্বনি মুখরিত করে জ্যোতিবিজ্ঞানীর যন্ত্রকে (21 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ)।

মৌলের আপেক্ষিক প্রাচুর্য

জাগতিক ও মহাজাগতিক (Cosmic) উপকরণ থেকে সারা বিশ্বের মৌলের আপেক্ষিক প্রাচুর্য সম্বন্ধে মোটামুটি নিখুঁত চিত্র উন্মোচিত (1নং চিত্র)। সারা বিশ্বের পদার্থগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক প্রাচুর্য সর্বাধিক—মোট পরমাণু-সংখ্যার শতকরা 93 ভাগ এবং মোট পদার্থের ওজনের শতকরা 76 ভাগ। এর পরেই স্থান হিলিয়ামের—মোট পরমাণু-সংখ্যার শতকরা 7 ভাগ এবং মোট ওজনের শতকরা 23 ভাগ। পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight) বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাচুর্য হ্রাস পেতে থাকে এবং লেখচিত্রের দ্রুত অবতরণ লক্ষিত হয়। এই অবতরণের প্রবণতার প্রথম আকস্মিক ব্যতিক্রম দেখা যায় লৌহবর্গের মৌলগুলির (Iron group) ক্ষেত্রে। এই মৌলগুলি প্রকৃতিতে পার্শ্ববর্তী মৌলগুলির তুলনায় 10,000 গুণ বেশী পরিমাণে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য,

*বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

হিলিয়ামের পরবর্তী মৌলগুলির সমষ্টিগত পরিমাণ বিশ্বের ভরের (Mass) মাত্র শতকরা 1 ভাগ।

মৌল সৃষ্টির তত্ত্ব

জর্জ গ্যামো (George Gamow), হান্স বেথে (Hans Bethe) ও ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle)-এর তত্ত্ব থেকে মৌল সৃষ্টির একটি সুসমঞ্জস চিত্র পাওয়া যায়।

$$4\,{}^{1}_{1}H \longrightarrow 2\,{}^{2}_{1}H + 2\,e^{+}$$ (পজিট্রন)

$$2\,{}^{2}_{1}H + 2\,{}^{1}_{1}H \longrightarrow 2\,{}^{3}_{2}He$$

$$2\,{}^{3}_{2}He \longrightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}^{1}_{1}H$$

$$4\,{}^{1}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,e^{+}$$ (পজিট্রন)
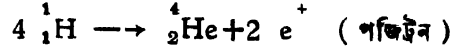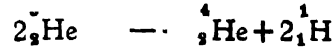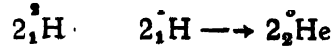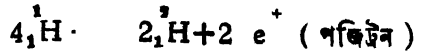
এই চক্রে (p p cycle) আরও কিছু বিক্রিয়া হয় বলে অনেকের ধারণা।
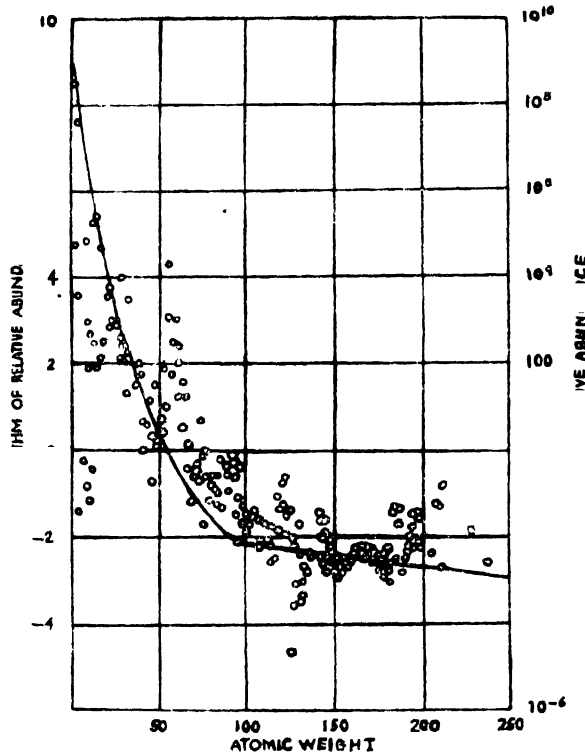
1নং চিত্র—মৌলের আপেক্ষিক প্রাচুর্য

আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের মতে মৌল গঠন নক্ষত্রপুঞ্জের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিপিণ্ডের মধ্যেই হয়েছিল। পরমাণু-বিজ্ঞানীদের দৃঢ় ধারণা যে, নক্ষত্রপুঞ্জের ও সূর্যের তাপশক্তির উৎস হলো কেন্দ্রক-বিক্রিয়া (Nuclear reaction)—হাইড্রোজেন থেকে এর ভারী আইসোটোপ ও হিলিয়ামের উদ্ভব (প্রোটন-প্রোটন চক্র: Proton-proton cycle)

${}^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{1}H + {}^{1}_{1}H$; ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$। বিকল্প কেন্দ্রক-বিক্রিয়া* কার্বন-

---
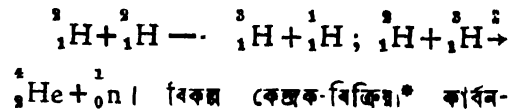
*কেন্দ্রক-বিক্রিয়া বলতে বোঝায় পরমাণু-কেন্দ্রকের উচ্চশক্তিসম্পন্ন পরমাণুকণার বিক্রিয়া। যেমন, কার্বন কেন্দ্রক ${}^{12}_{6}C$-এর (পরমাণু-ক্রমাঙ্ক =6 এবং পারমাণবিক ভর=12) সঙ্গে প্রোটন কণার (1H) বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন-13 (${}^{13}_{7}N$) এবং গামা রশ্মি।

নাইট্রোজেন চক্র (Carbon-Nitrogen Cycle ; C-N Cycle) :

$$ {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{13}_{7}N + \gamma \text{ (গামা রশ্মি)} $$
$$ {}^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + e^{+} \text{ (পজিট্রন)*} + \nu \text{ (নিউট্রিনো)†} $$
$$ {}^{13}_{6}C + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{14}_{7}N + \gamma $$
$$ {}^{14}_{7}N + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{15}_{8}O + \gamma $$
$$ {}^{15}_{8}O \rightarrow {}^{15}_{7}N + e^{+} + \nu $$
$$ {}^{15}_{7}N + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{4}_{2}He $$

$$ 4\,{}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2e^{+} + 26{\cdot}8\text{Mev} $$
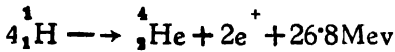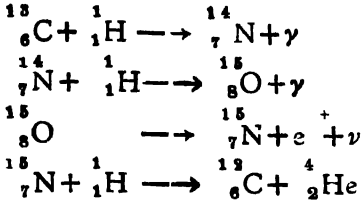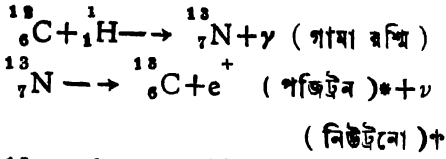
উপরিউক্ত কেন্দ্রক-বিক্রিয়ায় 26·8 Mev অর্থাৎ 2·68 কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উদ্ভূত হয়।

আমাদের সৌরমণ্ডলের সূর্যে হিলিয়ামের গাঢ়ত্ব শতকরা 90 ভাগের বেশী—প্রোটন-প্রোটন চক্রই সেখানে সম্ভাব্য বিক্রিয়া এবং কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র মুখ্য বিক্রিয়া নয়। উভয় চক্রের মূল বিক্রিয়া এক অর্থাৎ হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামের উদ্ভব এবং সঙ্গে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রের মূল শর্ত 2 কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা; চক্র একবার পূর্ণ হতে 60 লক্ষ বছর সময় লাগে।

কেন্দ্রক-বিক্রিয়া আবিষ্কারের পর রাদারফোর্ড 1920 সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে যা সম্ভব, তা সৌরদেহে সংঘটিত হওয়া শক্ত নয়।

আইনষ্টাইনের সূত্র $E=mc^2$ (E—শক্তি, m—পদার্থের ভর, c=আলোকের গতিবেগ) অনুযায়ী শক্তিকে পদার্থে এবং পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে পদার্থ ছিল শক্তির গর্ভে অর্থাৎ তখন কেবলমাত্র শক্তির আধিপত্য ছিল। সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল একটি কেন্দ্রীয় বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, যার অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা ছিল প্রায় 50 লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই প্রচণ্ড তাপে পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল না—শুধু ছিল পরমাণুকণাগুলি—প্রোটন (Proton), নিউট্রন (Neutron) ও ইলেকট্রন (Electron)। এদের গতীয় শক্তি প্রায় 10,000 ইলেকট্রন ভোল্ট (সাধারণ তাপে গতীয় শক্তি 10^{-2} ইলেকট্রন ভোল্ট)। কেন্দ্রক-বিক্রিয়ার এই অনুকূল পরিবেশে প্রোটন-প্রোটন চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই চক্রে হিলিয়াম কণার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশঃ এর গাঢ়ত্ব বর্ধিত হয়। কিছুক্ষণ পরে যখন হাইড্রোজেন জ্বালানীর পরিমাণ হ্রাস পায়, তখন মূল অগ্নিকুণ্ডের কেন্দ্র শীতল হতে থাকে এবং ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচনের ফলে মাধ্যাকর্ষণজনিত বল (Gravitational force) বৃদ্ধি পায় এবং কেন্দ্রের (Core) তাপমাত্রা বর্ধিত হয়। বহির্মণ্ডলের উপরিতল আকস্মিক বৃদ্ধি পায় এবং তাথেকে তেজ-বিকিরণের ফলে (লাল আলো) মূল নক্ষত্র বা নীহারিকা একটি 'লাল দৈত্য' (Red giant) নামে অভিহিত হয়।

এইবার নক্ষত্র বা নীহারিকাদেহের তাপমাত্রা প্রায় 10 কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। হিলিয়াম কণাগুলি থেকে সম্মিলন বিক্রিয়ায় (Fusion reaction) ধারাবাহিকভাবে স্থায়ী লৌহবর্গের মৌলগুলি পর্যন্ত সৃষ্ট হয়।

$$ {}^{4}He \rightarrow {}^{8}Be \underset{\text{(ক্ষণস্থায়ী)}}{} \rightarrow {}^{12}C \rightarrow {}^{16}O \rightarrow {}^{20}Ne \rightarrow {}^{24}Mg \cdots\cdots \rightarrow {}^{56}Fe $$
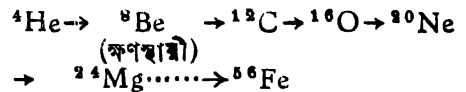
বেরিলিয়াম-8 অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী কেন্দ্রক, যা গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়াম কণার সঙ্গে সম্মিলন বিক্রিয়ায় কার্বন কেন্দ্রকে (${}^{12}_{6}C$) পরিণত হয়। প্রকৃতিতে বেরিলিয়াম-8 পাওয়া যায় না। এর স্থায়ী আইসোটোপ বেরিলিয়াম-9 আকরিকে দেখা যায়। হিলিয়াম ও কার্বনের অন্তর্বর্তী মৌল—লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ও বোরন

---

*পজিট্রন—ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মী কণা: আধান+1;

† নিউট্রিনো—অন্যতম অস্থায়ী কেন্দ্রক কণা; আধান শূন্য এবং ভর ইলেকট্রনের চেয়ে কম।

প্রথম পর্যায়ে সৃষ্ট হয় না। এগুলি গৌণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারী মৌলগুলিকে প্রোটনকণার দ্বারা আঘাত করলে কখনও কখনও লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ও বোরন কেন্দ্রক-বিক্রিয়াজাত খণ্ড কেন্দ্রক হিসাবে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ সৌরদেহে বা নক্ষত্রদেহে সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাপমাত্রা 1·5 কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী হওয়ায় কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রের প্রাধান্য থাকে। কার্বন থেকে প্রোটন সম্মিলন বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন-15 কণা পর্যন্ত সৃষ্ট হয়। এথেকে কার্বন-12 ও হিলিয়াম

$$^{1}H \quad {}_{13} \quad {}^{1}H \quad {}_{14}$$
$$^{12}C \longrightarrow C$$
$$^{1}H \qquad {}^{1}H$$
$$\longrightarrow {}^{15}N \longrightarrow {}^{12}C + {}^{4}He$$
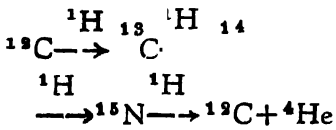
উৎপন্ন হয়। এই পর্যায়ে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সমস্ত আইসোটোপ উদ্ভূত হয়।

৩য় পর্যায়ে প্রোটন বিক্রিয়ায় অক্সিজেন থেকে অক্সিজেন-17 নিওন থেকে নিওন-21 সৃষ্টি হয়। এখন অক্সিজেন-17, নিওন-21 ও কার্বন-13 (দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপন্ন) হিলিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অস্থায়ী কেন্দ্রক সৃষ্টি করে, যা থেকে প্রচুর নিউট্রন উৎসারিত হয়। এই ধরণের বিক্রিয়া গবেষণাগারে পরীক্ষায় সমর্থিত হয়েছে। এইবার নিউট্রন বিক্রিয়ায় (Neutron capture) লৌহবর্গের মৌলগুলি ধারাবাহিকভাবে ভারী মৌলগুলি (বিসমাথ পর্যন্ত, পরমাণু-ক্রমাঙ্ক 83) উৎপন্ন করে। বিসমাথের পরবর্তী মৌলগুলি তেজস্ক্রিয় এবং অস্থায়ী।

কোন এক দৈত্যাকায় নক্ষত্রের বর্ণালী থেকে টেক্নিশিয়ামের (মৌল 43) অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। টেক্নিসিয়াম অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় মৌল। এর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী আইসোটোপের অর্ধায়ুকাল* 2 লক্ষ 16 হাজার বছর। কাজেই নক্ষত্রের জন্মের অনেক পরে নিশ্চয়ই এই মৌল উদ্ভূত হয়েছিল। এমন কি কোন বিস্ফোরণশীল দৈত্যাকায় নক্ষত্রের বর্ণালীতে ক্যালিফোর্ণিয়াম-254 (পরমাণু-ক্রমাঙ্ক 98)-এর অস্তিত্বের (অর্ধায়ুকাল=55 দিন) ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ক্যালিফোর্ণিয়ামের আবিষ্কার হয়েছিল 1952 সালে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে তাপকেন্দ্রক বিস্ফোরণের (Thermonuclear explosion) ভস্মরাশি থেকে।

উপরিউক্ত মৌলগুলির সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়েছিল মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে। ধারাবাহিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে নক্ষত্রদেহের বিস্ফোরণ ঘটলো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রদেহের কিয়দংশ মৌল পদার্থসমেত তীব্র বেগে বিক্ষিপ্ত হয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লো। এইভাবে সৌরমণ্ডল ও গ্রহরাজির সৃষ্টি হলো। জ্বলন্ত অগ্নিগোলকের অবস্থা থেকে কোটি কোটি বছর ক্রমাগত তেজবিকিরণের পর আমাদের পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল ও শান্ত অবস্থায় এলো—ক্রমে ক্রমে ভূত্বক, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদির উদ্ভব হলো। প্রাচীনতম নীহারিকা থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন যে, সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্ত ছিল প্রায় 650 কোটি বছর আগে। উল্কাপিণ্ড বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের সৌরমণ্ডলের বয়স প্রায় 450 কোটি বছর। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম শ্রেণী (Uranium seris) থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আমাদের পৃথিবীর বয়স প্রায় 300 কোটি বছর।

অতএব আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে, পৃথিবীতে আমরা যে মৌলগুলি দেখতে পাই এবং যা পর্যায়-সারণী রচনা করেছে, তাদের সৃষ্টি হয়েছিল দূর-দূরান্তের এক নীহারিকা দেহে।

---

* অর্ধায়ুকাল (Half-life Period)—যে সময়ের মধ্যে মূল তেজস্ক্রিয়তা অর্ধেক (50%) হ্রাস পায়।

সঞ্চয়ন

ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম

অনেক দেশের ইতিহাসেই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেক সময়ই দেখা গেছে, কিন্তু এই বছর জুলাই মাসে আমেরিকার প্রায় 20 কোটি অধিবাসী একটি ব্যাধির উচ্ছেদসাধনের অভিযানে যে একাগ্রতা নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্যই উল্লেখযোগ্য।

এই সংগ্রাম নবাগত মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিরুদ্ধে। প্রায় 60 বছর আগে এই ধরণের আর এক জাতের ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগ-জীবাণু সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রোগের কবলে বিশ্বে 2 কোটি লোক প্রাণ হারায়। এর মধ্যে 5 লক্ষেরও বেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসও আগের বারের মতই মারাত্মক হবে কিনা, তা ডাক্তারেরা জোর দিয়ে সঠিক বলতে পারছেন না। কিন্তু সেই রকম বিপজ্জনক হবে না একথাও নিশ্চিত বলা যায় না। এই রোগ-জীবাণুর মূলোচ্ছেদ করবার জন্যে প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড খুব তৎপর হয়ে উঠেছেন। স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে বিনামূল্যে এই রোগের প্রতিষেধক টিকাদানের জন্যে তাঁর অনুরোধমত মার্কিন কংগ্রেস 13 কোটি 50 লক্ষ ডলার মঞ্জুর করেছে।

যে সব রোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী-দের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে ফ্লুয়ের স্থান পঞ্চম। এই ব্যাধির কবলে বছরে গড়ে 17 হাজার মার্কিন নাগরিক প্রাণ হারায়।

ফ্লুয়ের আক্রমণের কথা আগে থেকে বলা যায় না। যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা এসে উৎপাত করতে পারে। বিগত শতাব্দীতে এই রোগের করাল গ্রাসে সমগ্র বিশ্ব সাতবার পতিত হয়। ফ্লুর সংক্রমণ হয় হঠাৎ। রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে এমন মানুষের 20 থেকে 53 শতাংশ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। শিশুরাই এই রোগে আক্রান্ত হয় বেশী। আর এর আক্রমণে বৃদ্ধ এবং পুরনো জটিল ব্যাধিগ্রস্তরাই বেশী প্রাণ হারায়।

ডাক্তারেরা বলেছেন ঠিক প্রতি 10 বছর অন্তর নতুন জাতের ফ্লুয়ের ভাইরাস পৃথিবীকে গ্রাস করে। একটি ভাইরাসের সঙ্গে আরেকটির কোন মিল খুঁজে পাওয়া ভার। এক টিকা অন্য ধরণের ফ্লুয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল। নতুন ফ্লু এসে যখন তার তাণ্ডব সুরু করে, তখন মানুষ হয়ে পড়ে একেবারে নাচার ও অসহায়। এই সুযোগে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে রোগের দাপট সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

1918 সালে এই ধরণের তাণ্ডব একবার পৃথিবীকে আন্দোলিত করে তুলেছিলো। এর পর আবার তাণ্ডব দেখা দেয় 1957 সালে। সেবার এই তথাকথিত এশিয়ান ফ্লু-র সূত্রপাত হয়েছিল মধ্য চীনে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই রোগ-জীবাণু অধিকাংশ প্রতিবেশী দেশে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর মাত্র চার মাসের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল এর করাল গ্রাসে পড়ে। এর তিন মাস পরেই এই রোগ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে সুরু করে সারা দেশের উপর দিয়ে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। চিকিৎসকেরা

তৎপর হয়ে উঠলেন। খুব তাড়াতাড়ি করে তাঁরা রোগাক্রান্তদের 50 হাজার টিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব হলো না। কেননা, রোগ-জীবাণুর সংক্রমণশক্তি ছিল আরও দ্রুতগামী। সেইবার একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই রোগ প্রায় 4 কোটি 50 লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে 70 হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

বছর দশেক পরে 1958 সালের জুলাই মাসে নতুন আর এক জাতের ফ্লুয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এর নাম হংকং ফ্লু। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই নতুন রোগ ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত হয়। আর বছরের শেষাশেষি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 50টি অঙ্গরাজ্যের সবগুলিতে মহামারীর আকারে দেখা দেয়। প্রায় 5 কোটি লোক হংকং ফ্লু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে প্রায় 28 হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। এর পর এই ইনফ্লুয়েঞ্জা পরের বছর ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিস্তারলাভ করে।

এই বছরের (1976) ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন আর এক ধরণের ভয়াবহ ফ্লুর আগমন ঘটে। এটি হচ্ছে সোয়াইন ফ্লু। নিউইয়র্ক সিটির দক্ষিণে নিউ জার্সির এক সৈনিক শিবিরে এই ফ্লু প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই ফ্লুয়ের ভাইরাস জীব-বিজ্ঞান-গত দিক থেকে 1918 সালের ফ্লুয়ের ঠিক অনুরূপ। এই রোগ-জীবাণু সাধারণতঃ শূকরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আর যে সব কৃষকদের কারবার শূকর নিয়ে তারাও এই ফ্লুতে কখনো কখনো আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমানে এই ধরণের ফ্লু সেনাবাহিনীতে একজন থেকে আর একজনের মধ্যে সংক্রামিত হতে দেখা যাচ্ছে। এই রোগে আক্রান্ত 12 জনের রোগ সঠিকভাবে নির্ণীত হয়েছে বটে, তবে শয়ে শয়ে লোক যে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তা বলা যায়।

এই সোয়াইন ফ্লু এশিয়ান ফ্লুর পুনরাবৃত্তি, না তার চেয়েও মারাত্মক, বা 1918 সালের মারাত্মক ফ্লু-র মত ভয়াবহ, তা কিন্তু এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করছে—যে কোন নবাগত ফ্লুই মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। জর্জিয়ার অন্তর্গত আটলান্টায় অবস্থিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এই অভিমত ব্যক্ত করেছে।

তবে এবারের ফ্লুর উচ্ছেদসাধনের সংগ্রামে ডাক্তারেরা কোমর বেঁধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবেন। কেননা, তাঁরা নিরস্ত্র নন। তাঁদের হাতে এবার রয়েছে টিকা, যা 1918 সালে ছিল না। আর যদি টিকাতে কোন সুফল পাওয়া না যায়, তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক্স, 1918 সালে যা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

সবচেয়ে আশার কথা হচ্ছে এই যে, ফ্লুর এবারকার সংক্রমণ রোধ করতে ডাক্তারেরা হাতে বেশ কিছু সময় পেয়েছেন। এই নতুন জর ধরা পড়েছে ফেব্রুয়ারীর মাসে। এমন কি পরবর্তী ফেব্রুয়ারী পর্যন্তও এর বিস্তার অব্যাহত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই এবারের নতুন ফ্লুর মোকাবিলা করবার জন্যে আমেরিকার চিকিৎসকেরা যথেষ্ট সময় পেয়েছেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস উভয়েই এই ব্যাপারে দ্রুত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ফ্লুর উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর হয়ে গেছে। সেই অর্থে রোগ প্রতিষেধক টিকা কিনে সেগুলির যথাযোগ্য বিলিব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বে-সরকারী ডাক্তারদের মাধ্যমে আমেরিকার প্রতিটি নাগরিককে ঐ সমস্ত টিকাদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এই অভিযানের লক্ষ্য হলো 95 শতাংশ আমেরিকাবাসীকে ফ্লু প্রতিষেধক টিকাদান করা। এই প্রতিষেধক টিকা পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী কর্মচারী, কয়েদী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে

প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে এই টিকা 70 থেকে 90 শতাংশ কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয়েছে। আগেকার চেয়ে এই টিকা অনেক বেশী কার্যকরী। যারা কোনভাবে ফ্লু-দ্বারা আক্রান্ত হবে, তাদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হবে।

বৃদ্ধ এবং পুরনো রোগীদের নিয়েই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী ভাবনা। এই পর্যায়ের রোগাক্রান্তদের টিকাদানের কাজ জুলাই-এর মধ্যে সেরে ফেলা হয়েছে। এরপর সুরু হয়েছে বড় অভিযান। তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি মানুষকে টিকা দেবার গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এতবড় কর্মযজ্ঞে ইতিপূর্বে আর কখনও হাত দেওয়া হয় নি। 1918 সালের মহামারীর সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিচর্যার জন্যে 10 লক্ষ ডলারের বিনিময়ে হাজার হাজার ডাক্তার নিয়োগ করেছিলেন। এখনকার তুলনায় ঐ প্রচেষ্টা খুবই সামান্য।

ষাটের দশকে আমেরিকায় 10 কোটি অধিবাসীকে পোলিওর টিকা দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অল্প বয়সী। বর্তমানের অনুপাতে তখনকার প্রচেষ্টা ঠিক অর্ধেকের মত হবে। ঐ সময় টিকাদানের কাজ দু-বছরেরও বেশী সময় ধরে করা হয়েছিল, ছ-মাস সময়ে করা হয় নি।

গত বছর ব্রেজিল মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযানে হস্তক্ষেপ করে। সে দেশের মোট লোকসংখ্যা 10 কোটির মধ্যে 8 কোটি লোককে টিকা দেওয়া হয়েছিল। মাত্র পাঁচ দিন অভিযান চালিয়ে সাও পাওলো শহরের 95 লক্ষ লোককে টিকা দেওয়া হয়।

বসন্ত রোগ নির্মূল করবার জন্যে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী এক সার্থক অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছিলো। একজন একজন করে প্রতিটি মানুষকে টিকা না দিয়ে বসন্তরোগ চিরতরে উচ্ছেদের জন্যে ঐ রোগ প্রতিবার প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়াই ঐ অভিযানের লক্ষ্য ছিল। কাজেই মাত্র মাস ছয়েক অভিযান চালিয়ে থেকে না গিয়ে বসন্তের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই 10 বছরেরও বেশী সময় অবিশ্রান্ত ধারায় চালানো হয়েছিলো।

যতদূর জানা গেছে, বিশ্বের মাত্র আর একটি দেশই তার জনসাধারণকে সোয়াইন ফ্লুর কবল থেকে রক্ষা করবার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। ক্যানাডা দেশের 2 কোটি 30 লক্ষ অধিবাসীর অর্ধেককে এই টিকা প্রয়োগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

1976 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

রসায়নবিদ্যা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লিপ্সকম্ব রসায়ন শাস্ত্রে 1976 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—বোরন এবং হাইড্রোজেনের যৌগ—বোরেন (Borane) সম্পর্কিত কাজের স্বীকৃতি হিসাবে।

নোবেল অ্যাকাডেমী ডক্টর লিপ্সকম্বের অন্যান্য কাজ—যেমন এনজাইমের গঠন ও ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কিত কাজেরও প্রশংসা প্রশস্তিপত্রে করেছেন।

ডক্টর লিপ্সকম্ব যে কাজের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন, তার ফলে বিভিন্ন বোরেন এখন মানসিক ব্যাধি ও মস্তিষ্কের টিউমারের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। বোরেন আগে ছিল একটা বিষাক্ত বিস্ফোরক পদার্থ। তার এই রূপান্তর ঘটিয়েছেন ডক্টর লিপ্সকম্ব। তাঁর এই কাজে আর একজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ীর প্রভাব পড়েছে, তিনি হলেন লিনাস পলিং। ভবিষ্যতে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসাতেও বোরেন ব্যবহৃত হতে পারে।

এই সম্ভাবনা সম্পর্কে ডক্টর লিপ্সকম্ব বলেছেন, "আমার এখনও ধারণা, আমার চূড়ান্ত কাজ এখনও পড়ে আছে। তিনি বলেছেন, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বোরেনের ব্যবহার এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। আরও অনেক কিছু করা বাকী।"

20 বছর ধরে বোরেন সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন ডক্টর লিপ্সকম্ব। তিনিই প্রথম এর গঠন-বিন্যাস নির্ধারণ করেন এবং বীক্ষণাগারে কেলাসিত বোরেন সৃষ্টি করতে সমর্থ হন এবং তা এক্স-রে দিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর লিপ্সকম্ব স্নাতক হন এবং ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট থেকে পান পি. এইচ. ডি।

শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিদ্যা

1976 সালে শারীরবৃত্ত এবং চিকিৎসা বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া মেডিক্যাল স্কুলের প্রোফেসর বারুচ. এস. ব্লুমবার্গ এবং মেরিল্যাণ্ড অঙ্গরাজ্যের বেথেসডাস্থিত ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোলজিক্যাল ডিজিজেস্-এর প্রোঃ ডি. কার্লেটন গাজডুশেক। সংক্রামক ব্যাধির উৎস এবং বিস্তার সম্পর্কিত নতুন আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার অর্জন করেছেন তাঁরা।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের এই আবিষ্কারের সূত্র পান।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রক্তমস্তু বা সিরামে ডক্টর ব্লুমবার্গ একটি নতুন উপাদান আবিষ্কার করেন, যার নাম এখন অষ্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন হলো একরকম রাসায়নিক পদার্থ, যা দেহে রোগ প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি বা বিরুদ্ধ শক্তি তৈরী করে। লিভার বা যকৃতের এক রকম রোগ হলো হেপাটাইটিস। অত্যন্ত প্রবল ধাঁচের এক রকমের হেপাটাইটিস রোগের ভাইরাসের অঙ্গ হিসাবে এই অ্যান্টিজেনের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডক্টর ব্লুমবার্গের এই আবিষ্কারের ফলে হেপাটাইটিস রোগের ভাইরাসের প্রতিষেধক হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ভ্যাকসিন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। যাঁরা অন্যের জন্যে রক্ত দেন, তাঁদের রক্ত যাচাই করে নেবার সময়ে এই হেপাটাইটিসের অস্তিত্ব পরীক্ষার কাজেও এর ব্যবহার হচ্ছে। ডক্টর ব্লুমবার্গ মনে করেন যে, আফ্রিকা, দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান এবং ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়ার কোন কোন

অঞ্চলে যে বিশেষ ধরণের রক্তের ক্যান্সার দেখা যায়, এই ভ্যাকসিনের সাহায্যে তার চিকিৎসা করা যাবে।

সুরিনাম, নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, উত্তর মেরু, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বহু স্থানের পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দাদের রক্তরস নিয়ে গবেষণা করতে করতে ডক্টর ব্লুমবার্গ চিকিৎসা-মূলক নৃতত্ত্ববিদ হয়ে পড়েন, অর্থাৎ এমন একজন চিকিৎসাবিদ, যাঁর কাজ হলো বিভিন্ন সামাজিক এবং বংশগতির মানুষ কেন এক এক রকম অসুখের শিকার হয় বা হয় না, তারই কারণ খুঁজে বের করা। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়াতে তিনি এই বিষয়ে অর্থাৎ মেডিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি বিষয়ে একটি পাঠক্রম ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। নিউইয়র্কে তাঁর জন্ম, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োকেমিষ্ট্রিতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রী পান।

ডি. কার্লেটন গাজডুশেক যে কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তার সূত্রপাত নিউ গিনিতে। সেখানে মারাত্মক 'কুরু' রোগের কারণ বের করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি এমন একটি ভাইরাসের সন্ধান পান, যা সংক্রামিত হয় প্রাচীন একটি উপজাতীয় প্রথার মাধ্যমে—মানুষের মস্তিষ্ক ভক্ষণের ফলে। পৃথিবীর অন্য অনেক মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গেও ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত।

নিউগিনিতে অবশ্য এই রোগ এখন আর নেই, কারণ প্রাচীন প্রথাটিও পরিত্যক্ত হয়েছে আবিষ্কারের পর থেকে। এখানে যে ভাইরাস আবিষ্কার করেন ডক্টর গাজডুশেক, তা হলো 'স্লো ভাইরাস' শ্রেণীর। এই ভাইরাসই মাল্টিপল স্কেলেরোসিস বা 'পার্কিনসন্স্ ডিজিজ-'এর মত অনেক জটিল স্নায়বিক গোলযোগের কারণ বলে মনে করা হয়। ভেড়াদের মধ্যে স্ক্র্যাপি বলে এক রকম রোগ হয়, তারও কারণ এই ভাইরাস। এদের বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নিত করা খুব কঠিন (অত্যন্ত ক্ষুদ্র) এবং এদের বিনাশ করাও দুঃসাধ্য। অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি এবং কড়া রসায়নেও এদের কোন ক্ষতি হয় না।

এই ধরণের 'স্লো ভাইরাস' নিয়ে এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর গাজডুশেক। পেডিয়াট্রিক্স জেনেটিক্স, ইমিউনোলজি এবং নিউরোলজিতে তিনি বিশেষজ্ঞ।

এঁর পিতা এবং মাতা হাঙ্গেরীয় এবং গাজডু-শেকের জন্ম নিউইয়র্কে। ইউনিভার্সিটি অব রচেষ্টার এবং হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডিগ্রী নিয়ে 1953 সালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ-এ যোগ দেন।

পদার্থবিদ্যা

1976 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ষ্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাকসিলেটর সংস্থার প্রোফেসর বার্টন রিচ্টার (45) এবং ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রোফেসর স্যামুয়েল সি. সি. টিং (45) যুগ্মভাবে। ডক্টর রিচ্টার আবিষ্কার করেছেন একটি মৌল পদার্থ 'পি. এস. আই', এবং ডক্টর টিং আবিষ্কার করেছেন মৌল পদার্থ 'জে'। 1974 সালে কয়েক মাসের আড়াআড়িতে এঁরা দু-জন এককভাবে এই দুটি পদার্থ আবিষ্কার করেন, যা পরে পদার্থবিদ্যার জগতে বিপ্লব এনে দেয়। প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম পদার্থ, যা হলো সকল পদার্থের আদি উপাদান, সেই 'বিল্ডিং ব্লক্স'-এর রহস্য-সন্ধানে এই আবিষ্কার যুগান্তকারী। শীঘ্রই হয়তো সকল রকম পদার্থের প্রকৃতির ব্যাখ্যা করবার মত একটা সাধারণ তত্ত্ব এথেকে গড়ে উঠতে পারে।'

বহু কাল ধরে ধারণা ছিল যে, পরমাণুই হচ্ছে প্রকৃতির অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয় আদি

উপাদান। তার পর জানা গেলো যে, অ্যাটম বা পরমাণুর মধ্যে আছে ইলেকট্রন, যা নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে এবং নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন আর নিউট্রন। ইলেকট্রন হলো মৌল পদার্থ, তাতে আর কিছু নেই। কিন্তু অ্যাকসিলেটর নিয়ে গবেষণা করতে করতে (অ্যাকসিলেটরের মাধ্যমে প্রোটনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়) ইঙ্গিত পাওয়া গেলো যে, প্রোটনের মধ্যে আরও কিছু থাকা সম্ভব।

দশ বছর আগে প্রোফেসর মারে গেলম্যান এবং জর্জ জিউইগ (দু-জনেই এখন ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজিতে আছেন) তত্ত্বগত-ভাবে এই মত প্রতিষ্ঠা করেন যে, প্রোটনের মধ্যে 'আরও কিছু' পদার্থটি হচ্ছে 'কোয়ার্ক'। সেই একই সময়ে হার্ভার্ড-এর প্রোফেসর শেলডন গ্লাশ এবং স্ট্যানফোর্ড-এর জেমস জর্কেন তত্ত্ব হিসাবে প্রমাণ করেন যে, কোয়ার্ক চার রকমের হবার কথা—সাধারণ প্রাকৃতিক জগতে দু-ধরণের কোয়ার্ক দেখা যায়, যেমন—গাছপালা, ফুল, মানুষ ইত্যাদির গঠনে, আর দু-ধরণের কোয়ার্কের দেখা পাওয়া যেতে পারে কেবল অ্যাকসিলেটরের মধ্যে, যেখানে পরমাণুকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা সম্ভব। এই শেষের দু-জাতের কোয়ার্ককে বলা হলো 'স্ট্রেঞ্জ' এবং 'চার্ম'। রিচটার-টিং আবিষ্কারের ফলে 'স্ট্রেঞ্জ' কোয়ার্কের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে অন্যটির ব্যাপারে কোন কিছু প্রমাণিত হয় নি।

'জে' এবং 'পি. এস. আই'-এর আবিষ্কারে পদার্থবিদ্‌দের মধ্যে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। সুইডিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সেস-এর প্রোফেসর গোস্টা একস্পং বলেন, 'মৌল উপাদানের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের তুলনা নেই। সারা পৃথিবীর যে সব বীক্ষণাগারে পদার্থের প্রকৃতি এবং নতুন পদার্থ নিয়ে গবেষণা চলছে, সেই সব বীক্ষণাগারের কাজের ধারাই বদলে গেছে এর দৌলতে।'

এই আবিষ্কারের ফলে প্রকৃতিসম্পর্কিত সমস্ত রকম তত্ত্বকে যেমন একটি মাত্র তত্ত্বে সংহত করবার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি পদার্থের আসল রূপটি সঠিকভাবে জানবার পথও খুলে যেতে পারে এবং সেটি জানতে পারলে বিজ্ঞানীরা পদার্থের পরমাণুকে যথেচ্ছভাবে বাছাই করে কেটে-ছেঁটে ইচ্ছামত পদার্থ তৈরী করতে পারবেন।

ডক্টর রিচ্‌টারের জন্ম নিউ ইয়র্কে 1931 সালে। ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজি থেকে পি এইচ-ডি পান, তারপর স্ট্যানফোর্ডে যোগ দিয়ে তাঁর আবিষ্কারের সংগ্রাম নির্মাণ করেন।

ডক্টর টিং-এর বাবা-মা চৈনিক; ডক্টর টিং জন্মেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি বড় হয়েছেন চীনে, বারো বছর বয়স পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা পান নি।

মিশিগান ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পি. এইচ-ডি পান এবং কলম্বিয়া অঙ্গরাজ্যের বার্কলেতে ইউ-নিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার কাজ সুরু করেন। বর্তমানে তাঁর কার্যক্ষেত্র দুটি—ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং জেনিভার ইউরোপিয়ান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার।

গবেষণা-সংবাদ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় আবর্জনা

পারমাণবিক জ্বালানীর তৈরী ও ব্যবহার পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরে অপ্রয়োজনীয় এবং তেজস্ক্রিয় নানা বস্তুর সৃষ্টি হয়। এসমস্ত বস্তুকে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা বলা হয়। এগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে পড়ে পারমাণবিক বিভাজনের সময় সৃষ্ট তীব্র তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বিভিন্ন আইসোটোপ; আর অন্য ভাগে পড়ে রিয়্যাক্টরের দহন-অবশেষ থেকে নূতন জ্বালানী তৈরী করবার সময় সৃষ্ট অ্যাক্টিনাইডসমন্বিত নানারকম বস্তু। এইভাবে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ একটি বিরাট সমস্যা। 1959 সাল থেকে 1972 সালের মধ্যে এই সমস্যা আলোচনার জন্যে ভিয়েনার আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা সাতবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এর পরে অষ্টম সম্মেলন হয় 1976 সালে। এই সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তরল তেজস্ক্রিয় পদার্থকে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করবার সমস্যা। এর কারণ, কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করলে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সেগুলিকে সংরক্ষণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের গবেষণার ফল উপস্থাপিত করা হয়।

পারমাণবিক চুল্লীর কাছেই নিরাপদ স্থানে অস্থায়ীভাবে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা সংরক্ষণ করবার জন্যে কঠিন পদার্থের যেসব রূপভেদ আলোচনা করা হয়, সেগুলি হলো ক্যালসাইন (অর্থাৎ আবর্জনাকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তাদের মধ্যস্থিত উদ্বায়ু পদার্থকে বের করে দেবার পর যে কঠিন পদার্থ পড়ে থাকে), কাচ এবং সেরামিক পদার্থ। এই সম্পর্কে ক্যালসাইনকে সরাসরি আরও উত্তপ্ত করে কাচে পরিণত করবার পদ্ধতি কিংবা তা না করে ক্যালসাইনকে গলিত কাচের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাবার পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি আলোচিত হয়। উচ্চ-তেজস্ক্রিয়তার ক্যালসাইনকে ধাতব বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করাবার পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলও আলোচিত হয়। এইভাবে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত তেজস্ক্রিয় আবর্জনা, উত্তাপ, তেজস্ক্রিয়তা এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফল উক্ত সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই কঠিন পদার্থগুলির যান্ত্রিক স্থায়িত্বের অবস্থাই বা কিরকম, তাও বর্ণনা করা হয়। বিভিন্ন গবেষকদের মতে, সংরক্ষণের দিক থেকে ক্যালসাইনরূপে ঐ আবর্জনা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। বিভাজনজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থকে সংরক্ষণ করবার জন্যে কাচ, সেরামিকই উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাচের মধ্যে ফস্‌ফেট কাচ অপেক্ষা বোরো-সিলিকেট কাচ এই কাজের জন্যে অনেক বেশী উপযোগী।

কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত এই তেজস্ক্রিয় আবর্জনা কিভাবে সংরক্ষিত হলে বহু দিন বাদেও এর যান্ত্রিক স্থায়িত্ব বজায় থাকবে, সে বিষয়ে একটি পরীক্ষার ফল জানা গেছে। 1960 সালে কতকগুলি নেফেলাইন-সিয়েনাইট কাচখণ্ডের মধ্যে অধিক তীব্রতার তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অনু-

প্রবেশ করিয়ে ঐ কাচখণ্ডকে জলের নীচে রাখা হয়েছিল। 16 বছর বাদে ঐ কাচ খণ্ডগুলির যান্ত্রিক স্থায়িত্বের পরীক্ষা করে এই সম্বন্ধে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে।

বেশ কিছু গবেষক বিভিন্ন ভূস্তরে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত তেজস্ক্রিয় আবর্জনা সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এঁদের মতে, দীর্ঘস্থায়ী অ্যাক্টিনাইড তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি আবর্জনা থেকে প্রথমে পৃথক করে পৃথকভাবে উপযুক্ত ভূস্তরে সংরক্ষণ করবার বিষয়টি আরও বিশদভাবে গবেষণার যোগ্য। মাঝারী ও কম তীব্রতার তেজস্ক্রিয় আবর্জনা নিয়েও কিছু আলোচনা হয়।

আলোচ্য সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ ফল থেকে এটা বোঝা যায় যে, এই ব্যাপারে প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক দূর এগিয়েছে। প্রতিটি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী খুঁটিনাটি ব্যাপারের সমাধান পেতে হলে এই সম্পর্কে আরও গবেষণা প্রয়োজন। আশা করা যায়, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পরীক্ষাগারের গবেষণালব্ধ ফলকে প্রযুক্তিস্তরে উন্নীত করবার কাজে বিভিন্ন রাষ্ট্র উপযুক্ত গবেষণার জন্যে অর্থবরাদ্দ করে এই বিষয়ে মানুষের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করবেন।

সুনীলকুমার সিংহ*

---

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

বিজ্ঞান-সংবাদ

সংক্রমণ রোধে রক্তের উপাদান

এমন অনেক লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার রোগী দেখা যায়, যাদের শরীরে নানাভাবে সংক্রমণ দেখা দেয়। এর প্রতিকারের জন্যে তাদের অনেক ওষুধ খেতে হয়। এর ফলে প্রায়ই রোগের সংক্রমণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই ধরণের রোগীর সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে রক্তের গবেষকেরা একটা উপায় উদ্ভাবন করেছেন। অরিগনের (যুক্তরাষ্ট্র) অন্তর্গত পোর্ট ল্যাণ্ডের প্যাসিফিক নর্থওয়েষ্ট রেড ক্রস ব্লাড সেণ্টারের ডাক্তারেরা এই ধরণের সংক্রমণ প্রশমিত করবার জন্যে রক্তের শ্বেত কোষ জমাট-করা অবস্থায় ব্যবহার করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছে লিউকাফেরেসিস। এই ব্যবস্থার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে উপযুক্ত রক্তদাতার নির্বাচন। যে দাতার রক্তের উপাদান রোগীর রক্তের উপাদানের সঙ্গে মিলে যাবে, তার রক্ত থেকেই সংক্রমণ প্রতিরোধক এই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করা হয়। এজন্যে সাধারণতঃ রোগীর কোন আত্মীয়কেই বেছে নেওয়া হয়। রক্তদাতার রক্ত প্রায় ঘণ্টাতিনেক ধরে বিশেষ ফিল্টারের মাধ্যমে ছেঁকে নেওয়া হয়। ডাক্তারেরা সংক্রমণ প্রতিরোধকারী রক্তের উপাদানগুলিকে বেছে নেন। তারপর তা জমাট করে নেওয়া হয় এবং পরে তা ধীরে ধীরে রোগীর রক্তনালীর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর

দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—1976

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা
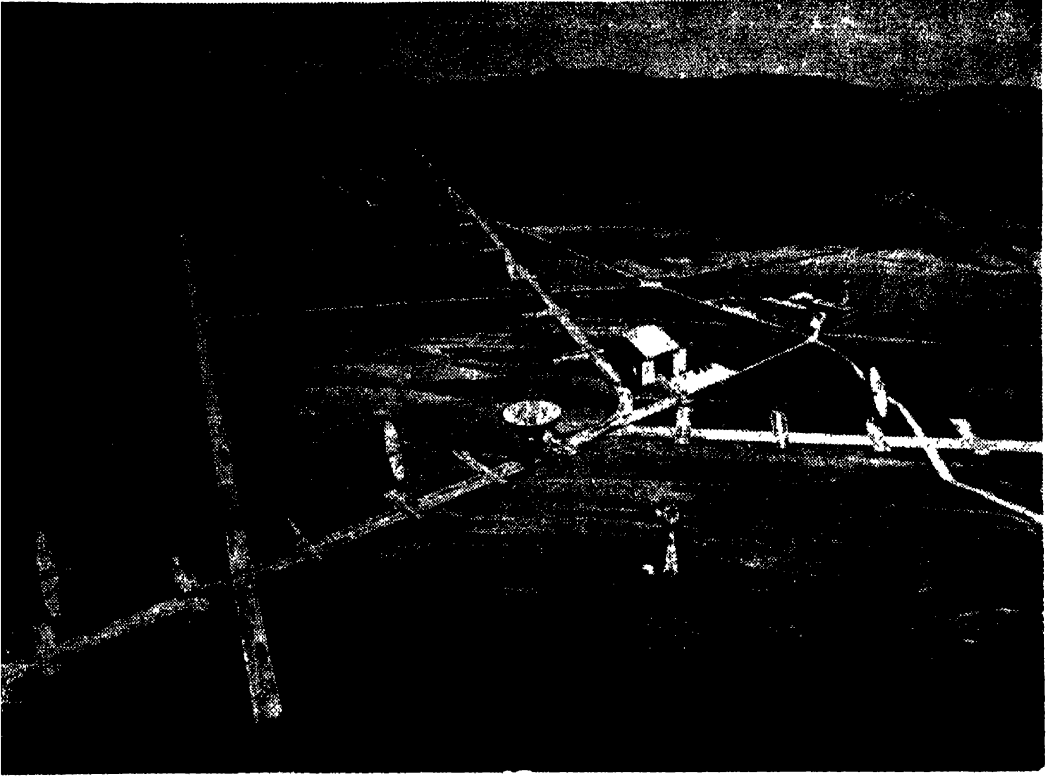
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রেডিও-টেলিস্কোপ

নিউ মেক্সিকোর সকোরোর নিকটবর্তী স্থানে "The very large array" নামক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রেডিও-টেলিস্কোপ যন্ত্রটি তৈরী হচ্ছে। এতে থালার আকৃতির 27টি অ্যান্টিনা থাকবে। প্রত্যেকটি থালার ব্যাস 25 মিটার, ওজন 160 টন। এগুলিকে Y আকারের তিনটি রেল রোডের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মহাকাশের কোয়াসার, কৃষ্ণ গহ্বর, তারকার সংগঠন, গ্যালাক্সির গঠনবিন্যাস, আন্তর্নাক্ষত্রিক অণু সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। 1981 সালের মধ্যে যন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে কার্যোপযোগী হবে।

কেপ্লারের তৃতীয় সূত্র

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মহাকাশের রহস্য মানুষকে আকর্ষণ করেছে। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ে মানুষের কল্পনার বিরাম ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে মানুষ কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবে পদার্পণ করলো। ঐ সময় সর্বপ্রথম টাইকো ব্রাহী (Tycho Brahe) নামে একজন ড্যানিশ জ্যোতির্বিদ্ আকাশে গ্রহগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করেন এবং বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান পরিমাপ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত তথ্যাবলী মোটামুটি নিখুঁত ছিল। এই সমস্ত তথ্য কয়েক বছর ধরে অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করে এবং নিজে আরও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করে আর একজন ড্যানিশ জ্যোতির্বিদ্ জন কেপ্লার গ্রহের গতিসংক্রান্ত তিনটি সূত্র উপস্থাপিত করেন (1609—1618)। এগুলি গ্রহের গতিসংক্রান্ত কেপ্লারের সূত্র (Kepler's of Laws Planetary Motion) নামে পরিচিত। কেপ্লারের এই সূত্র তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই সূত্রগুলি থেকে গ্রহের গতির সুষ্ঠু বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু কি কারণে গতি ঐ প্রকার হয়, তা জানা যায় না। পরবর্তীকালে এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে নিউটন তাঁর মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন।

কেপ্লারের সূত্রগুলি প্রায় চার-শ' বছর আগে উদ্ভাবিত হলেও আজও এদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে—সূর্যকে কোন একটি ফোকাসে রেখে সমস্ত গ্রহ উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে—সূর্য এবং গ্রহ সংযোগকারী কাল্পনিক রেখা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই ক্ষেত্রফল পরিক্রমা করে অর্থাৎ গ্রহের ক্ষেত্রীয় বেগ (Areal velocity) ধ্রুবক। তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে—কোন উপবৃত্তে পরিক্রমণের পর্যায়কালের বর্গ গ্রহের উপবৃত্তাকার পথের দীর্ঘ অক্ষার্ধের (Semimajor axis) ঘনের সমানুপাতী। তিনটি সূত্র পৃথকভাবে বলা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে তৃতীয় সূত্রটি প্রতিপন্ন করা যায়। সাধারণতঃ কলন (Calculus) ব্যবহার করে কেপ্লারের সূত্রগুলি প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে কলনের ব্যবহার না করে কি ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে তৃতীয় সূত্রটিকে প্রতিপন্ন করা যায়, তা দেখানো হবে। এজন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রাবলী ও উপবৃত্তের ধর্মাবলীর ব্যবহার করা হবে। নীচে এরূপ দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হলো।

প্রথম সূত্রানুযায়ী গ্রহের পথ উপবৃত্তাকার। ধরা যাক, কোন উপবৃত্তাকার পথের দীর্ঘ অক্ষার্ধ a এবং হ্রস্ব অক্ষার্ধ (Semiminor axis) b। আরও ধরা যাক, কেন্দ্র (c) থেকে ফোকাসের দূরত্ব c. $\therefore b^2=a^2-c^2$—(1), কারণ উৎকেন্দ্রিকতা

$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$ এবং $cF=ae=c$। যদি গ্রহটির পর্যায়কাল T হয়, তবে গ্রহটির ক্ষেত্রীয় বেগ হবে, $\frac{\pi ab}{T}$ যা গ্রহটির ক্ষেত্রে ধ্রুবক। যে মুহূর্তে গ্রহ দীর্ঘ অক্ষ অতিক্রম করে, সেই মুহূর্তে ক্ষেত্রীয় বেগ হবে $\frac{1}{2}rv$ যেখানে $r=$ সূর্য থেকে সেই মুহূর্তে গ্রহটির দূরত্ব এবং $v=$ ঐ মুহূর্তে গ্রহটির বেগ। গ্রহের দীর্ঘ অক্ষ অতিক্রম করবার ক্ষেত্র মাত্র দুটি দীর্ঘ অক্ষের দুই প্রান্ত A এবং B (চিত্র)। A এবং B বিন্দুদ্বয় অতিক্রম করবার সময় যদি গ্রহের বেগ যথাক্রমে V_2 এবং V_1 হয়, তবে
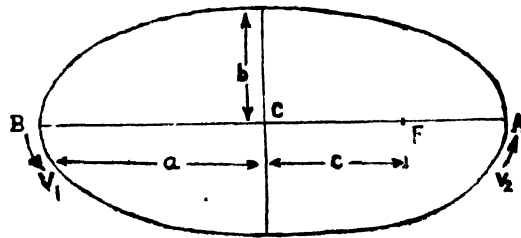
$$\frac{\pi ab}{T}=\frac{1}{2}(a+c)v_1=\frac{1}{2}(a-c)v_2\cdots\cdots(2)$$

সমীকরণ (1) ও (2) থেকে b-কে অপনীত (Eliminate) করে পাই,

$$V_1^2=\frac{4\pi^2a^2}{T^2}\left(\frac{a-c}{a+c}\right) \quad \text{এবং} \quad V_2^2=\frac{4\pi^2a^2}{T^2}\left(\frac{a+c}{a-c}\right)\cdots\cdots\cdots(3)$$

প্রথম পদ্ধতি—দীর্ঘ অক্ষের দুই প্রান্ত (A, B) অতিক্রমকালে গ্রহটির শক্তি যথাক্রমে

$$\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{GmM}{a+c}\ \ldots\ldots(4) \quad \text{এবং} \quad \frac{1}{2}mv_2^2-\frac{GmM}{a-c}\ldots\ldots(5)$$

(এখানে $m=$ গ্রহের ভর এবং $M=$ সূর্যের ভর)

শক্তির সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী (4) ও (5) সমান, অর্থাৎ

$$\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{GmM}{a+c}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{GmM}{a-c}\ldots\ldots(6)$$

সমীকরণ (3) ও (6) থেকে পাই, $\frac{4\pi^2a^2}{2T^2}\left(\frac{a-c}{a+c}\right)-\frac{GM}{a+c}=\frac{4\pi^2a^2}{2T^2}\left(\frac{a+c}{a-c}\right)-\frac{GM}{a-c}$

সরল করে পাই, $T^2=\frac{4\pi^2a^3}{GM}\ldots(7)$ অর্থাৎ $T^2\propto a^3$—অতএব কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রটি পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—দীর্ঘ অক্ষের দুই প্রান্তে উপবৃত্তের বক্রতার ব্যাসার্ধ (Radius of curvature) $r=\frac{a^2-c^2}{a}$ (a ও c-এর অর্থ প্রথম পদ্ধতির অনুরূপ)। এখানে

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বক্রতার ব্যাসার্ধের এই সূত্রটি নির্ণয়ে কলনের ব্যবহার করা হয়। তবে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি থেকে সুরু করলে কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্র' প্রমাণের জন্যে আর কলনের ব্যবহার করতে হয় না। অবশ্য রবার্ট ভীনস্টক (Robert Weinstock) দাবী করেছেন যে, কলনের ব্যবহার ব্যতিরেকেই তিনি উপবৃত্তের আলোচ্য সূত্রটি নির্ণয় করতে পেরেছেন।

B-তে অবস্থানকালে (চিত্র) গ্রহের উপর বলের অরীয় উপাংশ (Radial component) হবে $\frac{Gm}{(a+c)^2}$. a^2-c^2. অর্থাৎ $v_1^2 =$

GM $\left(\frac{a-c}{a+c}\right)$......(8)

সমীকরণ (8) এবং সমীকরণ (3)-এর প্রথম সমীকরণ থেকে পাই,

$$\frac{4\pi^2a^2}{T^2}\left(\frac{a-c}{a+c}\right)=\frac{GM}{a}\left(\frac{a-c}{a+c}\right)$$ অর্থাৎ $T^2 \propto a^3$ (কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্র)।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রবন্ধে উপস্থাপিত দুটি পদ্ধতিতেই কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রটি কেপ্‌লারের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র থেকে কলনের ব্যবহার ব্যতিরেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তাই কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রটি পৃথক একটি সূত্র কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

প্রদীপকুমার দত্ত*

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী

জেনে রাখ

(1) কতগুলি মানুষে একটি সূর্য ?

মানুষের শরীরে পরমাণুর সংখ্যা কত? এই প্রশ্নে অনেকেই ঘাবড়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের শরীরে পরমাণুর সংখ্যা প্রায় 10^{27} ; অর্থাৎ 1-এর ডানদিকে 27টি শূন্য বসালে যত হবে—তত। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুর সংখ্যা প্রায় 10^{75} ; অর্থাৎ এক্ষেত্রে 1.এর ডানদিকে পঁচাত্তরটি শূন্য বসাতে হবে।

সূর্য ও একজন সাধারণ স্বাস্থ্যবান মানুষের ভর তুলনা করে দেখা গেছে যে, সূর্যের ভর প্রায় 10^{28} সংখ্যক মানুষের ভরসমষ্টির সমান। এই হিসাবে সূর্যের পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়ায় $10^{27}\times10^{28}$; অর্থাৎ 10^{55}। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে প্রায় চার-শ' কোটি বছর আগে। মানুষ এসেছে তার অনেক পরে। পৃথিবী সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও

সৃষ্টি হয়েছে—একথা ধরে নিয়ে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা আনুপাতিক হার হিসাব করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানুষের শরীর রেখে দেওয়া যদি সম্ভব হতো, তাহলে ঐ 10^{28} সংখ্যক মানুষের শরীর পেতে 1,000,002,000 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ 1,000,002,000 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মাবে তাদের সমস্ত ভরের সমষ্টির সমান হবে সূর্যের ভর।

(2) আকাশে নক্ষত্র কত ?

শোনা যায়, গোপাল ভাঁড়কে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি আকাশে কত নক্ষত্র আছে তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন গোপাল ভাঁড় ইচ্ছামত একটা বিরাট সংখ্যা বলে রাজাকে বোকা বানিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আকাশে যে তারা দেখছি, তা গুণতে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মত সময় লাগবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। খালি চোখে যে অর্ধগোলক দেখা যায়, তাতে প্রায় 3500 নক্ষত্র আছে। সুতরাং এই অর্ধগোলকে 3500 নক্ষত্র দেখতে পাবার কথা। কিন্তু নানা কারণে সবগুলি দেখা যায় না। আকাশে যে দিন চাঁদ দেখা যাবে না, এমন একটি মেঘমুক্ত পরিষ্কার রাত্রিতে অর্ধগোলকে প্রায় 2500 নক্ষত্র দেখা যায়। এদের প্রত্যেকটি গুণতে এক সেকেণ্ড করে সময় নিলে গাণিতিক হিসাবে প্রায় 41 মিনিটের কিছু বেশী সময়ে ঐ 2500 নক্ষত্র গোনা সম্ভব হবে। তবে অবশ্য একযোগে যদি গোনা সম্ভব হয়!

যুগলকান্তি রায়

ভেবে কর (1)

1. মনে করা যাক, পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সোজাসুজি একটি চোঙাকৃতি ছিদ্র আছে। এই অবস্থায় যদি উত্তর মেরু থেকে একটি পাথরের বল ঐ ছিদ্র দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় (চিত্র) তাহলে তা...।
(পৃথিবীর অভ্যন্তরে বলটির ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হবে না ধরে নেওয়া যাক)
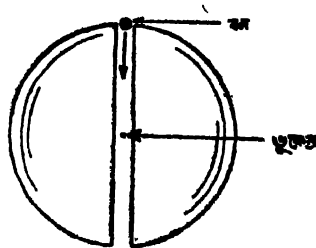
(ক) বলটি দক্ষিণ মেরু দিয়ে ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে যাবে ;

(খ) পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে থেমে যাবে ;

(গ) সরল দোলগতিতে ভূকেন্দ্রের সাপেক্ষে স্পন্দিত হবে।

2. ধরা যাক, AB রেখার নীচের অংশে জলের মধ্যে একটি সমকোণী চৌপল ডোবানো অবস্থায় আছে (চিত্র)। p_1, p_2, p_3 এবং p_4 যথাক্রমে P_1, P_2, P_3 ও P_4 বিন্দুর উদস্থৈতিক চাপ নির্দেশ করে। এই অবস্থায়................................ হবে।

(ক) $p_1+p_2=p_3+p_4$

(খ) $p_1+p >p_3+p_4$
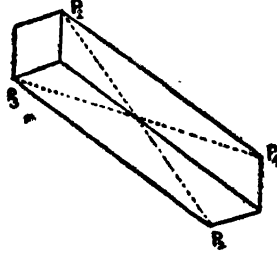
(গ) $p_1+p_2<p_3+p_4$

3. কোন মোটর গাড়ী মোট পথের অর্ধেক পথ 60 কি. মি. / ঘ. বেগে এবং বাকী পথ 40 কি. মি. / ঘ. বেগে অতিক্রম করে। ঐ গাড়ীটির গড় বেগ হবে......... কি. মি. / ঘ.

(ক) 48 কি. মি. / ঘ.

(খ) 49 কি. মি. / ঘ.

(গ) 50 কি. মি. / ঘ.

(সমাধান 561 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুলালকুমার সাহা*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

ভেবে কর (2)

1. 12টি সমআকৃতিবিশিষ্ট বল আছে। এদের মধ্যে একটির ওজন অবশিষ্ট বলগুলি থেকে আলাদা—তা বেশী অথবা কম সে সম্পর্কে কিছু বলা নেই। তুলাদণ্ডের দু-দিকের পাল্লায় মাত্র তিনবার চাপিয়ে ঐ বিশেষ বলটিকে সনাক্ত করতে হবে। এর জন্যে কোন বাটখারা নেওয়া চলবে না। প্রতিবার এক সঙ্গে পাল্লায় কতগুলি বল চাপানো যাবে—সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সর্ত মেনে চলবার প্রয়োজন নেই।

2. একদিন বিখ্যাত গণিতবিদ্ রামানুজন্ কোন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। একটি মোটরগাড়ীর নম্বর দেখে বিদেশী বন্ধু মন্তব্য করলেন—সংখ্যাটি অত্যন্ত নীরস, এর কোন বিশেষ ধর্ম নেই। কিন্তু রামানুজন্ প্রতিবাদ করে বললেন—এই সংখ্যাটি হলো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, যাকে দুটি পূর্ণসংখ্যার ঘনফলের যোগফল হিসাবে দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়। ঐ সংখ্যাটি কত ? [টিকা : যেমন ধরা যাক, 28 সংখ্যাটিকে লেখা যায় 3^3+1^3 ; অর্থাৎ এই সংখ্যাটিকে দুটি সংখ্যার ঘনফলের যোগফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু একে অন্য কোন দুটি ঘনফলের যোগফল হিসাবে প্রকাশ করা যায় না]

(সমাধান 563 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) দেবব্রত সরকার*

* পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্র

মডেল তৈরী

(1)

কৃষ্ণ বস্তুর বেশী তাপ শোষণের পরীক্ষা

বিকিরণ পদ্ধতির মাধ্যমে তাপ কোন বস্তুর উপর আপতিত হলে, ঐ তাপের কিছু অংশ বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত, কিছু অংশ শোষিত এবং বাকী অংশ বস্তুর মধ্য দিয়ে সংবাহিত হয়। তাপ যখন বস্তুর উপর এসে পড়ে, তখন সেই তাপ কৃষ্ণ বস্তু কর্তৃক অনেক বেশী পরিমাণে শোষিত হয়—খুব কম অংশই প্রতিফলিত বা সংবাহিত হয়ে
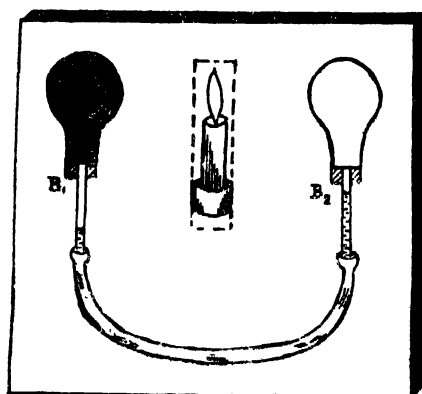
থাকে (আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর বেলায় আপতিত তাপের সমস্ত অংশই শোষিত হয়ে থাকে)। অন্যান্য বস্তুর তুলনীয় কৃষ্ণ বস্তু যে অপেক্ষাকৃত বেশী তাপ শোষণ করে নিম্নোক্ত পরীক্ষায়

মাধ্যমে তা লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষাটি স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও সহজে করে দেখতে পারে। এটি তৈরী করতে খুবই কম খরচ পড়ে।

B_1 ও B_2 দুটি ফিলামেণ্ট কেটে যাওয়া বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্। বালবের গোড়ার পীচ সূচালো কোন যন্ত্র [মোটা গুণ সুচ বা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুচিয়ে ভিতরের অংশ (ফিলামেণ্ট ধারক)] বের করে নিতে হবে। যে-কোন একটি বাল্‌ব্, ধরা যাক B_1-কে আগুনের শিখায় সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে ভুসাকালির আস্তরণ ফেলা হলো। বাল্‌ব্ দুটির নিম্নাংশ মাপমত রবারের ছিপি দিয়ে ভাল করে বন্ধ করা হয়। প্রত্যেকটি ছিপির মাঝখানে ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়ে প্রায় 15 সে.মি. লম্বা দুটি কাচনল প্রবেশ করানো থাকে। ছিপির ছিদ্র ও কাচনলের প্রস্থচ্ছেদ সমান নেওয়া হয়। নল দুটির নিম্নাংশ একটি রবার বা প্লাষ্টিক নলের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত। সমগ্র ব্যবস্থাটি একটি উল্লম্ব কাঠের বোর্ডের উপর ক্ল্যাম্প-এর সাহায্যে আটকানো থাকে (চিত্র)। এই ব্যবস্থায় প্লাষ্টিক বা রবারের নলসমেত কাচের টিউব দুটি U-আকৃতি ধারণ করে এবং B_1 ও B_2 বাল্‌ব্ দুটি একই অনুভূমিক তলে অবস্থান করে। এখন যে কোন একটি নলসমেত ছিপি বাল্‌ব্ থেকে খুলে ঐ খোলা মুখ দিয়ে নলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যালকোহল ঢালা হলো, যাতে অ্যালকোহল তলের উচ্চতা কাচনলের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওঠে। তরলের সমোচ্চশীলতা ধর্ম অনুযায়ী দুটি কাচের নলে অ্যালকোহল তল সমান উচ্চতায় অবস্থান করবে। বাল্‌ব্ দুটির ঠিক মাঝখানে মোমবাতি বসাবার জন্যে একটি ধারক আছে এবং পিছন থেকে স্ক্রু-এর সাহায্যে ধারকটিকে একটি স্লিট বেয়ে নামানো বা ওঠানো যায়। মোমবাতি পুড়ে ছোট হয়ে গেলেও ধারকটি উঠিয়ে বা নামিয়ে মোমবাতির শিখাকে প্রয়োজনমত উচ্চতায় আনা যায়। সব সময় মোমবাতির শিখা ও বাল্‌ব্ দুটির মাঝের অংশ একই সরলরেখায় থাকে। পরীক্ষা করবার আগে সমগ্র ব্যবস্থাটিকে বায়ুনিরুদ্ধ করে নিতে হবে (এর জন্যে মোম এবং গ্রীজ ব্যবহৃত করা যেতে পারে)।

বাল্‌ব্ দুটির আয়তন সমান। কাচের নলের ভিতর অ্যালকোহল তলের উচ্চতা সমান হওয়ায় নলসমেত বাল্‌বে আবদ্ধ বায়ুর আয়তনও সমান। এখন একটি জ্বলন্ত মোমবাতিকে বাল্‌ব দুটির ঠিক মাঝখানে রাখা হলো। এ অবস্থায় মোমবাতি থেকে দুটি বাল্‌বের দিকেই তাপশক্তি সমপরিমাণে বিকিরিত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে, B_1 বাল্‌বের সংলগ্ন নলে অ্যালকোহল তল ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে যাবে এবং ঐ সঙ্গে B_2 বাল্‌বের সংলগ্ন নলের অ্যালকোহল তল সমপরিমাণে উপর দিকে উঠে যাবে।

B_1 বাল্‌বে ভুসাকালির আস্তরণ থাকায় কৃষ্ণ বস্তুর ধর্ম অনুযায়ী B_2 বাল্‌বের তুলনায় তা অনেক বেশী পরিমাণে তাপ শোষণ করে। সুতরাং B_1 বাল্‌ব্ B_2 বাল্‌বের তুলনায় বেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। উত্তাপের ফলে B_1 বাল্‌বের বায়ু B_2 বাল্‌বের বায়ুর তুলনায় আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং তা বাল্‌বের সংযুক্ত টিউবের অ্যালকোহল তলের উপর বেশী

চাপ দেয়। এর জন্তেই B_1 বাল্‌বের সংলগ্ন নলের অ্যালকোহল তল B_2 বাল্‌বের সংলগ্ন নলের তুলনায় নীচে নেমে যায়।

এ পরীক্ষাটির মাধ্যমে কৃষ্ণ বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা ভাল করে লক্ষ্য করতে হলে মোটা মোমবাতি নিতে হবে যাতে জ্বলবার সময় আগুনের শিখা যথেষ্ট বেশী হয়। মোমবাতির পরিবর্তে লম্বা ধরণের বেশী ক্ষমতার বৈদ্যুতিক বাতি কিংবা বিশেষ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক হিটারে ব্যবহৃত তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটিয়েও তাপ উৎপন্ন করে পরীক্ষাটি করা যায়। তবে ঐ তাপের উৎসের দু-দিকে সমান দূরত্বে খুব কাছাকাছি বাল্‌ব্ দুটিকে একই ভাবে বসাতে হবে। পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে শ্রীআরতি পাল এটি তৈরী করেছেন।

মহুয়া দে

(2)

প্রারম্ভিক বেগসম্পন্ন পতনশীল বস্তুর গতি

একই উচ্চতা থেকে অবাধে বা অনুভূমিক বেগ নিয়ে কোন পতনশীল বস্তু একই সময়ে মাটিতে এসে পড়ে। তবে অবাধে পতনশীল বস্তু ঠিক উল্লম্বভাবে নীচে এসে পড়বে এবং প্রারম্ভিক বেগ দিয়ে ছাড়লে বস্তুটি অবাধে পতনশীল বস্তুর তুলনায় মাটিতে কিছুটা দূরত্বে (অনুভূমিক তলে) গিয়ে পড়বে। বস্তুর প্রারম্ভিক বেগ যত বাড়বে, তা
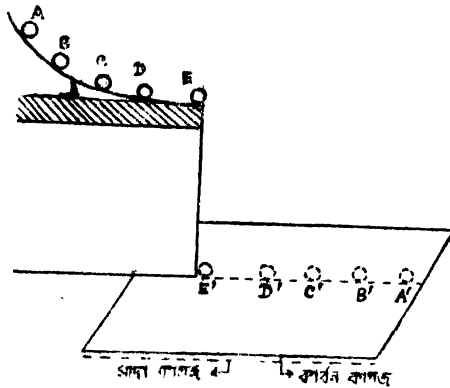
ততই বেশী দূরত্বে মাটিতে গিয়ে পড়বে; অর্থাৎ বস্তুর প্রারম্ভিক বেগ ও অনুভূমিক দূরত্ব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। আলোচ্য পরীক্ষাটিতে তা প্রমাণ করা যায়। পতনশীল বস্তু মাটিতে যে বিন্দুতে এসে পড়ে, সেখান থেকেই এই অনুভূমিক দূরত্ব মাপা হবে। মডেলটি অল্প খরচে তৈরী করা যায়।

কোন টেবিলের উপর একটি বক্রতলকে ধারকের সাহায্যে চিত্রের মত করে রাখা হয়েছে। এই বক্রতলের নীচের দিকের কিনারা প্রায় অনুভূমিক। বক্রতলটির উপর দিয়ে শুধুমাত্র একটি গোলাকার মার্বেল সহজে গড়িয়ে যেতে পারে। বক্রতলের বিভিন্ন স্থান থেকে কোন মার্বেলকে ক্রমান্বয়ে ছেড়ে দেওয়া হলে ঐ তলের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসবার জন্যে তলের অনুভূমিক কিনারায় এসে সেটি একটি নির্দিষ্ট অনুভূমিক বেগ অর্জন করে এবং মাটিতে উল্লম্বভাবে না পড়ে কিছুটা অনুভূমিক দূরত্বে এসে পড়ে। ধরা যাক, বক্রতলের A, B, C, D অবস্থান থেকে মার্বেলটি ছাড়লে তা মাটির উপর যথাক্রমে A′, B′, C′, D′ বিন্দুতে এসে পড়ে। বক্রতলের কিনারা E থেকে মার্বেলটিকে অবাধে ছেড়ে দিলে তা খাড়াভাবে নীচে E′ বিন্দুতে এসে পড়বে। A, B′, C′, D′ ও E′ বিন্দুগুলির অবস্থান জানবার জন্যে অনুভূমিক তলে একটি সাদা কাগজ রেখে তার উপর একটি কার্বন কাগজ রাখা হয়। এ অবস্থায় পতনশীল মার্বেলটি মাটিতে যে বিন্দুতে এসে পড়ে, পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সাদা কাগজের উপর এক একটি কালো গোলাকার ছাপ পড়ে যায়। পতনশীল বস্তুটির প্রারম্ভিক বেগ A, B, C, D ও E বিন্দুতে সহজেই নির্ণয় করা যায়। E′ বিন্দু থেকে A′, B′, C′, এবং D′ বিন্দুর দূরত্ব মেপে নেওয়া হলো। এথেকে পতনশীল বস্তুটির বিভিন্ন প্রারম্ভিক বেগের সঙ্গে টেবিলের পাদবিন্দু থেকে মার্বেলটির দ্বারা অতিক্রান্ত বিভিন্ন দূরত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। লেখচিত্রের মাধ্যমেও সহজেই এই সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে এটি তৈরী করেছেন শ্রীনিমাই মণ্ডল।

মহুয়া দে

(3)

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় নেমপ্লেটে 'ভিতর' / 'বাহির' সঙ্কেত

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মস্থলে বা বাড়ীতে বাইরের দরজায় তাঁরা আছেন কি নেই, তা বোঝাবার জন্যে তাঁদের নেমপ্লেটের সঙ্গে একটি কাঠ বা প্লাষ্টিকের পাতকে কাটা স্লিট বরাবর এপাশ-ওপাশ সরিয়ে পর্যায়ক্রমে 'ভিতর' (IN) ও 'বাহির' (OUT) লেখাকে চাপা দেওয়া হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিতরে থাকলে পাতটিকে সরিয়ে 'ভিতর'-কে এবং বাইরে থাকলে পাতটিকে সরিয়ে 'বাহির'-কে করে রাখা হয়। তবে এ ব্যবস্থা ততটা কার্যকরী নয়। অনেক সময় বাইরে থেকে মজা করবার জন্যে পাড়ার ছেলেরা 'ভিতর'-কে 'বাহির' এবং 'বাহির'-কে 'ভিতর' করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে। বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাহায্যে যদি এমন ব্যবস্থা করা যায়, যাতে 'ভিতর' বা 'বাহির' বাড়ীর ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তবে এই বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এখানে যে মডেলটির কথা আলোচনা করা হবে, তাতে ‘ভিতর’ ‘বাহির’—নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা থাকবে বাড়ীর ভিতরে। ধরা যাক. একটা বাড়ীতে তিনজন ভদ্রলোক থাকেন। তাঁদের নাম ধরা যাক মি. X, মি. Y, এবং মি. Z. বাইরের নেমপ্লেটে এঁদের প্রত্যেকের নামের পাশে একটি করে পুশ সুইচ থাকবে। নীচের বর্তনীতে এগুলি P_1, P_2, P_3 দিয়ে দেখানো হয়েছে। এছাড়া আর একটা সুইচ S থাকবে। এই সুইচটা বন্ধ করে যদি পুশ টেপা হয়, তাহলে তার পাশে নাম লেখা ব্যক্তি বাড়ীতে থাকলে তবেই বাড়ীর ভিতরে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি B বেজে উঠবে। ‘ভিতর’-‘বাহির’ নির্দেশ করবার জন্যে নেমপ্লেটের নীচে একটি কাঠের ছোট বাক্স বসাতে হবে। এই বাক্সের সামনের দিকটা
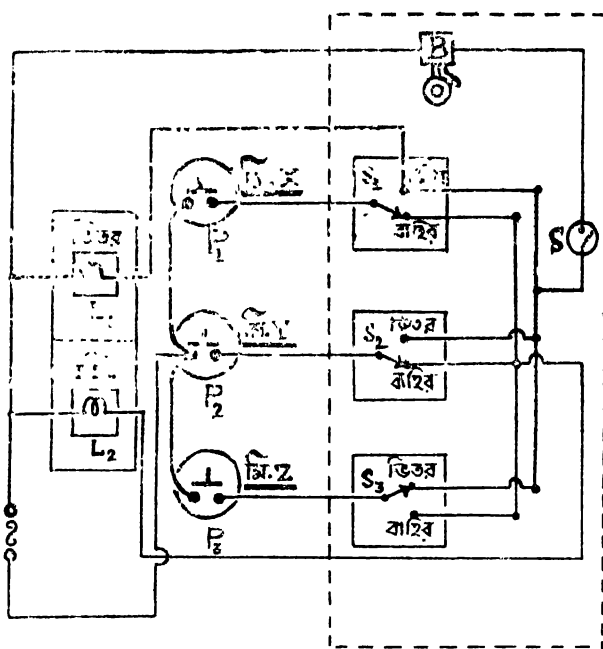
খোলা। এর মাপটা এমন করতে হবে, যাতে দুটি 15 ওয়াটের ল্যাম্প (L_1, L_2) মুখোমুখি বসিয়েও 3 সে. মি.-র মত জায়গা থাকে। এই জায়গার মধ্যে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে পার্টিশান দিতে হবে যাতে L_1-এর আলো L_2-এর ঘরে এবং L_2-এর আলো L_1-এর ঘরে না পৌঁছুতে পারে। এবার একটি মোটা কালো কাগজের (কালো কাগজের মাপ বাক্সের খোলা দিকের সমান হবে) একদিকে ‘ভিতর’ এবং অন্যদিকে ‘বাহির’ কথা দুটি স্টেনসিল কেটে লিখে দিতে হবে। কাগজের এমন জায়গায় এটা করতে হবে যেন ‘ভিতর’ বা ‘বাহির’ লেখা দুটি যথাক্রমে L_1 ও L_2 ল্যাম্প দুটির ঠিক সামনেই পড়ে। এবার কালো কাগজটির সমান মাপের একটি সাদা ড্রইং সিট এবং দুটি কাচ লাগবে। এখন যদি কাচ দুটির মাঝখানে প্রথমে সাদা কাগজ এবং তার নীচে স্টেনসিল কাটা

কালো কাগজটি রেখে বাক্সের খোলা দিকটাতে আটকে দেওয়া যায়, তাহলে সামনের কাচের তল সাদা দেখাবে কিন্তু বাক্সের ভিতরে L_1 কিংবা L_2 ল্যাম্প জ্বললে 'ভিতর' অথবা 'বাহির' শব্দটি দেখা যাবে। বাড়ীর ভিতরে মি. X, মি. Y এবং মি. Z-এর ঘরে একটি করে দ্বিমেরুবিশিষ্ট সুইচ থাকবে। এগুলিকে চিত্রে যথাক্রমে S_1, S_2 এবং S_3 দিয়ে দেখানো হয়েছে। S_1, S_2, S_3 এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টা B বাড়ীর ভিতরে থাকবে। চিত্রে ডট দিয়ে ঐ অংশকে বোঝানো হয়েছে। সুইচের মেরু একদিকে রাখা অবস্থায় বাইরের সংশ্লিষ্ট পুশ চেপে ধরলে বোর্ডে 'ভিতর' নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং অন্যদিকে রাখা অবস্থায় বোর্ডে 'বাহির' নির্দেশ পাওয়া যাবে। নেমপ্লেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে যখন বাড়ীতে আসবেন, তখন তাঁর নিজের সুইচের মেরুকে 'ভিতর' অবস্থানে এবং যখন বাড়ী থেকে বেরোবেন তখন 'বাহির' অবস্থানে রেখে দিয়ে যাবেন। চিত্রানুযায়ী বর্তনীটি তৈরী করলেই মডেলটি কাজ করবে। বর্তনীতে পরিবর্তী প্রবাহ দেখানো হয়েছে। সমপ্রবাহের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। কালো স্টেনসিল কাটা কাগজ ও সাদা ড্রইং শিটের মাঝখানে কোন রঙীন স্বচ্ছ সেলোফেন কাগজ রাখলে 'ভিতর'-'বাহির'। নির্দেশও রঙীন দেখাবে। পরিষদের হাতে-কলম কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীসুবোধ গুপ্তা এটি তৈরী করছে।

অর্পণ সেনগুপ্ত

ভেবে কর (1) প্রশ্নাবলীর সমাধান

1. পতনশীল বলটি পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের জন্যে ত্বরিত গতিতে কেন্দ্রের দিকে পড়বে। পৃথিবীর কেন্দ্রে এই আকর্ষণী বলের মান শূন্য। কাজেই বলটি যখন ভূকেন্দ্রে এসে পৌঁছুবে, তখন তার উপর পৃথিবীর আকর্ষণী বল ক্রিয়া করে না; কিন্তু গতিজাড্যের জন্যে বলটি কেন্দ্র ছাড়িয়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে এগিয়ে যাবে। এই অবস্থায় পৃথিবী বলটিকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। ফলে বলটি দক্ষিণ মেরুর দিকে অনেকটা পথ অতিক্রম করে পুনরায় কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসে। উপরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কেন্দ্রে বলটির উপর কোন আকর্ষণী বল থাকে না, কিন্তু ঐ অবস্থানে বলটিতে গতিজাড্য থাকে। এজন্যে বলটি উত্তর মেরুর দিকে অনেকটা পথ অতিক্রম করবে। তখন আবার বলটি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়। এভাবে বলটি একবার দক্ষিণ মেরুর দিকে এবং তার পরেই

উত্তর মেরুর দিকে গতি পায়; অর্থাৎ বলটি সরলদোলগতিতে কেন্দ্রের সাপেক্ষে স্পন্দিত হবে।

2. চিত্রানুযায়ী
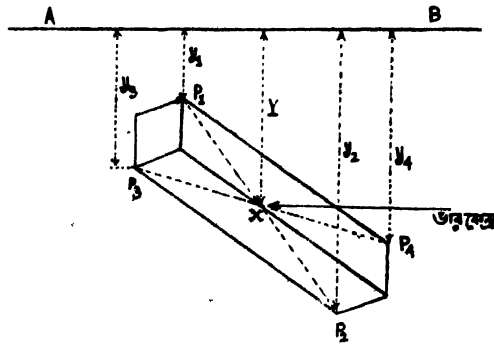
$$p_1 = y_1\rho g, \qquad p_3 = y_3\rho g$$
$$p_2 = y_2\rho g, \qquad p_4 = y_4\rho g$$

y_1, y_2, y_3, y_4 যথাক্রমে AB তল থেকে P_1, P_2, P_3 এবং P_4 বিন্দুর দূরত্ব। ρ এবং g যথাক্রমে জলের ঘনত্ব এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ। x বিন্দুটি সমকোণী চৌপলের ভারকেন্দ্র। x বিন্দু থেকে AB তলের দূরত্ব মনে করা যাক y.

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{y_3 + y_4}{2}$$

সুতরাং $$\frac{y_1 + y}{2} = \frac{y_3 + y_4}{2}$$

বা, $$y_1 + y_2 = y_3 + y_4$$

উভয় পক্ষকে ρg দিয়ে গুণ করলে—

$$y_1\rho g + y_2\rho g = y_3\rho g + y_4\rho g$$

অতএব $$p_1 + p_2 = p_3 + p_4.$$

3. প্রশ্নে মোটরগাড়ীর দ্বারা অতিক্রান্ত পথটির দূরত্ব দেওয়া নেই। ধরা যাক, ঐ দূরত্ব = x কি. মি.। প্রশ্নানুসারে

$$\frac{x/2}{60} + \frac{x/2}{40} \quad \frac{x}{v}$$

এখানে v = বেগ। বা, $\frac{1}{60} + \frac{1}{40} \quad \frac{2}{v}$

$\therefore \quad v = 48$ কি. মি./ঘ.

উঃ 1. প্রথমে বলগুলিকে 1 থেকে সুরু করে 12 পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হলো। এবার নিম্নলিখিত উপায়ে বলগুলিকে তুলাদণ্ডের পাল্লায় চাপানো হলো।

	বাঁ দিকের পাল্লা	ডান দিকের পাল্লা	
প্রথম বার—	1, 4, 5, 12	7, 9, 10, 11	.........(I)
দ্বিতীয় বার—	2, 5, 8, 11	7, 4, 6, 12	.........(II)
তৃতীয় বার—	3, 10, 11, 12	7, 6, 8, 9	.........(III)

উপরিউক্ত সারণীটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—

1নং বল পৃথক ওজনের হলে প্রথম বারে যে কোন একদিকের পাল্লা নেমে যাবে—কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের ওজনে তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকবে। একই ভাবে 2নং এবং 3নং বল পৃথক ওজনের হলে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারেও যে কোন একদিকের পাল্লা নেমে যাবে।

অনুরূপভাবে 4 কিংবা 5 পৃথক ওজনের হলে (I) ও (II) ওজনের সময় তুলাদণ্ড অনুভূমিক হবে না।

আবার 9 বা 10 পৃথক ওজনের হলে, (I) ও (III) ওজনের সময় তুলাদণ্ড অনুভূমিক হবে না। ঠিক একইভাবে, 8 বা 6 পৃথক ওজনের হলে (II) ও (III) ওজনের সময় তুলাদণ্ড অনুভূমিক না থেকে যে কোন দিকে হেলে যাবে।

এবার 4 এবং 5—এদের মধ্যে কোন্‌টি পৃথক ওজনের, তা নিম্নোক্ত উপায়ে বোঝা সম্ভব। যদি 4নং বলটি পৃথক ওজনের হয়, তবে (I) এবং (II) ওজনের সময় যথাক্রমে বাঁ-দিক এবং ডানদিকের পাল্লা হেলে যাবে আবার 5নং বলটি পৃথক ওজনের হলে (I) এবং (II) ওজনের সময় দু-ই বারেই বাঁ-দিকের পাল্লা হেলে যাবে। একইভাবে 9, 10 এবং 8' 6—এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

অবশিষ্ট 7, 11 এবং 12নং বলের কোন একটি পৃথক ওজনের হলে (I), (II) এবং (III) ওজনের প্রত্যেক বারেই তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকবে না। যদি 7নং বল পৃথক ওজনের হয়, তবে তিন বারেই ডানদিকে পাল্লা হেলে যাবে। 11নং বল পৃথক ওজনের হলে প্রথমবারে পাল্লা যেদিকে হেলবে, অন্য দু-বারে তার বিপরীত দিকে হেলবে। 12নং বল পৃথক ওজনের হলে তিনবারের ওজনে পাল্লা পর্যায়ক্রমে বাঁ-দিক, ডান-দিক ও বাঁ-দিকে হেলবে। এই ভাবেই 7, 11 এবং 12নং বলের মধ্যে পৃথক ওজনের বলটিকে সনাক্ত করা যাবে।

উঃ 2. $1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3$

ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান

লিভার ও তার ব্যবহার

বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের মাধ্যমে কঠিন কাজকে সহজে করা হয়ে থাকে। যে ব্যবস্থায় এক অংশে বল প্রয়োগ করে অন্য অংশের কোন বাধাকে অতিক্রম করা হয়, তাকে যন্ত্র বলে। অতিক্রান্ত বাধা ও প্রযুক্ত বলের অনুপাতকে যান্ত্রিক সুবিধা বলা হয়। লিভার হলো এক প্রকার যন্ত্র। এটি একটি সোজা বা বাঁকানো দণ্ড—যার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু স্থির থাকে এবং দণ্ডটি ঐ বিন্দুর চারপাশে অবাধে ঘুরতে পারে। স্থির বিন্দুটিকে আলম্ব (Fulcrum) বলা হয়। আলম্বের একই দিকের বা অন্য দিকের দুটি বিন্দুর একটিতে বল প্রয়োগ করা হয়, অন্য বিন্দুতে ভার থাকে।

লিভারের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই জানা ছিল। এর যান্ত্রিক সুবিধা খুবই বেশী। অনেকেরই এই ঘটনাটি জানা আছে যে, লিভারের কথা ভেবেই আর্কিমিডিস বলেছিলেন, ঠিক মত একটি লিভার পেলে তিনি তা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারেন।

টিউব-ওয়েল, ঢেঁকি, হাতল, কাঁচি, শাবল, ছিপ, চিমটা, বেলচা, পেরেকতোলা হাতুড়ি, আবর্জনা ফেলবার হাতগাড়ী প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন কাজে লাগে। এগুলির সবগুলিই বিভিন্ন শ্রেণীর (তিন) লিভারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীনকালের লোকেরা যে লিভারের ব্যবহার জানতো, তা প্রাচীন যুগের নিদর্শন থেকে জানা যায়। সিন্ধু যুগের লোকেরা যে নৌকা চালাতে জানতো, তা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার শীলমোহরের নিদর্শন থেকে জানা যায়। নৌকার দাঁড় হলো লিভার (প্রথম শ্রেণী)। এথেকে বোঝা যায় যে, সিন্ধু যুগের লোকেরা লিভারের ব্যবহার জানতো। সিন্ধু সভ্যতা তো অনেক পরের কথা, মানুষ যখন প্রথমে পশুর সঙ্গে গুহায় বাস করতো, সেই সময়েও মানুষ লিভারের ব্যবহার জানতো। লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; (ক) প্রথম শ্রেণীর লিভার, (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এবং (গ) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার লিভারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। টিউবওয়েলের হাতল (1নং চিত্র), তুলাদণ্ড, ঢেঁকি, কাঁচি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর লিভার (2নং চিত্র)। এই শ্রেণার লিভারের এক প্রান্তে বল P প্রয়োগ করতে হয় এবং অপর প্রান্তে ভার বা বোঝা W থাকে। যে প্রান্তে বোঝা থাকে, তার নিকটবর্তী কোন বিন্দুতে আলম্ব থাকে। কাঁচিতে দুটি প্রথম শ্রেণীর লিভার কাজ করে। ঠেলাগাড়ী,

সুপারী কাটবার যাঁতি প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত (3নং চিত্র)। এই শ্রেণীর লিভারের এক প্রান্তে আলম্ব বিন্দু C এবং অপর প্রান্তে বল P প্রয়োগ করতে হয়
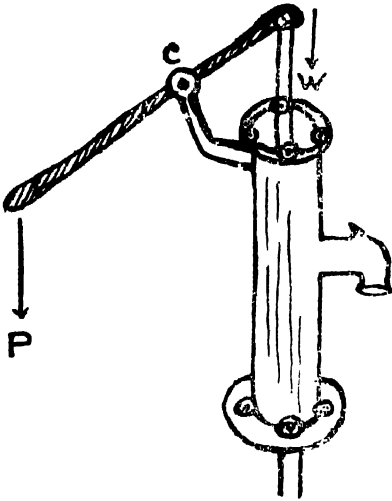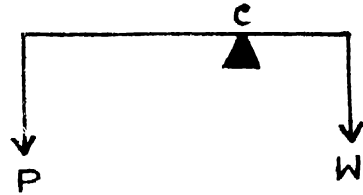
1নং চিত্র
2নং চিত্র

এবং P-এর নিকটবর্তী স্থানে ভার বা বোঝা W থাকে। সুপারী কাটবার যাঁতিতে এই ধরণের দুটি লিভার সংযুক্ত থাকে আবার মানুষের হাত (4নং চিত্র), মাছ ধরবার

3নং চিত্র
4নং চিত্র
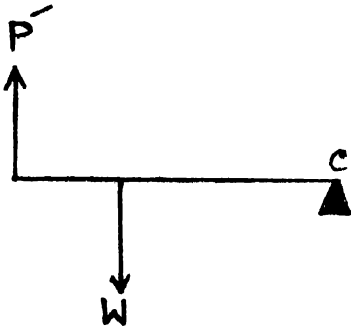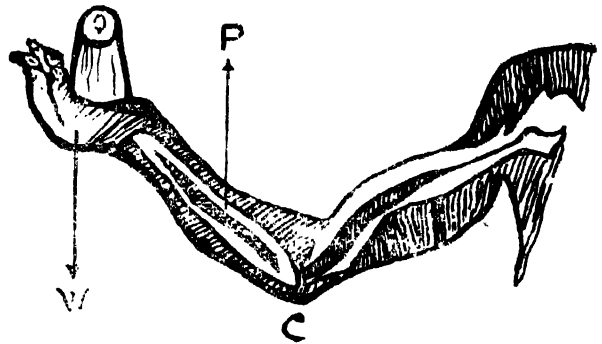
ছিপ, চিমটা প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর লিভার (5নং চিত্র)। প্রথম শ্রেণীর লিভারে বিশেষ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে সর্বদাই যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা নেই না থাকলেও বিশেষ ধরণের কতকগুলি সুবিধার জন্যে এই লিভার ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর লিভারের এক

প্রান্তে আলম্ব বিন্দু C থাকে এবং অপর প্রান্তে বোঝা W ও মাঝামাঝি স্থানে বল P প্রয়োগ করতে হয়।
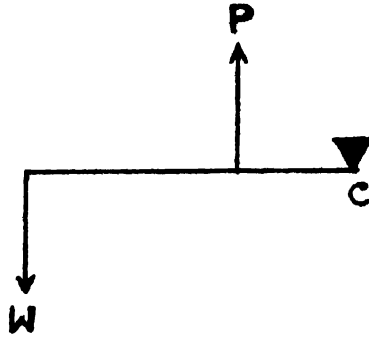
5নং চিত্র

অনেক সময় বেশ কয়েকটি লিভার নিয়ে একযোগে 'সম্মিলিত লিভার' তৈরী করা হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে ভারী মাল ওজন করবার জন্য 'ওয়েটব্রীজ' (Weight bridge) ব্যবহৃত হয়; এটি সম্মিলিত লিভারের একটি পরিচিত উদাহরণ।

আনন্দ সরকার

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1: র‍্যামি কি? এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করলে ভাল হয়।

—অজয়কুমার দত্ত, ফরিদপুর, বাংলাদেশ

উত্তর 1: পাট ও মেস্তাজাতীয় একপ্রকার গাছের ছাল থেকে তৈরী একজাতের উদ্ভিদ-তন্তুকে র‍্যামি বলে। এই তন্তু খুবই সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

এজাতীয় গাছ 1 মিটার থেকে প্রায় 3 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। তবে খুবই ঝোপজাতীয়। এজাতীয় গাছের গোড়ার মাটি থেকে বহু কাণ্ড উৎপন্ন হয়। পাট এবং মেস্তা গাছের তুলনায় র‍্যামি গাছের পাতা বেশ বড়। এই গাছে ছোট ছোট ফুল হয়—যা থেকে ফল এবং পরে বীজ পাওয়া যায়। সবরকম আবহাওয়াতেই র‍্যামির চাষ হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ এবং উষ্ণ অঞ্চলে র‍্যামির চাষ খুব ভাল হয়। চীনে সর্বাপেক্ষা বেশী র‍্যামির চাষ হয় এবং তাথেকে উৎপন্ন তন্তুকে চীনের লোকেরা

বিভিন্ন কুটির শিল্পে কাজে লাগায়। চীনে এই গাছ চীনা-ঘাস নামে পরিচিত। জাপান, ফরমোসা, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রেজিল, পেরু প্রভৃতি দেশেও র‍্যামির চাষ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে, আসামে, উত্তরবঙ্গে, বিহারের কয়েকটি জায়গায় র‍্যামির চাষ হয়। উত্তরবঙ্গে র‍্যামিকে কুরকুণ্ডা বলে। তবে উত্তরবঙ্গে সাধারণতঃ জেলেরাই এই চাষ অল্পমাত্রায় করে থাকে। তারা ঐ গাছের ছালের তন্তু দিয়ে মাছ ধরবার জাল তৈরী করে। কথিত আছে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে র‍্যামির চাষ করা হতো এবং তা থেকে সূতা তৈরী করে ভাল ভাল পোষাক বানানো হতো। বিশিষ্ট অতিথিদের র‍্যামির তৈরী ঐ সব পোষাক উপহার দেওয়ার প্রথা চালু ছিল।

র‍্যামির চাষের জন্যে শিকড় বা গাছের ছোট ছোট কাণ্ড রোপণ করা হয়ে থাকে। বীজ থেকে র‍্যামির চাষ করবার নানারকম অসুবিধা হয়; প্রথমতঃ বীজ থেকে চারাগাছ বড় হতে অনেক সময় লাগে এবং এছাড়াও দেখা গেছে যে, বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ এক রকমের হয় না। তাই কাণ্ড বা শিকড় চাষের জন্যে ব্যবহার করা হয়। পাট এবং মেস্তা চাষের জন্যে মোট সময় লাগে প্রায় 100 দিন। কিন্তু র‍্যামিগাছ একবার লাগালে প্রায় 5/6 বছর একই জায়গায় থাকে এবং সময় বিশেষে যখন গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরে এবং পাতা হল্‌দে হয়ে যায়, তখন র‍্যামির কাণ্ড কেটে নেওয়া হয়ে থাকে। এই চাষে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরণের জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক একটি গাছের গোড়া থেকে 15/20টি কাণ্ড পাওয়া যায়। এগুলি কেটে নেওয়ার পর মাটি থেকে আবার নতুন নতুন কাণ্ড বের হয়। সাধারণতঃ বছরে তিনবার কাণ্ড কেটে নেওয়া হয়।

পাট গাছ পচিয়ে যেভাবে তা থেকে আঁশ বের করা হয়, সেভাবে র‍্যামির আঁশ ছাড়ানো সম্ভব নয়। কেননা র‍্যামির ছালে একপ্রকার আঠালো পদার্থ থাকে, যা কাণ্ডগুলি ভেজাবার সময় গলে গিয়ে আঁশের সঙ্গে মিশে যায়; ফলে এভাবে র‍্যামি থেকে পরিষ্কার আঁশ পাওয়া যায় না। সেজন্যে কাঁচা কাণ্ড থেকে র‍্যামির ছাল ছুলে নেওয়া হয়—যা প্রথমে শুকিয়ে পরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাথেকে পরিষ্কার আঁশ বের করে নেওয়া হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানারকম পদ্ধতির মাধ্যমে র‍্যামির সবুজ কাণ্ড থেকে পরিষ্কার আঁশ বের করা হয়ে থাকে। তবে উৎকৃষ্ট আঁশ বের করবার পক্ষে কোন পদ্ধতিই খুব সহজ এবং ত্রুটিমুক্ত নয়। এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। এমনকি উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে বিভিন্ন দেশ থেকে সময় সময় নানারকম পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

র‍্যামির আঁশ রেশমের মত। এর আঁশে 90 শতাংশেরও বেশী আল্‌ফা-সেলুলোজ থাকে। পাটের তুলনায় র‍্যামির আঁশে লিগ্‌নিনের অংশ খুবই কম। র‍্যামির আঁশ

ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধক। বিভিন্ন প্রকার রঙের দ্বারা এর আঁশকে রঞ্জিত করা যায়। অন্যান্য তন্তুর কোষ অপেক্ষা র‍্যামির তন্তুর কোষ অনেক বেশী লম্বা হয়ে থাকে। এই কোষ প্রায় 75 মাইক্রন পর্যন্ত চওড়া। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যে র‍্যামির সুতা খুবই মজবুত হয়ে থাকে। র‍্যামির সুতা থেকে তৈরী পোষাক অপেক্ষাকৃত মজবুত হয়। তাছাড়া র‍্যামির তন্তুনির্মিত পোষাকে সহজেই হাওয়া চলাচল করতে পারে।

পৃথিবীতে পশমের উৎপাদন যথেষ্ট নয়। এজন্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় র‍্যামিকে পশমের মত তৈরী করে আসল পশমের সঙ্গে মিশিয়ে পশমের অভাব মেটাবার চেষ্টা চলছে। কৃত্রিম তন্তুর সঙ্গেও র‍্যামির তন্তু মিশিয়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য—দড়ি, সুতা, জাল, তোয়ালে, প্যারাসুট, নৌকার পাল, বৈদ্যুতিক বর্তনীতে উপযুক্ত তড়িৎ-নিরোধক এমনকি সিগারেটের জন্যে প্রয়োজনীয় ভাল কাগজও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

গৃহপালিত পশুপক্ষীদের জন্যে (গরু, মহিষ, মুরগী ইত্যাদি) র‍্যামি গাছের পাতা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতার প্রায় 30 শতাংশ প্রোটিন। একারণে কোন উপায়ে পরিশোধন করে মানুষের উপযোগী খাদ্য তৈরীর কথাও অনেকে ভেবে দেখছেন।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

পরিষদ-খবর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1975-76 সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

[স্থানাভাবে পরিষদের সাধারণ অধিবেশনের বিশদ বিবরণ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। এই সংক্রান্ত বিবরণ পত্রিকার জানুয়ারী '77 সংখ্যায় ক্রোড়পত্র হিসাবে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হবে]

গত 25শে নভেম্বর, 1976, বৃহস্পতিবার তিন ঘটিকায় পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবন'-এ অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার সভাপতিত্বে পূর্বে প্রচারিত কর্মসূচীমত সাধারণ অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। 1975-76 সালের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক প্রচারিত ও পরিষদের সভ্যগণের নিকট প্রেরিত পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলী সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি বিশদভাবে আলোচনার পর উক্ত সভায় যথোচিত সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় 1976-77 সালের কার্যকরী সমিতির জন্যে বিভিন্ন পদে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন :

অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি)

" সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ "

" মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী "

" বলাইচাঁদ কুণ্ডু "

" মৃগাঙ্কুমার দাশগুপ্ত (সহ-সভাপতি)

" মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ "

অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় "

" গৌরদাস মুখোপাধ্যায় "

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র "

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র "

অধ্যাপক মহাদেব দত্ত (কর্মসচিব)

ডঃ রতনমোহন খাঁ (সহযোগী কর্মসচিব)

ডঃ শ্যামসুন্দর দে (")

ডঃ সুনীলকুমার সিংহ (কোষাধ্যক্ষ) এবং কার্যকরী সমিতির সাধারণ সদস্য : শ্রীবিজয় বল, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামসুন্দর পাল, অধ্যাপক প্রতুল দে, শ্রীদেবব্রত সিন্‌হা, শ্রীমতী উষা ঘোষদস্তিদার, ডঃ শিবব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল কুমার দে, ডাঃ সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাধন পাণ্ডে, ডঃ বৈদ্যনাথ বসু, ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা, ডঃ মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদুলাল সাহা, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী।

পরিশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শ্রীমহাদেব দত্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

হাওড়া-ময়দানের ডালমিয়া পার্কে স্টুডেন্টস হেল্থ সেন্টারের আমন্ত্রণে পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গত 1লা ডিসেম্বর, 19‾6 থেকে জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীটি 1লা জানুয়ারী 1977 শেষ হবে। বিকাল 4টা থেকে রাত ৫টা পর্যন্ত এটি জনসাধারণের জন্যে নিয়মিত খোলা থাকে। উক্ত প্রদর্শনীতে হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকেও অংশগ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাই ঐ প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী-দের নিজের হাতে তৈরী বিভিন্ন মডেল ও চার্ট সুন্দরভাবে দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। জনজীবনের প্রয়োজনভিত্তিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তৈরী বেশ কিছু সংখ্যক মডেল এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। এগুলির মধ্যে আছে 'সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে সহজে ভেজাল সনাক্তকরণ,' 'স্বয়ংক্রিয় আপৎকালীন আলো.' 'বৈদ্যুতিক চিঠির বাক্স,' 'সিঁড়ির আলো', 'তিনবাবুর এক চাপরাশী', 'বর্তনী পরীক্ষক', 'মাছডাকা যন্ত্র', 'পেট্রোল থেকে বার্নার জ্বালানো, 'চুম্বকীকরণ ও বিচুম্বকীকরণ' 'ডিমার' প্রভৃতি আরও অনেক মডেল। শিক্ষা-ভিত্তিক মডেলের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক স্থানীয় সময়.' 'ডায়োডের কার্যপ্রণালী', 'প্লবতার পরীক্ষা' 'ওজনের আপাত হ্রাস' 'বৈদ্যুতিক উপায়ে রঙের খেলা,' 'কৃষ্ণবস্তুর তাপ শোষণ', 'স্থিতিশক্তি থেকে গতিশক্তি', 'মজার মজার রাসায়নিক বিক্রিয়া' ইত্যাদি আরও অনেক চিত্তাকর্ষক মডেল দেখানো হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই প্রদর্শনীটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সুদীর্ঘ 32 দিন প্রদর্শনী চলাকালীন কিছু দিন অন্তর অন্তর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে উক্ত প্রদর্শনীতে প্রয়োজনভিত্তিক ও শিক্ষাভিত্তিক —নানারকমের মডেল দেখানো হবে; অর্থাৎ বেশ কিছু মডেল নিয়ে আসা হবে এবং তার বদলে অন্যান্য আরও মডেল প্রদর্শিত হবে।

জনসাধারণকে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে এজাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীর গুরুত্ব সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার অপেক্ষা রাখে না। সেদিক থেকে এই আয়োজনের জন্যে স্টুডেন্টস্ হেল্থ্ সেন্টারের কর্মকর্তারা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে হাতে-কলমে কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীসুব্রত ঘোষ হেল্থ সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুব্রত রায়কে সহযোগিতা করছেন। হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য শ্রীবিকাশ চক্রবর্তী সমগ্র প্রদর্শনীটি পরি-চালনায় সহযোগিতা করছেন।

শ্যামসুন্দর দে
সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা
ও
হাতে-কলমে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে

পরিষদ সংক্রান্ত কোন বিষয় অবহিত হইবার প্রয়োজন হইলে কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।